বার্ষিক
প্রতি সংখ্যা ১
সিক
ত্রকা

(তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)
শ্রাবণ, (১৩৪০)

বিষয় সূচী

পুস্তক-পরিচয়

পাদক :

পরিচালক :
শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৪০

পরিচয়

কালান্তর

একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়া-পড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগদ্বেষে গল্পেগুজবে তাসেপাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা তিনচার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিত্তানুশীলনার যে আয়োজন হোত সে ছিল যাত্রা সংকীর্ত্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাঁচালি কবিগান নিয়ে। তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনী-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত। যে জগতের মধ্যে বাস সেটা সঙ্কীর্ণ এবং অতিপরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বারবার হয়েচে আবর্ত্তিত অপরিবর্ত্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবযাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেচে, সেই সকল কঠিন সংস্কারের ইঁটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানবব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেচে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতন প্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আরএক অংশের ঘাত সংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্চে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সঙ্কোচন-প্রসারণে পরিবর্ত্তিত হচ্চে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।

বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্য সংঘটন করেচে কিন্তু তার চিত্তের

সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য; এক চিরপ্রথার সঙ্গে আরএক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আরএক বাঁধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেচে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া প্রবল হয়নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়েনি,—একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জ্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েচে তাতে পার্সি-পড়া স্মিত-পরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ ছিল, এক মঙ্গলকাব্য আরএক বৈষ্ণব পদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিম্বা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখিনে, বৈষ্ণব গীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় পার্সি শব্দ জমেচে বিস্তর, তা ছাড়া সেদিন অন্তত সহরে রাজধানীতে পারসিক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েচে,—পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেচে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলেনি। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেচে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করেনি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-ভাঙাভাঙি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে। সেইজন্য পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।

তার পরে এলো ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে,—তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক

ব্যাপারে ঘটিয়েচে যোগ বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না ক'ষে ভাগেরই অঙ্কফল কষচে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর—তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাতালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সব চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।

ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। এই চেষ্টা যে-ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সেতো মৃত্যুর ধর্ম্ম। আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কি কতটুকু পেয়েচি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত করে নিপুণ ভঙ্গীতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েচে সেটা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্ব্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না—এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেচে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে চিত্ত জেগে আছে।

বর্ত্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কি। একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েচে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েচে সেইখানটাই সে

অধিকার করেচে। কিসের জোরে ? সত্য সন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলিস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্ত্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায়নি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্ম্মমভাবে দমন করেচে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত ক'রে সত্যকে সে যাচাই করেনি। প্রতিদিন জয় করেচে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্ম্মুক্ত।

যদিও আমাদের চারদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেচে, আমাদের সামনে এনেচে জ্ঞানের বিশ্বরূপ, মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্ব্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেচে, যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অণুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকার করতে চায়; এইটে দেখিয়েচে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবী করতে পারে না।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে-আইন এলো তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটেনা। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা-অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান,—কোনো মুনিঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ সৃষ্টি প্রবর্ত্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাট্‌খারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ-কথাটা এখনো আমরা সর্ব্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেচি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেচে সন্দেহ নেই। সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেচে তাদেরও আজ দেবালয়-প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও একদল লোক নিত্যধর্ম্মনীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্চেন,

তবু সেই আপ্তবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ণ জোর পাচ্চেনা। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজচে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শঙ্করাচার্য্য উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।

মুসলমান আমলের বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে, অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্য্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেচে তখনকার দেবচরিত্রকল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন শাসন পাকা করে তুল্‌ত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেচি। সেই নিষ্ঠুর বলের হার-জিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হোত। ধর্ম্মের নিয়ম মেনে চলবে সাধারণ মানুষ, সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করবার দুর্দ্দাম অধিকার অসাধারণের। সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে, কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে স্ক্র্যাপ্‌ অফ্‌ পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্দ্ধা রাখে। নীতি-বন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্ম্মসাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেচে। তখনকার দিনে প্রচলিত দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, এই কথাটার অর্থ এই যে জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খ্যাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেচে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্বের অপরিহার্য্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবী। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্ম্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজ সাম্রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারেনা যে উইলিঙডনো বা জগদীশ্বরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্ম্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করেনা। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে, এ-কথা মনে করিনে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত

শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্দ্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্ব্বভূমিনতা স্বীকার করে এক জায়গায় ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েচে।

যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোলো তখন স্বধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্ব্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে জন্মগত নিত্য বিধানে বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্ব্বতা আপন অসম্মান শিরোধার্য্য করে নিতে বাধ্য, তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্ত্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুলোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; এ-কথা ভুলে যায় যে ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেচে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্য্যকারণবিধির সার্ব্বভৌমিকতা, আর একদিকে ন্যায় অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দ্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হোতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করচি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে সকল দাবী আমরা কোনোদিন মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারিনি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েচে—"A man is a man for a' that"।

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্ত্তমান যুগে—অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারো শো খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি করে থাকে। য়ুরোপের যে-অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বর্য্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ-কথা কেউ সেদিন মনেও করেনি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উলটো দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্মেশন্ যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন যুগে য়ুরোপ যে-মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাট্‌সিনি-গারিবালডির বাণীতে কীর্ত্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেচি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর একদিকে ইংরেজচরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্বে ইংরেজের সরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল—সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম! কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেচি? মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়! অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবী, শ্রেণীনির্ব্বিচারে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারেনি। তা হোক্, আচরণে পদে পদে প্রতিবাদসত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ

করচে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেচে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়েনি। তবু য়ুরোপের বিদ্যা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমারের মনের মধ্যে সম্মান পাচ্চে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্ব্বেই বলেচি য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেচে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেচে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে। এতে করেই সকল প্রকার অভাব-ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েচে। এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই আজ পর্য্যন্ত আমরা স্বজাতিসম্বন্ধে দুঃসাধ্যসাধনের আশা করচি, এবং প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করচি সেই প্রবল পক্ষেরই বিচারের আদর্শ নিয়ে। বলতেই হবে এই চিত্তগত চরিত্রগত সহযোগ ছিল না আমাদের পূর্ব্বতন রাজদরবারে। তখন কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই মূলগত দূরত্ব ছিল যাতে করে আমরা আকস্মিক শুভাদৃষ্টক্রমে শক্তিশালীর কাছে কদাচিৎ অনুগ্রহ পেতেও পারতুম, কিন্তু সে তারই নিজ গুণে, বল্‌তে পারতুমনা যে সর্ব্বজনীন ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারেই, মানুষ ব'লেই মানুষের কাছে আনুকূল্যের দাবী আছে।

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চল্‌ল। বহুকালের সুপ্ত এসিয়ায় দেখা দিল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতিসংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্ত্তমান কালের মধ্যেই বর্ত্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যকরূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেচে। অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্বইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও

মনে ছিল যে এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব্ব ল এবং অর্ডর, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাইনে, কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল ল এবং অর্ডরের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েচে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।

আজ ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্ম্মানি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের অঙ্ক খুব মোটা। কিন্তু এর দ্বিগুণ মোটাও যদি হোত, তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হোতনা, দেনদার দেশে যদি কেবলমাত্র ল এবং অর্ডর বজায় রেখে তাকে আর সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত। যদি তার অন্নসংস্থান রইত আধপেটা পরিমাণ, তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হোত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে শতকরা পাঁচ সাত জন মানুষের মতো শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজনানুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্ব্বলতা নিহিত করে দেওয়া সত্বেও নিশ্চেষ্টপ্রায় থাকত তার আরোগ্যবিধান। কিন্তু যেহেতু জীবনযাত্রার সভ্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এ-সকল অভাব একেবারেই মারাত্মক; এইজন্যে পাওনাদরকে এমন কথা বলতে শুনলুম যে আমরা দেনাশোধ করবনা। সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারেনা যে এই প্রাণ-দেউলে-করা তোমাদের দুর্ম্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারবনা যাতে বর্ব্বরদশার জগদ্দল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে। বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপ যে-সভ্যতার আদর্শকে উদ্ভাবিত করেচে য়ুরোপই কি স্বহস্তে তার দাবীকে ভূমণ্ডলের পশ্চিম সীমানাতেই আবদ্ধ করে রাখবে? সর্ব্বজনের সর্ব্বকালের কাছে সেই সভ্যতার মহৎ দায়িত্ব কি য়ুরোপের নেই?

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হোলো চীনের মর্ম্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত এমন সর্ব্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয়নি,—এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েচে "মায়া" জাতির অপূর্ব্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল; তার বেদনা অনতিকালপরে লুপ্ত হয়েচে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েচে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জ্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য য়ুরোপ কী রকম করে দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জ্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানিন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্বসচিব শুস্‌টারের "Strangling of Persia" বইখানা পড়লে। ওদিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কি রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই জাতীয় কোনো হত-ভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্ম্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।

তার পরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দ্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্ব্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেচে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেনি। তারা আসত কালো আঁধির মতো ধূলায় আপনাকে আবৃত ক'রে, কিন্তু এ এসেচে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত উৎস উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে, দগ্ধ ক'রে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখ্‌চি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার

পরে বিশ্বাস হারিয়েচে, আজ সে স্পর্দ্ধা ক'রে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে; একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে-য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সঙ্কোচ ছিল, আজ সে লজ্জা দিচ্চে সেই সঙ্কোচকেই। আজকাল দেখচি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্চে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্চে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। সভ্য য়ুরোপের সর্দ্দার পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজীর বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়ার্লণ্ডে রক্ত-পিঙ্গলের যে-উন্মত্ত বর্ব্বরতা দেখা গেল, অনতি-পূর্ব্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুমনা। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে-য়ুরোপ একদিন তৎ-কালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েচে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজ্‌মের নির্ব্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠসাধনা, আজ দেখচি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠচে। ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা অল্পবয়সে আমরা য়ুরোপের বেদী থেকে শুনতে পেতুম, আজ সেখানে যারা খৃষ্টের উপদেশকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, যারা শত্রুকেও হিংসা করা মনে করে অধর্ম্ম, তাঁদের কী দশা ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্চি।

যুদ্ধবিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইমঁ লিখচেন—

"So after the war I was sent to Guiana. * * * condemned to fifteen years' penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness, but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment—banishment for life. One arrives in Guiana sound in health, young, vigourous, one leaves (if one leaves), weakly, old, ill. * * * One arrives in Guiana honest—a few months later one is corrupted * * * They (the transportees) are an easy prey to all the maladies of this land—fever, dysentery, tuberculosis and most terrible of all leprosy."

পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালী যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেচে, সে কী রকম দুঃসহ নরকবাস, সে-কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েচে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জার্ম্মানি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হোলোনা। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালীন য়ুরোপের বর্ব্বর নির্দ্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারদিকে উদ্‌ঘাটিত হোতে থাকল তখন এই কথাই বারবার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে—বর্ব্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্ব্বরতা? কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত", বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দ্দিনের মধ্যে দেখা দেয়, এইতো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার-পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারিনে, দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা, বলতে পারিনে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে-দুঃখী, যে-অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহ-গর্জ্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেইদিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া পর্য্যন্ত দেউলে হোলো। তার পরে আসুক কল্পান্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতিহাস

(২)

ইতিহাসের অর্থ ও রীতি সূচনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট করাই প্রবন্ধের এই অংশের উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের স্থূলধারাটী এক হলেও, বিভিন্ন দেশের পারিপার্শ্বিকের জন্য সে ধারা ভিন্নরূপ ধারণ করে ও ভিন্ন গতিতে চলে। যে দেশ কোন কারণে কৃষিপ্রধানই রইল, চাষ-বাস ব্যতীত যে দেশের লোকের জীবিকা-সংগ্রহের অন্য উপায় আবিষ্কৃত কিংবা অনুকৃত হল না, সেখানে সমাজের গঠন নির্ভর করে প্রধানত জমির সত্ত্বের ওপর। কৃষিপ্রধান দেশে জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধটী অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধের মূলসূত্র হয়ে ওঠে। হপ্‌কিন্‌স্ নামক একজন চিন্তাশীল লেখক পিতাপুত্রের সম্বন্ধ বিচার করে এক পুস্তক লিখেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি দেখাচ্ছেন যে সম্পত্তির ওপর পিতার একচেটিয়া অধিকারের বিপক্ষে পুত্র বরাবরই আপত্তি করে এসেছে, এবং সেই বিরোধের ফলে সমাজ-ধর্ম্মে অনেক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তাঁর ভাষায়, কৃষিপ্রধান সমাজে পিতার স্থান বর্ত্তমান সমাজের monopolist-capitalistএর মতন। রোমান আইনে পিতার অধিকার গোড়ায় কি ছিল এবং পরপর কি ভাবে কমে এসেছিল দেখলে হপ্‌কিন্‌সের মন্তব্যে সায় দিতে হয়। চীন সভ্যতাকে আমরা নিতান্তই ধর্ম্মপ্রাণ ও অটল-অচল বলে শ্রদ্ধা করি—কারণ সেটী গোষ্ঠীপ্রধান। গ্রানে সাহেব দেখিয়েছেন যে চীন গোষ্ঠীর মধ্যে পিতাপুত্রের আদর্শ-সম্বন্ধের ভিত্তি হল জমিদারের প্রতি প্রজার শ্রদ্ধাভক্তি। ঈজিপ্টেও এই জমিসত্ত্বসম্বন্ধ মনসবদারীতে পরিণত হয়ে সমাজের অন্যান্য কর্ম্মে ও চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস থাকলেও ঐতিহাসিক নেই—সেইজন্য এই কৃষিপ্রধান দেশের সম্পত্তিজ্ঞান কি ভাবে তার সমাজকে গড়ে তুলেছিল আমরা ঠিক জানি না। একটা কথা তবু জোর করে বলা চলে, মুসলমান ও ইংরেজ যুগে জমিদারী-সত্ত্বের ইতিহাস না জানলে লোক-সমাজের ইতিহাস বুঝতে পারা যায় না।

আমাদের লোকাচার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে লোক-ধর্ম্মে, আমাদের বিবাহাদি অনুষ্ঠানে, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধে, শ্রাদ্ধতর্পণে, গ্রাম্যসমাজের মনোভাবে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে। ভগবানকে রাজা এবং ভক্তকে প্রজা বলবার প্রথাটী অপ্রাচীন নয়। পৌরাণিক স্বর্গের সমাজও এই সমাজের প্রতীক। তা ছাড়া, মুসলমান-সাম্রাজ্যের উৎপত্তি, বিস্তার, ও পতনের মধ্যেও এ সম্বন্ধটী যে বিশেষভাবে কার্য্যকরী তা দেখতে পাই। মুসলমান রাজারা জমির ভোগদখলে বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করেন নি বলেই তাঁদের প্রভুত্ব ভারতের ঐতিহাসিক ধারাকে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত করে নি। ইংরেজ যুগের আইনে ভোগসত্ব পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, সেইজন্য আমাদের ইতিহাসের ধারাও বদলাচ্ছে। একদিকে স্থায়ী বন্দোবস্ত, অন্যদিকে প্রজাসত্ত্বের আইন,—ও খানিকটা তারই ফলে ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা, এইগুলোই হল ভারতের বর্ত্তমান যুগের নির্দ্দেশ-চিহ্ন।

কৃষিকার্য্যের অপেক্ষা জীবনধারণের আরো ভাল উপায় আছে ইংরেজের কাছেই প্রথমত আমরা এই খবরটী পেয়েছি। সেইজন্য ইংলণ্ডের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইংলণ্ডে জীবন-ধারণের রূপ-পরিবর্ত্তন এতই অদ্ভুত বলে লোকের মনে ঠেকে যে তাকে রেভোলিউশন বলা হয়। কিন্তু এই ইন্‌ডষ্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পূর্ব্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে আর একটা বিপ্লব লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধিত হয়েছিল। পশমের ব্যবসার জন্য মেষপালনের প্রয়োজন, সেজন্য অনেক জমি একত্রে থাকা চাই, তাই চাষার দখলে যে সব খণ্ড খণ্ড জমি ছিল সেগুলিকে এই জমিদার-ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের দখলে আনা হল। পার্লামেণ্ট কোন আপত্তি করলে না, পার্লামেণ্টের প্রায় সব সভ্যই তখন ঐ দলের। ইংলণ্ডের গ্রাম্য-অবস্থা তখন অন্য গ্রাম ও কৃষি-প্রধান দেশের মতনই ছিল। এখনকার ইংলণ্ডের অবস্থা দেখলে সে অবস্থা বোঝা যায় না, কেননা ইংলণ্ডই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে উৎপাদনের উপায়ভেদে, অর্থাৎ কল-কারখানার জন্য, সামাজিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাস একটী সম্পূর্ণ অধ্যায়ের পাতা শেষ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড কৃষিপ্রধান ছিল, (১৭৯২ সালেই প্রথম রীতিমত শস্য আমদানী

হতে লাগল), অনেক জমি তখনও ছোট জমিদারের হাতে। কুটীর-শিল্পের সাহায্যে তখনও অনেক লোকে জীবন-ধারণ করছে। কিন্তু এই সময় জমিদারের হাতে ব্যবসালব্ধ টাকা জমতে সুরু হয়। তাঁরা উদ্বৃত্ত টাকায় নতুন জমি, চাষ-বাসের নতুন কল কিনলেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদনবৃদ্ধি করে শস্যের দাম কমালেন। ছোট চাষীরা হটে গেল, কুটীর-শিল্প নষ্ট হল, টুকরো টুকরো জমি পরিবেষ্টিত হয়ে বড় জমিদারের দখলে এল। জমি দখলের জন্য অনেক সময় আইনের সাহায্যও নিতে হত না, তিন ভাগের দুই ভাগ চাষী সম্মতি দিলেই চলত। সম্মতি তাদের দিতেই হত। ফলে ১৮০০ সাল থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ একার জমি জমিদারের হাতে এল, ১৮৫০ সালে আর কিছুই বাকী রইল না। চাষী ও গ্রামবাসীদের common landএর ওপর অধিকারও চলে গিয়েছিল। গরীবের দুঃখ উপশমের জন্য একটা পরিবেষ্টন-সমিতিও যে বসেনি তা নয়, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু টাকাও চাষীরা পায়—কিন্তু সে টাকা দুদিনেই উবে যায়। তখন জমি ও গ্রাম থেকে বিতাড়িত চাষী বাধ্য হয়ে কলকারখানায় যোগ দেবার জন্য সহরে এল, কিংবা এই জমিদার ও প্রজার বেড়াজালের বাইরে নতুন দেশে, আমেরিকায় চলে গেল।

ইতিমধ্যে আবার কলকারখানার নতুন মালিকরা জমিদার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এই জন্য জমির দাম খাজনার চল্লিশগুণ হয়। পুরানো জমিদারের গোষ্ঠী লোপ পেল, নতুন বড় লোকের সঙ্গে বিবাহাদি চলতে লাগল। রিফর্ম্ম বিলের সময়, ১৮৩০।৪০ সালে, পশ্চিম য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ডেই জমিদারপিছু গড়পড়তা সব চেয়ে বড়, এবং জমির সত্ত্বাধিকারী চাষীপিছু গড়পড়তা সব চেয়ে ছোট জমির চাষ হত। ইংলণ্ডের গ্রাম্য-সমাজ এইভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হল, খাজনা উপভোগী জমিদার, ফসলের ব্যবসাদার জমিদার, এবং চাষের মজুর-সম্প্রদায়। কিন্তু গ্রাম্য-সমাজও ক্রমে লোপ পেল, ইংরেজ সহরবাসী হল। যেখানে কলকারখানা সেখানেই ভিড়, সেখানেই সহর।

ইংরেজ-সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন ও নতুন শ্রেণীবিভাগের জন্য একধারে যেমন ধন-তান্ত্রিক কৃষি-কর্ম্ম তেমনি অন্যধারে নতুন কলকব্জার

আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থসমাগমই দায়ী। এই সময়কার কল-কব্জার আবিষ্কারের বিবরণ পড়লে মনে হয় যে আবিষ্কারকদের প্রেরণা একেবারেই নিঃস্বার্থ ছিল না। কয়লার খনিতে জল ভরে উঠছে, সেই জল তুলে ফেলতে হবে, মজুররা পারছে না, নতুন কল চাই, অশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ররা ব্যাবহারিক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ চালানো কল একটা খাড়া করলেন, পরে একজন আবিষ্কারক সেই কলগুলোকে অদলবদল করে নতুন কল সৃষ্টি করলেন, যার সাহায্যে খনি থেকে জল তোলাও হল, আবার এক সহর থেকে অন্য সহরে দ্রুততরভাবে এবং সস্তায় মাল পাঠানোও হল। এই উপায়ে তুলোর কারখানায়, রাস্তা তৈরীতে, খাল কাটানোতে, সরবরাহের উপায়ে, রেল-জাহাজে, কলের বহুল প্রয়োগ সুরু হল। অবশ্য এসবই বিজ্ঞানের দৌলতে। আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের আপত্তি মঞ্জুর করে এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ-বিজ্ঞান কিংবা টেক্‌নলজি বলা চলতে পারে। কলের প্রয়োগ থেকে শুধু উৎপাদনের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি হল তা নয়, বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে জীবনধারণের উপায়ও পরিবর্ত্তিত হল। প্রথম পরিবর্ত্তন উৎপাদনের উপায়ভেদে; মানুষের বদলে কল, যার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ দূর থেকে দূরতর হতে চল্‌ল, যার ফলে আবার উৎপাদন নামক প্রকৃত সামাজিক প্রক্রিয়াটী নৈব্যক্তিক ও অমানুষিক হয়ে উঠল। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন সামাজিক শক্তির রূপভেদে—পূর্ব্বে ছিল যার অন্নসংস্থান বেশী তারই প্রতিপত্তি, এখন হল যার হাতে টাকা কিংবা যার টাকা ধার করবার ক্ষমতা বেশী তারই প্রভাব বেশী। পূর্ব্বে সামাজিক প্রতিপত্তির মাপকাঠি ছিল প্রতিপালন, এখন সেই ক্ষমতা সামাজিক কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্যই নিয়োজিত হল। পূর্ব্বে ক্ষমতার দায়িত্ব ছিল সমাজের প্রতি, এখন শক্তির দায়িত্ব হল শুধু নিজের অর্থবৃদ্ধি এবং শক্তির প্রয়োগ হল শক্তিশালী ব্যক্তির ও শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য চাই প্ল্যান, চাই নতুন কল, চাই নতুন বাজার, কিংবা পুরানো বাজারে চাহিদার নতুন স্তর, চাই র‍্যাশন্যালিজম, চাই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বুদ্ধি, চাই ব্যাবহারিক ধর্ম্ম, চাই মুনাফা বাড়াবার জন্য একনিষ্ঠতা। যত টাকা জমছে, ততই কল বাড়ছে, যত কল বাড়ছে ততই টাকা জমছে—এ যেন একটা স্বাভাবিক নিয়ম! আগে, মধ্যযুগে, একজোড়া কাপড়ের

জন্য তাঁতির বাড়ী যেতে হত, তাঁতি অর্ডার না পেলে ভাল কাপড় তৈরী করত না। কলের মালিক এই রকম ব্যক্তিগত অর্ডারের জন্য বসে থাকতে পারেন না। কল ও টাকাকে সর্ব্বদাই খাটানো চাই, বসে থাকলেই তাদের মালিককে তারা, গল্পের ভূতের মতন, মেরে ফেলবে। সব জিনিষ এক ছাঁচে ঢালাই হল ও বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হল। সেজন্যই শ্রম-বিভাগ, যাতায়াতের সুগমতা, এবং নতুন বাজারে অবাধ-বাণিজ্য ও ব্যবসা চাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাসের মূলকথা এই প্রয়োজনগুলি। এদের তাগিদেই ইংলণ্ড এখনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

কলকারখানার যুগে শ্রেণীবিভাগ সামাজিক পরিবর্ত্তনের একটী প্রধান কথা। পূর্ব্বে বলা হয়েছে, কৃষিজীবিদের অবস্থা নতুন জমিদারি প্রথার জন্য খারাপ হয়েই আসছিল। গৃহশিল্পীরাও কলকারখানার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ল। নতুন ধরণের জমিদার ও কলকারখানার মালিক এই দুই সম্প্রদায় মিশে নতুন ধনীর শ্রেণীতে পরিণত হল। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগ নতুন ধরণের, কিন্তু নূতন সৃষ্টি নয়। সমাজের শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বেই ছিল, এখনও রইল, জমিদার ও প্রজার শ্রেণী এখন কলকারখানার মালিক ও মজুর শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হল মাত্র। আদিমযুগে, অসভ্য জাতির মধ্যে শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। অসভ্যদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ, কর্ত্তৃপক্ষ ও শাসিত, এবং বিবাহ-বন্ধনের উপযোগী শ্রেণীবিভাগ ঐতিহাসিক ঘটনা। অনেকের মতে এটা ইকনমিক বিভাগ নয়। যদি নাও হয়, তবুও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে অন্নসংস্থানের জন্য বহিঃ-প্রকৃতিকে জয় করে, কিংবা তার সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ স্থাপন করার ফলে ইকনমিক শ্রেণীবিভাগ তাদের মধ্যে ছিল না। স্ত্রীপুরুষ, যুবাবৃদ্ধের জৈব বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম-বিভাগও ছিল। ধরা যাক্, শ্রেণী-বিভাগ হল কৃষিযুগের শেষ দিকে। কিন্তু মানুষ সে সম্বন্ধে সচেতন তখনও হতে পারল না। প্রথম ঐতিহাসিক কারণ বোধ হয় এই যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অর্থাৎ পুরোহিতবৃন্দ এই বিভাগকে গোপন রাখতে চেষ্টা করলেন, ধর্ম্মের সাহায্যে। এই সময় সামাজিক একত্বের প্রচারক হলেন পুরোহিত, এবং উপভোগী হলেন জমিদার, পরে জমিদারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জমিদার, অর্থাৎ

রাজা। রাজা হলেন ধর্ম্মের রক্ষক, কাণ্ডারী। এই যুগের কোন বড় লেখকদের লেখায় সমাজ যে এক নয়, বিচ্ছিন্ন, এই কথাটা ধরা পড়ে না। ধরা না পড়লেও একথা ঠিক যে সমাজ তখন শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। তখন বৃহত্তর সমাজের চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী ও পেশার প্রতিই মানুষের অনুরাগ পড়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের সর্ব্বত্রই যে guilds ও profession তৈরী হয়েছিল এই ঘটনাই সভ্যতার ইতিহাসের সব কথা নয়। যেটা চক্ষুর অন্তরালে ঘটছিল সেটা একটা নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি। ক্যাথলিক চার্চ্চের সৃষ্ট একত্বের চেয়ে এই ঘটনার সঙ্গেই বর্ত্তমান সভ্যতার যোগসূত্র বেশী দৃঢ়। যখন শুধু জীবন ধারণের জন্য চাষবাসের বদলে শস্যের ও অন্যান্য কাঁচামালের আমদানী-রপ্তানীতে বেশী মুনাফা আছে দেখা গেল, যখন রাস্তাঘাটের বদলে সমুদ্র-যাত্রা, গ্রামের বদলে ছোট সহর, হাট ও মেলার বদলে বাজার, উঠানের এক পাশে মরাইয়ের বদলে সহরের মধ্যে কিংবা নদীর ধারে গুদোম, সোজাসুজি লেনদেনের বদলে টাকার (ও পরে বিল্ ও চেকের) সাহায্যে লেন-দেন সুরু হল, তখন একদল ভদ্রলোক উঠলেন যাঁরা নিজেরা কিছু উৎপন্ন করেন না, অথচ উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে সাহায্য করেন। প্রথমে এই দলের অনেকে ইহুদী ছিলেন। কারণও ছিল,—প্রাথমিক খৃষ্টান ধর্ম্মের বাধার জন্য খৃষ্টানরা তেজারতী করতে পারতেন না। সে বাধাও ক্রমে রোমান আইনের দৌলতে হ্রাস পেল। সেই হ্রাসের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে। প্রথমে উত্তমর্ণ সুদ নিতেই পারতেন না, যা টাকা ধার দিতেন তাই ফেরৎ পেতেন। রোমান আইনে প্রথমে ঠিক হল, (Damnum Emergens) যদি ধার শোধ হবার দিন উত্তমর্ণ যে টাকা ধার দিয়েছিলেন কেবল তাই ফেরৎ পান, তা হলে যা ক্ষতি হতে পারত (অথচ হয়নি) তার পূরণের নামে সামান্য কিছু বেশী টাকা উত্তমর্ণ গ্রহণ করতে পারেন। ইতিপূর্ব্বেই উত্তমর্ণ ক্ষতিপূরণস্বরূপ সুদ গ্রহণ করছিলেন, তবে লুকিয়ে। যা অলক্ষ্যে ঘটছিল আইনের দ্বারা তাকেই প্রকাশ্য ও আইন-সঙ্গত করা হল। তারপর Lucrum Cessens, অর্থাৎ উত্তমর্ণ যে নিজে ব্যবসায়ে টাকা না খাটিয়ে পরকে টাকা খাটিয়ে বড় লোক হবার সুযোগ দিয়েছেন এই স্বার্থত্যাগের জন্য লাভের টাকা থেকে উত্তমর্ণের আংশিক

ক্ষতিপূরণ করার প্রয়োজন আইনে স্বীকৃত হল। শেষে Contractus Trinus—অর্থাৎ মোটা টাকা ও মুনাফার ক্ষতিপূরণের বিপক্ষে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে চুক্তিপত্র। (মধ্যযুগের আইনের ফাঁকি এখন অষ্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদের সুদ ও মুনাফা সম্বন্ধে মতবাদে পরিণত হয়েছে বলে সন্দেহ হয়।)

কৃষিযুগের পরিণতি জমিদার-তন্ত্রের যুগে—সে যুগের শ্রেণীবিভাগের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে এই যুগেই বড় বড় ব্যাঙ্ক তৈরী হয়, ইটালী, জার্ম্মানীর বাণিজ্যপ্রধান সহরে। সেখানে জমিদারের বদলে বণিক ও মহাজনরা অনেকটা স্বাধীনভাবেই নগরের কাজ চালাতেন। এঁরাই উপনিবেশে ব্যবসা চালাবার জন্য নিজেদের গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন। গবর্ণমেণ্টও সে অনুমতি সাগ্রহে দিলেন। তখন রাজা এবং তাঁর পারিষদ ও পার্শ্বচরবর্গ ই তখনকার গবর্ণমেণ্ট। তাঁদের টাকার দরকার তখন খুবই বেশী। উপনিবেশ থেকে বিস্তর জিনিষ আসতে লাগল, আমেরিকা থেকে সোনা রূপা এল। জমিদার-সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন ধনীর আবির্ভাব হল—squirearchy, ইংলণ্ডে যাঁদের প্রতিনিধি হলেন হ্যাম্প্‌ডেন। এই শ্রেণীর চাপে রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের, জমিদারের, পাদ্রীর ও রাজার প্রভুত্ব কমল। যাঁরা ধর্ম্মের সাহায্যে ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন তাঁদের ভাষায় এই system of Protestant rational ethicsই মধ্য-সত্ব-উপভোগী ধনী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের হেতু। তাঁদের ব্যাখ্যায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধটী উল্‌টে গেলেও তাঁদের বিবৃতি অনেকটা সত্য। কোথায় রইল মানুষের জঠরের ক্ষুধা? এখন এই মধ্যসত্বোপভোগীর কৃপায় উৎপাদনের প্রয়োজন পরিণত হল মানুষের বদলে পকেটের ও কলের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে, মুনাফার হার চড়ানো ও অবাধ বাণিজ্যের জন্য নতুন বাজারের সন্ধানেতে। একধারে মানুষ দল বাঁধছে, অন্যধারে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা লোপ পাচ্ছে। সবাই ভাবলে—এই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম। বড় বড় পণ্ডিতে প্রকৃতির এই নিয়ম বোঝাবার জন্য বই লিখলেন, একটা শাস্ত্র পর্য্যন্ত খাড়া করলেন। এঁরাই হলেন নতুন ধনীর পুরোহিতবৃন্দ। ভারতের অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতবর্গ ও নেতারা এঁদেরই বংশধর। আডাম্ স্মিথ্, রিকার্ডো শুধু অর্থনীতির নয়, ব্যক্তিতন্ত্রবাদেরও আদি ধর্ম্মপ্রচারক।

ধর্ম্মের এনামেল খ'সে যাবার পরও সমাজের শ্রেণীবিভাগ লোকের কাছে ধরা পড়বার সুযোগ দেওয়া হয় নি। তখন অন্য প্রলেপ লাগানো হল —একটী দেশাত্মবোধ, অন্যটীর বাংলা প্রতিশব্দ না থাকলেও তার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত—Liberalism। এই দু'টী মতবাদের ইতিহাস লেখবার স্থান এ নয়। মাত্র তাদের ভেতরকার সম্বন্ধটুকুর প্রকৃতি নির্ণয় করছি। সপ্তদশ শতাব্দীর য়ুরোপের রাজারা যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন তার সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁরা জমিদার-সম্প্রদায়ের নিকটে। সেই থেকে দেশাত্মবোধের সৃষ্টি। ক্যাথলিক ধর্ম্মের দ্বারা পুষ্ট একতাজ্ঞান এই দেশাত্মবোধের কাছে হেরে গেল। রাজা ও জমিদারবর্গের সন্ধির ফলে Physiocratism মতবাদ প্রচারিত হয়। ইংলণ্ডের এই মতের বহুল প্রচার হয় নি। নতুন ধনীকে তুষ্ট করার জন্য ইংলণ্ডে অন্য মতবাদের (Mercantilism) প্রয়োজন ছিল। ইংরেজই সর্ব্বপ্রথম দেশাত্মবোধের তথা ভূম্যাত্মবোধের মোহ কাটালে। ইংরেজ সর্ব্বপ্রথম বুঝলে যে ঔদার্য্যের মত মহৎ গুণ আর নেই। এই উদার-পন্থাকে বিচার করলে বোঝা যায় যে এটী নতুন ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ঔদার্য্যের দ্বারাই কল কারখানার মালিক নিজেদের সার্থকতা প্রমাণ করে, স্বার্থ গোপন করে, পরকে ভোলায়। প্রায় এক শত বৎসর ধরে পূরোদমে ইকনমিক জাতীয়তা চালাবার পর প্রমাণ করার প্রয়োজন হল যে বস্তুটী অসার। প্রমাণিত হল যে, সমাজের মূলে আছেন ব্যক্তি, যাঁর গোটাকয়েক জন্মগত অধিকার আছে, যিনি নিজের কিসে ভাল হয় নিজেই ভাল বোঝেন, অতএব তাঁকে নিজের মতে কাজ করবার সুবিধা দিলে জগতের অধিকতম উপকার হবে। অতএব সিদ্ধান্ত হল—ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। উদারতার অর্থ ব্যক্তির স্বাধীনতা। অবশ্য ব্যক্তি মানে যে-সে ব্যক্তি নয়, ধনী-ব্যবসাদার-সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তি। অন্য ব্যক্তির পক্ষে সহ্যগুণই হল সব চেয়ে বড় সদগুণ—কারণ সহ্য করলেই অন্ন জুটবে, নচেৎ জুটবে না। পৃথিবীতে নানা প্রকৃতির মানুষ আছে, কিন্তু অন্তরের মনুষ্যত্ব যখন একই বস্তু তখন ঝগড়া-ঝাঁটি করে লাভ নেই, তখন সেই ভেতরের মনুষ্যত্বকে সুবিধা দেওয়া হোক্, জয় হোক সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার, জয় হোক সাধারণতন্ত্রের! ভেতরের মনুষ্যত্ব অর্থে

হিসাবী-জীবটুকু, যার একমাত্র কাজ সস্তায় কিনে মাগ্যিতে বেচা, যার একমাত্র প্রয়োগ একটী নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধি। (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলেই বুদ্ধিবাদের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়।) আসল কথা, ব্যবসা চালাবার জন্য কোন বাধাবিঘ্ন থাকলে চলবে না, না থাকবে রাজনৈতিক বাধা, না থাকবে শুল্কের, না থাকবে দূরত্বের। টাকা ঘরেই রয়েছে, সে টাকা খাটাবার জন্য কাঁচামাল পাকামালে পরিণত করে বেচবার জন্য বাজার চাই। মজুরদের যেখানে সেখানে চাকরী নেবার, জমি, ঘরদোর ছেড়ে কল-কারখানার দরজায় ভিড় করার জন্য স্বাধীনতা চাই। দেশে যে বাধা দেবে সে জেলে যাবে, বিদেশে যে বাধা দেবে তার সঙ্গে যুদ্ধ হবে। অর্থাৎ বাজারের কোন দরজা থাকবে না, বাজার হবে অনিয়ন্ত্রিত। মাত্র একটী নিয়ম সেখানে থাকবে। সেটী মানুষের তৈরী নয়, বোধ হয় ভগবানের, ভগবানের না হলে প্রকৃতির, প্রকৃতির না হলেও মানব-প্রকৃতির, তাও না হলে তাই হওয়া উচিত। নিয়মটী হল মুনাফার আশা। বড় বড় পাদ্রী, বড় বড় জীবতত্ত্ববিদ, বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ, দার্শনিক, অর্থনীতির মহারথীরা বল্লেন, 'হাঁ, হাঁ, তা ত বটেই, আমরাও ভেবে তাই বুঝেছি।' অমনি বই লেখা হয়ে গেল। অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহ এই বিষয়টীর ইতিহাস অতি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'বিচিত্রা'র পাতায়।

ইংলণ্ডই য়ুরোপ নয়। ফ্রান্সে ও জার্ম্মানীতে জমিদারতন্ত্রের প্রকোপ আরো বেশী দিন ধরে চলেছিল বলে সে সব দেশে নতুন শ্রেণী অত শীঘ্র গঠিত হতে পারে নি। ফরাসী বিপ্লবের পরেই ফ্রান্সে, এবং আরো প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে জার্ম্মানীতে নব্য-সম্প্রদায় মাথা তোলেন। ফ্রান্সে ছোট ছোট চাষী জমির অধিকারী হওয়ার দরুণ, কয়লা এবং লোহা না থাকার দরুণ, এবং উপনিবেশ ইংরেজের হস্তান্তরিত হবার জন্যই ফরাসী মধ্যসম্ভোগভোগী শ্রেণী ভাল ভাবে সমাজের ও রাষ্ট্রের বুক জুড়ে বসতে পান নি। জার্ম্মানী নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। একাংশে জমিদার, অন্যাংশে ছোট চাষী, মাঝখানে কল-কারখানার মালিক ও বণিকের প্রাধান্য ছিল। জার্ম্মানীর আবার উপনিবেশ পর্য্যন্ত ছিল না। এই সব নানা কারণে ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে ইংলণ্ডের মত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাব

ফুটে উঠল না। যতটুকু ফুটেছিল তারই জন্য industrial movement-এর গোড়ার দিকে ফ্রান্স ও জার্ম্মানীকে খানিকটা উদার-পন্থী হতে হয়। এখনকার তুলনায় তখনকার বিদেশী দ্রব্যের ওপর শুল্কের বাধা কমই ছিল।

কিন্তু সব দেশেরই একই সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চলতে পারে না। বাজার কই? দেশের সমাজের নতুন স্তর কিংবা দেশের বাইরে উপনিবেশ ভিন্ন বাজার নেই। অন্য দেশের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যে ও বিনিময়ে বাধা তোলে ধনী সম্প্রদায়ের স্বষ্ট দেশাত্মবোধ। তাই বাকী পৃথিবীর উপর টান পড়ল। এশিয়া ও আফ্রিকা ভাগ হল। যে দ্রব্যউৎপাদনে তুলনায় বেশী লাভ সম্ভব, সেই বিশিষ্ট দ্রব্য এক দেশে বেশী প্রস্তুত হতে লাগল। প্রতিযোগিতার হাত থেকে তবু রক্ষা নেই। সব দেশ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হল। শ্রমবিভাগের নতুন সংস্করণ সুরু হয় এই অবস্থা থেকে। আগে দেশের সমাজে ছিল ধনী ও নির্ধন, মালিক ও মজুর, কল কারখানা ও কৃষি, এখন সেই বিভাগ পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। য়ুরোপ পাকামাল রপ্তানী ও এশিয়া আফ্রিকার উপনিবেশ এবং আমেরিকা কাঁচামাল সরবরাহের ভার নিল। অর্থাৎ ধনীর স্বদেশ বলে কিছু রইল না, এবং ধনোৎপাদনের সাহায্যে শ্রমিকের ভৌগলিক পরিসীমাও লোপ পেল। কিন্তু উপনিবেশ কারুর ভাগ্যে বেশী, কারুর ভাগ্যে কম, কারুর ভারবাহী জাহাজ বেশী, কারুর কম। তাই মন্দভাগ্য দেশের ধনীরা দেশের দিকে মন দিলেন। আগে দেশের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে জিনিষ পাঠাতে হলে শুল্ক দিতে হত। শুল্ক তুলে দেওয়া হল। রাস্তাঘাট, খাল, রেল লাইন দেশকে ছেয়ে ফেল্‌লে। একা ইংলণ্ড ও হলাণ্ড ব্যতীত য়ুরোপের বাকী সব দেশই আত্মরক্ষায় অর্থাৎ দেশের ঐক্যসাধনে মন দিলে। ষ্টেট্ হল ভগবান, জাতিগত ঐক্য হল সব চেয়ে শক্ত বাঁধন। এইটাই হল জার্ম্মান লিবারেলিজম। এর সঙ্গে ইংরেজ লিবারেলিজমের পার্থক্য অনেক। জার্ম্মান উদারপন্থার মূলকথা ষ্টেট্ ও সমাজগত ঐক্য, ইংরেজী উদারপন্থার মূলকথা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পার্থ্যক্যের কারণও সুস্পষ্ট; ইংলণ্ডের উদারপন্থা উপনিবেশ ও অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের ফল, জার্ম্মানীর হল উপনিবেশ না থাকার প্রতিক্রিয়া। এই জন্যই বোধ হয় ইংরেজী চিন্তাধারায় লালিত

ভারতবাসী কম্যুনিজম, ফ্যাসিজম্, নাৎসি আন্দোলন ঠিক বুঝতে পারে না। জার্ম্মানীতে উদারমতের প্রচারক ছিলন হেগেল, ফিখ্টে প্রভৃতি দার্শনিক, লিষ্টের মত অর্থনীতিবিদ, এবং আমনের মত জাতিতত্ত্ববিদ। সকলেই ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতেন, অর্থাৎ ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য ও বৈশিষ্ট্যকে গণ্য করেই তাঁরা নিজেদের মত প্রস্তুত করেছিলেন। ইটালীতে এ মতবাদের প্রবর্ত্তক ছিলেন সিসমণ্ডী। লিষ্ট দেখলেন বিশ্বজনীন অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য সব দেশের পক্ষে সব সময় উপযুক্ত নয়। কোন দেশ কৃষিপ্রধান, কোন দেশ ব্যবসা ও বাণিজ্যপ্রধান, অতএব অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা চাই। লিষ্ট বল্লেন, ইকনমিক নিয়মাবলী ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক নয়। প্রত্যেক দেশের অবস্থা প্রায় সমান সমান হলে তবেই তাদের মধ্যে অবাধ ব্যবসা চলতে পারে। সে জন্য গবর্ণমেণ্টের, রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন—কেননা সমাজের অন্য কোন শক্তি বিদেশ থেকে আমদানী বন্ধ করতে পারে না। ইতিমধ্যে ষ্টেটের সাহায্যে দেশের উৎপাদন-শক্তি সর্ব্বাঙ্গীণ হয়ে উঠুক, ইংলণ্ডে যেমন অবাধ-ব্যবসার যুগের পূর্ব্বে ছিল, যেমন আমেরিকায় সে সময় হচ্ছে। লিষ্টের মতবাদে গোটাকয়েক জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে। (১) ঐতিহাসিক অবস্থা ও পারম্পর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা; (২) ইকনমিক জাতীয়তা; (৩) ষ্টেটের উপর নির্ভরশীলতা; (৪) অবাধ-বাণিজ্যের আপাত-অসম্ভবনীয়তা। লিষ্ট অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে ছিলেন না, বরঞ্চ স্বপক্ষেই ছিলেন, তবে তখন নয়, পরে, ষ্টেটের সাহায্যে ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির পরে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে লিষ্ট দেশবাসীকে বোঝালেন যে ভৌগলিক দূরত্ব না ঘোচালে দেশের মধ্যে অবাধ-বাণিজ্য চলতে পারে না। তাঁরই উপদেশে জার্ম্মানীতে রেল লাইন বিস্তৃত হয়। লিষ্টের মূল বক্তব্যগুলি লক্ষ্য করলে সন্দেহ হয় যে তাঁর মতবাদ জার্ম্মানীর ধনতন্ত্রের পরিপোষক মাত্র। অন্য দিক দিয়ে দেখলেও তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমেরিকা থেকে লিষ্ট balanced economy শিখে এসেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ষ্টেটকে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হলে চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে, এবং কৃষিজীবী ও ব্যবসা-জীবিদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কোন একটি বিশেষ উপায় বা শ্রেণী অন্য কোন উপায় বা শ্রেণীকে

গ্রাস করবে না। তখন জার্ম্মান শ্রমিকরা শ্রেণীবদ্ধ হয় নি, তাই উপায় বলতে ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা শস্যউৎপাদন, ও শ্রেণী বলতে রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসাদার, জমিদার, কৃষিজীবীই বোঝাত। এই জার্ম্মান (প্রুসিয়ান) জমিদার সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ জমিদারের মতন ছিলেন। তাঁরা ছিলেন প্রভু ও ধনী, জমিদারি ছিল তাঁদের প্রকাণ্ড, লোক-লস্করের সাহায্যে জমিদারিতে বসে তাঁরা জমিদারি চালাতেন। তাঁরা এখন ষ্টেটের কাছ থেকে লিষ্টের মতানুযায়ী সাহায্য চেয়ে বসলেন, সমগ্র দেশের খাদ্য-সরবরাহের নামে। ষ্টেট তাঁদেরকে অনেক সুবিধা দিতে বাধ্য হল। Protectionism এর মোদ্দা কথা এই—দেশের মধ্যে, দেশাত্মবোধের নামে, নতুন ধনী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ ব্যবসাদার ও জমিদারকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া; স্বাধীনতার প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফাবৃদ্ধি করা ও এমন বাজার তৈরী করা যেখানে অন্য দেশের সস্তামাল প্রবেশ করতে পারবে না। এ স্বাধীনতা ষ্টেটের দান।

এইবার ইংলণ্ড অন্য পথ ধরলে। ইংলণ্ডের ধনতন্ত্র আরো পুরাতন, দেশটাও ছোট, সব মাল দেশে তৈরী হয় না, পূরো বছরের খাবারের জন্য অন্য দেশ থেকে মাল আমদানী করতে হয়, অথচ টাকা বেশী, উপনিবেশ অনেক। ভারবাহী জাহাজ, জীবন বীমা, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা ইংলণ্ড পৃথিবীকে কিনে রেখেছে। এ অবস্থায় ধনতন্ত্র সে দেশে সহজে উগ্র হয়ে উঠবে আশা করা যায়। কিন্তু উগ্ররূপ পরকে দেখানো যায় না। মালিকের দল তাই প্রতিযোগিতার কুফল বুঝে খুব বড় বড় কল-কারখানা ফাঁদলেন। দেশের মধ্যে বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলিতে অর্থ ও বিজ্ঞানের জোরে এবং উপনিবেশে নিজেদের রাষ্ট্রের জোরে একচেটিয়া ব্যবসার পত্তন করলে। একচেটিয়া ব্যবসা চালাবার জন্যই সমুদ্রপারের উপনিবেশের সার্থকতা। আজ সে সার্থকতা সর্ব্বত্রই ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে, উপনিবেশের ধনীসম্প্রদায় স্বদেশ-হিতৈষী হয়েছেন। যে কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন পতাকা, সেই কারণে ভারতবর্ষেরও গৈরিক পতাকা। নানা বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এইখানেই বিশ্বের সাথে আমাদের যোগ। ইতিহাসের এই ধারাতেই আমাদের বর্ত্তমান ইতিহাস পুষ্ট হচ্ছে, আমাদের সমাজ ও মন গড়ে উঠছে।

আমাদের মানসিক ইতিহাসের তিনটী বর্ত্তমান লক্ষণ আছে। এক, দর্শন ও ধর্ম্মের ভাষার নিয়ত প্রয়োগ, দুই, দেশাত্মবোধ, ও তিন, উদারমত। এই তিনটী নিদর্শন কিন্তু আমাদের ইতিহাসের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করে না। বরঞ্চ গোপন করে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, কংগ্রেস ও শিক্ষিত সমাজ এই গোপন ষড়যন্ত্রের নায়ক। ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের চক্রান্ত ধরা পঁড়েও পড়ছে না। মহাত্মাজী ও মালব্যজী অচ্যুতদের মন্দিরে ও কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার দিতে প্রস্তুত, কিন্তু চতুর্বর্গের উপর হস্তক্ষেপ না করে। অচ্যুতোদ্ধার সমিতির সভাপতি বির্লা ব্রাদার্সের একজন। কংগ্রেস শ্যাম রাখেন না কুল রাখেন নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না। একধারে ধর্ম্ম, অন্য ধারে অর্থের প্রতিকূল টানে কাম নিষ্কামের কোঠায় উঠেছে—মোক্ষ ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। কংগ্রেস কাকে সন্তুষ্ট করবেন—ব্যবসাদারকে না জমিদারকে? অনুষ্ঠান কাকে সন্তুষ্ট করছে এই প্রশ্নের উত্তরই অনুষ্ঠানকে বিচার করে। ধনীসম্প্রদায়ের কার্য্যাবলী দেখলে বোধ হয় যে তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক role সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, তাই তাঁরা কংগ্রেসকে খানিকটা সাহায্য করতে প্রস্তুত। শ্রমিকেরা বোধ হয় এখনও সচেতন হয় নি, তবে বোধ হয় হ'তে বেশী দেরী নেই। একদিকে ভারতের ইতিহাস এখন লিবারেল যুগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে একচেটিয়া ব্যবসার তাগিদে যে অধিরাজ্য, বা ইম্পিরিয়লিজম তৈরী হয় তারই ফলাফল আমাদের সকলকে ভোগ করতে হচ্ছে। এ দুইএর মধ্যে বিরোধ রয়েছে, কিন্তু সেটা গতির হারের, সাময়িক ক্রমের পার্থক্যে। বিরোধটী প্রকৃতিগত নয়। অনেকের মতে আমাদের সমাজ অতি শীঘ্রই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে, বাইরের চাপে, যেমন ল্যাবরেটারীতে অতিরিক্ত আলোর জোরে একটী জীবকোষ অল্প সময়েই বিভক্ত হয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে দেশ অনেক বেশী প্রত্যাশা করে। সে প্রত্যাশা তাঁরা মেটাননি ব'লে তাঁদের সামাজিক কৃতঘ্নতার তুলনা নেই। তাঁরা বিদেশী রাজা ও ধনীসম্প্রদায়ের আশ্রয়ে জন্মেছেন বলে পরিত্রাণ নেই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কার্য্যাবলী, অর্থাৎ তাঁদের বই সকলকেই পড়তে হয়। বিশেষত ঐতিহাসিকদের। দু-একজন ছাড়া

এঁরা সকলেই দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ, সকলেই ইংরেজী ধরণের উদারপন্থী। কেউই সামাজিক ইতিহাস লেখেন না। কারুর লেখাতেই ইতিহাসের ধর্ম্ম ও রীতি প্রকাশ পায় না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ তাঁদের দেখাতে হয়, কিন্তু সে সম্বন্ধ নির্ভর করে শুধু প্রমাণের ওপর। প্রমাণ-সাপেক্ষতাই তাঁদের যৌক্তিকতার একমাত্র অস্ত্র। তাঁরা উকীল হলেও পারতেন, ঘটনার বিপর্য্যয়ে, বোধ হয় নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বড় উকীল না থাকার দরুণ, ঐতিহাসিক হয়েছেন। ইতিহাসের আদিতে ও ঘটনার পারম্পর্য্যের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা কাজ করে তার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই। তাঁরা সামাজিক বিপ্লবের ইতিহাস লেখেন না। কি ভাবে সমাজ বাঁচবার জন্য চেষ্টা করছে, ভাল ভাবে বাঁচবার জন্য সমাজ গঠন কোন সঙ্কট-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে—এ বিষয়গুলি তাঁরা বাদ দেন। তাঁরা জনসাধারণের ইতিহাস লেখেন না, জনসাধারণকে অবহেলা করেন, বোধ হয় ঘৃণাও করেন। সেই জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকরা হয় ছদ্মবেশী উকীল, না হয় ছদ্মবেশী কেরাণী। তাঁদের ইতিহাস পুরানো কাসুন্দী ঘাঁটা, সমসাময়িক ইতিহাস নয়, ভবিষ্যতের ইতিহাসও নয়। যা হচ্ছে, যা হয়ে এসেছে তাই ভাল—এই প্রমাণ করাই তাঁদের গূঢ় অভিসন্ধি।

ভারতবর্ষের ইকনমিষ্টদের বিপক্ষেও অনেক আপত্তি রয়েছে। আমরা পড়াই আডাম্ স্মিথ্, রিকাডো, মার্শাল্, যাঁদের মতগুলি অ-নিয়ন্ত্রিত ও অবাধ বাণিজ্যের ধনতন্ত্র ও অধিরাজকতন্ত্রের সমর্থনের জন্য তৈরী হয়েছিল। কিন্তু মনে মনে চাই আমরা Protectionism, যার প্রকৃতিও পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যা পড়াই এবং যা চাই তার মধ্যে মতের বিরোধ রয়েছে। তা ছাড়া, আমরা ইনডাষ্ট্রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে, চরখা চালানো ও চাষবাসের সপক্ষে। কিন্তু অবাধবাণিজ্য ও স-বাধ বাণিজ্য দুইই কল কারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যে দেশ কৃষিপ্রধান তাদের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। বলকান দেশ ও রুষের ইতিহাস আমাদের পড়া উচিত, সবুজ-বিদ্রোহের ইতিহাস আমাদের জানা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়েও ওসব দেশের ইতিহাস পড়ানো হয় না। নিখিল ভারতীয় ইকনমিক্ কন্‌ফারেন্সে মার্শাল কিংবা তাঁর দলের মত ভিন্ন অন্য মতের আলোচনা করলে হাস্যাস্পদ

হতে হয়। নিখিল ভারতীয় ইকনমিক কন্‌ফারেন্স যে চলছে তার একমাত্র কারণ এই যে আমাদের বংশগত একটা ঐক্য আছে। সেটী হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উদারপন্থাকে সমর্থন করা। অটোয়া চুক্তির তর্কে আমাদের অর্থনীতিবিদেরা ধনী-সম্প্রদায়ের স্বার্থই দেখেছিলেন। যাঁরা আপত্তি করলেন তাঁরা বম্বেওয়ালার মুখ চেয়ে কিংবা দেশাত্মবোধের দোহাই দিয়ে, যাঁরা সমর্থন করলেন তাঁর ব্রিটিশ ইম্পিরিয়লিজমের মূল কথাটী অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ-সন্ধান না বুঝে। সামাজিক ইতিহাসের দিকে কেউ দেখলেন না। ভারতবাসীর এই মানসিক কাঠামোতে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যকে বসানো হয়েছে। সে জন্য বিজ্ঞানের ডাক্তার হয়েও গোঁড়ামী, বিজ্ঞান শিক্ষার বদলে শিল্প শিক্ষার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্রেরা আর্টস বিভাগের ছাত্রের চেয়ে কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়, এবং তাঁরাও গবর্ণমেণ্টের চাকরী না পেলে বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দিয়ে শিল্পবিদ্যার কলেজ প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বচন উদ্ধৃত করে। আর দর্শন! আমাদের দর্শনের পুস্তক সবই দর্শনের ইতিহাস, সে ইতিহাসও আবার রেকর্ড ঘেঁটে রিপোর্ট লেখা। সাহিত্যের আজ ভীষণ দুর্ভাগ্য। তরুণ সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা সব বড়লোক হতে চান, ওপরের শ্রেণীতে উঠতে চান্। সেখানে যেটুকু দুঃখের খবর পাই সেটুকু অর্থের অনটনে, কিংবা রোমাঞ্চকর ভাববিলাসের অসুবিধায়।

এই হল আমাদের দেশের অবস্থা। এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য হল—বিংশ শতাব্দীতে জীবন-ধারণ করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর উপযোগী জীবন-ধারণের উপায় অবলম্বন করা। এখানে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের কথা ওঠে না। কথা ওঠে ঐতিহাসিক রীতিনীতির, যার মধ্যে দৈবশক্তির ক্রীড়া না থাকলেও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের দুর্নিবার পরাক্রম লক্ষ্য করা যায়।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ছেলেবেলায় ভূত প্রেত, দানা দক্ষ, যক্ষ রক্ষ, এ কোনো কিছুই মানতে শিখি নেই। জুজু নামক একটা জীবের নামও লোকজন আমাদের কাছে করতে পেত না। আষাঢ়ে গল্প নানারকমের শুনতাম বটে, কিন্তু সে সব গল্প সত্য নয় জেনেই শুনতাম। এই ত গেল শৈশবের কথা। তারপর ইস্কুল কলেজে বছর পনেরো ধ'রে শিখলাম যে ইংরাজেরা এ দেশে যে নবীন চিন্তার ধারা এনেছেন, তাতে সংস্কার, বিশ্বাস, এ সবের স্থান নেই; যুক্তিদ্বারা যা সিদ্ধ হয়, একমাত্র তাই মেনে নেওয়া যেতে পারে, বাকী সব বাতিল। এও মাথা পেতে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন সমস্যায় পড়েছি। সাহেবেরা যে এত দিন ধ'রে হাইড্রোজেন অক্সিজেন ইত্যাদি নানা শ্রুতি-মধুর নাম দিয়ে গণ্ডা বিশেক বিভিন্ন গোত্রীয় পরমাণুর অবতারণা ক'রে আমাদের চোখে ভেল্‌কী লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সে ত শুনতে পাই আজ রদ্দী হ'য়ে গেছে। আবার না কি মান্ধাতার আমলের সেই এক অদ্বিতীয় পরমাণুর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার পর, ইথার। বিদ্যার্জ্জনের সময়েই ঐ অদৃশ্য অস্পৃশ্য ভারবিহীন পদার্থটা সম্বন্ধে একটু খটকা লেগেছিল। এক একবার মনে হত যে যেমন তাপের ক্যালরী বাতিল হয়ে গেছল, তেমনই এটাও যাবে। তবু সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিজ্ঞানের একটা মূলমন্ত্র আঁকড়ে ধ'রেছিলাম যে পদার্থ আর শক্তি দুটো বিভিন্ন জিনিস, এ দুটোর অদল বদল হতে পারে না। এ সম্বন্ধে প্রাচীনদের মত যখন কানে আসত, অমৃতং বালভাষিতং ব'লে উড়িয়ে দিতাম। সেদিকেও ত আজ সব গুলিয়ে গেল। বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা বলেছেন যে রেডিয়ম ব'লে না কি এক পদার্থ বেরিয়েছে যা একটুও ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে ক্রমাগত শক্তি বিকীর্ণ করছে। তাহলে আর কি ধ'রে থাকি? এ অবস্থায় একবার সমস্ত লব্ধবিদ্যাটা কষ্টিপাথরে ঘ'ষে যাচিয়ে নেওয়া ভাল। আলোর কিরণ মাধ্যাকর্ষণের জোরে বেঁকে যায় এ কথা মনে করতেও

যে আমাদের মাথা ঘুরে যায়! একদিন সমস্ত মন্ত্র তন্ত্র দেব দেবীকে হাঁচি টিকটিকির সঙ্গে এক পুঁটুলিতে বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলাম। আবার ডুবুরী না ডাকতে হয়!

বহুদিন পূর্ব্বে ঋষি চার্ব্বাক বলেছিলেন, মানুষের জীবন দীপ-শিখার মত। তেল ফুরিয়ে গেলে নিবে যায়, তখন তাকে আবার তেল ঢেলে উস্‌কে তোলা যায় না। মূর্খ! শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান কাকে করছ? কপিল মুনি জোর গলায় বলেছিলেন, ঈশ্বর অসিদ্ধ, মূলাভাবে প্রমাণা-ভাবে। হাল আমলের আমাদের গুরুরা হাজার হলেও ইংরেজের ধামাধরা। চার্ব্বাক কপিলের সাহস পাবেন কোথায়? তাঁরা স্বাধীন চিন্তার ঢং একটা করলেন বটে। অর্থাৎ শাস্ত্রের অনেকগুলো তত্ত্বের মধ্যে মনের মত একটাকে বেছে নিলেন। সেইটা ছাড়া বাকীগুলোর নাম দিলেন, কুসংস্কার। তাঁদের নিজের বিশ্বাসটা হল প্রমাণসিদ্ধ বিশ্বাস, আর অন্যগুলো হল অন্ধবিশ্বাস। যতদিন ছোট ছিলাম এ সব মেনে নিতাম। কিন্তু বড় হতেই পাঁচজনা মিলে ক্রমাগত জটলা করতে আরম্ভ করলাম, প্রমাণ কই, প্রমাণ কই? মনে আছে, একদিন জনাকয়েক আমরা ব'সে পেলীর ঈশ্বরতত্ত্ব খুলে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের পরিচ্ছেদটা পড়ছি ও সশব্দে আলোচনা করছি। নিঃশব্দে আমার মাষ্টার মহাশয় ক্ষেত্রবাবু কখন এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারি নেই। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে খুব জোরে হেসে উঠলেন, "এর চেয়ে ঝেড়ে নাস্তিক হয়ে যা, বাবা। পাপ কম হবে।" অথচ, একবার যদি বুক ফুলিয়ে বলি যে যা প্রামাণ্য নয় তা আমার গ্রাহ্য নয়, তাহলে সৃষ্টিকর্ত্তাকেই বা প্রমাণের বাহিরে ঠেলে দিই কি ক'রে?

খুব ছোট থাকতে খিদিরপুরের যোগেন্দ্র বাবুর কাছে বাবা নিয়ে গেছলেন। তাঁকে নাস্তিক ব'লে জানতাম, কিন্তু তবু বড় চমৎকার লাগল। আমার মনে আছে তিনি বাবার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হেসে বললেন, "You can't be an ancient and a modern man at the same time—প্রাচীন, আধুনিক দুই ত আর একসঙ্গে হওয়া যায় না।" পাঠক, আমার উপর বিরক্ত হবেন না। আমি ঠিক করেছি যে আমি

ancient, প্রাচীন। আর সেই প্রাচীনদের মন নিয়েই অর্ব্বাচীনদের বলতে ইচ্ছা করি, "কোনো প্রত্যক্ষ জিনিসকেই ছেঁটে ফেলতে পারে না, যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক, যথার্থ দার্শনিক। যদি তাঁর বড় সাধের বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারে ঘা লাগে, তাহলেও না।" পুরানো বৈজ্ঞানিক theories যে রকম ক'রে হেলায় আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, নূতন গুলোর অদৃষ্টেও তাই আছে যদি না নূতন facts-এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে।

পাঠক, আমার অনধিকারচর্চ্চা ক্ষমার চোখে দেখবেন। আমি কতকগুলো ভুতুড়ে ব্যাপারের গল্প আজ করব তারই জন্য এত কৈফিয়ৎ দিতে হল। ঘটনাবলী অতিপ্রাকৃত হলেও অতিরঞ্জিত নয়। গল্প লিখছি প্রধানতঃ আমার যুক্তিবাদী বন্ধুদের জন্য। তাঁরা তাঁদের সাধের theory-গুলো একবার যাচিয়ে নেবেন।

যখন আমার বয়স বছর দশেক, তখন একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে গেছলাম। আমাদের গ্রামের বাড়ীর দক্ষিণে বারান্দায় ওঠবার যে সিঁড়ি আছে, তার মাঝখানটায় এক চওড়া চাতাল। সেই চাতালে মাদুর পেতে আমরা শুতাম। আমাদের সামনে পাঁচিলের ঠিক বাহিরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক সজ্‌নে গাছ ছিল। লোকের বিশ্বাস যে ঐ সজনে গাছে এক ডাইনী থাকে। কথাটা আমাদের কানে এসেছিল তবে হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নেই, কেননা আমরা ভূত প্রেত বিশ্বাস করতাম না। একদিন আমি আর আমার মেজোভাই ঐ চাতালের উপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সরকার দাদা আমাদের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে পার্শ্বে এক বালিশ নিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। প্রায় রাত দুটো হবে, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সজনে গাছের দিকে নজর পড়তেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এক স্ত্রীলোক ডালে ব'সে আঁচল দুলিয়ে আমাকে ডাকছে। চুপি চুপি আমার ভাইকে জাগিয়ে দেখালাম। সে বললে, "ব'সে ব'সে দেখা যাক্, দাদা, ডাইনীটা কি করে।" আমি উত্তর দিলাম, "না রে, না। তার চেয়ে খুব পা টিপে টিপে আয়। কাছে গিয়ে দেখে আসি। খবরদার, সরকার দাদা না জেগে ওঠেন।" হাত ধরাধরি ক'রে দুভাই এগিয়ে চললাম। ভূত ত মানতাম না, কিন্তু বুক অকারণ টিপ টিপ করতে লাগল। খানিক দূর যেতে

না যেতে, স্ত্রীলোকটা মিলিয়ে গেল আর তার জায়গায় দেখা গেল একটা কলাপাতা দক্ষিণে হাওয়ায় নড়ছে। সুস্থমনে চাতালে ফিরে গেলাম। গিয়েই কিন্তু দেখি কলাপাতার উপর চাঁদের আলো প'ড়ে আবার সেটা ডাইনীর আঁচল হয়ে গেল। দুজনে খুব হেসে উঠতেই সরকারদার নিদ্রা-ভঙ্গ হল। তাঁকে ডাইনী দেখালাম। তিনি বেরসিক লোক, ঘাড় ধ'রে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। মার কাছে পরদিন গল্পটা করতেই তিনি বললেন, "এই জন্যই ত বলি, ও সব ভূত প্রেতের কথায় কান দিস্ না। ও সব গল্পই ঐ রকম।"

তা কিন্তু নয়। অনেক বছর পরে আর এক রকম ভূতের সংস্পর্শে এসেছিলাম। তখন আমি আহমদাবাদ জেলায় কাজ করি। ছাপ্পান্ন সংবতের ভীষণ দুর্ভিক্ষের পরের বছর। লোকের বড় দুরবস্থা। আমার প্রধান কাজ ছিল কুলী মজুর জাতীয় লোকেদের খয়রাতী টাকা বিলি করা, আর খাতেদার চাষীদের বলদ বীজ কেনবার জন্য দাদন দেওয়া। অনেক সময় নগদ দাদন না দিয়ে বলদই কিনে দিচ্ছিলাম। এই সব কাজে সাহায্যের জন্য সরকার আমাদের কয়েকজন ফেমিন অফিসার দিয়েছিলেন। আমার ধোলকা তালুকার সহায় যিনি ছিলেন তাঁর নাম, ধরুন, Mr. S.। তিনি বৃদ্ধ ইংরেজ, পুলিসের পেনশন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। দিনের বেলায় কাজ বেশ করতেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর নিজের পানীয় নিয়েই কাটাতেন। আমি দুই একবার সদুপদেশ দিতে গেছলাম। তবে বালকের উপদেশ তিনি ভাল ভাবে নিতেন না, বিরক্ত হতেন। একদিন আমাকে বললেন, "মশায়, আমি বুড়ো মানুষ। আমার কি খেলে ভাল হয়, কি খেলে মন্দ হয়, আমি বুঝি।" বৃথা বড়াই, বুঝতে পারলেন না। শেষে দুদিনের অসুখে মারা গেলেন। সহজ অসুখ নয়। বিকারের অবস্থায়, দুনিয়া সুদ্ধ লোককে গালাগালি দিতে দিতে গেলেন। যে ঘরে তিনি থাকতেন, সেই ঘরের জানালার সার্সীগুলো ঘুষো মেরে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার মাস দুই পরে আমাকে কতকগুলো বলদ বিলোতে ধোলকায় যেতে হয়েছিল। এক দিনের কাজ, তাই সঙ্গে তাঁবু নিয়ে যাই নেই। তহশীলদার রাও সাহেবকে ব'লে পাঠিয়েছিলাম যে সরকারী

বাঙ্গলাতে থাকব। আমার ক্যাম্প ছিল ৩০।৪০ মাইল দূরে। সেখান থেকে একজন চাকর নিয়ে টাঙ্গায় রওয়ানা হয়ে ধোলকা বাঙ্গলায় পৌঁছিলাম সন্ধ্যাবেলায়। রাও সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বললেন, "আপনার এখানে থাকা হবে না। আমি ডিস্‌পেনসারীর একটা খালী ঘরে আসবাব পত্র সব রাখিয়ে দিয়েছি।" আমি রাজী না হওয়াতে বললেন, "চৌকিদার কি বলছে, তাহলে শুনুন।" চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, "ঐ সাহেবটা বড় দৌরাত্ম্য করে। কাউকে এখনও মারে নেই বটে, কিন্তু রোজ সারারাত বেড়িয়ে বেড়ায় কুঠীর ভেতর। আমরা রাত্রে ভয়ে কেউ ওদিকে যাই না। বেলা থাকতে থাকতে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে নিজের কুঠরীতে শুই"। আমার সন্দেহ হল। মনে হল, কোন কু-মতলবে মিথ্যা কথা কইছে, বাড়ীটাকে পোড়ো বাড়ী ক'রে রাখতে চায়। তাই জিদ ক'রে ঐখানেই রইলাম। বাড়ীটা আমারই সরকারী আবাস। আগে অনেকবার থেকেছি। উপরতলার একটা ঘর আমার বড় ভাল লাগত। সেই ঘরটাই নিলাম। S. মরেছিল নীচের এক ঘরে। উপর নীচে সব সুদ্ধ শোবার ঘর চারটে। খুব বড় বড় ঘর। মাঝখানে সিঁড়ি। প্রত্যেক শোবার ঘরের লাগা কাপড় পরার ঘর, স্নানাগার। দোতলার মেঝে খুব পালিশ করা তক্তার।

আমি খাওয়া দাওয়ার পর প্রায় একটা পর্য্যন্ত লেখা পড়া ক'রে শুয়ে পড়লাম। বড় ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিলাম। একটা লণ্ঠন জ্বলতে লাগল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ঠিক জানি না। মিনিট পনেরো হবে। হঠাৎ জেগে উঠে শুনলাম, পাশের শোবার ঘরটায় কে একজন ভারী বুট জুতো প'রে মশ্‌ মশ্‌ ক'রে চলছে। উঠে ব'সে বেশ ক'রে কান পেতে শুনলাম। ঠিক বুটের আওয়াজ। লোকটা ঘরের একদিক্‌ থেকে আর একদিক্‌ ক্রমাগত টহল দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মেজের তক্তা মড় মড় করছে, যেমন হয় পুরানো কাঠের মেজের উপর লোক চললে। দু ঘরের মাঝে সিঁড়ির চাতাল। আমার স্থির বিশ্বাস হল, কোন মানুষ আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ভয়ানক রাগ হল। বালিসের নীচে এক পিস্তল ছিল। এক হাতে সেইটা নিয়ে, অন্য হাতে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে, তিন চার লাফে সেই ঘরটায় গিয়ে পড়লাম। যে ভাবে যতটুকু সময়ে আমি গেলাম, তাতে কোন মানুষের

সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাবার সম্ভাবনা ছিল না। ও ঘরে যেতে যেতে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। বেশ ক'রে দরজা জানালা পরীক্ষা ক'রে দেখলাম। এক চাতালের দিকের দরজা ছাড়া আর সব ভেতর থেকে ডবল ছিটকিনি লাগানো। ঘর একেবারে খালি। একটা কেদারা পর্য্যন্ত নেই। ভাবতে লাগলাম। যে আওয়াজ আমি পাঁচ মিনিট ধ'রে শুনে এসেছিলাম সে নির্ঘাত মানুষের পায়ের আওয়াজ। ইঁদুর, বেরাল, এমন কি কুকুর, ও রকম শব্দ করতে পারে না। আস্তে আস্তে নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু যেই তন্দ্রা এসেছে, আবার সেই মশ্ মশ্ মশ্। আবার, একটুক্ষণ শুনে, পিস্তল লণ্ঠন নিয়ে লাফিয়ে গেলাম। এবার আরও তাড়াতাড়ি গেলাম, যাতে সিঁড়ি বেয়ে কারও পালাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে। লক্ষ্য ক'রে এবার দেখলাম যে আমি ঘরে পা দিতেই আওয়াজ থামল, তার আগে নয়। চারিদিকে ফের খুঁজে দেখলাম। সব আগের মত বন্ধ। বিছানায় ফিরে গেলাম। আবার তন্দ্রা আসতেই শব্দ আরম্ভ। ফের লণ্ঠন নিয়ে দৌড়। আবার চারিদিক চুপ চাপ। তিন বারের পর একটু একটু ভয় হতে লাগল। মানুষই হোক্, অন্য কিছুই হোক্, আমি ত কিছু করতে পারছি না। অথচ উপায় নেই। লোকজনকে ডাকাডাকি করতে প্রবৃত্তি হল না। শেষ স্থির করলাম, হোক গে আওয়াজ আমি ঘুমাব। বড় শ্রান্ত হয়েছিলাম। পায়ের শব্দ শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা আমার চাকর চা নিয়ে এসে আমাকে জাগালে। সে জিজ্ঞাসা করলে, "সাহেবের কি রাত্রে ঘুম হয় নেই?" আমি বললাম, "কেন?" সে বললে, "যে চাপরাসীটা নীচে সদর দরজার বাহিরে শুয়ে ছিল সে সারারাত কার বুট প'রে বেড়াবার শব্দ শুনেছে।" আমি চুপ ক'রে গেলাম।

কাজ কর্ম্ম সেরে সেই দিন বিকেলেই আমার ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। তার কিছু দিন পরে আমার আহমদাবাদ থেকে দাক্ষিণাত্যে বদলি হল। আর ধোলকা বাঙ্গলার কিছু খবর জানি না।

কখনো মৃতব্যক্তির ছায়া দেখেছি কি না, অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন। দেখেছি যে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে যখন একা দেখেছি,

সেটা আমার ভ্রম ব'লেও মনে হতে পারে। কিন্তু যেখানে আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেউ সেই ছায়া-মূর্ত্তি দেখেছে, তখন ঘটনাটা উল্লেখ-যোগ্য আর, বোধ হয়, প্রণিধান-যোগ্যও। এ রকম আমার দু তিনবার হয়েছে। তার মধ্যে একটা ঘটনা বর্ণনা করা নানা কারণে অনুচিত মনে হচ্ছে। দ্বিতীয়টার কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এক পরমশ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়ের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর পরে তাঁর বাড়ীতে এক শুভ কর্ম্মের আয়োজন হয়েছে। বাড়ীর সকলেরই বার বার মনে হচ্ছে যে আজ এমন দিনে তিনি নেই, থাকলে কি আনন্দ হত তাঁর। শুভ মুহূর্ত্তে দেখা গেল যে সদর দরজায় তাঁর আত্মীয় স্বজনের পেছনে তিনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত হলাম। গাড়ী থেকে তাঁর শান্ত প্রসন্ন বদন দেখতে দেখতে নামলাম। ভেতরে যেতে যেতে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। আমি কাউকে এ ঘটনা বলি নেই। দুদিন বাদ জানতে পারলাম যে আমি ছাড়াও আর একজন সেই সৌম্য মূর্ত্তি দেখেছিল। যে গাড়ীতে আমি আসি, সেই গাড়ীর শোফেয়ার ঐ বাড়ীর পুরানো চাকর। আমার স্বর্গীয় আত্মীয়ের প্রিয় ভৃত্য ছিল। সে পরদিন সকালে মহিলাদের জানায় যে আগের দিন তার মনিব উপস্থিত ছিলেন সদর দরজায়, সকলের সঙ্গে। পরে আমি সেই শোফেয়ারকে জিজ্ঞেস পড়া ক'রে জানলাম যে ঠিক যে জায়গায় যে কাপড়ে আমি মৃত মহোদয়কে দেখেছিলাম, সেই স্থানে সেই পোষাকে সেও দেখেছিল। আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা আছে। আমার গাড়ীতে সেদিন আরও দুজন ছিলেন। তাঁরা কিছুই দেখেন নেই। তবে তাঁদের সঙ্গে আমার স্বর্গীয় আত্মীয়ের কোন স্নেহ-সম্বন্ধ ছিল না।

আমি অনেক বয়স পর্য্যন্ত কখনো কোনো Se'ance দেখি নেই। Se'ance-এর উপর কোন শ্রদ্ধাও আমার ছিল না। ১৯১৮ সালে যখন আমি রত্নগিরিতে ছিলাম, আমাদের জেলার কলেক্টর ছিলেন B. সাহেব একদিন বিকেলে B. আমার বাড়ী এসে হাজির হলেন। দেখেই মনে হল তাঁর মন বড় ক্ষুব্ধ অশান্ত হয়ে রয়েছে। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে, তুমি Se'ance সম্বন্ধে কিছু জান?" আমি উত্তর দিলাম, "কিছু মাত্র না। কখনো চক্ষে দেখার সুযোগও হয় নেই।" "আজ সন্ধ্যাবেলা

আমার বাঙ্গলাতে এসো। দেখতে পাবে।” “বেশ, আসব। কিন্তু তোমার এ সব ঝোঁক আছে জানতাম না ত!” B. ভদ্রলোক ছিলেন, যাকে বলে, Canny Scot। তাঁর পেটে এত বিদ্যা, কে জানে। তিনি বললেন, “না হে, আমি এসবের কিছুই জানি না। কিন্তু আমার বড় তাক লেগে গেছে। আমি মালবনে ছিলাম গেল কয়েক্ দিন। সেখানে ইস্কুলে পড়ে এক ছোকরা, নাম কান্দে। আমাকে একজন উকীল বললেন যে এই কান্দে খুব ভাল medium, পরলোকগত আত্মা নামাতে পারে। কথা হচ্ছিল এক বাগান পার্টিতে। সন্ধ্যা হতেই কান্দে বসল এক পেনসিল কাগজ নিয়ে। অচ্যুতরাও দেশাইকে চিনতে ত? তাঁর Spirit-কে ডাকলে। প্রথমে কাগজে কতকগুলো যা তা আঁচড় পড়তে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে দেখা গেল এক একটা স্পষ্ট ইংরেজী অক্ষর। ক্রমশঃ অক্ষর থেকে কথা, কথা থেকে একটা পূরো বাক্য বের হল। আমি কাগজটা নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। তারপর দিন দপ্তর থেকে অচ্যুতরাওয়ের লেখা বের ক'রে সেটার সঙ্গে কাগজের লেখা মেলালাম। দুটোই এক হাতের লেখা স্পষ্ট বোঝা গেল। এই তুমি নিজেই দেখ না।' ব'লে আমাকে দুখানা কাগজ দিলে। আমি বেশ ক'রে পরীক্ষা করলাম। লেখা এক রকমই ত মনে হল। B. ফের বলতে লাগলেন, “আচ্ছা কি ক'রে এসব হয় বল দেখিনি। Spirit কি ক'রে আসতে পারে? এলেই বা লেখে কি ক'রে? যাক্, আমি কান্দেকে সঙ্গে এনেছি। সে বলেছে আমার ভাই আল্‌ফ্রেড্‌কে ডাকবে।” এই আল্‌ফ্রেড্ এক বছর আগে যুদ্ধে মারা গেছে। B. তাকে বড় ভালবাসত, আজও এতটুকু ভুলতে পারে নেই। আমি বললাম, “আচ্ছা বন্ধু, আমি সন্ধ্যাবেলা আসব তোমার ওখানে। আমার স্ত্রীকেও ব'লে যাও। তিনি এসব ব্যাপার কিছু কিছু বোঝেন। আগে Se'ance দেখেছেন।” B. ওঁকেও ব'লে গেল।

সাতটার সময় দুজনে কলেক্টরের বাড়ী গেলাম। সেখানে তিনজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। দুজন আমার চেনা। একজন বৃদ্ধ রাও সাহেব, থিওসফিকাল্ সভার অধ্যক্ষ, আর অন্যজন এক মাষ্টার, খুব উৎসাহী থিওসফিষ্ট। তৃতীয় লোকটী বালকমাত্র, বয়স ষোলো সতেরো, অত্যন্ত রোগা, কিন্তু বড় বড় উজ্জ্বল চোখ। B. তার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন,

"এইটী মিষ্টার কান্দে। এরই কথা তোমায় বলছিলাম।" নমস্কারাদি সেরে সবাই এক গোল টেবিলের (তেপায়া) চারিদিকে বসলাম। টেবিলটা প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া। আমার স্ত্রী হাত খানেক দূরে দর্শক হয়ে বসলেন। আমি বললাম, "রাও সাহেব, আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানি না। কি করতে হয় দেখিয়ে দেবেন।" তিনি বললেন, "আমরা আজ কলেক্টর সাহেবের ভাই আল্‌ফ্রেডের প্রেতাত্মাকে ডাকব। সকলে হাত উপুড় ক'রে টেবিলের উপর রেখে হাতে হাতে ছুঁইয়ে বসা যাক্।" সেই রকম বসা হলে তিনি B. সাহেবের কাছে তাঁর ভাইয়ের একখানা ছবি চেয়ে নিলেন। সুন্দর চেহারা, একুশ বাইশ বছরের জোয়ান্, পূরো জঙ্গী পোষাক প'রে তলোয়ার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবিখানা আমরা সবাই দেখে নিলে পর রাও সাহেব বললেন, "আপনারা এক মনে এঁর কথা ভাবুন।" প্রায় দশ মিনিট ঐ রকম বসার পর B. অধীর হয়ে উঠতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কই রাও সাহেব, আল্‌ফী ত এল না।" রাও সাহেব কান্দেকে বললেন, "কি হে কান্দে?" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার কাঁধের পেছনে একজন কে এসে দাঁড়াল। তার মুখ আল্‌ফ্রেডের মত, কিন্তু সাজ অন্য রকমের। ছবির মূর্ত্তির গায়ে একটা ঘোর রঙ্গের পলটনী কোট, পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ঘোড়সওয়ারী বুট, কোমরে তলোয়ার ছিল। আর এর অঙ্গে খাকী কামিজ ও কাটা পেণ্টলুন, পায়ে পট্টী জড়ান আর কোমরে পিস্তল। ছবির মুখটা গম্ভীর, কিন্তু এ মৃদু মৃদু হাসছে। আমি মূর্ত্তি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম, যদিচ আমার চোখ টেবিলের পানে ফেরানো ছিল। কান্দে উত্তর দিলে, "ঐ যে এসেছেন।" "কোথায়?" "জজসাহেবের পেছনে। ঠিক তাঁর ডান কাঁধ বরাবর।" এতটা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কান্দে, কি রকম কাপড় পরে এসেছে, বল ত।" ছোকরা যথাযথ বর্ণনা করলে। তারপর প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কওয়ার একটা উপায় স্থির হল। টেবিলের পায়া একবার ঠুকলে, "হাঁ," দুবার ঘন ঘন ঠুকলে, "না"। রাও সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব, ঠিক বুঝতে পেরেছেন কি রকম ক'রে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন?" টেবিলের পায়া একবার ঠক করলে

আমরা বুঝলাম spirit জবাব দিতে প্রস্তুত। নানাপ্রকার প্রশ্ন করা হল। কোনো কোনোটার "হাঁ, না," জবাব হয়, কোনো কোনোটার হয় না। "আপনি কোন্ যুদ্ধে মারা যান।" "আপনার কর্ণেলের নাম কি ছিল?" "আপনি কোন স্কুলে পড়তেন?" এই রকম প্রশ্নের উত্তর টেবিলটা বানান ক'রে ক'রে দিতে লাগলো। একটু বুঝিয়ে বলি, যাঁরা আমার মত আনাড়ী তাঁদের জন্য। ধরুন কোন বিশেষ জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করা হল। টেবিল একবার পায়া ঠুকে জানালে যে সে প্রস্তুত। তারপর রাও সাহেব আস্তে আস্তে A B C D ব'লে যেতে লাগলেন। যেটার বেলায় ঠক ক'রে আওয়াজ হ'ল সেইটে প্রথম অক্ষর। চারবার এই রকম ক'রে পাওয়া গেল A, V, O, N। আমরা বুঝলাম নামটা Avon। তখন একবার সোজা প্রশ্ন ক'রে মোকাবিলা ক'রে নিলাম। যত কথা জিজ্ঞাসা করা হল, তার অধিকাংশের উত্তর B. ছাড়া আর কেউ জনতেন না। Adjutant-এর নাম তাঁরও জানা ছিল না। অথচ টেবিলের কাছ থেকে একটা নাম পাওয়া গেল। পরে B. বিলেতে খোঁজ করে জেনেছিলেন নামটা ঠিক। এ সমস্ত সময়টাই ছায়ামূর্ত্তি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম। হঠাৎ মনে হল কেউ নেই। দুই একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। কান্দে বললে, "আল্‌ফ্রেড্ বেরিয়ে যাচ্ছেন।"

এই কথা বলতে না বলতে টেবিলটা ভয়ানক দুলে উঠল। প্রায় নাচতে লাগল, যেমন ছোট নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর করে। একবার এ পা ঠোকে, একবার ও পা। রাও সাহেব খুব চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে তুমি, আমাদের বিরক্ত করতে এসেছ?" কোন সাড়া নেই। টেবিল সেই পাগলের মত নাচছে। খুব জোরে কয়েকবার ধমক দিতে স্থির হল। রাও সাহেব বললেন, "নিশ্চয় সেই White।" আমাকে বোঝালেন, "মহাশয় একটা অতি পাজি spirit আছে। আমাদের জ্বালাতন ক'রে মারে। কখন বলে, আমি Scotchman, কখন বলে পার্শী। কিন্তু বোধ হয় ও মুসলমান, কেননা একদিন ফারসীতে নাম লিখেছিল medium-এর মারফত, মীর মহম্মদ মুনশী।" আমি এবার কিছুই দেখতে পেলাম না। কান্দে বললে, "হাঁ সেই বটে।" একটা কথা বলতে ভুলে গেছি

যে ঘর অন্ধকার ছিল না। একটা বড় ল্যাম্প কোণে জ্বলছিল, তবে তার আলোটা কমিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর Whiteএর সঙ্গে কথাবার্ত্তা। সুবিধা করা গেল না। সে যা তা উত্তর দিতে লাগল। শেষ রাও সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "দেখ তোমাকে কিছুতেই ছুটি দেব না এরকম করলে। যখন এসেছ একটু মজা করে যাও। রাজী আছ ?" টেবিল আওয়াজ দিলে, ঠক্। মাষ্টার তখন তাঁর গোল টুপিটা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, "এটাকে দাঁড় করাও দেখি, White।" আস্তে আস্তে টুপীটা দাঁড়িয়ে উঠে গড়াতে আরম্ভ করলে টেবিলের এ পাশ থেকে ও পাশ। তারপর White (?) দেশালাইয়ের বাক্স নাচালে। বাক্সটা নেচে নেচে হুকুমমত একবার এর কাছে যায়, একবার ওর কাছে। আল্‌ফ্রেডের সঙ্গে কথা কওয়ার সময় যে গাম্ভীর্য্য সকলের মনে এসেছিল সেটা চলে গেল। B. পর্য্যন্ত হাসতে লাগল। হঠাৎ টেবিল আবার ক্ষেপে উঠে নাচতে লেগে গেল। খানিকক্ষণ কিছুতেই বাগ মানে না। তখন রাও সাহেব টেবিল চাপড়ে বললেন, "আচ্ছা, একটা কাজ ক'রে তুমি চলে যেতে পার। আমাদের টেবিলটাকে হাঁটাও।" আমরা দাঁড়িয়ে উঠলাম। পাঁচজনেরই হাত টেবিলের উপরে। টেবিল দেড় বছরের ছেলের মত টলতে টলতে হাঁটি, হাঁটি, পা, পা আরম্ভ করলে। দরজার গোড়ায় পৌঁছলে সকলে হাত ছেড়ে দিলে। শুধু আমার হাত রইল। রাও সাহেব বললেন, "মুখে বলতে থাকুন, Go on, go on।" আমি তাই বলতে লাগলাম। টেবিল চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে বাহিরের ছাদে গেল। ঠক্ ঠক্ করতে করতে ছাদটা পার হল। তারপর কে যেন টেবিলটাকে হুড়মুড় ক'রে ছাদের আলসের গায়ে উলটে দিলে। হয়ে গেল Se'ance।

B. দু তিনদিন ধ'রে আমায় ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কি ব্যাপার বল ত ? আল্‌ফী কি সত্যি এসেছিল ? না ওদের মধ্যে কেউ আমাদের চোখে ভেলকী লাগিয়ে দিয়েছিল ?" আমি কি উত্তর দেব ? নিজেই বুঝতে পারি না কিছু। আগে মনে করতাম Se'anceগুলো সব জুয়োচুরী। নিজে চোখে দেখলাম যে কেউ হাতে ক'রে টেবিলও নাড়ে নেই, টুপী দেশালাইও কেউ তারে বেঁধে নাচায় নেই। তারপর, আমার

পেছনে যে মূর্ত্তি দেখলাম সেটা কান্দে দেখতে পেলে কি ক'রে, যদি আমার মনের ভ্রমই হয়? বুদ্ধিমান পাঠক নিজের বুদ্ধিমত ব্যাখ্যা ক'রে নেবেন।

আর এক রকমের ঘটনা একটা বলি। এটাতে প্রেতাত্মার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেবারও আশ্চর্য্য এই লেগেছিল যে আমি যে ছায়াটা দেখলাম তার কথা আর একজন জানলে কি ক'রে? প্রায় পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন খুব বেশী ছবি আঁকতাম। প্রায় সব ছবিই দেব দেবীর মূর্ত্তি। ছবিগুলোর technique নেই বললেই হয়, কেননা আমি আঁকতে কখনো শিখি নেই। তবে আমার কাছে তার মূল্য খুব বেশী এই জন্য যে ঐ daub আঁকতে আঁকতে আমি আমাদের দেশের প্রাচীন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি পরিষ্কার বুঝতে পারি। আমার বাঁধা নিয়ম ছিল যে কোন ঠাকুরের ধ্যান বার বার প'ড়ে মূর্ত্তিটা ধারণা করতে চেষ্টা করতাম। যতক্ষণ না বেশ স্পষ্ট একটা মূর্ত্তি মানসপটে দেখতাম, ততক্ষণ আঁকতে আরম্ভ করতাম না। অবশ্য, শিব গড়তে বাঁদর গড়ার যে কথাটা আছে সেটা আমারও বার বার হত। কল্পনার মূর্ত্তিটা কাগজে ফোটাতে পারতাম না। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। আমার চেষ্টার সাক্ষী অনেকেই ছিলেন। তার মধ্যে একজন আজ দেশবিশ্রুত সাধু পুরুষ। তিনি প্রায়ই ব'সে ব'সে আমার আশা নিরাশার খেলা দেখতেন। দিলাসাও যথেষ্ট দিতেন। একদিন বললেন, "এই ছবি আঁকতে আঁকতেই একদিন আপনার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হবেন।" পাঠককে অভয় দিচ্ছি। সে রকম কিছু ঘটে নেই, কুণ্ডলিনী আজও ঘোর সুষুপ্তিতে মগ্ন।

অতসী কুসুম, জবা কুসুম, নবজলধর শ্যাম, নবদুর্ব্বাদল শ্যাম, হিরণ্ময় বপু, নানা রকম রং দিবারাত্র মাথার ভেতর ঘুরছে। ক্রমাগত তুলি ঘষে ঘষে এই সব রং ফলাতে চেষ্টা করছি, আর চিত্রকর-জাতীয় যাকে কাছে পাচ্ছি তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করছি, লজ্জা সরম কিছুই নেই। এখন কিন্তু মনে করতেও লজ্জা বোধ হয়। অন্যান্য রং তুলি থেকে এক রকম বের হত। মূর্ত্তির ভঙ্গ ও মুদ্রাও কতকটা রপ্ত হয়েছিল। কিন্তু দেবতার পদতল করতলের অলক্তরাগ, আঁকা দূরে থাক, মনেও দেখতে পেতাম না। সেকাল

একালের যত ছবি দেখেছি, কোনটারই এই জিনিস আমার মনে ধরে নেই। এত ক'রে একথা বলবার কারণ এই, যে আমার গল্পটাই ছবির রং নিয়ে।

১৯০৯ সালে যখন কুচবেহারে রয়েছি, তখন এক বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়ার সঙ্গে আলাপ হয়। শুধু আলাপ নয়, ঘনিষ্ঠতা হয়। বার বার তার কীর্ত্তন শুনতাম, কখনো কখনো সারারাত। সে নীচ জাতীয় ছিল, বিদ্যা বুদ্ধিরও বিশেষ ধার ধারত না। কিন্তু তার ভক্তির পুঁজি অপর্য্যাপ্ত ছিল। তার সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প ক'রে বড় আনন্দ পেতাম। সে আমায় কেবলই বলত, "বাবু, আমাকে আমার গোপালের একটা ছবি এঁকে দিন।" আমার যে ছবি আঁকার কত হাঙ্গাম তা সে কি জানবে? একদিন কথাটা ভেঙ্গে বললাম, "বৈরাগী, তোর গোপাল যখন ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজায়, তখন তার ডান হাতের চেটোর রং কি রকম দেখায়, আমি বুঝতে পারি না। আমায় দেখাতে পারিস!" ব'লে আমার আঁকা এক বংশীধারী মূর্ত্তি দেখালাম তাকে, "এই দেখ্‌না, এ কি তোর গোপালের হাতের রং!" বৈরাগী চুপ ক'রে রইল।

পরে, একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর কোনো বন্ধুর বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনতে যাওয়ার কথা। বৈরাগী যাওয়ার পথে আমায় ডেকে নিয়ে যাবে। রাত আটটায় আমি ব'সে ব'সে পড়ছি, এমন সময় সে এল। সেইদিন ভারতীতে নন্দলাল বাবুর আঁকা "জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ" ছবিটা এসেছিল। আমার সেটা এত ভাল লেগেছিল যে ছিঁড়ে ঘরের বেড়ায় টাঙ্গিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। বৈষ্ণবকে দেখালাম "ছবিটা দেখ্‌ত, চিনতে পারিস্ কি না।" সে একবার দেখেই ছোঁ মেরে ছবিটা খুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, "বাবু, এ যে আমার গৌর! আমি এটা নেব। আপনি ত আমার গোপালের ছবি ক'রে দিলেন না।" আমি বললাম, "তা নে। আমার আর একখানা আছে। কিন্তু তুই গোপালের হাতের রং ত কই বলে দিলি না। কি পূজা করিস্ রোজ রোজ!" বৈরাগী একটু হাসলে।

কীর্ত্তনের আসরে পৌঁছেই সে শ্রীগৌরাঙ্গের ছবিখানা এক থামের উপর এঁটে দিলে। তারপর সেই ছবির উপর চোখ রেখে গৌরচন্দ্রিকা

আরম্ভ করলে। কি গানই গাইলে সেদিন! গলা তার চিরদিনই মিষ্টি, কিন্তু সে দিনের মত মধুর স্বর একদিনও শুনি নেই। সার্থক চিত্রকরের ছবি আঁকা!

গান নাচ নিত্য প্রথামত চলল। বারোটার পর খুব জমেছে। বৈরাগী রাধা কৃষ্ণের এক একটা উপমা দিচ্ছে, আর সেইটে গাইতে গাইতে ঘুরে ঘুরে নাচচে। "শ্যাম নবনীরদ বরণ, রাধা থির বিজুলী", "নীল তমাল ঘেরে কনকলতা রে", এই রকম এক একটা আলাদা পদ গাইছে। আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি। অন্ততঃ আমি নিজের কথা বলতে পারি। গানে, সুরে, নাচে, তালে, আমাকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি আমার সামনে দুটী নীল হাত বাঁশী ধ'রে রয়েছে। ডান হাতের চেটো আমার দিকে ফেরানো। তার রং বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। লাল, কিন্তু সে রকম লাল আমি কখনও দেখি নেই। রঙ্গের বাক্স থেকে সে রক্তরাগ কি ক'রে বেরোবে? আঁকতে কখনো চেষ্টাও করি নেই। তবে আমার সমস্যা পূরণ হয়ে গেল। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

এ পর্য্যন্ত সবটা বোঝা যায় এক রকম। ঐ অলক্ত রাগ দেখবার জন্য আমার এত দিনের আগ্রহ যে সেটা ঐ ভাবে দেখব তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। কীর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার সময় নন্দলাল বাবুর চিত্রের মন্ত্রের মত অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে মনে একটু হিংসাও হয়েছিল। কেন ও রকম আঁকতে পারি না? কে জানে, হয়ত গান শুনতে শুনতে ছবির কথা অজান্তে মনের মধ্যে তোলা পাড়া করছিলাম। তার উপর সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি। ফলে একটা ও রকম ছায়াচিত্র দেখা অসম্ভব নয়।

কিন্তু যেটা যথার্থ অদ্ভুত, সেটা হচ্ছে এই যে ঠিক ঐ মুহূর্ত্তে গায়ক মুখ ঝুঁকিয়ে আমার কানে ব'লে গেল, "বাবু, দেখলেন?" এই দুটী কথা চকিতের মত ব'লে আবার ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। আমার পাশে যে বন্ধুটী ব'সেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বৈরাগী কি বললে?" আমি উত্তর দিলাম, "কিছু না।"

পরদিন আমি বৈষ্ণবকে বললাম, "আমি তোর গোপাল আঁকতে পারব না। তুই যে রং দেখালি, ও রং আমি কোথায় পাব?" সে হাঁ

করে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। বললে "বাবু, আমি কি দেখালাম?" আমি বললাম, "কাল রাত্রে নাচতে নাচতে আমায় যে বললি, দেখলেন বাবু?" বৈষ্ণব আশ্চর্য্য হয়ে গেল, "আমি ত কিছুই বলি নেই, বাবু। আমার ত কোন্ কথাই মনে হচ্ছে না।" আমি তাকে কি হয়েছিল বর্ণনা করতে সে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে তার ঠাকুরকে প্রণাম করলে। পাঠক, বৈরাগী কি ক'রে জানলে যে আমার চোখের সামনে দুটো হাত বাঁশী ধ'রে দেখা দিয়েছে? কথাটা ভেবে দেখার মত।

এই বৈরাগীর কথা বলতে বলতে অন্য সাধু সন্তের গল্পও মনে আসছে। তবে তাতে চটকদার কিছু নেই। যোগবলের কোন অদ্ভুত নিদর্শন দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নেই। সুদূর প্রদেশে মঠ অনেক দেখেছি। তবে, ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও শচীদেবীর ঢেঁকীশালে ধান ভানবে, অপ্সরাদের সঙ্গীত তার কানে কি ক'রে পৌঁছবে?

অন্য রকমের দুই একটা আশ্চর্য্য জিনিসের কথা ব'লে আজকের লেখা শেষ করব। এ কথাগুলোর সঙ্গে ভূত প্রেতের বা ঠাকুর দেবতার কোন সম্পর্ক নেই। আমার এক কবিরাজ বন্ধু ছিলেন। তিনি অনেক দিন কৈলাস-বাসী হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসা বিদ্যায় অসাধারণ অধিকার ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু এ প্রসঙ্গে বলা অবান্তর হবে। তাঁর সম্বন্ধে দু চারটা ঘটনা বলব, যা আমাদের আমাদের বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। কবিরাজ, বোধ হয়, কোন রকম যোগ সাধনা করতেন। কখনো খুলে কিছু আমাকে বলেন নেই। তবে, আমাকে শিকারে আসক্ত জেনে লক্ষ্যবেধ সিদ্ধির জন্য ত্রাটক যোগ অভ্যাস করতে বারবার উপদেশ দিতেন। উপদেশ নিষ্ফল হয়েছিল। আমাদের লোভ দেখাবার উদ্দেশ্যে তিনি একটা বুজরুকী মাঝে মাঝে করতেন। একটা কাগজে কিছু লিখে, সেটা আমরা ওঁর কপালে গঁদ দিয়ে এঁটে দিতাম। তারপর উনি রীতিমত পদ্মাসনে ব'সে, শিবনেত্র হয়ে, ধীরে ধীরে বানান ক'রে ক'রে সেই লেখা পড়তেন। মনে হত, পড়তে খুব বেগ পেতে হচ্ছে। কিন্তু সবটা ঠিক পড়তেন শেষ পর্য্যন্ত।

কবিরাজ মহাশয়ের হাত দেখার অভ্যাসও ছিল। এক একটা খুব আশ্চর্য্য কথা বলতেন। বিশেষ ভুল কখনো করেছিলেন বলে মনে নেই। একদিন এক বিয়ে বাড়ীতে এসে কনের হাত দেখে হঠাৎ বললেন, "না, বিয়ে ত হবেনা ও তারিখে।" সকলে শশব্যস্ত হয়ে উঠল। বিয়ে নির্দ্দিষ্ট তারিখে না হওয়ার তখন কোন কারণই ছিল না। আবার ভাল ক'রে হাত দেখে পরীক্ষা করে বললেন যে কয়েকদিন পরে অমুখ তারিখে বিয়ে হবে। সেই দিনই বরের হাত দেখলেন। দেখে, অনেক ইতস্ততঃ করে বললেন, "আপনার পিতার সাংঘাতিক অসুখ, পৃষ্ঠব্রণ হয়েছে। অস্ত্র চিকিৎসা ক'রে সারবে। ভোগ অনেক আছে, তবে ভয় নেই।" বরের পিতা তার পর সন্ধ্যাবেলা কলকাতায় পৌঁছলেন পিঠে একটা সামান্য ফোড়া নিয়ে। দেখতে দেখতে সেই ফোড়া ভীষণ কার্‌বঙ্কলে দাঁড়াল। কাটা-কুটি হল। বেশ কয়েক সপ্তাহ বিছানায় প'ড়ে থেকে অবশেষে সেরে উঠলেন। বিবাহ কবিরাজের বলা তারিখেই সম্পন্ন হল।

একবার আমার কর্ম্মস্থানে ফিরে যাওয়ার দিন কবিরাজ এসেছেন বিদায় নিতে। আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম, "কবিরাজ, হাতটা একবার দেখ। কিছু লাভ লোকসান আছে কিনা।" কবিরাজ বললেন, "তোমাদের ভাই সব বিষয়েই ঠাট্টা। আচ্ছা, দাও হাত।" হাত পরীক্ষা ক'রে জানালেন, "বিশেষ কিছু দেখছি না। তবে মাস-খানেকের পরে কিছু ধনাগম হবে। একটা খারাপ জিনিসও আছে। শীঘ্রই বাম অঙ্গে একটা আঘাত পাবে। কপালগুণে অল্পের উপর দিয়েই যাবে। ভয় করার কারণ নেই।" কর্ম্মস্থানে ফিরেই শুনলাম একটু আয় বৃদ্ধি হয়েছে। অভাবনীয় কিছু নয়। তবে আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। বাম অঙ্গে আঘাতটাও বাদ গেল না। সেটা পেলাম পথেই, জাহাজের স্নানাগারে। চৌকাটটা বাঁ হাতে ধ'রে সেই ঘরে ঢুকছি, এমন সময় অকস্মাৎ একটা বড় ঢেউ লেগে জাহাজটা খুব কাৎ হয়ে গেল। ফলে লোহার দরজা দড়াম করে আমার হাতের উপর পড়ল। হাতটা সময়ে টেনে বের ক'রে নিতে চেষ্টা করলাম তাই খুব লাগল না। কিন্তু একটা আঙ্গুল চিমটে গেল। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগ করলাম। শেষ নখটা কালো হয়ে উঠে গেল।

হাত দেখার কথা বলতে আর একজনের কথা মনে হচ্ছে। ভদ্র লোকের নাম বিনয় বাবু। বন্দেমাতরং আপিসে কাজ করতেন। খুব কাজের লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল নেচে গেয়ে, যাত্রা থিয়েটারের নকল করে লোককে হাসানো। একদিন আমরা অনেকগুলি লোক জমা হয়েছি। বিনয় হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বল্বার ঢং ক'রে সবাইকে হাসাচ্ছেন। স-বাবু সেই সময় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভীষণ ঝোঁক ছিল তাস খেলার। এসেই চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন, "কেন সময় নষ্ট করছেন সব? তাস বের করুন।" বিনয় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "একবার হাতটা দেখে দিই আসুন।" তিনি হেসে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন "চটপট সেরে নিন, মশায়।" এদিকে বিনয় তাঁর হাত দেখেই ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে নানা রকম হাসি ঠাট্টা আরম্ভ করলে। একটু পরেই সুবিধা বুঝে আমার কাছে একে চুপিচুপি বল্লে "কর্ত্তা, একবার বাহিরে আসবেন? একটু কথা আছে।" বাহিরে আমায় নিয়ে গিয়ে মুখটা খুব ভার করে বললে, "আপনাদের বন্ধুর হয়ে এসেছে। একটা চিহ্ন হাতে উঠেছে। আগে ও চিহ্ন দুবার দেখেছি, দুবারের কোন বারই তিন মাস কাটে নেই। কথাটা বলতাম না। কিন্তু উনি আমাদের কাগজে উইল করে কিছু দিয়ে যাচ্ছেন না? সেইটে একটু তাড়া দেবেন। নইলে ফসকে যাবে।" এর কয়েক দিন পরে এক শনিবারে আমরা স-বাবুর বাড়ী বেড়াতে গেলাম। বাড়ী শহরের বাইরে। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে তাঁর গাড়ীতেই কলকাতা ফিরিলাম। পথে তিনি সঙ্গীত সমাজে নেমে পড়লেন। স-বাবু লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড মানুষ। বেশ ভাল স্বাস্থ্য দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার পর্য্যন্ত মোটরে পাড়ি দেন। তাঁর যে হঠাৎ কিছু হবে এটা অভাবনীয়। কিন্তু দুদিন পরে সোমবারে সকালবেলা এক ভদ্রলোক এসে বললেন, স- চন্দ্র যে যায় যায়। আপনারা দেখতে গেছলেন? আমরা কিছুই জানতাম না। ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম যে শনিবার দিন ক্লাব থেকে ফেরবার পথে হেদোয় নেমে স-বাবু রক্ত বমি করেছিলেন। বাড়ী গিয়ে আরও বমি হয়। ডাক্তার বলেছেন যে ভেতরের কি শিরা ছিঁড়ে গেছে। যখন এই সব কথা হচ্ছে, তার আগেই স-চন্দ্র ইহলোক ছেড়ে

গেছেন। উইল সই হয় নেই, টাকাকড়ি সব এক ধনী আত্মীয় পেলেন।

কোষ্ঠীর ফলাফল সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলব। ঘঠনাটা আমার এক বন্ধুর জীবনের। সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধেই আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, শোনা কথা নয়। একদিন ইন্দ্রলোকে দেবরাজের সভায় নাচতে নাচতে বন্ধুবরের তাল কেটে যায়। ফলে, স্বাধিকারপ্রমত্ত শাপেনাস্তংগমিত মহিমা হয়ে তাঁর কতিচিৎবর্ষ নির্ব্বাসনে কাটাতে হয়, রামগিরিতে নয়, সিন্ধুতীরে। প্রভু শাপমোচনের কোন দিবস বা উপায় স্থির ক'রে দেন নেই। তবে বন্ধু সেখানে অবলাবিপ্রযুক্ত ছিলেন না। উপরন্তু সেই মরুপ্রদেশে তাঁর পুত্ররত্ন লাভ হল। বন্ধুবরকে মরুবাসী সবাই বড় স্নেহ করতেন। এক ইসলামপন্থী মিত্র অনেক যত্ন করে নবজাত কুমারের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করতে প্রবৃত্ত হলেন। গ্রহের ফলাফল গণনা করতে গিয়ে জ্যোতিষী পিতার শাপমোচনের কাল জানতে পারলেন। বন্ধুর কাছে গিয়ে বললেন, "আগামী বছর অমুক মাসের বারোই তারিখে তোমার শাপমুক্তি হবে।" আমি নিজে স্থির জানি যে সে সময় পর্য্যন্ত মুক্তির দিন নির্দ্দিষ্টই হয় নেই, বিচারসাপেক্ষ ছিল। অথচ জ্যোতিষীর গণনা ঠিক ফলল এক বছর পরে। নির্দ্দিষ্ট মাসের দশোই তারিখে মোহর বন্ধ আদেশ পত্র বন্ধুর হাতে এল। তিনি ঠিক বুঝলেন ভেতরে কি আছে। কিন্তু খুলে দেখবার উপায় ছিল না। লেফাফার উপর বড় কর্ত্তার নাম, সুতরাং পত্র তাঁর কাছেই পাঠাতে হল। বন্ধু বড় কর্ত্তাকে এক চিঠি লিখলেন সেই দিনের ডাকে, "আজ তোমার কাছে একটা সরকারী চিঠি পাঠাচ্ছি। যদি ভেতরে আমার নামে কোন হুকুম থাকে ত তারযোগে খবর দিও।" যদি বড় কর্ত্তা তার করতেন ত বন্ধু মুক্তির হুকুম এগারোই তারিখে পেতেন। কিন্তু তা করলেন না। নানা রকম ভেবে চিঠিই লিখলেন। ফলে শাপমোচনের আদেশ ঠিক বারোই তারিখে বন্ধুর হাতে এল। জ্যোতিষগণনা বিফল হল না।

Coincidence "কোন রকমে মিলে গেল," ব'লে এত কথা কাটিয়ে দেওয়া কঠিন।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

নিসর্গের অনুবর্ত্তন

আমরা যে বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে বাস করি, তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীতি হয়, এ বিশ্ব কতকগুলা জড় পরমাণু-পুঞ্জের যদৃচ্ছাজাত সংশ্লেষমাত্র নহে—ঐ জড়ের অন্তরালে এক অদ্ভুত চিন্ময়শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নিখিল নিসর্গকে অভ্রান্তগতিতে, সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় বিবর্ত্তনপথে পরিচালন করিতেছে। সে শক্তি জড়শক্তি নহে—উহা চিন্ময়ী, ঈক্ষাময়ী। ঐ শক্তি সারা বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়া, (বাইবেলের ঋষির ভাষায়) sweetly and mightily ordereth all things—অনুগ্র ও অমোঘভাবে নিখিল নিসর্গের ব্যবস্থাপন করিতেছে। দার্শনিক কবি ম্যাথু আরনল্ড উহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—

Something not ourselves, which makes for righteousness অর্থাৎ অ-মানব কোন কিছু, যাহা জগৎকে শিবপন্থায় চালিত করে।

মনীষী বার্গসঁ (যিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক) ঐ শক্তিকে Elan Vital বলিয়াছেন এবং ঐ শক্তির 'Original impulse', উহার 'Internal push,' পুরাণী প্রেষণাকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঐ শক্তির প্রেরণাতেই Creative Evolution সিদ্ধ হয়।

It begins to be evident that there is *something* of the psychological order, immanent in all things, low as well as high, which feels and strives and achieves. (Bergson)

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হঠকারিতা করিয়া একদিন বলিতেন বটে যে, ভূত ও ভৌতিকশক্তি—জগৎ-সমস্যার সমাধানপক্ষে এই জড় মিথুনই যথেষ্ট। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজে এখন ঐ মত প্রায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার্ জেমস্ জিন্সের (Sir James Jeans) একটি প্রগাঢ় উক্তি স্মরণ করা ভাল।

The universe begins to look more like a great thought than a great machine. * * The universe shews evidence of a designing and controlling power, that has something in common with our individual mind.—Sir James Jeans

এ সম্পর্কে সার্ অলিভর লজের (Sir Oliver Lodge) উক্তিও কম উদাত্ত নহে।

There is evidence of mind at work, beneficent and contriving mind, actuated by purpose, a purpose inspired by a farseeing insight, a deep understanding, an adaptation to conditions.—The Making of Man

ঐ Purpose, Adaptation to conditions প্রভৃতিরই প্রাচীন নাম 'ঈক্ষা'—ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্ (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৫)। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি—তা' তিনি কবি, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যেই হউন—বিশ্বের অন্তরালে বরাবরই ঐ ঈক্ষা, অভিসন্ধি, Purpose এর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

There is a soul at the centre of nature.—Emerson.

Yet I doubt not through the ages, one increasing purpose runs.
—Tennyson.

মনে হয় কোন এক নিগূঢ় নিয়তি।
যুগযুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি॥

অর্থাৎ নিসর্গের পশ্চাতে যে অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন আছে—যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া ঐ আপূর্য্যমান অভিসন্ধির সম্পূরণ হইতেছে—কালে ঐ অমোঘ নিয়তি সম্পূর্ণ হইবেই।

কেন হইবে? যেহেতু,

ময়া তত মিদং সর্ব্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্ত্তিনা—গীতা

—অব্যক্ত মূর্ত্তিতে 'তিনি'—সেই অনামা অজানা 'তৎ'—নিখিল বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন—

ওমার খায়মের কথায়—

Whose secret presence thro' creation's veins
Running quicksilver like, eludes your pains.

অর্থাৎ ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ম্
ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্।

সেই 'বিজ্ঞানম্ আনন্দম্' ব্রহ্ম, দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় সর্ব্বভূতে অনুস্যূত আছেন্—'An all-pervading Energy, operating wisely and beneficially, according to fixed laws of its own'—

—এবং নিজের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-অনুসারে এই জগৎকে ঋতমার্গে ও হিতমার্গে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

তাহাই যদি হয়, তবে মানুষের উচিত নয় কি ঐ সকল নিয়ম-অনুসারে নিসর্গের সহিত সহযোগিতা করা ?—কারণ, ঐরূপ করিলেই তো তাহার হিত, তাহার কল্যাণ। তাহা না করিয়া, সে যদি নিসর্গের প্রতিকূলতা করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার অহিত, তাহার অকল্যাণ। সেই জন্য ক্লিফোর্ড বলিতেন—'Nature is conquered by obedience—নিসর্গ-জয়ের উপায় বিদ্রোহিতা নয়, অনুবর্ত্তিতা'। যদি সুবুদ্ধি হও, নিসর্গের অনুসারে চলো, তাহার ধারার অনুসরণ করো—জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'The Return to Nature' নাম দিয়া অধ্যাপক ওডহাউস (Professor E. A. Wodehouse) একটি চমৎকার রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ রচনা পাঠ করিলে সন্দেহ থাকে না যে, লেখক এ দেশের বৈদান্তিক চিন্তার সহিত সুপরিচিত এবং ঐ চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। নিসর্গের অনুবর্ত্তিতা প্রসঙ্গে ওডহাউস লিখিয়াছিলেন :—

During the past 20 years there have sprung up a whole number of movements, whose watchword may be roughly expressed as 'Leave it to Nature' and which are actively applying this formula, with conspicuous success, to various departments of human life। অর্থাৎ বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে, যাহাদের মূলমন্ত্র হইতেছে—'নিসর্গের অনুবর্ত্তন' এবং যাহারা জীবনের অনেক বিভাগে ঐ মন্ত্রের প্রয়োগ করিয়া বিশিষ্ট সফলতা লাভ করিতেছে। উহাদিগের প্রচারিত মূলমন্ত্রের যদি ভাষ্য করা যায়, তবে সে ভাষ্য এইরূপ দাঁড়ায় :—

Nature knows her business infinitely better than man does, and that the only path to well-being, in the widest sense of the term, lies in yielding to her and leaving the control of things in her hands. Another way of expressing this is that whatever is "Natural" is *ipso facto* good, and that the only evil in the whole wide world is that which is "Unnatural" in the sense of going counter to Nature's laws.

অর্থাৎ যাহাই নৈসর্গিক—নিসর্গের অনুযায়ী, তাহাই শ্রেয়ঃ ; যাহাই অনৈসর্গিক, নিসর্গের প্রতিযোগী, তাহাই হেয়। শ্রেয়ের ও হেয়ের এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। পাশ্চাত্যেরা যাহাকে 'নেচার' বলেন—আমরা যাহাকে নিসর্গ বলিতেছি—তৎসম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত এই :—

(1) That what we call 'Nature' is created, pervaded and sustained by one Life and this life is Divine.

(2) That, consquently, the life in question, being Divine, is essentially good and contains all that is good within itself.

(3) That this Divine life in Nature is not at rest but is continually active.

(4) That this activity is purposive and is all tending in a certain direction, determined by the very nature of the Life Itself and the conditions to which It has subjected Itself by imprisoning and limiting Itself in the manifested worlds.

(5) That all human wisdom, conceived as an intelligent pursuit of human well-being, lies thus in allying itself with Nature and co-operating with her in the furthering of her great spritual purposes.

অর্থাৎ (১) যাহাকে আমরা নিসর্গ বা বিশ্ব বলি, ঐ বিশ্ব এক দৈবশক্তি দ্বারা রচিত, অনুস্যূত ও বিধৃত। ঐ শক্তির প্রস্রবণ শ্রীভগবান্।

(২) অতএব ঐ শক্তি যখন ভাগবতী শক্তি, তখন উহা কল্যাণ-ঘন এবং সমস্ত কল্যাণের নিদান।

(৩) বিশ্বের মধ্যে ব্যক্ত ঐ ভাগবতী শক্তি নিষ্ক্রিয় বা নিদ্রিত নহেন, কিন্তু সতত ক্রিয়াশীল।

(৪) ঐ ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি অভিসন্ধিমূলক এবং এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সে লক্ষ্য ভাগবতী শক্তির স্বরূপ ও স্বভাব এবং বিশ্বের মধ্যে ঐ শক্তি যে বিধায় নিজেকে সংবৃত ও সঙ্কুচিত করিয়াছেন, সেই ধারাও স্ব-ভাবের দ্বারা নিয়ত।

(৫) অতএব মানবের পক্ষে প্রকৃত শ্রেয়ের পথ—নিসর্গের কল্যাণময় নিয়তির প্রপূর্ত্তির জন্য তাহার সহযোগিতা করা—অর্থাৎ অনুকূলভাবে 'নিসর্গের অনুবর্ত্তন' করা।

ঠিক্ কথা! কিন্তু বিশ্বকে ছাড়িয়া যদি ব্যক্তিকে ধরা যায়, সমষ্টিকে ছাড়িয়া যদি ব্যষ্টি-মানবকে গ্রহণ করা যায়, তবে 'নিসর্গের অনুবর্ত্তন'-নীতি, তবে নিয়তির পরিপূর্ত্তি কি আকার ধারণ করে?

আমরা যদি নিজের নিজের অন্তস্তল একটু গভীর ভাবে পরীক্ষা করি, তবে দেখিতে পাই—(আমি সাধারণ নরনারীর কথা বলিতেছি, সাধুসন্ত বা বন্যবর্ব্বরের কথা বলিতেছি না)—

Two Souls alas! reside within my breast.—Goethe's Faust.

—একটি নয়, দুইটি আত্মা সেখানে বিরাজ করিতেছে। কে কে? একজন ভূতাত্মা, অন্যজন জীবাত্মা—একজন মর্ত্ত্যবিহারী, অন্যজন বিমানচারী। গেটের মহানাটকের ভাষায় বলি—

One with tenacious organs holds, in love
And clinging lust, the world in its embraces .
The other strongly sweeps, (this dust above),
Into the high ancestral spaces.

এই যে ভূতাত্মা বা Animal Man এবং জীবাত্মা বা Spiritual Man—কেহ কেহ এই দোঁহাকে Lower Self ও Higher Self বলিয়াছেন। Lower Self (ভূতাত্মা) কামসংযুক্ত এবং Higher Self (জীবাত্মা) কামবিযুক্ত—

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসংযুক্তং শুদ্ধং নির্বিষয়ঞ্চ যৎ॥—উপনিষদ্

সেইজন্য তত্ত্বদর্শী গেটে ভূতাত্মার clinging lustএর কথা বলিলেন এবং জীবাত্মার সম্বন্ধে 'this dust above' বলিলেন। সেইজন্য মানুষ একাধারে দেব-মর্কট—তাহার মধ্যে দৈবী প্রকৃতি ও পাশবী প্রকৃতির একত্র সমাবেশ। একজন বিখ্যাত ফরাসি লেখক (M. Taine) নেপোলিয়নের মধ্যে যুগপৎ উচ্চতা ও নীচতা, তুঙ্গতা ও তুচ্ছতা ('the greatest, the meanest of mankind') লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে Jupiter-Capion আখ্যা দিয়াছেন (Jupiter হইলেন দেবেন্দ্র—আর Capion ফরাসি নাটকের একটা জঘন্য হীন পশুচরিত্র)। বুঝিয়া দেখিলে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জুপিটার-কাপিয়ঁ (দেব-মর্কট)—সকলেই একাধারে উচ্চ-নীচ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, তুঙ্গ-তুচ্ছ, সু-লীন-কু-লীন। মানুষের এই তুঙ্গতাকে লক্ষ্য করিয়া সেক্‌সপিয়র হ্যামলেটের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

What a piece of work is a Man! How noble in reason! How infinite in faculty! In form and moving how express and admirable! In action how like an angel! In apprehension how like a God! The beauty of the world, the paragon of animals! ঠিক্ কথা!

কৃষ্ণের যতেক রূপ
সর্ব্বোত্তম নররূপ!

সেইজন্য ভাগবত বলিয়াছেন, বিধাতা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কতকত বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত হইলেন না (ন মুদম্ অবাপ)—যতদিন না তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। সেই বাইবেলের কথা—

Lord! What is Man that thou art mindful of him and the son of man that thou so regardest him?

এ প্রশ্নের উত্তর বাইবেল নিজেই দিয়াছেন—

God made man in His own image—in His own image He made him.

—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলিয়াছেন :—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ

—মনুষ্যের মধ্যে যে জীবাত্মা, উহা তাঁহারই অংশকলা—Divine fragment—সেই ব্রহ্ম-অগ্নির কণা (জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব)—সেই সচ্চিদানন্দ-সিন্ধুর বিন্দু। উপনিষদ্ এ (Divine fragment) জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে নিঃসঙ্গনির্লেপ, শুদ্ধবুদ্ধ, নিরবদ্য-নিরঞ্জন প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কারণ—

Our own metaphysical I, our divine self, persisting in untarnished purity, through all the aberrations of human nature, eternal blessed. (Deussen)

কিন্তু আমাদের ভূতাত্মা—আমাদের Corporeal self?

অথ যো বাব শরীরম্ ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্—মৈত্র, ৩।২

'He is born in sin'—সে শুদ্ধ নয়, পাপবিদ্ধ,—স্বচ্ছ নয়, মলিন—প্রাজ্ঞ নয়, অজ্ঞ—তুঙ্গ নয়, তুচ্ছ—ঈশ নয়, অনীশ।

অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ—মুণ্ডক, ৩।১।২

সে—পাপোহং পাপ-কর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। তাহার ক্ষুদ্রতা নীচতা হীনতা নির্বুদ্ধিতা মলিনতা মোহান্ধতা—সার অলিভর লজ যাহাকে 'aberrations and abominations' বলিয়াছেন—এ সমস্ত লক্ষ্য করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয় এবং মানুষ যে মর্কটের সন্তান তৎসম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

When we follow the evolutionary history of our *bodies* and our brains, backward over a stretch of half a million years, we find them engulfed in the jungle of apedom.—
Sir Arthur Keith.

ঠিক কথা! মানুষের ভূতাত্মা—তাহার Animal Soul, তাহার পাশবী প্রকৃতির সম্বন্ধে কিথের ঐ উক্তি অকাট্য। কিন্তু তাহার জীবাত্মা—

তাহার Spiritual Soul, তাহার দৈবী প্রকৃতি? তৎসম্পর্কে আর একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কথা স্মরণ করুন।

We are incarnations of *spirit* here and now—spiritual beings in contact with inert matter for a time.—Lodge

সেই প্রাচীন কথা—

শরীরম্ অভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৮

এই দেহযোগই যত বালাই—দেহযোগাৎ বা সোপি (ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৬)—মগ্নো বপুষি শোচতি (পঞ্চদশী)। এই যোগের ফলেই পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের Personality (আমাদের ভূতাত্মার নামান্তর)। Persona ল্যাটিন শব্দ—তাহার অর্থ মুখস বা Mask—রোমে অভিনেতারা যে মুখসে মুখ ঢাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার অভিনয় করিত। বস্তুতঃ 'The Personality is the mask of the inner man' অর্থাৎ এই ভূতাত্মা, জীবাত্মা বা অন্তরাত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে, তাঁহার মুখস মাত্র। ঐ অন্তরাত্মা সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য লেখক আমাদের বেদান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

Within the deep recess of the self of every man, resides a timeless spaceless changeless Reality—the Divine monad or supreme soul of all men.

সে যাহা হউক, মানুষের মধ্যে যে দ্বি-বিধ আত্মা—মর্ত্ত্যবিহারী ভূতাত্মা (Lower Self) ও বিমানচারী জীবাত্মা (Higher Self) বিরাজ করিতেছে—ইহা নিঃসন্দেহ। তা' যদি হয়, তবে এই দোঁহার মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বাস্তবিকও অন্তর্দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় আমাদের প্রত্যেকেরই চিত্তক্ষেত্র এক একটা রক্তাক্ত রণভূমি—সেখানে 'সু' ও 'কু'—দৈবী প্রকৃতি ও পাশবী প্রকৃতির অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছে। দেবাসুরের এই যুদ্ধ লক্ষ্য করিয়াই মহাকবি শেকস্পিয়র (যাঁহাকে কেহ কেহ the greatest Psycho-analyst বলেন) বলিয়াছেন—

The kingdom of man suffers insurrection.

আর একজন অভিজ্ঞ লেখকের এ সম্বন্ধে উক্তি এই—(It) is the battle ground of human life—the place where the spiritual and terrestrial energies meet in conscious conflict * * All the futility and suffering in human life is due to their (i. e. the terrestrial energies') usurping the guiding and directing power which belongs to (the spiritual energies).

পশুদের মধ্যে কেবল পাশব প্রকৃতি—পশুতে দৈবী প্রকৃতির সমাবেশ নাই ; সেইজন্য তাহাদের মধ্যে এ সংঘর্ষের বালাই নাই। কিন্তু মানুষে ?

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥

মানুষ ধর্ম্ম জানে, কিন্তু সে দিকে তার প্রবৃত্তি হয় না—সে অধর্ম্ম জানে, কিন্তু তা' হ'তে তার নিবৃত্তি হয় না। খৃষ্টীয় সাধু সেণ্ট পল নিজের মধ্যে 'সু' ও 'কু'র এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া সকাতরে বলিয়াছেন ঃ—

The good that I would do I do not; but the evil I would not, that I do. For I delight in the law of God but I see another law in my members (যাহাকে আমরা ভূতাত্মা বলিতেছি), warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members.

এই বিরোধস্থলে এবং যখন মানুষের মধ্যে দৈবী প্রকৃতি ও পাশবী প্রকৃতি উভয়েরই সমাবেশ রহিয়াছে—যখন তাহার চিত্তনদী উভয়তঃ বাহিনী—বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় (ব্যাসভাষ্য), যখন—

শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ (যোগবাসিষ্ঠ)

—তখন সুসভ্য মানুষ নিসর্গের অনুবর্ত্তন করিতে কোন প্রকৃতির অনুসরণ করিবে ? দৈবীর না পাশবীর ? ভূতাত্মার না জীবাত্মার ? কারণ, এ কথা ত' অবিসংবাদী যে,—

'Civilisations can not be run on the principles of the jungle. You require spiritual wisdom and self-discipline.'

আমাদের মধ্যে যে জুপিটার আছেন, দেবতা আছেন, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইব ? না যে বানর-বৃক (the tiger and the ape) আছে, যে কাপিয়ঁ-মর্কট আছে, তাহার অনুবর্ত্তন করিব ?

এই প্রসঙ্গে পাঠককে ঔপন্যাসিক Aldous Huxleyর Point Counter-point হইতে কয়েকটি কথা শুনাইতে চাই। আজকাল অলডাস হাক্সলির খুব নাম ডাক—আর এই Point Counter-point নাকি তাঁর Masterpiece—উপন্যাসিক পরাকাষ্ঠা—স্থষ্টিরাদ্বৈব ধাতুঃ ! হাক্সলি যে একজন প্রতাপী লেখক—তা' অস্বীকার করিবার জো নাই।

তবে ইংলণ্ডের সাহিত্য-রুচি কত বিকৃত হইয়াছে, তাঁহার Brief Candles—বিশেষতঃ এই Point Counter-point পড়িলে বুঝা যায়। ইহার আগাগোড়া কুৎসিত কামক্রীড়ার অভিনয়ে উল্লসিত—ইহার টানা-পোড়েন মদনরতির উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে উপদ্রুত। কামো দত্তাৎ কামঃ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ! সে যা হ'ক, প্রকৃতম্ অনুসরামঃ। এই উপন্যাসে হাক্সলি স্থানে স্থানে 'নিসর্গের অনুবর্ত্তন' কর—'Be Natural' এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—সেইজন্যই এ স্থলে তাঁহার কথা তুলিলাম।

'Dont be anything but a Man—a man mind you—not an angel or a devil' 'মানুষ হও—মানুষই হও—দেবতাও নয়, অসুরও নয়—মা-নু-ষ!'

'Every attempt at being something better than a man—the result is always the same. Death—some sort of death. You try to be something more than you are by *nature* and you kill something in yourself and become much less × × You try to be more than human, but you only succeed in making yourself less than human. Always.'

'প্রকৃতি মানুষকে যেমনটি রচেছে, সে যদি তার চেয়ে বড় হবার চেষ্টা করে—সে যদি অতি-মানুষ হ'তে চায়—সে চেষ্টা তার শুধু ব্যর্থ হবে তা নয়, সে আত্মহত্যা কর্ব্বে—সে অমানুষ হ'বে।'

আদর্শ, অধ্যাত্মজীবন, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি—হাক্সলির মতে এ সমস্ত বাজে কথা, ভণ্ডামি—

I am so tired of this rubbish about the higher life and moral and intellectual progress and living for ideals and the rest of it. It all leads to death. × × It is all a dammed lie and an idiotic lie at that—all this pretending to be more than human.

সত্য বটে যিশুখৃষ্টের মত মহাপুরুষ আমাদের সংযম সাধন করিতে বলিয়াছেন, দৈবী প্রকৃতি অর্জ্জন করিয়া আমাদের 'দ্বিজ' হইতে বলিয়াছেন (Unless you be born *again*), অতি-মানুষ হইয়া লোকোত্তর স্বর্গ-রাজ্যে আরোহণ করিতে বলিয়াছেন—সত্য বটে সেণ্ট ফ্রান্সিস্, সেণ্ট অ্যান্টনি প্রভৃতি খৃষ্টীয় সাধু মহাজনগণ যিশুখৃষ্টের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া পৃথিবীর মাটির ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু (হাক্সলির মতে) তাহারা সব Perverts (বিকৃতমনাঃ)—কেন না, তাহারা Instincts

falsify করিয়াছিল—পাশবী প্রকৃতির বিপরীতাচরণ করিয়াছিল! তাহাদের মত মহাপাপী কে ?

The only absolute evil act that a man can perform is an act against life—against his own integrity. He does wrong, if he perverts himself—if he falsifies his instincts.

অতএব—Telling them to obey Jesus is telling them to be more than human * * And to think that the world is full of such creatures! Not quite so far gone as St. Anthony and his demons or St. Francis and his half-wits. But of the same kind—different only in degree. All perverted in the same way—by trying to be non human—non-humanly religious, non-humanly moral, non-humanly intellectual and scientific, non-humanly specialised and efficient. * * All perverts—perverted towards goodness or badness, towards spirit or flesh!

অভিজ্ঞ পাঠক এই সকল উক্তির মধ্যে য়ুরোপে অধুনা যে নবতর মনোবিজ্ঞান (Psycho-analysis) গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। অর্থাৎ Repression suppression, সংযম-নিয়ম, নিরোধনিগ্রহ কিছু নয়—প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ?

তোমার 'Psyche'র মধ্যে যে বাসনা কামনা—'Instincts' ইত্যাদি প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার অনুসরণ কর—ওই তোমার কল্যাণের পথ!

এই Psycho-analysis-বিজ্ঞানের প্রধান আচার্য্য ডাক্তার ফ্রয়েড (Freud) ও তাঁহার শিষ্যকল্প ডাক্তার ইয়ুং (Jung)। তাঁহাদের পরীক্ষা-সমীক্ষার ফলে আমাদের Psyche (soul বা জীবচিত্ত)-সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ঐ Psyche—যাহার অপর নাম 'the Unconscious'—ঐ সাইকির যে মর্ম্মভেদ করিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না।

Much has been taught him in recent years about the hitherto unsuspected elements in his Psyche, but the emphasis is all too often on the static side alone so that he finds himself possessed of little more than an inventory of contents. (Cary Baynes)

ভারতীয় মনস্তত্ত্বের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, ঐ Unconscious বা অব্যক্ত সম্বিৎ তাঁহার নিকট একেবারেই অভিনব নয় ; উহাকেই মায়ার, লজ

প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা Subliminal Consciousness বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আমাদের জাগ্রৎ সম্বিৎ (Brain-consciousness) সমগ্র সম্বিতের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র—যেন সমুদ্রে ভাসমান তুষার-স্তূপের উপরি-ভাগস্থ চূড়ামাত্র।

Each of us is only a partial incarnation of a larger self. * * Besides the consciousness of the ordinary field (অর্থাৎ Brain Consciousness), there is a consciousness existing beyond the field, that is extra marginally and outside of the primary consciousness * * There are uprushes into the ordinary consciousness of energies originating in the subliminal parts of the mind. (See James's Varieties of Religious Experiences pp 233 & 234).

এ সকল কথার সহিত আমাদের বিন্দুমাত্র বিবাদ নাই। ভূতাত্মার তলাতল হইতে, পাশবী প্রকৃতির 'গহন গভীর' হইতে বীচিক্ষোভ উত্থিত হইয়া সময়ে সময়ে আমাদের চিত্রক্ষেত্র প্লাবিত-মথিত-উদ্বেলিত করে, ইহাত' আমাদের প্রত্যেকের সুবিদিত। কিন্তু Psycho-analystরা যখন বলেন, ঐ ভূতাত্মা বা পাশবী প্রকৃতিই আমাদের স্বরূপ (our real human nature), তখনই তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিতে হয়। যখন তাঁহারা বলেন —We veil from ourselves our real human nature, with all its dangerous, subterranean elements and its darkness—

—তখন উত্তরে বলিতে হয় যে, ঐ Subliminal Consciousness ছাড়া, ঐ ভূতাত্মা, পাশবী প্রকৃতির উপরে মানুষের একটা জীবাত্মা, একটা দৈবী প্রকৃতি ('life-giving empyrean elements'), একটা Supra-liminal Consciousness আছে—যাহার শুভ জ্যোতিঃ পাপতাপের, হীনতাদীনতার অন্ধতমস্ ভেদ করিয়া কর্ম্মীর ঈশ্বরার্পণে, ভক্তের পরানুরক্তিতে, জ্ঞানীর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায়, ধ্যানীর ধ্যানধারণায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ডাঃ ইয়ুং বলিয়াছেন ঃ—

There can evolve spontaneously out of the Unconcious, contents which the Conscious cannot assimilate.

বাঢ়ম্—তথাস্তু ! কিন্তু ইয়ুংকে জিজ্ঞাসা করি—পাগলের পাগলামি এবং কলাবিদের কলাসিদ্ধি, কবির কাব্যোচ্ছ্বাস ও যোগীর যোগসমাধি কি

এক উৎস হইতে উৎসারিত? অতএব 'Two souls alas! reside within my breast'—মহাকবি গেটের এই প্রগাঢ়োক্তি—মানুষের মধ্যে ঐ মর্ত্ত্যবিহারী ভূতাত্মা ও বিমানচারী জীবাত্মার যুগপৎ সমাবেশ স্বীকার করিতেই হয়।

কিছু পূর্ব্বে আমরা অল্‌ডাস্‌ হাকস্‌লির মতের আলোচনা করিতে-ছিলাম। তিনিও মানুষে এই দ্বিবিধ প্রকৃতির সমাবেশ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন মানুষের এক অন্তে (Poleএ) Spirit Mind Consciousness এবং অন্য অন্তে তাহার Body Instincts ইত্যাদি। তাঁহার মতে এই বিরোধী প্রকৃতিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনই (Perfect Balance, Perfect Relativity) মানবের পরমার্থ। মানুষ সংসাররূপ রঙ্গভূমিতে যেন একটা সটান দড়ির উপর কৌতুক দেখাইতেছে—যদি সে ঠিক সজাগ ও সমঞ্জস হইয়া চলিতে না পারে—যদি কদাচিৎ এদিকে বা ওদিকে একটুমাত্রও ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে তাহার পদস্খলন ও অকালমরণ অবশ্যম্ভাবী।

A man is a creature on a tight rope, walking delicately equilibrated, with mind consciousness and spirit at one end of his balancing pole and body and instinct and all that is unconscious and earthly and mysterious at the other. Balanced —which is damnably difficult. And the only absolute he can ever really know is the absolute of perfect balance—the absoluteness of perfect relativity.—Point Counterpoint.

এই সামঞ্জস্য-সাধন যে খুব কঠিন তাহা বলাই বাহুল্য; সেই জন্য হাক্‌সলি ইহাকে damnably difficult বলিলেন। ইহা যে প্রচুর প্রযত্ন-সাপেক্ষ, তাহাও নিসংশয়—'demands the most thoroughgoing and wearisome preparation, consisting in the right payment of all debts to life'। শুধু তাহাই নয়—যদি Psycho-analysis-বিজ্ঞান একেবারে বাজে কথা না হয়, তবে এরূপ সামঞ্জস্যসাধন একেবারে অসাধ্য, অসম্ভব (psychologically impossible to carry out)। সেই জন্য ডাঃ ইয়ুংয়ের ব্যবস্থাপত্র (Prescription) অন্যরূপ; তিনি বলেন—

The art of letting things happen, action in non-action, letting go of one-self, became a key to me, with which I was able to open the door to the way. The key is this: We must be able to let things happen in the Psyche....Consciousness is for ever interfering, helping, correcting and negating, and never leaving the simple growth of the psychic process in peace. অতএব কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত? Allow the psychic processes to go forward without interference—to put aside the activity of the consciousness.

এই 'wise passivity'—উদাসীন নির্যোগ—ইয়ুংয়ের মতে ইহাই প্রকৃত যোগ। এই প্রণালীর প্রয়োগ করিয়া তিনি নাকি অনেক মনোরোগীকে নীরোগ করিয়াছেন—'This detachment is an effect which I know very well from my professional practice; it is the therapeutic effect par excellence, for which I labour with my students and patients। বেশ কথা! কিন্তু ইয়ুংকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—মনোরোগী, বিশেষতঃ মনোরোগিনীর পক্ষে যাহা হিতকর, দৈব প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার তাহাই কি সদুপায়? স্বীকার করি, কেবল repression supression—নিয়মন, নিগ্রহণ অনেক স্থলেই নিষ্ফল। 'A repressed astral body (ইয়ুং যাহাকে 'Unconscious' বলিয়াছেন) is no acquisition and leads nowhere. Modern Western Psychology (Psycho-analysis) has proved it.' (Through the Eyes of the Masters, p 28) কিন্তু ইয়ুং কি অস্বীকার করিবেন যে, চিত্তকে (ভারতীয় যোগের ভাষায় যাহাকে 'পরিকর্ম্ম' বলে) সেই পরিকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ করা যায় এবং পৌরুষ ও প্রযত্ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়?

পৌরুষেণ প্রযত্নেন লঙ্ঘনীয়া শুভে পথি—যোগবাসিষ্ঠ

বস্তুতঃ ভূতাত্মার আক্ষেপবিক্ষেপ ছাড়াইয়া জীবাত্মার তুঙ্গভূমিতে সুস্থিত হইবার যে শুভ ও সার্থক উদ্‌যোগ—তাহাই যোগ। এ জন্য যম নিয়ম চাই—অভ্যাস বৈরাগ্য চাই।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ—যোগসূত্র

এই 'অভ্যাস'কে লক্ষ্য করিয়া একজন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন—The control and domination of the Desire-energies is the essence of Yoga and the whole reason for self-discipline.

অতএব ইয়ুংয়ের অনুমোদিত উদাসীন নির্যোগ—wise Passivity, Action-in-inaction কখনই প্রকৃত যোগ নহে।

আর বৈরাগ্য ? সেও প্রচুর সাধন-সাধ্য এবং তাহার ফলে ?

My long sickness now begins to mend
And *nothing* brings me *all* things.—Timon of Athens

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

অতএব—'The Ego (জীবাত্মা) is to comprehend and control the Personality (ভূতাত্মা), till he has finished with desire.'

Body, Desire, Mind—তন্ হন্ মন্—কায় কাম মনস্—এই ত্রিতয় (triad) লইয়া আমাদের Personality বা ভূতাত্মা। ইহার নিগ্রহ-নিয়মন কঠিন বটে—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ! প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ —গীতা

—কিন্তু অসম্ভব নয়। এবং ইহার সহজসাধ্য উপায়—অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় (ছান্দোগ্য)—ভূতাত্মার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। 'You have to control and transmute every desire, every emotion, and to raise your desire-nature (ভূতাত্মা) to the Buddhic plane (জীবাত্মা), through the transmuting fire of selfless action—to raise the emotional to the spiritual by means of prayer and aspiration. (Through the eyes of the Masters.)

Pscho-analysisএর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—The higher (such is the law) always inhibits the lower.

ডাঃ ইয়ুংয়ের কথাতেই বলি—What, on a lower level, had led to the wildest conflicts and to emotions full of panic, viewed from the higher level of the personality (Ego বলিলে ভাল হয়), now seemed like a storm in the valley seen from a higher mountain top.—Dr Jung's Commentary on Chinese Book of Life ' I Chin' p 88.

যখন মানুষ ভূতাত্মার ঊর্দ্ধে উঠিয়া জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়, পাশবী প্রকৃতি ছাড়াইয়া (transcend করিয়া) দৈবী প্রকৃতিতে সুস্থিত হয়—

তখন,—

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে—ছান্দোগ্য

—সেই সম্প্রসন্ন জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ উপসন্ন হইয়া স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই প্রকৃত যোগ—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্—যোগসূত্র, ১।৩

এই অবস্থার বর্ণন করিয়া চৈনিক যোগদীপিকা 'আই চিন্' বলিয়াছেন ঃ—

Then one has ability always to react to things by reflexes only (গীতা যাহাকে 'শারীরং কেবলং কর্ম্ম' বলেন). Then body and heart (ভূতাত্মা) are completely controlled and one is quite free and at peace, letting go all entanglements, untroubled by the slightest excitement, with the Heavenly Heart (জীবাত্মা) exactly in the middle। ডাঃ ইয়ুং ইহাকে "reunion with the laws of life, represented in the Unconscious" বলিয়াছেন। সে অবস্থায় "Instead of being in it, one is *above* it, (Jung).

ইহাই প্রকৃত নির্দ্বন্দ্ব হওয়া—"The union of the opposites on a *higher* level of consciousness" (Jung).

এইরূপ দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব!
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি, নিবৃত্তানি ন কাঙ্খতি॥ —গীতা

তিনি "outgrows, that is raises the level of consciousness to a higher plane"। ইহাকেই সাংখ্যেরা বলেন—প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ স্বস্থঃ। তখন তিনি সাক্ষী, দ্রষ্টা, Spectator মাত্র হন, কর্ত্তা বা ভোক্তা থাকেন না। ইহাই যোগসিদ্ধি—'when the Conscious becomes detached from the Unconscious'—যখন জীবাত্মা ভূতাত্মা হইতে বিবিক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে স্ববস্থিত হন। এই যোগসিদ্ধির পথে বিচরণ—এই পাশবী প্রকৃতির ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দৈবী প্রকৃতিতে উন্নয়নই মানুষের পক্ষে প্রকৃত 'নিসর্গের অনুবর্ত্তন'।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

জার্ম্মানির দুরবস্থা

১

আডল্‌ফ্‌ হিট্‌লারের অনুবর্ত্তী নাৎসি-দলের সূত্রপাত হয় গত মহাযুদ্ধের সামান্য কিছুদিন পরে—কিন্তু ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তারা জার্ম্মানিতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেনি; মাত্র তিন বৎসর আগেও হিট্‌লারী আন্দোলন দেশে ও বিদেশে নগণ্য এবং উপহাসাস্পদ বলে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু আজ হিট্‌লার যে শুধু প্রধান মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত তা' নয়, স্বয়ং জার্ম্মানির প্রেসিডেণ্ট্‌ও আর তাঁকে পদচ্যুত করতে সাহস পাবেন কিনা সন্দেহ; এমন কি রাইশ্‌ষ্টাক্‌ বা রাষ্ট্রীয় মহাপরিষদ পর্য্যন্ত তিন মাস হ'ল রাজ্যশাসনের সমস্ত ভার ও সকল ক্ষমতা হিট্‌লারের হাতে সমর্পণ ক'রে রাজনৈতিক নির্ব্বাণ লাভ করেছে। রাশিয়ার সাম্যবাদিদলের এবং ইটালিতে ফাসিষ্ট্‌দের যেমন একাধিপত্য আজকের দিনে জার্ম্মানিতে নাৎসি-প্রভুত্ব তদনুরূপ।

হিট্‌লারের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মূলে শুধু যে তাঁর ব্যক্তিত্ব বা সম্মোহনী বাগ্মিতা, তাঁর সহচরদের উৎসাহ ও দল-সংগঠনের কৌশল কিংবা যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তি রয়েছে এ কথা অবশ্য বলা চলে না। বস্তুতঃ নাৎসিদের সাফল্য অত্যাশ্চর্য্য বোধ হ'লেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। এই প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় আলোচনার যোগ্য—মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানির প্রতি বিজয়ী মিত্ররাষ্ট্রগুলির ব্যবহার, উত্তর-সামরিক যুগে জার্ম্মানির জটিল আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং ইটালিতে মুসোলীনি কর্ত্তৃক ফাসিষ্ট্‌ আদর্শে নূতন রাষ্ট্র গঠন।

২

ভের্সাই-র সন্ধির সময় যে জার্ম্মানির প্রতি অবিচার করা হয়েছিল এসম্বন্ধে প্রায় সকলেই এখন একমত। প্রেসিডেণ্ট্‌ উইলসন্‌ অবশ্য নিরপেক্ষ ন্যায়সঙ্গত ভাবে শান্তিস্থাপনের আদর্শ প্রচার করেছিলেন কিন্তু আর্থিক লোভ, রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি ও জার্ম্মান্‌-বিদ্বেষী ক্ষিপ্ত জনমতের

সম্মিলিত প্রভাবে পরাজিত শত্রুর লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। যুদ্ধাবসানের পর জার্ম্মানিতে দেশব্যাপী নৈরাশ্য ও জাতিগত আক্রোশ সম্পূর্ণ বুঝতে হ'লে ভের্সাই-সন্ধির মূল কয়েকটি সর্ত্ত স্মরণে রাখা আবশ্যক।

প্রথমেই সীমা-নির্দ্ধারণের কথা মনে আসে। জার্ম্মানির প্রত্যন্তদেশে যে জনপদগুলির উপর প্রতিবেশীদের লোভ ছিল তাদের ভাগ্য স্থির করার সময় চারটি বিভিন্ন নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়—অধিবাসীদের ইচ্ছা, ঐতিহাসিক দাবী, আত্মরক্ষার সুবিধা ও আর্থিক প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে বিশেষ যে-নীতিটি অবলম্বন করলে জার্ম্মানির ক্ষতি হয় সেটাই অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন, অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, পোল্‌দের আর্থিক উন্নতির জন্য, ডান্‌সিগ্‌ পোল্যাণ্ডের অধীন করা হয়—অথচ সিলেসিয়ার দক্ষিণাংশ জার্ম্মানির বিশেষ ক্ষতি সত্ত্বেও পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত করা হ'ল—কেননা সে অঞ্চলে পোল্‌ প্রজার সংখ্যা অধিক। বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানির জাতিগত ঐক্য অগ্রাহ্য ক'রে তাদের একতার পথ ফ্রান্সের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য যুক্তির সাহায্যে রুদ্ধ করা হয়। নূতন সীমারেখার পরপারে যে-জার্ম্মানেরা এভাবে স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জার্ম্মান জনসাধারণের মনে অতি প্রবল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানির আর্থিক উন্নতি অন্য দেশের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল; এই সুযোগে সেই সমৃদ্ধির মূলোচ্ছেদ করা হয়। অপর্য্যাপ্ত কয়লা ও লোহা এবং পণ্যদ্রব্য প্রেরণের সুবন্দোবস্ত জার্ম্মান ব্যবসাবাণিজ্যের ভিত্তি-স্বরূপ ছিল। সন্ধির সময় লোরেন, সিলেসিয়া, সার প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কয়লার খনি ও লোহার কারখানা জার্ম্মানির হস্তচ্যুত হয়। অধিকাংশ জাহাজ এবং নদী ও রেললাইনগুলির অধিকার হস্তান্তরিত হওয়ার ফলেও জার্ম্মানির সবিশেষ আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল এ কথা বোঝা শক্ত নয়। অসংখ্য জার্ম্মান আজও এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার স্বপ্ন দেখ্‌ছে।

তৃতীয়তঃ জার্ম্মানির সামরিক শক্তির ধ্বংস সাধিত এবং নিরস্ত্র জার্ম্মান জাতির পক্ষে ভবিষ্যতে যুদ্ধসজ্জা এইসঙ্গে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়।

ভের্সাইর্ সন্ধিতে অবশ্য বিধান ছিল যে, জার্ম্মানির অস্ত্রবিসর্জ্জনের পর বিজয়ী শক্তিবৃন্দও অস্ত্রত্যাগ করবে। কিন্তু কোনো সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে আজ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা কল্পনাতেই পর্য্যবসিত রয়েছে। ফলে এখন জার্ম্মানরা দাবী করতে পারছে যে নিরস্ত্রীকরণ সর্ব্বত্র সম্পন্ন না হ'লে জার্ম্মানিকেও আবার ইচ্ছামত রণসজ্জার স্বাধীনতা দিতে হবে।

কিন্তু বিজয়ীদের বাতুলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাতে। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মানি প্রতি বৎসরে বিপুল অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হৃতরাজ্য ধ্বংসোন্মুখ জার্ম্মানজাতির পক্ষে এই শাস্তি যে কত নিষ্ঠুর সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ। কিন্তু জার্ম্মানির অবস্থা যদি লক্ষগুণ ভালও হত, তবু এই ঋণ শোধ করার সম্ভাবনা থাকত না—কেননা আর্থিক ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের দু'টি পন্থাই জার্ম্মানির পক্ষে রুদ্ধ। বিদেশী রাজ্যসমূহ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে জার্ম্মান্ পণ্যদ্রব্যের অবাধপ্রবেশের পথ শুল্কের সাহায্যে বন্ধ করতে দৃঢ় সংকল্প অথচ ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল ততখানি সোনা সংগ্রহ করা কোনো দেশের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। এইজন্য সম্প্রতি বিজয়ী রাষ্ট্রগুলিকে তাদের প্রাপ্য আদায় করার দাবী ছাড়তে হয়েছে ; কিন্তু সমস্ত জার্ম্মান জাতির দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, বারো বৎসর ব্যাপী এই নিগ্রহই জার্ম্মানির সকল আর্থিক দুর্দ্দশার মূল কারণ।

উত্তরসামরিক যুগে তরুণ জার্ম্মানদের আত্মাভিমানে সব চেয়ে আঘাত লেগেছে অন্য একটি ব্যাপারে। ভের্সাই-সন্ধিপত্রের ২৩১ ধারায় বিগত মহাযুদ্ধ বাধাবার সকল দোষ জার্ম্মানির স্কন্ধে আরোপ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক মাত্রেই এখন স্বীকার করবেন যে এ-অপবাদ অতি অন্যায়—যুদ্ধের জন্য বস্তুতঃ সকল দেশই অল্পবিস্তর দায়ী। বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও পরাস্ত জার্ম্মানিকে এই সন্ধি স্বাক্ষর করতে হয়। জার্ম্মানিই একমাত্র দোষী এই কথা স্থিরনিশ্চয় করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এই জন্যই কয়েক বৎসর জার্ম্মানিকে জাতিসঙ্ঘে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি, এবং আজ পর্য্যন্ত তাকে ইউরোপের বহিঃস্থিত উপনিবেশ-শাসনের অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। বহু শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত গর্ব্বিত জাতির পক্ষে

এরূপ অপমান অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। ভের্সাইর সন্ধি সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত; সব সর্ত্তগুলি কার্য্যে পরিণত করবার কোনো সংকল্প ছিল না—জার্ম্মানদের এ আশাও অমূলক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। জার্ম্মানির চিরবৈরী ফ্রান্স বহুদিন ধরে সন্ধির সমস্ত বিধান অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত করার চেষ্টা করেছে। ফ্রান্সের এ মনোভাবের মূল কারণ ভয়। জার্ম্মানদের আশু প্রতিশোধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সদাসর্ব্বদা সতর্ক থাকা ফ্রান্সের উচিত—এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হয়ে যুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্ম্মানির প্রতি যে-ব্যবহার করেছে দুর্ভাগ্য-বশতঃ তার প্রথম ফলই হয়েছে এই যে, জার্ম্মানদের ফ্রেঞ্চ-বিদ্বেষ ও প্রতি-শোধের ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রবলতর হয়ে উঠছে। প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য ফরাসী সৈন্য জার্ম্মানিতে বারবার প্রবেশ করেছে; এমন কি ১৯২৩ সালে জার্ম্মানদেশের প্রধান পণ্যোৎপাদন-কেন্দ্র রূর প্রদেশ কিছু কালের জন্য ফ্রান্স অধিকার করেছিল। ১৯২৪ সালের বন্দোবস্তের পর বল প্রয়োগ প্রথা অবশ্য পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গ সন্ধি-সর্ত্ত সংস্কারের কোনো প্রস্তাবে কর্ণপাত করে নি।

ভের্সাই সন্ধির বিরোধী জার্ম্মান জনমত দিনে দিনে তীব্রতর হচ্ছে। এই প্রতিবাদ-স্পৃহা নাৎসি-দলপুষ্টির প্রধান কারণ, কেননা হিট্‌লার সন্ধি-পত্রের অন্যায় ও অপমানজনক সর্ত্তগুলি অমান্য করার প্রস্তাব করেছেন। নাৎসি নেতাদের আস্ফালন ও বাক্‌যুদ্ধ জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের জন্য ফ্রান্স অনেকাংশে দায়ী।

৩

কিন্তু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে ফ্রান্সের প্রকোপ আগের তুলনায় কমে যাবার পর নাৎসিদের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হল কেন। সম্প্রতি ফ্রান্সে উদারতর দলগুলির প্রভাব বর্দ্ধিত হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহ। অবশ্য ভের্সাইর বিধিব্যবস্থা এখনও পরিশোধিত হয়নি; এবং গভীরতম অবসাদের সময় প্রতিবাদ-প্রবৃত্তি যতখানি থাকে, অবস্থার আংশিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার বৃদ্ধিও অপ্রত্যাশিত নয়। তবুও নাৎসিদের প্রতিপত্তির গভীরতর কারণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বাদ দিলেও গত পনেরো বৎসর ধ'রে অন্য দু'টি সমস্যা জার্ম্মানিকে ত্যক্ত করেছে—গণতন্ত্রর প্রতি আস্থার উত্তরোত্তর হ্রাস এবং আর্থিক দুরবস্থা। নাৎসিদের সাফল্য বহুলভাবে গণতন্ত্রবিরাগ ও আর্থিক সাচ্ছল্য-স্বপ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে সম্রাটের আমলে জার্ম্মান শাসন-পদ্ধতিতে গণতন্ত্রের বিশেষ কোনো স্থান ছিল না। যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে, আকস্মিক বিপ্লবে কাইজারের সিংহাসনচ্যুতি ঘটল, এবং একই সঙ্গে রিপাব্লিক ও ডিমোক্রাসি স্থাপিত হল। তারপর আর্থিক বিপত্তি ও বৈদেশিক নিষ্পেষণের যুক্ত প্রভাবে অনভ্যস্ত জার্ম্মান জাতির চোখে গণতন্ত্রের সার্থকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। জার্ম্মানিতে বরাবরই রাজনীতিক্ষেত্রে নানা মতের ঘাতপ্রতিঘাত দেখা গেছে—এখনও ছয় সাতটি বড় পৃথক দলের অস্তিত্ব দেশে বা পার্লামেণ্টে কোনো একটি দলের সংখ্যাধিক্যকে নিঃসন্দিগ্ধ হতে দিচ্ছেনা। রাইশষ্টাক্-নির্ব্বাচনে প্রতি ৬০০০০ ভোটের জন্য একটি আসন নির্দ্দিষ্ট হয়—সুতরাং সাধারণ অবস্থায় কোনো দলের সভ্যসংখ্যায় হঠাৎ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ জার্ম্মান পলিটিক্সের ক্ষেত্র ইংল্যাণ্ড বা এমেরিকার মতন নয় বরং অনেকটা ফ্রান্সের অনুরূপ।

১৯১৯ সালের নবশাসন-পদ্ধতির নামকরণ বিখ্যাত হ্বাইমার নগরীর নামে হয়েছে বলে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জার্ম্মানদের হ্বাইমার-পন্থী বলা যেতে পারে। এদের মধ্যে উদারনৈতিক, সোশ্যাল ডিমোক্রাট এবং কাথলিক সেণ্টার পার্টিই প্রধান। গণতন্ত্রে আস্থাহীন জার্ম্মান দলগুলির মধ্যে তিনটির নাম উল্লেখযোগ্য। ন্যাশনালিষ্ট্ দল পুরাতন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করে; জার্ম্মানির সামরিক প্রতিপত্তি ও লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার তাদের প্রধান উদ্দেশ্য; হুগেন্ব্যর্গ ও ডুয়েষ্টর্ব্যর্গের নেতৃত্বে প্রাশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়, সেনানীবৃন্দ ও জমিদারগোষ্ঠী এদের পৃষ্ঠপোষক এবং বিখ্যাত লৌহশিরস্ত্রাণ-বাহিনী এদেরই প্রতিষ্ঠান। সাম্যবাদীদল বল্শেভিক্ মন্ত্রে দীক্ষিত এবং জার্ম্মানিতে সোভিয়েট্তন্ত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর; টেল্মান্ ও ক্লারা সেট্কিন্ প্রভৃতির নেতৃত্বে এদের উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে এক বিষম বিভীষিকার

সৃষ্টি করেছে। ন্যাশনাল্ সোশ্যালিষ্ট্ বা নাৎসি মতবাদ উপরোক্ত চরম মত দু'টির মধ্যবর্ত্তী পন্থা বলে দাবী করা হয়; জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই বিরোধী আদর্শের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হিট্‌লারী আন্দোলনের বিশেষত্ব। ঝঞ্ঝা-বাহিনী নামক প্রতিষ্ঠানটি নাৎসিদের প্রভাব দেশের সর্ব্বত্র বিস্তার করেছে—তাদের সাজসজ্জা, পতাকা, শোভাযাত্রা, উৎসব প্রভৃতি, নানাভাবে তরুণ-মনকে আকৃষ্ট করতে পারে। ডিমোক্রাসির উপর নির্ভর ও সে বিশ্বাসের অভাব এই দুই চিন্তাধারার সঙ্ঘর্ষ প্রথম থেকে এইভাবে জার্ম্মান রিপাব্লিককে ক্ষুব্ধ করে এসেছে।

আর্থিক বিপদ এই সঙ্ঘাতকে দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত করেছে একথা সুনিশ্চিত। যুদ্ধের পর যখন অন্য দেশে সহজ অবস্থা ফিরে আসছিল ক্ষতিপূরণের দাবীতে জার্ম্মানি তখন মুহ্যমান। বিদেশের প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টাতে inflationএর সূত্রপাত হয়, তার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চিত অর্থসম্পদ সহসা লোপ পায়। প্রধানতঃ এমেরিকার সাহায্যে ১৯২৪ সালে ক্ষতিপূরণের ভার লাঘব করবার বন্দোবস্ত হয় এবং তারপর কয়েক বৎসর জার্ম্মানজাতির অবস্থা স্বচ্ছলতর হয়েছিল বলা চলে। এমেরিকার কাছ থেকে প্রচুর ঋণ এবং উৎপাদন-পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি ও প্রসার এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল। দুঃখের বিষয় ১৯২৯এর পর থেকে সারা পৃথিবীময় আর্থিক দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এল। এমেরিকার অর্থ সাহায্য বন্ধ ও জার্ম্মান পণ্যের বাজার সংকীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুঃসময় জার্ম্মানিতে রুদ্ররূপেই দেখা দিয়েছে। তার ফলে যে শ্রমিকদের মধ্যে নৈরাশ্য, নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর দুশ্চিন্তা ও কৃষিব্যবসায়ীদের হাহাকার উপস্থিত হবে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ও বড় কারখানার মালিক প্রভৃতি ধনিকপ্রবরদের উপর দুঃস্থ ধনিকদের আক্রোশও দেখা যাচ্ছে। ধনিকপ্রধানেরা আবার দুর্দ্দিনের দোহাই দিয়ে শ্রমিকদের পূর্ব্বার্জ্জিত অধিকার হ্রাসের চেষ্টার ত্রুটি করছেনা। বর্ত্তমানের এই বিভিন্ন আর্থিক প্রবৃত্তির প্রায় সবগুলিই মিশ্রিত হয়ে নাৎসি-আন্দোলনে রূপ পেয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিগণ, নিম্নস্তরের ধনিকেরা ও সন্ত্রস্ত কৃষক সম্প্রদায়—এরাই এখন নাৎসিদের প্রধান সম্বল।

কিন্তু পূর্ব্ব অঞ্চলের ভূস্বামিগণ ও পশ্চিমের ধনিকশ্রেষ্ঠরাও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির আশায় হিট্‌লারের সাহায্য করেছে। বিভিন্ন বিরোধী শ্রেণীর সমাবেশ ও জার্ম্মানির বিশেষ আর্থিক অবস্থা একাধারে হিট্‌লারের সাফল্যের কারণ এবং ভবিষ্যৎ আশঙ্কার হেতু হয়েছে বলা যায়।

৪

নর্ডিক স্পর্দ্ধার নবীনতম প্রচারক হিটলারের দেশোদ্ধার-অভিযান লাটিননেতা মুসোলীনির কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেছে একথা আশ্চর্য্য হলেও নিঃসন্দেহ। নাৎসিদের যে জার্ম্মান ফাসিষ্ট নামে অনেক সময় অভিহিত করা হয় সে শুধু কথার কথা নয়। হিট্‌লারের দল নিজেদের সোশ্যালিষ্ট মনে করে, এই সেদিন গোয়রিং সেকথা আবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সোশ্যালিজমের যে সংজ্ঞা এতকাল চলে এসেছে নাৎসিমতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য অতি অল্প। রাজ্যভার গ্রহণ করবার পরও হিটলার সকলকে আশ্বস্ত করেছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার বিলুপ্ত হবার কোনো আশঙ্কা নেই; অর্থসচিব শাখ্‌ট্‌ বল্‌ছেন যে রাষ্ট্রের আর্থিক নীতির বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হবে না। এ সকল ব্যাপারে নাৎসিরা অবশ্য সম্পূর্ণ একমত নয়, কিন্তু সোশ্যালিজমের সুপরিচিত মূলসূত্রগুলি নাৎসিদল এখন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করেছে এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। এর একটি অকাট্য প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে হিটলার ও তাঁর অনুচরেরা সাম্যবাদিদলকে দেশের ও আপনাদের প্রধান শত্রু বলে গণ্য করেন আর সোশ্যালিষ্ট মতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মার্ক্‌স্‌ নাৎসিদের আতঙ্ক। স্বদেশকে সাম্যতন্ত্র স্থাপনের আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন ব'লে হিটলারের বিশেষ গর্ব্ব আছে।

এইখানে ইটালিয়ান ফাসিষ্ট ও জার্ম্মান নাৎসিদের মূলগত ঐক্য ধরা পড়ে। মুসোলীনিও নিজের দেশকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন ভেবে গর্ব্ব অনুভব করেন। তফাৎ এই যে তাঁর বুদ্ধি প্রখর ও ধারণা সুস্পষ্ট বলে তিনি বোঝেন যে তাঁর বর্ত্তমান আচরণ ও মতামতকে সোশ্যালিজম্ নামে অভিহিত করা হাস্যকর।

মুসোলীনির ফাসিজম্ সাম্যবাদের মতন সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারা নয়। কিন্তু ফাসিষ্ট আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে কয়েকটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট হচ্ছে। তার প্রায় সকলগুলিই নাৎসি মতামতের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—এইখানেই মুসোলীনির কাছে হিটলারের ঋণ। এই চিন্তাস্রোত অন্য অনেক দেশে—এমন কি ইংল্যাণ্ডে পর্য্যন্ত সম্প্রতি পৌঁছেছে। এর বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার।

ইংল্যাণ্ডে, এমেরিকায় ও ফ্রান্সে যে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে, ফাসিজম্ তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে চায়। আধুনিক যুগে রাজ্যপরিচালনে পার্লামেণ্টের কোনো সার্থকতা নেই; ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলের রাজনৈতিক সাম্যের কোনো প্রকৃত মূল্য নেই; সংখ্যাধিকের মতানুসারে নিয়মকানুন প্রবর্ত্তন অমঙ্গলের কারণ—এই বিশ্বাসগুলির উপর ফাসিজমের প্রতিষ্ঠা। সাম্যবাদীদের মতে শ্রেণীবিভাগ না উঠে যাওয়া পর্য্যন্ত ডিমোক্রাসি সম্ভবপর নয়; ফাসিষ্টেরা গণতন্ত্রের আদর্শ পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয় মনে করে, তাদের মতে বুদ্ধি ও গুণের আভিজাত্য সমাজের শাসকশক্তি হওয়া উচিত।

ফাসিষ্ট্ মতবাদ অনুসারে এই আদর্শ নূতন সমাজ গঠন উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ নিন্দনীয় নয়। শাসনযন্ত্র অধিকার করতে হলে বিপ্লব প্রয়োজন হতে পারে—বিশেষ করে সাম্যতন্ত্র স্থাপনের আশঙ্কা থাকলে বলপ্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। সেই একই যুক্তি অনুসারে বিপ্লবের পরও দমননীতি আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। শুধু এই বলপ্রয়োগ ব্যাপারে ফাসিষ্ট্ ও কমিউনিষ্ট সত্য-সত্যই একমত বলা চলে।

নবসমাজের প্রতিষ্ঠা শুধু নূতন অভিজাত্যে নয়; ফাসিষ্ট্ কল্পনায় রাষ্ট্রশক্তির প্রতি সম্ভ্রম নবযুগের স্তম্ভস্বরূপ। ষ্টেট্ শুধু স্বার্থসিদ্ধির উপায় নয়—তার একটি আধ্যাত্মিক রূপ ও সার্থকতা আছে। ষ্টেট (অবশ্য শুধু আদর্শ ফাসিষ্ট্ রাষ্ট্রেরই কথা হচ্ছে) সমষ্টির কল্যাণের প্রতীক, বিভিন্ন ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থের বহু ঊর্দ্ধে বিরাজমান সমগ্র সমাজের মঙ্গলচিন্তার আধার। শ্রদ্ধাহীন সোশ্যালিষ্ট্ সমালোচকের মতে অবশ্য এই তথাকথিত সমষ্টির মঙ্গলচিন্তা প্রভুশ্রেণীর স্বার্থের আবরণ মাত্র।

ফাসিজ্‌ম্ যে জাতীয়তাবাদের একটি বিশেষ রূপ একথা সর্ব্বজনবিদিত। জাতীয় ঐক্য, জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় সাধনা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণে, মুসোলীনি ও হিট্‌লার উভয়ের অনুবর্ত্তীদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। ন্যাশনালিজ্‌ম্ আবার অতি সহজেই সাম্রাজ্যবাদে পর্য্যবসিত হয়। এইজন্য বিভিন্ন দেশের ফাসিস্ট্‌দের মধ্যে সদ্ভাবের সম্ভাবনা অল্প—প্রতি দলই নিজের দেশের গৌরব ও ভবিষ্যতে সেই গৌরববৃদ্ধির স্বপ্নে মগ্ন।

ফাসিজ্‌মের আর্থিক মতামত একটু জটিল। ফাসিষ্ট্ পণ্ডিতেরা একদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপুল বৃদ্ধি, মূলধনের যথেচ্ছ ব্যবহার, ব্যাঙ্কারদের দৌরাত্ম্য, যন্ত্রের নিত্যনবীন প্রসার প্রভৃতির নিন্দা করেন। পক্ষান্তরে ফাসিষ্ট্ মতবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সমাজের ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হয়েছে এবং এইখানেই সর্ব্ববিধ সোশ্যালিজ্‌মের সঙ্গে তার প্রধান ও দুস্তর পার্থক্য। ধনতন্ত্রকে পরিত্যাগ না করে সমাজের মঙ্গলের জন্য তাকে নিয়ন্ত্রিত করা ফাসিজ্‌মের আদর্শ। এই কাজ আদৌ সম্ভবপর কিনা ফাসিষ্ট্ মতবাদ সম্বন্ধে এই প্রশ্নই প্রধান জিজ্ঞাস্য।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ফাসিজ্‌ম্ অনেকাংশে পুরাতন বহু ধারণার পুনরাবৃত্তি মাত্র। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে, বিংশ শতাব্দীতে ফাসিজ্‌মের হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ কি। এর উত্তর এই যে, মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে নানাদেশে ধনতন্ত্র প্রায় বিকল হয়ে পড়েছে। ধনিকবাদের অবাধ প্রসারের ফলে আজ উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই—সমাজের আর্থিক জীবনযাত্রা আজ অচলপ্রায়। এ অবস্থায় কথা ওঠা স্বাভাবিক যে ধনতন্ত্র বজায় রাখতে গেলে নিয়ন্ত্রণ ছাড়া চলবে না। ওদিকে আবার শ্রমিক-মহলে অসন্তোষবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদ ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে। সাধারণ অবস্থায় ডিমোক্রাসি ক্ষতিকর নয়; কিন্তু ঘোর দুর্দ্দিনে ধনতন্ত্র ও তার উপর যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাকে রক্ষা করতে হ'লে সাম্যবাদীদের প্রতি বলপ্রয়োগ ও ধনিকবন্ধুদের একাধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাসে এগারো বছর আগে ইটালিতে মুসোলীনি যে পথ দেখিয়েছিলেন, আজকের দিনে হিট্‌লারের সেই পন্থানুসরণের অর্থ এই যে, জার্ম্মানিতে অনুরূপ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে।

৫

কি উপায়ে হিট্‌লারের প্রভুত্ব জার্ম্মানিতে স্থাপিত হ'ল তার বিশদ বিবরণ এখানে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে শুধু কয়েকটি কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে।

জার্ম্মানরা এখন ১৯১৯ থেকে ১৯৩০ পর্য্যন্ত এগারোটি বছরকে হ্বাইমার যুগ নামে অভিহিত করে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলির সংখ্যাধিক্য শেষোক্ত বৎসর পর্য্যন্ত বজায় ছিল, যদিও বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রিসভাগুলি গঠিত হবার ফলে সুশাসনের পথে পদে পদে বাধা উপস্থিত হত। ষ্ট্রেসমান্‌-প্রদর্শিত নীতির অনুসরণে ফ্রান্সের বৈরিতা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আর্থিক অবনতি ও গণতন্ত্রে অবিশ্বাসের যুক্ত প্রভাবে ১৯৩০ সালের মধ্যভাগে হ্বাইমার-পন্থীদের প্রাধান্য অবসান হ'ল।

১৯৩০-এর মার্চ্চ থেকে ১৯৩২ সালের জুন পর্য্যন্ত কাথলিক্‌ সেণ্টার নেতা ডক্টর ব্রুইনিং প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য চালান। এই দু'বছর রাষ্ট্রীয় মহাপরিষদে দুই বিরোধী শক্তি প্রায় সমকক্ষ থাকায় সহজভাবে রাজ্যশাসন দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ব্রুইনিং একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করলেন—প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি প্রেসিডেণ্টের সাহায্যে অর্ডিনান্সরূপে জাহির করে পরে কোনো সময় সুবিধামত রাইশষ্টাকের মত গ্রহণ করা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের মতামত ন্যাশন্যালিষ্টদলের অনুযায়ী; সেই দলভুক্ত অভিজাতদের প্ররোচনায় ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি তিনি ব্রুইনিংকে পদচ্যুত করলেন। হ্বাইমার কন্‌ষ্টিটিউশনের আশাভরসা ব্রুইনিংএর পদত্যাগের সঙ্গে নির্ম্মূল হয়।

গত বৎসরের শেষ ছ'মাস হিণ্ডেনবুর্গ ও তাঁর ন্যাশনালিষ্ট্‌ বন্ধুগণ অন্য সকল দলকে গ্রাহ্য করে রাজ্য চালাবার চেষ্টা করলেন। প্রথমে ফন্‌ পাপেন ও তার পর সেনাপতি শ্লাইশার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন—শাসনকার্য্যে মহাপরিষদের আর কোনো হাত রইল না—এমন কি প্রাশিয়ার পার্লামেণ্ট্‌ ও মন্ত্রিসভাকে পর্য্যন্ত বরখাস্ত করে এক শাসক নিযুক্ত হ'ল।

ব্রুইনিং বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে গণতান্ত্রিক শাসনরীতি পরিহার করেছিলেন—ন্যাশনালিষ্ট্‌দের কিন্তু সে বিষয়ে কোনো সঙ্কোচ ছিল না। কিন্তু শ্লাইশার ক্রমশঃ প্রেসিডেন্ট্‌ ও তার অন্তরঙ্গ অভিজাত বন্ধুদের বিরাগভাজন হয়ে পড়াতে বর্ত্তমান বছরের জানুয়ারী মাসে ব্রুইনিংএর মত তাঁকেও পদত্যাগ করতে হ'ল। গত কয়েক নির্ব্বাচনে নাৎসিদের সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখে অবশেষে ন্যাশনালিষ্ট্‌ নেতারা স্থির করলেন যে হিট্‌লারের সঙ্গে রাজনৈতিক সখ্যস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে ন্যাশনালিষ্ট্‌ ও নাৎসিদের মিলিত মন্ত্রিসভায় হিট্‌লার প্রধান মন্ত্রীরূপে দুইজন সহচরের সঙ্গে প্রবেশ করলেন।

নাৎসিদলের এই প্রথম ক্ষমতালাভ। হিণ্ডেনবুর্গ ও হুগেন্‌ব্যর্গের বিশ্বাস ছিল যে নাৎসিদের সাহায্য নেওয়া সত্ত্বেও আসল ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে পারবেন। দু'মাসের মধ্যে প্রমাণ হল হিটলার আর তাঁর দলই দেশের প্রকৃত কর্ত্তা। প্রেসিডেন্ট্‌ এখন নাৎসিদলের মুঠোর মধ্যে আর ন্যাশনালিষ্ট্‌দের অবস্থা (অন্ততঃ আপাততঃ) ধনীলোকের গরীব আত্মীয়ের মতন। তাদের প্রধান অস্ত্র—লৌহশিরস্ত্রাণবাহিনী নাৎসিদের কারসাজিতে সম্প্রতি ছত্রভঙ্গ ও তার পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে।

নাৎসি-আধিপত্যের দ্রুত প্রসার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার ফল। ক্যাপ্টেন্‌ গোয়রিং প্রাশিয়ার পুলিশ-অধ্যক্ষ হয়েই রিপাব্লিকগণ ও সোশ্যালিষ্ট্‌ পুলিশকর্ম্মচারীদের বিতাড়িত করে বা করবার ভয় দেখিয়ে নাৎসি-শক্তিকে নিরাপদ করলেন; সঙ্গে সঙ্গে নাৎসি ঝঞ্ঝাবাহিনী সরকারী সৈন্যের পদমর্য্যাদা ও অধিকার লাভ করল। ডক্টর ফ্রিক্‌ আভ্যন্তরিক সচিব নিযুক্ত হয়েই গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগে নাৎসি-কর্ত্তৃত্বের ব্যবস্থা করলেন। হিট্‌লারের আদেশে সংবাদপত্রের উপর কড়া পাহারা বসে অতি অল্পদিনে বিপক্ষের স্বাধীন মত প্রচার অসম্ভব হয়ে পড়ল। সমাজতন্ত্রী কাগজগুলির প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্যবাদী নেতারা সকলে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হলেন।

নাৎসিরা শত্রুদের নানাপ্রকার নির্য্যাতন ও বিধিমত প্রহারের ব্যবস্থা করতেও কিছুমাত্রও দ্বিধা করে নি—আর অত্যাচার রোধ করা দূরে থাক,

গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারীদের পক্ষই অবলম্বন করেন বলা যায়। অবশেষে মার্চ্চ মাসে দেশব্যাপী নির্ব্বাচনের ঠিক আগে রাইশ্‌ষ্টাকের বাড়ী হঠাৎ ভস্মীভূত হ'ল। অগ্নিকাণ্ড সাম্যবাদী ষড়যন্ত্রের ফল, এই বিশ্বাসে নির্ব্বাচনের দিন লক্ষ লক্ষ ভোটার হিটলারকে সমর্থন করে। রাইশ্‌ষ্টাক্ ধ্বংস বস্তুতঃ নাৎসিদেরই গুপ্ত কীর্ত্তি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। ইংল্যাণ্ডেও ১৯২৪ সালের নির্ব্বাচনে শ্রমিকদলের পরাজয় জিনোভিয়েভের জাল চিঠি প্রকাশের ফল—একথা অনেকে বিশ্বাস করেন।

৫ই মার্চ্চের নির্ব্বাচনে নাৎসি ও ন্যাশনালিষ্ট দল রাইশ্‌ষ্টাকের ৬৪৭টি আসনের মধ্যে ৩৪০টি অধিকার করে। তার এক সপ্তাহের মধ্যে নাৎসি কর্ত্তৃত্ব সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাশিয়া পূর্ব্ব থেকেই গোয়রিঙের করায়ত্ত হয়েছিল এখন জার্ম্মনির অন্য রাজ্যগুলির প্রত্যেকটির উপর এক একজন নাৎসি অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছে। ২৩শে মার্চ্চ তারিখে নূতন রাইশষ্টাক্ আগামী চার বৎসরের জন্য রাজ্য শাসনের সকল ভার হিট্‌লারকে সমর্পণ করে এক আইন বিধিবদ্ধ করল। তার আগেই সাম্যবাদিদলকে বেআইনী ঘোষণা ও তারপরে ট্রেড-ইউনিয়নগুলির উচ্ছেদ সাধন শ্রমিকদের রাষ্ট্রিক ক্ষমতাকে ধ্বংস করেছে।

জার্ম্মানির শাসনপদ্ধতির এই বিশাল পরিবর্ত্তনকে বিপ্লব নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। যত সহজে এই নূতন বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে সত্যসত্যই বিস্মিত হ'তে হয়। নাৎসিদের দৃঢ়সঙ্কল্প ও দক্ষতা সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা ছিল দেখা যাচ্ছে। নির্য্যাতনের ভয়ে বহুলোক আজ মৌন তবুও জার্ম্মানির বিরাট শ্রমিক আন্দোলনের এই পরিণতি বাস্তবিক আশ্চর্য্যজনক। সাম্যবাদীরা নাৎসিদলের শক্তিসামর্থ্য সামান্য জ্ঞানে সোশ্যাল ডিমোক্রাট্‌দের সমালোচনায় সময় অতিবাহিত করেছিল; সোশ্যাল ডিমোক্রাটেরা অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে সোশ্যালিজম্-প্রতিষ্ঠার সকল ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে দিন কাটাবার সাধনায় বহুদিন যাবৎ সিদ্ধিলাভ করেছে। জার্ম্মান শ্রমিকদের দৌর্ব্বল্য ও নিরীহতা নাৎসি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৬

নাৎসিদের আধিপত্য জার্ম্মানির নবজীবনের সূচনা কিনা এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে। হিটলারের যাদুস্পর্শে কি দুঃখের দিন সত্যই শেষ হ'ল? যে কারণে এ সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ হয় তারই আলোচনায় এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

দেশব্যাপী নির্য্যাতনের সত্যতা সম্বন্ধে মন নিঃসন্দেহ হ'লেও তার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়ত অনুচিত। বিপ্লবের সময় কিছু পরিমাণ অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক রাশিয়া ও ইটালি এবং পূর্ব্বযুগের ফ্রান্সের বিপ্লব-গুলির কথা ভোলা অন্যায়। শুধু জার্ম্মান সোশ্যালিষ্টদের উপর কোনো বলপ্রয়োগ হচ্ছে না একথা বোঝাবার জন্য নাৎসি কাগজগুলির ও ডক্টর গোয়েবল্‌স্ প্রভৃতি নেতাদের প্রয়াস হাস্যোদ্রেক করে। বিদেশী পত্রিকা-গুলিতে মাঝে মাঝে যে চিঠিপত্র নাৎসি প্রোপাগাণ্ডার সাক্ষ্য দেয় তার অধিকাংশই শিশুসুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

মার্ক্সপন্থিগণ সম্ভবতঃ নাৎসিদের কাছে দয়ার প্রত্যাশা করে না! কিন্তু য়িহুদি বিদ্বেষের প্রবল বন্যা যে কি ভাবে নূতন যুগ সৃষ্টি করছে বোঝা শক্ত। য়িহুদিদের জার্ম্মান্‌-সভ্যতায় কোনো দান নেই একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা—ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে জার্ম্মান পরিশীলন-সম্পদ যুগে যুগে এরা পুষ্ট করেছে। এখনও আটজন জার্ম্মান য়িহুদি রয়েছেন যাঁরা নোবেল্‌ প্রাইজ লাভ করে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। জার্ম্মান য়িহুদিদের জার্ম্মানি ছাড়া অন্য স্বদেশ নেই। অবশ্য যুদ্ধের পর বহু য়িহুদি জার্ম্মানিতে প্রবেশ লাভ করেছে সত্য কিন্তু পনেরো বছর ধরে যে দেশ বিদেশস্থিত জার্ম্মানদের প্রতি খারাপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ জানিয়েছে, আপনার সীমার ভিতর অনুরূপ ব্যবহার তার পক্ষে শোভা পায় না। আর নর্ডিক শ্রেষ্ঠতার আস্ফালনও বিংশশতাব্দীতে অশোভন মনে হয়। নাৎসি আমলে জার্ম্মানিতে শান্তির চেয়ে হিংসা ও ঈর্ষাই বেশী প্রকাশ পাচ্ছে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের যে সম্পূর্ণ অবসান হয়েছে সে কথাও বলা চলে না; শত্রুদের কথা ছেড়ে দিলেও ন্যাশনালিষ্ট্‌ ও নাৎসিদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের

কথা ওঠে। কাইজারের পুনরাগমন বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত হিটলার কি সিদ্ধান্ত করবেন ? ক্যাথলিকদের সঙ্গে সম্পর্ক কি রকম দাঁড়াবে ? বিভিন্ন স্তরের নাৎসিদের ঐক্য কি বরাবর বজায় থাকবে ?

ইতিমধ্যেই আধুনিক জার্ম্মানি সম্বন্ধে অনেকের মত পরিবর্ত্তন হয়েছে। মহাযুদ্ধের পর নানাদেশে নানা লোক জার্ম্মানির দুঃখে সমবেদনা বোধ করেছিলেন। নাৎসি-বিপ্লবের পর সে সহানুভূতি হ্রাস হতে পারে। এমন প্রশ্নও ওঠা বিচিত্র নয় যে ফ্রান্সের জার্ম্মান-ভীতি কি সত্যই অমূলক ?

নাৎসিদের আধিপত্যের ফলে ইউরোপে যুদ্ধের সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হয়েছে। ভের্সাই সন্ধির আমূল সংস্কার কি বিনাযুদ্ধে সম্ভব ? রণসজ্জার স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব স্পষ্টতর করে তুলতে পারে। ফাসিষ্ট প্রভাবে জাতীয় মনোভাব ও সাম্রাজ্যবাদ অধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করে—তার ফল বিষময় হওয়া আশ্চর্য্য কি ? ফাসিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যেও সঙ্ঘর্ষ হওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু আর্থিক সমস্যাই নাৎসিদের প্রধান বিপদ। নাৎসিদলের গঠনই এমন যে কোনো সুস্পষ্ট আর্থিক নীতির অনুসরণ তাদের পক্ষে দুষ্কর। বর্ত্তমান দুরবস্থার অনেক কারণ জার্ম্মানিতে সীমাবদ্ধ নয়। তার কোনো প্রতিকার হিটলারের দ্বারা সাধিত না হ'লে অবসাদ ও নৈরাশ্য আসতে বাধ্য। জার্ম্মানির মত ব্যবসাপ্রধান দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে বহুদিন দমিত রাখা দুঃসাধ্য। তাদের পূর্ণ সন্তোষ বিধান করতে হ'লে নাৎসি মতবাদের আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

মুসোলীনি অবশ্য অনেকাংশে কৃতকার্য্য হয়েছেন কিন্তু সে সাফল্যও আপেক্ষিক ; ইটালির সমস্যা ভবিষ্যতে তীব্রতর হবে। কিন্তু হিটলারের পথে বিঘ্ন অনেক বেশী—নাৎসিদের অনেক সমস্যার অস্তিত্ব ইটালিতে ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত সকল বাধাবিপত্তির উপর জয়ী হতে পারলে হিটলারকে অতিমানব ব'লে স্বীকার করতে হবে। সেইজন্য জার্ম্মানির দুরবস্থার অবসান এখনও স্বপ্নমাত্র মনে হয়।

শ্রীসুশোভন সরকার

সাহিত্যের মাত্রা

বর্ত্তমান যুগে পূর্ব্ব-যুগের থেকে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়েচে তা নিয়ে তর্ক হতে পারে না। এখনকার মানুষ জীবনের যে-সব সমস্যা পূরণ করতে চায় তার চিন্তা-প্রণালী প্রধানত বৈজ্ঞানিক, তার প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে, এই জন্যে তার মননবস্তু জমে উঠ্‌চে বিচিত্ররূপে এবং প্রভূত পরিমাণে। কাব্যের পরিধির মধ্যে তার সম্পূর্ণ স্থান হওয়া সম্ভবপর নয়। সাবেক কালে তাঁতি যখন কাপড় তৈরি করত তখন চরকায় সুতো কাটা থেকে আরম্ভ করে কাপড় বোনা পর্য্যন্ত সমস্তই সরল গ্রাম্য-জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলত। বিজ্ঞানের প্রসাদে আধুনিক বাণিজ্য-পদ্ধতিতে চলচে প্রভূত পণ্য উৎপাদন। তার জন্যে প্রকাণ্ড ফ্যাক্‌টরির দরকার। চারদিকের মানব-সংসারের সঙ্গে তার সহজ মিল নেই। এই জন্যে এক-একটা কারখানার সহর পরিস্ফীত হয়ে উঠ্‌চে, ধোঁয়াতে কালিতে যন্ত্রের গর্জ্জনে ও আবর্জ্জনায় তারা জড়িত বেষ্টিত, সেই সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ বিস্ফোটকের মতো দেখা দিয়েচে মজুর-বস্‌তি। একদিকে বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্‌গার করচে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড, অন্য দিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে গন্ধে দৃশ্যে স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠচে। এর প্রবলত্ব ও বৃহত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারখানা-ঘরের সেই প্রবলত্ব ও বৃহত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েচে উপন্যাসে, তার ভূরি আনুষঙ্গিকতা নিয়ে। ভালো লাগুক মন্দ লাগুক আধুনিক সভ্যতা আপন কারখানা-হাটের জন্যে সুপরিমিত স্থান নির্দ্দেশ করতে পারচে না। এই অপ্রাণ পদার্থ বহু শাখায় প্রকাণ্ড হয়ে উঠে প্রাণের আশ্রয়কে দিচ্চে কোণ-ঠাসা করে। উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েচে। বল্‌তে পারো বর্ত্তমানে এটা অপরিহার্য্য, তাই বলে বলতে পারো না এটা সাহিত্য। হাটের জায়গা প্রশস্ত করবার জন্যে মানুষকে ঘর ছাড়তে হয়েচে, তাই বলে বলতে পারোনা সেটাই লোকালয়।

এখনকার মানুষের প্রবৃত্তি বুদ্ধিগত সমস্যার অভিমুখে, সে কথা অস্বীকার করব না। তার চিন্তায় বাক্যে ব্যবহারে এই বুদ্ধির আলোড়ন চল্‌চে। চসরের ক্যাণ্টরবরি টেল্‌সে তখনকার কালের মানব-সংসারের

পরিচয় প্রকাশ পেয়েচে। এখনকার মানুষের মধ্যে যে, সেই পরিচয় একেবারেই নেই তা নয়। অনুভাবের দিকে অনেক পরিমাণে আছে, কিন্তু চিন্তার মানুষ তার সেদিনকার গণ্ডি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। অতএব ইদানীন্তন সাহিত্যে যখন মানুষ দেখা দেয়, তখন ভাবে বলায় চলায় সেদিনকার নকল করলে সম্পূর্ণ অসঙ্গত হবে। তার জীবনে চিন্তার বিষয় সর্ব্বদা উদ্যত হয়ে উঠবেই। অতএব আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই। তা হোক, তবু সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন। অর্থাৎ রস-সম্ভোগের যে-নিয়ম আছে, তা মানুষের নিত্য-স্বভাবের অন্তর্গত। যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুনতে চইবে যদি প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না সজীব মানবচরিত্র। আমরা তাকে একান্ত সত্যরূপে চিনতে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তিটা আছে সে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎসুক। কিন্তু কালের গতিকে আমার সেই ব্যক্তি হয়তো অতিমাত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পলিটিক্সে। তাই হয়তো সাহিত্যেও ব্যক্তিকে সে গৌণ করে দিয়ে আপন মনের মতো পলিটিকসের বচন শুনতে পেলে পুলকিত হয়ে ওঠে। এমনতরো মনের অবস্থায় সাহিত্যের যথোচিত যাচাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারিনে। অবশ্য গল্পে পলিটিকস্‌প্রবণ কোনো ব্যক্তির চরিত্র যদি আঁকতে হয় তবে তার মুখে পলিটিকসের বুলি দিতেই হবে, কিন্তু লেখকের আগ্রহটা যেন বুলি-জোগান দেওয়ার দিকে না ঝুঁকে প'ড়ে চরিত্র-রচনের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। চরিত্র-সৃষ্টিকে গৌণ রেখে বুলির ব্যবস্থাকেই মুখ্য করা এখনকার সাহিত্যে যে এত বেশী চড়াও হয়ে উঠচে তার কারণ আধুনিক কালে জীবন-সমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা করার কাজে এই যুগের মানুষ অত্যন্ত বেশী ব্যস্ত। এই জন্যে তাকে খুসি করতে দরকার হয় না যথার্থ সাহিত্যিক হবার। প্রহ্লাদ বর্ণমালা শেখবার সুরুতেই ক অক্ষরের ধ্বনি কানে আসবামাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করেই অভিভূত হয়ে পড়লো। তাকে বোঝানো আবশ্যক যে বিশুদ্ধ বর্ণমালার তরফ থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, ক অক্ষর কৃষ্ণ শব্দেও যেমন আছে তেমনি কোকিলেও আছে,

কাকেও আছে, কলকাতাতেও আছে। সাহিত্যে তত্ত্বকথাও তেমনি, তা নৈর্ব্যক্তিক, তাকে নিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লে চরিত্রের বিচার আর এগোতে চায় না। সেই চরিত্ররূপই রসসাহিত্যের, অরূপ তত্ত্ব রসসাহিত্যের নয়।

মহাভারত থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। মহাভারতে নানা কালে নানা লোকের হাত পড়েচে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক্ থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুৎ গড়ন বলেই টিঁকে আছে। এটা স্পষ্টই দেখা যায় ভীষ্মের চরিত্র ধর্ম্মনীতিপ্রবণ—যথাস্থানে আভাসে ইঙ্গিতে, যথাপরিমাণ আলোচনায়, বিরুদ্ধ চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এই পরিচয়টি প্রকাশ করলে ভীষ্মের ব্যক্তিরূপ তাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার কথা। কাব্য পড়বার সময় আমরা তাই চাই। কিন্তু দেখা যাচ্চে কোনো এক কালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতিপ্রবল ছিল। এইজন্যে পাঠকের বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ এক পর্ব্ব জুড়ে নীতি কথায় প্লাবিত করে দিলেন। তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়। এখনকার উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা করো। মুস্কিল এই যে এই সকল নীতিকথা তখনকার কালের চিত্তকে যে রকম সচকিত করেছিল এখন আর তা করে না; এখনকার বুলি অন্য, সেও কালে পুরাতন হয়ে যাবে। পুরাতন না হলেও সাহিত্যে যে-কোনো তত্ত্ব প্রবেশ করবে, সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য সত্ত্বেও সাহিত্যের পরিমাণ লঙ্ঘন করলে, তাকে মাপ করা চলবে না। ভগবদগীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন হবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহই অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক-প্রণালী আছে, কিন্তু সৎ কথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েচে বল্‌লে গীতাকে খর্ব্ব করা হয় না।

যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামায়ণে রামের যে-দেখা পাওয়া গেছে সেটাতে রামের চরিত্রই প্রকাশিত। তার মধ্যে ভালো দিক আছে, মন্দ দিক

আছে, আত্মখণ্ডন আছে। দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে। রাম যদিও প্রধান নায়ক তবু শ্রেষ্ঠতার কোনো কাল-প্রচলিত বাঁধা নিয়মে তাঁকে অস্বাভাবিক রূপে সুসঙ্গত করে সাজানো হয়নি। অর্থাৎ কোনো একটা শাস্ত্রীয় মতের নিখুঁৎ প্রমাণ দেবার কাজে তিনি পাঠক-আদালতে সাক্ষী-রূপে কাঠগড়ায় দাঁড়াননি। পিতৃসত্য রক্ষা করার উৎসাহে পিতার প্রাণনাশ যদিবা শাস্ত্রিক বুদ্ধি থেকে ঘটে থাকে, বালিকে বধ না শাস্ত্রনৈতিক না ধর্ম্মনৈতিক। তারপরে বিশেষ উপলক্ষ্যে রামচন্দ্র সীতা-সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উপরে যে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেছিলেন সেটাতেও শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বজায় থাকেনি। বাঙালী সমালোচক যে রকম আদর্শের ষোলো আনা উৎকর্ষ যাচাই ক'রে সাহিত্যে চরিত্রের সত্যতা বিচার ক'রে থাকে সে আদর্শ এখানে খাটে না। রামায়ণের কবি কোনো একটা মতসঙ্গতির লজিক দিয়ে রামের চরিত্র বানাননি, অর্থাৎ সে চরিত্র স্বভাবের, সে চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র ওকালতির নয়।

কিন্তু উত্তরকাণ্ড এলো বিশেষ কালের বুলি নিয়ে; কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে মারে তেমনি করে চরিত্রকে দিলে মেরে। সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রব্লেম। সে যুগে ব্যবহারের যে আটঘাট বাঁধবার দিন এলো, তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সত্ত্বেও সীতাকে বিনা প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না। সেটা যে অন্যায় এবং লোকমতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তার অগ্নিপরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েচে। সেই বাহবার জোরে ঐ জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।

আজকের দিনের একটা সমস্যার কথা মনে করে দেখা যাক। কোনো পতিব্রতা হিন্দু-স্ত্রী মুসলমানের ঘরে অপহৃত হয়েচে। তারপরে তাকে পাওয়া গেল। সনাতনী ও অধুনাতনী লেখক এই প্রব্লেমটাকে নিয়ে আপন পক্ষের সমর্থন রূপে তাঁদের নভেলে লম্বা লম্বা তর্ক স্তূপকার করে

তুলতে পারেন। এরকম অত্যাচার কাব্যে গর্হিত কিন্তু উপন্যাসে বিহিত এমনতর একটা রব উঠেচে। খাঁটি হিঁদুয়ানী রক্ষার ভার হিন্দু মেয়েদের উপর, কিন্তু হিন্দু পুরুষদের উপর নয় সমাজে এটা দেখতে পাই। কিন্তু হিঁদুয়ানী যদি সত্য পদার্থই হয় তবে তার ব্যত্যয় মেয়েতেও যেমন দোষাবহ পুরুষেও তেমনি। সাহিত্য-নীতিও সেইরকম জিনিষ। সর্ব্বত্রই তাকে আপন সত্য রক্ষা করে চলতে হবে। চরিত্রের প্রাণগত রূপ সাহিত্যে আমরা দাবী করবই, অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে তবে তার বুদ্ধিগত মূল্য যতই থাক্ তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে। নভেলে কোনো একজন মানুষকে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই বইখানাকে এম, এ, পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর পত্র করে তোলা চাই এমন কোনো কথা নেই। গল্পের বইয়ে যাঁদের থীসিস্ পড়ার রোগ আছে আমি বলব সাহিত্যের পদ্মবনে তাঁরা মত্ত হস্তী। কোনো বিশেষ চরিত্রের মানুষ মুসলমানের ঘর থেকে প্রত্যাহৃত স্ত্রীকে আপন স্বভাব অনুসারে নিতেও পারে, না নিতেও পারে, গল্পের বইয়ে তার নেওয়াটা বা না-নেওয়াটা সত্য হওয়া চাই, কোনো প্রব্লেমের দিক থেকে নয়।

প্রাণের একটা স্বাভাবিক ছন্দোমাত্রা আছে ; এই মাত্রার মধ্যেই তার স্বাস্থ্য সার্থকতা তার শ্রী। এই মাত্রাকে মানুষ জবরদস্তি করে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। তাকে বলে পালোয়ানি, এই পালোয়ানি বিস্ময়কর, কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয় সুন্দর ত নয়ই। এই পালোয়ানি সীমা-লঙ্ঘন করবার দিকে তাল ঠুকে চলে, দুঃসাধ্য সাধনও করে থাকে কিন্তু এক জায়গায় এসে ভেঙে পড়ে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ভাঙনের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেচে। সভ্যতা স্বভাবকে এতদূরে ছাড়িয়ে গেছে যে কেবলি পদে পদে তাকে সমস্যা ভেঙে ভেঙে চলতে হয়, অর্থাৎ কেবলি সে করচে পালোয়ানি। প্রকাণ্ড হয়ে উঠচে তার সমস্ত বোঝা এবং স্তূপাকার হয়ে পড়চে তার আবর্জ্জনা। অর্থাৎ মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে সাধনা করা চলচে। আজ হঠাৎ দেখা যাচ্চে কিছুতেই তাল পৌঁচচ্চে না শমে। এতদিন দূন চৌদূনের বাহাদুরি নিয়ে চলছিল মানুষ, আজ অন্তত অর্থনীতির দিকে বুঝতে পারচে বাহাদুরিটা

সার্থকতা নয়,—যন্ত্রের ঘোড়দৌড়ে একটা একটা করে ঘোড়া পড়চে মুখ থুবড়িয়ে। জীবন এই আর্থিক বাহাদুরির উত্তেজনায় ও অহঙ্কারে এতদিন ভুলেছিল যে গতি-মাত্রার জটিল অতিকৃতির দ্বারাই জীবনযাত্রার আনন্দকে সে পীড়িত করচে, অসুস্থ হয়ে পড়েচে আধুনিক অতিকায় সংসার, প্রাণের ভার-সাম্যতত্ত্বকে করেচে অভিভূত।

পশ্চিম মহাদেশের এই কায়াবহুল অসঙ্গত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেচে সাহিত্যে। কবিতা হয়েচে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেচে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা করে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল কস্‌রতের কাজে লেগেচে। তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড। অর্থাৎ এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়; বিস্ময়করর‍ূপে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল; প্রয়োজন-সাধকও হতে পারে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণবান নয়। পৃথিবীর অতিকায় জন্তুগুলো আপন অস্থিমাংসের বাহুল্য নিয়ে মরেচে, এরাও আপন অতি-মিতির দ্বারাই মরচে। প্রাণের ধর্ম্ম সুমিতি, আর্টের ধর্ম্মও তাই। এই সুমিতিতেই প্রাণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ, এই সুমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা। লোভ পরিমিতিকে লঙ্ঘন করে, আপন আতিশয্যের সীমা দেখতে পায় না, লোভ উপকরণবতাং জীবিতং যা, তাকেই জীবিত বলে অমৃতকে বলে না। উপকরণের বাহাদুরি তার বহুলতায়; অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে। আর্টেরও অমৃত আপন সুপরিমিত সামঞ্জস্যে, তার হঠাৎ-নবাবী আপন ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্ অত্যাড়ম্বরে, সেটা যথার্থ আভিজাত্য নয়, সেটা স্বল্পায়ু মরণধর্ম্মী। মেঘদূত কাব্যটি প্রাণবান, আপনার মধ্যে ওর সামঞ্জস্য সুপরিমিত। ওর মধ্যে থেকে একটা তত্ত্ব বের করা যেতে পারে, আমিও এমন কাজ করেচি কিন্তু সে তত্ত্ব অদৃশ্যভাবে গৌণ। রঘুবংশ কাব্যে কালিদাস স্পষ্টই আপন উদ্দেশ্যের কথা ভূমিকায় স্বীকার করেচেন। রাজধর্ম্মের কিসে গৌরব কিসে তার পতন কবিতায় এইটের তিনি দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছেন। এইজন্য সমগ্রভাবে দেখতে গেলে রঘুবংশ কাব্য আপন ভারবাহুল্যে অভিভূত, মেঘদূতের মত তাতে রূপের সম্পূর্ণতা নেই। কাব্যহিসাবে কুমারসম্ভবের যেখানে থামা উচিত সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু

লজিক হিসাবে প্রব্লেম হিসাবে ওখানে থামা চলে না। কার্ত্তিক জন্মগ্রহণের পরে স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই প্রব্লেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টে দরকার নেই প্রব্লেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকে সম্পূর্ণ করাই তার কাজ। প্রব্লেমের গ্রন্থি মোচন ইন্‌টেলেক্‌টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টি-শক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট এই কল্পনার এলেকায় থাকে লজিকের এলেকায় নয়।

তোমার চিঠিতে তুমি আমার লেখা গোরা ঘরে বাইরে প্রভৃতি নভেলের উল্লেখ করেচ। নিজের লেখার সমালোচনা করবার অধিকার নেই, তাই বিস্তারিত করে কিছু বলতে পারব না। আমার ঐই দুটি নভেলে মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে সে কথা কবুল করতেই হবে। সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে সেগুলি জায়গা পেয়েচে, না জায়গা জুড়েচে। আহার্য্য জিনিষ অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে। কিন্তু ঝুড়িতে করে যদি মাথায় বহন করা যায় তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন-সাধন হতে পারে কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন হয় না। গোরা গল্পে তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম যতই হোক না সে নিন্দনীয়। আলোচনার সামগ্রীগুলি গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে তবে প্রব্লেমে ও প্রাণে প্রবন্ধে ও গল্পে জোড়াতাড়া জিনিষ সাহিত্যে বেশী দিন টিঁকবে না। প্রথমত আলোচ্য তত্ত্ববস্তুর মূল্য দেখতে দেখতে কমে আসে, তারপরে সে যদি গল্পটাকে জীর্ণ করে ফেলে তাহলে সবসুদ্ধ জড়িয়ে সে আবর্জ্জনারূপে সাহিত্যের আঁস্তাকুড়ে জমে ওঠে। ইব্‌সেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায়নি কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসেনি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে? মানুষের প্রাণের কথা চির-কালের আনন্দের জিনিষ, বুদ্ধিবিচারের কথা বিশেষ দেশকালে যত নতুন হয়েই দেখা দিক্ দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়। তখনো সাহিত্য যদি তাকে ধরে রাখে তাহলে মৃতের বাহন হয়ে তার দুর্গতি ঘটে। প্রাণ কিছু পরিমাণ অপ্রাণকে বহন করেই থাকে যেমন আমাদের বসন্ আমাদের

ভূষণ, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে রফা করে চলবার জন্যে তার ওজন প্রাণকে যেন ছাড়িয়ে না যায়। য়ুরোপে অপ্রাণের বোঝা প্রাণের উপর চেপেচে অতি পরিমাণে; সেটা সইবে না। তার সাহিত্যেও সেই দশা। আপন প্রবল গতিবেগে য়ুরোপ এই প্রভূত বোঝা আজও বইতে পারচে, কিন্তু বোঝার চাপে এই গতির বেগ ক্রমশ কমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। অসঙ্গত অপরিমিত প্রকাণ্ডতা প্রাণের কাছ থেকে এত বেশী মাশুল আদায় করতে থাকে যে একদিন তাকে দেউলে করে দেয়। *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* পত্রখানি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রসঙ্গে *

সে আজ আঠারো বৎসরের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধক্রমে আচার্য্য শীল মহাশয় কলেজ পরিদর্শক হিসাবে একবার প্রেসিডেন্সী কলেজে আসেন। সেই তাঁহাকে প্রথম দেখি—কলেজের তিনতালায় বাঁ দিক্‌কার দর্শনানুশীলনীর (Philosophy Seminar) ঘরে। যাঁহার তত্ত্বাবধানে আমাদের এই দর্শনানুশীলন নিয়মিত সভা-সমিতিক্রমে চলিত, সেই অধ্যাপক মহাশয় সাদরে শীল মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিয়া এই সকল সভার প্রতিবেদন তৎসমীপে উপস্থাপিত করিলেন। আমরা তখন অজ্ঞাত বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার মতামতের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। অচিরেই শীল মহাশয় সেই বিবৃতি পাঠ করিয়া ব্যাপারখানি বুঝিতে পারিলেন; পঠিত প্রবন্ধগুলির আয়তনের তুলনায় সমালোচনা-ভাগের ক্ষীণতা উপলব্ধি করিয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমাদের অধ্যাপক মহাশয়ের দিকে চাহিলেন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার নীরব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "এই দেখুন, আমি ঠিক এই বিষয়েই এদের কত বলেছি, কিন্তু কিছুতেই এই সমালোচনার বিষয়ে ছেলেদের আগ্রহ জাগে না। এদের কিরকম একটা জড়তা বা আত্মগোপনের ভাব—"। কথাটা একরকম কাড়িয়া লইয়াই যেন ভাবাবেশে শীল মহাশয় বলিয়া উঠিলেন "না, তা কেন হবে? যে দেশে প্রথম ওঙ্কার মন্ত্র উচ্চারিত এবং অধ্যাত্মবাদ প্রথম প্রচারিত হয়েছে, সে দেশের

* বিগত ১৩৩৮ সালের চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় "আচার্য্য শীলের প্রশ্নোত্তর" শীর্ষকপ্রবন্ধে সুপণ্ডিত দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্পর্কে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আচার্য্যদেবের গুণানুরাগী ও পাণ্ডিত্যমুগ্ধ সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কথাগুলি গভীরব্যঞ্জনাপূর্ণ এবং আচার্য্য মহাশয়ের জীবনীর পরিচায়ক। তাঁহার জ্ঞানসাধনার যে অন্তর্মুখীন দিক্ লোকচক্ষুর অন্তরালে এতদিন সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছিল তাহার উপরেও ইহাতে আলোকপাত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের অনুক্রমণিকা ও পাদটীকা হিসাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

সাধন-মন্ত্র হচ্ছে আত্মপ্রচার বা আত্মপ্রতিষ্ঠা—অবশ্য নীটশের কদর্থে এর অপপ্রয়োগ হলেও—আত্মগোপন বা আত্মবিলোপ তা কখনই হতে পারে না।" ("In this very land of ours, the land of the *Atman*, it is not self-denial or self-effacement but self-recognition or self-assertion—not, however in the Nietzschean sense—that is to be the guiding principle of our daily life")। কথাগুলি তদানীন্তন ভাবপ্রবণ তরুণচিত্তে যে রেখাপাত করিয়াছিল তাহা আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট্ বিভাগে দর্শনশাখার ক্লাসগুলিতে শীল মহাশয়ের সহিত আরও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পাইলাম। এখানে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাই আমাদের দর্শনানুরাগের প্রধান লক্ষ্য ও উপজীব্য হইল। একদিকে যেমন তাঁহার তীক্ষ্ণ মনীষা বিচার ও বিশ্লেষণে প্রকাশ পাইত, অপরদিকে তাঁহার অব্যাহত ব্যাপক ও সমন্বয়দৃষ্টিতে তদীয় অলোকসামান্য প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যাইত। অধ্যাপনা প্রসঙ্গে যখনই হিন্দু মনের সহজ সমন্বয়মুখী প্রতিভার ("the synthetic genius of the Hindus") উল্লেখ করিতেন, তখন স্বতঃই তাঁহাকে এই প্রতিভার জীবন্ত প্রতিভূ বলিয়া মনে হইত। এই আদর্শের অনুকল্পেই আচার্য্য মহাশয় তুলনামূলক সমালোচনা—প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের চিন্তাধারার তুলনা—আগ্রহসহকারে তাঁহার সমস্ত অধ্যাপনায় প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই সমালোচনা-পদ্ধতি কেবল ভাববিলাস বা খেয়াল মাত্র ছিল না। ইহা তাঁহার দার্শনিকদৃষ্টি-প্রসূত ও তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গিসম্পর্কে অনুস্যূত ছিল। এইজন্য একদিন তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনের এই একটি ঐকান্তিক কামনা—যেন এমন একটি দার্শনিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যাইতে পারি যাহা কেবলমাত্র চিরাগত 'টোল' প্রথানুসারেই দর্শনালোচনা ও অধ্যাপনা করিবেনা পরন্তু তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা জগতের জ্ঞানসম্ভার আয়ত্ত করিতে পারিবে।" এই তুলনামূলক সমালোচনার যে অপব্যবহারও হইতে পারে সে সম্বন্ধে তিনিও

অনবহিত ছিলেন না এবং আমাদেরও অনেক সময়ে সাবধান করিয়া বলিতেন, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তাধারার তুলনা করিতে গিয়া তাহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য ও মূলগত ঐক্য দেখিয়া কখনও সিদ্ধান্ত করিয়া বসিও না যে একটি অপরটির প্রতীক বা প্রতিধ্বনি মাত্র। অবধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে ঐক্যের পটভূমিকার উপরে বৈশিষ্ট্যের বা অনৈক্যের রেখাগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।" এই বিশ্বাসই তাঁহার অধ্যাপনা-পদ্ধতির প্রাণস্বরূপ ছিল। জগতের সমস্ত জ্ঞানসাধনার রাজ্যে তাঁহার অবাধ ও সাবলীল গতি থাকা সত্ত্বেও কম্পাসের কাঁটার মত তাঁহার চিত্ত ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্যে স্থিরনিবদ্ধ থাকিত। এক এক সময় আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিতেন, "লোকের বিশ্বাস যে আমি অধ্যাপনাপ্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সহিত প্রতীচ্যের দর্শনের তুলনা করিতে গিয়া অনেক সময় স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করি, বা যাহা কস্মিন্ কালেও ভারতীয় দার্শনিকগণ কল্পনা করিতে পারেন নাই এমন অনেক জিনিস তাঁহাদের উপরে আরোপ করি। তোমরাই অনুধাবন করিয়া দেখ, বস্তুতঃ আধুনিক দর্শনজগতের মুখ্য প্রশ্নগুলির সমাধান এই সব প্রাচীন গ্রন্থকারগণ করিয়া গিয়াছিলেন কিনা।" সত্যই এক এক সময় তিনি যখন ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য বা রামানুজ-ভাষ্য কিংবা ধর্ম্মরজোধ্বরীন্দ্রের 'বেদান্ত পরিভাষা' গ্রন্থের অধ্যাপনাপ্রসঙ্গে প্রতীচ্যজগতের আধুনিকতম দার্শনিকদিগের সহিত ভারতীয় মনীষিগণের ভাবগত নিগূঢ় ঐক্য সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেন, তখন আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে তাহা শুনিয়া যাইতাম ও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতাম। তবে যে স্বকর্ণে এসব ব্যাখ্যা শুনে নাই তাহার পক্ষে উপরোক্ত সংশয় অমূলক নহে।

আচার্য্য শীল মহাশয়ের প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় এই ভারতীয় দর্শনবিভাগের ক্লাসগুলিতে পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইত। এখানে আচার্য্য ও শিষ্যদিগের মধ্যে এমন একটা ভাবগত ঐক্য—'ভাবৈকরসম্'—সৃষ্ট হইত যে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মুখ বিমল জ্ঞানানন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিত। তখন অনেক সময়ই মনে হইত বাক্য ও মনের উপরেও এক অধ্যাত্মলোক আছে যেখানে তর্ক বা বাদানুবাদের কোনও প্রসার নাই—

যাহার সম্বন্ধে কেবল বলা যায়—"It is Spirit that bears witness to Spirit"।

এক এক সময় দেখিয়াছি এই জ্ঞানতপস্বী ভাবাবেশে তদ্গতচিত্ত হইয়া পুস্তকখানি সম্মুখে রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে তখন দেখিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথাগুলির সার্থকতা বুঝিতে পারিতাম—'Disturbed with the joy of elevated thoughts'।

কখনও মনে হইয়াছে তিনি যেন কোন্ এক স্বরচিত মানসলোকে বৈদান্তিক ব্রহ্মের মত 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ' অবস্থায় রহিয়াছেন, যেখানে বিশ্বের সমস্ত রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন; কিন্তু অভিমন্যুর মত এই জ্ঞানব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিবার মন্ত্র তাঁহার জানা নাই। আবার মনে হইয়াছে জগতের সকল সত্যদ্রষ্টা এবং শিল্পস্রষ্টার ইহাই স্বরূপ—তাই বোধ হয় ব্রাউনিং বলিয়াছিলেন—

"But God has a few of us whom He whispers in the ear;
The rest may reason and welcome: 'tis we musicians know"

কিন্তু যখনই আচার্য্য ও শিষ্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে তখনই দেখিয়াছি উভয়ের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব ভাববিনিময় ও নৈকট্য। তখন সেই Abt Voglerএর ভাষাতেই বলিতে হইয়াছে ঃ

"And the emulous heaven yearned down, made effort to reach the earth,
As the earth had done her best, in my passion, to scale the sky."

কিন্তু আচার্য্য শীল মহাশয়ের বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বসাধারণোদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে এই প্রকার সফলতা কখনও দেখা যায় নাই। এই বক্তৃতাগুলির প্রথম দিকে প্রথমতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীর উৎসাহ ষোলো আনা মাত্রায় দেখা যাইত। ক্রমশঃ শ্রোতৃসংখ্যা কমিতে থাকিত, অবশিষ্টেরাও জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি বক্তার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। এইরূপে ক্ষীয়মান শ্রোতৃ সংখ্যা দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া একদিন শীল মহাশয় বলিয়াছিলেন "এ বক্তৃতাগুলি যদি আমি কেম্‌ব্রিজ বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতাম তবে নানাস্থান হইতে উৎসুক বিদ্যার্থিগণ দলে দলে আসিয়া শুনিত। তোমরা এগুলি এত সস্তায়

পাও বলিয়া ইহার মূল্য বোঝ না।” দুঃখের বিষয়, এই আক্ষেপ বা শ্লেষ কোনটারই আশানুরূপ ফল ফলিল না। শেষে যাহাতে শূন্যগৃহে বক্তৃতার অধিবেশন করিতে না হয় সেজন্য অচিরেই ভারতীয় দর্শন বিভাগের ছাত্রদের সেই বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা হইল।

ইহার দশ বৎসর পরে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে দুইবার আচার্য্য শীল মহাশয়ের সহিত দেখা হয়। এ সময়ে তিনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ মহীশূরের কর্ম্মবহুল জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রথমবার যখন দেখা হয় তখন বিদেশে কি কি কাজ করিয়াছিলাম তাহার বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তিনি কথা-প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের আলোচনা উত্থাপন করিলেন, এবং বলিলেন “দেখ, ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেকেই লিখেছেন বটে কিন্তু কেউই তার spiritটা ধরতে পারেন নি।” অন্য প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়াতে কথাটা একরকম চাপা পড়িয়া গেল, কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য ছিল আচার্য্য মহাশয়ের এ বিষয়ে কি ধারণা। পরে বাহিরে আসিয়া আমার স্বতঃই মনে হইল যে মহীশূর বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার যে Syllabus of Indian Philosophy প্রকাশিত হয় তাহা হইতে ভারতীয় দর্শনের স্বরূপ তিনি কি চক্ষে দেখিতেন তাহার কথঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।

দ্বিতীয়বার যখন তাঁহার সহিত দেখা হয় তিনি তখন তাঁহার কন্যার গৃহে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে বাহুমূলে একটা স্নায়বিক বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন। সেজন্য অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আমার সহিত কথোপকথন চলিতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া হিন্দু দর্শনের কথা উঠিল এবং হিন্দুর দার্শনিক চিন্তাধারা কিরূপে যুগে যুগে ক্রমাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহার একটি ন্যায়সঙ্গত এবং ঐতিহাসিক প্রাঞ্জল বিবৃতি তাঁহার নিকটে পাইলাম। আমি তখনই তাঁহার কথাগুলিকে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ চাহিয়া দেখিলাম শীল মহাশয় সোজা হইয়া বসিয়াছেন এবং কি রকম আত্মসমাহিতভাবে বলিতেছেন, “দেখ, আমি এমন একটা নিখুঁত পরিপূর্ণতার সন্ধান করেছি যে কোনও দিন আর কিছু করে উঠতে পার্‌লাম না। যখনই একটা কিছু কর্‌তে বা লিখ্‌তে যাই

তখনই মনে হয় একটা সুসংবদ্ধ চিন্তার গণ্ডি গড়ে তুল্‌ছি। এটা আমার একান্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ—তাই আমার আর কিছু হ'ল না।" বাস্তবিকই এখানেই এই সত্যান্বেষী জীবনের ট্র্যাজেডি। কথাগুলি অপর যে কোনও লোকের মুখে অসহনীয় দম্ভের মত শোনাইত, কিন্তু তিনি যে ভাবে বলিলেন তাহাতে নিরবলেপ, শিশুসুলভ, সরল আত্মনিবেদনের মতই শোনাইল। এই রকম জ্ঞান তাপসের পাণ্ডিত্যানুযায়ী স্বভাবসিদ্ধ সারল্য লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রুতিতে বিধান করা হইয়াছিল—'তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ', অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া বালসুলভ সারল্যে অবস্থান করিবেন'। ধীরেন্দ্রবাবুও তাঁহার প্রশ্নোত্তরের পরে এই ধারণা লইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—"একদিকে হৃদয়ের চিরপরিচিত, চিরপূজিত, মহাপণ্ডিত ডক্টর-ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অন্যদিকে সকল পাণ্ডিত্যবিস্মৃত, সংসারবিরক্ত অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দে মগ্ন শিশুভাবাপন্ন মহাপুরুষ।"

এই কথাগুলি সত্যই বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ। সেজন্য অনেকেই ধীরেন্দ্রবাবুর কথার সমর্থন করিয়া বলিবেন—"দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার যে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা আছে তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ কোনও গ্রন্থ তাঁহার নাই। জাগতিক দৃষ্টিতে ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে এক মহা পরিতাপের বিষয়।" জাগতিক বা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ইহা যে আক্ষেপের বিষয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ মাপকাঠিতে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিমাপ করা চলে না। এই জাতীয় প্রতিভার সম্পর্কে যথার্থই Rabbi Ben Ezraর ভাষায় বলিতে হয়—

> "Not on the vulgar mass
> Called 'work' must sentence pass,
> Things done, that took the eye and had the price ;"

এ প্রসঙ্গে ডেমোক্রেসী বা গণতন্ত্রের যতই দোহাই পাড়ি আর অভিজাত্যবাদ (intellectual aristocratism) বলিয়া যতই উপহাসই করি, এই ব্যাপারে "পংক্তিভোজন" চলে না। সেজন্য আমার মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে ব্যর্থ সাধনা বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহাই তাঁহার অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন করে।

তাঁহার এই যে ছোট বড় সমস্ত বিষয়ে নিখুঁত হওয়ার একটা ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহার একটা সামান্য নিদর্শন এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল। আচার্য্য শীল মহাশয় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধিনায়ক ও সিনেট সভার সদস্য ছিলেন, তখন কোনো এক সভ্যের প্রস্তাবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশের সংখ্যার কেন এরূপ ভীতিজনক (!) স্ফীতি হইতেছে তাহার অনুসন্ধানার্থে এক বিশেষ কমিটির নিয়োগ হয়। এই কমিটির কর্ণধার হিসাবে আচার্য্য শীল মহাশয় এই গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সাহার্য্যার্থে এক অঙ্কশাস্ত্রবিৎ গ্রাজুয়েট্ পুরাতন দপ্তরখানা ঘাঁটিয়া graph প্রস্তুত করতঃ পাশ-ফেলের হিসাব নিকাশ করিতে লাগিল। সিনেট হলের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের ঘরটিতে বসিয়া বেচারাকে প্রায়ই দেখিতাম "গ্রাফের" রেখা টানিয়াই চলিয়াছে; আর মাঝে মাঝে শুনিতাম আচার্য্য শীল মহাশয় তাহার 'গ্রাফ'এর 'পতন-অভ্যুদয়' পন্থার তারিফ করিয়া বলিতেছেন, "বাঃ বাঃ বেশ হচ্ছে। ঠিক এই lineএই এটাকে workout ক'রে যেতে হবে।" এরকম চলিল মাসের পর মাস—বৎসর ঘুরিয়া আসিল কিন্তু কমিটির রিপোর্ট আর বাহির হয় না। এম্, এ পরীক্ষার পর একদিন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখি সেই সহকর্ম্মীটি কর্ম্মক্লান্ত বিরস বদনে পাশে বসিয়া আছেন, আর আচার্য্য মহাশয় পরমোৎসাহে তাঁহাকে বুঝাইতেছেন কোথায় একটু ভুলচুক্ হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "দেখ, এ আমার এক incubusএর মত হয়েছে।" আমার মনে হইল—"এ ত ঠিক স্বখাত সলিলে ডুবে মরা"—কিন্তু বাহিরে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া দু'একটা কথা বলিলাম। শেষ পর্য্যন্ত এই গবেষণার ফলে কোনো রিপোর্ট সিনেট সভায় আলোচিত হইয়াছিল কিনা তাহা আমার জানা নাই। যেরকম ভাবগতিক দেখিয়াছিলাম তাহাতে মনে হয় সে গবেষণা গ্রাফেরই 'মরুপথে হারাল ধারা'!

ধীরেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে প্রশ্নোত্তরে লব্ধ আচার্য্যদেবের আর যে একটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসম্পর্কে দুএকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিব। কথাটি আচার্য্য মহাশয়ের দার্শনিক মতের ক্রমপরিণতির দিক্ হইতে অতি মূল্যবান্। যাঁহারা আচার্য্য শীল মহাশয়ের

অন্তরঙ্গ বন্ধু, বা মেধাবী, বিচক্ষণ শিষ্য হিসাবে তাঁহার মতামত অনুধাবন করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা যে তিনি ব্যক্তিত্ববাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতপন্থী। ব্যক্তির যে নিরপেক্ষ, অনুপম ও অসীম মূল্য আছে, এবং কর্ত্তা ও ভোক্তা হিসাবে তাহার সকল স্বত্বই যে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায় সংরক্ষিত হইবে—এই দার্শনিক মতবাদের দিকে তাঁহার একটা ঝোঁক অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে। জীবনের অনুভূতির প্রসার ও গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মনে হয়, জীবনের সমস্ত পুরুষার্থেরই একটা উৎকেন্দ্রিক মূল্য নিরূপণ—re-valuation বা trans-valuation of all values—তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। আচার্য্যদেবের নিজ উক্তিই সেই সাক্ষ্য দিতেছে—"পূর্ব্বে বহুদিন আমার বিশ্বাস ছিল, ভূমার মধ্যে এই জাগতিক জীবনের সকল আনন্দ ও অনুভূতি স্থান পাইবে, অথচ ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও কোনো প্রকারে রক্ষিত হইবে। কিন্তু এখন ভূমার যে অনুভূতি হইতেছে তাহাতে এই সকলের কোনোই অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না। ('এই সমস্তই যেন একেবারে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে')। এই অনুভূতির এমন একটা জোর আছে যে, উহার সম্বন্ধে কোনো সংশয় মনে আসিতেই পারে না। এই অনুভূতির সামনে সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতা যেন দাঁড়াইতেই পারে না; এই সব অতি তুচ্ছ মনে হয়। দৈনন্দিন জগতের সহিত এই অনুভূতির জগতের কোনোই সম্পর্ক খুঁজিয়া পাই না। এই দুইটা জগৎ যেন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন (dis-continuous)।" এই দুই পরস্পর-বিভক্ত জগতের স্বরূপ বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার শারীরকভাষ্য (১অ, ১পা, ৪সূত্র) ব্যাখান প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট হইতে জানি। তখন তিনি গভীর ভাবাবেশের সহিত শঙ্করাচার্য্যের শান্ত গম্ভীর, ধীরোদাত্ত বাণীর যেন প্রতিধ্বনি করিয়াই উচ্চারণ করিতেন—"তস্মান্নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বম্। যস্য তু যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং নাসবগতব্রহ্মাত্মভাব ইত্যনবদ্যম্"। তখন তাঁহার সেই ব্যাখ্যানের মধ্যে যে আন্তরিকতার পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলাম উক্ত প্রশ্নোত্তরের উপসংহারে তাহারই পূর্ণ প্রকাশ ও পরিণতি দেখিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

শ্রীসরোজকুমার দাস

রাজা রামমোহন রায়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিভা

নব্য ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের জন্মদাতা রাজা রামমোহন রায়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি যে রাষ্ট্রীয় মতবাদ প্রচার করেন ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের যে পথ নির্দ্দেশ করেন তাহাই অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ কংগ্রেস স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতে থাকে। যে কোনো রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মূলে কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় মতবাদ বর্ত্তমান থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের স্বরূপ, প্রজার অধিকার, শাসন-প্রণালীর মূলনীতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রকাশ করেন, তাহাকে ব্যাবহারিক জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনকারিদের আবির্ভাব হয়। রাজা রামমোহনের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি একাধারে রাষ্ট্রদর্শনের ব্যাখ্যাতা ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রবর্ত্তক।

রাজা রামমোহনের শিক্ষা, সাধনা ও প্রকৃতি তাঁহাকে দার্শনিক করিয়া তুলিয়াছিল। এই দার্শনিক মনোবৃত্তি লইয়া তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাগুলির আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কতকগুলি মূলসূত্র লাভ করিয়াছি, আর তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে একটি বিশেষ রাষ্ট্রীয় আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে দার্শনিকের অভাব ছিল না, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর আচার্য্য শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত কোনো দার্শনিক রাষ্ট্রীয় দর্শনের কোনো আলোচনা করেন নাই। ইহার জন্য দার্শনিকগণকে দোষী সাব্যস্ত করিলে অন্যায় হইবে। যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বিচারাত্মক জনমতের অস্তিত্ব নাই, যেখানে যথেচ্ছাচার শাসনতন্ত্র প্রচলিত, সেখানে রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো মতবাদ প্রকাশ করিবার সাহস ও উৎসাহ সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। রাজপুত সামন্ততন্ত্র ও মুসলমান স্বেচ্ছাচারতন্ত্র রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না বলিয়া মধ্যযুগে ভারতীয় দার্শনিকগণ এ বিষয়ে নীরবতা

অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যে বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে সুশাসন প্রবর্ত্তন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লর্ড নর্থের প্রবর্ত্তিত নূতন শাসন-বিধির প্রচলনের সময় হইতে ১৮২১ সালে রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক "সংবাদ কৌমুদী" নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করা পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে বঙ্গদেশে কথঞ্চিৎ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, মফঃস্বলে না হইলেও বড় বড় সহরে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সূত্রপাত হইয়াছিল ও ইংরাজ বণিক ও রাজপুরুষদের সংসর্গে এবং ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক কয়েকজন লোকের মন উদারভাবাপন্ন হইয়াছিল। নব-যুগের তখন প্রথম প্রভাত। এই শুভক্ষণে রাজা রামমোহন ভরিতের সুপ্ত রাষ্ট্রীয় চৈতন্য উদ্বোধনের আয়োজন করিলেন। দেশবাসীর উন্নতির কামনা অন্যান্য যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির মনে উদিত হইয়াছিল তাঁহারা রাজা রামমোহনের সহকর্ম্মীরূপে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে দ্বারকা-নাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের লইয়া রাজা রামমোহন এক অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী স্থাপন করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের বেশী আগে এরূপ গোষ্ঠী স্থাপন ও সংবাদপত্রের, পুস্তিকাদির সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন উত্থাপন করা সম্ভব ছিল না। ঐ সময়েও দেশে সম্পূর্ণভাবে শান্তি স্থাপিত হয় নাই, প্রজাগণের ধনপ্রাণ একেবারে নিরাপদ হয় নাই ও জনসাধারণ দূরে থাকুক, দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। এতগুলি প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও যে রাজা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ও রাষ্ট্রীয় বিচারের অবতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা তাঁহার ভাস্বর প্রতিভার অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন।

রাজা রামমোহন যখন ইংলণ্ডে ভারতীয় বিচার ও রাজস্বসংগ্রহ পদ্ধতির সংস্কার করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন তখন শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চের "সমাচার দর্পণে" লিখিয়াছিলেন যে রাজা যে সকল সংস্কার প্রয়োজন বলিয়া দাবী করিতেছেন, সেগুলি

যদি তাঁহার চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে কেবল বর্ত্তমান যুগ নহে, ভবিষ্যতের প্রত্যেক যুগের লোকেরা তাঁহাকে দেশের পরমহিতকারী বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিবে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের Bengal Spectator নামক হিন্দু কলেজের পুরাতন ছাত্রদলের পত্রিকায় লিখিত হয় যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের কোম্পানীর সনন্দে ভারতীয়গণের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার জন্য আমরা বহুল পরিমাণে রাজা রামমোহনের নিকট ঋণী। উল্লিখিত দুইখানি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পত্রিকার লেখা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে রাজা রামমোহনের অসাধারণ প্রচেষ্টার ফলেই রাজকর্ম্মে ইংরাজগণের সহিত ভারতীয়দের সমান অধিকার ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের ৮৭ ধারায় স্বীকৃত হয়। কংগ্রেস স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—এমন কি মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন পর্য্যন্ত—এই ধারায় স্বীকৃত অধিকারকে কার্য্যে পরিণত করাই ছিল এদেশের রাজনৈতিকগণের প্রধান চেষ্টা।

রাজা রামমোহন বিলাতে যাইয়া প্রধান প্রধান রাজনৈতিকদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া ভারতে সুশাসন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করিতেন। লর্ড এলেনবরার নিকট হইতে তিনি এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে তিনি (এলেনবরা) কখনও ভারতের উন্নতির পরিপন্থী হইবেন না। রাজা ইংলণ্ডের লোকের সহানুভূতি পাইবার জন্য যেরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন্, ইষ্ট ইণ্ডিয়া সোসাইটি, বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন্, পুণা সার্ব্বজনীক্ সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সেইভাবে ইংলণ্ডে ইংরাজ বা ভারতীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ইংরাজগণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই সব তথাকথিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কেহই রাজার ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে সমগ্রভারতের রাজনৈতিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার খুলিবার প্রস্তাব হয়। "জাতীয় ধনভাণ্ডারে"র জন্য যে আবেদনপত্র বাহির হয় তাহাতে ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ সেন, আনন্দমোহন বসু ও

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) প্রস্তাবিত ধনভাণ্ডারের ন্যাসী-রূপে সহি করেন। তাহাতে লিখিত হয়—"মহারাণীর ঘোষণাপত্র অনুসারে শাসন-কার্য্যে চুক্তিবদ্ধ ও অচুক্তিবদ্ধ (Covenanted & Uncovenanted) উভয়বিধ কর্ম্মচারীরই অধিক পরিমাণে নিয়োগ, স্থানীয় আত্ম-শাসন প্রণালীর পূর্ণতাসাধন, শাসনকার্য্যে প্রতিনিধিপ্রণালীর প্রবর্ত্তন, ইংলণ্ডে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি রাখা, সংবাদপত্র দ্বারা এবং প্রকাশ্য সভা দ্বারা ইংলণ্ডের জন-সাধারণের নিকট সমাজের প্রকৃত অভিমত জ্ঞাপন করা এবং ইংলণ্ডে আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে দুইটী সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য করা, এই সকল বিষয়ে জাতীয় ধনভাণ্ডারের রক্ষকগণ আপনাদের বিবেচনা অনুসারে অর্থব্যয় করিতে পারেন" ("সাধারণী" ১৮ই নভেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৮৩ সালের ভারতের এই রাজনৈতিক প্রোগ্রামের বা কার্য্যপ্রণালীর সহিত ১৮৪৩ সালের মধ্যে প্রচারিত রাজার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মধারার তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে প্রাক্‌কংগ্রেস যুগে রাজার রাজনৈতিক প্রভাব কিরূপ ছিল। প্রথমতঃ মহারাণীর ঘোষণা-পত্র ১৮৩৩ সালের সনন্দের ৮৭ ধারারই বিস্তৃত সংস্করণ এবং ঐ ধারা রাজার চেষ্টাতেই বিধিবদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় আত্মশাসন প্রণালীর পূর্ণতাসাধন সম্বন্ধে রাজাও মনোযোগী ছিলেন; তবে তিনি গ্রাম্যশাসন-কেন্দ্রের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করিতেন না, কেননা তাহাতে গ্রাম্যদলাদলির ফলে বিচারকার্য্যে বিঘ্ন হইতে পারে। কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে গ্রাম-সমূহে পঞ্চায়েতী বিচার প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন (পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থাবলীর ২৫০-৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তৃতীয়তঃ "শাসন কার্য্যে প্রতিনিধিপ্রণালীর প্রবর্ত্তন" অর্থাৎ প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপকসভার স্থাপন সম্বন্ধে রাজার মত ছিল যে তাঁহার সময়ে ঐরূপ প্রতিনিধি পাওয়া দুষ্কর—সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তে বিচার ও শাসন বিভাগ হইতে ব্যবস্থা (Law) বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ভারতের উচ্চতর ভারতীয় রাজকর্ম্মচারী, মহাজন, বণিক, জমীদার প্রভৃতির ও সংবাদপত্রের মতামত লইয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য (উক্ত ইংরাজী গ্রন্থাবলীর ২৬৬-৬৭ পৃঃ, ৪৫৬-৪৬১ ও Asiatic Journal Sept. Dec.

1833 দ্রষ্টব্য)। ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে তাঁহার বিলাত গমনই তাঁহার মতবাদকে স্পষ্ট বুঝাইতেছে—তিনি তৎকালে বিলাত যাইবার জন্য যে কি অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। সংবাদপত্র প্রকাশ দ্বারা ইংরাজদের নিকট ভারতীয়দের মতামত জ্ঞাপন সম্বন্ধে রাজাই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যোগী হয়েন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের Asiatic Journal হইতে জানা যায় যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও নীলরতন হালদারের সহযোগে রাজা রামমোহন "Bengal Herald" নামক একখানি সংবাদপত্রের সত্বাধিকারী হন। এই সংক্ষিপ্ত তুলনা-মূলক বিচার লইতে প্রমাণিত হইতেছে যে রাজা রামমোহনের প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপ্রণালীই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে অনুসৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গত শতাব্দীতে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে নাই এবং তজ্জন্য যাহার সমাধান সম্বন্ধে কোনো ভারতীয় রাজনৈতিক গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই তাহার সম্বন্ধেও রাজা রামমোহন নিজের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত তাঁহার উত্তর-কালীন দেশবাসীকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তটী তাঁহার কোনো গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই—তাই আমরা India Gazette-এর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখের কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"It lies with every Government to establish and preserve a community of feeling, interest and habitude, among the various classes of its subjects by treating them all as one great family without showing an invidious preference to any particular tribe or sect, but giving fair and equal encouragement to the worthy and intelligent under whatever denomination they may be found. But by pursuing a contrary plan, for "community of feeling" will of course be substituted "religious jealousy," for community of interest, a spirit of domination or ascendency on the one hand, of hatred and revenge on the other; and lastly for "community of habitude" will be established a broad line of demarcation and separation even in conducting public business."

রাজা তাঁহার এই মত ভারতে জুরীপ্রথা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে Board of Controlকে জানাইয়াছিলেন। তিনি যে উদারনীতির উল্লেখ করিয়াছেন ও যাহা অনুসৃত না হইলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া শাসনকার্য্যে পর্য্যন্ত বিঘ্ন উৎপাদন করিবে বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার সত্যতা আজ একশত বৎসর পরে আমরা ভারতবাসিগণ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। তাঁহার উদারনীতি অনুসৃত হইলে আজ সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বহ্নিতে আমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতাম না।

বিলাতে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার ফলে ইংরাজগণ রাজাকে কি ভাবে দেখিতেন তাহা তাঁহার সমকালীন একটী ব্যঙ্গ নাটিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। নাটিকাটীর বর্ণিত বিষয় এই যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে বিভিন্ন নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা ভারতশাসন সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিপ্রায় নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতেছেন। একজন নির্ব্বাচনপ্রার্থীর মুখ দিয়া নাট্যকার বলাইতেছেন—

"I propose, therefore, in the first place, that Raja Rammohan Roy be appointed Governor Generel of India ; that all the judicial posts be filled by Mahomedans, all the revenue offices by Hindoos, and the police be executed by East Indians or Indo-Britons. The beauty of this plan, ladies and gentlemen, consists in this : the Raja is neither a Hindoo, Mahomedan nor a Christian, so that he can have no bias towards any part of the population of India ; and the rest being antagonistical that is opposed to each other, they would keep, by their very opposition, the whole machine of government in steady opera tion just as an arch is retained firmly together by contrary pressure on all sides of it" (Asiatic Journal 1832, ২৮১-২৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এই কল্পিত উক্তি কেবল যে রাজা রামমোহনের রাষ্ট্রিয় প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি তাহা নহে, পরন্তু শাসকসম্প্রদায়ের তৎকালীন মনোভাবের অন্যতম সুস্পষ্ট নিদর্শন।

গণতন্ত্রের প্রতি রাজার অনন্যসাধারণ সহানুভূতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁহার মতামত সম্বন্ধে অনেকেরই জ্ঞান আছে বলিয়া এই

বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে বিষয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা করিব না। এখন আমরা রাষ্ট্রীয় দর্শনে তাঁহার নিজস্ব দান কি সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবহার-বিজ্ঞান (jurisprudence) একটি বিশেষ বিভাগ। রাজা রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবহার-শাস্ত্র মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া তাহার মূলতত্ত্বগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেইজন্য ব্যবহার-বিজ্ঞানের মূলসূত্র সম্বন্ধে তাঁহার মতামত গভীর শ্রদ্ধার সহিত আলোচনার যোগ্য। ব্যবহারশাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে কাহাকে আমরা বিধি, ব্যবহার, আইন (Law) বলিয়া মানিব? তাহার উৎপত্তি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য লেখকগণ দুই পরস্পরবিরোধী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। জার্ম্মান পণ্ডিত Savigny ও ইংরাজ লেখক Maine বলেন যে কোনো সমাজে (community) যে সকল প্রথা পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহাই সেই সমাজের ব্যবস্থা বা আইন বলিয়া গণ্য। ইঁহারা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া ব্যবহারের উৎপত্তি বিচার করিয়াছেন বলিয়া ইঁহাদিগকে Historical School বা পৌর্ব্বাপর্য্য-মতবাদী বলা হয়। এই দলের যাঁহারা বিরুদ্ধবাদী—যেমন Austin ও তৎশিষ্য Holland, তাঁহারা অতীতকালে ব্যবস্থার কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল তাহার বিচারে কালক্ষেপ না করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কাহাকে ব্যবস্থা বলিব তাহারই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে বিশ্লেষণবাদী বা Analytical School বলে। ইঁহাদের মতে তাহাকেই আইন বলিব যাহা রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান শক্তি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে আদেশ করিয়াছেন ও বিচারালয়ে যাহার প্রয়োগ হইয়াছে বা হইতেছে। কোনো বিশেষ প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে কিনা ইহা লইয়া অনেক বিবাদ হইয়া গিয়াছে। আবার রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান শক্তির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াও কোনো প্রথা আইন বলিয়া গণ্য হয় কিনা ইহারও মীমাংসা গত শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ করিতে পারেন নাই। Austinএর সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্র ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; তাহার দুই বৎসর

পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন ব্যবস্থার যথার্থ স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"In every country, rules determining the rights of succession to, and alienation of, property first originated in the conventional choice of the people, or in the discretion of the highest authority, secular or spiritual, and those rules have been subsequently established by the common usage of the country, and confirmed by judicial proceedings" (উক্ত গ্রন্থাবলীর ৩৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এই একটী বাক্যের দ্বারা রাজা পৌর্ব্বাপর্য্যবাদী ও বিশ্লেষণবাদীদের মধ্যে যে বিবাদ একশত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে আইনের উৎপত্তি দুইভাবে হইতে পারে—হয় সমাজের লোকেরা একযোগে কোনো একটী নিয়ম স্থির করিয়াছিল অথবা রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান শক্তি আদেশদ্বারা কোনো নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বপ্রধান শক্তি আদিমযুগে যে দুই প্রকারের হওয়া সম্ভব ইহাও রাজা তাঁহার মনীষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আজকাল ফ্রেজার সাহেব দেখাইয়াছেন যে অসভ্যমানবের মধ্যে যাদুকর ও পুরোহিত প্রাধান্য লাভ করিত। কিন্তু আর একদল লেখক বলেন যে যাহার গায়ে বেশী জোর থাকিত বা যে যুদ্ধকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৌশলী হইত সেই নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিত। মানবসমাজ যে সকলস্থানে একই প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া বিকাশলাভ করে নাই রাজা একশত বৎসর পূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন যে যে আদেশ আইন হয় সে আদেশ রাষ্ট্রীয় বা ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় প্রধান শক্তির নিকট হইতে আসিতে পারে। কিন্তু একযুগে একদল লোক কোনো নিয়ম স্থির করিলে বা কেহ কোনো নিয়ম অনুজ্ঞাদ্বারা প্রবর্ত্তন করিলেই পরবর্ত্তী সকল যুগের লোকে তাহা মানিয়া চলিবে এমন কোনো কথা নাই। তাই রাজা বলিতেছেন যে উত্তরকালে দেশের লোকের তাহাকে প্রথা বলিয়া মানিয়া লওয়া চাই। কিন্তু কেবল মানিলেও চলিবে না—কেননা যাহা শুধু দশের মানার উপর নির্ভর করে তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহা মানে কিনা এবং এরূপ প্রশ্ন উঠিলে তাহার মীমাংসা দুষ্কর। সেইজন্য রাজা

আইন কি নির্ণয় করিবার জন্য সর্ব্বশেষে বলিতেছেন যে উহা বিচারালয়ের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে গৃহীত ও তদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হওয়া প্রয়োজন। একটী বাক্যের মধ্যে এতগুলি গভীর সত্য প্রকাশ করা ভারতীয় সূত্রকার ঋষিদের বংশধরের পক্ষেই সম্ভব। আমরা দেশী লোকের কথা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করি না বলিয়াই ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া রাজার পরবর্ত্তী লেখক অষ্টিন প্রভৃতির মতবাদই আলোচ্য বলিয়া গ্রহণ করি।

যেমন ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ে তেমনি ব্যবস্থার সহিত নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক নির্ণয়ে রাজা রামমোহন অষ্টিনের পূর্ব্বে সত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অথচ এই দুইটী বিষয় অষ্টিনই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া তিনি সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন "Essay on the rights of the Hindus over ancestral property according to the law of Bengal" নামে একটি প্রবন্ধ ও "বেঙ্গল হরকরায়" কয়েকখানি পত্রপ্রকাশ করেন; এই সকল পত্রে ও প্রবন্ধে পুত্রগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া পিতা পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বা বাঁধা দিতে পারেন রাজা এই মত প্রকাশ করেন। পিতার এই প্রকার অধিকার অন্ততঃ জীমূত-বাহনের সময় হইতে বঙ্গদেশে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে—সুতরাং ইহাই দেশের আইন। দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতা এইরূপ অধিকার পরিচালনা করিলে পরিবারবর্গের ক্লেশ হয় সত্য, কিন্তু "এরূপ অধিকার পরিচালনা করা উচিত নহে" প্রভৃতি যে সমস্ত বাক্য দেখা যায় তাহা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ মাত্র আইনের আদেশ নহে। অনেক আইন আছে যাহা নীতিবিগর্হিত কিন্তু তথাপি তাহা আইন বলিয়া গণ্য হয়। এই উক্তি সমর্থন করিতে যাইয়া রাজা যে সমস্ত উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে ব্যবহারশাস্ত্রের ও নীতিশাস্ত্রের সীমানা সুন্দরভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি বলেন—"মাদকদ্রব্য ব্যবহারে কেবল স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তাহা নহে, জীবননাশও হইতে পারে, অথচ প্রকাশ্যে মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক লইয়া উহা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া অত্যন্ত বিগর্হিত ও ধর্ম্ম-বহির্ভূত আচরণ; কিন্তু সেইজন্য কি উক্ত কর প্রদান বেআইনী বলিয়া বন্ধ করিতে

হইবে ? বিজিগীষা বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া নিষ্ঠুর ভাবে যুদ্ধ করিয়া লুটের ধন বণ্টন করিয়া লওয়া নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ—সেইজন্য কি এই বিভাগ বেআইনী মনে করিয়া লুটের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয় ? অনুপযুক্ত ব্যক্তির কুলধন বা অপর কিছু বিবেচনা করিয়া তাহাকে কন্যাদান করা নীচ ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য—কিন্তু তাই বলিয়া কি উক্ত বিবাহ অসিদ্ধ স্থির করিয়া উহাদের সন্তানগণকে অবৈধশ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে ? দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোনো ব্যক্তির প্রাণ নাশ করা দুর্নীতির পরিচায়ক, এমন কি অনেকের দ্বারা উহা নরহত্যারূপে বিবেচিত হয় কিন্তু তথাপি বিচারালয়ে যেভাবে এই অপরাধকে উপেক্ষা করা হয় তাহা দ্বারা উহা বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয় না কি ?…………
………তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে এই যে কোন দুর্নীতিমূলক কার্য্য বৈধ বিবেচিত হইবে তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব ? আর কোন দুর্নীতিমূলক কার্য্য অবৈধ বিবেচিত হইবে ও আইনতঃ নাকচ হইয়া যাইবে তাহাই বা কি প্রকারে স্থির করিব ? ইহার উত্তরে আমরা দেশের ব্যবহার (Common law) ও প্রচলিত প্রথা কি স্থির করিয়া উক্ত সমস্যা সমাধান করিব।" (উক্ত গ্রন্থাবলীর ৪০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। রাজা এই সব দৃষ্টান্ত দিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যাহা প্রচলিত প্রথা বলিয়া স্বীকৃত তাহাকে আইন বলিয়া মানিতেই হইবে। উহা যদি দুর্নীতিমূলক হয়, তবে সংশোধন করিবার জন্য আন্দোলন করা কর্ত্তব্য কিন্তু যতদিন সংশোধন না হয় ততদিন তাহা মানিতেই হইবে।

রাজা রামমোহন Montesquieu-এর শাসন-শক্তির ত্রিধা-বিভাগ-নীতিকে সুশাসন লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিতেন। শাসন-বিভাগ, ব্যবস্থা-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ পরস্পর-স্বাধীন থাকিলে ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইলে শাসিত দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সুবিচার বর্ত্তমান থাকিতে পারে এ কথা রাজা বহুস্থানে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। (উক্ত গ্রন্থাবলীর ২৩৩-২৩৪, ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এদেশে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপকসভা স্থাপিত হইলে পাছে শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা (executive officers) উহার সভ্য হন ও শাসন ও ব্যবস্থা-বিভাগ তদ্দ্বারা একই হস্তে ন্যস্ত হয় এই ভয়ে রাজা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভা স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা যাহাতে বিচার-

বিভাগে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তৎপ্রতি ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগ তিনি আকর্ষণ করিয়াছিলেন (উক্ত গ্রন্থাবলীর ২৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বড়লাট সাহেবের হাতে আইন বা রেগুলেশন জারি করিবার ক্ষমতা যাহাতে না থাকে তজ্জন্যও তিনি আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই গুরুতর প্রশ্নের সমাধান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই; প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারবিধিতেও বড়লাটের অর্ডিনান্স জারি করিবার ক্ষমতা বজায় থাকিবে, সেইজন্য এ বিষয়ে রাজার মতটী সাধারণের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"In every civilised country rules and codes are found proceeding from one authority, and their execution left to another. Experience shows that unchecked power often leads the best men wrong and produces general mischief.

যে সময়ে রাজা রামমোহন রায় জীবিত ছিলেন সে সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মত ছিল যে রাষ্ট্রে সকলের সমান অধিকার থাকা কর্ত্তব্য—কোনো সম্প্রদায়ের বা কোনো ব্যক্তির গুণ প্রকাশের পক্ষে যে সকল বাধা আছে তাহা দূর করিয়া সকলকে সমান সুবিধা ভোগ করিতে সুযোগ করিয়া দিলেই সরকারের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল। এই নীতিকে Laissez-faire policy কহে। রাজা এরূপ নীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মত ছিল এই যে দরিদ্র অবনত ব্যক্তিদিগকে যদি সরকার বলিয়া দেন যে তোমরা উপযুক্ত হইলে তোমাদের উন্নতিতে যাহাতে কেহ বাধা না দিতে পারে তাহা আমরা দেখিব, তবে তাহাতে তাহারা বিশেষ লাভবান হইবে না। কেননা যতদিন পর্য্যন্ত না সকলের অবস্থা সমান হয় ততদিন সকলের উন্নতির পক্ষে সমান সুযোগ ঘোষণা করা নিরর্থক। এইজন্য যাহাতে সরকার গরীব চাষীদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে প্রথমে ধনে ও বিদ্যায় উন্নত করিয়া তুলেন তৎপ্রতি রাজা যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি আনয়ন করিতে না পারিলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কিছুতেই হইতে পারে না। সেইজন্য কৃষকেরা যাহাতে একদিকে জমীদারদের নিকট হইতে অন্যদিকে সরকারের নিকটে সাহায্য পায় তজ্জন্য তিনি চেষ্টিত হইয়াছিলেন (উক্ত গ্রন্থাবলীর ২৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কৃষকদের ব্যথায় তিনি কেমন ব্যথিত হইতেন তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটী হইতে বুঝা যাইবে—

"In short, such is the melancholy condition of the agricultural labourers, that it always gives me the greatest pain to allude to it."

ধর্ম্মজগতে যেমন রাজার আদর্শ ছিল একেশ্বরবাদের মহান সূত্রে সমগ্র মানব-জাতির ঐক্যসাধন করা, রাষ্ট্রীয় জগতে তেমনি তাঁহার আদর্শ ছিল ইংলণ্ডের কর্ম্মশক্তি ও ভারতের জ্ঞানশক্তিকে এক আধারে নিয়োজিত করিয়া সমগ্র প্রাচ্য ভূভাগকে সভ্যতার বিমল কিরণ দান করা। যীশুর উচ্চস্তরের নীতিবাদের সহিত বেদান্তের জ্ঞানবাদ মিলিত হউক, ইংলণ্ডের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত ভারতের সমাজ-বশ্যতা একত্রে সম্মিলিত হউক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানব ভাই-ভাইয়ের মত হাত ধরাধরি করিয়া চিরন্তন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক এই ছিল রাজার অন্তরের কামনা। এই জন্যই তিনি ভারতে ইংরাজ রাজত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আশা করিতেন যে ইংরাজ-জাতির সদ্বুদ্ধি, ন্যায়বুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে ভারতবর্ষ ক্রমে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের মধ্যে সমানের অধিকার লাভ করিবে ও তাহার ফলে ইংরাজজাতির সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হইবে। এই সম্বন্ধকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভূমিতে স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে রাজা রামমোহন ভারতে ইংরাজ-শাসনের দোষ ত্রুটি বিদূরিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে অবশ্য এ সন্দেহও জাগিয়াছিল যে হয়তো তাঁহার অনুমোদিত সংস্কারাদি সাধন করা সত্ত্বেও এমন একদিন ভারতবর্ষে আসিবে যেদিন আর ইংলণ্ডের সহিত যোগসূত্র বজায় রাখা এদেশ-বাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু রাজা প্রার্থনা করিতেন যে এমন দিন যদিই আসে তবে যেন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ পরস্পরের প্রতি প্রেম মৈত্রী সহানুভূতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে—যেমন পক্ষীশাবক সাবালকত্ব পাইয়া তাহার মায়ের নিকট হইতে স্বতন্ত্র হয়। এইরূপভাবে স্বাতন্ত্র্য লাভের পর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের সাহায্যে ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের অপরাপর জাতিসমূহে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তার করিবে এই উজ্জ্বল আশা রাজা রামমোহন হৃদয়ে পোষণ করিতেন (উক্ত গ্রন্থাবলীর ২৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

শরৎ প্রভাতে

(ফ্র্যাঙ্ক ও' কোনর্-এর "গেষ্টস্ অফ্ দি নেশন" বইয়ের "সেপ্টেম্বর ডন" অবলম্বনে)

শরৎ কাল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি। অমন সুন্দর শরৎ ও অঞ্চলে অনেক বছর হয়নি। পাঁচদিন ধ'রে এক মূহূর্ত্ত অবসর ছিল না। রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর বারোটি দল মিলে বিপ্লবী সৈন্যদের একটি ছোট্ট শাখাকে ক্রমাগত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। বিপ্লবী সৈন্যরা কিন্তু দমেনি। গ্লেন্‌ম্যানাস ব'লে একটি জায়গায় বনের মধ্যে তারা বেশ আড্ডা গেড়ে বসেছিল; সামনেই নদী, ওপারে ছিল বিপক্ষের দল, ভারি লড়াই করার সুবিধা। কিন্তু ইতিমধ্যে নদীর উপর তাড়াতাড়ি সাঁকো বানিয়ে আর এক-দল শত্রুসৈন্য এসে পড়াতে তাদের অবস্থা হোলো সঙ্গীন, তখন তারা বনবাদাড় মাঠঘাট ভেঙে দিল সোজা দৌড়। সাতজন ক'রে একটি খানায় গিয়ে পথ আগলায়, আর সাতজন ততক্ষণে গিয়ে পরের খানায় পৌছায়। মাঝে মাঝে শত্রুপক্ষ তাদের প্রায় ধ'রে ফেলে, তখন তারা আবার আর একদিকে চলে। এইভাবে লড়াই করতে করতে তারা পালাচ্ছিল। কিন্তু এবার আর গতি ছিল না, নতুন একদল শত্রুসৈন্য এসে তাদের প্রায় ঘিরে ফেলেছিল। অগত্যা রাতারাতি অন্য এক পথ দিয়ে ঘুরে এসে তারা আবার গ্লেন্‌ম্যানাসে তাদের আড্ডায় উপস্থিত হ'য়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। আর কেওন ও হিকিতে জোর পরামর্শ হচ্ছিল, এবার কি করা যায়?

হিকির পরনে একটা কালো কুর্ত্তা আর সবুজ রঙের ঘোড়ায় চড়ার পায়জামা। দেখতে সে ছিপছিপে লম্বা। লোকটির নাকি দয়ামায়ার বালাই নাই, কিন্তু ভারি বিবেকী। তার ফ্যাকাশে মুখে আর শিঙের ফ্রেমওয়ালা চশমা-আঁটা চোখের তীব্র দৃষ্টিতে এক অমানুষিক নিষ্ঠার আভাস ফুটে উঠছে। মুখের ভাব অনেকটা তরুণ বৈজ্ঞানিক বা পুরোহিতের মতন। লোকে বলে তার নাকি কল্পনাশক্তি নাই, আর নাই রসজ্ঞান। কিন্তু লড়াই করতে সে ওস্তাদ, আর মানুষের জীবনমরণ যে-কাজের উপর নির্ভর করে তার বেলায় ভারি সাবধানী। তার সঙ্গীটি বেঁটে আর হোৎকা গোছের, তার গোল মুখের ভাবটি বেশ প্রসন্ন, আর তার বাঁ-চোখটি ভীষণ ট্যারা। লোকটি বেশ ঠাণ্ডা

মেজাজের, কিন্তু বিবেকটিবেকের ধার সে বড় ধারেনা, কোনো কাজে তার উপর নির্ভর করা চলে না। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে তার ধরণধারণ খুব সুবিধার নয় ব'লে তার বেশ একটু দুর্নাম ছিল। লোকটি আবার তাই নিয়ে গর্ব্ব করত আর তার যে-চোখটি ট্যারা নয় সেই চোখ মটকে বলত যে মান্‌স্টার অঞ্চলে এমন গ্রাম নাই যেখানে তার ঘরবাড়ি বা ছেলেপিলে জুটবে না। লোকটি হিকির থেকে অনেক বেশি পড়াশুনো করত; যেখানেই থাক না কেন, তার পকেটে একটা না একটা বই থাকবেই। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বইটা হোতো একটা অশ্লীল ফরাসী উপন্যাস; কিন্তু মাঝে মাঝে তার পকেটে কবিতার বইও থাকত আর তাই থেকে সে মোটা গেঁয়ো গলায় সুর ক'রে তার বন্ধুকে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাত। নিজের গলার স্বর নিজের কানে শোনা তার একটা সখ ছিল; যখন তাদের দল কোনো জায়গায় বিশ্রাম করত তখন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ও আবৃত্তি অভ্যাস করত। নদীর ধারে এই দুটি বন্ধু ছিল দাঁড়িয়ে। হিকির হাতে একটা গাছের ডালকাটা ছড়ি, তাই দিয়ে সে অন্য মনে জল ঘাঁটছিল। কেওনের ঘাড়ের উপর রাইফেল, হাতে এক টুকরো রুটি, সে চুপ ক'রে হিকির দিকে তাকিয়ে ছিল।

মিনিট দশেক পরে দুজনে ফিরে এল। ঘাসের উপর বারোজন ভলান্টিয়ার সেখানে বসেছিল হিকি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখল। তার দৃষ্টিতে আগ্রহের লেশমাত্র ছিল না। ভলান্টিয়াররা কেউ রুটি চিবোচ্ছে কেউ মরচে-পড়া পাত্রে ঝরণার জল ধ'রে খাচ্ছে। তাদের রাইফেলগুলো সব পাশে পড়ে। সবাই প্রায় টুপি খুলে ফেলেছে। মাথার উপর শরতের ভাস্বর সূর্য্য, গাছের পাতায় সবে হলদে আভা দেখা দিয়েছে, তারি ফাঁকে ফাঁকে আলোর কণা এসে পড়েছে ভলান্টিয়ারদের দীপ্ত মুখে, তাদের অনাবৃত গলায়। হিকি ফিরে আস্‌তে সবাই তার দিকে তাকাল। হিকি সংক্ষেপে বল্‌ল, "এবার আমাদের এই দল ভেঙে দেওয়া হবে এই ঠিক করা গেল।"

একজন প্রায় কাঁদকাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "দল ভেঙে দেওয়া হবে? তার মানে আমরা যে-যার বাড়ি ফিরে যাব?"

"হ্যাঁ, নইলে আর উপায় কি? হয় দল ভেঙে দেওয়া, নয় সবাই একসঙ্গে মরা—এভাবে তো আর চলতে পারে না।"

সবাই হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

"আর এই সব রাইফেল, পোষাক, এগুলোর কি হবে?"

"পুঁতে রাখতে হবে।"

"পুঁতে রাখতে হবে! পাঁচদিন ধ'রে এত কাণ্ডের পর?"

"আমার যা বলার বলেছি।"

কেওন স্নিগ্ধ স্বরে বলল, "কি করব বলো, ভাই? নিতান্তই যে নিরুপায়! এই এতদিন ধ'রে তোমরা যে আমাদের ছেড়ে যাওনি, মনে কোরোনা জিম ও আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ নই। তোমাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমাদের যে বন্ধুত্ব হয়েছে তা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে। কিন্তু যদি ছাড়াছাড়ি হবেই তাহলে এই ভাবে হওয়াই ভালো। আমরা চাই আয়ারল্যাণ্ডের জন্য মরতে নয়, বাঁচতে। কিন্তু এবেলা ছাড়াছাড়ি না করলে নিতান্তই মরতে হবে। এ কথা না মেনে লাভ কি? এই জায়গাটা একেবারে বেজায় সমতল, তার উপর বেজায় লোকের ভিড়, আর রাস্তারও অন্ত নাই।"

কারো মুখে কথা নাই। ভলান্টিয়াররা একবার এ-ওর দিকে আর একবার তাদের দলপতিদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। লাল গোঁফওয়ালা এক ভলান্টিয়ার—চাষার ঘরে মজুরি ক'রে সে খায়—সযত্নে ব'সে কতকগুলো স্যাণ্ডউইচ পুঁটলি বেঁধে রাখছিল। হঠাৎ পুঁটলিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল, গাছের পাতার মধ্য দিয়ে সেটা টপ করে নদীর জলে গিয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়ের বোচকাটায় সে মারল এক ঠ্যালা, তারপর খাকি কোমরবন্ধটা খুলতে সুরু করল। তার মুখ ফ্যাকাশে, তার হাত থরথর করে কাঁপছে। একে একে সবাই পড়ল উঠে।

"যাই চলো ভাই, এক হপ্তা পর বাড়িতে ঘুমিয়ে আরাম হবে।"

কথাগুলো যে বলল তাকে প্রায় ছোকরা বললেই চলে। দিব্যি সুন্দর তার চেহারা।

আগের লোকটি একটু তীব্র স্বরে জবাব দিল, "অত সোজা নয়, হে খোকা। এক হপ্তা যেতে না যেতেই ছাখোনা ভিন্ন রকম বিছানার ব্যবস্থা

হয় কিনা—আর বেশ শক্ত বিছানা হে, খুব যে আরামের তা নয়। তখন বুঝবে ঠ্যালা!”

সবাই এই কথায় সায় দিল।

কেওন তাড়াতাড়ি বলল, “তা অতটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। এইতো সবে এক হপ্তা ঘরছাড়া, এরই মধ্যে কি আর ওরা আমাদের সব টের পেয়েছে?”

আর যায় কোথা! সেই লোকটিতো চটে আগুন! একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলল, “বাপু, ধরা পড়ার ভয় কাকে দেখাচ্ছ? কার সঙ্গে কথা বলছ, জানো? আমি আর ও—এই দুজনে সারাপথ বেয়ে প্যাসেজ পর্য্যন্ত এসেছিলাম লড়াই করতে। এক বাড়ির থেকে দুজনে রওনা হ’য়ে নিঝুম রাতে সাইকেল চ’ড়ে সটান গিয়ে হাজির হয়েছিলাম বড় দলে যোগ দেবার জন্যে। তারপর তাদের সঙ্গে গেলাম একেবারে মাক্‌রুম পর্য্যন্ত। সেখান থেকে তারা দিল ফেরৎ পাঠিয়ে—এই যেমন তোমরা ফেরৎ পাঠাচ্ছ। আমরা এক হপ্তার সখের সেপাই নই। কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, তোমাদের জন্যে আর বোকা বনছি না।”

কেওন নিরুত্তর।

অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখবার যে গর্ত্তটা ঠিক ছিল ছোকরাটি তা জানত। বনের চারপাশে যে ছোট দেওয়াল তারি গায়ে এই গর্ত্তটা খোঁড়া হয়েছিল। খানিকক্ষণ খোঁজার পর সেটা পাওয়া গেল। সেই ছোকরাটি আর কেওন দুজনে মিলে বড় বড় কতকগুলো পাথর একে একে সরিয়ে ফেলল। এই পাথরগুলোর তলায় ছিল মস্ত একটা গর্ত্ত আর তার মধ্যে কফিনের মতো একটা বাক্‌স, প্রায় ছ’ টুকরো অয়েলক্লথ, খানিকটা ময়লা ন্যাকড়া, আর তেল একটিন। রাইফেলগুলো জড় ক’রে—তাদের আর তেল মাখানোর সময় ছিলনা—অয়েল ক্লথে জড়িয়ে রাখা হোলো। কোমরবন্ধ, সঙ্গীন প্রভৃতি আর সব হাতিয়ার সরঞ্জামগুলোও ঐ ভাবে রাখা হোলো। কেবল কেওন ও হিকি তাদের হাতিয়ার হাতছাড়া করলনা। হিকির একেবারে এদিকে মনই ছিল না। যখন অস্ত্রশস্ত্র সব সমাধিস্থ করা হচ্ছিল সে তখন গাছের ছায়ায় ছায়ায় বিষণ্ণ মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, মাঝে মাঝে হঠাৎ রোদ প’ড়ে তার চশমার কাচ ঝিকমিক করছিল।

কাজ শেষ হ'লে পাথরগুলো আবার সরিয়ে যথাস্থানে রেখে মাটি পিটে সমান ক'রে দেওয়া হোলো। বারোটি ভলান্টিয়ার কেউ বা পায়জামার পকেটে হাত গুঁজে কেউবা পিছনে হাত মুড়ে বোকার মতন দাঁড়িয়ে। আগে প্রত্যেক যে-যা ছিল—চাষার ছেলে বা দিন-মজুর—তাকে আবার ঠিক তাই দেখাচ্ছে।

সেই ছোকরাটি খুব মুরুব্বির মতন গলায় বল্‌ল "সময়তো হোলো, এবার তাহলে যাওয়া যাক।" সে পরখ ক'রে দেখছিল এই ছোট্ট দলটির সবাই তাকে মানে কিনা।

কেওন একগাল হেসে এই একটু আগে যে-লোকটি তাকে চড়া চড়া কথা শুনিয়েছিল তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সেই লোকটি নীরবে কেওনের হাতখানি নিয়ে একমুহূর্ত্তকাল ধ'রে রাখল। প্রীতির ও বন্ধুত্বের হাসিতে তাদের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সেই ছোকরাটি গট্‌মট্‌ ক'রে হিকির কাছে গিয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতন ভাবভঙ্গী ক'রে হাত এগিয়ে দিয়ে খুব চালের মাথায় বল্‌ল, "তাহলে, মিষ্টার হিকি, এবার আসি। আশা করি শীগ্‌গিরই আবার দেখা হবে।"

হিকি মৃদুহেসে জবাব দিল, "আচ্ছা, ভাই আসি—তোমাদের ভালো হোক।" আর সকলেও পরস্পরের কাছে বিদায় নিতে এগিয়ে এল। সকলে মিলে একবার শেষবারের মতন সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল—"তোমাদের ভালো হোক্‌। ভগবান তোমাদের সাথী হোন্‌।" তারপরে এই ছোট্ট দলটি ভেঙে গাছের ছায়ায় ছায়ায় যে-যার বাড়ির পথ ধরল। তাদের গলার স্বর ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। নদীর ধারে রইল শুধু দুই বন্ধু—হিকি আর কেওন।

২

প্রায় এক ঘণ্টা পরে তারা যখন লাফ দিয়ে বনের ওপারের বেড়া ডিঙোচ্ছে তখন হঠাৎ এক বন্দুকের আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে কেওনের টুপি একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি। কেওন বন্দুক তুলে একেবারে খানার গা ঘেঁসে দাঁড়াল, কিন্তু হিকি বেচারি বিহ্বল ভাবে টুপির পাশে শুয়ে

সেটি তুলে ধ'রে সযত্নে ঝেড়ে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে তার উপরকার ছেঁদাটি দেখতে লাগল।

"কাণ্ড দেখেছ! যে এই ব্যাপার করতে পারে সেতো মা-বাপ মরা ছেলের মুখের থেকে রুটির টুকরো ছিনিয়ে নিতেও পারে। কিন্তু যাই বলো জিম্ লোকটির হাত ভালো। কি টিপ! আর এই এক-দুই-আড়াই ইঞ্চি তলায় হ'লেই হয়েছিল আর কি! জানতেও পারতাম না। তা বেশ! ফস্‌কেছে তো, আর একবার ফস্‌কানো মানে এক মাইল। আর মাইলের কথাই যদি বললে...", মাথা হেঁট ক'রে অতি সন্তর্পণে উঠে সে এই কথাগুলো বলছিল। তার বন্ধু তার কথা শেষ হতে না হতেই ব'লে উঠল, "যতক্ষণ না তুমি সামনের মাঠটা পেরোও ততক্ষণ আমি এইখানেই থাকব।"

"বলি, তারপর আমরা যাব কোথায়?"

"সে যে-দিকেই হোক না কেন। কোনোমতে এই যায়গাটা ছেড়ে বাঁচি। হিসেবনিকেশ পরে হবে।"

"যুদ্ধের যখন এই অবস্থা তখন জেনারেল হিকি হুকুম দিলেন পিছু হট্‌তে", বিড় বিড় ক'রে এই কটি কথা ব'লে মাথা নীচু ক'রে কেওন মাঠের উপর দিয়ে দিল এক দৌড়। পিছন পিছন বন্দুকটা ঘাসের উপর লুটোতে লুটোতে চলল।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে হিকি দেখল কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই। সূর্য্য তখন ঠিক মাথার উপর, তারই তাতে সমস্ত পৃথিবী তেতে উঠেছে। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল তার ঠিক নীচে বন, লাল্‌চে আভাধরা পাতার ফাঁকে ফাঁকে চওড়া নদীটি ঠিক ইস্পাতের মত জ্বল্‌জ্বল্ করছে। নদীর ওপারে শাদা রঙের বড় রাস্তা একবারে পরিষ্কার প'ড়ে রয়েছে—রাস্তার ওপারে একটি ছোটো পাহাড়, অনেক গাছ, আর একটি বাড়ি। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট টুপীর মতন এই বাড়িটিকে বনের ভিতর থেকে দেখা যায়না। কিন্তু হিকি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে এই বাড়ি আর তার হাতার ভিতরকার ঘরটর সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। বাড়িটি পুরোনো, সম্ভবত অষ্টদশ শতাব্দীর, ফটকের ভিতর দিয়ে বাড়ি পর্য্যন্ত গাড়ি যাবার চওড়া পথ, তারপর সামনে দরজা পর্য্যন্ত সিঁড়ির ধাপ। হঠাৎ এই দরজাটি খুলে

শাদা পোষাক-পরা একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। বোধহয় বন্দুকের আওয়াজ তার কানে গিয়েছিল আর কাছাকাছি বিপ্লবী সৈন্যদল আছে তাও বোধহয় সে জানত। হিকি ভাবছিল, বন্দুকের নলের উপর টুপি কিম্বা রুমালটা একবার তুলে ধরলেই হোলো—আবার মেয়েটার শোনার মতন একটা আওয়াজ হবে। এই ভাবনা তাকে একেবারে পেয়ে বসল। স্বভাবত সে ছিল খুব সাবধানী, কিন্তু তবু বন্দুকের ঘোড়াটা একবার টিপবার জন্যে তার হাত সুড়সুড় করছিল। সে হিসেব করছিল, বিপক্ষের দলে কতজনই বা হবে? বড়জোর বারো, তা'নইলে তারা নিশ্চয় ভরসা ক'রে আরো এগিয়ে আসত। মেয়েটি চোখের উপর হাতের আড়াল ক'রে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। এই বেলা তাকে যদি হাত দিয়ে বা রুমাল উড়িয়ে ডাকা যায় তো মজা মন্দ হয়না, যদিও তাতে বিপদ আছে।

কেওনের খোঁজে ফিরে তাকিয়ে হিকি দেখল যে কেওন তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। কেওন যেই দেখল হিকি তাকে দেখতে পেয়েছে অমনি আর সে দিকে না এসে অন্যদিকে চলতে সুরু করল, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে হাত নাড়তে লাগল যে হিকি বুঝল যে তাড়াতাড়ি চলা দরকার। সুতরাং খানাটার বেশ কাছ ঘেঁসে হিকি কেওনের পিছু নিল।

কেওন যে ফাঁকটা লক্ষ্য করে দৌড়েছিল সেখানে পৌঁছে হিকি দেখল যে কেওন সেখানে উপুড় হয়ে বসে বন্দুকটা আঁকড়ে ধ'রে হাঁপাচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি এই ভাব দেখিয়ে সে বল্ল, "জিমি, ভাই—দৌড় ছাড়া আর গতি নাই, একেবারে সাজা দৌড়। তর্ক করিস নে ভাই—যুদ্ধে পিছু হটতে হ'লে কি ভাবে ও কখন হটতে হয় সে বিষয়ে আমার পরামর্শ একবারে পাকা!" সে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল তারা যেখানে গুড়ি মেরে রয়েছে সেখান থেকে একটা ঢালু মাঠ সোজা পাহাড়টার মাথা পর্য্যন্ত উঠে গিয়েছে। "ঐ মাঠটা পেরোবার সময় আমাদের ভালো করেই দেখা যাবে, কিন্তু একবার পেরোতে পারলে গা ঢাকা দিবার জায়গার অভাব হবে না। তৈরি আছতো?"

হিকি জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কি অনেকে নাকি?"

"একেবারে সাপের মত কিলবিল করছে। তৈরি কিনা বলোনা ?"

"নিশ্চয় ! এই তো।"

বাস্ ! তারপরেই চোখ বুঁজে লম্বা দৌড়। প্রায় আধমিনিট তার নিজের বুকের দপ্‌দপ্ আর ঘাসের উপর তাদের পায়ের থপ্‌থপ্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই তার কানে এল না। সূর্য্যের আলো তার ঝাপ্‌সা চোখে ঠিক গোলাপী কুয়াসার মত দেখাচ্ছে আর মনে হচ্ছে এই রঙীন শূন্য হ'তে কখন পায়ের তলার মাটি ধাঁ ক'রে লাফিয়ে উঠে মারবে এক ধাক্কা। হঠাৎ একসঙ্গে প্রায় বারোটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, তার উপর আবার একটা পট্‌পট্ শব্দ—এ একেবারে মেশিন-গানের, আর ভুলচুক নাই। সে চমকে উঠে হঠাৎ বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে দেখতে পেল যে বেশ কিছু আগে আগে কেওন মাথানীচু ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। সে আরো জোর দৌড়তে সুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে মেশিন-গানটারও জোর বেড়ে গেল—পট্‌পট্ আওয়াজের মাঝে মাঝে আর ফাঁক রইল না। তারপর হঠাৎ এই শব্দ গেল থেমে, শুধু মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ কানে আসতে লাগল। ক্রমে তাও মিলিয়ে গেল। কেওনের তখন হঠাৎ মনে হোলো, তাইতো, অনেকক্ষণ সেই খোলা জায়গাটুকু সে পেরিয়ে এসেছে, এতক্ষণ দৌড়চ্ছিল শুধু ঝোঁকের মাথায়।

কেওন একটা গাছে ঠেঁস দিয়ে বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তার অবস্থা শোচনীয় ; শরীরে শক্তি আর প্রায় নাই, অভ্যাসমত সে কাঁপতে কাঁপতে জামার পকেটগুলোতে হাতড়ে সিগরেট খুঁজছে। মুখের কোণে ম্লান হাসির আভাস ; গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোতে চায়না।

কোনোরকমে ঢোক গিলে সে বল্‌ল, "ব্যাটারা বন্দুক ধরতে শেখেনি ; কিন্তু, যাই বলো, খুব বেঁচে গেছি।"

"খুব—একেবারে কানের কাছ দিয়ে !" বাস্। হিকির মুখে আর কথা বেরোল না। তার মনে হচ্ছিল খুব শক্ত হাতে চেপে ধ'রে কে যেন তার মাথাটাকে বন্‌বন্ ক'রে ঘোরাচ্ছে। কোনোরকমে টলতে টলতে সে বন্ধুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রায় একমাইল দূরে একটা পাহাড়ে নদী ছিল। বরফের মত ঠাণ্ডা তার জল। দুই বন্ধুতে গিয়ে সটান এই কন্‌কনে জলে মাথা দিল ডুবিয়ে, দম বন্ধ হ'য়ে আসে আর কি, কিন্তু আবার—বারবার তারা এই ভাবে মাথা ধুতে লাগল। চোখের সামনে ভিজে চুল এসে পড়ায় তারা প্রায় কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু কি তৃপ্তি! তারপর জলটা একটু পরিষ্কার হ'তে অঞ্জলি ভ'রে তা পান করল। মুখে কারো কথাটি নেই। ক্রমে রুমালে হাতমুখ ভালো ক'রে মুছে দুজনেই সিগরেট ধরিয়ে জোর টেনে একটু যেন বল পেল।

কেওনের আগের স্ফূর্ত্তির ক্ষীণ রেশ যেন ফিরে এসেছে। সে বল্‌ল, "যে-রকম মালুম দিচ্ছে, দিনটা কাটবে ভালো—নিঃশ্বাস ফেলার অবসর জোটে কিনা সন্দেহ।"

ক্লান্তস্বরে হিকি জবাব দিল, "মনে হয় ওরা আমাদের দলটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। দল যখন ভেঙেই গেল তখন এ ভাবে ঘুরে বেড়ানো নিছক বোকামি—একেবারে মারাত্মক।"

"করতে চাও কি? পশ্চিম দিকে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"একেবারে সটান বাড়ি—সেই পাহাড়ের মাঝখানে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কি ক'রে যে তা হ'বে তাতো ভেবে পাই না।"

"তুমি না পাও আমি পাই। আমাদেরতো ঘেরাও করেছে—আর বোধ হয় ক্রমশই এগিয়েও আসছে। একবার কোনো রকমে একটু ফাঁক পেলেই সরে পড়া। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারলেই বোধ হয় তা পারা যাবে। তারপর ম্যালো দিয়ে যাব ডনোমোর—তারপর আর কিছু গোলমাল নাই।"

"ব্যবস্থাটা শুনতে তো ভাল, কিন্তু, পথ জানোতো?"

"ঠিক অবিশ্যি জানিনা, তবে আপাতত উত্তরদিকে খানিকটা দূর গেলে বোধ হয় মন্দ হয় না।"

"উত্তর দক্ষিণ বুঝি না—মোদ্দা কথা গুলিগোলা পৌঁছায়না এমন কোথাও—যুদ্ধশাস্ত্রের মূল সূত্র হোলো তাই।"

মাঠ ভেঙে, যতটা সম্ভব আড়ালে আবডালে তারা চলতে সুরু করল। ঘাড়ে বন্দুক। হিকির পা তার দেহের ভার যেন আর বইতে পারেনা। কেওনের অবস্থা ও তথৈবচ। সে ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। ঠিক মাথার উপর সূর্য্য—সামনের খোলা মাঠ রোদে ভেসে গিয়েছে। ক্ষেতের পর ঘন-সবুজ ক্ষেত, মাঝে মাঝে কালো কালো চষা মাঠ, কোথাও বা অজস্র মেঠো ফুল বা ছবির মতন একটি কুঁড়েঘড়। বহুদূরে দিগন্ত ঘিরে রয়েছে লঘু নীল মেঘের মত পাহাড়ের সারি। সতৃষ্ণ কাতর চোখে কেওন তাকিয়ে দেখছিল একবার এই পাহাড়ের দিকে—একবার মাথার উপর সূর্য্যের দিকে, অস্ত যাবার নামগন্ধও তার নাই।

কি আর করে! মনের দুঃখ জানাবার জন্যে একটু রসিকতা করেই সে বল্‌ল, "আমার মায়ের সন্তানটি এখন ঠিক যে কোথায় থাকতে পারলে খুসী হন তা কি আর আমি জানিনা? হিকি বল্‌ল, "আর আমিও কি সে কথা বলতে পারিনা?"

কেওনের মন পড়ে রয়েছে পাহাড়ে। সে বল্‌ল, "বুঝেছি—নিশ্চয়ই কিল্‌নামার্টার।" পাহাড়ের উপরে তাদের গ্রামের নাম। আবার সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

"আরে ছি! আমি ভাবছি সহরের কথা—যেখানে জীবনটা কাটালাম।"

"তোমার জীবন—থাক্। বলি, বিয়ে টিয়ে করবে না?"

"বিয়ে? আরে আগে যুদ্ধ জিতি, তারপর ওসব ভাব্‌ব।"

"যদি যুদ্ধে আমরা হারি?"

"সে হ'তেই পারে না।"

কেওন মুচকি হেসে আড় চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল। কারো মুখে কথাটি নেই। তাদের পথ চলাও যেন শেষ হয় না।

৩

পাঁচবার প্রায় তারা বিপক্ষ সৈন্যদলের হাতে পড়েছিল। প্রতিবারই কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছে। শেষবার আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি। এক চাষার বাড়িতে গিয়ে সবে আরাম ক'রে একটু চা খেতে

বসেছে এমন সময় একদল শত্রুসৈন্য হাজির—তাদের খোঁজে নয়, চায়ের চেষ্টায়। সুতরাং খিড়কি দিয়ে হুড়মুড় ক'রে পালানো ছাড়া আর উপায় কি ? কিন্তু খালিপেটে হলেও একেবারে খালিহাতে যাওয়াটা কি ভালো—তাই কেওন মস্ত এক টুকরো রুটি একেবারে আঁকড়ে ধ'রে নিয়ে এসেছিল। বেচারি! রুটি সংগ্রহের তাগিদে টুপিটার কথা আর তার মনে হোলোনা। কি দারুণ ক্ষতি! সে নাকি হিকিকে শপথ ক'রে বলেছিল টুপিটা তার স্ত্রীকে উপহার দিবে। কোন্ স্ত্রীকে তা অবশ্য বলেনি। যাই হোক, রুটিটা দুই বন্ধু ভাগাভাগি ক'রে খেল, আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর যে গরম চা আর তাজা মাখন ফেলে এসেছে তার কথা ভেবে অনেক দুঃখ করল।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'লে তারা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আর তাড়ার ভয় ছিলনা। হিকি বল্‌ল, যে জায়গায় তারা এসে পৌঁছেছে তার কাছেই তার এক খুড়ী থাকেন। সেখানে রাত কাটালে মন্দ কি ? কেওন খুব উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে বল্‌ল, "কি জানি, বাবা, বুড়ী যদি আমাদের বন্দুক আর সাজসজ্জা দেখে ভয়টয় পায়, তাই বলি ওগুলো রাতের মত কোথাও রেখে যাই।"

বাড়ির কাছে যখন তারা পৌঁছাল তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। একটা প্রাচীরের গায়ে বন্দুকগুলো রেখে লম্বা ঘোরানো পথ বেয়ে তারা পাহাড়ের উপর বাড়ির দরজায় উপস্থিত হোলো। পথ ঘাট মাঠ স্তব্ধ। রাতের আকাশ মায়ের স্নেহের মত গভীর শান্তিতে বিপুল পৃথিবীকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। মাঠের ঘোর সবুজ রঙ্ ক্রমে ধূসর হয়ে দূরে উজ্জ্বল বেগুনিতে মিলিয়ে গেছে। মাঝ দিয়ে গেছে একটি নদী। তার শীর্ণ স্রোতের রেখাকে দেখাচ্ছে ঠিক আগুনের শাদা শিখার মত। পথের ধারে গাছের সার, দুটো একটা ঝরা পাতা তাদের মাথায় এসে পড়ছে। আবছায়া ডালপালার তলায় গুঁড়িগুলো মাঝে মাঝে ঈষৎ চক্‌চক্ করছে।

শাদা চুনকাম-করা লম্বা গোছের বাড়ি। নিচু ছাদ। চার পাশে হাতাতে রান্নাবাড়ি প্রভৃতি। হিকির খুড়ী বেরিয়ে এসে এদের অভ্যর্থনা করল। বুড়ী বাতে একেবারে কুঁজো। নাকের উপর চশমা চড়িয়ে এদের

দেখে সে বেশ খুসীই হোলো। রান্নাঘরে গিয়ে এরা দুজনে চা খেতে বসল। ধক্ ধক্ ক'রে আগুন জ্বলছে, তারি উপর লম্বা চেন দিয়ে ঝুলোনো চায়ের কেট্‌লি। বাড়িটির যা-কিছু সবই নিতান্ত শাদাসিধে আর সাবেক কালের—খোলা উনুন, চাকা ঘুরিয়ে চালানো হাপর, সামনাসামনি দুটি দেওয়ালের দুটি ছবি, একটি বিদ্রোহী রবার্ট্ এমেট্-এর, যার প্রাণদণ্ড হয়েছিল, আর একটি দেশনেতা পার্ণেল্-এর। সাবেক কালের হ'লেও জায়গাটি কিন্তু বেশ আরামের। যখন খুড়ী জানলার পাখী বন্ধ ক'রে আলো জ্বালিয়ে দিল আর ঘরটা বেশ মনের মতো গরম হোলো, জায়গাটির আরাম আরো যেন নিবিড় হ'য়ে উঠল। আর বুড়ী যখন টেবিলের কাছে চেয়ার এগিয়ে এনে হিকিকে তার মা বোন সকলের কথা জিজ্ঞাসা করল তখন মনে হোলো এ যেন একেবারে নিজেদের বাড়ি। এই ভাবে ভবঘুরের মতন ঘুরে বেড়ানো নিয়ে সে হিকির সঙ্গে খুব খানিকটা রঙ্গ করল। তবুতো সারাদিন দুই বন্ধুর কি রকম কেটেছে আর সেই বন্দুক লুকানোর ব্যাপার কিছুই তারা ভাঙেনি। আরো কত ঠাট্টাই না সে করল। বেশি বয়সে সংসারের বাঁধন যখন আলগা হ'য়ে আসে, জীবনের জটিল ব্যাপারগুলো যখন ছায়ার মত ক্রমশ দূরে সরে যায়, তখন এই ভাবেই লোকেরা কথাবার্ত্তা বলে—এই রকম নিশ্চিন্ত হালকা মনে।

ব্যাণ্ড বাজিয়ে দস্তুরমত দাঙ্গাবাজী ক'রে যখন ভোট সংগ্রহে লোকে একেবারে উন্মত্ত হ'য়ে উঠত বুড়ী সেই আমলের লোক। হিকির কাছে সে সব কথা মনে হয় যেন কত যুগ আগের—প্রায় রূপকথা বললেও চলে। তখনকার দিনের দেশনেতা পার্ণেল বুড়ীর শেষ উপাস্য দেবতা—পার্ণেলের পর বুড়ী আর কিছু খবর টবর রাখেনা। এই অদ্ভুত সেকেলে জীবটির কথাবার্ত্তা ধরণধারণ হিকির মনকে খুব অদ্ভুতভাবেই নাড়া দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বুড়ী যে-জগতে বাস করে সেটা সম্পূর্ণ তার মনগড়া, বাস্তব জগতের সঙ্গে তার কোনোই মিল নাই। এই ভাবেই তাদের কথাবার্ত্তা চলছিল—কেউ কাউকে বোঝেনা, যে-যার নিজের মত ব'কে যাচ্ছে।

কেওন ইতিমধ্যে নির্ব্বিবাদে খেয়ে যাচ্ছিল। তার এক চোখ কিন্তু ছিল যে তরুণী নারীটি নীরবে রান্নাঘরের সব কাজকর্ম্ম করছিল তার উপর।

পাঁড়াগেঁয়ে মেয়ে, বুড়ীর কাজকর্ম্মে সে সাহায্য করে। তার চেহারায় একটি আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য ছিল—তাই ঠিক সুন্দর না হ'য়েও তাকে সুন্দর দেখায়। শীর্ণ ঋজু তার দেহ, মুখে হাসির রেশ নাই, বড় বড় দুটি চোখের দৃষ্টি উদাস বিষণ্ণ। মাথার উপরে একরাশ সোনালী চুল মস্ত খোপা ক'রে বাঁধা। এলোমেলো তার পোষাক, আর তারি তলায় তার দেহের কমনীয়তা রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে। এই বলিষ্ঠ অথচ কিশোর দেহের সহজ সঞ্চরণ কে'ওন মুগ্ধ হ'য়ে দেখছিল।

এক বোতল হুইস্কি এসে পড়াতে তার চমক ভাঙ্‌ল। বেশ কড়া এক গেলাস ভ'রে নিয়ে সে খুব তৃপ্তির সঙ্গে চুমুক দিল। হিকি একবার কট্‌মট্‌ ক'রে তাকাল, কিন্তু কে'ওনের তাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। বাপ্‌রে, এক হপ্তা সে ওসব ছুঁতে পারেনি। পাছে খারাপ দৃষ্টান্তে আর সকলে বিগড়ে যায় তাই হিকি এবিষয়ে খুব কড়া ছিল।

এই দুইটি অতিথির বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করার জন্যে বুড়ী আর তাঁর পিছন পিছন তরুণীটি ঘর থেকে যেই চ'লে গেলেন, অমনি কে'ওন টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বল্‌ল, "জিম, ভাই, আমি কিন্তু আগের থেকে ব'লে রাখছি—ঐ মেয়েটিকে আমি ভালো না বেসে পারবনা।"

"পারতেই হবে।"

"কখ্‌খনো না। আর শুধু কি তাই? মেয়েটিও আমাকে ভালো না বেসে পারবে না। সুতরাং আমার এইখানেই স্থিতি। বুঝলেহে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী! এতদিন তো যথেষ্ট সংযম অভ্যাস করা গেল, আর কেন?"

"হুইস্কির মাত্রা একটু বেশি হয়েছে। এইবার ক্ষান্ত দাও।"

"আরে, থামোনা, গুরুমশায়—এখন তো আমাদের ছুটি।"

ইতিমধ্যে হিকির খুড়ী ফিরে এলেন। কথাবার্ত্তা আবার সুরু হোলো। হিকির চোখ রয়েছে কিন্তু সারাক্ষণ কে'ওনের উপর; সে মনের আনন্দে গেলাসের পর গেলাস হুইস্কি শেষ করছে আর মেয়েটির দিকে ঘন ঘন নজর দিচ্ছে—তার সাহস ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আর এক গেলাস ঢালবার জন্যে সে হাত বাড়িয়েছে এমন সময় হিকি বোতলটা ছিনিয়ে নিল।

"যথেষ্ট হয়েছে—আর নয়।" এক হাতে সে বোতল আগলাচ্ছে, আর এক হাত দিয়ে কেওনকে ঠেকাচ্ছে।

কেওন কত অনুনয় করল। আর মাত্র একটি গেলাস—তাও নয়, এক চুমুক, এক ফোঁটামাত্র। ভারি ক্লান্তি লাগছে—খেয়েই সে শুয়ে পড়বে। হিকির খুড়ীও সঙ্গে যোগ দিয়ে বল্‌ল, তাইতো, সারাদিন পরিশ্রমের পর আর এক গেলাস না হয় খেলই, একটু তাজা হওয়াতো দরকার। কিন্তু কে কার কথা শোনে? দরকার বোধ করলে হিকির মতন কড়া লোক হয় না—এবং এ ক্ষেত্রে সে দরকার বোধ করছিল। অগত্যা বুড়ীর পিছন থেকে হিকিকে মুখ ভেঙ্‌চিয়ে কেওন শুতে গেল। তার ভীষণ রাগ হচ্ছিল, জোর ক'রে সে জেগে থাকার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এল, আস্তে আস্তে সে বিছানায় ঢলে পড়ল।

হিকিরও ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু ম্যালো থেকে খুড়ো বাড়ি ফেরা পর্য্যন্ত সে জেগে রইল। খানিক পরে পাথর-বাঁধানো আঙিনায় গাড়ির চাকার ও ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল, ও অবশেষে তার খুড়ো ঘরে ঢুকল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকেই বৃদ্ধ খবর দিল, বাইরে নাকি ঝড় উঠছে। হিকির মনে হোলো, সত্যিই তো, বাড়ির চারপাশের গাছগুলো যে শির্‌শির্ করছে! বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বল্‌ল, "ভগবান ঝড় পাঠান ঝরাপাতা উড়িয়ে নেবার জন্যে"—যেন কতই তত্ত্ব-কথা আওড়াচ্ছে। "এইবার শীলার শুতে যাবার সময় হোলো", এই ব'লে খুড়ী সেই তরুণী নারীটিকে শুতে পাঠালেন। রান্নাঘরের পাশে তার ছোট্ট শোবার ঘর। আস্তে আস্তে উঠে সে চলে গেল, মুখে একটি কথা নেই, অদ্ভুত মেয়ে!

তারপর বুড়ো বুড়ী আর ভাইপোতে বসে চা-পান এবং গল্প। খুড়ীর মুখে কথার স্রোত আর থামতে চায়না। এর কথা, ওর কথা, তাদের পরিবারের খুঁটিনাটি কতই না বাজে কথা। হিকির চোখে ঘুমের ঘোর ঘনিয়ে আসছে আর মাঝে মাঝে সে ঢুলে পড়ছে, আবার চমকে উঠে সোজা হয়ে বসছে। খুড়োরও দশা প্রায় ঐ রকম। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড চেষ্টার পর গুরুগম্ভীর যা-হোক কিছু একটা ব'লে আবার বুড়ো

ঝিমোচ্ছে। অবশেষে বৃদ্ধ আর না পেরে উঠে পড়ল। হিকিও তার সঙ্গ নিল। খুড়ী রইলেন আলোটালো সব নিবোতে।

কেওনের মতন অমন একটি জীব থাকা সত্ত্বেও হিকির এই বাড়িটিকে কেমন স্তব্ধ, নির্জ্জন, পৃথিবীর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ব'লে মনে হচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল, যদি তাদের খোঁজে এই বাড়িটিতে আবার খানাতাল্লাস প্রভৃতি দৌরাত্ম্যের সুরু হয়। তার চাইতে বোধহয় একেবারে না আসাই ছিল ভালো। এই দুটি শিশুর মতন সরল নিঃসন্তান নিরুদ্বেগ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জীবনে কোনো আশা বা আশঙ্কার বালাই ছিলনা। হিকির মন চাইছিল না যে তাদের জন্যে এদের কোনো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে হিকি দেখছিল বাইরে গাছের সার হাওয়ায় দুলছে। তাদের ছোট্ট শোবার ঘরটির জানলার ফ্রেমে আর মেজের তক্তাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের শব্দ বহুদূরের মাদলের ক্ষীণ ধ্বনির মতন তার কানে আসছিল। মোমবাতি জ্বালিয়ে সে কাপড় ছাড়ছে এমন সময় কেওন ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি যাই বলো, মেয়েটিকে আমি চাই—তুমি—যাই—বলো……।"

"কর্ত্তা, একটু ভালো হ'য়ে ঘুমোও। অত চ্যাঁচামেচি কোরোনা", এই বলে সেও কেওনের পাশে গিয়ে শুল।

বাতাস নাকি ? তাই তো, বাতাসই তো বটে। সে সবে ঘুমিয়েছিল, এরই মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। দমকা হাওয়ায় জীর্ণ বাড়িটির জানলার শার্সিগুলো থরথর ক'রে কাঁপছিল। "ভগবান ঝড় পাঠান ঝরাপাতা উড়িয়ে নেবার জন্যে"—কথাটা মনে পড়ে তার হাসি পেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে দেখছিল জানলার শার্সিগুলো বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—সুতরাং বাইরে বৃষ্টি পড়ছেনা। হঠাৎ তার মনে হোলো কি নিরর্থক নিরানন্দ তার জীবন। এই যে পালিয়ে বেড়ানো আর কষ্ট সহ্য করা—কার কি লাভ এতে ? অবশ্য যুদ্ধে তাদের দল জিতবে, কিন্তু যদি হারে তখন উপায় ? কলেজ ছাড়ার পর থেকে পুলিশ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। ফেরার পথ একেবারে বন্ধ। এক উপায় আমেরিকা

পালানো। হায়রে, এই জন্যেই কি তার মা এত কষ্ট ক'রে তাকে লেখা পড়া শিখিয়েছিল—মরবার সময় ছেলের এই দশা দেখবার জন্যে ?

ঠিক এই কথা সেই দিন—না আগের দিন ?—সকালে সে তো স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। সেই যখন গ্লেন্‌ম্যানাসের বনের ধারে সে দাঁড়িয়েছিল আর সামনের সেই বাড়িটির দরজায় হঠাৎ শাদা পোষাক-পরা একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। সেই মেয়েটির কাছেও কি এই সব গণ্ডগোল একেবারেই নিরর্থক মনে হয়নি ? ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার মনের মধ্যে যেন হঠাৎ সব চূরমার হয়ে ভেঙে গেল আর তার মনে হোলো কি নির্ম্মম, কি দারুণ নির্ম্মম এই সমস্ত যা কিছু! সে ছট্‌ফট্ করছিল ঐ মেয়েটির সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যে, অন্তত একটিবার হাত নেড়ে তাকে ডাকতে। মানুষের সামান্য একটু সঙ্গের জন্য এত কাতরতা কেন ? তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে সে ব্যস্ত, তাই বেশিক্ষণ এসব কথা ভাববার তার সময় হয়নি। কিন্তু আজ রাতে একলা বিছানায় শুয়ে তার নিঃসঙ্গ নিরর্থক জীবনের বেদনা দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিল।

"এ ভাবে বেঁচে কি লাভ" ?—হঠাৎ চেঁচিয়ে সে এই কথা জিজ্ঞাসা করল। সে শুনল বাতাসের মৃদু আর্ত্তনাদ দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো এই প্রাচীন বাড়িটির স্তব্ধ শান্তি ক্ষুব্ধ করছে, তার মনে হোলো তার অন্তর্নিহিত দুঃখ আর বাতাসের এই আর্ত্তনাদ যেন এক।

"জিম" !

পাশে কেওন উঠে বসে তাকে ডাকছিল। হিকি চোখ বুঁজে চুপটি করে পড়ে—পাছে কেওন আবার বক্‌বক্ সুরু করে।

"জিম" !

কি অদ্ভুত কেওনের গলার স্বর! মনে হলো সে যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে। বিছানা হাতড়ে হাতড়ে কেওন হিকির হাত ধ'রে তাকে টানছিল।

"জিম, শীগ্‌গির ওঠো, শোনো!"

"কেন, ব্যাপার কি ?"

"শুনছনা!" "কি?" "ঐ যে!" "হাওয়ার কথা বলছ?" "জিম!" "শীগ্গির ঘুমোও—সত্যি আর জ্বালিয়োনা।" "জিম শোনো!" "শুনছিতো।" "ঐযে! কি সর্ব্বনাশ!"

বাতাসের আর্ত্তনাদে সমস্ত বাড়িটি যেন গোঙ্রাচ্ছিল। এই গোঙানির উপর আর একটা তীব্র আওয়াজ ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। বাইরের গাছে গাছে তখন তুমুল তাণ্ডব সুরু হয়েছে।

"জিম, শোনোনা।"

"কি হয়েছে বলনা বাপু।"

"সহ্য হয় না! যীশুখৃষ্ট! অসীম তোমার শক্তি। আর যে পারি না!" হঠাৎ বিছানার চাদরটাদর সব ছুঁড়ে ফেলে দুই হাতে চোখ ঢেকে কেওন শক্ত হ'য়ে শুয়ে পড়ল। চমকে উঠে হিকি জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে তোমার?"

"ঐযে! ওরা আস্‌ছে!" কেওনের গলার স্বর বিকৃত! ভয়ে সে প্রায় চেঁচাতে সুরু করেছে।

"শীগ্গির চুপ করো। বাড়িশুদ্ধ জাগাতে চাও নাকি? এখানে কি এইজন্যে আসা হয়েছিল? কি হয়েছে খুলে বলো শীগ্গির!"

"বলছি ওরা এসেছে—ঐযে বাইরে, শুনছনা? কানের মাথা খেয়েছ?"

হিকি হাত দিয়ে কেওনের মুখ শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে বল্‌ল, "চুপ! চুপ! বাড়িতে সব বুড়ো বুড়ো লোক ঘুমাচ্ছে। আক্কেল নাই, তারা যে উঠে পড়বে!"

"কখ্খনো চুপ করব না। ঐ শোনো!"

আবার বাতাসের গর্জ্জন সুরু হয়েছে। এক একবার হাওয়া পড়ে যাচ্ছে, তারপর অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর আবার নতুন ক'রে আরম্ভ হচ্ছে। হিকির হাতের মধ্যে কেওন ভয়ে একেবারে কাঠের মতন শক্ত হয়ে আছে।

"লক্ষীটি জিম্, কি করি?"

"তোমাকে এই শেষবার বলছি। চুপ ক'রে শুয়ে থাকো তো ভালো, নইলে তোমাকে আস্ত রাখব না। বেশি টেনে এই অবস্থা হয়েছে। বুঝেছ ?"

"উঃ! পারিনা!"

"সাবধান!"

বাইরে বাতাস প্রচণ্ড হুঙ্কারে আবার তাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। কেওন পাগলের মতো হিকির হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল। প্রাণপণে সে হিকির বাঁ হাত ধ'রে টানছিল, যাতে সে তার মুখ চেপে ধরতে না পারে। সে আবার চেঁচাতে যাচ্ছে এমন সময় হিকির এক ঘুসি এসে পড়ল তার মুখে। তার ভয়ের চীৎকার হঠাৎ যন্ত্রণার কাতর গোঙানিতে মিলিয়ে গেল।

"কি রকম ? এবার ঠাণ্ডা হবে তো ?"

"পায়ে পড়ি জিমি, আমাকে মেরোনা। আমি মিথ্যে বলছিনা—নিশ্চয় ওরা আসছে।"

কেওন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ঘুসি খেয়ে তার ঠোঁট নিশ্চয় কেটে গিয়েছিল, কেননা হিকির বাঁ হাত গড়িয়ে রক্ত পড়ছিল।

"তুমি তাহলে চুপ করবে ?"

"সত্যি বলছি আমি চুপ করব। শুধু অমন ক'রে আমায় মেরোনা, পায়ে পড়ি, মেরোনা।"

"আচ্ছা মারবনা। কেটে গিয়েছে ?"

"জিমি!"

"জিজ্ঞাসা করছিলাম—কেটে গেছে কিনা।"

"জিমি, আমার হাত ধরো।"

হিকি তার হাত ধরতে কেওন চুপ করল। তাকে ঠাণ্ডা দেখে হিকি আবার তার পাশে গিয়ে শুল। কেওন তার আর একটি হাত হিকির হাতে ঘাড়ে মাথায় বুলিয়ে তাকে যেন আরো কাছে পাবার চেষ্টা করছিল। হিকি ভাবছিল, খুব ঘুম হোলো যাহোক।

সত্যি হিকির কপালে রাত্রে ঘুম একেবারে ছিল না। খানিকক্ষণ তার সঙ্গীটি বেশ চুপচাপ থাকে, তারপর যেই ঝড়ের বেগ বাড়ে আর

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা কেঁপে ওঠে বা শ্লেটের চাল থেকে এক টুকরো আলগা শ্লেট সশব্দে পাথর-বাঁধানো আঙিনায় পড়ে, অমনি আবার কেওনের প্রলাপ আরম্ভ হয়।

"জিম, ওরা আমাকে ধরতে আসছে!"

"চুপ করো, ভাই, দোহাই তোমার চুপ করো।"

"ঐ যে ওরা আসছে! বাইরে ওদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমাকে ওরা ধ'রে নিয়ে যাবে। আমার বন্দুকটা কোথায় জিম? শীগ্‌গির, শীগ্‌গির!"

"কি পাগলের মত বকছ? ওতো বাতাসের শব্দ! তোমার মতন লোকের হাতে এখন বন্দুক দিলেই হয়েছে, একটু জোর বাতাসেই যার এই অসম্ভব প্রলাপ!"

"জিম, সর্ব্বনাশ হোলো! আর রক্ষে নাই!"

ভোরের দিকে ক্লান্ত হ'য়ে কেওন অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল। পাছে সে জেগে ওঠে তাই অতি সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে হিকি পায়জামা আর কুর্ত্তাটা পড়ল, তারপর একটা সিগরেট ধরিয়ে জানলার ধারে গিয়ে বসল। বাতাসের প্রকোপ তখন কমে গিয়েছে। আকাশে মেঘের সার ছুটে চলেছে, তারি ফাঁকে ফাঁকে গাছের মাথায় মাথায় আবছায়া আলো এসে পড়ছে। ধূসর কুয়াসায় আঙিনা ঢাকা। ক্রমে কুয়াসা যতই পরিষ্কার হতে লাগল হিকি দেখল সারা আঙিনা ছেয়ে রয়েছে ঝড়ের দৌরাত্ম্যের চিহ্ন—ঝরা পাতা, ভাঙা শ্লেটের টুকরো, অজস্র খড়কুটো। ক্রমে আরো পরিষ্কার হোলো। বিরলপত্র গাছগুলোকে ঠিক মল্লযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত পালোয়ানদের মতন দেখাচ্ছিল। কনকনে ঠাণ্ডা। শীতকালের মত ম্লান আলোয় আকাশ পৃথিবী ভরে গিয়েছে। গাছে গাছে পাখীরা গান গাচ্ছে।

একটা দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার শব্দ তার কানে এল। আঙিনায় কার যেন পায়ের শব্দ; প্রকাণ্ড একটা বালতি হাতে শীলা ঐ বাইরের একটা ঘরের দিকে যাচ্ছে। তার পায়ে মস্ত একজোড়া ছেলেদের বুট—মাপে প্রায় তার পায়ের দ্বিগুণ, পাথরের উপর তারি খটখট আওয়াজ

হচ্ছিল। সোনালী চুলের লম্বা বেণী দুলিয়ে সে চলছিল—মনে হচ্ছিল তার পিঠের দীর্ঘ খাজ যেন এই বেণীরই জন্যে।

আস্তে আস্তে উঠে মোজা পরে হিকি পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরে গেল। খোলা দরজা দিয়ে সামান্য ঝাপসা আলো এসে পড়েছে—তা না হলে ঘরটি ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরে শীলার পায়ের শব্দ তার কানে এল। তাড়াতাড়ি গিয়ে তার হাত থেকে বালতিটা সে নিল। শীলা জিজ্ঞাসা করল, রাত্রে ঝড়ে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে কিনা। সে একটু মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ল। চিমনির আগুনের কাছে গিয়ে শীলা হাঁটু গেড়ে বসে হাপরের চাকা ঘুরাচ্ছিল। ক্রমে আগুনের আভায় ঘরটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। শীলার পিঠে সোনালী চুলের বেণী, তার মুখে আগুনের গোলাপী আভা। সে উঠে দাঁড়াতে হিকি দুই হাতে তাকে টেনে নিয়ে তার মুখচুম্বন করল। হিকির কাঁধে মাথা রেখে শীলা তখন তার গায়ে লুটিয়ে পড়েছে। কি অদ্ভুত এই নীরব মেয়েটি। কি নিঃসঙ্কোচ তার এই আত্মসমর্পণ! আগুনের উত্তাপে যখন ঘর ক্রমে ভরে গেল, অতৃপ্ত বাসনার নিবিড় ব্যথায় হিকির মন তখন অধীর হয়ে উঠেছে—শীলার ঘাড়ে মুখ গুঁজে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। নীলাভ ধূমের কুণ্ডলী ধূসর মাঠের উপর গাছের পল্লবে পল্লবে ক্রমশ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। শরতের সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলোয় আকাশ পৃথিবী তখন উদ্ভাসিত।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

দিনান্ত

একাত্তরটি প্রদীপ-শিখা নিব্‌ল আয়ুর দেয়ালিতে,
শমের সময় হোলো কবি এবার পালা-শেষের গীতে।
গুণ টেনে তোর বয়েস চলে, পায়ে পায়ে এগিয়ে আনে
তরঙ্গহীন কূল-হারানো মানস-সরোবরের পানে।
অরূপ-কমলবনে সেথায় স্তব্ধ বাণীর বীণাপাণি,—
এতদিনের প্রাণের বাঁশি চরণে তাঁর দাওরে আনি।
ছন্দে কভু পতন ছিল, সুরে স্খলন ক্ষণে ক্ষণে,
সেই অপরাধ করুণ হাতে ধৌত হবে বিস্মরণে।
দৈবে যে গান গ্লানিবিহীন ফুলের মতো উঠ্‌ল ফুটে
আপন বলে নেবেন তাহাই প্রসন্ন তাঁর স্মৃতিপুটে।
অসীম নীরবতার মাঝে, সার্থক তোর বাণী যত
অন্ধকারের বেদীর তলায় রইল সন্ধ্যাতারার মতো।
যৌবন তোর হয় নি ক্লান্ত এই জীবনের কুঞ্জবনে,—
আজ যদি তার পাপড়িগুলি খসে শীতের সমীরণে
দিনান্তে সে শান্তিভরা ফলের মতো উঠুক ফলি'
অতন্দ্রিত নিশীথিনীর হবে চরম পূজাঞ্জলি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জার্নাল

সুন্দরের জাতি নাই। যাহাদের আছে
তাহারা নমিত-শির সুন্দরের কাছে।
তাহাদের মুগ্ধনেত্রে পড়ে না পলক।
অন্তরে উদ্বেলি' উঠে অব্যক্ত পুলক।
দাক্ষিণ্যের ভারে চিত্ত পরিত্রাণ যাচে
সুন্দরের কাছে॥

১১ই জানুয়ারী ১৯৩৩

সে ছিল পাষাণ
শিল্পী তারে করে গেল
কী সুষমা দান !
মূর্খ তারে দেবী ভ্রমে
অর্ঘ্য যায় দিয়া
সুবিচিত্র মনস্কাম
যত্নে নিবেদিয়া।
প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ
তারে মাপে জোপে,
লক্ষণ মিলায়ে রাখে
যাদুঘর-খোপে ॥

১২ই জানুয়ারী

পার্শ্বে প্রিয়া, তাহার পানে
তাকাই নাকো ফিরে ;
কোন অতীতের যুদ্ধকথা
মন ফেলেছে ঘিরে।
সত্য কিনা তাও জানিনে
সত্যসম লাগে।
রাত্রি হলো গভীর, তবু
চিত্ত আমার জাগে ॥

১৩ই জানুয়ারী

স্রষ্টা যিনি মানবের মাঝে
মৃত্যু তাঁর কী করিতে পারে ?
দেশে দেশে তাঁর আমন্ত্রণ
ভায়া নারে রোধ করিবারে ।

কে জানে আমার স্বজনের
কোন দূরে কত যুগ পরে
কে লভিবে পূর্ণতম স্বাদ
আবিষ্কার-মোদিত আদরে !

দান মম সত্য হোক শুধু,
প্রাণ মোর রহুক তাহাতে,
একদিন কোথাও কেমনে
কেহ তুলে লবে যোড়হাতে ॥

১৪ই জানুয়ারী

হারায়েছি কত সূর্য্যোদয়
মূল্য যার গণনা না হয়
অবহেলা ভরে।
কত পুষ্প দ্বারে কর হানি'
দিনান্তে ঝরিয়া গেছে জানি
মূক অনাদরে।
কত দিন অমূল্য সময়
বৃথা তর্কে করিয়াছি ক্ষয়
আলস্যে বিলাসে।
হারায়েছে থান দুই সোনা
দাম যার হাতে যায় গোণা
খেদ কেন আসে !

১৬ই জানুয়ারী

আদরিণী বধূ, স্নেহের ছুলাল,
ছোট একখানি গেহ,
ছু চারিটি প্রিয় আত্মীয়জন,
বয়স্যজন কেহ,
পুরানো ভৃত্য একটি কি ছুটি,
—স্বর্গ ইহারে কয়,
সুলভের মতো শুনিতে, কিন্তু
ছুর্লভ অতিশয় ॥ ২৭শে জানুয়ারী

ছপ্ ছপ্ পড়ে দাঁড় নৌকা চলে।
পাতিহাঁস সন্তরে নদীর জলে।
কাদাখোঁচা উড়ে যায় অদূরে বসে।
ছুই তটে শূন্যতা, রৌদ্র শ্বসে ॥ ২৯শে জানুয়ারী

ছু দিনের শেষে বন্ধুরা গেছে
যে যার আলয়ে ফিরে।
উহাদের সাথে সুখগুঞ্জন
বিস্মৃত হই ধীরে।
আসে কর্ম্মের চক্রমুখর
কটু কর্কশ দিন
ছু দিনের স্মৃতি স্বপ্নের মতো
সত্বর হবে লীন ॥ ৩১শে জানুয়ারী

মন চলে গেছে দূরে হিমাদ্রিচূড়ে
অরণ্যনীল তুষারশুভ্র পুরে।
দেবতা যেথায় একা
ছুর্গমপথ-লঙ্ঘনকারী
যাত্রীরে দেন দেখা ॥ ১লা ফেব্রুয়ারী

তুচ্ছ দিনেও ক্ষান্ত রহে না
　　জীবনের সঞ্চয়।
এক দিন মোরে পূর্ণ করিবে
　　আজিকার অপচয়॥　　　　৪ঠা ফেব্রুয়ারী

শিলা ইষ্টকে পরিচয় লিখে
　　নামহীন কবি যত
মর্ত্ত্যের দান মর্ত্ত্যে সঁপিয়া
　　কোন দূরে হলো গত।
বৃথা মোরা আছি পুরাণেতিহাস
　　বাক্য রচনারত॥　　　　৭ই ফেব্রুয়ারী

পূর্ণিমানিশি জ্যোৎস্নাধবল ধরা,
দূরে 'চোখ গেল' অপরিশ্রান্ত ডাকে।
অকারণে হাঁকে জাগরূক সারমেয়,
সকলে ঘুমায়ে স্বপ্নে হেরিছে কা'কে॥　　　　৯ই ফেব্রুয়ারী

এই দিনটিরে ভুলে যাব একদিন
　　ভুলিব ইহার অফুরান্ ব্যস্ততা।
এই সব জন কেহই রবে না মনে
　　মনে রহিবে না ইহাদের কারো কথা।
এসব দৃশ্য যেই অদৃশ্য হবে
　　স্মৃতি হতে হবে অমনি নির্ব্বাপিত।
অতঃপরের প্রবল বিসংঘাতে
　　অধুনা সে হবে চ্যুত বিস্মৃত মৃত॥　　　　২৩শে ফেব্রুয়ারী

সারাদিনভর পদে পদে ব্যর্থতা,
তিক্ত মনের বিরস রুক্ষ কথা,
আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্ছিত—
এই কি মোদের বহুদিবাবাঞ্ছিত
পদ্মার চরে বাস ?
নির্জ্জন দ্বীপ, ভেক মক্ মক্ করে,
আকাশ জ্বলিছে তারার সলিতা ধরে,
জলের সঙ্গ জাগায় কী অনুভব,
মৃদু তালে বাজে কল্লোল কলরব,
বায়ু বহে উচ্ছ্বাস। ২৪শে ফেব্রুয়ারী

ফাল্গুননিশি চন্দ্রের চোখে তন্দ্রা
স্তব্ধতা ভেদি ঝিল্লীর স্বর তীব্র
তারা ও জোনাকি দেয়ালী স্বর্গে মর্ত্ত্যে
চিত্তে আমার অম্লান তপোবহ্নি ॥ ১লা মার্চ

নর্ম্মের অবকাশ নাই রে
মগ্ন রয়েছি সদা কর্ম্মে,
চিন্তায় ভুলে থাকি তাই রে
লগ্ন রয়েছে যাহা মর্ম্মে।
যাহা মোর জীবনের বিত্ত
জীবনের অন্তে যা নিত্য
আভাস তাহার যেন পাই রে
বিস্মৃতি-বিরচিত-হর্ম্ম্যে ॥ ২রা মার্চ

ছোট ছোট কাজ বড় ভালো করে করি
বড় কাজ যত পিছনে রয়েছে পড়ি'।
তবু মনে মোর আছে এই সান্ত্বনা
করণীয় এরে করি নাই বঞ্চনা।
বড় আর ছোট কে রেখেছে ভাগ করে
কোনো দিন কেহ উল্টা বুঝিবে ওরে॥　　　　৮ই মার্চ

বিগতের শোচনীয়
　　মগ্ন
চেয়ে দেখিনা যে ধরা
　　চন্দ্রিকালগ্ন।
আকাশেতে উৎসব
　　মর্ত্ত্যে গীতরব
মৃদুল সমীরে ঝরে
　　মদিরা।
চিত্তবধূ কেন
　　বধিরা॥　　　　৯ই মার্চ

জীবন কী বিমোহন রে জোৎস্না-বিকীরিত রাত্রে
সমীর শীকর যায় বরষি, তরণী দুলিছে জলগাত্রে।
ভুবনে তাহার কিবা ভাবনা প্রণয়প্রতিমা যার অঙ্কে
কণ্ঠে যাহার সুরমদিরা তাহারে কাঁপাবে কী আতঙ্কে।
　　　　১২ই মার্চ

মহাপুরুষের সাধনা মহান
　　বিপুল তাঁহার বেদনা
ক্লান্তির ভারে কেঁদ না রে মন কেঁদ না!
কারো পরে তোর বিরক্তি নাই
　　কিছুতে নাইকো ক্ষোভ।

পৃথিবীর পথে লোষ্ট্রে নাইকো লোভ।
স্মরণ রাখিস্ সমুখ ছাড়ায়ে
আপনার দূর লক্ষ্য
ইহারা তোমার কেহ নয় সমকক্ষ।
ইহাদের পরে বৃথা অবজ্ঞা
রোষ অভিমান মিছে,
ইহাদের সাথে জড়ায়ে রোস্‌নে পিছে। ১৭ই মার্চ

কঠিন কর্ম্মযজ্ঞে শরীর যে অবসন্ন
যৌবন দিন-রাত্রি পায় না ভোগের অন্ন।
সুন্দর যায় অস্তে হেরিবার অবকাশ নাই
অন্তরতলে রুদ্ধ নিষ্ফল সব বাসনাই। ১৮ই মার্চ

প্রিয় রমণীরে প্রিয়তর বাসিবার
শক্তি আমারে দেহ প্রভু অনিবার।
সোহাগে সোহাগ ডুবাইতে যেন পারি।
আকাঙ্ক্ষা যেন পূরাইতে নাহি ছাড়ি।
ত্যাগের মূল্য যেন দিই মমতায়।
প্রিয় হতে যেন বেদনা সে নাহি পায়।
আপনারে তার মনোমতো করিবার
শক্তি আমারে দেহ প্রভু অনিবার॥

২৬শে মার্চ ১৯৩৩

লীলাময় রায়

প্রাণমৃত্তিকা

মৃত্তিকায় দিয়ে যাব
আমার জীবন নিঃস্ব ক'রে
প্রাণের নিগূঢ় সত্তা।
তাতে লাগবে রৌদ্র
পড়বে বৃষ্টি
জাগবে ঘাস।
আমার আমি থেকে ফুটবে ফুল
উড়বে ধূলো ঘূর্ণিনৃত্যে বিকেলের বাতাসে॥

প্রাণ আমার, ব্যথা পেয়োনা।
তুমি মাটিতে দিয়ে গেলে সত্তা,
থাকবে আকাশ, তুমিও থাকবে তারই সঙ্গে
ব্যাপ্তির ছড়ানো চেতনা।
ঘুরবে দিনরাত্রি, তুমিও জোয়ার-ভাঁটায় হবে আন্দোলিত
অন্য যুগে, অন্য লোকে,
অন্যকালের ভূমিকায়॥

প্রাণ আমার, ব্যথা পেয়োনা।
উজাড় ক'রে ঢালো তোমার সঞ্চিত বোধন
এই মাটিতে।
দেখ, সকল ভার তোমার মিলিয়ে গেল
দুঃখ সুখের, জানা অজানার, সকল প্রয়াসের গতি,
মাটি হোলো চেতন, পেল সত্তা॥

তোমার প্রেমের জাগরণ দিয়ে যাও,
সেই পরম দীপ্তি যা জ্বলেছিল তার চোখে,
দিয়ে যাও মাটিকে তোমাদের মিলনের সত্তা,
আনন্দের সৃষ্টি লাগুক্ মৃত্তিকায়॥

প্রাণ আমার ব্যথা পেয়োনা।
তোমাকে রেখে গেলেম আমি
মাটির বুকের ধন মাটিতে,
অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃকণা।
পেয়েছিলেম ভোরে আমার ধরণীতে,
কত জানলেম, হলেম, বাড়ল মোদের পরিচয়,
চঞ্চল আবেগে হোলো লীলা
বারেবারে, অনন্তের নীল স্থিরতার তলে
মানুষের ব্যাকুল সংসারে, প্রখর রৌদ্রে,
দূরের সন্ধানী এই মর্ত্ত্যলোকালয়তীর্থে॥

আকাশে যখন আজ তারা উঠ্‌ল,
হাওয়া উঠ্‌ল সমুদ্রপারের,
সব ঐশ্বর্য্য নিবেদন করি এস
মাটির বেদীতে
নবজন্মের সত্তা,
লোকে লোকান্তে ধারা যার বইবে
এই পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে॥

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রতর্ক

দেশে দেশান্তরে
উদ্দীপ্ত যৌবনখানি অপচয় ক'রে
এসেছে মুমূর্ষু দিবা, লুপ্তকীর্ত্তি নটীনীর প্রায়,
অক্ষম জরার লজ্জা লুকাতে হেথায়,
জগতের এ-অখ্যাত কোণে॥

মোর মনে
হয়তো বা শান্তি নেই তাই ঃ
তাই বুঝি বোধ হয় নিতান্ত বৃথাই
অন্ধকার বন্ধ ঘরে শ্বাস টেনে বাঁচা কোনোমতে ;
উন্মার্গ হয়েছে নদী, বর্জ্জিত এ-শ্মশানসৈকতে
নির্ব্বিকার ঊষরতা শুধু ;
যত দূর দৃষ্টি যায় করে ধূ ধূ
ভ্রাম্যমাণ পিঞ্জরের দুর্লঙ্ঘ্য প্রসার
নিঃসঙ্গ নির্ব্বাক নিরাকার।
মনে হয়
আত্মাপুরুষের কান্না প্রতিধ্বনিময়
শুনি যেন অহোরাত্র নীরবের ফাটলে ফাটলে ;
কি জানি কে বলে—
"খোলো খোলো অলক্ষ্য দুয়ার,
হয়ে গেছে পার,
সহনীয়তার সীমা পার হয়ে গেছে বহুক্ষণ ;
অস্থাবর মুক্তির লগন
সূর্য্যাস্তের স্বর্ণসম ভস্ম হবে চোখের নিমেষে" ॥
তাই যবে দার্শনিক বন্ধু মোর এসে
জ্ঞানস্নিগম্ভীর কণ্ঠে আরম্ভিলো তত্ত্ববিশ্লেষণ,
হলোনা তো তখনো রচন
অভ্যস্ত সখ্যের সেতু মোদের বিজন ব্যবধানে ॥

সে কহিলো,—"মরুগ্রস্ত ক্ষুব্ধ প্রেতস্থানে
হানি তীক্ষ্ণ মর্ম্মক্ষত উর্ব্বরতা আনে হলধর।
অমৃতের পুত্র মোরা ঃ জন্ম জন্মান্তর,
নন্দনের প্রতিশ্রুতি বুকে,

অভুঙ্কিত ভূমিসম প'ড়ে আছে মোদের সম্মুখে।
আজিকার ক্লেশ,
এ-বিরোধ, বিসংবাদ, অরুন্তুদ বন্ধ্য নিরুদ্দেশ,
এ-সকলি পরীক্ষা কেবল।
উন্মথিয়া সুখস্মৃতি সর্ব্বনাশা যেই হলাহল
সৃষ্টি করে সুরাসুরে জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণে,
ত্রিভুবনে
সে-বিষের জ্বালা হতে নেই নেই কাহারো নিস্তার ;
তারি পুরস্কার
অমোঘ সাযুজ্য ঐক্য মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ-সাথে।
হয়তো বা হাতে হাতে
দক্ষিণান্ত হয়না মোদের ;
জীবনের প্রসর্পণ হয়তো বা পথে বিকল্পের।
কিন্তু যার পরমায়ু অমেয় অক্ষয়,
দুগ্রহের উপদ্রব তার কাছে নগণ্য কি নয় ?
এক আধ শতাব্দীর বৈফল্য-নৈরাশ,
শাশ্বতের তুলনায়, তাহা যেন সংক্ষিপ্ত নিঃশ্বাস
দ্রুতগামী সোপানারোহীর।
ভ্রমান্ধ যে, সে কেবল আতুর অধীর,
অনন্তের প্রকৃতিরে কোনোমতে বুঝিতে না-পেরে
পথকষ্টে মৃতপ্রায় কেন্দ্র খুঁজে ফেরে।
শুধু আস্থা আর সহিষ্ণুতা,
সৃষ্টির রহস্য মাত্র এই দুটি সনাতন কথা" ॥

আরো কত বলে গেল সে যে,—
মোর জীর্ণ সংস্কারের ছিন্ন তারে বেজে
সে-তর্কের অনুনাদ মুখরিলো নিষ্ক্রিয় মস্তকে।

কিন্তু মোর স্মৃতিসিক্ত চোখে
ঘনীভূত প্রদোষের বিদেশী নীলিমা
এ-বাল্লায় প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্র চতুঃসীমা
অনায়াসে দিলো লুপ্ত ক'রে।
শরীর রহিলো হেথা, সপ্তসিন্ধু পলকে সন্তরে
আত্মা বেগবান
অচেনা নগরীচূড়ে সংগোপনে করিলো প্রয়াণ।
যুগান্তে একদা সেথা আমরা দুজনে
কল্পনার স্তূপ দিয়ে গড়েছিনু প্রসন্ন গগনে
অসম্ভব দুরাশার উদ্ধত পাহাড়;
দুরারোহ নিরালায় তার
আকাশকুসুম তুলে পেতেছিনু ভাবী ফুলশেজ।
সে-দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বাসের নাক্ষত্রিক তেজ,
নির্ব্বাণ চন্দ্রের মতো, মৃত্যুহিম আজিকে বিতরে;
বিশ্বব্যাপ্ত অভাবের অতল বিবরে
অন্তরিত সে-সম্ভ্রান্ত বিরহের দৃপ্ত সহিষ্ণুতা;
সে-দীপ্র বেদনা অনাহূতা
লাগে নাই আত্মপর কারো উপকারে;
শুধু আপনারে
করেছি একেলা নিঃস্ব অপ্রতর পরিখার মাঝে॥

সেদিনো যে নিরুপাধি সাঁঝে
এমনি চৈনিক নীল রেখেছিলো ঘিরি
অন্তরঙ্গ ঘটাটোপে অবিচল সে-মানসগিরি।
জানি তাই, ও-দিব্য বরণ
নহে শাশ্বতের কান্তি; ও যে প্রাবরণ
নিরাশ্বাস নিরর্থ শূন্যের।

হে বন্ধু, তাইতে তব তত্ত্বদর্শনের
পরিক্ষিপ্ত যুক্তিজাল বাঁধিবারে পারেনা আমায়।
যদিও বা ক্লান্ত বুদ্ধি মাঝে মাঝে তর্কে দেয় সায়,
তবু মোর উপজ্ঞা গভীর
জানে স্থির
অনন্ত অমৃত তব মায়া, মিথ্যা মায়া ;
হয়তো তা হতে সত্য অতীতের এই রিক্ত ছায়া ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

ভবানন্দের হরিবংশ—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য গ্রন্থমালা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

এ গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্বেই সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু তিনি বাংলা সাহিত্যকে যে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তা' বহুকাল অটুট থাক্‌বে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ৫ খণ্ডে শ্রীশ্রীপদকল্পতরু প্রকাশ করেন, এবং সেই বিপুল গ্রন্থ সম্পাদনে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন এ গ্রন্থেও আমরা তার পরিচয় পাই। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রকাশিত হবার পর আমরা আর এরূপ সুসম্পাদিত গ্রন্থ দেখিনি। দুখানি বিভিন্ন পুঁথি অবলম্বনে গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে, সযত্নে শব্দগুলির পাঠান্তর দেওয়া হয়েছে, ভূমিকায় গ্রন্থের ভাষা ছন্দ ও বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সম্পাদক গ্রন্থের পরিশিষ্টে টীকায় দুরূহ পঙ্‌ক্তিগুলির অর্থ আলোচনা করেছেন ও পরিশেষে অতি প্রয়োজনীয় শব্দসূচী দিয়েছেন। এ শব্দসূচীতে শব্দগুলির অর্থ নির্দ্দিষ্ট ও বহুস্থানে উৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে।

হরিবংশের পুঁথিগুলি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান পাবনা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট থেকে সংগৃহীত। ময়মনসিংহ জেলা থেকেই তিনখানি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে ও তন্মধ্যে একখানিই সব চেয়ে প্রাচীন—লিপিকাল ১০৯৬ সাল; এ পুঁথিখানি সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ও সুলিখিত। এই পুঁথিখানির পাঠ আলোচনা করে সম্পাদক স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন যে এ পুঁথি লেখার অন্ততঃ এক শতক পূর্ব্বে ভবানন্দ তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হরিবংশের ভাষা ও কথাবস্তু প্রভৃতির বিচার করেও সম্পাদক ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে সম্পাদক মনে করেন যে গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও চৈতন্যের পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি রসশাস্ত্রকারদের কোন প্রভাব এ গ্রন্থে দেখা যায় না বলেই মনে হয় যে চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরেই ভবানন্দ তাঁর কাব্য রচনা করেন। হরিবংশের ভাষা পূর্ব্ববঙ্গের। তা' ছাড়া বেশীর ভাগ পুঁথিগুলিই পূর্ব্ববঙ্গে পাওয়া গিয়েছে ব'লে সম্পাদক স্থির করেছেন যে ভবানন্দের জন্মভূমি ছিল হয় পূর্ব্ব ময়মনসিংহে, না হয় কুমিল্লা বা পশ্চিম শ্রীহট্টে। সম্পাদক মহাশয়ের এ সব সিদ্ধান্ত যে যুক্তিযুক্ত তা'তে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন খুব প্রাচীন গ্রন্থ বলেই সম্পাদক মহাশয়ের বিশ্বাস, কিন্তু তবুও হরিবংশের ভাষার সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার তুলনা করে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা' প্রণিধানযোগ্য—"হরিবংশের প্রাচীনতম পুঁথিতে বেশীর ভাগ 'ঠাই' ও ক্বচিৎ 'ঠাঞি' রূপ দেখা যায়। সংস্কৃত 'সাগর' শব্দের অপভ্রংশে 'সাঅর' বা 'সায়র' ও নাগর শব্দের অপভ্রংশে 'নাঅর' বা 'নায়র' রূপ হিন্দি, মৈথিল ও বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যে প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'সাগর' ও 'নাগর' ব্যতীত কুত্রাপি অপভ্রংশ রূপগুলি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দাবলীর এই উচ্ছৃঙ্খল রূপবৈষম্যে ও 'নাগর' 'সাগর' ইত্যাদি তৎসম শব্দ প্রয়োগের অস্বাভাবিকতা দেখিয়া, ইহা অনুমান না করিয়া পারা যায় না যে, এই সকল রূপবৈষম্য কোনও নির্দ্দিষ্ট

ব্যাকরণের নিয়মের ফলে ঘটে নাই; কবি অথবা কাব্যের লিপিকারদিগের স্বাধীনতা হেতুই এইরূপ বানানে বৈষম্য ঘটিয়াছে।”

যাঁরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন রত্নগুলির উদ্ধারে ও আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন আশা করি তাঁদের নিকট পরলোকগত সম্পাদকের এই সুচিন্তিত ভূমিকা, সুসম্পাদিত গ্রন্থ ও সযত্নে রচিত শব্দসূচী উপযুক্ত সমাদর পাবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

Life and Experiences of a Bengali Chemist—
By Prafulla Chandra Roy—Published by Messrs. Chakravertty, Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta,

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৃহৎ আত্মজীবনী। জগতের চক্ষে আচার্য্যদেব কত বড় রসায়নবিৎ, সে বিষয় আলোচনা করা তাঁহার ছাত্রের পক্ষে অশোভন। তাঁহার সাধের Bengal Chemical Works যৌথ কারবার হিসাবে সমগ্র ভারতে কি পৃথিবীতে কত বড় প্রতিষ্ঠান, তাহাও বিবেচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে যে হতভাগ্য দেশ চির-তিমিরাবৃত, সেখানে খদ্যোৎকুলের কীর্ত্তিও চারণের গৌরবগাথার বিষয় হয়। নিজের জন্মভূমির হীনতায় নতমস্তক এই অতি ক্ষুদ্র সমালোচকের চক্ষে আচার্য্যদেবের যে রূপ প্রতিভাত হইয়াছে, শুধু তাহারই কথা বলিব। সে রূপ দেশপ্রেমিক অকিঞ্চন স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসীর রূপ। তাহার অনুপম গৌরবচ্ছটার সম্মুখে রসায়নচর্চ্চা ও মিল স্থাপন প্রচেষ্টা ম্লান হইয়া যায়। গুরুদেব চিরজীবন ব্রাহ্মণের উচ্চতম আদর্শের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। এই দ্বিজশ্রেষ্ঠের হস্তে বৈশ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কত দূর কার্য্যকরী হইবে তাহাতে আমার সন্দেহ আছে। তাঁহার গভীর বিদ্যানুরাগ প্রিয়ছাত্র বর্গের মধ্যে অনস্যূত হইয়া সারা ভারতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার দেশসেবা, দরিদ্র সেবার আদর্শ তাঁহার তরুণ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আচার্য্যের যাহা কার্য্য তাহা তিনি করিয়াছেন। প্রেরণা তিনি দিয়াছেন এখন সার্থকতা তাঁহার স্বদেশীর হস্তে।

প্রফুল্লচন্দ্র বাল্যে ও যৌবনে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা আমাদের মতে সঙ্কীর্ণ অতি সঙ্কীর্ণ। বিলাত প্রবাসের পথে তিনি জাহাজে পড়িতেন Smile's Thrift Spencer's Sociology, Boswell's Johnson ইত্যাদি; যে হতভাগ্য সহযাত্রি উপন্যাসাদি পড়িয়া কালক্ষেপ করিত, তাহাদের প্রতি এই বালকের কি অসীম অবজ্ঞা ছিল! বাল্যকালে সহপাঠীদের সহিত ইনি বড় একটা মিশিতেন না। ইঁহার তৎকালীন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায়,

“From my childhood I was of a shy disposition and did not much mix with companions of my own age; but my favourite recreation was reading and arboriculture combined with physical exercise. I have always held that children brought up in towns imbibe all the vices of cockneydom Nursed in a kind of hot-house and brought up under artificia

conditions they arrogate to themselves the airs of a superior being, heap ridicule on the queer ways, manners and brogue of the countrybred and seldom feel sympathy for village folk."

এই superior airs কিন্তু বালক প্রফুল্লচন্দ্রের কম ছিল না। পুস্তকের প্রথমাংশ পাঠে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু inferiority complex'ও ছিল, নহিলে সহরবাসীদের কথা বলিতে এত ঝাঁঝ কেন? সে কথা যাক্। এই বালকের সহপাঠীদিগকে মনে ধরিত না। দেশে গেলে পিতার বৈঠকখানায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট যাইতেন না। যদিও গ্রন্থকার সেকথা স্বীকার করেন নাই, তবু মনে করিলে দোষ হয় না যে বালক অবজ্ঞাভরেই যাইতেন না। ঐ যুগের তথাকথিত স্বাধীন চিন্তার ধারা ইহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছিল। তাই স্বরচিত কল্পলোকে বাস করিতেই ইনি ভালবাসিতেন।

এখন দেখিতে হইবে যে, এই অসম্ভব রকমের প্রতিকূল বায়ুর মধ্যে মানুষ হইয়াও প্রফুল্লচন্দ্র ভবিষ্যৎ জীবনে এমন সহজ ভূতদয়ার অধিকারী কিরূপে হইলেন। কেমন করিয়া তাঁহার সমস্ত প্রাণমন পরের কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন। পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় আচার্য্যদেব লিখিতেছেন,

"My migration to my ancestral home twice every year had a sobering effect on me. These periodical visits to rural spots considerably neutralised the disadvantage of urban upbringing.

যখন গ্রামে যাইতেন, পৈত্রিক জমীদারগৃহে কর্ম্মহীন আলস্যে বসিয়া থাকিতেন না। কৃষক শ্রমজীবীদের কুটীরে কুটীরে যাইয়া তাহাদের সুখ দুঃখের কথা শুনিতেন, আর যথাসাধ্য তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে দরিদ্রের জীবনের সহিত তাঁহার একটা যোগ স্থাপিত হইল। অল্প বয়সেই ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। কেন এরূপ হইল বলা কঠিন। হয়ত ভোগের প্রতি তাঁহার একটা প্রাক্তন বা hereditary বিরাগ ছিল। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই ত্যাগের আদর্শ নিশ্চয়ই পান নাই, কেননা অধিকাংশ নগরবাসী ব্রাহ্মের সেকালে একটা দুর্ব্বিষহ superiority complex ছিল। উপনিষদের জ্ঞানযোগ ও সাহেবী ভোগলালসা মিলিয়া যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল আজও বঙ্গদেশ তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

প্রফুল্লচন্দ্র Gilchrist বৃত্তি পাইয়া বিলাতে লেখাপড়া করিতে গেলেন। বিলাতের ছাত্রজীবন আলোচ্য পুস্তকে মনোরম ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সেই বর্ণনা পড়িলেই পাঠক বুঝিবেন যে সেই উৎকট উদ্দাম সাহেবীয়ানার যুগেও প্রফুল্লচন্দ্র সাহেব হইয়া দেশে ফিরিতে পারিলেন না কেন? বরং পূর্ব্বের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিল। দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের একটা সুন্দর পরিষ্কার জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া ফিরিলেন।

সেই জ্ঞান লইয়া আচার্য্য কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিলেন। কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিল। সে পরিচয় শুধু কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নয়। সর্ব্বত্র সারা সহরময় তিনি অল্পদিনের মধ্যে ছাত্রদের বন্ধু ও সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। নিঃশব্দে, অকাতরে নিত্য তিনি যে সাহায্য দান করিতেন তাহার

আভাস পুস্তকের কোথাও নাই। কিন্তু সেকালে যাঁহারা ছাত্র ছিলেন তাঁহারা সকলেই জানিতেন। আচার্য্যদেব নানা প্রকার সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু দর্শক ও শ্রোতারূপে, অধ্যক্ষ বা মোড়লরূপে নয়। সভাস্থলে এক কোণে ছাত্রদের পশ্চাতে বসিয়া থাকিতেন। বক্তৃতা পর্য্যন্ত করিতেন না।

শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী নীরব সাধনার পর আরও দ্বাদশবর্ষ সমগ্র ভারতখণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ছত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। পাঠক এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া দেখিবেন প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন এই ভাবে ভাগ করা যায় কি না। তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে এই নীরব সাধনার যুগে প্রফুল্লচন্দ্র রামদাসের মত দুই মহাশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। প্রথম, লোক আকর্ষণ করিবার শক্তি। দ্বিতীয় যোগ্য কর্ম্মী নির্ব্বাচন করিবার শক্তি। রামদাসের এক বিখ্যাত উক্তি ছিল "অধিকার পাহুনি কাম সংগাবেঁ"—"অধিকার দেখিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে"। ভবিষ্যৎ জীবনে আচার্য্যদেব যে কর্ম্মে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা এই শক্তির বলে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের রাসায়নিক গবেষণা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার যোগ্য লোক আমি নই। সে বিষয়ে নানা খ্যাতনামা অধ্যাপকের অভিমত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তথা, Bengal Chemical Works সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য কিছু নাই। তবে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান, তাই আর পাঁচজনের মত আমিও গর্ব্ব অনুভব করি যে উঠিয়া যায় নাই, এমন সুন্দর ভাবে আজও চলিতেছে। পুস্তকের ১৮০ পৃষ্ঠায় জেম্‌স্ সাহেবের এক চমৎকার অভিভাষণ আছে। বাহুল্য ভয়ে সমস্তটা উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। পাঠক নিশ্চয় পড়িয়া দেখিবেন আচার্য্য রায় সম্বন্ধে এই বিদেশী বড় সুন্দর কয়েকটি কথা বলিতেছেন। দুই ছত্র তুলিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

Whereas he has contributed to the enterprise the best he had to give * * * he has left it to others to draw the dividends."

প্রফুল্লচন্দ্র বিলেতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার, ইংরেজ সরকারের Knight, কিন্তু আমাদের স্বদেশ-প্রেমিক সর্ব্বত্যাগী আচার্য্য-দেব!

পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। কোন বিষয়ই বাদ পড়ে নাই, কারণ এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠের প্রতিভা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা সর্ব্বতোমুখী। কিন্তু মনের আবেগবশতঃ লেখকের ভাষা সর্ব্বত্র সংযত হয় নাই। বাঙ্গালীর অযোগ্যতা বা দুর্দ্দশার জন্য আক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি যোগ্যতর অবাঙ্গালীর উপর অযথা আক্রোশ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। বাজার হাটে এরূপ কথা অনেক শোনা যায় বটে, কিন্তু ঋষিকল্প পুরুষের মুখে শুনিলে কষ্ট হয়।

সেইরূপ, জমীদার ব্যবহারজীবী সরকারী কর্ম্মকারী ইত্যাদি পদস্থ ব্যক্তিগণকে জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও হাস্যাস্পদ। Parasite, Glorified Clerk ইত্যাদি ভাষার উত্তরে অবলীলাক্রমে Glorified গুরুমহাশয়, Pedagogic mentality, ইত্যাদি পদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে দেশের দুঃখ

ঘুচিবে কি ? আচার্য্যদেব জ্ঞানী ও কর্ম্মবীর বলিয়া আমাদের নমস্য। বাগ্‌যুদ্ধে জয়ী হইলেও তাঁহার কি খ্যাতি বাড়িবে ?

গ্রন্থের ছাপা পরিষ্কার ও বাঁধাই মনোরম। ভাষা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার মত যোগ্যতা আমার নাই। তবে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Pocahontas—By David Garnett (Chatto & Windus)
Josephus—By Lion Feuchtwanger (Martin Secker)

য়ুরোপীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা ওয়াল্টার স্কটের সময় হতে আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। তখন ছিল সাহিত্যের রোমান্টিক যুগ, ইতিহাস ছিল গৌণ, উপন্যাস মুখ্য; অতীতের রঙীন কল্পলোকে নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক ঘটনাবহুল জীবনের গল্প করা, প্রেম ও শৌর্য্যের বিচিত্র কাহিনী বলা ছিল ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। তারপর, উনবিংশ শতাব্দী ধরে নানা ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে অতীত আর অজানা কাল্পনিক রইল না। সেজন্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে বসে রিয়ালিষ্ট ঔপন্যাসিকগণ চিত্তরঞ্জক গল্প বলার চেয়ে ঐতিহাসিক সততা রক্ষা করা লেখকের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলে ঠিক করলেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস হল উপন্যাসবর্ণিত কালের গবেষণামূলক সকল তথ্যানুযায়ী নিখুঁত ছবি। অতীতকালকে নানা সূক্ষ্ম বাস্তবতায় নির্ভুলভাবে চিত্রিত করতে গিয়ে অতীতের মায়ালোক মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু অতীতের এ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার দ্বারা কোন কাল্পনিক ব্যক্তির প্রেম-শক্তি-দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ জীবনের গল্প বলে অতীতকে বাস্তব চিত্তাকর্ষক করে তোলা রিয়েলিষ্ট ঔপন্যাসিকদের প্রয়াস ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস এক নবরূপ নিয়েছে। নব-রোমান্টিক ঔপন্যাসিকগণ ইতিহাসকে নবদৃষ্টিতে দেখেছেন। অতীতের কোন যুগের পরিখা-প্রাচীর বেষ্টিত নগর, দুর্গ, প্রাসাদ, গৃহ, তার নৃপতি ভূস্বামী অভিজাত সমাজ, তার আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, জীবনপ্রণালী, এ সকলের বর্ণনার সঙ্গে কোনো রোমহর্ষণ কাল্পনিক কাহিনী বলে তাঁরা তৃপ্ত নন। অতীত ইতিহাসে যে সব সংঘাতক্ষুব্ধ যুগ ও ঘটনাবলীতে মানবের চিরন্তন সমস্যা মূর্ত্ত হয়েছে, সে সব কাল ও ঘটনা, সে সব ঐতিহাসিক পুরুষ ও বিপ্লবের বাস্তব চিত্র এঁকে বর্ত্তমান সভ্যতার দ্বন্দ্ব-সমস্যাকে পরিস্ফুট করতে, তাদের সমাধান খুঁজতে তাঁরা প্রয়াসী হয়েছেন।

একদল লেখক নানা ঐতিহাসিক মহান্ পুরুষদের জীবনী লিখতে আরম্ভ করেছেন রোমান্টিক উপন্যাসের লেখন-রীতিতে—চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ, ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকের দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্র বিবর্ত্তনের নাটকীয় চিত্র,—যেমন, এমিল লুড্‌ভিকের নেপোলিয়ন, বিসমার্ক।

অপরদিকে, উপন্যাস লেখা হচ্ছে অতীত ইতিহাসের কোন সত্যিকার ব্যক্তির জীবনের যথাযথ বর্ণনা করে, কোন কাল্পনিক চরিত্র বা ঘটনাবলী সৃষ্টি করে নয়,

নানা পণ্ডিতের গবেষণার ফল সব সংগ্রহ করে, পাঠ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছু'খানি সম্প্রকাশিত উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে—ডেভিড্ গার্নেট লিখিত পোকাহন্টাস ও ফয়েক্টভেঙ্গার লিখিত জোসেফস্।

পোকাহন্টাস্ রেবেকা বা রমোলার মত মানস সৃষ্টি নয়। পোকাহন্টাস্ ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর বন্য ভার্জ্জিনিয়ার এক ইণ্ডিয়ান্ রাজার কন্যা; আমেরিকার আদিম জঙ্গলে নদীতীরে তার সহজ সুন্দর অসভ্য জীবনে এল এলিজাবেথ যুগের লণ্ডন থেকে এক দুঃসাহসী ইংরাজ জন্ স্মিথ্, সে তার জীবন দিল বদলে, ভার্জ্জিনিয়ার ইংরাজদের উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসের সঙ্গে তার জীবন, জন্ স্মিথের জন্য তার প্রেমের কাহিনী গেল জড়িয়ে; গার্নেট পোকাহন্টাসের এ কাহিনী বড় সুন্দরভাবে বলেছেন।

বইখানির ভূমিকাতে লেখক লিখেছেন:

Facts begin by inspiring the imagination: they end by imprisoning it in a strait-waistcoat, and the following work was written in their fetters.

My ambition has been two-fold: to draw an accurate historical picture and to make it a work of art.

গ্রন্থকার তাঁর এই দুই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করতে পেরেছেন; একদিকে যেমন ঐতিহাসিক সততা রক্ষা করা হয়েছে, অপরদিকে বইখানি সুখপাঠ্য সত্যিকার উপন্যাস হয়েছে। তাঁর লেখবার শক্তির এর চেয়ে আর বড় প্রশংসা কি হতে পারে?

আমেরিকান ইণ্ডিয়ান রাজপুত্রী পোকাহন্টাসের গল্পটি এইরূপ:

১৬০৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ভার্জ্জিনিয়া কোম্পানী প্রেরিত তিনখানি ছোট জাহাজ উত্তর-আমেরিকায় চেসাপিক্ উপসাগরে এসে পৌছাল একশত চল্লিশ জন ঔপনিবেশিক ও চল্লিশ জন নাবিক নিয়ে। জেম্স্ নদীর তীরে জেম্স্টাউন বলে জায়গায় এই দুঃসাহসী দল তাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করলে,—তাদের চারিদিকে আদিম পথহীন অরণ্য, অসভ্য ইণ্ডিয়ান শত্রুগণ; নিজেদের মধ্যে দলাদলি, কর্ত্তৃত্বলাভের জন্য পরস্পরের ষড়যন্ত্র; তার সঙ্গে খাদ্যাভাব, জ্বর, বন্যজীবন। ধীরে ধীরে এই অসমসাহসিক অর্থলিপ্সু ঔপনিবেশিকগণের শাসনকর্ত্তা হয়ে উঠল কাপ্তান জন্ স্মিথ বলে এক সৈনিক। ভার্জ্জিনিয়ার ইণ্ডিয়ানদের রাজা পাওহ্টানের সঙ্গে কিরূপ সতর্কভাবে ব্যবহার করে সখ্য রাখতে হবে, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসা করতে হবে, তাদের কাছ থেকে আহার্য্য দ্রব্য আদায় করতে হবে, তা সে জানত। কিন্তু একবার এক অজানা নদী ধরে নব দেশ আবিষ্কার করতে গিয়ে জন্ স্মিথ বন্দী হল ইণ্ডিয়ানদের হাতে; পাওহাটানের কাছে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল; তাকে হত্যা করবার হুকুম হল। প্রথমে তাকে অনেক রকম খাবার খেতে দেওয়া হল ভাল করে।

তারপর, হত্যা করবার অনুষ্ঠান। ইণ্ডিয়ান্রা স্মিথকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলে; এক বড় পাথরের উপর রইল তার মাথা; এক শাণিত প্রস্তর-কুঠার তার ওপর উদ্যত হয়ে উঠল; এইবার বুঝি গলায় পড়ে! এমন সময় একটা চীৎকার হল, ঘাতকের হাতের কুঠার গেল থেমে, একটি ছোট মেয়ের কালো নরম দেহ স্মিথের বুকের উপর এসে জড়িয়ে পড়ল। সে রাজা পাওহাটানের মেয়ে পোকাহন্টাস! সে বলে উঠল, তোমরা একে মারতে পারবে না; এ আমার; আমার চাই একে; আমি এর সঙ্গে

খেলা করব। তার বাবা মেয়ের আব্‌দারে রাজী হলেন। জন্ স্মিথ প্রাণে বাঁচল, সে হল পোকাহন্‌টাসের খেলার সাথী, তার প্রিয় ভাল্লুক।

কিন্তু স্মিথকে ইণ্ডিয়ানরা বেশীদিন ধরে রাখতে পারল না; সে আবার জেম্‌স্‌টাউনে এসে সেই ছোট উপনিবেশ শাসনের ভার নিল। তার বিদায়ের সময় পোকাহনটাস্ বারবার বল্লো, তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আস্‌বে ত, যদি না আস ত আমি তোমায় ধরে নিয়ে আসব; তুমি আমার। সেই অসভ্য বালিকা স্মিথকে সত্যই ভালবেসেছিল। একবার পাওহাটান ঔপনিবেশিকদের ধ্বংস মৎলব করে অতর্কিতে জেম্‌স্‌টাউন আক্রমণ করবার সঙ্কল্প করলে; কিন্তু পোকাহনটাস্ বাবার মন্ত্রণা শুনে লুকিয়ে গিয়ে স্মিথকে সব অভিসন্ধি জানালে; জেম্‌স্‌টাউনের আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

ঔপনিবেশিকদের মধ্যে দলাদলি বেড়ে যেতে লাগল; স্মিথ তাদের নিজের কর্ত্তৃত্বে রাখতে পারলে না; তারপর এক দুর্ঘটনায় বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াতে স্মিথ ভার্জ্জিনিয়া ছেড়ে ইংলণ্ডে ফিরে গেল। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কিন্তু প্রচার হয়ে গেল, স্মিথ মারা গেছে। পোকাহনটাস্ প্রথমে বিশ্বাস করলে না; তারপর ভাবলে তার ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুরা তাকে হত্যা করেছে। উপনিবেশ স্থাপনা করার জন্য দুঃসাহস, বুদ্ধি, নেতৃত্ব-শক্তি স্মিথের মধ্যে ছিল; বস্তুতঃ তার বীরত্ব দেখেই পোকাহনটাস্ তাকে ভালবেসেছিল। স্মিথ চলে যাবার পর ঔপনিবেশিকগণ ছন্ন-ছাড়া শক্তিহীন হয়ে পড়ল; সুযোগ বুঝে পাওহাটান একদল ঔপনিবেশিককে হত্যা করলে, তা দেখে পোকাহনটাস আনন্দিত, তার প্রিয় স্মিথের হত্যার যথোচিত প্রতিশোধ নেওয়া হল ভেবে।

আবার নূতন ঔপনিবেশিক দল এল, যোগ্যতর শাসনকর্ত্তাদের অধীনে ইংরাজ-উপনিবেশ শক্তিমান শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠল।

সতেরো বছরের পোকাহনটাস্ মঞ্জরিত বন্যলতা। একদল ইংরাজ জাহাজে করে এসেছে নানা জিনিষের বিনিময় করে ব্যবসা করতে; পোকাহনটাস্‌কে দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল। জাহাজ দেখে পোকাহনটাসের অন্তরেও কত স্মৃতি জেগে উঠল! এই জাহাজ করে স্মিথ এসেছিল। পোকাহনটাস্ গেল জাহাজে, তার ভেতর দেখতে নামল; যখন সে ঘরে ফিরে যাবার জন্যে ডেকে উঠল, দেখে, জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে, সে বন্দিনী।

জেম্‌স্‌টাউনে সে বন্দিনী; কিন্তু তার দিন আনন্দে কেটে যেতে লাগল। ইংরাজ শাসনকর্ত্তা স্যার টমাস্ গেট্‌সের দুই কন্যা বেসি ও মলি তার খেলার সঙ্গিনী; তাদের কাছে থেকে সে ইংরাজী শেখে, লণ্ডনের গল্প শোনে, ইংরাজী বেশভূষা পরে, আচার ব্যবহার দুরস্ত করে।

পোকাহন্‌টাসকে ফিরিয়ে দেবার জন্য যে সব সর্ত্ত ইংরাজরা বলে পাঠালে, পাও-হাটান সে সব সর্ত্তে রাজী হতে পারলেন না, পোকাহনটাস ঔপনিবেশিকদের দলের একজন হয়ে গেল।

তারপর এই ইণ্ডিয়ান রাজকুমারী খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষা নিলে; রল্‌ফ্ নামে এক ইংরাজকে বিবাহ করে ইংলণ্ড দেখতে চলে গেল। ভার্জ্জিনিয়ার আদিম প্রস্তরের যুগ হতে বেন্ জন্সনের লণ্ডন, রাজা প্রথম জেম্‌সের রাজসভা! খৃষ্টমাসের সময় পোকাহনটাস্ রাজদরবারে নিমন্ত্রিত হল, নাট্য, নৃত্য দেখলে; চারদিক তার কাছে অত্যাশ্চর্য্যকর মনে হতে লাগল।

কিন্তু আদিম বনের অম্লান কুসুমের সভ্য নগরের আবহাওয়া সহ্য হল না বেশী দিন। বনলতা অকালে শুকিয়ে গেল। গ্রেভ্‌সেণ্ডে পোকাহনটাসের সমাধি দেওয়া হল।

এই ইণ্ডিয়ান রাজকুমারীর অপূর্ব্ব জীবন সহজ সৌন্দর্য্যে পরম মাধুর্য্যে ভরা। গার্নেট ছন্দোময় চিত্রোপম ভাষায় তার কথা লিখে ইতিহাসকে উঁচুদরের উপন্যাস করে তুলেছেন।

পোকাহন্‌টাস উপন্যাসখানি যেন লিরিক কবিতা, জোসেফস্‌ উপন্যাস এপিকের মত বিরাটতার চিত্রপট, বিচিত্র তার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোম সম্রাজ্যের শক্তি, ঐশ্বর্য্য, সংঘাত, বিজয় গৌরবের নানা খণ্ড চিত্রের পর চিত্র। সেই প্রাচীন ইতিহাসের প্রশস্ত রাজপথে আমরা শুনতে পাই সম্রাট নিরোর প্রমত্ত হাসি, রোম সৈনিকদলের অস্ত্রের ঝঞ্চনা, প্যালেষ্টাইনবাসী অধীন ইহুদীজাতির স্বাধীনতার জন্য আর্ত্তনাদ, জেরুজেলাম ধ্বংসের রুদ্র অগ্নিময় সঙ্গীত, এক বিরাট সাম্রাজ্যের ভাঙনের ছন্দ।

জোসেফস্‌ ছিলেন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর এক প্রসিদ্ধ ইহুদী ঐতিহাসিক। প্রথম শতাব্দীতে রোমের শাসনের বিরুদ্ধে প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদের বিদ্রোহ, সংগ্রাম, রোমক সেনাপতি ভেস্‌পসিয়ানেব কাছে ইহুদীদের পরাজয়, জেরুজেলাম ধ্বংস—এই সম্বন্ধে "ইহুদীদের যুদ্ধ" বলে এক গ্রন্থ জোসেফাস্‌ লিখে গেছেন। জার্ম্মান ভাষায় ফয়েক্ট্‌ভেঙ্‌য়ারের উপন্যাসের নামও "ইহুদীদের যুদ্ধ"।

বইখানি পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ "রোম"—ইহুদী যুবক জোসেফস্‌ জেরুজেলাম থেকে রোমে এসেছেন কয়েকজন ইহুদী পুরোহিতের শাস্তি রদ করতে, তাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে। সম্রাট নিরোর প্রিয় এক ইহুদী অভিনেতার সুপারিশে জোসেফস্‌ সম্রাজ্ঞী পোপায়েরার নিকট ক্ষমার আবেদন করতে সমর্থ হলেন। ইহুদী অভিনেতার এক অভিনয়ে খুসী হয়ে সম্রাজ্ঞী দণ্ডিত পুরোহিতদের মুক্তিদানের আদেশ দিলেন।

জোসেফস্‌ সফলকাম হয়ে প্যালেষ্টাইনে ফিরলেন; তিনি আরও বুঝে গেলেন রোম রাজশক্তির বিরুদ্ধে ইহুদীজাতির বিদ্রোহ করার অভিসন্ধি বাতুলতা মাত্র। কিন্তু জেরুজেলামের ইহুদীরা তাঁর পরামর্শ শুনলেন না, তাঁকে পাঠানো হল গ্যালিলিতে বিদ্রোহের আয়োজন করবার জন্য। ভেস্‌পেসিয়ানের নেতৃত্বে রোমক সৈন্যদলের আক্রমণে জোসেফসের ইহুদী সৈন্যগণ সহজেই পরাজিত হল, জোসেফস্‌ বন্দী হলেন। ভেস্‌পেসিয়ানের সম্মুখে তাঁকে আনা হল, তিনি এক ভবিষ্যদ্বাণী করে উঠলেন, "কনসল ভসপেসিয়ান, আপনি রোমের সম্রাট হবেন।" জোসেফসের জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা দেখে ভেসপেসিয়ান তাঁর দিকে আকৃষ্ট হলেন; তাঁকে নিজের সহচর করে রাখলেন, আলেকজাণ্ড্রিয়াতে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

এদিকে "ইহুদী যুদ্ধ" চলতে লাগল। রোম সৈন্য যখন জেরুজেলাম অবরোধ করে অবশেষে জেরুজেলাম ধ্বংস করার সংকল্প করলে, তখন জোসেফস্‌কে পাঠানো হল রোম সেনাপতির কাছে; যদি তিনি জেরুজেলামবাসীদের বুঝিয়ে বলতে পারেন, রোমের কাছে আত্মসমর্পণ করলে জেরুজেলাম ধ্বংস হয় না। কিন্তু জেরুজেলামের ইহুদীরা মরীয়া হয়ে উঠেছে। তারপর এই স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। রোমসৈন্যদের শিবিরে থেকে জোসেফস্‌ রোমসৈন্যদ্বারা জেরুজেলামের ধ্বংসলীলা দেখেন।

ভেস্‌পেসিয়ান সত্যই রোমের সম্রাট হলেন; জোসেফসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল্‌ হল। তিনি ভেসপেসিয়ানের প্রিয়, বৃত্তিভোগী, রোমের নাগরিক হলেন। তারপর ঐতিহাসিক পুস্তক লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি চক্রী স্বার্থান্বেষী শক্তিপ্রিয় ইহুদীর চরিত্র পরম শক্তি ও সহানুভূতির সহিত অঙ্কিত হয়েছে। জোসেফসের মধ্যে আদর্শবাদ ছিল, তিনি ইহুদীজাতির শক্তিবৃদ্ধি ও গৌরব কামনা করেছেন, কিন্তু স্বজাতিপ্রীতিতে মত্ত হয়ে আত্মবিসর্জ্জন করবার মহান্‌ শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল না; তাঁর চরিত্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ও দুর্ব্বলতা সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

Jew Sussর লেখক Josephusউপন্যাসে তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাবলী অতিবাস্তব চমকপ্রদ করে লেখার শক্তির পূর্ণতর পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

Dangerous Corner—J. B. Priestly (Heinemann)

Priestleyর বইখানা তিন অঙ্ক নাটিকা। "Good Companions" যিনি লিখেছেন তাঁর যে চরিত্রসৃষ্টি ও নাটকোচিত ঘটনা সমাবেশের দক্ষতা যথেষ্ট, তা জানা ছিল। কিন্তু বাজে বকার ক্ষমতাও যে তাঁর অসামান্য, এবং তুচ্ছ জিনিষের স্ফীত বর্ণনা যে তার কলমে সহজেই আসে তাও দেখছি তাঁর "Angel Pavement"এ। কাজেই নাটকে যে সংযম ও তালবোধের একান্ত প্রয়োজন, তাঁর লেখায় তা' পাব কিনা সন্দেহ ছিল। "Dangerous Corner" পড়ে সন্দেহ ভঞ্জন হল। লেখকের টেক্‌নিক্‌ অনবদ্য। চরিত্রগুলি মানুষ, ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য, এবং ঘটনা-পরম্পরা পাকা কারিকরের সাজানো।

কোথাও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের বাড়াবাড়ি নেই; চরিত্রসৃষ্টি নাটকখানায় গৌণ, মুখ্য এর গল্পাংশ। গল্পটি অতি যত্নে বলা, অথবা বলানো। পাত্রপাত্রীর মুখে মুখে একটু একটু করে গল্পটা বলানো হয়েছে, তার এক একটি অধ্যায় যেন এক এক জনের রচনা। চরিত্রগুলির মধ্যে প্রধান অপ্রধান বলে কিছুই নেই, সবাইকেই সমান প্রয়োজন গল্পের জন্য। একজনও যদি অসহযোগ করত অন্যের সঙ্গে, গল্প হত বিকলাঙ্গ। লেখার প্রধান লক্ষ্য মনে হল পাঠকের কৌতূহল ও বিস্ময় উদ্রেক করা। অন্যান্য গভীর অনুভূতি জাগ্রত করার বিশেষ কোনো চেষ্টা নেই। হৃদয় মথিত আলোড়িত না হলে যাঁরা সাহিত্যপাঠ বিফল মনে করেন তাঁরা খুসী হবেন না এ বই পড়ে; কারণ ভীত, চমকিত, ক্রুদ্ধ বা বিগলিত হবার সুযোগ এতে তাঁরা বেশী পাবেন না। আরেক কথা, অতি আধুনিকতার কোনো কায়দা বা চালাকি এতে দেখলাম না। সাধারণ মানুষ এ বই অনায়াসে বুঝতে ও উপভোগ করতে পারে লেখকের বুদ্ধির ও বিদ্যার প্যাঁচে বা ভাষার কস্‌রতে তাকে দিশাহারা হতে হয় না। কৌতূহল জাগিয়ে তা নিবৃত্ত করার চেষ্টামাত্র না করা এবং পাঠককে ধাঁধায় ফেলা যদি বড় আর্ট হয়, তাহলে অবশ্য এ বই অবজ্ঞেয়। কারণ শেষ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত বা অনুমানসাপেক্ষ আর কিছুই রইল না। এ নাটকের গল্পাংশকে সেইজন্য বিশকৌটোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—situation একটির পর একটি খুলেই চলেছে, বেড়েই চলেছে, মনে হয় বুঝি

কোথাও শেষ নেই, কিন্তু এক জায়গায় এসে দেখা যায় আছে সমাপ্তি। কৌটোর প্রত্যেকটি যেমন স্বতন্ত্র অথচ সমগ্রের মধ্যে বিধৃত ও লুকায়িত, এ গল্পের ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলিও ঠিক তেমনি।

Caplan দম্পতী, Robert ও Freda, Whitehouse দম্পতী, Gordon ও Betty, অবিবাহিত Stanton এবং অবিবাহিতা Olwen—এই বন্ধু ছজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত। পুরুষত্রয় একই কারবারে অংশীদার, অল্‌ওয়েন তাদেরই কারবারে কর্ম্মচারিণী। সকলের মধ্যে প্রীতির বন্ধন। এই দলে আর একজন ছিল, রবার্টের ছোট ভাই মার্টিন; সে কিছুকাল আগে মারা গিয়েছে। তার মৃত্যু রহস্যমণ্ডিত তবে লোকের বিশ্বাস কোন অজ্ঞাত কারণে সে করেছিল আত্মহত্যা। তার প্রসঙ্গ বন্ধু ছজনের মধ্যে তোলা হয় না পারতপক্ষে, কেননা তার স্মৃতি সকলের কাছেই অল্পবিস্তর ব্যথার স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সন্ধ্যায় ক্যাপলানদের গৃহে গল্পগুজব বেশ চলছে, এমন সময় সিগারেটের প্রয়োজন হওয়ায় ফ্রীডা একটা musical cigarette box খুলে ধরলে। অল্‌ওয়েন্ সেটা দেখেই বললে, এটা না মার্টিনের? ফ্রীডা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল অল্‌ওয়েন্ জানল কি করে। উত্তরে শুনল মার্টিন সেটা অল্‌ওয়েন্‌কে দেখিয়েছিল। অসম্ভব! কেননা মার্টিন যেদিন মারা যায় সেই দিন সন্ধ্যায় ওটা মার্টিন একজনের কাছে উপহার পায়। অল্‌ওয়েন্ স্থির দৃষ্টিতে ফ্রীডাকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বললে, তা হবে আমার বোধ হয় ভুল হয়েছে। সত্যপ্রিয় রবার্ট বুঝল কথাটা চাপা দেওয়া হচ্ছে, কোথায় কি একটা সত্য গোপন থেকে গেল বুঝি! এই আরম্ভ হল প্রশ্নের পর প্রশ্ন সত্য নিরূপণের পালা। বিবরে কীটের খোঁজ করতে গিয়ে হাত ঠেকল কেউটে সাপের গায়ে। অল্‌ওয়েন্ স্বীকার করলে মার্টিন যেদিন মারা যায় সেদিন সন্ধ্যায় তার কাছে সে গিয়েছিল। কেন? মার্টিন তাকে সিগারেট কেসটা দেখিয়েছিল এবং বলেছিল ফ্রীডা নিজে হাতে তাকে সেটা দিয়ে গেছে সেদিন বিকেলে। ফ্রীডা? ফ্রীডা কি তবে যেত প্রায়ই মার্টিনের কাছে? হাঁ। কেন? প্রশ্নোত্তরে জানা গেল মার্টিনকে ফ্রীডা ভালবাসত, চিরদিন শুধু তাকেই ভালবেসেছে।

আর অল্‌ওয়েন্? মার্টিনকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারত না, কারণ মার্টিন ছিল নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, নেশাখোর। সেদিন গিয়েছিল জানতে তাদের firm-এর যে-পাঁচশো পাউণ্ড চুরি গিয়েছিল সেটা কে নিয়েছে, মার্টিন কোন খবর রাখে কি না। মার্টিন বললে নিয়েছে রবার্ট, এবং সেই শুনে অবধি অল্‌ওয়েন্ মনে যে দারুণ যন্ত্রণা চেপে দিন কাটাচ্ছে তার পরিমাণ করবে কে? রবার্ট চুরি করেছে অল্‌ওয়েনের এত কষ্ট কেন? জানা গেল অল্‌ওয়েন্ রবার্টকে দেখে অবধি ভালোবেসে এসেছে। ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে পড়ল যে রবার্ট চুরি করেনি, মার্টিনও না, করেছে ষ্টন্‌টন্। ষ্টন্‌টন্ রবার্টকে বুঝিয়েছিল মার্টিন চোর, এবং তার আত্মহত্যার কারণই বোধ হয় অনুতাপ; আবার মার্টিনকে বলেছিল রবার্টই নিয়েছে চেক্‌টা। অলওয়েন সে-রাত্রে মার্টিনের সঙ্গে চুরি-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তার পর যখন চলে আসতে চায় তখন মার্টিন নেশায় মত্ত হ'য়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। অলওয়েন্ জোর করে চলে আসতে গেলে তাকে পিস্তল নিয়ে ভয় দেখাতে গিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে নিজের গুলিতে মার্টিন নিজেই মারা যায়। অলওয়েন্ জানত কাছেই ষ্টন্‌টনের বাসা। তাই সোজা চলে যায় তাকে সব কথা বলতে। তখন রাত্রি এগারোটা। সেখানে গিয়ে বাইরে থেকে বেটিকে দেখতে

পায় ষ্টন্টনের কাছে একাকিনী। সুতরাং আর সে-বাড়ীতে প্রবেশ করা তার হল না। বেটি অসতী শুনে রবার্টের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। কারণ, তাকে নাকি রবার্ট দেবীর মত পূজা করে এসেছে মনে মনে। বেটির এ-হেন পতনের কারণও অজ্ঞাত রইল না। বিবাহের পূর্ব্বে সে গর্ডনকে সত্যই ভালবেসেছিল, কিন্তু বিবাহান্তে দেখল সে আসল মানুষই নয়, সে মার্টিনের জন্য পাগল, মার্টিনের সঙ্গ লাভই তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। ষ্টন্টনের সঙ্গে বেটির যে-সম্বন্ধ তাতে প্রেমের কোন স্থান নেই, কারণ ষ্টন্টন ভালবাসে অল্‌ওয়েন্‌কে। তবে আর সকলে তাকে নাকি মনে করে শুধু সুন্দর একটি পুতুল, কেবল ষ্টন্টনই আবিষ্কার করেছে সে বঞ্চিতা নারী!

সত্য সম্বন্ধে রবার্টের মনোভাব অবশ্য ঠিক জেষ্টিং পাইলেটের মত নয়। সে খাঁটি সত্য কি তা শুধু জানবার অপেক্ষায় থাকে না, তাকে টেনে বার করে। কিন্তু যা পায় সে কি সত্য? এ বই পড়ে বাস্তবপন্থীদের আনন্দে লাফিয়ে ওঠার সুযোগ হবে কি না সন্দেহ। রক্তে মাংসে গড়া আস্ত মানুষের চেয়ে কঙ্কাল বেশি সত্য রবার্ট মনে করতে পারে, তবু এ নাটকের প্রতিপাদ্য তা মোটেই নয়। যা মধুর বা সুন্দর তা শুধু মুখোস, শুধু খোলস, যা কুৎসিত বা নিষ্ঠুর তাই নির্জ্জলা সত্য, এ কথা বিশ্বাস করার প্রবণতা আর যারই থাক গ্রন্থকারের নেই। তাই তৃতীয় অঙ্কের শেষে রবার্টের সার সত্য সংগ্রহের নির্ম্মম উদ্যম যখন অবশেষে ক্ষান্ত হল, এবং তার এতদিনের জীবনকে যখন তার মনে হল শুধু তাসের বাড়ী, তখন ষ্টন্টন তাকে ভৎর্সনা করে বললে; "You've been living in a fool's paradise and now having got yourself out of it by tonight's efforts, you're busy building yourself a fool's hell to live in"। গর্ডন এবং বেটিকে পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত বলে সকলে যে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে, সে বিশ্বাসের কি কোনো ভিত্তি নেই? যাকে লোকে অনুরাগ বলে মনে করেছে তা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা, কেবলই ফাঁকি? এর উত্তর যেন অলওয়েন্ দিয়েছে মনে হয়ঃ

Betty: We put up a good show, didn't we?

Robert: You did.

Gordon: Yes, we did. What would have happened if we'd gone on pretending like hell to be happy together?

Betty: Nothing.

Gordon (thinking it out): No. If we'd gone on pretending long enough, I belive we might have been happy together, sometimes. It often works out like that.

Betty: Never.

Olwen: Yes, it does. That's why all this is so wrong really. The *real* truth is sometimes so deep you can't get at it this way, and all this half truth does is to blow everything up. It isn't *civilized.*

সুতরাং সভ্যতা মেকি এবং বর্ব্বরতাই খাঁটি এ তথ্য এ বই থেকে উদ্ধার করা চলবে না।

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

Family History—By V. Sackville-West, (Hogarth Press)
They Were Defeated—By Rose Macaulay (Collins).

শ্রীমতী স্যাকভিল-ওয়েষ্ট প্রথম সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন কাব্যে। তাঁহার "দি ল্যাণ্ড" প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে যশস্বী করিয়া তোলে। কিন্তু বর্ত্তমানে যুগধর্ম্মের তাড়ন এমনই প্রবল যে প্রায় কোনো কবিকেই শুধু কাব্য লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখা যায় না। বাণীর পূজার জন্ম বিবিধ উপচার সংগ্রহ এখন লেখক-মাত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে অধুনাতন অনেক লেখকেরই প্রতিভা বহুমুখ; গদ্যে পদ্যে, গল্পে নাটকে, সমালোচনে, ভ্রমণকাহিনীতে, অনেকেই সিদ্ধহস্ত। লেখিকারাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন। তাই কবি স্যাকভিল-ওয়েষ্ট "প্যাসেজ টু টেহারান" ত লিখিয়াছেনই, উপরন্তু অল্পকালের মধ্যে পর পর তিনটি নভেল লিখিয়া উপন্যাস-জগতেও আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। "ফ্যামিলি হিষ্টরি" তাঁহার তৃতীয় উপন্যাস। কিন্তু তিনি যখন প্রথম "দি এডওয়ার্ডিয়ান্‌স্" লেখেন তখনই তাঁহার রচনার স্বকীয়তা লক্ষ লক্ষ উপন্যাসের ভিতর হইতে পাঠক ও সমালোচকের প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "অল প্যাসান স্পেণ্ট" সে যশ ম্লান করে নাই, ও এ কথা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে, "ফ্যামিলি হিষ্টরি"তে তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মানবসভ্যতার আদিম কাল হইতেই বোধ হয় নারী গল্প বলিয়া আসিতেছে; তাই গল্প বলার আর্টে তাহার জন্ম-পটুত্ব সুপ্রকাশ। ইংরেজী সাহিত্যে অতি উচ্চশ্রেণীর গল্প-কথকের অভাব নাই, তবু তাহাদের মধ্যে জেন অষ্টেনের স্থান কাহারো অপেক্ষা নীচে নহে। অথচ কি বিপুল সামাজিক বিড়ম্বনার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁহাকে লিখিতে হইত তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যায় শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌এর "এ রুম অব ওয়ান্‌স্ ওন্" পড়িলে। বর্ত্তমানে কাল-প্রগতির ফলে একদিকে যেমন নারী পৌরুষাভিমানী হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে গল্পে নানা অবান্তর বিষয়ের অবতারণার মোহ এমনই প্রবল যে অনেক খ্যাতনামা লেখকের গল্পে গল্পের অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে দূরবীণ কষিতে হয়। ইঁহারা যে কেন সোজাসুজি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, অথবা সুবিপুল আত্মকাহিনী না লিখিয়া আখ্যায়িকার আশ্রয় লন তাহার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। ইঁহাদের সম্বন্ধে স্বতঃই মনে না আসিয়া পারে না, কুইনিন বড়িতে চিনি মোড়ার উপমাটি। হইতে পারে কুইনিন অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ, তাহাতে অমৃতের আস্বাদ নাই; তাহাতে দরকার রোগীর, সুস্থলোকের নহে। ভালো করিয়া বলা গল্পে অমৃতত্ব আছে, তাহার আকর্ষণ চিরন্তন। গল্পের বিষয় যত জটিল ও গভীর হইবে, ভালো করিয়া বলিতে পারিলে তাহার মর্য্যাদাও তত উচ্চে উঠিবে। আর বিষয় যত গুরুতর হোক, গল্প লিখিতে বসিয়া কথাশিল্পের দাবীকে উপেক্ষা করিলে সমস্ত রচনাটি ব্যর্থ হইয়া যায়, ফুটা কলসীতে জল ঢালার মতো, অথবা যে-কোনো বৃহৎ সংখ্যাকে শূন্য দিয়া গুণ করার মতো। আধুনিকা হইলেও নারী বলিয়া বোধ হয় শ্রীমতী স্যাকভিল-ওয়েষ্ট এ সহজ সত্যটি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি যে কত সুন্দর করিয়া গল্প বলিতে পারেন, দৃশ্যের পরে দৃশ্য সাজাইয়া, ঘটনার সহিত ঘটনার সঙ্ঘাত করাইয়া, অঙ্কিতব্য চরিত্রগুলিকে বিচিত্র অবস্থানের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে কিরূপ জীবন্তপ্রায় স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা যাহারা তাঁহার প্রথম দুটি উপন্যাস

পড়িয়াছে তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিবে। এমন কোনো মাথার দিব্য নাই যে গল্প সুগঠিত হইলে খোকাখুকুর মনোরঞ্জক পরীকাহিনী হইতে বাধ্য। "ফ্যামিলি হিষ্টরি" সুখপাঠ্য ও স্বল্পপরিসর; আজকালকার মহাভারতাকার ছত্রভঙ্গ ও ব্যাসকূটসঙ্কুল উপন্যাসের যুগে এ বিশেষত্ব তুচ্ছ নয়; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রচুর নিদর্শন মেলে যে শ্রীমতী স্যাকভিল-ওয়েষ্টের মন সুপরিণত, দৃষ্টি সজাগ, সমস্যা-বোধ প্রখর, ও জীবন-জিজ্ঞাসা নিরন্তর সাগ্রহ। আখ্যানবস্তু মোটামুটি এই—ইভলীন জ্যারল্ড, সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিধবা, বয়স চল্লিশ, ঈটন-এর ছাত্র সতেরো-আঠারো বছরের পুত্র বিদ্যমান, প্রেমে পড়িলেন এক নাচের মজলিশে মিঃ মাইল্‌স্ ভেন-মেরিক-এর সহিত যিনি একজন উদীয়মান প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও যাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ। পঁচিশও চল্লিশের আকর্ষণে সাড়া দিল। আঠারোর নিকট এ কাহিনী বেশী দিন গোপন রহিল না; কিন্তু সে ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। বরং মনে মনে তৃপ্ত হইল এই ভাবিয়া, পিতামহের মৃত্যুর পর যে বিশাল সম্পত্তি তাহার হাতে আসিবে তাহাকে বর্ত্তমানের আদর্শ-অনুযায়ী সম্যক পরিচালনার জন্য এমনই একটি বুদ্ধিমান, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্ম্মতৎপর অভিভাবকের নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ তাহার পিতৃব্যেরা নেহাৎ অকর্ম্মণ্য, সম্পন্ন পিতার পুত্রদের যেমন হওয়া উচিত। পিতামহের সহিত তাহার আদর্শমত মিল নাই তবুও ড্যানিয়েল জ্যারল্ড্ বৃদ্ধ উইলিয়াম জ্যারল্ড্‌কে ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করে—যেহেতু তিনি এই বিপুল সম্পত্তি আপন হাতে গোড়া হইতে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই "পারিবারিক ইতিহাস" অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী এখনকার ইংলণ্ডের সমৃদ্ধিশালী বুরজোয়াশ্রেণীর নানা বিভিন্ন চরিত্রের লোক আঁকিয়াছেন, ও এই উপলক্ষে দেখাইয়াছেন সুদূর-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ব্রিটিশ জাতির মেরুদণ্ডে (কারণ এই বুরজোয়াশ্রেণীকেই ইংলণ্ডের মেরুদণ্ড বলা হয়) কোথায় ঘুণ ধরিতেছে, এবং কোন পথেই বা এ রোগের প্রতিকার সম্ভব। বইটির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় উইলিয়াম্ জ্যারল্ডের চরিত্রে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির প্রভাব সুস্পষ্ট। "দি এড্‌ওয়ার্ডিয়ান্‌স্" এর সুপরিচিত লিওনার্ড ও ভায়োলার পুনরাবির্ভাবও খুব সম্ভব গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির ধারাবাহিকতার প্রভাবে। কিন্তু লেখিকার স্বকীয়তা ইহাতে চাপা পড়ে নাই। গল্পের শেষ দৃশ্য ইভলীন ও মাইল্‌স্-এর ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রেমের শোচনীয় পরিণামের চিত্র, যে পরিণামের জন্য দায়ী কাহারো মন্দ স্বভাব নহে, দায়ী বয়সের পার্থক্যজনিত মেজাজের ভিন্ন গতি। এত সংযত-লেখা এমন করুণ দৃশ্য আধুনিক সাহিত্যে কদাচিৎ চোখে পড়ে। তুলনা খুঁজিতে হেমিংওয়ের "এ ফেয়ারওয়েল টু আর্ম্‌স্"এর শেষ দৃশ্যের উল্লেখ করিতে হয়; ও এ-তুলনা যে কত উচ্চ প্রশংসা তাহা সাহিত্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন।

"দে ওয়্যার ডিফীটেড" লিখিয়া শ্রীমতী রোজ মেকলে পাঠকসমাজকে চমক লাগাইয়া দিয়াছেন। তিনি নূতন লেখক নহেন, তাঁহার "কীপিং আপ্ অ্যাপিয়ারেন্‌সেস্" "ষ্টেয়িং উইথ রিলেশন্‌স্" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে ঔপন্যাসিক হিসাবে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছিল। সাহিত্য সমালোচনায়ও তাঁহার রচনার মূল্য আছে। তবু মনে হয় এই প্রথম তিনি যেন নিজেকে খুঁজিয়া পাইলেন। এতদিন তাঁহার নিকট লোকে প্রত্যাশা করিত ভাষা ও ভাবের চাকচিক্য, ঝলমলানি। কিন্তু ব্রিলিয়ান্স্ দিয়া, ক্লেভারনেস্ দিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করা যাইতে পারে, লোকচিত্তস্পর্শ করা যায় না। যে নিগূঢ় অন্তর্বেদনার ফলে বৃহৎসাহিত্য সৃষ্টি হয় তাহার আভাস এতকাল তাঁহার রচনায় কমই মিলিত। "দে ওয়্যার ডিফীটেড" লিখিবার সময় তাঁহার যেন দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি

ঘটিয়াছে, তিনি নির্মোকের মতো পুরাতন জীবন পরিহার করিয়া সমৃদ্ধতর নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন। মলাটে নাম না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত যে এই বইটি সেই আগেকার রোজ মেকলেরই লেখা। কোথাও একটু প্রয়াস নাই জাহির করিবার, ধাঁধা লাগাইবার, ঝলসাইয়া দিবার; আত্মসমাহিত সারল্যের দিব্য বিভায় সমস্ত রচনাটি আলোকিত। অথচ বিচক্ষণ পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়িবে এই সারল্যের অন্তরালে কী অসাধারণ সাধনা নিহিত আছে। "দে ওয়্যার ডিফীটেড" ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার মস্ত বিপদ এই যে তাহাতে প্রায়শঃই হয় ইতিহাস নয় উপন্যাস মারা পড়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই-ই। ইউরোপে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মদাতা সার ওয়ালটার স্কট্-এর রচনাবলীতে ঐতিহাসিকেরা কত যে ছিদ্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তবু ত তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণের তুলনায় স্কট্-এর ঐতিহাসিক অভীপ্সা ছিল নিতান্ত খর্ব্ব। যে যুগে তিনি তাঁহার আখ্যায়িকায় ঘটনাবলী প্রক্ষেপ করিতেন, তাহার দুচারিটি বড় ঘটনা বা বিখ্যাত ব্যক্তি গল্পের মধ্যে আমদানী করিয়া স্কট ইতিহাসের আমেজ মিশাইতেন; ফ্লবেয়ার বা ফ্রাঁস্-এর লেখায় অতীতের বিশেষ যুগকে যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস দেখা যায় তাহা স্কটএর অজ্ঞাত ছিল। তাঁহার সময় ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, তাই ঔপন্যাসিকের কল্পনার পরিধি অসঙ্কোচে বিস্তার লাভ করিত। আজ আর তাহা চলে না। এখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে বসিলেই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় রক্তচক্ষু ঐতিহাসিকের ভ্রুকুটিভঙ্গীর ভয়ে। অবশ্য যদি এমন স্থানকাল বাছিয়া লওয়া যায় যাহার সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব, তাহা হইলে ঐতিহাসিককে এড়াইয়া পূর্ব্বতন নিরঙ্কুশতা ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব। এইখানেই শ্রীমতী রোজ মেকলের দুর্জ্জয় সাহস পাঠকের নিশ্বাসরোধ করে। "দে ওয়্যার ডিফীটেড্"-এ বর্ণিতকাল ইংলণ্ডের ১৬৪০-৪১ খৃষ্টাব্দ। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন, এযুগ ইংলণ্ডের ইতিহাসে কি সঙ্কটময় যুগ। প্রজার পক্ষ হইয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুত ও শিরশ্ছিন্ন করিবার জন্য ক্রমওয়েল তখনও নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হন নাই বটে, কিন্তু যে ভাবসংঘাতের ফলে দেশে অন্তর্বিপ্লব চণ্ডরূপে দেখা দেয় তাহার সমস্ত আয়োজন তখন পূরাদমে চলিয়াছে। একদিকে চার্চ্চের অনড় গোঁড়ামী, অন্যদিকে বেকন ও ডেকার্ট প্রণোদিত নব্যবিজ্ঞান ও দর্শনের প্রবর্দ্ধমান প্রভাব। সাহিত্যজগতে শেকসপীয়ার ও বিশেষ করিয়া বেন জনসন্-এর স্মৃতি তখনও অম্লান, অথচ তাহার পুরোভাগ দখল করিয়া আছেন এব্রাহাম কুলী, জন ক্লীভল্যাণ্ড, প্রভৃতি ভাবহীন বাক্যবহুল কবিযশপ্রার্থীর দল। মিলটন তখনও কেম্ব্রিজের শীতল ছায়ায় বসিয়া সর্ব্বগ্রাসী বিদ্যাচর্চ্চায় ও কবিত্বময় সৌন্দর্য্যের ধ্যানে বিভোর, ও যে পরিমাণে তিনি তাঁহার সুমহান্ ভবিষ্যতের গৌরবরঞ্জিত পরিণতির সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন, সেই পরিমাণে অন্যের প্রতি তাঁহার ব্যবহার বাহ্যতঃ ত্রুটিহীন অবজ্ঞায় ভরা। "দে ওয়্যার ডিফীটেড"-এ প্রধান চরিত্র রবার্ট হেরিক, জুলি কনিবেয়ার ও জন ক্লীভল্যাণ্ড। হেরিক কবি ও তখন ডেভনশিয়ারের একটি ছোট গির্জার আচার্য্য। তিনি সুশিক্ষিত স্ফূর্তিপ্রিয় সামাজিক, এককালে বেন জনসনএর সাহিত্যসভায় অনুচরবৃত্তি করিতেন, এ গ্রাম্যজীবন তাঁহার ভালো লাগে না। তিনি লিখিয়াছিলেন,

More discontents I never had
Since I was born, than here;
Where I have been, and still am sad,
In this dull *Devon-Shire*,

তাঁহার বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটিমাত্র তৃপ্তির বস্তু, জুলি রুনিবেয়ার। এই মেয়েটিকে আজকালকার ইংলণ্ডের শিক্ষিতা মেয়েদের অগ্রদূত ধরা যাইতে পারে। সে মেয়ে থাকিতে চায় না, ছেলে হইতে চায়, নারীত্ব বর্জ্জন করিয়া নয়, নারীত্ব বজায় রাখিয়া। অর্থাৎ সে জন্মতঃ মেয়ে হইলেও তাহার জ্ঞানপিপাসা পুরুষের মতো। তাহার পিতা নব্যবিজ্ঞানপন্থী ও স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী। পিতার দুলালী বুদ্ধিমতী কন্যা অল্পবয়সেই ল্যাটিন গ্রীক শিখিয়া ফেলিয়াছে, রবার্ট হেরিকের কাছে পড়িয়া। সে কবিতাত পড়েই, কবিতা লিখিতেও পারে। ভাই কেম্ব্রিজে পড়ে বলিয়া তাহার সৌভাগ্যকে সে মনে মনে হিংসা করে। অথচ ভাইটির পড়া শোনায় মোটেই মন নাই। তাহার অত্যন্ত আগ্রহের ফলে তাহার পিতা তাহাকে লইয়া কেম্ব্রিজে কিছুদিনের জন্য বেড়াইতে গেলেন। হেরিকও সঙ্গে ছিলেন, কারণ, তাঁহার একান্ত লোভ হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিশীলিত আবহাওয়ায় নিজেকে তাজা করিয়া লইতে। আরও একটি গোপন বাসনা তাঁহার মনে বাসা বাঁধিয়াছিল। তিনি জানিতেন তিনি কবি, অবিমিশ্র কবি। ইহাও জানিতেন তাঁহার কবিতা তখনকার ফ্যাশানের অনুযায়ী নয়, কাজেই লোকপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তাঁহার কবিতায় বাকচাতুরী নাই, উদ্ভট উপমা সংগ্রহ নাই, আছে সরল অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ:

I Sing of Brooks, of Blossoms, Birds and Bowers;
Of April, May, of June and July flowers.
I sing of May-Poles, Hock-carts, Wassails, Wakes,
Of Bridegrooms, Brides and of their Bridall-cakes.

তবু যদি কেম্ব্রিজের মতো স্থানে তাঁহার সযত্ন-লালিত কবিতাগুলির কোনো অনুরাগী পাঠক জোটে। কেম্ব্রিজে আসিয়া জুলি প্রেমে পড়িয়া গেল তাহার ভাইয়ের শিক্ষক সেণ্ট্ জন্স্ কলেজের ফেলো তরুণ কবি জন ক্লীভল্যাণ্ডের সহিত। এই তরুণ কবিটির হৃদয় বলিয়া কোনো বালাই ছিল না। তরুণী-মন লইয়া খেলা করাই তাঁহার পেশা। জুলি খেলা বোঝে না, কাব্যসাহিত্যে প্রেমের কথা সে যাহা পড়িয়াছে, ক্লীভল্যাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া তাহার পরিপূর্ণ উপলব্ধি সে জীবনে করিতে চায়। কাজেই বাধিল সংঘর্ষ, ঘটিল বিসম্বাদ, ও তাহার প্রেমের ও জীবনের শোকাবহ পরিণাম। কিন্তু এ ব্যর্থতা শুধু তাহার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়। ইহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তখনকার কেম্ব্রিজের শিক্ষাদীক্ষার ব্যর্থতা, তখনকার ইংলণ্ডের সমস্ত সমাজ-জীবনের ব্যর্থতা, কয়েক বৎসরের মধ্যেই যাহার নিষ্করুণ চরম প্রকাশ জ্বলিয়া উঠিল দেশব্যাপী বিপ্লবে ও আত্মকলহে।

বইখানিতে নানাশ্রেণীর অনেক চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, কথাবার্ত্তা কহানো; এমন কি পত্র লেখানো পর্যন্ত হইয়াছে; তাহাদের দু' একটি ব্যতীত আর সবগুলিরই অস্তিত্ব ঐতিহাসিক সত্য। লেখিকা ভূমিকায় বলিতেছেন যে তিনি

কোনো চরিত্রের মুখে এমন একটি কথা বসান নাই যাহা সে যুগে প্রচলিত ছিল না। কি কঠোর সাধনা ও অবধানতার ফলে এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া যায় তাহা সহজেই অনুমেয়। আর ভাষাবিৎ ও ইতিহাসবিৎ দুজনেই স্বীকার করিতেছেন, শ্রীমতী রোজ মেকলে সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

একথা ভাবিলে ভুল হইবে গ্রন্থকর্ত্রী শুধু ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের জন্য এ বই লিখিয়াছেন। মানুষের জীবন ও মন সম্বন্ধে যাঁহারই ঔৎসুক্য আছে, তিনি ইহাতে গভীর আনন্দ পাইবেন, আশা করা যায়। যে ঐতিহাসিক উপন্যাস অমূল তরুর মতো একান্ত কল্পনা-প্রসূত, বর্ত্তমানের জীবনযাত্রার সহিত যাহার কোনো সম্পর্ক নাই, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, সাহিত্যিক মূল্য অধিক হইতে পারে না। "দে ওয়্যার ডিফীটেড" পড়িতে পড়িতে প্রতিক্ষণে বর্ত্তমানের কথা মনে আসে, দেখা যায়, দেশকালের ব্যবধান সত্ত্বেও মানবজীবনে সমত্বের ফল্গুস্রোত কেমন নীরবে অথচ অপ্রতিহত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে ভালো ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা অতি বিরল। স্কটএর পদানুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র যে খাত কাটিয়া গিয়াছেন তাহা প্রায় মজিয়া আসিল। হরপ্রসাদ ও রাখালদাস নূতন ধারা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র, সফল হন নাই। তাঁহারা ইতিহাসে ওস্তাদ হইলেও কথা-শিল্পে শিশু ছিলেন। বঙ্গসরস্বতী বিজয়মাল্য হস্তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছেন তাঁহারই জন্য যিনি রসোদ্ঘাটনের শক্তির সহিত মিলাইতে পারিবেন ঐতিহাসিক সাধনা—শ্রীমতী রোজ মেকলের মতো।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

Famous Plays of 1932-33—

Children in Uniform—Christa Winsloe. Miracle at Verdun—Hans Chlumberg. Service—C. L. Anthony. Strange Orchestra—Rodney Auckland. Behold, We Live—John Van Druten. Counsellor-at-Law—Elmer Rice. (Victor Gollancz Ltd).

এই ছ'খানা ইংরেজী নাটক পড়ে নিরাশ হতে হল। এক বছরেরও কিছু বেশী সময়ের মধ্যে যে এর চাইতে ভাল নাটক অভিনীত হয়নি সেটা বিলেতের ষ্টেজ এবং ইংরাজী সাহিত্যের দুর্ভাগ্যের কথা। ছ'খানা নাটকের মধ্যে আবার দুখানা মূল জার্ম্মান থেকে অনূদিত আর একখানার লেখক আমেরিকান এবং আমেরিকার ষ্টেজেই তার প্রথম অভিনয় হয়। দু'একখানা ছাড়া এই নাটকগুলোর ভেতরে "বিখ্যাত" হয়ে উঠবার উপকরণ বিশেষ কিছু দেখা গেল না। অবশ্যি শুধু বই পড়ে সে বিষয়ে ঠিক মতামত দেওয়া যায় না; কারণ নাটকের অভিনয়ে সাফল্যলাভ প্রয়োগনৈপুণ্য, সু-অভিনেতৃ-সম্মিলন ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপরে নির্ভর করে এবং সে রকম যোগাযোগ ঘটলে একখানা কুলিখিত নাটকেরও বিখ্যাত হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। যাই হোক, যে ক'খানা নাটক বিখ্যাত বলে এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে সেগুলো পড়ে' মনে হয় বাঙ্গালাদেশের

মত সে-দেশেও যে এখন রঙ্গমঞ্চের দুর্দ্দশার যুগ চলছে তার একটা প্রধান কারণ যথার্থ ভাল নাটকের অভাব।

এই সংগ্রহের প্রথম নাটক Children in Uniform জার্ম্মান থেকে অনূদিত। এতে পুরুষ-চরিত্র নেই কারণ সমস্ত ঘটনা ঘটেছে মেয়েদের একটা বোর্ডিং স্কুলে। গল্পাংশ সংক্ষেপে এই—বর্ত্তমান বিপ্লবের সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেকার অভিজাত সম্প্রদায়ের উপযোগী কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় পরিচালিত জার্ম্মান মেয়েদের একটা বোর্ডিং স্কুল। ম্যানুয়েলাকে তার মাসী এই স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে একটা দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। ম্যানুয়েলা শৈশবে মাতৃহারা, ভাবপ্রবণ স্বভাবের মেয়ে; স্কুলের কঠোর বিধিনিষেধ ও শিক্ষয়িত্রীদের অকরুণ ব্যবহারে প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়ল। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে ফ্রাউ বার্ণবার্গ ছাত্রীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন, তার ওপরে তিনি সুদর্শনা, দীর্ঘাঙ্গী আর তাঁর মুখশ্রীতে শক্তি ও আভিজাত্যের ছাপ—কাজেই স্কুলের সব মেয়েই তাঁর কাছ থেকে একটু প্রশংসা, একটু আদর পাবার জন্যে লালায়িত হয়ে থাকত। ম্যানুয়েলা প্রথম দেখাতেই তার স্নেহবঞ্চিত বুভুক্ষিত মনে ও সদ্যজাগ্রত কিশোরী হৃদয়ের সবখানি ঢেলে দিয়ে তাঁকে ভালবেসে ফেলল। বিশেষ কোন ছাত্রীর ওপরে শিক্ষয়িত্রীর পক্ষপাত দেখানো স্কুলের নীতিবিরুদ্ধ—কাজেই ম্যানুয়েলার ওপরে মনে মনে করুণা সহানুভূতি পোষণ করেও বার্ণবার্গ তার সঙ্গে আর সব মেয়ের মতই নিয়ম বাঁধা ব্যবহার করতেন। কিন্তু একদিন তিনি নিয়মভঙ্গ করলেন—ম্যানুয়েলার কাপড়-চোপড়ের দুর্দ্দশা দেখে তাকে নিজের একটা সেমিজ দান করে ফেললেন। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ম্যানুয়েলার প্রাণের গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল—

"আপনি যখন রাত্তিরে বিদেয় নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন, তখন আমার মনে হয় যেন আমার সব হারিয়ে ফেলেছি···আঁধারের ভেতরে আমি সেই বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে থাকি···চেয়েই থাকি। ইচ্ছে হয় যে উঠি···ঐ দরজা খুলে ফেলি···পা টিপে টিপে আপনার বিছানার কাছে যাই···আপনার হাতখানা আমার হাতের ভেতরে নিই···আপনাকে বলি—কিন্তু না, না, তা' যে বলতে নেই; তাই বিছানাটা আঁকড়ে ধরি···প্রাণপণে···এত জোরে যে হাত ঝিম ঝিম করে···"

শিক্ষয়িত্রী বাধা দিয়া বল্লেন, "তুমি নেহাৎ একটি খুকি, ম্যানুয়েলা।" তার উচ্ছ্বাসের আতিশয্য দেখে বার্ণবার্গ চমকে গেলেন; কিন্তু সেটাকে চাপা দেবার জন্যে যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে, দুচারটে মিষ্টি কথা বলে তাকে বিদেয় দিলেন।

কয়েকদিন পরে স্কুলের মেয়েরা মিলে একটা নাটকের অভিনয় করছে। নতুন ছাত্রী ম্যানুয়েলা খুব চমৎকার অভিনয় করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। চারদিক থেকে প্রশংসার বৃষ্টিতে, বিশেষ করে বার্ণবার্গের প্রশংসায় ম্যানুয়েলার মাথা স্থির নেই—আনন্দে, উত্তেজনায় সে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেয়েই চলেছে। ঘোর মত্ত অবস্থায় সে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলে যে তার মত সৌভাগ্য কার! শিক্ষয়িত্রী বার্ণবার্গ তাকে ভালবাসেন। তারপর সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল। শেষের দিকটায় স্বয়ং প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হঠাৎ সেখানে এসে এই চরম কেলেঙ্কারীর সাক্ষী রইলেন।

এর পর শাস্তির পালা ম্যানুয়েলাকে কতকটা নির্জ্জন কারাবাসের মত ব্যবস্থায় রাখা হ'ল। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী বার্ণবার্গকে যে সে দেখতে পাবে না এই কল্পনাই তার কাছে সব চাইতে অসহনীয় বোধ হ'ল। তাঁর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে ম্যানুয়েলা

তাঁর পায়ে কেঁদে পড়ল, "বলুন, আপনি দিনে অন্ততঃ একবারটি আমায় দেখা দেবেন—নইলে আমি মরে যাব।" বার্ণবার্গ কিছুতেই রাজী হলেন না; তাকে নানারকম করে বোঝাবার চেষ্টা করে শেষটায় বললেন, "তুমি আমাকে এত বেশী ভালবেসো না, ম্যানুয়েলা। এটা অন্যায়—এটা পাপ!" এই কথায় মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়ে ভগ্নহৃদয়ে ম্যানুয়েলা চলে গেল। একটু পরে শোনা গেল ম্যানুয়েলা জানালা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

নাটকখানার অভিনয়ের অনুমতি পাওয়া নিয়ে একটা গোলযোগ হয়েছিল বলে কাগজে পড়েছিলাম। দুর্নীতিমূলক বলে নাকি censor একে ছাড়পত্র দিতে চাননি। ম্যানুয়েলার চরিত্রে sexual perversion বা স্বভাববিরুদ্ধ যৌনলিপ্সার আভাস কল্পনা করা যেতে পারে বটে কিন্তু তাহলে লেখিকার ওপরে অবিচার করা হবে! তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সেই দিকটা বাঁচিয়ে চলেছেন। ম্যানুয়েলার চরিত্রে একটি মাতৃহারা স্নেহবঞ্চিত কিশোরী-হৃদয়ের ভালবাসা পাবার ও দেবার জন্যে আকুলতাই দেখতে পাই। তার একজন স্নেহময়ী শিক্ষয়িত্রীর প্রতি যে আকর্ষণ লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন সেটা মাতৃস্নেহেরই সমধর্ম্মী—তা'ছাড়া অন্য কোনো কথা পড়বার সময় মনে আসে না। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে তার আড়াল থেকে আর কি লুকানো জিনিষ টেনে বার করা যেতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই।

নাটকের গঠনে ও ঘটনাসৃষ্টিতে শিল্পপ্রতিভার পরিচয় বিশেষ নেই। চরিত্র সৃষ্টিতেও লেখিকা কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ম্যানুয়েলা ও বার্ণবার্গ ছাড়া আর সব চরিত্র যেন ছাঁচে ঢালা, বিশেষত্বহীন। নাটকের তাগিদে যখন যে কথা বলবার দরকার হয়েছে, যেই হোক একজনকে দিয়ে যেন লেখিকা সে কথা বলিয়েছেন। প্রধান চরিত্র ম্যানুয়েলার মধ্যেও যথেষ্ট অসঙ্গতি আছে। প্রথম দৃশ্যে সে ভীত, সঙ্কুচিত, অস্ফুটবাক সামান্য বালিকামাত্র, যেন বয়স অনুপাতে তার মানসিক পরিণতিও হয় নি। মোটে দুএক সপ্তাহ পরেই দেখতে পাই যে সে তার সঙ্গিনীদের কাছে নিজের প্রণয়ানুভূতির কথা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে, সবিস্তারে, সালঙ্কারে বলছে। স্কুলের এক শিক্ষকের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব বেশ একজন পরিণতবুদ্ধি, গরিমাময়ী মহিলার মত প্রত্যাখ্যান করছে; দুদিনের শিক্ষাতেই স্কুলের মধ্যে সব চাইতে সুদক্ষ ও শঙ্কাহীন অভিনেত্রী হয়ে উঠেছে। অথচ এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনকে বিশ্বাস্য করে তুলবার কোন প্রয়াস লেখিকা করেন নি। যাই হোক, এ সব দোষ সত্ত্বেও মেয়েটির অন্তর্বেদনার কাহিনী বেশ মর্ম্মস্পর্শী হতে পারত কিন্তু শেষটায় একটু চমক লাগবার লোভ সামলাতে না পেরে লেখিকা তার আত্মহত্যা ঘটিয়ে একেবারে রসভঙ্গ করে দিলেন। যেন বাজি জিতবার আর কোন উপায় না দেখে তাঁকে শেষ তাসখানি খেলতে হয়েছে। সে হিসাবে এটাকে তাঁর ব্যর্থতার স্বীকারোক্তিও বলা যেতে পারে।

Miracle at Verdun নাটকখানিও জার্ম্মান থেকে অনূদিত। যুদ্ধের সম্বন্ধে লেখা আর-কয়েকখানা বিখ্যাত উপন্যাস ও নাটকের মত এরও উদ্দেশ্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে লোকমতকে জাগিয়ে তোলা। মহাযুদ্ধে যত লোক মরেছে তাদের জন্য শোক করে সবাই, কিন্তু কোনো অলৌকিক শক্তিবলে তারা যদি আবার বেঁচে ওঠে, তাহলে তাদের সম্বর্দ্ধনাটা কি রকম হবে তারই চিত্র লেখক দেখাতে চেয়েছেন।

সৈনিকদের বেঁচে উঠবার সংবাদ দেশে দেশে কি ভাবে গৃহীত হচ্ছে এবং সৈনিকরা নিজেদের মাতৃভূমিতে পৌছিলে তাদের অভ্যর্থনাই বা কি রকম হচ্ছে, সে সব কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে দেখানো হয়েছে। দৃশ্যগুলোর যোগ সাধনের জন্যে ঐক্যসূত্র কিছুই নেই, প্রচলিত রীতি অনুসারে গল্পের ক্রমবিকাশ climax ইত্যাদিও নেই, কাজেই. প্রথানুযায়ী অঙ্কবিভাগ না করে তেরোটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে নাটকখানাকে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম দৃশ্যের সংযোগস্থল ভার্ডুনের একটা গোরস্থান। এখানে ফরাসী, ইংরাজ, জার্ম্মান ইত্যাদি শত্রুমিত্র সব জাতীয় সৈনিককে এক-জায়গায় সমাধিস্থ করা হয়েছে। যুদ্ধারম্ভের পঁচিশ বছর পরে ১৯৩৯ সালে নানা দেশ থেকে একদল ভ্রমণকারী এই গোরস্থান দেখতে এসেছে। শেষ দৃশ্যও তাই—প্রথম দৃশ্যেরই অনুপর্ব্ব। মাঝের এগারোটি দৃশ্যকে বোধ হয় লেখক একজন জার্ম্মান ভ্রমণকারীর স্বপ্ন বলতে চান। দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বর্গ থেকে দেবদূত নেমে এসে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা করে আদেশ করলেন, "ওঠো, জাগো", আর সব কবর ভেদ করে মৃত সৈনিকেরা উঠে সার বেঁধে মার্চ্চ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ঘটনাটি প্রথম দেখলেন দুজন ফরাসী সেনানায়ক; তাঁরা ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে রইলেন।

এরপর দেশে দেশে খবর দেবার পালা। এইখানে এত বিরুদ্ধ রসের অবতারণা করা হয়েছে যে দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। ফরাসীদের প্রধান মন্ত্রী তাঁর প্রণয়িনীর স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর সঙ্গে রাত্রিযাপন করছিলেন। টেলিফোনে তাঁর কাছে সংবাদ এল। মহিলাটির সঙ্গে খানিক কথা কাটাকাটির পর (যা থেকে দেখা গেল প্রধান মন্ত্রীটি একটি অপদার্থ) তিনি টেলিফোন ধরলেন। খবরটি বুঝতে তাঁর অনেকটা সময় লাগল। যখন বুঝলেন, তখন বিশ্বাস করতে চাইলেন না, স্থির করলেন যে এটা তাঁর বিরুদ্ধে খবরের কাগজওয়ালাদের চক্রান্ত (কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ঠিক বোঝা গেল না।) এর পর তিনি নিশ্চিন্তমনে প্রেয়সীর আলিঙ্গনে ধরা দিলেন ও ঘর অন্ধকার করে দৃশ্য শেষ হল।...জার্ম্মানীর চ্যান্সেলার কাজের লোক—রুটিন-বাঁধা কাজের বাইরে তাঁর মাথা খেলে না। খবরটার গুরুত্ব তিনি বুঝতেই পারলেন না, যেহেতু বিষয়টা তাঁর কর্ত্তব্যের এলাকার বাইরে। আর্চ্চবিশপকে সংবাদ দেবার আদেশ দিয়ে তিনি নিদ্রা গেলেন।

এই রকম অস্বাভাবিক ও অতিরঞ্জিত চিত্র আরো অনেক জায়গায় আছে। এ ধরণের ব্যঙ্গচিত্র প্রহসনে চলতে পারে, একটা গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখা ট্র্যাজেডিতে নয়। যে সুর নিয়ে নাটকের আরম্ভ এবং যাতে তার শেষ হয়েছে তার মাঝে মাঝে এই ধরণের বেসুর লাগাতে ভারি বিসদৃশ বোধ হয়।

বেঁচে ওঠা সৈনিকরা কল্পনায় নানারকম সুখের ছবি আঁকতে আঁকতে বাড়ী ফিরছে, এদিকে দেশে তাদের জায়গা যারা দখল করেছে তারা নানারকম ভাবনায় অস্থির হচ্ছে। একজন এসে দেখলে তার স্ত্রী আবার বিয়ে করে ঘরসংসার পেতেছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে তোমরা বলে দাও আমার স্থান কোথায়?" নতুন স্বামী চেঁচিয়ে বলে উঠল, "গোরস্থানে, কবরে, ঐ মাটীর নীচে।" "আচ্ছা বেশ" বলে সেই হতভাগ্য নতশিরে চলে গেল। সৈনিকরা দেখলে যে যে-সব বড় বড় আদর্শের কথা শুনে তারা প্রাণ দিয়েছিল সেগুলো সব ভুয়ো। মানুষে মানুষে, এবং জাতিতে জাতিতে

হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি ঠিক আগের মতই চলেছে। তা'রা আরো দেখলে যে জীবিতেরা তাদের চায় না—মৃতদের আবার কবরে পাঠাবার উদ্দেশ্যে তারা সংঘবদ্ধ হচ্ছে। তখন তারা মনের দুঃখে আবার ভার্ডুনে ফিরে গিয়ে কবরে প্রবেশ করলে।

লেখকের যুক্তি ঠিক বোঝা যায় না। সৈনিকেরা যুদ্ধে মরেছে বলেই কি তা'দের স্ত্রীদের আর বিয়ে না করে আমরণ বৈধব্য পালন করা উচিত? স্বাভাবিক কারণে যারা মরেছে, তারাও যদি বেঁচে ওঠে তাহলে তো সেই একই সমস্যার উদ্ভব হবে। তবে আর যুদ্ধের কথা টেনে আনবার কি দরকার ছিল? আর এক কথা এই যে সৈনিকরা নিজের চোখে দেখলে যে তারা যে আদর্শের জন্যে প্রাণ দিয়েছিল সেটা সত্যে পরিণত হয়নি'। এ কথা আগে জানলে তারা প্রাণ দিত না, তাই কি লেখক বলতে চান? যথার্থ আদর্শবাদী যে সে কখনো এ কথায় সায় দেবে না; সে জানে যে শুধু প্রাণ দেবারই একটা সার্থকতা আছে—আদর্শের সাফল্য হাতে হাতে লাভ না করলেও। অবশ্যি দু'পক্ষেরই যারা সত্যি সত্যি আদর্শের জন্যে প্রাণ দিয়েছে এখানে তা'দেরই কথা হচ্ছে।

নাটকের চরিত্র প্রায় একশোটি। তবে লেখকের বিবেচনা আছে; এক একজন অভিনেতাকে দিয়ে দু'তিনটা ভূমিকার অভিনয় কি করে করানো যেতে পারে তার একটা তালিকাও তিনি দিয়েছেন। নাটকখানা পড়ে শেষ পর্য্যন্ত এই ধারণা মনে থেকে যায় যে, এত আয়োজন-আড়ম্বর করে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে নানাদেশের নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়েও লেখক জিনিষটাকে জমাতে পারেন নি। যে কথাটা তিনি বলতে চেয়েছেন সেটা মনে দাগ রাখবার মত করে মোটেই বলতে পারেন নি।

Service নাটকখানা বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট নিয়ে লেখা। মন্দার বাজারে বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত একটা ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরের ক্রমশঃ পতন ও পুনরুত্থানের কাহিনী। বিষয়টি নীরস, কাজেই তাকে সরস করবার জন্যে কারবারের মালিকের দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যা আর প্রথম পক্ষের চপল-স্বভাবা কন্যাকে আনা হয়েছে আর তাদের দুজনের মধ্যে ঈর্ষা-কলহ নাটকের অনেকটা জুড়ে রয়েছে। এতেও তিন ঘণ্টার খোরাক পূরে হয়নি, তাই সঙ্গে আর একটি sub-plot জুড়ে দেওয়া হয়েছে—চাকরী হারিয়ে কেরাণি ও তার ছেলে-মেয়ে একটা ছোট ব্যবসা খুলে কি করে আবার মাথা তুলে দাঁড়াল তারই ইতিহাস।

নাটকের climax ঘটেছে যখন কারবারের মালিক আর বাঁচাবার কোনো উপা[য়] না দেখে নামমাত্র দামে দোকানটাকে বেচে ফেলে বাড়ী এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী এব[ং] প্রেমিকের সঙ্গে পলাতকা। নাটকের শেষটা আরো ছেলেমানুষী। মালিকের বেপরোয়া ছেলেটি প্যারীতে ফূর্ত্তি করতে গিয়েছিল বলে জানা ছিল। সে হঠাৎ বাড়ী ফিরে এসে বলে দোকান বেচে দেওয়া হবে না—কারণ, এতদিন যে সে প্যারীতে ছিল, সেটা আমো[দ] করে বেড়াবার জন্য নয়; দোকানের উন্নতি কিসে হয় সে চুপি চুপি তাই শিখছিল তখন সমস্যা হল কি করে দোকান রাখা যায়—বিক্রীর কণ্ট্রাক্ট একরকম হয়ে গেছে সমাধান হতেও দেরী হল না—কণ্ট্রাক্টে গলদ বেরিয়ে পড়ল, না বেচলেও চলবে উল্টে, দোকান বেচা হয়েছে সেই খবর ছাপাবার জন্যে খবরের কাগজওয়ালার কা[ছে] খেসারতের বাবদে একটা মোটা টাকা আদায়েরও আশা হ'ল। এদিকে পলাত[ক] স্ত্রীটি খবরের কাগজে স্বামীর দুরবস্থার কথা পড়ে অনুতাপে আবার স্বামীর কা[ছে] ফিরে এল, কিন্তু নেহাতই কিনা সে লোক ভাল নয়, তাই স্বামীর সঙ্গে তার মিলনা

লেখক আর ঘটতে দিলেন না। দোকান বেচতে হয় নি এবং স্বামীটি বেশ বাহাল-তবিয়তেই আছেন দেখে তার ধর্ম্মজ্ঞান উবে গেল এবং সে আবার সেই প্রেমিকের কাছে প্রস্থান করল। এরপর ছেলের প্যারীতে-শেখা বিদ্যার জোরে দোকান আবার উন্নতির পথে এগিয়ে চলল এবং ঠিক সেই সময়ে কয়েকটা বড় বড় কণ্ট্রাক্টও এসে জুটল। তখন আর পায় কে! জানলার ফাঁক দিয়ে মেঘভাঙ্গা আকাশে রামধনুর উদয় দেখিয়ে ভাবী সুদিনের আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যবানিকা-পতন হল।

নাটকখানা সেখানকার থিয়েটারে মন্দা বাজারকে তেজী করেছে কিনা এবং নাট্যকারের অর্থসমস্যার সমাধান করতে পেরেছে কিনা সেটা জানবার জন্যে কৌতূহল রইল।

Strange Orchestra-র পটভূমিকাও একটা বোর্ডিং হাউস। বাড়ীওয়ালী, তার তিন ছেলেমেয়ে আর নানারকম প্রকৃতি ও মতিগতির কয়েকজন ভাড়াটে। এতগুলো বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবন-যাত্রার চিত্র। নাটকে প্লট বিশেষ কিছু নেই কারণ গল্প বলার চাইতে ছবি আঁকার দিকেই লেখক বেশী ঝোঁক দিয়েছেন। নানারকম বিচিত্র সুরসংযোগে একটা অদ্ভুত ঐক্যতান।

বৈচিত্র্য সাধনের জন্যে প্রায় সব কটা চরিত্রেই একটা না একটা eccentricity জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ীওয়ালী থিয়সফি-ভাবাপন্ন—কর্ম্মফল, vibration ইত্যাদি বুলি তোতাপাখীর মত আওড়ায়; তার এক মেয়ে এস্‌থার যখন যে-বই পড়ে তাই নিয়ে মেতে ওঠে ইত্যাদি। প্রায় সব মানুষগুলোই ছিটগ্রস্ত। শেষের দিকে গল্পও একটু আছে। পিটার নামে এক ভাড়াটে বাড়ীওয়ালীর মেয়ে জেনীকে ভালবাসার ভান ক'রে তার টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে গেল। ঠিক সেই দিনই জেনী হঠাৎ চোখের অসুখে অন্ধ হয়ে গেল। জেনীকে আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সবাই বললে পিটার মরে গিয়েছে। ক'দিন পরে পুলিশের তাড়া খেয়ে পিটার আবার হঠাৎ সেই বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল। সব কথা জানতে পেরে জেনীর মূর্চ্ছা ইত্যাদি। এর ভেতর আবার একদিন দুজন ভাড়াটে জিমি আর লরা একসঙ্গে দরজা বন্ধ করে গ্যাস দিয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করলে। এই রকম সব ভিন্ন ভিন্ন গল্পের টুকরো জোড়া দিয়ে নাটকখানা গাথা হয়েছে।

বর্ত্তমান যুগসন্ধিসময়ে যখন রাষ্ট্রে, সমাজবিধিতে, ও ব্যক্তিগত জীবনে নানারকম বিপ্লব-শক্তির ক্রিয়া চলছে তখনকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমস্যাকুল জীবনযাত্রার একটা টুকরো ছবি বেশ ফুটেছে কিন্তু নাটক হিসাবে জিনিষটাকে ভাল বলা চলে না।

Behold, We Live এর প্লট নিতান্তই মামুলি। টোনো তার স্ত্রী সারার ওপর অত্যাচার করত। অসহ্য হয়ে উঠাতে একদিন সারা আত্মহত্যা করবে স্থির করলে; এমন সময় গর্ডনের সঙ্গে দেখা। গর্ডনের সঙ্গে বেরিয়ে এসে সারা স্বামীকে ডিভোর্স করলে। গর্ডন ছিল বিবাহিত কিন্তু তার স্ত্রী কুচরিত্রা এবং তার সঙ্গে তার বনিবনাও ছিল না; কাজেই এইবার গর্ডনের সঙ্গে সারার বিয়ে হলেই মিটে যেত। কিন্তু তাতে একটা বাধা উপস্থিত হল; গর্ডনের স্ত্রী কি এক খেয়ালের বশে কিছুতেই তার স্বামীকে ডিভোর্স করে বিবাহের স্বাধীনতা দিতে রাজি হল না। যাই হোক তাতে যে তাদের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হল তা মনে হয় না—তারা স্বামী-স্ত্রীর মতই ঘরকরণা করতে লাগল। বিশেষতঃ যখন দেখতে পাচ্ছি যে গর্ডনের মা, Dame উপাধিধারিণী মহিলা-সারার সঙ্গে ঠিক পুত্রবধূর মতই ব্যবহার করছেন, তখন সে-দেশের বর্ত্তমান সমাজ

ব্যবস্থায় দশের চোখেও তাদের সম্বন্ধটা বিশেষ দূষণীয় হবে না বলেই ধরে নিতে পারি। এর পর এ নাটকের সমাপ্তি ট্র্যাজেডিতে হওয়া সম্ভাব্য ছিল না, অপরিহার্য্য তো নয়ই। কিন্তু তিন বছর এই রকম সুখে স্বচ্ছন্দে কেটে যাবার পর হঠাৎ গর্ডনের একটা কঠিন অসুখে মৃত্যু হয়ে নাটক শেষ হল।

প্রধান চরিত্র তিনটি এবং হেক্টর ও জুয়েল এই দুটি পার্শ্ব-চরিত্র ভালই ফুটেছে। কিন্তু কথাবার্ত্তাগুলো নীরস ও একঘেয়ে হওয়াতে এবং মূল গল্পটিতে কোন বিশেষত্ব না থাকাতে নাটকটি জমে ওঠে নি'। টোনো তার স্ত্রীর দিকে পিস্তল লক্ষ্য করছে, এই দৃশ্য নিয়ে নাটকের আরম্ভ ডিটেকটিভ গল্পের চমক লাগাবার শস্তা কলাকৌশলের কথা মনে করিয়ে দেয়। "Young Woodley" এর যশস্বী লেখকের কাছে আমরা এর চাইতে ভাল জিনিষ আশা করেছিলাম।

Counsellor-at-Law কে যদিও যথার্থ ভাল নাটক বলা যায় না, এই সংগ্রহের ভেতর এই খানাই আমার সব চাইতে ভাল লেগেছে, কতকগুলো কারণে নাটকটির গল্পাংশ সামান্য ও বিশেষত্বহীন। নিউইয়র্কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইনজীবী জর্জ সাইমন এই নাটকের নায়ক। তিনি হঠাৎ জানতে পারলেন যে তাঁর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর বহুদিন আগের একটা বেআইনী কাজের কথা খুঁজে বার করে তার সাহায্যে তাঁর সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে। এই দারুণ সঙ্কটে পড়ে তিনি যখন আত্মহত্যাও বাঞ্ছনীয় মনে করছেন সেই সময় তাঁর নিযুক্ত একজন গোয়েন্দা সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর একটা গোপন অপরাধের সংবাদ ও তার প্রমাণ তাঁকে এনে দিলে। সেই প্রমাণ হাতে থাকাতে তিনি যখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছেন ঠিক সেই সময় সংবাদ পেলেন যে তাঁর স্ত্রী তাঁরই এক বন্ধুর সঙ্গে পলাতকা। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিচলিত হয়ে তিনি আবার আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন এমন সময় তাঁর সেক্রেটারী হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বাধা দিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করলে।

এই গল্পাংশটুকুতেই নাটকের দুর্ব্বলতা। নইলে আবহাওয়ার সৃষ্টিতে, চরিত্র-চিত্রণে, গঠননৈপুণ্যে আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েও তাঁর প্রখর দৃষ্টিতে লেখকের যথার্থ শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্লটের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে মনে হয় নাট্যকার নিজেও খুব সচেতন; তাই তিনি গল্পবলার দিকে ও ঘটনা-স্রোতের ক্রমপ্রবাহের ওপর বেশী মনোযোগ দেন নি; মূল plot এর সঙ্গে আরো কয়েকটি ছোট ছোট subplot জুড়ে দিয়েছেন; সমস্ত প্রথম অঙ্কটির মধ্যে শেষের দুএক পৃষ্ঠা ছাড়া মূল গল্পটির সূচনা মাত্রও করে নি। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিশেষত্বহীন ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে কতকগুলো জীবন্ত চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার দিকেই তিনি সমস্ত ঝোঁক দিয়েছেন।

নাটকের পটভূমিকা এটর্নীর আপিসটি বেশ নিপুণভাবেই আঁকা হয়েছে নানা-রকম কাজে বিভিন্ন প্রকৃতির মক্কেলদের আনাগোনা, পুরুষ ও নারী কর্ম্মচারীদের ব্যস্ততা-হীন কর্ম্মকুশলতা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অবিশ্রাম একতরফা কথাবার্ত্তা সবটা মিলে মৌমাছির চাকের মত কর্ম্মচঞ্চল আপিসের ছবিটি খুব সুন্দর ফুটেছে।

কিন্তু নাটকটির প্রধান গুণ চরিত্রসৃষ্টিতে। নায়ক থেকে আরম্ভ করে সামান্য জুতো-সাফ-করা ভৃত্য পর্য্যন্ত বেশ নিপুণ তুলিতে জীবন্ত করে আঁকা। কোথাও অসঙ্গতি বা আতিশয্য নেই।

নায়ক সাইমন successful ব্যারিষ্টার। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের শক্তিতে এত বড় হয়েছেন। তদুপযুক্ত গুণেরও অভাব নেই। অত্যন্ত কর্ম্মঠ, কর্ত্তব্যপ্রিয়; সকলের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করেন। তবে নীতিজ্ঞান খুব প্রখর নয়—নিজের বা মক্কেলের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এক আধটু বেআইনী কাজ বা মিথ্যাচরণ করতে কুণ্ঠিত নন—অবশ্যি কারো অনিষ্ট না করে। মাতৃভক্ত, বন্ধুবৎসল এবং স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায় অন্ধ।

তাঁর স্ত্রী কোরা প্রথম স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসে সাইমনকে বিয়ে করেছেন। সাইমনের বলিষ্ঠ পৌরুষ ও অগাধ ভালবাসায় প্রথমটা আকৃষ্ট হয়ে থাকলেও তিনি সুখের পায়রা। স্বামী কাজে ব্যস্ত থাকেন—সেই অবসরে তিনি অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেমচর্চ্চা করেন। স্বামীর বিপদের দিনে তাঁকে ফেলে দেশভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে স্বামীর এক বন্ধু।

সাইমনের সেক্রেটারী রেজিনা তার মনিবকে ভালবাসে। তার স্বাভাবিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে ভালবাসার প্রেরণা থাকাতে সমস্ত কাজ নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করে। আর নিষ্ফল ভালবাসার নিরুদ্ধ আবেগ নিয়ে সাইমনের অযোগ্যা স্ত্রীর ওপরে একটা দারুণ বিদ্বেষ পোষণ করে।

এই ক'টি প্রধান চরিত্র ছাড়া অনেকগুলো পার্শ্ব চরিত্র আছে। মিসেস্ চ্যাপমান স্বামীহত্যার অভিযোগ থেকে সাইমনের ওকালতির জোরে খালাস পেয়েছে। খবরের কাগজে কাগজে বিখ্যাত হয়ে পড়াতে ভারি খুসি। সাইমনের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা একটা সাময়িক প্রেমমাদকতায় পরিণত হওয়ায় সে তাঁকে প্রেমনিবেদন করে অকস্মাৎ একটা চুমো খেয়ে ফেলল; তারপর তাঁর প্রত্যাখ্যানে আহত হয়ে তাঁকে শাসিয়ে চলে গেল।

অপরিণতবুদ্ধি কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমিউনিষ্ট যুবক হ্যারি, অধ্যবসায়ী প্রেমিক ভাইনবার্গ, বড়লোকের ছেলেদের ভুলিয়ে বিয়ের ফাঁদে ধরবার চেষ্টাকারী সিনেমা অভিনেত্রী লিলিয়ান এবং আরো অনেকগুলো ছোট ছোট চরিত্র বেশ জীবন্ত হয়েই ফুটেছে।

কিন্তু নাটকের মেরুদণ্ড তার গল্পে। প্রথম থেকে পাঠকদের কৌতূহল জাগিয়ে তুলবার এবং শেষপর্য্যন্ত তাকে আকৃষ্ট করে রাখবার মত না হওয়াতে গল্পটি নাটকের উপাদানে গঠিত হবার অনুপযুক্ত এবং সেই জন্যে আর সব বিষয়ে এত সুন্দর হয়েও নাটকটি মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না।

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার

শিরণী—দরজীর শান্তর; অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন এম, এ কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক—এম, সি সরকার এণ্ড সন্স।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন বাংলা সাহিত্যে পরিচিত, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি হারামণি নাম দিয়ে বাউলের গানের যে সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন তা'তে অনেকেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পল্লীর কথা ও কবিতায় তা'র মন আকৃষ্ট হয়েছে—তাই তিনি এবার এই নূতন সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক মহম্মদ শহীদুল্লাহের 'পরিচয়' ও শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্ব্বাণীর সহিত এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই

উপকথাটী পাবনা জেলার কোন এক পল্লী থেকে সংগৃহীত; এরূপ উপকথা অনেক পল্লীতে চলিত আছে. এবং যাঁ'রা এগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করবেন তাঁরাই বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাভাজন হবেন, কারণ এই সব উপকথার ভিতর দিয়েই নিরক্ষর পল্লীজনের রচনা-শক্তি ও কৃষ্টির অভিব্যক্তি। ভাষাতত্ত্বের ও নৃতত্ত্বের দিক দিয়েও এ সব সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আছে— কারণ বাংলা দেশের নানা স্থানের ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে হ'লে এই সব সংগ্রহ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। এই সংগ্রহের কাজে মনসুরউদ্দিনই প্রথম অগ্রসর হয়েছেন।

নামকরণে সংগ্রহকর্ত্তা বলেছেন যে "খাঁটি প্রাদেশিক ভাষায় এই উপকথাটী লেখা গেল"। এ উক্তি থেকে মনে হয় তিনি কথাটী যেরূপ শুনেছেন সেইরূপই লিপিবদ্ধ করেন নি, নিজেও হাত চালিয়েছেন। সে সন্দেহ যদি সত্য হয় তাহ'লে ভাষাতত্ত্বের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা কম। হয়ত মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের নিজের স্থানীয় ভাষাতেই উপকথাটী লিখেছেন, কিন্তু তিনি অন্য প্রদেশের ভাষার আওতায় উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন— সুতরাং সে ভাষার কিছু ছাপ এই সংগ্রহে পড়তে বাধ্য—উদাহরণ পৃঃ ৩ "সন্তানাদি কিছুই নাই", "সে বড়ই আক্ষেপ করলো", "সকলে আমাকে", "আমি সেই রকম করবো" ইত্যাদি। মনসুরউদ্দিনের স্থানীয় ভাষা আমি জানি না, তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সব কথাগুলি তাঁর স্থানীয় ভাষার নয়। এ সব সংগ্রহ করবার সময় নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের অনুমোদিত পন্থা অনুসরণ করা ও সংগ্রহকর্ত্তার নিজের হাত ভ্রমেও যা'তে সংগ্রহে না পড়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। আর একটি কথা, মনসুরউদ্দিন এ বই ফার্সিধরণে পেছন থেকে আরম্ভ করেছেন, ও তাঁর রচনায় অপ্রয়োজনীয় আরবি ও ফার্সি কথা চালিয়েছেন। এতে সাহিত্যের সৌকর্য্য সাধিত হ'বে কি? ভারতবর্ষে ব্রাহ্মী লিপির একটা নির্দ্দিষ্ট গতি রয়েছে—সে গতির ব্যতিক্রম করার আবশ্যকতা কিছু আছে কি? "হারামণি" প্রকাশের সময় এ ব্যতিক্রম তিনি করেন নি। উৎসর্গ পত্রে মনসুরউদ্দিন লিখেছেন "আমার মায়ের অমৃতময়ী স্মৃতির উদ্দেশ্যে দুনিয়ার তামাম কচি ছেলে মেয়ের হাতে দিলাম।" যে সব "কচি ছেলে মেয়ে"— 'অমৃতময়ী স্মৃতি'র অর্থ বুঝতে পারে "পৃথিবীর সমস্ত……" কথাগুলির অর্থবোধ করতে পারবে না বলেই কি তিনি "দুনিয়ার তামাম……" আমদানী করেছেন?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

Memoirs of a British Agent—By R. H. Bruce Lackhart (Putnam)

লয়েড জর্জ্জের সদ্য প্রকাশিত আত্ম-গরিমার কাহিনী পড়িতে পড়িতে আমাদের মত পররাষ্ট্র-পীড়িত মানব-চিত্ত স্বতঃই প্রফুল্ল হইয়া উঠে যখন প্রতীয়মান হয় যে ইংরাজের ন্যায় অতি কুটিল রাজনীতিজ্ঞেরও চাল ইতিহাসের স্বচ্ছন্দ পাদবিক্ষেপে দলিত লাঞ্ছিত হইয়া যাইতে পারে। লর্কহার্ট গত মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে বিপ্লবের শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়াতে ইংরাজ-রাজের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং আন্তর্জ্জাতিক কূট চক্রান্তের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহার শোচনীয় বৈফল্যের কাহিনী উপন্যাসের ন্যায়

সরল ভাবে তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিহাসের আভ্যন্তরীণ সত্যের উপর অনেকখানি আলোকপাত করিয়াছেন। কর্ম্ম-প্রেরণার উৎস স্বরূপ যে স্বদেশ-প্রেম তাঁহাকে এককালে নিষ্ঠায় ও একাগ্রতায় ইংরাজ পররাষ্ট্র-চক্রান্তের আদর্শ স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল, আজ নিয়তির বিচিত্র গতিতে তাহা নিষ্ফল হইয়াছে এবং বোধ করি সেই কারণেই তাঁহার লেখনীর সহজ সাবলীল ছন্দ অহমিকা ও একদেশ-দর্শিতার অসংস্থিতিতে পর্য্যবসিত না হইয়া, আত্মনিরপেক্ষ নির্লিপ্ত আখ্যান-শিল্পে পরিণত হইতে পারিয়াছে।

লেখকের প্রথম-জীবন বিচিত্র হইলেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনাসঙ্কুল, এবং এজন্য বিনয়ের বাহুল্য না-করিয়া তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত দ্রুততালে ভাষা ও ভাবের উৎকর্ষ বাঁচাইয়া নিজের অপরিণত জীবনের কাহিনী সঙ্ক্ষেপে সারিয়া কর্ম্মজীবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

নিছক সত্য-ভাষণের খাতিরে মানুষের ঐশ্বর্য্যময় প্রকৃতির বিচিত্র কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ যে সাহিত্যে আলোচিত হয়, লকহার্টের আত্ম-কাহিনীর সেখানে স্থান নাই। ড্রাইসার বা ডুরান্টের ন্যায় মনঃস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের তাগিদ লেখকের নাই। তিনি নিজেকে সংসারের লীলা-ক্ষেত্রে গৌণ বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছেন। এই নির্লিপ্ততার মূলে কোনো আধ্যাত্মিক বোধ নাই,—আছে অতৃপ্ত অন্তরের গভীর নৈরাশ্য ও অবসাদ।

যে স্বদেশ-প্রেম ও কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইংরাজরাজদূতগণ রাজনৈতিক কর্ম্ম-সাধনে আত্মদান করেন তাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিতুষ্টিলোভ না থাকিলেও জাতিগত সিদ্ধিলাভের তৃপ্তি থাকে। লকহার্টের বেদনার কারণ, তাঁহার কষ্টলব্ধ অভিজ্ঞতা ও সোভিয়েট শক্তির সহিত সখ্যস্থাপনের অক্লান্ত চেষ্টা লয়েড জর্জ্জীয় মন্ত্রীসভার রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের অতি-বুদ্ধির সঙ্ঘাতে সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় এবং আজ বিপ্লব-সমস্যার অবসানে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যখন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তখন তিনি স্বয়ং কর্ম্মজীবন হইতে বিতাড়িত। তবু আত্মকথাতে শ্লেষ বা অভিমানের ব্যঞ্জনা শ্রুতিকটু হইয়া উঠে নাই, কারণ তিনি প্রকৃত শিল্পী কর্ম্মজীবনের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর মধ্যে নিজের গতিবিধি নির্ব্যাজ নিরপেক্ষ অনুকম্পার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ।

লক্‌হার্ট এক স্থানে কৌতুকচ্ছলে আক্ষেপ করিয়াছেন যে তিনি যদি জনমত-নির্ভরশীল ক্ষণস্থায়ী মন্ত্রীদিগের মনোরঞ্জনের চেষ্টা না করিয়া হোয়াইট হলের পাকা কর্ম্মচারীদিগকে মুরুব্বী ধরিতেন এবং স্বয়ং রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে অচল অনড় হইয়া স্থাণুর ন্যায় বিরাজ করিতেন, তবে তাঁহার জীবনযাত্রা হয়তো অধোগামী হইত না। আমার মনে হয় অতি শুভক্ষণে তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়াছিল, কারণ প্রবর্দ্ধমান শিল্পীর পক্ষে সাংসারিক উন্নতির বালুচর নিরাপদ নহে। ফরাসী বিপ্লবের সময় যে ইংরাজদূত Robespierre ও Danton-এর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহার দিন-পঞ্জিকা হোয়াইট হলের পাষাণ প্রাচীরের সমাধি হইতে অব্যাহতি পাইলে জগতের ইতিহাস-সাহিত্য নিশ্চয়ই সমৃদ্ধিলাভ করিত।

মঙ্কহাউস্ থর্ণটন্ প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমিক বৃটিশ ইন্‌জিনিয়ারগণের বিচার উপলক্ষে ভারতবাসী ইংরাজদিগের যে মুখপত্রগুলি সম্প্রতি তীব্রভাবে বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল, এই আত্মকাহিনীটি তাহাদের বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের দিশাহারা উল্লম্ফনের পশ্চাতে যে বিবর্ত্তন-ভীরুতা প্রকাশ পায় তাহার প্রথম বিকাশ বহু পূর্ব্বে, তখনও সোভিয়েট সরকার সম্পত্তি-বৈষম্য নিরাকরণের প্রলয়ঙ্কর হঠকারিতায়

প্রবৃত্ত হয় নাই। বোধ করি বাণিজ্যপুষ্ট জাতির পক্ষে প্রগতির সাড়া স্বভাবতঃই আতঙ্ক-কর। ১৯১৭ সালের প্রারম্ভে যুদ্ধরত রুষরাজশক্তি যখন ইংরাজের প্রতিশ্রুত অস্ত্র ও অর্থের সাহায্য না পাইয়া মুখ্যতঃ নিজের দোষেই ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন হইতেই ইংলণ্ড অস্বস্তিবশতঃ বারবার ভব্যতার সীমা বিস্মৃত হইয়া রিক্ত নির্ঘোষ ও নিষ্ফল চক্রান্তে আপন সম্ভ্রম লঘু করিয়াছে।

স্বল্প পরিসর সমালোচনায় রুষ-বিপ্লবের সুসম্বদ্ধ ইতিবৃত্তের স্থানাভাব হইবে বলিয়া লকহার্ট-কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া সম্ভব হইল না।

কর্ম্মজীবনের বিরতির পূর্ব্বে লকহার্টের অবস্থা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত হইয়াছিল। বলশেভিকদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চাতে মিত্রশক্তির ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল এবং অবশেষে আর্চাঙ্গেলের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া তিনি যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন নানা ব্যক্তিগত কারণে তাঁর চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। দার্শনিক নিরীক্ষার সহিত ভাগ্য-বিড়ম্বনাকে অঙ্গীকার করিয়া লইতে বোধ করি সেই সময়েই তিনি শিক্ষালাভ করেন।

জাতীয়তার দৃঢ়দুর্গ ভেদ করিবার দুর্লভ শক্তি লকহার্টের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তিনটি পরদেশী রমণীর কল্যাণে। প্রথম জীবনের মাওয়ারী প্রণয়িনীর অসমাপ্ত পরিচয়, শেষ-জীবনের রুষ-প্রেয়সীর প্রেমালোকে নিষ্প্রভ হয় নাই অথচ অষ্ট্রেলিয়ান স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সহমর্ম্মিতার ঐশ্বর্য্যেও লেখক অধিকারী।

কৌশলে সত্যের নগ্নমূর্ত্তি রাখিয়া ঢাকিয়া মধুর আখ্যান শিল্প যাঁহারা রচনা করেন তাঁহাদের লেখনী হইতে হৃদয়ের অকৃত্রিম আলেখ্য প্রসূত হয় না। সুতরাং নক্ষত্রত্রয়ের কোন্‌টির আলোক তাঁহার চিত্তাকাশে স্থায়ীভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন। ঘটনার দিক দিয়া এ-কাহিনীর সত্য মিথ্যার বিচার চিত্রগুপ্তের উপরেই ন্যস্ত। এখানে শুধু এইটুকুই উল্লেখযোগ্য যে, যে আত্ম-নিবেদনে শত্রুর নিষ্কুণ্ঠ প্রশংসা স্থান পায়, তাহার মিথ্যাভাষণও ধন্য।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

The History of the Russian Revolution—
By Leon Trotsky. (Victor Gollancz). 3 volumes.

(১)

বিংশ শতাব্দীতে বেঁচে, ক্ষোভ করবার বিশেষ কোন কারণ নেই আমার বিশ্বাস হয়েছে। কিছু না হোক, মহাযুদ্ধ ও তার কর্ম্মভোগ, রুশিয়ান বিপ্লব ও তার ফলে নব্য-রুশিয়ার অভ্যুত্থান, চীন, ভারতবর্ষ ও মুসলমান-প্রধান দেশের নব-জন্ম, বিজ্ঞানের প্রসার, এবং শ্রমিকদলের আত্মপ্রতিষ্ঠা ত' লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছি! এইগুলির মধ্যে যে কোন ঘটনা পূর্ব্বের যে কোন শতাব্দীর যে কোন যুগকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারত। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে প্রত্যক্ষ ঘটনার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের অসুবিধা হয়। সমসাময়িক ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বের নিগূঢ় কার্য্যকারণ সম্বন্ধটি পরিস্ফুট হয় না। যা চোখের সামনে ঘট্‌ছে তার স্বাধীনতা পূর্ব্বাপর পারম্পর্য্যের বাইরে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হয়, তার মধ্যে অতীতের রেশ নেই; ভবিষ্যতের আভাস নেই; সে কেবল স্বপ্রধান। যার পূর্ব্বস্মৃতি

নেই, তার আবার ইতিহাস কি ? ইতিহাস ত' স্মৃতিশাস্ত্রেরই একটি রূপ ! অতএব সমসাময়িক ঘটনা হয় কোন দাগ না রেখে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়, না হয় দৈনিক খবরের কাগজের পুরানো তাড়ার মধ্যে আত্মগোপন করে। সাধারণ লোকের পক্ষে ইতিহাসের ধারা বর্ত্তমানের বালুচরে লুপ্ত হয়। কিন্তু অ-সাধারণ ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। অ-সাধারণ ব্যক্তি অর্থে প্রকৃত ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিকের কাছে ঘটনাবলীর মধ্যে কোন বিরতি নেই, একটি ঘটনা অন্যটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, শ্যামদেশের যমজের মতই। অতীত বর্ত্তমানের মধ্যে ওতঃপ্রোত, অতীত-বর্ত্তমানের কৃপায় ভবিষ্যৎ প্রাণবন্ত। ইতিহাসের এই তন্ময়তা, এই অন্তর্ভূতি না বুঝলে সমসাময়িক ইতিহাস বোঝাও যায় না লেখাও যায় না। এক কথায় প্রত্যেক ঐতিহাসিকের একটি দেখবার ভঙ্গী অর্থাৎ দর্শন থাকা চাই। ইতিহাসের যতপ্রকার দর্শন হয়েছে তার মধ্যে মার্ক্সের সংশোধিত হেগেলের মতবাদই বর্ত্তমান সভ্যতার উপযোগী। ট্রটস্কীর ইতিহাস পূর্ব্বোক্ত মতবাদ-সম্মত। শ্রেণী-বিরোধের দ্বারা জরাজীর্ণ রুশিয়ান সমাজের পুনর্গঠন, এবং সোভিয়েটরূপী নব্য-অনুষ্ঠানের সাহায্যে জনসাধারণের স্বহস্তে মাত্র আটমাসের মধ্যে রাজ্যের সমগ্রভার গ্রহণ, এই হল ট্রট্‌স্‌কীর প্রতিপাদ্য। বিষয় বস্তুর পরিবর্ত্তে প্রতিপাদ্য বলবার অর্থ এই যে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী, জুলাই ও অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে যে ঐক্য আছে সেটি ঐতিহাসিক ন্যায়ের সঙ্গতি, ঋতুর পরিবর্ত্তন নয়।

মার্কসের মতবাদকে গ্রহণ করেই ট্রটস্কীর এই আটমাসের ঘটনাবলীকে গ্রথিত করেছেন বল্লে ট্রটসকীর মতন লোকের প্রতি অবিচার করা হয়। ট্রটসকীর নিজস্ব দেখবার ভঙ্গীও আছে, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নতুনত্বও আছে। ট্রটসকী একজন সাহিত্যিক এবং উঁচুদরেরই সাহিত্যিক। সাহিত্যের দিক থেকে এই বইখানির মূল্য খুব বেশী। বিপ্লব-যুগের গতির দ্রুতহার তাঁর লেখায় দ্রুততর হয়েছে; বিপ্লব-যুগের নাটকত্ব তাঁর সজ্জিত ঘটনা-বিন্যাসে ধরা পড়েছে; এই অ-সাধারণ যুগের নায়ক-বৃন্দের চরিত্রগুলি তাঁর কলমে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বইখানি একটি উৎকৃষ্ট চিত্রশালা, সুশ্রী-বিশ্রী, মহান ও ক্ষুদ্র, কোন চরিত্রই বাদ পড়েনি এবং সবগুলিই জীবন্ত। লেনিন থেকে আরম্ভ করে চাষী, মজুর ও পদাতিক সকলের-ওপরই তাঁর সমান দৃষ্টি, কারুর ওপর জ্বালার, কারুর ওপর কৃপার, কারুর ওপর ভক্তির, কারুর প্রতি ঘৃণার; সে দৃষ্টির জোরে সকলেই যেন অতীতের কবর থেকে লাফিয়ে উঠে এসেছে। এই প্রাণদানের দৃষ্টি মার্কসের কোন শিষ্যের আছে বলে মনে পড়ছে না। মার্কসেরও ছিল না, কেননা তিনি আর সব কিছু হতে পারেন, আর্টিষ্ট তিনি নন। কোন মতবাদকে অনুকরণ করলেই আর্টিষ্ট হওয়া যায় না, যদিও আর্টিষ্ট হতে গেলে নিজের একটা মত থাকা চাই, কিংবা পরের মতকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করা চাই যাকে নিজের মতই বলা চলে। ট্রটস্কীর চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির বেশী সুখ্যাতি করতে গেলে লোকের মনে একটা ভুল ধারণা আসতে পারে। ইতিহাসকে যদি মহামানবের লীলাভূমি হিসেবে দেখা যায়, তা হলে পোর্ট্রেট আঁকার বিশেষ সুবিধা হয়। যেমন কার্লাইলের হয়েছিল। কিন্তু যদি কোন ঐতিহাসিক মহামানবে বিশ্বাস না করে জনমানবে বিশ্বাস করেন তবে তাঁর চরিত্র চিত্রাঙ্কনে বিশেষ অসুবিধা। গল্পলেখক ও নভেলিষ্ট এ অসুবিধা অতিক্রম করতে পারেন ও করেছেন, যেমন টলষ্টয়; বিশেষত তাঁর "ওয়ার এণ্ড পীসে"। সেখানে নেপোলীয়নকে ছোট করে একটি অজ্ঞাতকুলশীল সৈনিককে বড় করা হয়েছে, তার ওপর আলোর সমগ্র উজ্জ্বলতা নিক্ষেপ

করা হয়েছে। আলোকসম্পাতের পাত্রনির্ব্বাচনে টলষ্টয়ের আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সত্যের অপেক্ষা মতবাদের প্রতিশোধের ক্রিয়াই বেশী। তবু টলষ্টয় বড় লেখক, তাই রক্ষা! ট্রটস্কীর নায়ক কোন ব্যক্তি নয়, জনসাধারণ। তাঁর ইতিহাস জন-সাধারণের ক্রীড়াভূমি। তিনি কার্লাইলের মতন অতিমানবে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে কোন ঘটনাই Special Creation নয়, তিনি নিয়তিতে আস্থাবান। তাঁর মতে নেতা হচ্ছেন পূর্ব্বতন ইতিহাসের সৃষ্ট পুরুষ। এমন কি লেনিনও তাঁর মতে আকস্মিক ঘটনা নন। এই ধরণের মত পোষণ করলে চরিত্রাঙ্কন অতিশয় শক্ত হয়ে ওঠে। অতীত ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যোগ দেখাতে গেলে চরিত্রের বিশেষত্ব অঙ্কন করা যায় না। ট্রটস্কীর হাতে এই শক্ত কাজটি কিন্তু অতি সহজ হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে আমরা জনসাধারণের বিপ্লবী মূর্ত্তি দেখতে পাই, তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, ভয় ভাবনা, প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্ত্তন, তার আশা ভরসা কিছুই আমাদের কাছে গোপন থাকে না; অথচ সেই সঙ্গে লেনিন, কেরেন্‌স্কী মিলিউকফ, কর্ণিলভ ষ্ট্যালিন, ক্যামেনেভ, বুকানান ছবির ফ্রেম থেকে নেমে এসে বিপ্লবের মঞ্চে বিচরণ করতে থাকে। এ যেন টিন্‌টরেটোর ছবি দেখছি, হগার্থের নক্‌সা দেখছি। কোন একটি বিশেষ এবং বিপরীতধর্ম্মী মতকে অমন দৃঢ়ভাবে পোষণ করার সঙ্গে এমন চরিত্রাঙ্কন অন্য কোথায় সম্ভব হয়েছে কিনা জানিনা। সাহিত্যের দিক থেকে ট্রটস্কীর বই সম্বন্ধে অন্য কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এ ছাড়াও ট্রটস্কীর অন্য ধরণের নিজস্ব রয়েছে। সেটি মতের দিক থেকে। কার্লমার্কস যতদূর পড়েছি তাতে Dual-Power, (বীরবলের দু-ইয়ার্কী বনাম কার্টিসের ডায়ার্কি) স্থায়ীবিপ্লববাদ, কিংবা law of combined development-এর স্থির-সন্ধান পেয়েছি বলে মনে হয় না। অবশ্য আছে, কিন্তু অত স্পষ্ট ভাবে নয়। এও মনে হয় না যে কার্লমার্কস কোন পিছিয়ে পড়া জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। বরঞ্চ তাঁর মতে রুশিয়ার মতন শেষ বেঞ্চের জাতির আমূল পরিবর্ত্তন সবার শেষেই হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল শ্রেণীবিরোধের ফলে ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতেই ধনিসম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথম হার মানবে এবং শ্রমিকের জয় হবে। তা না হয়ে রুশিয়াতে হল। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার ব্যাখ্যা হয়ত কার্ল মার্কসের মতের মধ্যেই ছিল—কিন্তু সাধারণের অজ্ঞাতে। ট্রটস্কীর লেখায় সে ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার অন্তত প্রথম পরিচয়। ব্যাখ্যাটি হল এই—রুশিয়ার মতন কৃষিপ্রধান দেশে মধ্য-সত্বোপভোগী শ্রেণী সবল হয়ে উঠতে পারেনি, সেইজন্য একধারে সহরের অল্পসংখ্যক ধনী ও অন্যধারে শ্রমিকচাষীর মধ্যে অন্য কোন শ্রেণীর অন্তরায় ছিল না, এবং সেইজন্যই বিরোধের স্বরূপ অত শীঘ্র অত উগ্র এবং সমগ্রভাবে ফুটে উঠতে পেরেছিল। মার্কসের মতে যে ধারাটি বহুশতাব্দীতে বিস্তৃত, সে ধারাটি আটমাসেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ ঘটনা ঘটল নানা বাধা সত্বেও, কেননা ফেব্রুয়ারী মাসের বিপ্লবের ফলভোগ করলেন বিপ্লবীর দল নয়, স্যোশিয়াল ডেমোক্রেট মেনসেভিক ক্যাডেটের দল, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। জুলাই মাসে জনসাধারণ বুঝতে পারলে যে Dual Power তাঁদের জন্য নয়, তাঁরা যে ক্ষমতা অর্জ্জন করেছেন সেই ক্ষমতার মুখোস প'রেই ডিমক্রাসীর ধুরন্ধরগণ নিজেদের শ্রেণীর ক্ষমতাবিস্তারে ব্যস্ত। সেই থেকে সোভিয়েটেরা লেনিনের নেতৃত্বে, বিপ্লবের শত্রুদের মুখোস খসাতে লেগে গেল, শক্তি অর্জ্জন করে নিজেদের হাতেই রেখে দিলে। তারা নিতান্তই সাবধানী হল। "দরিদ্রে পাইলে ধন সে কি অন্যের কাছে রাখে?" বিপ্লবের নিয়মই

হল এই, ঘুমোলেই ক্ষমতা চুরী হয়ে যায়, তখন দ্বিগুণ খাটুনী। ট্রটসকীর মতে সার্থক বিপ্লব মানে স্থায়ী বিপ্লব। যে সব জাতি নিতান্ত অসমভাবে অগ্রসর হচ্ছে, যেসব দেশের এক কোণে কলকারখানার প্রাদুর্ভাব, বাকী সর্ব্বত্র আদিম যুগের কৃষি ও পশুপালন, যে সব জাতির এক শ্রেণী অত্যুন্নত, বাকী সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নিতান্ত গরীব তারা সকলে ট্রটস্কীর law of combined developmentএ আশান্বিত হবে। তর্কের খাতিরে একে law না বল্লেও একে বড় ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে দেখতে বাধে না। আর কিছু হোক আর না হোক, এই তথ্যে বিশ্বের বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক নিয়তির দুর্নিবার গতিকে শ্রদ্ধা করা হয়েছে। পুরোপুরি দুর্নিবার নয় অবশ্য, কেননা নিয়তির নিয়মকে জানলেই নিয়তিকে অতিক্রম করা যায়। আজ যদি ট্রটস্কীর হাতে বিপ্লব নিয়তির আকার ধারণ করেও থাকে তা হলেও তাঁর লেখায় বিপ্লবের যে তথ্যগুলি ফুটে উঠেছে তাদের সাহায্যে দেশ কাল ও পাত্রানুযায়ী জনসাধারণের কর্ত্তব্য ও স্বাধীন প্রচেষ্টার ধারা নির্দ্ধারণ করা শক্ত হয় না।

তা হলে এ বইগুলিকে কি বলব—ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, না খবরের কাগজের বাদানুবাদ ? একদল বলছেন—একে ইতিহাস বলাই চলে না, কেননা মতগুলি পক্ষপাতদুষ্ট। খানিকটা সত্য, কেননা উত্তমপুরুষ ব্যবহার না করলেও অনেকস্থলে লেখকের পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে, বিশেষ করে ষ্ট্যালিনের বিষয়ে। কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মেকলের ইতিহাস উচ্চশ্রেণীর ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। তা ছাড়া একটা কথা মনে রাখতে হবে যে রুশ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নায়কের পক্ষপাতদুষ্টবর্ণনাও পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিকের খনি। পরের কোন লেখকই এই বইখানিকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না, ভেতরকার খবর জানতে হলে ট্রটস্কীর বর্ণিত কাহিনীর কাছে হাত পাততেই হবে। একদল ট্রটস্কীর সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামতে আপত্তি তুলেছেন। সে আপত্তির জবাব আছে। ট্রটস্কীর সমাজ-তত্ত্ব পুরাতন সমাজভঙ্গের এবং নূতন সমাজ গঠনের। আমরা সমাজ-তত্ত্ববিষয়ক যে সব গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত সেগুলির বিষয় সমাজরক্ষা। সামাজিক বিপ্লবের বিষয়ে এমন উৎকৃষ্ট বই বোধ হয় আর কখনও লেখা হয়নি।

ট্রটস্কীর দর্শনের সঙ্গেও পুরাতন জড়বাদের পার্থক্য আছে। জনসাধারণকে অমন গভীর ভাবে ভালবাসা, জগতের কল্যাণচিন্তায় অমন গভীর ভাবে নিমগ্ন হওয়া, চিন্তার সঙ্গে কর্ম্মের অমন অঙ্গাঙ্গি মিলন, সুদুর ভবিষ্যতের আশায় অমন সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধপরিকর হওয়া, নিষ্কাম-কর্ম্মের অমন দুর্দ্দম প্রেরণা, সংজ্ঞার অমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ইতিহাসের নিয়মগুলির অমন অদ্ভুত আবিষ্কার, এবং তাদের ওপর চরম বিশ্বাসস্থাপনের পরও সজ্ঞ-পুরুষকারের ওপর অমন প্রগাঢ়শ্রদ্ধা—এ-সব গুণগুলি আদিম জড়বাদের সৃষ্ট নয়, ফরাসী জড়বাদীরও নয়। দর্শনের কৃপায় যদি এই গুণগুলি উৎপন্ন হয় তা সে দর্শনের যা নাম হোক না কেন আমাদের সেটি শ্রদ্ধার্হ। বইখানির সাহিত্যিক গুণের কথা পূর্ব্বেই লিখেছি।

আর খবরের কাগজের বাদানুবাদ ? বার্ণাড শ এবং ওয়েলসের কৃপায় নাটক-নভেলেও জার্ণালিজমের ছোঁয়াচ লেগেছে। এতে ভয় পাবার কথা নেই। শুদ্ধ আর্টের দিন গিয়েছে সমাজকে ত্যাগ করে, সমসাময়িক ইতিহাসকে বর্জ্জন করে বড় সাহিত্য হয় না এবং সমসাময়িক সে ইতিহাস বাদানুবাদে মুখরিত। যে দর্শন জীবন থেকে উদ্ভূত হয়েছে সে দর্শন জীবনে কালান্তরে দলীয় দর্শন হবেই হবে। যে মৃত তার সম্বন্ধেই দুটি মত থাকতে পারেনা, যে বেঁচে আছে তারই সম্বন্ধে ভালভাবে বেঁচে আছে কি মন্দভাবে বেঁচে আছে এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে।

প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠককে তিন ভলুমের এই বইটি পড়তে অনুরোধ করি। লেখার গুণে কাজটা খুব শক্ত হবে না। এ বইটা সেই শ্রেণীর যে শ্রেণীর বই ইতিহাস তৈরী করতে সমর্থ। এই ক্ষুদ্র সমালোচনায় বইটির মহত্ত্ব প্রকাশ করতে পারলাম না। সেজন্য আমি অবশ্য লজ্জিত নই, আমি শুধু অপারগ।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

লহ প্রণাম—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শৈলজানন্দের গল্প ও উপন্যাস সমালোচক ও পাঠক শ্রেণীর নিকট যেমন অবারিত প্রশংসা লাভ করেছে তেম্নি আবার বিরুদ্ধ সমালোচনাও কম অর্জ্জন করেনি। তাঁর এই নূতন উপন্যাসখানি পড়ে তাঁর লেখার প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় রূপ একত্র আমার চোখে তীব্র ভাবে ফুটে উঠেছে। কয়লাখনি, কুলি লাইন ও পল্লীগ্রামের অনেক চিত্র তাঁর লেখনীতে রঞ্জিত হয়েছে এমন বর্ণে এমন ব্যঞ্জনায় যা ইতিপূর্ব্বে আর কারুর লেখনীতে তেমনভাবে হয়ে ওঠেনি। আমার একজন অতি সুরসিক সাহিত্যিক বন্ধু একদিন বলছিলেন যে শৈলজানন্দের লেখা অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে সেই সব লোকালয়ের চিত্রে যেখানে পল্লীগ্রাম সহরের প্রান্তে এসে মিলিত হয়েছে এবং যেখানে পল্লী ও সহরের সভ্যতার, আদর্শের ও জীবনযাত্রার মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হচ্ছে। একথা নিশ্চয়ই ঠিক এবং শৈলজানন্দের লেখা ও চরিত্রগঠন সম্পর্কে আরও অনেক প্রশংসনীয় কথা বলবার আছে কিন্তু তাঁর বিপুল গ্রন্থসম্ভার রচনা করতে গিয়ে অনেকবার তিনি তাঁর স্বকীয় এলাকা ত্যাগ করে এসেছেন। এ সব জায়গায় তাঁর গল্পের রস ও চরিত্রসৃষ্টি প্রায়ই উদ্ভট হয়েছে। লহ প্রণামে তাঁর সুপরিচিত কৃতিত্ব ও এই উদ্ভটরস একত্র বিরাজমান। গল্প হিসাবে না হয় রচনা হিসাবে বইখানিকে এই দুই বিভাগে কর্ত্তিত করা যেতে পারে। গল্পটি সুরু হয়েছে পল্লীগ্রামের একটি সুকুমারহৃদয় বিধবা বালিকাকে নিয়ে। প্রতিবেশী এক কুটিল মন যুবকের প্রেম-অঙ্গীকারে মুগ্ধ হয়ে সে গ্রাম থেকে কলিকাতার এক গণিকালয়ে আনীত হয় ও সেখানে সে তার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ হারিয়ে ও নিরতিশয় লাঞ্ছনা ভোগ করে একদিন আত্মহত্যা করবার জন্য ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু নিয়তির নির্দ্দেশে সে প্রাণ না হারিয়ে হাঁসপাতালে এসে হাজির হয় ও এক দয়ালু বাঙ্গালী নার্সের আপন ঘরে আশ্রয় লাভ করে। এ পর্য্যন্ত যা গল্প তাতে শৈলজানন্দের নির্ব্বোধ নিষ্পীড়িত জনের প্রতি অন্তরঙ্গতা ও দয়াহীন মমত্বহীন উৎপীড়ক সমাজের আবর্জ্জনাময় বিকলাঙ্গের প্রতি নিশ্চপল দৃষ্টির বেশ নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এইখান থেকে গল্পাংশ মোড় ফেরে, লাঞ্ছিতা বালিকার গল্প হয় গৌণ, মুখ্য হয় নার্সের গল্প; সে মেয়েটিকে বিয়ে দেয় তার idiotic ভায়ের সঙ্গে এবং নিজে দুজন অবিবাহিত ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বৈরাচার ক'রে কখনও বা মেয়েটিকে সেখানে টেনে নিয়ে আসে,—ও অবশেষে একদিন ওদেরই একজনকে দিয়ে ঝোঁকের মাথায় অসাধ্যসাধন করিয়ে নিয়ে বিয়ে করে বসে। এ-অংশের সঙ্গে আমরা পল্লীবালিকার গণিকালয়ে নরকবাসের কোন সার্থক সংস্রব খুঁজে পাই নে। হয়ত একটু বা বাহ্য সংস্রব আছে কেননা নার্সটির ভাইয়ের idiotic উৎপীড়নেও এই পল্লীবালিকার অমল হৃদয়ে কষ পড়ে নি। বাস্তবিক বালিকাটির গল্প পাঠকের চোখের একবিন্দু

অশ্রুজল দাবী করে কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে নার্সের কীর্ত্তি লিপিবদ্ধ করবার জন্য এই অমলহৃদয়া বালিকাকে আনবার দরকার ছিল বা বালিকারই পরিণাম দেখাবার জন্য নার্সের কীর্ত্তিকাহিনীর প্রয়োজন হয়েছিল। এ দুটি গল্প সম্পূর্ণ আলাদা—এতই আলাদা যে একটি থেকে আর একটিতে লাফ দিতে গিয়ে মন ও তার রসস্পৃহা খঞ্জ হয়ে পড়ে।

আলোচ্য বইটির আর একটা দিক আছে যেটা আর একটু বিশদ আলোচনার দাবী পেশ করতে পারে। এটি হল বাস্তবতা; বালিকাটির গণিকালয়ে বাস করবার সময় গ্রন্থকার সেখানকার একটা বাস্তব নাতিবৃহৎ চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। এচিত্র একটু রুচিবিরুদ্ধ না হয়ে উপায় নেই কিন্তু চিত্রটি হৃদয়কে আলোড়িত করে। অধিবাসিনীগণ সকলেই প্রায় ক্রীতদাসী, খাওয়া-পরাটুকু পায়, রুটিন মাফিপ সারবেঁধে সেটুকু সারতে হয়, দিনমানে টিনের বাক্স রং করতে হয় ও রাত্রিকালের যা আয় সমস্তটুকু যায় স্বত্তাধিকারিণীর হাতে। এই গভীর পঙ্কের মধ্যে পল্লীবালিকাটিকে নিমজ্জন করবার ছলনার ফলে বালিকার বিশ্বস্ত অনাবিল আত্মসমর্পণ বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। বছর দুই আগে Kuprinএর Yama, The Pit নামে একটি বই প্রকাশিত হয়ে সাহিত্য-জগতের অতি উচ্চপ্রশংসা লাভ করে;—সে বইটিতে ঠিক এমনি একটি রাশিয়ার গণিকালয়ের জীবন্তচিত্র অঙ্কিত করা আছে। Kuprinএর বইখানিকে লহ প্রণামের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য Kuprinএর প্রতি অবিচার করা হয়, Kuprinএর চিত্রাঙ্কন পর্য্যাপ্ত, নিটোল;—লহ প্রণামে যেমন মাত্র পল্লীবালিকাটির চিত্র রক্তমাংসের হয়েছে Yamaতে তেম্নি সমস্ত চরিত্রই রক্তমাংসের, এ ছাড়া Yama গণিকালয়কে কেন্দ্র করে বৃহত্তর সমাজকে ঘিরে ফেলেছে। অনেকে মনে করেন Yama মানব-সমাজের এক নিভৃত জীবনকে লোকের চোখে উন্মুক্ত করে দিয়ে ইউরোপীয় সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য Yama ও লহ প্রণামের বালিকাটির নির্য্যাতন-কাহিনী ও উদ্ধারের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা উঠে লহ প্রণামের চিত্র কি আমাদের ওই নিভৃত জীবনাঙ্কের যবনিকা Yamaর মতন তুলে ধরেছে? সে যা হোক সন্দেহ-নেই,—যে তুলিতে গ্রন্থকার বালিকাটিকে এঁকেছেন তা তাঁর প্রশংসাগৌরব-মাখা নির্য্যাতিতের ছবি আকবার সার্থক তুলি।

কিন্তু এরই সঙ্গে জুড়ে দিয়ে যখন তিনি নার্স ও তার ফ্যাশনেবল পরিমণ্ডলের ছবি আঁকতে বসেছেন তখন তাঁর পরিকল্পিত বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে পঙ্গু, মেরুদণ্ডহীন; নিজের জোরে দাঁড়াবার তার ক্ষমতা নেই, গ্রন্থকারের খামখেয়ালির খেয়ালমত যথাতথা ঠেকো দেওয়া সে জিনিষ। নীললোহিতের বিবৃত্তিকার বলেছেন যে নীললোহিতের গল্প ছিল মিথ্যালোকের সত্যকাহিনী; এ অভিজ্ঞান নীললোহিতের নয় সকল গল্পেরই থাকা চাই কিন্তু লহ প্রণামের নার্সের কাহিনী কল্পলোকের মিথ্যাকথা হয়েছে সত্য হয় নি। লহ প্রণামের নির্য্যাতিতা বালিকার স্বামিসঙ্গের বুভুক্ষাকে গ্রন্থকারের নারীমেধের ত্রিনয়নীর বুভুক্ষার কাছাকাছি স্থান দিতে পারি কিন্তু নার্সটিকে কোনমতেই গ্রহণ করতে পারি না। সার বস্তুর সঙ্গে অসার মিশে যাওয়ায় বইটির অদৃষ্ট সম্বন্ধে আমার দ্বিধা রয়ে গেল।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

বঙ্গের মহিলা কবি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত,
প্রকাশক—পপুলার এজেন্সী, কলিকাতা

আজকালকার বঙ্গসাহিত্যে মহিলাগণের দানেব প্রাচুর্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কথা-সাহিত্যে, কবিতায়, এমন কি প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁহারা সগৌরবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির দ্বারা সেই দান ও স্থান সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীর মত আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে তাঁহার এই কার্য্যটিকে মহৎ বলিতেই হইবে। চণ্ডীদাসের রামী হইতে উমাদেবী পর্য্যন্ত ৩৩টি মহিলা কবির কাব্য-পরিচয় এই বইখানিতে দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ৫টি কবির,—"রামী", "চন্দ্রাবতী", "দ্বিজতনয়া", "আনন্দময়ী", "গঙ্গাদেবীর",—কবিতা সম্বন্ধে জ্ঞান অতি স্বল্প। স্বর্ণকুমারী, প্রসন্নময়ী, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, ও কামিনী রায় প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী লেখিকাদের জন্যই সাধারণ পাঠিকাদের মধ্যে কাব্যপ্রিয়তা প্রসার লাভ করে। তাঁহাদেরই কাব্যাদর্শে বর্ত্তমান মহিলা কবিরা অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে হয়। সে আদর্শটি কি? যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "ইংরাজি আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যের মধ্যে বিশালতা বা বিপুলতা, এক কথায় বিশ্বজনীন ভাব, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানুষমাত্রকেই অনুভব করা—তাহা ছিল না।" অর্থৎ এই বিশ্বজনীনতার রেশ প্রায় প্রত্যেক মহিলা কবির কবিতায় অনুরণিত হইতেছে বলিয়া যোগেন্দ্র বাবুর বিশ্বাস। তাছাড়া একটি বিষাদ ও নিরাশার সুরও যোগেন্দ্র বাবু লক্ষ্য করিয়াছেন। কতখানি বিশ্বজনীনতা থাকিলে কবিতা উচ্চ-শ্রেণীর হয় তা আমি জানি না। কিন্তু আমার মত পাঠিকার নিকট মহিলা কবিদের কাব্যের প্রধান আবেদন হইতেছে এই যে তাঁহারা সঙ্কীর্ণ সমাজের ক্ষুদ্র ও সামান্য ঘটনাগুলিও সহানুভূতিপূর্ণ সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়া প্রাণবন্ত করিয়াছেন। আমরা পুরুষ-সমাজের অপেক্ষা বেশী সীমাবদ্ধ সমাজে বাস করি। আমাদিগকে এই সমাজের শ্রীহীন ক্ষুদ্রতাকে নিজেদের, পুরুষদের এবং সংসারের জন্য সুন্দর করিয়া তুলিতে হয়। সে কৌশল আমাদের প্রকৃতিগত এবং শিক্ষালব্ধ। স্নেহ, মমতা, করুণা ও শিক্ষার সাহায্যে আমরা এই সৌন্দর্য্য বিধানে অগ্রসর হই। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির, শিক্ষার ও সমাজের বাহিরে যে জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে তাহার গোপন আহ্বানকে অবহেলা আমাদের অনেক সময়েই করিতে হয়।

এইজন্যই আমাদের লেখায় একটি বিষাদ ও হতাশার ছায়া পড়ে;—বৈধব্য কিম্বা ব্যর্থপ্রেম-জনিত নিষ্ফলতাই পূর্ব্বোক্ত হতাশার হেতু নয়। যতদিন না সমাজের যথোচিত পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ততদিন নারী-জীবনের সীমাবদ্ধ ভাবও কাটিবে না; ততদিন এই সুরের রেশও পাঠকবর্গের কানে আসিতে থাকিবে।

আজকালকার লেখিকাদের মধ্যে অপরাজিতা ও বিশেষ করিয়া ৺উমাদেবীর কবিতাতে স্ত্রীসুলভ সহজ বুদ্ধি দিয়া সংসারকে বুঝিবার ও আপন চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে—এ কথা রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন। এই প্রমাণের পর যোগেন্দ্র-বাবুর পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য যথর্থ নয় মনে হয়। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে পারি যোগেন্দ্র-বাবুর বইখানি বাঙ্‌লার এই ধরণের সাহিত্যের বিশেষ অভাব পূরণ করিল।

শ্রীছায়াদেবী

মানময়ী গার্লস্ স্কুল—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র (গুরুদাস) বার আনা।
শুভযাত্রা—শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার (রঞ্জন প্রকাশালয়) আট আনা।

রবীন্দ্র মৈত্রের বেনামীতে-লেখা ব্যঙ্গ গল্প, দুঃখী পলকের কাহিনী, প্রথম পড়ার পর তাঁহার সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যতটা আশা ততটা ভয় হইয়াছিল। শক্তিশালী নবীন লেখকের পক্ষে দলাদলির বিষাক্ত পরিমণ্ডলের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর আর কিছু হইতে পারে কিনা সন্দেহ। এ-অবস্থায় স্বদলের হাততালি ও পিঠ চাপড়ানোর মোহের সহিত আসিয়া যুক্ত হয় প্রতিপক্ষকে খর্ব্ব করিবার অধীর আগ্রহ, অধিকাংশস্থলে লোপ পায় ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান, হিতাহিতবিচার। ফলে লেখককে পাইয়া বসে একচোখোমি,—সত্যসাহিত্য-সৃষ্টির পথে যে ত্রুটিকে বলা যাইতে পারে বৃহত্তম অন্তরায়। রবীন্দ্র মৈত্রের শক্তির পরিচয় এইখানেই যে ব্যঙ্গরচনাতেও তাঁহার দুই চোখ খোলা থাকিত—অন্ততঃ যে-সব বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষের প্রশ্ন না উঠে। তাঁহার এক চোখে ফুটিত দরদ, অন্য চোখে শাসন। কাজেই তাঁহার ব্যঙ্গ হইয়া উঠিত রঙ্গের অনুরূপ—অর্থাৎ যাঁহাকে তিনি ব্যঙ্গ করিতেছেন তিনি যেন তাঁহারই দলের, শুধু মজা করিবার জন্য কয়েকটি বিশেষত্বকে একটু অতিরঞ্জিত করিতেছেন মাত্র। এই অতিরঞ্জনের যোগে একদিকে প্রকাশ পাইত তাঁহার শ্যেনদৃষ্টি সমালোচন, অন্যদিকে বহিয়া চলিত হাস্যরসের স্রোত। কারণ—অতিরঞ্জন, হাস্যরসের প্রাণ। যাহা নিত্য দেখা যায়, চোখ তাহার মধ্যে হাসিবার মতো কিছু খুঁজিয়া পায় না। তাই শিশু পড়িয়া গেলে হাসি আসে না, প্রাপ্তবয়স্কের বেলায় আসে। তাই একদেশের আচারব্যবহার ভিন্নদেশীর নিকট হাস্যকর; মঙ্গলগ্রহে 'মানুষ' থাকিলে তাহার নিকট পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতিটাই অদ্ভুত। কোনোখানে একটু বাড়াবাড়ি, নিয়মের একটু ব্যভিচার না ঘটিলে হাসা যায় না। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে, অতিরঞ্জনের হাস্যোদ্রেক করিবার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সাধারণকে যেকোন রকমে যেকোন দিকে বাড়াইয়া দিলেই হাস্যকর হয় না, ভীতিপ্রদও হইতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে পা পিছলাইয়া আছাড় খাইতে দেখিলে হাসি আসে বটে, কিন্তু যদি দেখা যায় ফলে ঘটিতেছে অঙ্গহীনতা বা অপঘাত, তখন হাসির বদলে কান্না আসার সম্ভাবনাই অধিক। হাস্যরসিককে তাই সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হয় কখন অতিরঞ্জন নিজের যথার্থ সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া বিরক্তিকর কুরূপে পরিণত হয়—কাঁচা লেখকের হাতে পড়িয়া যে দুর্দ্দশা অতিরঞ্জনের প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আর এই সুষ্ঠু সীমাজ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া রবীন্দ্র মৈত্র বাংলা হাস্য-সাহিত্যে চিরস্থায়ী পূজা পাইবার অধিকারী।

"মানময়ী গার্লস স্কুল" রবীন্দ্র মৈত্রের একটিমাত্র প্রকাশিত নাটক, আর এইটিতে তাঁহার সৃজনী-প্রতিভা নিষ্কলঙ্ক পূর্ণতায় পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। হাস্যরসপ্রধান নাটক লিখিতে যে মালমশলার প্রয়োজন, সে বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল পাকা রন্ধনীর মতো। তিনি জানিতেন, ফলষ্টাফ বা তারত্যুফএর মতো বিশাল চরিত্র সৃষ্টি করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই তাঁহার আদর্শ ছিল ইংলণ্ডের রেষ্টোরেশন্ যুগের পরিহাস-রসিক নাট্যকারগণ, বিশেষ করিয়া কন্‌গ্রীভ। হাস্যোদ্রেকী প্রয়োগশিল্প তিনি তাহাদের নিকট শেখেন, অবশ্য তাহাদের নৈতিক উন্মার্গগামিতা সযত্নে পরিহার করিয়া; রবীন্দ্র মৈত্রের পরিহাস-প্রাচুর্য্যে পঙ্কিলতার আভাস মাত্র নাই। এই নাট্যকলার কেন্দ্রীয় সূত্র—ঘটনাসংস্থান।

এমন একটি যোগাযোগ নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাহা সচরাচর না ঘটিলেও অতি-বিরল নয়; আর হাস্যোৎপাদন করিতে হইবে তাহাদের অভাবিত অথচ অন্-অস্বাভাবিক পরিণতিগুলির ক্রমিক উদ্‌ঘাটনে। সু-অভিনয়ের কল্যাণে আজ "মানময়ী"র যশ বাংলাদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই তাহার সংক্ষিপ্তসার দিয়া প্রমাণ করা নিষ্প্রয়োজন কিরূপ স্বচ্ছন্দ দক্ষতার সহিত রবীন্দ্র মৈত্র এই কেন্দ্রীয় সূত্রকে প্রয়োগ করিয়া সার্থকতার দিব্য প্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

নাটকে হাস্যসৃষ্টির আর এক উপায়, রসাল কথোপকথন। অনেক নাটকে এই বাক্যালাপের ছটা ঘটনাসংস্থানকে গৌণ করিয়া তোলে। তখন ইহাকে নির্দোষ গুণ বলা চলে কিনা সন্দেহ। "মানময়ী'র চরিত্রগুলি কাঠের পুতুল নয়, তাহারা কথা কয় জীবন্ত নরনারীর মতো. প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চলনভঙ্গী আছে। তাহারা কথা কয়, যে অবস্থায় যতটুকু না কহিলে নয় ততটুকু; নাট্যকারের মুখোস হইয়া তাঁহার পরিহাস-চাতুর্য্যের প্রকাশের সুযোগ দিবার জন্য নয়। এই দুর্লভ ক্ষমতা সর্ব্বদাই অভিবাদন-যোগ্য; এবং ইহা সম্ভব হয়, নাট্যকারের সর্ব্বব্যাপী অনুকম্পার ফলে। নাটকটি পাঠে বোঝা যায় গ্রন্থকারের মন অত্যন্ত আধুনিক। তাঁহার নায়ক মানস-মোহনের চরিত্রে বাংলার যুবকমনের একটি উজ্জ্বল দিকপ্রকাশ পাইয়াছে। লেখাপড়ায় সে মহাপণ্ডিত নহে, কিন্তু তাহার উপস্থিত বুদ্ধি প্রশংসনীয়। বিপদে পড়িলে ভড়কাইয়া না গিয়া উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে তৎপর। আর নারী সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সবল পুরুষোচিত ভদ্র। সে ভালোবাসিতে জানে, ভালবাসা পাইতেও চাহে, প্রেমের ক্ষেত্রে সে ধর্ম্ম-জাতিগোত্রের গুরুত্ব মানে না। অথচ অবস্থাচক্রে একটি অপরিচিতা তরুণীকে মাসাবধি স্ত্রী পরিচয়ে চালাইতে হইলেও তাহার মন ভাববিলাসিতায় উচ্ছল হইয়া আত্মমর্য্যাদা ও নারীমর্য্যাদার সীমা লঙ্ঘন করে না। তাঁহার সৃষ্ট সকল চরিত্রগুলিকেই যে তিনি জীবনে এইরূপ পছন্দ করিতেন তাহা নহে, তাহাদের দোষগুণ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ; অথচ শিল্পসৃষ্টির জন্য যে পক্ষপাতহীন সমবেদনা আবশ্যক, তাহা তিনি সকলকেই সমভাবে পরিবেশন করিয়া দিয়াছেন—বোধ হয় এক মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ ছাড়া। নাটকে দুষ্ট চরিত্রের অবতারণা দূষণীয় নয়। কিন্তু এইরূপ চরিত্রের প্রতি লেখকের মানুষ হিসাবে যতই বিরাগ থাকুক নাট্যকার হিসাবে বিরূপ হইলে চলিবে না। তাই, শাইলক্-এর প্রতি শেষপর্য্যন্ত পাঠকের করুণার উদ্রেক হয়, ইয়াগোর অমানুষিক শক্তির প্রভাবে বিস্ময়ে মাথা নত হইয়া আসে। ফার্ণাণ্ডেজ আমাদের মনে নিছক ছোটো-লোকোমির ছাপ রাখিয়া যায়। এই ত্রুটি ক্ষমা করা যায় এই ভাবিয়া যে চরিত্র-চিত্রণ রবীন্দ্র মৈত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। আর নাটিকাখানির অজস্র গুণরাশির ভিতর হইতে এই ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করার আর কোনই অজুহাত নাই—সমালোচকের অপ্রত্যাখ্যানীয় অপ্রিয় কর্ত্তব্যসাধন ছাড়া।

'শুভযাত্রা', শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদারের প্রথম প্রকাশিত রচনা, অথচ, আধ ঘণ্টায় পড়িয়া ফেলা যায়। এই নাটিকাখানিতে প্রবোধ বাবু বাংলাদেশের সমগ্র পাঠকচিত্ত জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই লোকপ্রিয়তার পিছনে কোনো কারসাজী, ব্যবসাদারী বুদ্ধি বা সাময়িক উত্তেজনার সংস্রব নাই, ইহা তাঁহার সার্থক রূপসৃষ্টির প্রকাশ্য পুরস্কার। গ্রন্থকার আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যকলাপদ্ধতির সহিত সুপরিচিত, ও সেই শিল্পকৌশলের উপর তিনি যে কিরূপ অনায়াস-প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছেন,

তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এই সুগঠিত দৃশ্যবিভাগহীন একাঙ্ক নাটিকাটি। সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে কলিকাতার এক মধ্যবিত্তগৃহস্থের দোতালার বেশ প্রকাণ্ড একটি কক্ষে; আর সময়, বিকাল পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। এইটুকু পরিসরের মধ্যে নাট্যকার আঁটাইয়াছেন বাঙালী পরিবারের একটি অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী, ঠিক যেমন করিয়া প্রকৃতিদেবী ফুলফলবীজের ভিতর আপন আয়োজন সম্ভার অব্যর্থ নিপুণতায় ঠাসিয়া দেন। বাহুল্যের এই নির্ম্মম বর্জ্জনে কাহিনীটির রস হইয়া উঠিয়াছে ভাবঘন, রূপনার অবিরত তাপে যাহা কিছু তরল সমস্ত উড়িয়া গিয়াছে। "শুভযাত্রা"য় এই রূপনার, মূর্ত্তিগড়নের ক্ষমতার পরিচয় দিয়া প্রবোধকুমার পাঠকবর্গকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। একাঙ্ক নাটকে চরিত্রের ক্রমিক বিকাশ সম্ভব নয়, প্রবোধকুমারেরও তাহা অভীপ্সিত নয়। তিনি দেখাইয়াছেন, একটি বিশেষ ঘটনা বিভিন্নধর্ম্মীর মনে কিরূপ স্বপ্রকৃতি-অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, আর এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে জীবনে কেমন অলঙ্ঘ্যভাবে মর্ম্মন্তুদ ট্র্যাজেডির আবির্ভাব হয়। কারণ, ট্র্যাজেডির মূলসূত্র, হেগেল বলিয়াছেন, সত্যের সহিত সত্যের, ন্যায়ের সহিত ন্যায়ের সংঘাত, অসত্য বা অন্যায়ের সহিত নহে; Tragedy is the conflict of right with right, not right with wrong. সুদূর মধ্যযুগের সুবিখ্যাত লেখক বইথিয়ুস জীবনে দার্শনিক সান্ত্বনার প্রয়োজনীয়তা কোথায়, আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, এই প্রয়োজন আছে; কেননা সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় চরম ট্র্যাজেডির জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যবহারকে দোষ দেওয়া বলে না, যেহেতু জীবনে আছে

> This discord in the pact of things,
> This endless war 'twixt truth and truth.

'শুভযাত্রা'য় দেখা যায় ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ উদার দার্শনিক দৃষ্টি নাট্যকারের আছে। কলেজের অধ্যাপক সুধাংশুর বয়স বছর ত্রিশ। তাহার ছিল সুখের জীবন; উন্নত-চরিত্রা মাতা, প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহশীলা ভগিনী ও স্বচ্ছল সংসার। হঠাৎ একটী পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে গিয়া মৃণালিনীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল, দুই মাসের শিশুর মৃত্যুর সহিত তাহা পরিণত হইল ঘোর উন্মত্ততায়। দুই বৎসর ধরিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসার পর ডাক্তারেরা একবাক্যে রায় দিলেন, এ-ব্যাধি এ জীবনে সারিবার নয়। যদি বা মাঝে মাঝে অল্প কালের জন্য জ্ঞান ফিরিয়া আসে, তাহার উপর নির্ভর করা চলিবে না। অবশেষে সুধাংশু পুনর্ব্বার বিবাহে রাজী হইল, কতকটা তাহার মাতার মুখ চাহিয়া, আর কতকটা নমিতাকে তাহার ভালো লাগে বলিয়া। সুধাংশু শুভযাত্রায় বাহির হইতে যাইবে এমন সময় মৃণালিনী চৈতন্য ফিরিয়া পাইল ও বন্ধঘরের শিকলটি ভিতর হইতে খুলিয়া আসিয়া ঢুকিল তাহার নিজের ঘরে যেখানে সুধাংশু সজ্জিত হইতেছিল। মৃণালিনী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ, কোনদিন যে সে পাগল হইয়াছিল, এ বোধ পর্য্যন্ত তখন তাহার নাই। এখন কি করা কর্ত্তব্য, এই সমস্যার গুরুভার সকলকে পীড়িত করিয়া তুলিল। সুধাংশুর সহিত মৃণালিনীর ব্যবহার সন্দেহলেশহীন, পূর্ব্ববৎ সাদর। এই সাদর ব্যবহারে, নিয়তির এই অকরুণ পরিহাসে হাসি আসে, শক্তিমান নাট্যকার অত্যন্ত কৌশলের সহিত এ হাস্য ফুটাইয়াছেন, কারণ এ হাসি বাহ্যতঃ স্নিগ্ধ হইলেও কার্য্যতঃ প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতো জ্বালাকর। এমন সময় বহুদিনের পরিচর্য্যাপরায়ণা বামা ঝির অতি স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বসিত কাংস্যকণ্ঠ মৃণালিনীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল, যাহার ফলে

মৃণালিনীর ভাই উপেন্দ্র, যে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল, তাহার নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতে বাধ্য হইল। সমস্যা হইয়া উঠিল আরো গুরুতর। পারিবারিক বন্ধু প্রবীণ চিকিৎসক কিন্তু পূর্ব্বমতই বাহাল রাখিলেন, উপরন্তু জানাইলেন, মৃণালিনী সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিলেও তাহার সুধাংশুর নিকট থাকা উচিত নহে, যেহেতু তাহার সন্তানের ঐ ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার ষোলআনা সম্ভাবনা। উপেন্দ্রের পরামর্শে মৃণালিনী চলিয়া যাইতে রাজী হইল। লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, মৃণালিনীর ট্রেণের সময়ের পূর্ব্বেই সুধাংশুকে চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া বর সাজিয়া বিবাহ-বাসরাভিমুখে যাইতে হইবে। মৃণালিনীও যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে প্রণাম করিতে আসিল, আর যবনিকা পতন হয় মৃণালিনীর শেষ প্রশ্নের স্বর নীরব হইবার পূর্ব্বেই—"ওগো সত্যিই কি আমার আর কোন আশা নেই ?"

সংক্ষিপ্তসার দিয়া প্রবোধকুমারের নাট্যরচনার কৃতিত্ব পূর্ণ প্রকটিত করা অসম্ভব। একটু একটু করিয়া টিপিয়া টিপিয়া অথচ অনাবশ্যক ঘোরাঘুরি না করিয়া পাঠকের মনকে গল্পের দিকে টানিয়া লইবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রবোধকুমার দেখাইয়াছেন। আর দেখাইয়াছেন নাটকে করুণ দৃশ্য ফুটাইতে হইলে নাট্যকারকে কিরূপ নিষ্করুণ হইতে হয়। তাঁহার প্রত্যেকটি চরিত্র স্বধর্ম্মের অখণ্ড প্রকাশে ভাস্বর। ঘটনা-গ্রন্থনেও মালতী ও উপেন্দ্রের ব্যবহারে যে দুএকটি ত্রুটি আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহা লইয়া মতভেদ সম্ভব ও তাহারা এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যই নহে। এ সত্ত্বেও প্রবোধকুমারের নাট্যকার-বৃত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ দেখার পূর্ব্বে। 'শুভযাত্রা'র প্রধান আকর্ষণ তাহার চরিত্র চিত্রণে ততটা নয়, যতটা সুনিপুণ বিষয় নির্ব্বাচন। প্রবোধকুমারের আখ্যানবস্তুটি অস্বাভাবিক নহিলেও অতি-বিরল। তাহাতে বোঝা যায়, ট্র্যাজেডির রহস্যকে তিনি এখনও পাশ হইতে আক্রমণ করিতেছেন, মুখোমুখি নহে। তাঁহার দৃষ্টি-ক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ। জগতের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলিতে অতি-বিরল ঘটনার অবতারণা হয় নাই, এমন নহে; কিন্তু তাহারা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ঘটনা-সংস্থানের উপর নির্ভর করিয়া নয়, বিরাট চরিত্রসৃষ্টির বিপুল কবিত্বশক্তির প্রসাদে।

বাংলাসাহিত্যে গীতিকবিতার উৎকর্ষ যেরূপ প্রখর, নাটকের অপকর্ষ তেমনই নিষ্প্রভ। মনে হয় নাকি একের উৎকর্ষই অপরের অপকর্ষের অন্যতম কারণ? কারণ, গীতিকবিতায় যেগুণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, অনেক সময়ে তাহা নাটকীয় সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী। বাঙালী চরিত্রে গীতিকবিতাসুলভ স্বশীল আবেগের প্রাচুর্য্য সকলেরই চোখে পড়ে; নাই আমাদের সেই স্বানুরাগহীন নির্ম্মায়িকতা যাহা শ্রেষ্ঠ নাটকের ঐশ্বর্য্য। রবীন্দ্র মৈত্র ও প্রবোধকুমারের রচনায় এই নির্ম্মায়িকতার দর্শন মেলে রবীন্দ্র মৈত্রের লেখনী অকালে থামিয়া গেল। প্রবোধকুমারের উপর এখন বাংলা নাট্যসাহিত্যের দাবী অনেক। শুধু এইটুকু প্রার্থনা, 'জার্ণিজ্ এণ্ড'-এর পর "ব্যাজার্স গ্রীণ" পড়িবার দুর্ভাগ্য হইতে বাঙালী পাঠক যেন অব্যাহতি পায়।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, ১৩৯-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রামকুমার মেশিন প্রেস, ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪০

পরিচয়

নয় মাত্রার ছন্দ

গত ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা'য় নয় মাত্রার ছন্দ-সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম। বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাংলায় চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার পর্ব্ব লইয়া ছন্দোবন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা হইতে পারে কিনা—সে বিষয়ে পথনির্দ্দেশ করিবার জন্য ছন্দশিল্পীদের আহ্বান করিয়াছিলাম। এতৎসম্পর্কে মাত্র দুইটি লেখা তাহার পরে পড়িয়াছি। একটির লেখক—শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক। অপরটির লেখক—কার্ত্তিক ১৩৩৯ সংখ্যার 'পরিচয়ে' কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশিত উদাহরণের আলোচনা পরে করিব, প্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তগুলির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের মত—বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত লেখা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং কয়েকটি নূতন দৃষ্টান্তও রচনা করিয়াছেন। বাংলা ছন্দে কি চলে আর না চলে এ সম্বন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় ছন্দশিল্পীর মতই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হইল তিনি ঠিক আমার প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই। নয় মাত্রার **চরণ** লইয়া যে ছন্দোবন্ধ হয়, তিনি তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু নয় মাত্রার **পর্ব্ব** লইয়া ছন্দোবন্ধ হয় কিনা তাহা বুঝাইবার বা

দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি যে পর্ব্বের কথা চিন্তা না করিয়া, চরণের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাহা ঐ প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝা যায়। তিনি নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর, এগার, তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে "বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরী করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।" এগার হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছেন তাহাতে যে চরণের মোট মাত্রা সংখ্যা লইয়াই গণনা করা হইয়াছে, চরণের উপকরণ পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা লইয়া গণনা করা হয় নাই তাহা ত সুস্পষ্ট। একটু বিশ্লেষণ করা যাক্।

এগার মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্তগুলির ছন্দোলিপি করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

১।	চামেলির : ঘন-ছায়া- | বিতানে	=(৪+৪)+৩
	বনবীণা : বেজে ওঠে | কী তানে।	=(৪+৪)+৩
	স্বপনে : মগন : সেথা | মালিনী	=(৩+৩+২)+৩
	কুসুম- : মালায় : গাঁথা | শিথানে॥	=(৩+৩+২)+৩

এখানে ছন্দের উপকরণ আট মাত্রার পর্ব্ব। প্রতি চরণে একটি আট মাত্রার পর্ব্ব ও পরে একটি তিন মাত্রার অপূর্ণ (catalectic) পর্ব্ব আছে। হয়ত কেহ অন্যভাবেও ইহার ছন্দোলিপি করিতে পারেন—

চামেলির : ঘন- | ছায়া- : বিতানে	=(৪+২)+(২+৩)
বন বীণা : বেজে | ওঠে : কী তানে।	=(৪+২)+(২+৩)
স্বপনে : মগন | সেথা : মালিনী	=(৩+৩)+(২+৩)
কুসুম : মালায় | গাঁথা : শিথানে॥	=(৩+৩)+(২+৩)

এ রকম ছন্দোলিপি করিলে মূল পর্ব্বটি হয় ছয় মাত্রার, এবং চরণটি একটি ছয় মাত্রার পূর্ণ ও একটি পাঁচ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব্বের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।

এ রকমের ছন্দোবন্ধ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বেও করিয়াছেন। যেমন—

—তাহারে শুধানু হেসে | যেমনি	=(৩+৩+২)+৩
—নতমুখে চলি গেলা | তরুণী	=(৪+৪)+৩
—এ ঘাটে বাঁধিব মোর | তরণী	=(৩+৩+২)+৩

এ রকম প্রত্যেক চরণের সঙ্কেত ৮+৩।

৬+৫ সঙ্কেতের উদাহরণও পাওয়া যায়—

—শিলা রাশি রাশি | পড়িছে খসে　　=(২+৪)+(৩+২)
—গরজি উঠিছে | দারুণ রোষে　　=(৩+৩)+(৩+২)

প্রাচীন কবিদের একাবলী আসলে এই সঙ্কেতের ছন্দ।

২। মিলন-স্থলগনে | কেন বল্　　=(৩+৪)+৪
নয়ন করে তোর | ছল্ ছল্!　　=(৩+৪)+৪
বিদায়-দিনে যবে | ফাটে বুক,　　=(৩+৪)+৪
সে দিনো দেখেছি তো | হাসিমুখ॥　　=(৩+৪)+৪

এখানে মূল পর্ব্ব সাত মাত্রার। এ সঙ্কেতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের আগেকার কাব্যেও পাওয়া যায়—

তাহাতে এ জগতে | ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি | মনোভার?
দু' কথা বলি যদি | কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে | কী বা কার?

তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্য হইতেই দিয়াছেন—

(৩) গগনে গরজে মেঘ, | ঘন বরষা　　=৮+৫
কূলে একা বসে আছি, | নাহি ভরসা　　=৮+৫

আরও দেওয়া যায়, যেমন—

রঙীন খেলেনা দিলে | ও রাঙা হাতে　　=৮+৫
তখন বুঝিরে, বাছা, | কেন যে প্রাতে　　=৮+৫

এই দুই উদাহরণেই মূল পর্ব্ব আট মাত্রার।

পনের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

(৪) হে বীর জীবন দিয়ে | মরণেরে জিনিলে　　=(৩+৩+২)+(৪+৩)
নিজেরে নিঃস্ব করি | বিশ্বেরে কিনিলে　　=(৩+৩+২)+(৪+৩)

এখানে মূল পর্ব্ব আট মাত্রার। পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্যেও এ রকম পাওয়া যায়, যেমন—

দিন শেষ হয়ে এল | আঁধারিল ধরণী=৮+৭

সতের মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ দিয়াছেন সেখানে মুদ্রিত দুইটি পংক্তি যোগ করিয়া তবে সতেরটি মাত্রা পাওয়া যায়। সুতরাং সেখানে যে সতের মাত্রার পর্ব্ব নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

(৫) ভরা নদী, দুই কূলে কূলে
কাশবন দুলিছে।
পূর্ণিমা তারি ফুলে ফুলে
আপনারে ভুলিছে।

এখানে পংক্তিগুলিতে যথাক্রমে ১০, ৭, ১০, ৭ মাত্রা করিয়া আছে। এক একটি পংক্তির শেষে যে সুস্পষ্ট যতি আছে তাহা লিখিবার ভঙ্গী হইতেই ধরা পড়ে। প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধযতি কি পূর্ণযতি তাহা লইয়া কিছু মতভেদ হইতে পারে। যদি তাহাকে অর্দ্ধযতি বলিয়াও ধরা যায় তাহা হইলেও সেখানে একটি পর্ব্বের শেষ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব্ব এখানে পাওয়া যায় না। আমার নিজের মনে হয় যে এখানে দশ মাত্রার পর্ব্বও নাই, দশ মাত্রার পর্ব্ব থাকিলে কাব্যের যে গাম্ভীর্য্য থাকে তাহার নিতান্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি আছে বলিয়া মনে হয়, সুতরাং এক একটি পংক্তিকেই আমি এক একটি চরণ বলিয়া ধরিতে চাই। প্রতি চরণে দুই পর্ব্ব, এবং মূল পর্ব্ব প্রথম ও তৃতীয় চরণে ছয় মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে চার মাত্রার। মূল পর্ব্ব সর্ব্বত্রই ছয় মাত্রার অথবা সর্ব্বত্রই চার মাত্রার এইরূপ ধরিয়া পাঠ ও ছন্দোলিপি করাও চলিতে পারে।

উনিশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ দিয়াছেন সেখানেও দুইটি পংক্তি যোগ না করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যায় না। অথচ এক একটি পংক্তি আসলে এক একটি চরণ; পর্ব্ব নহে, পর্ব্বাঙ্গ ত নহেই।

(৬) ঘন মেঘভার | গগন তলে =৬+৫
বনে বনে ছায়া | তারি, =৬+২
একাকিনী বসি | নয়ন-জলে =৬+৫
কোন্ বিরহিনী | নারী। =৬+২

এখানে ছয় মাত্রার পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া ছন্দ রচনা করা হইয়াছে। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, প্রথমটি পূর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূর্ণ পর্ব্বটি পাঁচ মাত্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে দুই মাত্রার।

একুশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ দিয়াছেন, সেখানেও ঐ ঐ মন্তব্য খাটে। দুইটি পংক্তি বা দুইটি চরণ যোগ না করিলে একুশ মাত্রা পাওয়া যায় না, ছন্দের মূল উপকরণ যে পর্ব্ব তাহাতে মাত্র ছয়টি করিয়া মাত্রা পাওয়া যাইতেছে।

(৭)　বিচলিত কেন | মাধবী শাখা　=৬+৫
　　মঞ্জরী কাঁপে | থর থর,　=৬+৪
　কোন্ কথা তার | পাতায় ঢাকা　=৬+৫
　　চুপি চুপি করে | মরমর　=৬+৪

ঐ দৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণ হইতে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ পর্ব্বের মাত্রার কথা ঐ প্রবন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি চরণের মাত্রা, কখন কখন চরণের অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ শ্লোকার্দ্ধের মাত্রার সংখ্যার হিসাব করিয়াছেন। কাজেই নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন তাহাতেও যে নয় মাত্রার চরণই পাওয়া যায়, নয় মাত্রার পর্ব্ব পাওয়া যায় না, তাহা বিচিত্র নহে। দশ মাত্রার পর্ব্বই বোধ হয় বাংলা ছন্দের বৃহত্তম পর্ব্ব, এতদপেক্ষা বৃহত্তর পর্ব্বের ভার সহ্য করা বাঙালীর ছন্দে বোধহয় সম্ভব নহে। সতের, ঊনিশ, একুশ ইত্যাদি মাত্রা সংখ্যা লইয়া বাংলা ছন্দের পর্ব্ব গঠন করা অসম্ভব।

পর্ব্ব লইয়া এত আলোচনা করিতেছি কারণ পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ। পর্ব্বের সহিত পর্ব্ব গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়; পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যায়; মিতাক্ষর ছন্দে পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা পরিমিত বলিয়াই তাহা মিতাক্ষর। পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখিয়া নানাভাবে চরণ ও স্তবক গঠন করিলেও ছন্দের ঐক্য বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের মাত্রা বা স্তবক গঠনের রীতি দ্বারা ছন্দের ঐক্য বজায়-রাখা যাইবে না। দু' একটি উদাহরণের দ্বারা আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করিতেছি।

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি—

এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা।

সকাল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়—

এই চরণটিতেও মোট সতের মাত্রা। কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা সমান বলিয়া তাহাদের সতের মাত্রার ছন্দ নাম দিয়া এক গোত্রে ফেলা কি সম্ভব হইবে? এই দুইটি চরণ কি কখন একই স্তবকে গ্রথিত হইতে পারে? ইহার উত্তর—না। কারণ, এই দুইটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন। এই পার্থক্যের স্বরূপ বোঝা যায় চরণের উপকরণ স্থানীয় পর্ব্বের মাত্রা হইতে। প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি। =(৬+৬+৫)

দ্বিতীয় চরণটি মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

সকাল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়=(৫+৫+৫+২)

ছয় মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পর্ব্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্যের জন্যই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। কাজেই ছন্দের পরিচয় দিতে গেলে বা তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যার অনুযায়ী করাই সঙ্গত, চরণের মাত্রাসংখ্যার অনুসারে করিলে কোন লাভ নাই।

আর একটি উদাহরণ দিই।

হেরিনু রাতে, উতল [illegible]
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে,
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে॥

উদ্ধৃত স্তবকের ভিন্ন ভিন্ন চরণে যথাক্রমে ১২, ৭, ১৭, ১২, ১৭, ৭, ১৭, ১২, ১২ মাত্রা আছে। এক একটি চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা হইতে

অথবা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার চরণ-সন্নিবেশের রীতি হইতে এখানে স্তবকের ঐক্য-সূত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু বরাবর পাঁচ মাত্রার মূলপর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ছন্দের ঐক্য বজায় আছে। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা হইতে, চরণের মাত্রাসংখ্যা হইতে নহে।

এই উপলক্ষে পর্ব্ব সম্বন্ধে দু' একটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই। প্রত্যেক পর্ব্বের পরে একটি অর্দ্ধযতি থাকে, অর্থাৎ সেই সময়ে জিহ্বার একবারের ঝোঁক শেষ হয় এবং পুনশ্চ শক্তি সংগ্রহের জন্য অতি সামান্য ক্ষণের জন্য জিহ্বার ক্রিয়া বিরত থাকে। জিহ্বার এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম পর্ব্ব।

এক একটি পর্ব্ব দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। অন্ততঃ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ না থাকিলে পর্ব্বের মধ্যে ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। তিনটির বেশী পর্ব্বাঙ্গ দিয়াও পর্ব্ব গঠিত হয় না, করিতে গেলে তাহা বাংলা ছন্দের গতির ব্যভিচারী হইবে। এক একটি পর্ব্বাঙ্গে এক হইতে চার পর্য্যন্ত মাত্রা থাকিতে পারে। এক একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ একটি গোটা মূল শব্দ অথবা একাধিক গোটা মূল শব্দের সহিত সমান। পর্ব্বাঙ্গ স্বর-গাম্ভীর্য্যের উত্থান পতনের এক একটি তরঙ্গের অনুসরণ করে।

পর্ব্ব ও চরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ চরণ মাত্রেই একাধিক পর্ব্বের সমষ্টি। পর্ব্বের পর অর্দ্ধযতি আর চরণের পর পূর্ণযতি থাকে।

এইবার নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত বলিয়া কবিগুরু যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন সেইগুলির বিশ্লেষণ করা যাক্।

(ক) আঁধার রজনী পোহাল,
      জগৎ পূরিল পুলকে,
  বিমল প্রভাত কিরণে
      মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে নয় মাত্রা আছে। কিন্তু এক একটি পংক্তি কি এক একটি পর্ব্ব না চরণ? পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধযতি

না পূর্ণযতি ? জিহ্বার ঝোঁক কি পংক্তির শেষে আসিয়া শেষ হইতেছে, না পূর্ব্বেই কোন স্থলে শেষ হইয়া আবার নূতন ঝোঁকের আরম্ভ হইতেছে ? ইহার ছন্দোলিপি কিরূপ হইবে—

আঁধার : রজনী : পোহাল।
জগৎ : পূরিল : পুলকে |
বিমল : প্রভাত : কিরণে |
মিলিল : দ্যুলোক : ভূলোকে |

এইরূপ, না

আঁধার : রজনী | পোহাল,	=(৩+৩)+৩
জগৎ : পূরিল | পুলকে,	=(৩+৩)+৩
বিমল : প্রভাত | কিরণে	=(৩+৩)+৩
মিলিল : দ্যুলোক | ভূলোকে,	=(৩+৩)+৩

এইরূপ ?

আমার মনে হয় উদ্ধৃত শ্লোকটিতে ছয় মাত্রার পর্ব্বই মূলপর্ব্ব, এবং দ্বিতীয় প্রকারে ছন্দোলিপি করাই স্বাভাবিক। কয়েকটি যুক্তি ও এ সম্পর্কে উত্থাপন করিতেছি।

"আঁধার" ও "রজনী" এই দুটি শব্দের উচ্চারণকালে তন্মধ্যে ধ্বনির যে প্রবাহ, "রজনী"র পর "পোহাল" উচ্চারণ করিতে গেলে তন্মধ্যেও কি ধ্বনির সেই প্রবাহ ? "আঁধার" ও "রজনী"র মধ্যে যতি নাই, কিন্তু "রজনী"র পরে কি একটি হ্রস্ব যতি বা অর্দ্ধ যতি আসে না ? যদি আসে তবে ঐ খানেই পর্ব্বের শেষ ও নূতন একটি পর্ব্বের আরম্ভ।

"পোহাল" শব্দটির পর একটি কমা আছে এবং ঐখানেই একটি বাক্যের শেষ হইয়াছে। সুতরাং ঐখানে একটি পূর্ণযতি আসাই কি একান্ত স্বাভাবিক নহে ? যদি ঐখানে পূর্ণযতি আসে, তবে ঐখানে একটি চরণের শেষ হইয়াছে। জটিল স্তবকের মধ্যে যেখানে elliptical বা অপূর্ণ চরণের ব্যবহার হয় সেখানে ভিন্ন অন্যত্র একটিমাত্র পর্ব্বে চরণ গঠিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে হ্রস্ব যতি বা অর্দ্ধযতি মোটে আসিল না, একেবারেই পূর্ণযতি আসিয়া পড়িল—এই ভাবে উচ্চারণ হয় না। সুতরাং, "পোহাল" শব্দের পর যদি পূর্ণ যতি থাকে তবে তাহার পূর্ব্বে কোথাও হ্রস্ব যতি নিশ্চয়ই আছে এবং সেইখানে পর্ব্বের শেষ হইয়াছে।

পরে দুইটি উদাহরণ সম্বন্ধেও একথা খাটে। সে দুটিও ছয় মাত্রার পর্ব্বে রচিত।

(খ) গোড়াতেই : ঢাক | বাজনা =(৪+২)+৩
কাজ করা : তার | কাজ না =(৪+২)+৩

(গ) শকতি : হীনের | দাপনি =(৩+৩)+৩
আপনারে : মারে | আপনি =(৪+২)+৩

ছয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব বেশী, এ বিষয়ে তাঁহার প্রবণতা স্বাভাবিক।

(৩+৩+৩) এই সঙ্কেতে নয় মাত্রার ছন্দ রচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ তাহা (৩+৩)+৩ হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ যাহা নয় মাত্রার পর্ব্ব বলিতে চাই তাহা ছয় মাত্রার একটি মূল পর্ব্ব এবং তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্বের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই উদাহরণগুলিতে যে নয়মাত্রার পর্ব্ব নাই তাহার একটি crucial test বা চূড়ান্ত প্রমাণ পরে দিব। আপাততঃ অন্য দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করা যাক।

(ঘ) আসন দিলে অনাহূতে
ভাষণ দিলে বীণা তানে,
বুঝি গো তুমি মেঘদূতে
পাঠায়েছিলে মোর পানে।

এখানে মূলপর্ব্ব নয় মাত্রার নয়, যদিও প্রতি পংক্তিতে নয়টি মাত্রা আছে। মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, একটি পাঁচমাত্রার পূর্ণ পর্ব্ব, অপরটি চার মাত্রার অপূর্ণ পর্ব্ব। ছন্দোলিপি করিলে এইরূপ হইবে—

আসন : দিলে | অনা : হূতে =(৩+২)+(২+২)
ভাষণ : দিলে | বীণা : তানে, =(৩+২)+(২+২)
বুঝি গো : তুমি—মেঘ : দূতে =(৩+২)+(২+২)
পাঠায়ে : ছিলে | মোর : পানে =(৩+২)+(২+২)

এখানে (৩+২+৪) সঙ্কেতের পর্ব্ব নাই, (৩+২)+(২+২) সঙ্কেতের চরণ আছে। "আসন" ও "দিলে" এই দুই শব্দের মাঝে যেরূপ ধ্বনির

প্রবাহ, "দিলে" ও "অনাহূতের" মধ্যে সেরূপ নয়। "দিলে" শব্দটির পর একটি যতি অবশ্যম্ভাবী, সেখানে একটি পর্ব্বের শেষ ধরিতেই হইবে।

এতদ্ভিন্ন (৩+২+৪) এই সঙ্কেতে পর্ব্ব রচিত হইতে পারে কি না সে সম্বন্ধে কয়েকটি a priori আপত্তিও আছে। প্রবন্ধ-শেষে সেইগুলি আলোচনা করিব।

(ঙ) বলেছিনু বসিতে কাছে,
দেবে কিছু ছিল না আশা।
দেবো বলে যে জন যাচে
বুঝিলে না তাহারো ভাষা।

এখানেও এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, প্রথমটি চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাঁচ মাত্রার। সঙ্কেত (২+২)+(৩+২); প্রথম চার মাত্রার পর একটি অর্দ্ধ যতির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

একটু চেষ্টা করিয়া বরং এখানে এক ঝোঁকে সাত মাত্রা পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া প্রতি পংক্তিতে ৭ মাত্রার একটি পূর্ণ ও ২ মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্ব রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত পংক্তিটিকে এক পর্ব্ব ধরিয়া পাঠ অস্বাভাবিক হইবে।

(চ) বিজুলী কোথা হ'তে এলে
তোমারে কে রাখিবে বেঁধে।
মেঘের বুক চিরি গেলে
অভাগা মরে কেঁদে কেঁদে।

(ছ) মোর বনে ওগো গরবী
এলে যদি পথ ভুলিয়া।
তবে মোর রাঙা করবী
নিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া।

এই দুই উদাহরণেই মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার। (চ) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে তিন মাত্রার পর এবং (ছ) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে ছয় মাত্রার পর অনেকটা বেশী ফাঁক ইচ্ছা পূর্ব্বক রাখিয়া লেখা হইয়াছে। সুতরাং ঐ ঐ স্থলে যে নূতন করিয়া ঝোঁক আরম্ভ হইয়াছে এবং একটি পর্ব্ব শেষ করিয়া আর একটি পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক।

স্মরণ রাখা উচিত যে বাংলায় ছয় মাত্রার পর্ব্ব আছে, পর্ব্বাঙ্গ নাই। চার মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব্বাঙ্গ বাংলায় অচল।

(জ)　　বারে বারে যায় চলিয়া
　　　ভাসায় নয়ন-নীরে সে,
　　বিরহের ছলে ছলিয়া
　　　মিলনের লাগি ফিরে সে।

রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ৪+৪+১—এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পড়িতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়া না দিলে অনেকেই বোধ হয় ইহাকে ৬+৩ এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ছয় মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ করিতেন। নহিলে যে ভাবে শব্দকে ভাঙিয়া পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অস্বাভাবিকতা আসে।

ভাসায় ন | য়ন নীরে | সে

অথবা

যাবার বে | লায়, দুয়া | রে—

এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে একটু কৃত্রিমতার অভিযোগ যথার্থই আসিতে পারে। ছোট এক, দুই বা তিন মাত্রার শব্দকে ভাঙিয়া পর্ব্ব অথবা পর্ব্বাঙ্গ গঠন এক স্বরাঘাত প্রধান (বা ছড়া-র) ছন্দে চলে। অন্যত্র কেবল অপূর্ণ অন্তিম পর্ব্ব গঠনের সময়ই ইহা চলিতে পারে। উপরের উদাহরণে যে শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু 'নয়ন' ও 'বেলায়' এই দুইটি শব্দকে যে ভাবে ভাঙা হইয়াছে তাহাতে একটু কৃত্রিমতা ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঐ সূত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে "চরণের শেষে যেখানে দীর্ঘ যতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে সেই যতির মধ্যে তাকে আসন দেওয়া যায়"; * কিন্তু অন্যত্র তাহা চলে না।

যাহা হউক, চার চার মাত্রা করিয়াও যদি ভাগ করা যায়, তবে এক একটি বিভাগ যে পর্ব্ব ও সমগ্র পংক্তিটি যে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন যে "**চরণের** শেষে **দীর্ঘ** যতি" আছে বলিয়া পংক্তির শেষের "ধ্বনি"কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইতেছে। সুতরাং এখানে

* মৎপ্রণীত "বাংলা ছন্দের মূলসূত্রে"র ২২ (ক) সূত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে।

যে চার মাত্রার পর্ব্ব ও নয় মাত্রার চরণ আছে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(ঝ) আলো এল যে দ্বারে তব
ওগো মাধবী বনছায়া।
দোঁহে মিলিয়া নব নব
তৃণে বিছায়ে গাঁথো মায়া॥

এখানেও প্রতি পংক্তি এক একটি চরণ, পর্ব্ব নহে। লিখিবার কায়দা হইতেই বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির দুই মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে এবং তদনুসরণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির প্রথম দুই মাত্রাকেও বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। সুতরাং বড় জোর এখানে সাত মাত্রার পর্ব্ব পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ছন্দোলিপির সঙ্কেত হইবে ২+(৩+৪), (২+৩+৪) নহে। নতুবা (২+৩)+(২+২) এই সঙ্কেতে মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ চলিতে পারে। সমগ্র পংক্তিটি একটি পর্ব্ব এবং ইহার মধ্যে অর্দ্ধ যতিরও স্থান নাই—এরূপ ধারণা কেন অসঙ্গত তাহা পরে বলিতেছি।

(ঞ) সেতারের তারে ধানশী
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজিয়া।
গোধূলির রাগে মানসী
সুরে যেন এলো সাজিয়া॥

এখানে মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার। প্রতি পংক্তিতে দুইটি পর্ব্ব; প্রথমটি ছয় মাত্রার, দ্বিতীয়টি তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্ব। (ছ) উদাহরণের সহিত ইহার ছন্দোগত কোন প্রভেদ নাই। 'নিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া' ও 'সুরে যেন এলো সাজিয়া' ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই।

(ট) জলে ভরা নয়ন-পাতে
বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী।
কি লাগিয়া বিজনরাতে
উড়ে হিয়া, হে বিরাগিণী।

এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব। প্রথমটি ৪ মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৫ মাত্রার। ৪ ও ৫ মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ-সম্বলিত নয় মাত্রার পর্ব্ব এখানে নাই। প্রথমতঃ, পাঁচমাত্রার পর্ব্বাঙ্গ হয় না।

উপরের পংক্তিগুলিতে 'নয়ন-পাতে' 'মেঘ-রাগিণী' প্রভৃতি এক একটি পর্ব্ব, পর্ব্বাঙ্গ নহে ; পড়িতে গেলেই একাধিক beat বেশ ধরা পড়ে। লিখিবার কায়দা হইতেও দেখা যায় যে চার মাত্রার পরই একটু বেশী করিয়া ফাঁক রাখা হইয়াছে। তাহাতেও বোঝা যায় যে ঐ স্থানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ ঐ খানে পর্ব্ব বিভাগ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নয়মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণগুলি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, সেগুলি নয়মাত্রার চরণের দৃষ্টান্ত, নয় মাত্রার পর্ব্বের দৃষ্টান্ত নহে।

এইবার crucial test বা চূড়ান্ত প্রমাণের কথা বলি। পর্ব্বমাত্রকেই পর্ব্বাঙ্গে বিভাগ করার নানা সঙ্কেত আছে। আটমাত্রার পর্ব্বকে ৪+৪ অথবা ৩+৩+২ সঙ্কেত অনুসারে, দশমাত্রার পর্ব্বকে ৩+৩+৪,৪+৩+৩, ৪+৪+২, ২+৪+৪ সঙ্কেত অনুসারে পর্ব্বাঙ্গে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু দুইটি পর্ব্বের মোট মাত্রা সমান থাকিলে তাহাদের পর্ব্বাঙ্গ বিভাগের সঙ্কেত বিভিন্ন হইলেও তাহারা একাসনে স্থান পাইতে পারে। নয় মাত্রার ছন্দ বলিয়া যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নানা বিভিন্ন সঙ্কেত আছে। যদি বিভিন্ন সঙ্কেতের পংক্তিগুলির পরস্পর পরিবর্ত্তন দ্বারা ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে তবেই প্রমাণ হইবে যে পংক্তিগুলি পর্ব্ব। যদি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে পর্ব্বগত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্যা সমান থাকিলেও ঐ কারণে ছন্দ-পতন হইতেছে। অর্থাৎ পংক্তিগুলি চরণ, পর্ব্ব নহে। এইবার পরীক্ষা করা যাক্। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতেই পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

গভীর গুরু গুরু রবে
　　　　বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী
মোর ব্যথাখানি লুকায়ে
　　　　বসিয়াছিলে একাকিনী।

অর্থের খিচুড়ি হোক্, ছন্দেরও খিচুড়ি হইতেছে কি ? প্রতি পংক্তিতে নয় মাত্রা কিন্তু বজায় আছে।

শুকতারা চাঁদের সাথী
সাথী নাহি পায় আকাশে।
চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ভাসায় নয়ন নীরে সে।

এ স্থলে প্রতি পংক্তিতেই নয় মাত্রা আছে, কিন্তু ছন্দ অক্ষুণ্ণ আছে কি ?

এই উপলক্ষে শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের উদাহরণ কয়েকটির উল্লেখ করিতে চাই। তাঁর রচনা হইতেও ঠিক্ প্রমাণ পাওয়া গেল না, কারণ তাঁহার উদাহরণে প্রতিসম পংক্তিগুলিতে একই সঙ্কেত রাখিয়াছেন। 'গুরু ছন্দ গর্জ্জন' 'করি বৃন্ত বর্জ্জন' এই দুই পংক্তিতে একই সঙ্কেত, (২+৩)+৪। সেইরূপ 'রাখিলাম নয় মাত্রা' 'করিলাম মহাযাত্রা' এই দুই স্থলে সঙ্কেত (৪+২)+৩। তত্রাচ "ছন্দ কিছু হইয়াছে কিনা ছন্দ-রসিকই বলিতে পারেন।"

এইবার নয়মাত্রার পর্ব্ব রচনা বাংলায় সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে দু' একটি তর্ক উত্থাপন করিতে চাই। পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মধ্যে বিচার হিসাবে সেগুলি বোঝান সুবিধা হইবে।

পূঃ পঃ—নয়মাত্রার পর্ব্ব বাংলায় না চলার কোন কারণ নাই। বাংলায় বিষম মাত্রার পর্ব্ব চলে এবং দশমাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ পর্ব্বের চলন আছে। সুতরাং নয় মাত্রার পর্ব্ব বেশ চলিতে পারে।

উঃ পঃ—কিন্তু তাহার উদাহরণ দিতে পার ?

পূঃ পঃ—উদাহরণ আপাততঃ দিতে পারিতেছি না। এ রকমের পর্ব্ব কবিরা হয়ত ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে করিলেও করিতে পারেন। না করিবার কোন কারণ আছে কি ?

উঃ পঃ—আছে। বাংলা ছন্দের পর্ব্বগঠনের রীতি অনুসারে নয়মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইতে পারে না।

পূঃ পঃ—কেন ?

উঃ পঃ—পর্ব্বমাত্রেই দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। বাংলায় যখন চার মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব্বাঙ্গ চলে না, তখন দুইটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া নয় মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইতে পারে না। যদি তিনটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া

নয়মাত্রার পর্ব্ব রচনা করিতে হয়, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি সঙ্কেতের অনুসরণ করিতে হইবে। (অ) ২+৩+৪ (আ) ৪+৩+২ (ই) ২+৪+৩ (ঈ) ৩+৪+২ (উ) ৩+৩+৩ (ঊ) ৩+২+৪ (ঋ) ৪+২+৩ (এ) ৪+৪+১ (ঐ) ৪+১+৪ (ও) ১+৪+৪। কিন্তু এই দশটির মধ্যে (ই), (ঈ), (ঊ), (ঋ), (ঐ) নামক সঙ্কেতগুলি অচল, কারণ তাহাতে দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে পর্ব্বাঙ্গগুলিকে সাজান হয় নাই, সুতরাং বাংলা ছন্দের একটি মূল রীতির ব্যভিচার হইয়াছে। বাকী রহিল পাঁচটি,—(অ), (আ), (উ), (এ), (ও)। তন্মধ্যে (অ), (আ), (এ), (ও) নামক সঙ্কেতে যুগ্ম মাত্রার ও অযুগ্ম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গের পর পর সন্নিবেশ হইয়াছে। বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ পর পর থাকিলে একটা উচ্ছল, চপল ভাব আসে, তজ্জন্য অবিলম্বে যতি স্থাপন করিয়া ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়; অর্থাৎ কেবলমাত্র দুই পর্ব্বাঙ্গযোগে রচিত পর্ব্বেই বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইতে পারে। তিন পর্ব্বাঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বে অযুগ্ম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইলেই তাহার পর আর একটি অযুগ্ম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ বসাইয়া ছন্দের সাম্য রক্ষা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' ছন্দ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন তাহাতেও এই তত্ত্বের আভাস আছে। 'পরিচয়ে'ও রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন সেগুলিতে যে পংক্তিতে বাস্তবিক একাধিক পর্ব্বের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা হইতেও একথা প্রমাণ হয়।

পূঃ পঃ—কিন্তু (উ) চিহ্নিত পর্ব্বাঙ্গে ত কোন রীতিরই ব্যত্যয় হয় নাই।

উঃ পঃ—হয় নাই বটে, কিন্তু সেখানে ছয় মাত্রায় পর্ব্ব বিভাগ করার প্রবৃত্তি এত সহজে আসে যে নয় মাত্রার পর্ব্ব আর থাকে না। নয় অযুগ্ম সংখ্যা। অযুগ্ম সংখ্যার পর্ব্ব বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় না। পাঁচ ও সাত মাত্রার পর্ব্ব বাংলায় চলে, কিন্তু Syncopated movement বা খঞ্জগতির পর্ব্ব হিসাবেই তাহারা চলে। সেজন্য দুইটি মাত্র বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গের পরস্পর সান্নিধ্য আবশ্যক

সম মাত্রার তিনটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া Syncopated movement রাখা যায় না।

পূঃ পঃ—এ সমস্ত যুক্তির সারবত্তা যথেষ্ট আছে বটে, তত্রাচ ৩+৩+৩ সঙ্কেতের পর্ব্ব চলিবে না কেন ? অবশ্য Syncopated movement না হইতে পারে, কিন্তু—অন্য রকমের গতিও ত সম্ভব। কোন ভবিষ্যৎ ছন্দ-শিল্পীর রচনায় একথা প্রমাণ হইতে পারে।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক শিষ্যদল

রাজা রামমোহনের ভাবসম্পদকে অবলম্বন করিয়া একদিকে যেমন এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী ধর্ম্মসংস্কারকদল গড়িয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংস্কারকদল আবির্ভূত হইয়াছিল। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন পর্য্যন্ত দশবৎসরকাল (১৮৩৩—১৮৪৩ খৃঃ অঃ) ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনে মন্দা পড়ে। আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ সময়ে কোনরূপে রাজা রামমোহনের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাজার বিলাত যাত্রার পর হইতেই কিরূপে ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয় তাহার একটি নূতন প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। রাজার সহিত অন্তরঙ্গতার ফলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর মূর্ত্তিপূজায় আস্থাহীন হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়া গেজেট" হইতে জানা যায় যে ঐ বৎসর প্রসন্নকুমার দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। নব্যবঙ্গের গুরু ডিরোজিও সাহেব তাঁহার সম্পাদিত "East Indian" কাগজে এজন্য প্রসন্নকুমারকে অনেক বিদ্রূপ করেন (India Gazette ১৯শে অক্টোবর ১৮৩১ খৃঃ অঃ দ্রষ্টব্য)। উক্ত দশবৎসরকালের মধ্যে রাজার ধর্ম্মমত বঙ্গদেশে অনাদৃত হইলেও, তাঁহার রাজনৈতিক মত ও কর্ম্মপ্রণালী বাঙ্গালার নেতৃবর্গ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দশবৎসরে রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক প্রভাব বঙ্গদেশে কিরূপে অনুভূত হইয়াছিল তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচ্য।

রাজা রামমোহন বিধিসঙ্গত প্রণালীতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিয়া দেশের দুর্দ্দশা অপনোদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিয়া অন্যায় অবিচারের প্রতীকার-চেষ্টা কেহ করেন নাই। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লইয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় জনগণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত করেন। বিচার ও রাজস্বসংক্রান্ত ব্যবস্থায় যে সকল দোষ ও ত্রুটি ছিল সেগুলি দূর করিবার জন্য, ও শিক্ষিত-জনমতের সাহায্যে বিধি প্রণয়ন করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তনের

জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার সাফল্যের নিমিত্ত তিনি একদিকে বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া দেশের জনমত গঠন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, অপরদিকে ইংরাজের পরিচালিত সংবাদপত্রের সাহায্যে ভারত-শাসন বিষয়ে ইংরাজদের সদ্বুদ্ধি জাগরিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতীয় শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিতে হইলে ইংলণ্ডের জনমতকেও ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিতে হইবে, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের বাসনা তাঁহার বিলাত যাত্রার অন্যতম কারণ। তিনি ইংরাজদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়া ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার উন্নতি-প্রয়াসের পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার বিলাতগমনের পর বাঙ্গালার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন দলের আবির্ভাব হয়। একদল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা লাভ করেন ফরাসী বিপ্লব হইতে। এইদলের একজন লেখক "Old Hindu" ছদ্মনামে "বেঙ্গল হরকরায়" ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি প্রবন্ধে এই ভাব প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষে ফরাসী বিপ্লবের অনুরূপ এক বিপ্লব ঘটিবার প্রয়োজন আছে। ইঁহারাই বোধ হয় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সময় কলিকাতার মনুমেণ্টের চূড়ায় ত্রিবর্ণের বিপ্লবী পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। "So great a favourite is the tri-colour at Calcutta, that we find it stated in the 'John Bull', that on Christmas day, it was hoisted along with the English on the top of Sir David Ochterlony's Monument." (Asiatic Intelligence, June, 1831.) এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একশত বৎসর পরেও ভারতবর্ষের তরুণেরা সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিজেদের মনোমত পতাকা উড়াইয়া স্বাধীনতা লাভের মোহমরীচিকা হইতে মুক্তিলাভ করে নাই। যাহা হউক, উক্ত দলের সমর্থক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। তাঁহারা সকলেই নূতন আমদানী ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত। তাঁহারা রাষ্ট্রের স্বরূপ কি, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, সরকার কি কি কার্য্য করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য এই সকল দার্শনিক বিষয় আলোচনা করিতেন। ইঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বেন্থামের ও অর্থনীতিতে অ্যাডাম্ স্মিথের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। ইঁহাদের সর্ব্বপ্রধান মুখপত্র ছিল

"জ্ঞানান্বেষণ"। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চ্চা আজও আমাদের দেশে বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা মূলতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করিবার জন্যই "জ্ঞানান্বেষণ" বাহির করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের Calcutta Quarterly Magazine and Review পত্রিকায় (৪১৭ পৃষ্ঠায়] "জ্ঞানান্বেষণ" সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ঃ—"The object of the Journal is the instruction of the Hindoos in the science of Government and Jurisprudence, and it adds to its crude essays on these abstruse points a few brief items of intelligence"। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ও কিছুদিন পরে অক্ষয়কুমার দত্ত এই বুদ্ধিজীবী চরমপন্থীদলের পরিচালনা করেন। আমি এই দলকে ভারতীয় "Philosophical Radicals" নামে অভিহিত করিয়াছি। ইঁহাদের কথা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। শুধু এই দলের সহিত রামমোহনী রাজনৈতিক দলের পার্থক্য নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে দু'একটি কথা বলিলাম।

রামমোহনীদল রাষ্ট্রের দার্শনিক ব্যাখ্যায় কালক্ষেপ না করিয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক অভিযোগ লইয়া আন্দোলন করিতেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজার বিলাত গমন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দলের প্রাধান্য ও ১৮৬১ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ কংগ্রেস স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দলের গৌণ প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাজার সাক্ষাৎ শিষ্যদল অর্থাৎ যাঁহারা রাজার সঙ্গে একযোগে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ও রাজার রাজনৈতিক আদর্শকে সফল করাই যাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা আলোচনা করিব। ইহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও জন্ অ্যাডামের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের রাজনৈতিক উদ্যম ১৮৩০ হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। তৎপরে রামমোহনের আবহাওয়ায় মানুষ অথচ তাঁহার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত নহেন এইরূপ ব্যক্তিগণের হাতে রাজনৈতিক

আন্দোলনের পরিচালনা-ভার আসে। এই দ্বিতীয় রামমোহনী দলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৪৩ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেতৃত্ব করেন। তারপর ১৮৬১ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রামমোহনী রাজনৈতিক ধারা বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ক্রমোন্নতিশীল গণতান্ত্রিকদলের সহিত সংঘর্ষে তাঁহারা ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়েন।

রাজা রামমোহন যখন বিলাত-যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার আরব্ধ রাজনৈতিক ব্রত উদ্‌যাপনের ভার লইয়াছিলেন প্রধানতঃ তাঁহার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু—প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'The Reformer' নামে একখানি পত্রিকা বাহির করেন। Calcutta Quarterly Magazine and Review পত্রিকার ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের The Calcutta Press নামক প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে "Reformer"-এর ৪০০ গ্রাহক ছিল, জ্ঞানান্বেষণের ১০০, India Gazetteএর ৩৭৩ Calcutta Courrier এর ১৭৫, Bengal Heraldএর ২৪২, Enquirer-এর ২০০ ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাইয়ের Friend of India হইতে জানা যায় যে সুপ্রতিষ্ঠিত "সমাচার-দর্পণের" মাত্র চারিশত গ্রাহক ছিল। সুতরাং Reformer সে যুগের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকার মধ্যে স্থান পাইত তাহা জানা যাইতেছে। আর Reformer যে রাজা রামমোহনের দলেরই মুখপত্র ছিল তাহাও Dr. Duffএর সমসাময়িক নিম্নলিখিত বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে—

"It represented the sentiments of a party not large in number but potent in rank and wealth, the party of the celebrated Raja Rammohun Roy."

প্রসন্নকুমার রাজা রামমোহনের নিকট হইতে ইংরাজ শাসনের প্রতি অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি রামমোহনের রাজনৈতিক-সংস্কার-প্রিয়তারও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে

তাঁহার কাগজে তিনি "শিক্ষিত হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় মত" নামে যে ইংরাজী প্রবন্ধ লেখেন তাহা India Gazetteএ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে উদ্ধৃত হয়। উক্ত প্রবন্ধে প্রসন্নকুমার বলেন,—"যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় ইংরাজ কিংবা অন্য শাসন আমরা পছন্দ করি, তাহা হইলে আমরা সকলে একবাক্যে বলিব ইংরাজ শাসনই আমরা সর্ব্বতোভাবে পছন্দ করি, এমন কি হিন্দুশাসনের চেয়েও। কিন্তু মনুষ্যকৃত কোন প্রতিষ্ঠানই দোষহীন নহে, এবং সকল প্রতিষ্ঠানেরই উন্নতি সাধন করা সম্ভব। সেইজন্য আমরা বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিতেছি ও তাহার উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছি।" কিন্তু তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের অন্য একটি প্রবন্ধে—যাহা Englishmanএ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে উদ্ধৃত হইয়াছে—বলেন যে যদি যোগ্য ভারতীয়গণকে কোন উচ্চপদ না দেওয়া হয়, যদি তাহাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হয়, তবে কি তাহারা ইংরাজ, ফরাসী বা রুষীয় অধিকার সম্বন্ধে সমান উদাসীনতা দেখাইবে না? রাজা রামমোহনের ন্যায় প্রসন্নকুমার ভারতীয়গণকে যোগ্যপদে নিযুক্ত করিবার জন্য ক্রমাগত আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে তিনি দেখেন যে ভারতে যখন বৃটিশ রাজত্বের সূত্রপাত হয় তখন ইংরাজেরা ভারতীয়গণকে উচ্চতম পদ ও বেতন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি রাজা রাজবল্লভের কথা উল্লেখ করেন।—

Raja Rajballava "was the senior member of the Revenue Board on a salary of rupees 5000, and had according to the rule of that period a seat in the council."

(Asiatic Intelligence, October 1832 হইতে উদ্ধৃত। 'Reformer' এর কোন সংখ্যা আমি দেখিতে পাই নাই বলিয়া সমসাময়িক কাগজপত্র ঘাঁটিয়া 'Reformer'এর লেখা যেখানে যেখানে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়াছি)।

প্রসন্নকুমার এদেশে জুরীর বিচার প্রচলনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন (Asiatic Intelligence Dec. 1832 ও India Gazette

January 29, 1833-র 'Reformer' হইতে উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি কি করিয়া ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল তাহার সম্বন্ধে প্রসন্নকুমারের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে প্রথমে নিগমসভা (Trade guild) ও গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ মোকদ্দামার চূড়ান্ত বিচার করিতে পারিত। তখন দেশে গণতান্ত্রিক-ভাব প্রবল ছিল। ক্রমে পুরোহিত সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের বৃদ্ধি হইলে নিগম ও পঞ্চায়েতের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে লাগিল ও প্রাথমিক বিচারের ক্ষমতা তাহাদের হাতে থাকিলেও, চূড়ান্ত বিচারের ভার পাইলেন রাজা। রাজা রামমোহন ভারতীয় ইতিহাসে রাষ্ট্রের ক্রমপরিবর্ত্তনের যে ব্যাখ্যা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'Brief Remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of Females, according to the Hindu Law of Inheritance" নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন (পণিনি আফিসের ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত রাজার ইংরাজী গ্রন্থাবলীর ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), তাহার প্রভাব প্রসন্নকুমারের উপর কিরূপভাবে পড়িয়াছিল তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

"Superstition, which was the prolific source of despotism and the stronghold of priestcraft, contributed not a little to deprive the people of their just rights, by adding undue authority to the privileges of the crown. The ministers of religion, who were also the legislators, easily discovered the weakness of a people, who from ignorance was credulous of the most absurd doctrines, which were offered for their belief, and to place their power on a firm basis. they connived with the rulers of the land to increase their power by sacrificing the rights of the people, which were in a manner entrusted to their charge by the credulous mob. Thus the appeal from the verdict of the punchait was made to rest with the king. (Asiatic Intelligence. December 1832 সংখ্যায় Reformer হইতে উদ্ধৃত।

রাজা রামমোহন বলিয়াছিলেন যে আর কোন প্রয়োজনে না হউক, ভারতীয়গণের রাজনৈতিক উন্নতির জন্যও, অন্ততঃ, সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কার সাধন প্রয়োজন। এই বাক্যের অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে

রামমোহনী চিন্তাধারায় সামাজিক অবস্থার সহিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা জানা দরকার। প্রসন্নকুমারের উল্লিখিত বাক্য হইতে আমরা উক্ত চিন্তা-প্রণালীর পরিচয় পাইতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে রাজা রামমোহন কেন সমাজসংস্কারের উপর এত বেশী জোর দিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রের সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার পথ দেখাইয়া যান। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় সেই পথ অনুসরণ করিয়া ৩৪০০০ টাকা দিয়া India Gazette-এর স্বত্ব ক্রয় করেন ও ঐ পত্র Bengal Chronicle এর সহিত যোগ করিয়া দেন (Asiatic Intelligence, April, 1835 দ্রষ্টব্য)। পরে তিনি "বেঙ্গল হরকরা"র কিছু অংশের স্বত্বও ক্রয় করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন যে "John Bull" কাগজ দেশীয় লোকদের উপর যে বর্ব্বরোচিত অন্যায় আক্রমণ করিতেছিল তাহার জবাব দিবার জন্যই তিনি ঐ কাগজের স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন (Memoirs of Dwarkanath Tagore, revised and enlarged edition of 1870, ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশবাসীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় বোধ জাগরিত করিবার প্রয়াস পান। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখের একটি সভায় তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে "আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা যে একচক্ষু হারাইলে অপরটিরই মাত্র যত্ন করা উচিত; সেইজন্য তাহারা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের কোনই চেষ্টা করে না এবং প্রকাশ্য সভাসমিতি হইতে নিজেদিগকে দূরে রাখে।" তিনি রামমোহনের মতনই বিশ্বাস করিতেন যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইলে দেশের লোকের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা অবশ্যই আসিবে। কতকগুলি শিক্ষিত ইংরাজ পরিবারকে এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা করিতে পারিলে তাহাদের সহিত সংসর্গের ফলে ও তাহাদের চেষ্টায় এদেশের লোকের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধিত হইবে—এই ধারণা রাজা রামমোহন পোষণ করিতেন ও দ্বারকানাথ তাহার সমর্থন করিতেন। রাজা রামমোহন জুরীর বিচার প্রবর্ত্তনের জন্য বিলাতে আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে দ্বারকানাথ এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া সুপ্রিম

কোর্টে জুরীর বিচার প্রবর্ত্তন প্রার্থনা করেন। রাজা রামমোহন অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুগণ এই প্রশংসনীয় উদ্যম পরিত্যাগ করেন নাই। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-নিরোধক আইন রদ্ করিবার জন্য একটি সভা হয়। তাহাতে দ্বারকানাথ বলেন—"আজ এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে যাইয়া আমি সেই কার্য্যের মাত্র পুনরাবৃত্তি করিতেছি যাহা দশবৎসর পূর্ব্বে আমি করিয়াছিলাম। যখন এই রেগুলেশন প্রথম জারী হয় তখন আমি, আমার ৩।৪জন আত্মীয় ও আমার মৃতবন্ধু রামমোহন রায় এই কয়জনমাত্র উহার বিরুদ্ধে সুপ্রিম্ কোর্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম।......আর কোন বাঙ্গালীকে আমাদের সহিত তখন যোগ দেওয়াইতে পারি নাই। তখন অনেকেই ভাবিয়াছিল যে আমার দুঃসাহসিকতার জন্য আমাকে বুঝি পরদিনই ফাঁসীকাঠে ঝুলান হইবে।" (ভোলানাথ চন্দ্র কৃত Life of Digamber Mitra Vol. I দ্রষ্টব্য)।

প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথ কেবলমাত্র সংবাদপত্রে ও সাময়িক সভার সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ে রাজা রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন, রাজা রামমোহনের বিরোধিতা করিলেও, রাজার মৃত্যুর চার বৎসর পরে তাঁহারা রাজার সহকর্ম্মী প্রসন্নকুমারের সহযোগিতায় Zamindary Association বা Landholders' Society নামক বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহার সম্পাদক হয়েন (The Bengal Harukaru, August 15, 1843 দ্রষ্টব্য)। রাজা রামমোহনের নীতি অনুসরণ করিয়া এই সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ ইংরাজ সভ্যও গ্রহণ করিতেন। তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার Mr. Turton উক্ত সভার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বরের অধিবেশনে সভার সভ্যগণের মনোভাব ও রাজনৈতিক আশা নিম্নলিখিত বাক্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন ঃ—

"It was not as a conquered nation that he desired to retain the inhabitants of India as British subjects, but as

brethren in every respect; as constituting a part of the Kingdom of Great Britain, as fellow subjects—with the same feelings, the same interests and objects and the same rights as the British-born inhabitants of England."

রাজা রামমোহনের রাষ্ট্রীয় আদর্শও ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে সমানের অধিকার লাভ করা। উদ্ধৃত বাক্যটি আলোচনা করিতে যাইয়া মনে রাখিতে হইবে যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে Durham Report প্রকাশিত হয় নাই। ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রই জানেন যে Durham Reportএই সর্ব্বপ্রথমে Dominion Statusএর ভাব জন্মলাভ করে। কিন্তু ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের আশা রাজা রামমোহনের মনেই প্রথম জাগরিত হয় ও তাহার সুস্পষ্ট রূপ পাওয়া যায় রাজার শিষ্যদলের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। উক্ত প্রতিষ্ঠান মূলতঃ জমীদারদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হইলেও দেশের জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় চৈতন্য উদ্বোধনে ও অধিকারলাভের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েসনের প্রসন্নকুমার-স্মৃতিসভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতেও এইরূপ কথা বলিয়াছেন (বাবু যোগেশ্বর মিত্র সম্পাদিত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তৃতাবলীর ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "জমীদারী সভা"র কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিলে মনে হয় ইংলণ্ডের ব্যারণগণ যেমন স্বেচ্ছাচারী রাজা জন্-এর বিরুদ্ধে লড়িতে যাইয়া নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের রাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের দেশের জমীদারেরা সেই যুগে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার বজায় রাখিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

যখন প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথের চেষ্টায় বঙ্গদেশে জনমত গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন রাজা রামমোহনের অপর একজন সহকর্ম্মী শিষ্য বিলাতের জনসাধারণকে ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইনি রেভারেণ্ড উইলিয়ম অ্যাডাম্। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের "Bengal Spectator" নামক পত্রিকা (১৬ পৃষ্ঠা) হইতে জানা যায় যে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইনি ইংলণ্ডে British India Society নামে এক সভা

স্থাপন করেন। ভারতীয় জনগণের উন্নতি সাধন করা ঐ সভার উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঐ সভার মুখপত্ররূপে অ্যাডাম্ সাহেবের সম্পাদকতায় "British India Advocate" নামে একখানি কাগজ বাহির হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চের "বেঙ্গল হরকরায়" উক্ত কাগজের সমালোচনায় লিখিত হয় যে উহা আট পৃষ্ঠার এক কাগজ এবং উহার আকার বিকট, "with a repulsive physiognomy"। যাহা হউক জমীদার সভার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বরের অধিবেশনে লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সহিত সহযোগিতা করিবার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বারকানাথ ঐ অধিবেশনে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। সভায় স্থির হয় যে নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ে লণ্ডনের সভার মনোযোগ আকর্ষণ করা হইবে—(১) লাখেরাজ জমি যাহাতে বাজেয়াপ্ত না হয়; (২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা তদনুরূপ কোন বন্দোবস্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাহাতে বিস্তৃত হয়; (৩) রাজস্ব, বিচার ও পুলিশ বিভাগের এরূপ সংস্কার সাধন করা যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা পায়; (৪) পতিত জমি এরূপভাবে বণ্টন করা হউক যাহাতে ধন উৎপাদনের সুবিধা হয় (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল হরকরার ১৪ই ও ১৬ই ডিসেম্বর সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর উপর ভারতের উন্নতি সাধনের ভার অর্পণ করিয়া রামমোহনের শিষ্যদল নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা একজন সদ্বক্তা ও সুপরিচিত ইংরাজকে জমীদার সভার এজেণ্টরূপে বিলাতে রাখিবার সঙ্কল্প করেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রস্তাবে ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থনে জর্জ্জ টম্‌সন্ সাহেব উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েন।

রাজা রামমোহন বিলাতে কিরূপ অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারকানাথের অবিদিত ছিল না। সেইজন্য তিনি নিজে বিলাতে যাইয়া দেশের উন্নতিবিধান করিতে মনোযোগী হইলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে তিনি জর্জ্জ টম্‌সনের সহিত পরিচিত হইলেন ও বাঙ্গালার যুবকবৃন্দকে বৈধপ্রণালীতে রাজনৈতিক আন্দোলন শিখাইবার জন্য তাঁহাকে এদেশে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। জর্জ্জ টমসন বিলাতে নিজের বিদায় সভায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে তিনি

নিজে ইচ্ছা করিয়া ভারতবর্ষে যাইতেছেন না, পরন্তু দ্বারকানাথের আগ্রহে ও যত্নে তথায় যাইতেছেন। দ্বারকানাথ যে তাঁহার ব্যয়ভার ও পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়াছেন সে কথাও জর্জ্জ টম্‌সন্ ইঙ্গিতে বলেন। (উক্ত বক্তৃতা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবরে Scotsman পত্রিকায় বাহির হয় ও বেঙ্গল হরকরায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে উদ্ধৃত হয়। Bengal Spectatorএ বা যোগেশ্বর মিত্র সম্পাদিত (১৮৯৫) জর্জ্জ টম্‌সনের বক্তৃতাবলীতে উহা স্থান পায় নাই)। উক্ত বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে দ্বারকানাথ বঙ্গীয় যুবকগণকে রাষ্ট্রীয় সাধনায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কতদূর আগ্রহশীল ছিলেন ও কি পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

জর্জ্জ টমসনের বঙ্গদেশে আগমন ও কলিকাতার বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উপদেশ দেন—

"To abhor expediency, to stand boldly for the cause of righteousness and to make organised efforts to secure the protection and security which the constitution of England guarantees."

তাঁহার বক্তৃতার ফলে, ও দ্বারকানাথের অনুসৃত কার্য্যপ্রণালীর ফলে, হিন্দুকলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদলের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার ইচ্ছা জন্মে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হিন্দুকলেজ হইতে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই philosophical radicals বা আদর্শবাদী চরমপন্থী ছিলেন। দ্বারকানাথ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড কর্ত্তৃক নিযুক্ত বঙ্গীয় পুলিশসংস্কারক কমিটির নিকট যে সাক্ষ্য দেন তাহাতে শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণের জন্য এক নূতন পদ সৃষ্টি করিতে সরকারকে উপদেশ দেন। ঐ পদের নামই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী। তিনি বলেন—

"They (the deputy magistrates) should be stationed in the interior and their powers in criminal cases should correspond with those of moonsiffs, and they should be allowed to exercise jurisdiction over the Thanadars".

তাঁহার প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব Mr. Dampierও করেন।

(Report of the committee formed by Lord Aukland in 1838 to investigate the state of Bengal Police, dated 18th August, 1838—৮ হইতে ১১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। ইহা কিশোরীচাঁদ মিত্রকৃত দ্বারকানাথের জীবনীতে উদ্ধৃত বা উল্লিখিত হয় নাই)। দ্বারকানাথের প্রস্তাব অনুসারে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট উক্ত পদ সৃষ্টি করিয়া চরমপন্থী কয়েক জন শিক্ষিত যুবককে উহাতে নিযুক্ত করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি খ্যাতনামা হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করায় আদর্শবাদী চরমপন্থীদল ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এদিকে আবার ঐ দলের ত্রাণস্বরূপ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী দ্বারকানাথ ও জর্জ্জ টম্‌সনের সহিত মিলিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৈধ আন্দোলনে যোগ দেন।

এক্ষণে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী রামমোহনী দলের ও চরমপন্থী দলের মধ্যে সেতুস্বরূপ। তিনি রাজা রামমোহনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন—এমন কি রাজাকে পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মসম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে সাহসী হইতেন বলিয়া কথিত আছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক। যখন হিন্দুকলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ "society for the acquisition of general knowledge" স্থাপন করেন তখন তারাচাঁদকেই তাঁহারা সভাপতির পদে বৃত করেন। তাঁহার সম্বন্ধে জর্জ্জ টম্‌সন্ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিলের সভায় বলেন ঃ—

A man whose earnest though quiet zeal, whose retiring modesty, benevolent feelings and whose incorruptible integrity entitled him and had, he believed, won for him the esteem and admiration of all who knew him."

তারাচাঁদ কিরূপ নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন তাহা ক্যাপ্‌টেন ডি, এল, রিচার্ডসনের সহিত তাঁহার ব্যবহারে বুঝা যায়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দুকলেজের হলে "জ্ঞানান্বেষণী সভা"র এক অধিবেশন হয়। উহাতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় চরমপন্থী দলের মুখপাত্ররূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোচনা করিয়া "The present state of the East India Company's criminal judicature

and Police under the Bengal Presidency" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। যখন তিনি প্রায় অর্দ্ধেক প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তখন হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপাল, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন তাঁহাকে বাধা দিয়া বলেন যে তিনি (প্রিন্সিপাল) কলেজের হলকে "den of treason" হইতে দিতে পারেন না। তখন তারাচাঁদ ক্যাপ্টেন্ ডি, এল, রিচার্ডসনকে যেরূপ অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা "বেঙ্গল হরকরার" পুরানো ফাইলের সমাধি হইতে উদ্ধার পাইবার যোগ্য। "জ্ঞানান্বেষণী সভা"র সভাপতি তারাচাঁদ বলিলেন—

—"Captain Richardson! With due respect, I beg to say, that I cannot allow you to proceed any longer in this course of conduct towards our Society, and as the President of the Society, and on behalf of my friend Babu Dukhin I must say that your remarks are anything but becoming. I am bound to add that I consider your conduct as an insult to the Society, and if you do not retract what you have said and make due apology, we shall represent the matter to the committee of the Hindu College, and if necessary to the Government itself. We have obtained the use of this public hall by leave, applied for, received from the committee, and not through your personal favour. You are only a visitor on this occasion, and possess no right to interrupt a member of this Society in the utterance of his opinions. I hope that Captain Richardson will see the propriety of offering an apology to my friend, the writer of the essay and to the meeting." (বেঙ্গল হরকরা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩ দ্রষ্টব্য)।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্ প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 'বেঙ্গল হরকরায়' উহা ছাপিত দিয়াছিলেন।

Philosophical Radical সম্প্রদায়ের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী জর্জ্জ টম্সনের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া এবং সম্ভবতঃ দ্বারকানাথের অনুরোধে প্রভাবান্বিত হইয়া বৈধভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উদ্যোগী হইলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল তারিখে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টায় The Bengal British India Society

স্থাপিত হইল। 'জমীদার সভা' ছিল ধনী অভিজাতদের সভা, আর এই নূতন প্রতিষ্ঠান হইল বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের সভা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যেমন 'জমীদার সভা' স্থাপনে রামমোহন-শিষ্য প্রসন্নকুমার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তেমনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপনে রামমোহনের দুই প্রিয়তম শিষ্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। ২০শে এপ্রিলের সভায় "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" স্থাপনের প্রস্তাব করিবার ভার পড়ে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের উপর। তারাচাঁদের প্রস্তাবে ও চন্দ্রশেখরের সমর্থনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল :—

"That a Society be now formed, and denominated, the Bengal British India Society, the object of which shall be the collection and dissemination of information, relating to the actual condition of the people of British India and the laws and institutions, and resources of the country and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects."

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস স্থাপনের বীজ এইরূপে উপ্ত হইল।

রাজা রামমোহনের আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু—আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সময়ে কেবল যে মৃতপ্রায় ধর্ম্মান্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিতেছিলেন তাহা নহে, পরন্তু রাজার ঈপ্সিত রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যে দেশবাসিগণকে পৌঁছাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—ইংরাজী বোধহয় জানিতেনই না, অথচ তিনি যদি রাষ্ট্র, ব্যবস্থাশাস্ত্র, আন্তর্জ্জাতিক আইন প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় দর্শনের কঠিন বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন, তবে বলিতে হইবে যে রাজা রামমোহনই তাঁহাকে এই সকল বিষয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া ছিলেন। তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নিকট "নীতিদর্শন" সম্বন্ধে ২৪টি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত :—১০নং স্বাদেশিকতা (Patriotism); ১৯নং যুদ্ধ ও সন্ধি ; ২০নং শাসন ব্যবস্থার উৎপত্তি, প্রয়োজন ও বিভিন্ন রূপ (On the origin and necessity of the Government and

the principal forms thereof now prevalent in the world); ২১নং বিধিসঙ্গত কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা ও প্রজার স্বাধীনতা (On the necessity of obedience to the lawful authority and the liberty of the subject); ২২নং আইনের উৎপত্তি; ২৩নং আন্তর্জ্জাতিক বিধান। (বেঙ্গল হরকরা ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪১ দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহর্ষির 'আত্মচরিতে'র পঞ্চদশ পরিশিষ্টে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের লেখা নীতি-দর্শন নামে একখানি বইয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমি অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধানের পর তাঁহার নিকট ঐ বইয়ের খোঁজ জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে তিনিও ঐ বই কোথাও পান নাই। যদি কেহ দয়া করিয়া ঐ বইয়ের সন্ধান দেন তবে বড়ই উপকার হয়)। রাজা রামমোহন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কতদূর অনুরক্ত ছিলেন তাহা আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উল্লিখিত বিষয়ের উপর বক্তৃতা হইতে সবচেয়ে বেশী বুঝা যায়।

১৮৩৩ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরকালের মধ্যে রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্যবর্গ তাঁহার রাষ্ট্রীয় সাধনাকে সফল করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার অভিপ্রেত ধর্ম্মসংস্কার-আন্দোলন চালাইবার জন্য সেরূপ যত্ন লয়েন নাই।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

গত সংখ্যার ভ্রম সংশোধন ঃ—৯৫ পৃষ্ঠা ১৭ লাইনে ১৮৮৩ এর বদলে ১৮৩৩ হইবে।

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যখন বিলেত রওয়ানা হই, তখন আমার বয়স কুড়ি বছরও হয় নেই। তবু আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আমি রীতিমত বড় হয়েছি, সংসারকে বেশ চিনেছি। চেনারই ত কথা! দুবছর মাথার উপর কেউ কর্ত্তাব্যক্তি ছিলেন না। মনের সাধে কলকাতার পথঘাট চ'ষে বেড়িয়েছি। তার উপর, বিয়ে করেছি, পরীক্ষায় ফেল হয়েছি, দিন দুপুরে রাত দুপুরে ফুটবল খেলেছি, সভা-সমিতিতে মোড়লী করেছি। আর কি রকমে মানুষে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ?

কর্ত্তৃপক্ষের কিন্তু ধারণা অন্য রকম ছিল। তাঁরা এই নাবালকটির তত্ত্বাবধানের নানা ব্যবস্থা করতে লাগলেন। স্থির হল, অমুক আমাকে বোম্বায়ে জাহাজে তুলে দিয়ে আসবেন, অমুক মার্সেইয়ে নামিয়ে নেবেন। জলপথটাও যে একটু স্বস্তিতে কাটবে তার উপায় এঁরা রাখলেন না। কাপ্তান সাহেবকে আমার অভিভাবক করে ছেড়ে দিলেন। আমি সমুদ্র পার হচ্ছিলাম ফরাসী কোম্পানীর জাহাজে। ওদের ভাষা একটু আধটু বলতে পারতাম ব'লে অফিসার-মণ্ডলীর কাছে আমার আদর খুব বেড়ে গেল। তারা আমার খাবার জায়গা করে দিলে নিজেদের মাঝে, আর এটা খাও ওটা খাও করে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে লাগল। আমার কেবিনে উইলিয়াম্‌স্‌ নামে এক বুড়ো ইংরেজ ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর পেশা ছিল রাজাদের ঘোড়দৌড়ি আস্তাবলের তদারক করা। আমি কুচবেহারের লোক জেনে তিনি মহাখুসী হয়ে আমাকে বললেন, "তুমি ত আমার আপনার লোক হে! আমি তোমাদের রাজার কত ঘোড়া রেসের জন্য তৈরী ক'রে দিয়েছি।" ফরাসী কাপ্তানকে এই বৃদ্ধ কি বললেন জানি না। কিন্তু এডেন, পোর্ট-সৈয়দ বন্দরে ইনিই আমাকে ডানা ঢাকা দিয়ে বেড়িয়ে নিয়ে এলেন। পাঠককে আগেই বলেছি আমার সহযাত্রী কাপ্তান ষ্টুয়ার্টের কথা। পোর্ট-সৈয়দ ছাড়বার পর তিনিও আমার একজন অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন। আমাকে একটু ব'কে ধমকে বললেন, "তুমি বড়লোকের

ছেলে, উইলিয়াম্‌সের সঙ্গে অত মাখামাখি কেন ? লোকটা জাতে সহিস বইত নয়।" ছেলেবেলা থেকে মার হুকুমে ঝি চাকরদের দাদা দিদি ব'লে ডেকে এসেছি, তাতে ত কোন দিন ইজ্জৎ যায় নেই। আজ উইলিয়াম্‌স্‌ আমার জাত মারবে কি ক'রে।

মার্সেই বন্দর চৌদ্দ দিনের দিন পৌঁছলাম। কাপ্তান পিঠ চাপড়ে বললেন, "তোমার কর্ত্তাদের লিখো যে আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলি নেই, ভালয় ভালয় ইউরোপ পৌঁছে দিয়েছি। তাঁরা যেন আমার এজেণ্ট সাহেবকেও জানান।" একটু পরেই দেখি চৌধুরী সাহেব এসেছেন। জাহাজের বন্ধুবান্ধবের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। লণ্ডন পর্য্যন্ত তিনি আমার কর্ণধার।

এইবার একটু বাজে কথা বলব। আমি বিলেত প্রবাসের গল্প লিখব শুনে এক তরুণ বন্ধু সেদিন ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের সময়ে বিলেত ছিল নাকি ?" প্রশ্নটা নিতান্ত অর্থহীন নয়। তবে, একটা যেমন তেমন বিলেত ছিল বই কি। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। আমাদের সেই সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মযুগের ভাবনা সাধনা যে রকম ছিল, আমাদের বিলেতরূপী সিদ্ধিও তদ্বৎ ছিল। এখনকার বাঙ্গালীর উৎকট সাধনার উপযুক্ত সিদ্ধি এখনকার উগ্র বিলেতী সভ্যতা। এ বিলেত আমাদের ধাতে সইত না। হয়ত ভিক্টোরীয় যুগের একজন সেকেলে স্কোয়ার এসে দাঁড়ালে তারও ঠিকে ভুল হয়ে যেত। সকলের কি পেঁয়াজ, রসুন, গরম মশলার গন্ধ বরদাস্ত হয়। তবে একটা কথা বারবার মনে হয়। যে জাত মহাযুদ্ধের সময় চার বছর ধ'রে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করেছিল, trench-এর (খাদের) পাঁকের মাঝে শুকনো নোনা মাংস খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছিল, shrapnel গুলির বর্ষণে কাতারে কাতারে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের ঘরে ফিরে এসে, কিছুদিন সকল বাঁধন সকল শাসন কেটে ফেলে দিয়ে, জীবনটাকে আবীর গুলালের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দেওয়ার সাধ হবে বইকি! কিন্তু যারা রণদেবতার তাণ্ডবলীলার সময় লেপ মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিল তাদের যোগ্য কণ্ঠাভরণ লৌহশৃঙ্খল। বসন্তোৎসবের ফুলের মালা তাদের জন্য নয়।

আমি যে ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে বসন্তোৎসবের চিহ্নমাত্র ছিল না। চারিদিকে একটা বিরাট আত্ম-প্রসাদের হাওয়া। কোন রকমের হালকাপণা সে হাওয়ার সঙ্গে খাপ খেত না। লোকে হাসত মুখ টিপে টিপে, নাচত পা ঘসে ঘসে, চলত গজেন্দ্রগমনে। ইংরেজ তখন তার অগাধ ঐশ্বর্য্য নিয়ে, বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে মশগুল। কিসে টাকার থলী আরও ভারী হবে, কিসে রাজ্য আরও বিস্তৃত হবে এই তার ধ্যান। এই যুগের সম্বন্ধেই এক রসিক ফরাসী লেখক ব'লে গেছেন, ইংরেজ-বাপ তার ছেলেকে সংসারযুদ্ধে পাঠাবার সময় আশীর্ব্বাদ করে, "বাপু যাও, টাকা রোজগার কর গিয়ে। পারত সৎপথে থেকে রোজগার কোরো। কিন্তু মনে রেখো, টাকা আনাই চাই।"

মোটের উপর ইংরেজের তখন একটা খুব হামবড়া ভাব। তা, হওয়ার কারণও ছিল। তাদের Free trade (অবাধ বাণিজ্য), Constitutional monarchy (নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র), Public school (ইটন, হ্যারো প্রভৃতি), Varsity (অক্সফোর্ড প্রভৃতি প্রাচীন বিদ্যাপীঠ) জগতের আদর্শ। তাদের বিশাল সাম্রাজ্য কেমন সুশৃঙ্খলায় চলছে। বিদেশীরা দেখুক, শিখুক। যুদ্ধবিগ্রহ অনেকদিন হয় নেই, কিন্তু তাতে কি এসে যায়, ইংলণ্ড সদাই প্রস্তুত! সেই সময়কার একটা গান মনে পড়ছে। কুলী মজুরেও রাস্তায় গাইত।

> "We dont want to fight
> But, by Jingo, if we do,
> We have got the ships,
> We have got the men,
> We have got the money too."

বড়াই শুনে অদৃষ্ট-দেবতা হয়ত অলক্ষ্যে আকাশের কোণে ব'সে হাসছিলেন। তার পর ক'টা বছরই বা গেছে! এত সাধের Free trade, Constitutional Monarchy, Eton, Harrow, Oxford, Cambridge, আর জগতের চোখে ধাঁধাঁ লাগাতে পারছে না। রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি এখন জগৎকে শিখতে হচ্ছে টিউটন, লাটীন ও স্লাভ জাতের

কাছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর পারের দুই জাতের হাতে। তারপর, জগৎজোড়া একটা বৃহত্তর ব্রিটেন গ'ড়ে তোলবার প্রচেষ্টা, তাও আজ জেনিভার আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মহান আদর্শের পাশে একটা অতি ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পন্থা ব'লে ধরা পড়ে গেছে। যাকগে, এ সব পুরানো কথা নয়, অতএব আমার অধিকারের বহির্ভূত।

চৌধুরী মহাশয়কে পাওয়া পেয়ে আমার একটা মস্ত সুবিধা হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে ইংলণ্ডে যেতে হল না। প্রায় হপ্তাখানেক ধ'রে মার্সেই ও পারিস দেখে গেলাম। আমি অজ-নেটীব ঘরের ছেলে, সাহেবী কায়দা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কলকাতায় শেষ কদিন ইংরেজ দরজী, ইংরেজ মুচী ও ইংরেজ নাপিতে মিলে আমাকে কোন রকমে সাহেব সাজিয়ে দিয়েছিল। কাজেই বড় বড় হোটেলে বাধ-বাধ ঠেকত বইকি! তবে মুরুব্বী সঙ্গে। ছোট বড় সমস্যাগুলো তিনিই মিটিয়ে দিতেন।

ডুমাসের Monte Cristo বইখানা আমার বড় ভাল লাগত। দেশে অনেকবার প'ড়ে এসেছিলাম। মার্সেই ঘুরে ঘুরে ঐ কেতাবের জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে লাগলাম। আর কিছু দেখতে পেয়েছিলাম কিনা মনে নেই। কিন্তু মার্সেইয়ের জাহাজঘাটা, আর বন্দরের মুখে শাতো দিফের কেল্লা দেখে বড় ফূর্তি হয়েছিল। আনন্দের আতিশয্যে ফরাসী ভাষায় একখানা Monte Cristo অনেক দাম দিয়ে কিনে ফেলেছিলাম। মার্সেইয়ের আর একটা romance আমার মনে গাঁথা ছিল। আমার মাষ্টার ফোশার সাহেব ফরাসী প্রথম ভাগ শেষ করেই আমাকে যত্ন ক'রে La Marseillaise পড়িয়েছিলেন আর এই গান রচনার গল্প বলেছিলেন। যারা এই সহরে এক শতাব্দী আগে প্রথম মার্সেইয়েজ গেয়েছিল, তাদের কথা বারবার মনে পড়তে লাগল যখন পারিসমুখো রওয়ানা হলাম। মনে সুরটা বাজছে। সেই "Allons, enfants de la Patrie"—(স্বদেশ সন্তান চল সবে আজি বিজয়ের অভিযানে)-র তালে আমিও আজ পারিস চলেছি। স্বপ্ন কি সুন্দর জিনিষ!

পারিস পৌঁছে এক মস্ত হোটেলে আমরা উঠলাম। হোটেলটা দেখলাম ইংরেজে ভরা। তাদের অনেকে আবার ভারত-ফেরৎ সাহেব মেম। এ বেচারারা আমাদিগকে যে খুব স্নেহ আদরের চোখে দেখছিল, তা বোধ হোল না। তবে তারা নিজেরাই বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। একদিকে চৌধুরী সাহেব বৈঠকী মানুষ, খুব জমিয়ে নিয়েছিলেন সকলের সঙ্গে। তার উপর আবার তাঁর পরিচিত এক ইংরেজ-পরিবার সেখানে ছিলেন তাঁরা সর্ব্বদা আমাদের নিয়েই থাকতেন। এই দলে দুটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সকলের নজর তাদের দিকে, কিন্তু তারা কারও দিকে ফিরে চাইত না। আমার হাতে এক আংটী ছিল। তার উপর লেখা, "Pensez a moi, মনে রেখো।" এক সুন্দরী সেই আংটী নিয়ে আমাকে ক্রমাগত জ্বালাতন করতে লাগলেন, "কে দিয়েছে, বলুন।" শেষ আমি বুঝিয়ে দিলাম যে ওটা আমার রক্ষা কবচ, পরা থাকলে দেবতা বিশেষের বাণ আমার গায়ে লাগবে না। সুন্দরীরা বললেন যে সব চেয়ে ভাল হয় আমার কপালের উপর একটা লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখলে, তাহলে কেউ কাছে ঘেঁসবে না। "কোন গুণ নাই তার, কপালে আগুন।" এঁরা আনকোরা এসিয়াটিক ছেলে এই প্রথম দেখলেন। নূতন জীবটির আশা করি দুই একটা গুণও দেখেছিলেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করার সাহস হয় নেই।

পারিসের দ্রষ্টব্য জিনিষ চৌধুরী সাহেব সবই দেখালেন। কিন্তু আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল Place de la Bastille। অত্যাচারী বুর্বঁ রাজার সেই বিশাল দুর্গের একখানা পাথরও আজ দাঁড়িয়ে নেই। চৌমাথার উপর ভুঁইয়ে শুধু গোটা কয়েক দাগ আছে। লোকে বলে ঐ দাগের উপর দুর্গের দেওয়াল ছিল। প্রজারা ক্ষেপে উঠে হাতের নখ দিয়ে একখানা একখানা ক'রে দেওয়ালের পাথর ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ভেরসাই লুভরের রাজবাড়ীও দেখলাম। এই দুই বাড়ীতে আমি পরে এতকাল কাটিয়েছি যে এদের কথা আর একবার ভাল ক'রে বলব। আমার অভিভাবক আমাকে নিয়ে একটু বিব্রত হয়েছিলেন, বোধ হয়। কোথায় পারিসের শোভা দেখে মশগুল হয়ে বেড়াব, না যত সেকালের

ভূত প্রেতকে নিয়ে টানাটানি করছি। নিজেরও লজ্জা বোধ হত। কিন্তু কি করব, পারিস ও ফ্রান্স সম্বন্ধে নানা রকম romantic সংস্কার নিয়ে ইউরোপে এসেছিলাম।

দিন চারেক বাদ লণ্ডন পৌঁছলাম। ষ্টেশনে ডাক্তার সিংহ নিতে এসেছিলেন। তাঁর হাতে আমায় তুলে দিয়ে চৌধুরী সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ী গেলেন। লণ্ডন ভাল লাগল না। বাড়ীগুলো মনে হল যেন ইংরেজ-চরিত্রেরই অনুরূপ, খুব বড়, ভারী, মজবুত, কিন্তু একেবারে সৌন্দর্য্য-বিহীন, একটুও চটক কি জলুস নেই। তার উপর আবার এপ্রেল মাস। ঝির ঝির ক'রে কেবল বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় কাদা। চারিদিক কেমন অন্ধকার মতন, নিরানন্দ। দু চারদিন থাকার পর সূর্য্যের মুখও দেখলাম, Albert Memorial-এর মত সুন্দর বাড়ীও এক আধটা নজরে পড়ল। কিন্তু চার বছরেও কিছুতেই লণ্ডনকে একটু ভালবাসতে পারলাম না। একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন সব সময় এই সহরের মুখটাকে বিকৃত ক'রে রেখেছে। হয় ত পারিস আগে দেখে এসেছিলাম ব'লেই এটা এমন ক'রে মনে ব'সে গেল।

সিংহ সাহেব আমাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন আমার লণ্ডনের অভিভাবকের বাড়ীতে। তাঁদের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। তাঁরা বিলেতফেরৎ সমাজের লোক। কিন্তু আমাকে এমন আদর যত্ন করলেন যেন আমি তাঁদের চিরদিনের চেনা মানুষ। আমার তখন নূতনের নেশা অনেকটা কেটে গেছে, বাড়ীর জন্য ভয়ানক মন কেমন করছে। মাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে এসেছি সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এ সময় মিসেস্ পালিতের মাতৃস্নেহ না পেলে কি হত বলতে পারি না। হয়ত ভারত সরকার একজন অতিযোগ্য সিবিলিয়ান হারাতেন।

বিলেতে এসে আমার একটা মস্ত লাভ হল। আস্তে আস্তে কূপমণ্ডূক ভাবটা কেটে গেল। প্রথম, আমাদের বাঙ্গালী-সাহেব সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। তাঁরাও যে আমাদেরই মত বাঙ্গালী, ইংরেজী কাপড় পরলেও, ইংরেজীতে কথা কইলেও অন্তরে বাঙ্গালী, এটা বুঝতে পারলাম। তখনকার দিনে বিলেতে সবশুদ্ধ চারশো ভারতীয় লোকের বাস ছিল। তার ভেতরে

অতি অল্পসংখ্যক লোক বিলেতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছলেন। বাকী সবাই আমাদের মত কাজ উপলক্ষে এসেছিলেন, কাজ হলেই বাড়ী ফিরে যাবেন। এই চারশোর মধ্যে দেড়শো বাঙ্গালী, দেড়শো পারসী আর বাকী একশো অন্য সব জাত মিলিয়ে। মহিলারা অধিকাংশ ইংরেজী ঘাঘরা পরতেন। বিলেতে শাড়ী প'রে বেড়ান তখনও রেওয়াজ হয় নেই। কিন্তু এই গাউন-পরা ইংরেজীভাষী মহিলারা আমাদের ছেলেছোকরার দলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেন, ঠিক দেশের সেকেলে গিন্নীদের মতন। সেই নিঃশব্দে একশো দেড়শো সিঙ্গাড়া কচুরী ভাজা, সেই প্রসন্ন হাসি সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে, বিদায়ের সময় সেই সাদর নিমন্ত্রণ, "আবার কবে আসবে সব?" এঁদের জন্যই ত বিদেশকে বিদেশ ব'লে মনে হত না। বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালীর মাঝে তখনও দুর্ভেদ্য প্রাচীর ওঠে নেই। পঞ্জাব-ক্লাব, মাদ্রাজ-ক্লাব, ইত্যাদিও গজায় নেই। কোন কোন পারসী একটু দূরে দূরে থাকতেন বটে, তা নইলে সকলের মধ্যে বেশ একটা আত্মীয়তা ছিল। Superiority complex যে মোটে ছিল না, তা নয়। বাঙ্গালীদের বুদ্ধির ও সাহেবিয়ানার বড়াই, আর পারসীদের রঙ্গের বড়াই কতকটা ছিল বই কি! সময় সময় "মেড়ো, মেড়ো" শুনে কান ঝালপালাও হয়ে যেত। তবু মোটের উপর বলা যেতে পারে ভেদবুদ্ধি তখনও প্রবল হয় নেই। এমন কি আঞ্জুমান-ই-ইসলামও জাতীয় আদর্শ একেবারে ছাড়ে নেই। অনেকেই নেশনেল লিবারেল ক্লাবে যেতেন। তাঁরা যে খুব প্রখর লিবারেল ছিলেন ব'লে এটা করতেন তা বলা যায় না। ক্লাবটা মোটামুটি সস্তা ছিল; আর সেখানে প্রবেশ-লাভ করাও খুব কঠিন ছিল না। আমার মুরুব্বী লোকেন পালিত মহাশয় ঐখানেই সন্ধ্যাবেলাটা কাটাতেন। আমাকেও দুচার বার বিলিয়ার্ড খেলতে নিয়ে গেছলেন। তবে আমার অত সাহেবসুবো পোষাল না ব'লে নাম লেখালাম না।

আমার কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন যে আমি গণিতের বিখ্যাত অধ্যাপক এডওয়ার্ড্‌সের বাড়ীতে থাকব। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত আমায় নিতে পারলেন না। তাই পালিত সাহেব আমার কলেজে থাকারই ব্যবস্থা করলেন। এর পর থেকে কিছুদিন কলেজের কর্ত্তা রেন্‌ সাহেব আমার

অভিভাবক হলেন। তিনি আমাদের খুব কড়া রাশে চালাতেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁকেও ঝেড়ে ফেলে দিলাম। সে পরের কথা। ইতিমধ্যে আমার বোর্ডার-জীবনের দুই একটা গল্প বলি।

তখনকার দিনে ভারতীয় ছাত্রেরা অর্দ্ধেক থাকত আমাদের Bayswater অঞ্চলে, আর অর্দ্ধেক থাকত গাওয়ার ষ্ট্রীটের দিকে। রেনের কলেজটা পাশাপাশি তিনখানা বাড়ী জুড়ে ছিল। সাহেব নিজে পঙ্গু ছিলেন, নড়াচড়া করতে পারতেন না। তাঁর স্ত্রী পরিবার সকাল সন্ধ্যা আমাদের সঙ্গে খেতেন। টিফিনে আসতেন না। দুচার জন বাহিরের ছেলেও আমাদের সঙ্গে টিফিন খেত। রেন পরিবারের একজনের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সে তাঁর মেয়ে Dolly; ডলী বাপের সেক্রেটারী ছিল, আপিসের কাজকর্ম্ম সব ক'রে দিত। কর্ত্তাকে আমাদের কিছু বলবার কইবার থাকলে তাকেই মুরুব্বী পাকড়াতাম। সে হাসমুখী সুন্দরী ছিল, সবাই তাকে ভালবাসত। রেন সাহেব নিজেও খুব ভাল লোক ছিলেন। মন বড় সাদা ছিল। কিন্তু বৃদ্ধের গলা কর্কশ আর কথাবার্ত্তা বড় রূঢ় ছিল। আমাদের মাঝে মাঝে হুজুরে ডাক পড়ত, যেতেও হত, কিন্তু আগ্রহ কারও ছিল না। যে দোর দিয়ে আমরা আপিসে ঢুকতাম সেটা সাহেবের চৌকীর পেছনে ছিল, দোরে টোকা মারলেই যে "Come in" জবাবটা পাওয়া যেত সেটা ঠিক পিস্তলের-আওয়াজের মত। কিন্তু ভেতরে যেতেই আগে নজরে পড়ত সেক্রেটারী সুন্দরীর মুখ। সে একটু হেসে, দরকার হলে চোখ টিপে, আসামীকে আশ্বস্ত করত। তারপর কথাবার্ত্তা কতকটা এই রকম চলত। "ডলী, কে এসেছে?" "মিষ্টার অমুক এসেছেন বাবা।" "সামনে এস। গুড মর্ণিং। দেখি, তোমায় কেন ডেকেছিলাম।" "বোধ হয় ইতিহাসের পরীক্ষার কথা ব'লবে বলে।" "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্, ডলী। মনে পড়েছে। তুমি ইতিহাসে মন্দ কর নেই, প্রায় সত্তর নম্বর পেয়েছ। তাই বলে যেন আবার মাথায় হাওয়া ভ'রে না ওঠে। আমি নজর রাখব, বুঝলে? বেশ ক'রে পড়াশুনো কোরো।"

একদিন হল কি, আমার ডাক পড়াতে আমি গেলাম সাহেবের কাছে। ভেতরে ঢুকে দেখি ডলী নেই। অকূল সমুদ্রে পড়লাম। আস্তে আস্তে

সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে ডেকেছিলেন, মহাশয় ?" "হ্যাঁ, ডেকেছিলাম বইকি। এই নাও।" ব'লে একখানা নিজের ফোটো আমার পানে ছুঁড়ে দিলেন। আমি ছবিখানা হাতে নিয়ে দেখছি, সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "দেখ বাপু, নিতে ইচ্ছে হয় ত নাও। নইলে ফিরিয়ে দাও।" এর আমি কি জবাব দেব ? আস্তে আস্তে বললাম, "আমাকে এটা দিন। বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব।" "না, না, তাঁকে আমি পাঠিয়েছি। ওটা তোমার। নিতে চাও ত ?" আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম, তিনি সেটা ধ'রে খুব ঝাঁকানি দিলেন। ভদ্রলোকের জোয়ান বয়সে নিশ্চয় খুব জোর ছিল। সাহেব আমাকে সত্যি একটু ভালবাসতেন। তবে তিনি যাদু, বাছা বল্‌তে জানতেন না। আর একটা গল্প বলি ওঁর। মাস দুই পরে আমি খবর পেলাম যে আমার মা মারা গেছেন। বিদেশে বিভূঁইয়ে এ রকম খবর পাওয়া কি ভয়ানক তা সবাই বুঝবেন। তার উপর আরও মন খারাপ হল এই ভেবে যে, সামান্য যে অশৌচ পালন, সেটাও করতে পারব না। ভেবে চিন্তে কদিন শুধু রুটি মাখন খেয়ে রইলাম। মনকে বোঝালাম, যতটুকু পারা যায় সেই ভাল। কলেজে কাউকে কিছু বললাম না। পরের মেলে রেণ সাহেব বাবার চিঠি পেয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই খুব কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "আমায় বল নেই কেন ? আমাকে সব কথা জানান তোমার কর্ত্তব্য, তা জান না ? এখানে তোমার জন্য ত আমি দায়ী।" আমি চুপ ক'রে রইলাম। সাহেব ধমকে উঠলেন, "তুমি নিতান্ত বুদ্ধিহীন। এই ঠাণ্ডা দেশে নিরামিষ খাওয়া চলবে না। শরীরের পক্ষে খারাপ।" আমি ধীরে ধীরে বললাম, "আর তিনদিন মাত্র বাকী, মহাশয়। এর মধ্যে আর মাংস খেতে বলবেন না।" সাহেব আমার পিঠে হাত রেখে ভারী গলায় বললেন, "It is hard lines on you, boy।" ব'লে চশমা মুছতে মুছতে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। পরের তিন দিন আমার জন্য অজস্র দামী ফল ও ক্রীম এল। বুঝলাম কার হুকুমে এসেছে।

পাঠককে ত আগেই জানিয়েছি আমার পল্‌টনে কাজ করার কি রকম সাধ ছিল। বিলেত পৌঁছানর কিছুদিন পরেই সব কাগজে বের হল যে

ব্রেজিলের সুরেশ বাবু মারা গেছেন। ও দিক ত বন্ধ হল। এখন কি করা যায়? একদিন কপাল ঠুকে রেন সাহেবকে আমার দুঃখের কথা জানালাম। তিনি বললেন, "তাতে কি হয়েছে? তুমি army পরীক্ষা দাও। তাহলে আমাদের ফৌজেই চাকরী পাবে। আমি আজই ব্যবস্থা করছি।" আমার প্রাণে আশা হল। কিন্তু আশায় ছাই পড়তেও দেরী হল না। সাতদিন পরে রেন সাহেব আমাকে ডেকে, অনেক দুঃখ করে দরদ দেখিয়ে বললেন, তোমার হুকুম এসেছে। তুমি Army পরীক্ষায় বসতে পার। কিন্তু first (সকলের উপর) হলেও জঙ্গী কলেজে ঢুকতে পাবে না। তোমার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।" তারপর একটু গরম হয়ে উঠলেন, "এসব ঐ হতভাগা Toryদের চালাকী। ওদের মত সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে কি আর এত বড় বাদশাহী চালান যায়।" বলতে ভুলে গেছি যে রেন একজন গোঁড়া Radical ছিলেন। ব্রেজিল গেল, স্যাণ্ডহর্স্ট গেল, এখন আমি করি কি? দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। ভলান্টিয়ার হওয়া যাক। কিন্তু সে পথেও দেখলাম অনেক বাধা। আমার স্যাণ্ডহর্স্ট যাওয়ার চেষ্টাতে লোকেন বাবু সায় দেন নাই। কিন্তু ভলান্টিয়ারী করার বিষয়ে তাঁর খুব উৎসাহ দেখলাম। তিনি নিজেও আমার সঙ্গে বন্দুক কাঁধে করবেন বললেন। অনেক খোজ খবর নিয়ে Honourable Artillery Company বলে এক নামজাদা অভিজাত পলটনে নাম দাখিল করার জন্য দরখাস্ত করা হল। স্বয়ং যুবরাজ এই পল্‌টনের কর্ণেল আর এদের উর্দ্দী অতি চমৎকার। আমাদের দরখাস্ত গ্রাহ্য হল। লোকেন বাবু রীতিমত গোলন্দাজ হয়ে গেলেন, কিন্তু আমার কিছুই হল না। তিন কেতা উর্দ্দীর দাম ও চাঁদা বাবদ প্রায় দেড়শো পাউণ্ড চেয়ে বসল। অত টাকা আমি কোথায় পাব? বাড়ীতে চেয়ে পাঠালাম কিন্তু গরীবের দুঃখ কেউ বুঝলেন না। আমার যুদ্ধ করা হয়ে গেল। ভাল মানুষের মত ব্যারিষ্টারী আড্‌ডায় নাম লেখালাম।

নাম লেখালাম বটে, কিন্তু প্রাণপণে বিদ্যাচর্চ্চা করতে লেগে গেলাম বললে মিথ্যা কথা হবে। আমার এত রকম ধান্দা ছিল যে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য খুব বেশী সময় পেতাম না। সে সব কথা ক্রমশঃ জাহির করব।

আপাততঃ অন্য একটা গল্প করি। সে সময়কার আবহাওয়া সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে। কলেজে আমার ম্যাক্ বলে এক বন্ধু ছিল। সে এবার্ডীন হতে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, পাশ ক'রে এসেছিল। ধার্ম্মিক প্রকৃতির মানুষ, প্রাণে রস-কস বিন্দুমাত্র ছিল না। একদিন ম্যাকের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। ভদ্রপল্লী ছেড়ে Portobello Road বলে এক বস্তীর মত মহল্লায় গিয়ে পড়েছি। সেখানে কুলীমজুরের বাস। সন্ধ্যা হয়ে আসছে তারা সব মেয়ে ছেলে নিয়ে ফুটপাথে পায়চারী করছে। নানা রকমের ফেরীওয়ালা চারিদিকে ভিড় ক'রে রয়েছে। আমার কাছে এ-পাড়াটা একেবারে নূতন, তাই ঘুরে ফিরে সব দেখছি। এমন সময় একটু দূরে একটা "shame, shame!" রব উঠল। চেয়ে দেখি একটি ভদ্র-লোকের মেয়ে, বছর পঁচিশেক বয়স হবে, নিকার-বকার পেণ্টুলেন প'রে বাইসিকেল চ'ড়ে যাচ্ছে, আর দুধারি লোক তাকে দুয়ো দিচ্চে। ম্যাকও দেখলে। দেখে ঘৃণাভরে ব'লে উঠল, "shameless hussy, বেহায়া ছুঁড়ী!" মেয়েটি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এই ছোট-লোকের ভিড় থেকে। ম্যাকের স্কচ্ রক্ত গরম হয়ে উঠল, আমাকে বললে, "come, let us hoot her, mon—এস, ওকে খুব দুয়ো দেওয়া যাক।" ব'লে খুব উৎসাহে হাততালি দিয়ে উঠল। আমি তাকে জোরে এক হেঁচকা মেরে টেনে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরলাম। পথে তাকে বললাম, "ম্যাক্, তুই ভদ্রঘরের ছেলে, ধার্ম্মিক লোক, একি ব্যবহার তোর?" মেয়েটার উপর ম্যাকের রাগ তখনও যায় নেই। সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই সব নির্লজ্জ ছুঁড়ীদের প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মই বা থাকবে কোথায়, ভদ্রঘরই বা থাকবে কি ক'রে? ভেবে দেখ, এরাই ভবিষ্যৎ বৃটনের মাতৃকুল!" এই রকম কত কি বক্তৃতা করলে। আমি নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। দেশ ছেড়ে এসেছি বটে, কিন্তু পবিত্র সনাতনী ভাব এখানেও ধাওয়া করেছে। বাস্তবিক, ইংলণ্ডের লোকের মনে তখনকার দিনে একটা মস্ত সমস্যা ছিল যে স্ত্রীলোকের ঘাঘরা কত লম্বা হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে অনেক গান ছড়া মনে আসছে, বাহুল্য ভয়ে পাঠককে উপহার দিতে পারছি না। বেচারা ম্যাক্ এখনও বেঁচে আছে কিনা জানি না। থাকে ত তার মেয়েদের আজানুলম্বিত গাউন

দেখে কত না মনে কষ্ট পাচ্চে। তারপর ভেবে দেখুন, আমাদের কালে বিলেতে মেয়ে পুরুষ এক ঘাটে কখনও স্নান করত না। যারা খুব রসিক পুরুষ, তারা তাই স্নান করতে Trouville যেত। আজ সে সব গোলযোগ নেই। ম্যাকের মেয়েরা হয়ত স্নানের পোষাক প'রে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বালির উপর টিফিন খাচ্চে। একটা কথা বলি—কেউ রাগ করবেন না। উনিশ শতকের ইংরেজ মেয়েরা কাপড় পড়ত অঙ্গ, শুধু অঙ্গ নয় অঙ্গের গড়ন পর্য্যন্ত ঢাকবার জন্য। সে বিছাটা তারা খুব রপ্ত করেছিল। সেই গোড়ালী পর্য্যন্ত লম্বা বেঢপ ঘাঘরা, আর গায়ে একটা ততোধিক বেঢপ লম্বা কোট, এ পড়লে সব মেয়ে মানুষকেই Mrs Grundy-র মতন দেখাত। আর আজ, আমাদের এই সভ্য ভব্য Grundy মেম সাহেবটি গেলেন কোথায়? না, তিনিও খাটো চুল কেটে খাটো পোষাক প'রে অঙ্গের অনুপম গঠন দেখাবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেড়াচ্চেন?

আমাদের কলেজে কড়া নিয়ম ছিল, রাত নটার ভেতর বাড়ী ফিরতে হবে। নটার সময় রোজ ভেতর থেকে দোরে খিল পড়ত। কেউ ঘণ্টা বাজালে, বুড়ো খানসামা হোপ দোর খুলে দিত। দিয়ে গম্ভীরভাবে বলত, "মশায়, কাল আপনার নামে রিপোর্ট করা আমার কর্ত্তব্য, তা আপনি জানেন।" অধিকাংশ সময় কিন্তু রিপোর্ট করাটা হয়ে উঠত না। হোপ বুড়োর এই থেকে একটা বাঁধা আয় ছিল। তবু মাঝে মাঝে সে বেঁকে দাঁড়াত, আর অধর্ম্ম করবে না। তখন কিছুদিন আমাদের গবাক্ষপথে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হত। হোপ লোকটা বড় ভাল ছিল। দিনের বেলায় খুব গম্ভীর গজেন্দ্র গমনে চলাফেরা করত। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় যখন দোর খুলে দিতে আসত: তখন মুখে বেশ একটা রঙ্গীন ভাব দেখা যেত। এমন কি, কখন কখন দাঁড়িয়ে দু পাঁচ মিনিট হালকা খোসগল্পও করত। আগেই বলেছি Wren গিন্নী আমাদের সঙ্গে টিফিন খেতেন না। টিফিন ব্যাপারটার অধ্যক্ষ ছিল মিষ্টার হোপ। তার "Luncheon is on the table, young gentleman" বলার কায়দা কি! আমরাও যথাসম্ভব তার মর্য্যাদা রক্ষা করতাম। টেবিলে বেশী গোলমাল করতাম না। কিন্তু একবার হল কি, দিন কয়েক ধ'রে বড় খারাপ মাংস টিফিনের টেবিলে

আসতে আরম্ভ হল। হোপকে বারবার বলেও কোন ফল হল না। তখন একদিন আমাদের দলের চাঁই M. তার মাংসের প্লেটটা তুলে নিয়ে জানালা পর্য্যন্ত কাওয়াজ ক'রে, "Here goes", ব'লে বাহিরে ফেলে দিলে ছুঁড়ে। আমরা বাকী সবাই দাঁড়িয়ে উঠলাম, হুররে, ব'লে! হোপের মুখে কথা সরল না। দুবার তিনবার Sir, Sir, ক'রে বুড়ো বেচারা কেঁদে ফেললে। কত বড় বড় ঘরে কাজ করেছে সে। এ রকম অপমান তার স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু জগতের গতিই ত এই। অত্যাচার-অবিচার তিলে তিলে জ'মে যখন একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভব্যতার মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে দাঁড়ায় প্রতিবিধানের জন্য। M.এর অসমসাহসিক কাজের ফলে কেলেঙ্কার হল অশেষ রকমের। প্রথম, আমাদের সবাইকে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে টিফিন খেতে হল বাহিরে। দ্বিতীয়, হোপ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এক চিঠি লিখলে মনিবকে। তৃতীয়, চায়ের পর আমাদের সবায়ের ডাক পড়ল বড় সাহেবের কামরায়। রোষ্ট মাংসের চাঙ্গড়াটা আনা হল সেইখানে। M. রেন সাহেবকে সেটা দেখিয়ে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা করলে। বক্তৃতার শেষ বাক্য, "The article is more useful as a geological specimen than as human food." সাহেব কোন রকমে হাসি থামিয়ে বললেন, "Shut up. Go away, you greedy fellows." এর পর থেকে কিন্তু টিফিনে মাংস খুব ভাল আসতে লাগল। আমরা চাঁদা করে হোপকে এক গিনি বকশীশ করাতে সে ইস্তফা পত্র ফিরিয়ে নিলে। গোল মিটে গেল, তবে Wren গিন্নী দিন দুই তিন খুব মুখভার ক'রে রইলেন। ডলী আমাদের খুব ধমকালে, "তোমরা মাকে না বলে হোপের উপর জুলুম করতে গেলে কেন? M ছোকরাটা বড় জ্যাঠা ছিল—সে বলে উঠল, "সুন্দরী, তোমার চরণে আমরা সবাই হেঁট মাথা হয়ে মাপ চাচ্ছি।" অনেক বছর পরে এই M-কে বেঁটে মোটা, গালফুলো, কমিশনার সাহেবরূপে দেখে সমস্ত গল্পটা মনে পড়ে গেছল। অনেক কষ্টে হাসি চেপেছিলাম।

আমি লণ্ডনে গিয়েই কলেজে বোর্ডার হয়ে গেলাম ব'লে স্বদেশী বন্ধুবান্ধব হতে একটু দেরী হল। পালিত, চৌধুরী, সিংহ সাহেব প্রভৃতি

বয়স্থ লোকের সঙ্গে প্রথমেই আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদের কাছে বেশী ঘেঁসতে সঙ্কোচ হত। অবশ্য মিসেস পালিতের কাছে লুচী পোলাও খেতে সময় পেলেই দৌড়তাম। আমার এক বাল্যবন্ধু শীল মেডা ভেলে এক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা ধর্ম্মে ক্যাথলিক ছিলেন আর ইউরোপের অন্যান্য ক্যাথলিক জাতের মত খুব মিশুক ছিলেন। তাঁদের বাড়ী বহুকাল পর্য্যন্ত ফি শনিবারেই যেতাম। গেলে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতাম। গিন্নী প্রথম দিনই ব'লে দিয়েছিলেন, "এ তোমার বন্ধুর বাড়ী। এখানে ঘরের ছেলের মত যাওয়া আসা করবে।" এক রকম ঘরের ছেলের মতনই হয়ে গেছলাম। এঁদের বাড়ীতে বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল, আর বেশ একটি বাগান ছিল। কাজেই সময় সহজেই কেটে যেত। অন্য পাঁচজন ভদ্রলোকের যাওয়া আসাও ছিল। কখন কখন বাগানে চা-পার্টি হত। এখানে নিয়মিত এসে ইংরেজ ভদ্রসমাজে মেশা অভ্যাস হয়ে গেল। নইলে প্রথম প্রথম লজ্জা করত বই কি! আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর মুস্কিলই ত ছিল ঐখানে। অনেকে Miss Manningএর বিখ্যাত N. I. A.'র সান্ধ্য সম্মিলনীতে যেত। সেখানে যত হোমরা চোমরা ভারত ফেরত ইংরেজ জমা হতেন আর প্রাণ ভ'রে তাদের পিঠ চাপড়াতেন। বন্ধু শীলের বাড়ীতে সুবিধা এই ছিল যে কালা আদমী বলে কেউ হেনস্তাও করত না, পিঠও চাপড়াত না।

অল্পদিনের মধ্যে Summer (গ্রীষ্ম) এল। এই Summer-ই এদের যথার্থ মধুঋতু। Spring-এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর। আকাশ পরিষ্কার। চারিদিকে যেন ফুলের মেলা লেগেছে। পার্কে, বাগানে, সর্ব্বত্র দলে দলে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলের মুখে হাসি। দীর্ঘ বেলা, সাড়ে আটটা নটা পর্য্যন্ত বাহিরে আলো। দৈনিক কাজ কর্ম্ম সেরে মানুষ অনেকক্ষণ আমোদ আহ্লাদ ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারে। এই তিনমাসের ইংরেজ, আর বাকী ন মাসের ইংরেজে অনেক তফাৎ। তবে এ সব সেকালের কথা। তখনও ইংরেজী সমাজ neurosis-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নেই। তখন এদের ধাত ছিল phlegmatic (কফপ্রধান)। বায়ুর প্রকোপ ছিল না।

আমাদের কলেজ তিন হপ্তার জন্য বন্ধ হল। আমি পাড়া গেঁয়ে ছেলে। বিলেতের পাড়াগাঁ দেখার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছিলাম। রেন সাহেব আমাকে ব্যবস্থা ক'রে পাঠিয়ে দিলেন টেম্‌স্ পারে গোরিং ব'লে এক গ্রামে। সেখানে পেনী নামে এক farmer (কৃষক) ছিল। সে গোঁড়া লিবারেল ছিল তাই রেন তাকে বড় শ্রদ্ধা করতেন। তার বাড়ী তিন হপ্তা থাকব ঠিক হল। আমার বিলেত সম্বন্ধে জ্ঞান এত কম ছিল যে ফার্ষ্ট কেলাসের টিকিট কিনে রওয়ানা হলাম। ঐ পথেই উইণ্ডসারের রাজবাড়ী। কাজেই গার্ড সাহেব ধ'রে নিলেন যে আমি সাম্রাজ্ঞী সন্দর্শনে যাচ্ছি। আমি বুঝিয়ে বললাম কোথায় যাচ্ছি। তবু সেলামের ঠেলায় অস্থির হয়ে উঠতে হল আর বকশীশ বাবৎ মব্‌লক পয়সা বেরিয়ে গেল। গোরিং ষ্টেশন পৌঁছতেই গার্ড স্বয়ং জিনিষ পত্র নামিয়ে দিয়ে ষ্টেশন-বাবুকে ব'লে দিলে, "ইনি পেনীর ফার্মে (খামারে) যাবেন। গাড়ী ডাকিয়ে পাঠিয়ে দিন।" গাড়ী কোথায় পাবে রেচারা! ট্রেন বেরিয়ে গেলে বললে, "আপনি একটু বসুন, আমি ফার্ম থেকে গাড়ী আনাচ্ছি।" এমন সময় আমি দেখলাম যে এক টাকমাথা টুকটুকে লাল মুখ, সাদা দাড়ী, গোঁপ কামান, বুড়ো দাঁড়িয়ে রয়েছে টিকিট ঘরের কাছে। আমাদের হোপের মত দেখতে, শুধু পোষাক আলাদা। পায়ে গেটার, গায়ে চৌখুপী কম্বুলে কাপড়ের লম্বা কোট, টুপীটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ফার্মার পেনী, না? গুড মর্ণিং, আমি এসেছি।" বুড়ো আমার হাতটাকে খুব নাড়া দিয়ে বললে, "আপনি মিষ্টার রেনের বিদেশী বন্ধু, না? আসতে আজ্ঞা হোক।" মুটের মাথায় জিনিষ তুলে দিয়ে চললাম ফার্মের পথে।

ফার্ম দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এর নাম চাষার খামার বাড়ী! ফটক থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত লাল কাঁকরের রাস্তা, দুধারে আপেল বাগান। বাড়ীটি ঝকঝকে নূতন, পেনী নিজে মজুর লাগিয়ে তৈরী করেছে। হলে ঢুকেই ডান দিকে আমার বসবার ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাবুলোকের ব্যবহারের উপযোগী আসবাব পত্র দিয়ে সাজান। বাঁ দিকে রান্নাঘর। পেনী-পরিবার সেইখানে খাওয়া দাওয়া করে। রান্নার চুলো, বাসন-

কোসন, টেবিল-তাক, সব তকতক করছে। আমাদের হিঁদু বাড়ীর রান্নাঘরও এককালে এই রকম ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল। এখন আর নেই। সে কথা যাক। পেনীর রান্নাঘরের অধিষ্ঠাত্রী বেরিয়ে এলেন মেয়েদুটিকে নিয়ে। তিনজনেই অতিথিকে খাতির করবার জন্য পরিষ্কার ছিটের গাউন প'রে রয়েছেন। গিন্নী আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, "আপনি আসবেন শুনে আমাদের বড় আনন্দ হয়েছিল। আমরা কখনও বিদেশী ভদ্রলোক দেখি নেই। যা দরকার, চেয়ে চিন্তে নেবেন।" মেয়েরা বললে, "আপনার জন্য আমরা কেক তৈরী করছিলাম। আপনি কেক খান ত?" দেখলাম এরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে আমি সাধারণ ইংরেজ ছেলের মতই খাই দাই থাকি। যতটা পারি অভয় দিলাম। আমার শোবার ঘর দোতলায়। সে ঘরেরও সাজসজ্জা দেখলাম সাদা-সিধে কিন্তু পরিষ্কার। তারপর মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে সমস্ত ফার্ম দেখে এলাম। তখন ক্ষেতে কিছু শস্য ছিল না বটে, কিন্তু ফলবাগান ফলে ভরা। বড় বড় গরু রয়েছে গোয়ালে। অজস্র হাঁস মুরগী পেরু। কিন্তু সব চেয়ে তোয়াজ দেখলাম শূয়োরের। সে শূয়োরের সঙ্গে আমাদের দেশের ঐ নামের নোঙ্গরা জন্তুগুলোর তুলনাই হয় না। এদের শূয়োর-গুলো যেন মোটা মোটা প্রকাণ্ড খরগোস। নানারকম রঙ্গের, আর কি পরিষ্কার! আমাদের গরুর গাও এত পরিষ্কার নয়। ব'সে ব'সে বিট, গাজর, শালগম, এই সব খাচ্ছে। মেয়েরা বড়াই ক'রে বললে, "আমাদের ফার্মের হ্যাম বেকন খেয়ে দেখবেন। এ রকম লণ্ডনেও পাওয়া যায় না।" সব ঘুরে ফিরে এসে সেদিন পেনীগিন্নীর কাছে চা খেলাম। মা মেয়েরা তিনজনেই চমৎকার সরল, যেমন চাষার মেয়ে সব দেশেই হয়। চকোলেট কেকটা সাদা সিধে কিন্তু সুন্দর লাগল। Home-made কেকের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। সন্ধ্যার সময় পেনীর ছেলে এল। সে বিয়ে-থা ক'রে গাঁয়ে মুদীর দোকান করেছে। দোকান-ঘরের দোতলায় থাকে। বাপ মার সঙ্গে খুব ভাব। তবু আলাদা থাকে কেন তখন বুঝতে পারি নেই। ক্রমশঃ জানলাম এই ও দেশের প্রথা। প্রথাটা নিতান্ত মন্দ নয়। গোরিং গাঁটি খুব ছোট। তবে ইস্কুল আছে, গির্জ্জা আছে, ডাকঘর

আছে। ডাকঘরের আলাদা বাড়ী নেই। এক মেঠাইয়ের দোকানে ডাক-আফিস, আর সেই দোকানওয়ালী ডাক-মাষ্টার।

পরদিন আমার এক বন্ধু লণ্ডন থেকে এলেন। দুজনে গ্রামে গিয়ে ক্রিকেট খেলার বন্দোবস্ত করে এলাম। চারিদিকের ফার্মের মজুর ছোকরারা গাঁয়ের গোচারণ মাঠের এক কোণে খেলত। তাদের খেলার সরঞ্জাম একটু মেঠো রকমের ছিল। আমরা এই ছোকরাদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়ে রেডিং থেকে নূতন জিনিস পত্র আনালাম। যতদিন ছিলাম এদের সঙ্গে প্রায় রোজ খেলতাম। খেলার প্রয়োজনও যথেষ্ট ছিল। ফার্মের তৈরী হ্যাম বেকন, তাজা ডিম, তাজা মাখন ক্রিম, সামনে পেয়ে লোভ সংবরণ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই একটু ব্যায়াম না হলে চলে কি ক'রে! আমরা ডাকঘর থেকে এক এক ঠোঙ্গা মেঠাই কিনে রোজ গ্রাম প্রদক্ষিণ করতাম, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করার জন্য। দু'চার দিনেই তাদের সঙ্গে খুব আলাপ জমে গেল। আর এক নিয়ম আমরা করেছিলাম। গ্রামের থেকে কাউকে না কাউকে রোজ ডিনার খেতে বলতাম। স্ত্রীলোক কেউ এলে মিসেস পেনীও বসতেন। কিন্তু প্রধানতঃ পুরুষরাই আসত। এই রকমে চাষা, কারিগর, দোকানদার সকলের সঙ্গেই কতকটা ঘনিষ্ঠতা হল। একদিন আমাদের ফার্মার পেনীও খেলেন। এমনি ত আমরা প্রায়ই রান্নাঘরে টিফিন খেতাম। তখন পেনীরা নিত্যকার পোষাকেই বসতেন। কিন্তু মিঃ পেনী যেদিন খানা খেতে এলেন সেদিন লম্বা কালো কোট, শক্ত খাড়া কলার, কালো বার্ণিসকরা জুতো এই সব পরেছিলেন। বোধ হয় ভদ্রলোকের বিয়ের সময়কার কাপড়, গায়ে বড্ড আঁট হয়ে বসেছিল। নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছিল। কেন না, খাওয়ার পর ঝাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে কাপড় বদলে রোজকার Corduroy পরে এসে, তবে সুস্থির হয়ে পাইপ ধরিয়ে বসলেন। গল্প করতে করতে যখন শুনলেন যে আমি বাঙ্গালী হিন্দু, তখন বললেন, "তাহলে ত আপনার একটা জিনিষ দেখা উচিত। এখান থেকে পাঁচ কোশ দূরে এক বড় ইঁদারা আছে। তার নাম Rajah's Well। বাঙ্গালা দেশের রাজা সেই ইঁদারা ক'রে দিয়েছেন।" আমরা বললাম, "চলুন না কাল যাওয়া যাক সেখানে।"

পরদিন গেলাম সেই কুয়ো দেখতে। পেনী গিন্নী নোনা শূকর মাংস, রুটি, মাখন, পনীর, বেঁধে দিলেন সঙ্গে। ফার্মার বলেছিল পাঁচ কোশ পথ। কিন্তু বার তের মাইলের এক হাত কম হবে না। চাষাদের কোশ-জ্ঞান দেখছি সব দেশেই এক রকম। যাইহোক, বুড়ো চলল কিন্তু সমানে আমাদের সঙ্গে। বেলা বারটায় আমাদের গন্তব্য গ্রামে পৌঁছলাম। খোঁজ নিয়ে কুয়োর কাছে গেলাম। দেখি সে এক বিরাট ব্যাপার। চূড়োওয়ালা সুন্দর হাওয়া-খানা। তার ভেতর বসবার বেঞ্চিপাতা। মাঝখানে এক গভীর ইঁদারা। শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে যে কাশীনরেশ ঈশ্বরীপ্রসাদ এই ইঁদারা বেঁধে দিয়েছেন। চৌকীদার এলে তার কাছ থেকে এক ছোট বই ও গোটাকয়েক মেডেল কিনলাম। বই থেকে ইতিহাস জানা গেল। এই গ্রামের এক সাহেব সিপাহীবিদ্রোহের সময় মহারাজের কিছু উপকার করেছিলেন। মহারাজ পুরস্কার দিতে গেলেন কিন্তু ভদ্রলোক নিলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর এতদূর রাজী হলেন যে পরে তাঁর কিছু অভাব হলে জানাবেন। কিছুকাল পরে নিজ গ্রামে ফিরে ভদ্রলোক দেখলেন যে সেখানে বড় জলকষ্ট। মহারাজকে জানালেন। তিনি অনেক খরচ পত্র ক'রে, তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, এই ইঁদারা ক'রে দিলেন। আমরা বেঞ্চে ব'সে ভোজন সেরে নিলাম। জল বড় মিষ্টি লাগল। লাগারই কথা। ও জলের সঙ্গে যে ভারতের হৃদয়ের যোগ আছে!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

ইতিহাস

(৩)

আমি ইতিপূর্ব্বে বরাবর 'শ্রেণী-বিরোধ' কথাটি ব্যবহার করেছি। এই অধ্যায়ে আমি 'শ্রেণী'র তাৎপর্য্য বোঝাতে চেষ্টা করব। ন্যায়-শাস্ত্রের সংজ্ঞাস্থাপন এক্ষেত্রে অসম্ভব; কারণ ইতিহাসের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা এবং অন্য প্রত্যয় থেকে শ্রেণী-প্রত্যয়কে বিযুক্ত করা যায় না। ইতিহাসের সংজ্ঞা ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা নয়। ইতিহাসের প্রত্যয় কর্ম্মের পন্থা নির্দ্দেশ করে।

সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেই প্রত্যয়ের আবশ্যক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি ছিন্নভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হয়, একের সঙ্গে অন্যের যোগ হয়ত থাকে না, থাকলেও সে যোগটি পরিষ্কার নয়। জ্ঞানের দিক থেকে অথচ অভিজ্ঞতা-গুলিকে যুক্তভাবে দেখবার একটা তাগিদ থাকে। প্রত্যয়ের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হয়। একবার গ্রথিত ও সমন্বিত হলে সেই প্রত্যয়েরই সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত ও নূতনতর হয়। প্রত্যয়ের সাহায্যে সেই প্রকারের অভিজ্ঞতার গভীরতর সমালোচনা সম্ভব হয়। এই উপায়ে একজনের জ্ঞান সর্ব্বসাধারণে ভোগ করতে পারে। প্রত্যয় হল সমন্বয়-জ্ঞানের ভাষা, এবং ভাষার ওপর কারুর একচেটিয়া অধিকার নেই। প্রত্যয়ের অন্য প্রকৃতি হল বেষ্টনীর সঙ্গে জ্ঞানীর ও পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের সমাযোগ-সাধন। জ্ঞানীর ও জ্ঞানের মধ্যে চিরকালই যে বৈরীভাব থাকে তা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু জোর করে বলবার দরকার রয়েছে যে বৈরীভাব না দূর করলে জ্ঞানবৃদ্ধিও হয়না, জ্ঞানীও সে জ্ঞানের সাহায্যে সম্পূর্ণ হন না, শান্তিও পান না। একমাত্র প্রত্যয়ের দ্বারাই বৈরীভাব দূরিত হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি ও সম্পূর্ণতা-স্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে। অভিযোজন-কার্য্যের ফলে পূর্ব্বদৃষ্টি আসে। পূর্ব্বাবোধের সাহায্যে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে সজ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যদি বিশদ-জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে প্রত্যয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি কোন জ্ঞানই কখনও পাবে না।

ইতিহাসও পাবে না। ব্যক্তির দিক থেকে বলা চলে যে ইতিহাসের ব্যাপকতর প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত, বর্ত্তমান, এমন কি ভবিষ্যৎ

অভিজ্ঞতা সুব্যবস্থিত হয়ে ব্যক্তিকে সুসম্পূর্ণ করে। এই হিসাবেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি প্রকৃত দর্শন। কোন জ্ঞানকে বিজ্ঞানের স্তরে তুলতে গেলে প্রত্যয়ের প্রয়োজন আরো বেশী করে অনুভব করতে হয়, এমন কি গোটাকয়েক নতুন রকমের প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের আলোচ্য-জ্ঞান হল ইতিহাস, যার বিষয় হল সামাজিক অভিজ্ঞতার ধারা। সে ধারার রীতিনীতি আছেই আছে, কেননা অভিজ্ঞতা একপক্ষে মানুষেরই, এবং মানুষের কার্য্যাবলী পূরোপূরি এলোমেলো কি অগোছাল নয়। অন্যপক্ষে বহিঃপ্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাত রয়েছে। বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে বহিঃপ্রকৃতির নিয়মাবলী মানব-প্রকৃতির নিয়মাবলী অপেক্ষা সুসম্বদ্ধ ও সুনির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ ইতিহাসের বিষয়-বস্তুর উপাদানগুলির একাংশ অন্যাংশের চেয়ে বিজ্ঞানাধীন। বহিঃপ্রকৃতির কোন বিশেষ ঘটনাকে ঘটনা-পারম্পর্য্য থেকে যূথভ্রষ্ট করা চলে, নিরালম্ব করা যায়, করলে বৈজ্ঞানিকের কোন সামাজিক ক্ষতি হয় না; কিন্তু মানবপ্রকৃতির বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাকে ধারাবাহিকতা থেকে মুক্ত করা চলেই না, কারণ এই ধারাবাহিকতা যান্ত্রিক অনুক্রম নয়, পূর্ব্ব ও পরের অন্বয়; এবং বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সামাজিক ক্ষতি হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই দুই কারণে বাইরের ঘটনাকে পরীক্ষাগারে পুনর্গঠিত করা চলে, এবং অন্তরের ঘটনা-সমাবেশ নিরুপম থেকেই যায়। (অবশ্য সবই আপেক্ষিকভাবে।) সংখ্যা শ্রেণীর একটি সাধারণ গুণ, এবং তার অন্য সাধারণ গুণ সম্ভব হয় একটি বিশেষ গুণের পুনরাবৃত্তির দরুণ। (এখানে শ্রেণী অর্থে অঙ্কশাস্ত্রের 'ক্লাশ' বলছি।) অতএব পদার্থ-বিজ্ঞান অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মাধীন, এবং অধীন হয়েই সার্থক, মনোবিজ্ঞান কিংবা সমাজতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে অধীন হতে পারেনা। অধীন হতে পারে সংখ্যা-শাস্ত্রের (Statistics), কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের (Mathematics) অধীনে এলে সার্থক হয় না। পূর্ব্বোক্ত দুই বিদ্যার মধ্যে পার্থক্যটুকু সকলেরই বিদিত।

ইতিহাসের মতন কোন মানুষ-সংক্রান্ত সামাজিকতত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের মতন বহিঃপ্রকৃতি-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের রূপ কখনও নিতে পারবে কিংবা নেওয়া উচিত এসব বিষয়ে বেশীদূর তর্ক চলতে পারে না। কারণ যে

উপায় অবলম্বন করলে তর্কের সিদ্ধান্ত হয় সেই উপায়টিই বর্ত্তমানে ন্যায়ের বিচারাধীন। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক সমাজের নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও যখন নানা দোষ থেকেই যাবে, তখন পূরোপূরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে সমাজতত্ত্ব হয়ত অচিরেই পদার্থ-বিজ্ঞানের কোঠায় উঠবে, তবু তার সাহায্যে সমাজের ভবিষ্যৎ প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহজনক। বিজ্ঞানসম্মত সমাজ হয়ত এমন হবে যেখানে ব্যক্তি কিংবা অন্য অ-বৈজ্ঞানিক শক্তির দ্বারা নবতর সমাজের পুনর্গঠন একান্ত অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। এপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী না করাই ভাল। আমার বক্তব্য গোড়াতেই বলে রাখচি—সমাজের আংশিকভাবে সত্য নিয়মগুলিকে (ঘটনার সাধারণ অভিমুখিনতা কিংবা ঝোঁকগুলিকে) পূর্ণতর সত্যে পরিণত করতে গেলে আপাতত যে উপায়ে বিজ্ঞানের ব্যাপকতর সত্যের সন্ধান মিলেছে সেই উপায় অবলম্বন করাই ভাল। উপায়টি হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেটি নির্ভুল না হলেও নিতান্তই উপকারী। এবং জ্ঞানের দিক থেকে দেখলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইতিহাস হল প্রত্যয়ের ইতিহাস। তাই বলে ইতিহাস পদার্থ-বিজ্ঞান নয়, physico-chemical পদ্ধতিও একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়, এবং পদার্থ কিংবা রসায়নবিদ্যার প্রত্যয় ও ইতিহাসের প্রত্যয় এক জিনিষ নয়।

পদার্থ-বিজ্ঞানকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিনিধি হিসেবে ধরছি। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও ইতিহাসের প্রকৃতির পার্থক্যটুকু স্বীকার না করে উপায় নেই। আমার মতে তিনটি মূলগত পার্থক্য আছে। (১) পদার্থ-বিজ্ঞান দেশ ও বিশেষত কাল-নির্দ্দেশ থেকে মুক্ত—অণুর গঠন ভারতবর্ষেও যা, হলাণ্ডেও তাই, আবার আজও যা বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও তাই ছিল, এবং আজ হতে শতবর্ষ পরেও তাই থাকবে, পরিবর্ত্তনটি মতের মাত্র; কিন্তু ইতিহাস দেশ ও কাল-নির্দ্দিষ্ট। অবশ্য দেশ ও কাল-নির্দ্দেশ নিয়তির নির্দ্দেশ নয়, নিয়মাধীন। (২) পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়গুলি (data) কিংবা দত্তি সকল প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ-লব্ধ, তার প্রতিপাদন পরীক্ষিত ও সর্ব্বদাই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যক্ষের সঙ্গেই পদার্থ-বিজ্ঞানের কারবার। ইতিহাসে নির্দ্দিষ্টের সংখ্যা নিতান্তই কম। যে সব ঘটনা ঘটেছে তারই পুরাতন কিংবা সমসাময়িক বিবৃতি,

পুঁথি, শিলালিপি প্রভৃতি থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে হয়। শুধু এই চিহ্নগুলিকেই প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা চলতে পারে, ঐতিহাসিকের বাকী কাজ অপ্রত্যক্ষভাবে পুনরুদ্ধার; অনেকটা জুরী কিংবা ডিটেকটিভের মতন। ইতিহাসের প্রণালী হল প্রধানত অবরোহী। ঐতিহাসিকের জানা নেই কোন ঘটনা সত্য, কোনটি অসত্য, কোনটি অতিরঞ্জিত; সত্য ঘটনা তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়। (এখানে পুরাতন ঘটনার বৃত্তান্ত ও পারম্পর্য্যের বিবৃতি অর্থে ইতিহাস কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে।) All facts are born free and equal বলা চলে না, কারণ শৃঙ্খলা ও শিকলের গুরুত্ব এক নয়। বরঞ্চ, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যে সব দেশ ও কাল-নির্দ্দিষ্ট ঘটনা জানা যায় সেই সব ঘটনাকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে ঐতিহাসিকের জ্ঞান অ-প্রত্যক্ষ ও অবরোহী। (৩) পদার্থ-বিজ্ঞানে যতটুকু অবরোহ-প্রণালী বা বিলোম ব্যবহৃত হয় সেটি শুদ্ধ, অর্থাৎ তার মধ্যে নতুন কোন ঘটনা প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, অবান্তর নামে তাকে বহিষ্কৃত করা হয়। ইতিহাসে তা চলে না, ইতিহাসে রবাহূতের সংখ্যা কম নয়, এবং তাদেরকে অন্তত মৌখিক অভ্যর্থনা করতেই হয়। সেইজন্য ইতিহাসের অবরোহ-প্রণালী অ-শুদ্ধ। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ রয়েছে তার মধ্যে মানুষের প্রবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্দেশ্য প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াকে ধারণ করতে হবে। বহিঃ-প্রকৃতিতে যে সব আকস্মিক ঘটনা ঘটে তার প্রভাবকেও অবহেলা করলে চলবে না। ইতিহাসে আকস্মিকের স্থান আছে, যেমন জীবের অভিব্যক্তি-বাদে mutation,—সে স্থান কতটুকু কিংবা কতখানি বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। তবে আকস্মিককে স্বীকার করলে অবরোহ-প্রণালী বিশুদ্ধ থাকে না, এই তথ্য জানলে ইতিহাস ও পদার্থ-বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি ও প্রণালী-গত পার্থক্য বোঝা যাবে।

পূর্ব্বোক্ত কারণে ইতিহাসের প্রত্যয় পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত মুক্ত, নিরালম্ব, বিষয়বস্তু থেকে নিষ্কর্ষিত হলেও অ-সংশ্লিষ্ট। সেগুলি একটি মনঃকল্পিত জগতের অশরীরী অধিবাসী। তারা যেন কোন বড় সাজ-পোষাকের

দোকানের ম্যানিকিন-প্যারেড, জনসাধারণ কাচের বাইরে রাস্তা থেকে তাদের দেখছে, বিস্মিত হচ্ছে, ঈর্ষান্বিত হচ্ছে। ব্র্যাড্‌লীর অতুলনীয় ভাষায়, তারা রঙ্গমঞ্চের রক্তহীন নর্ত্তকীর দল। কিন্তু ইতিহাসের প্রত্যয়গুলি রক্ত-মাংসের। তারা মূর্ত্ত, সংহত, দেশ ও কালনির্দ্দিষ্ট ব্যবহার থেকে অ-মুক্ত। প্রত্যয় মাত্রই মনঃকল্পিত, তবু যেন ঐতিহাসিক প্রত্যয়গুলি এই ব্যবহারিক জগতেরই অধিবাসী। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ যেন আরো ঘনিষ্ঠ, মধ্যে যেন বিশেষ ব্যবধান নেই। সামাজিক ব্যবহারের অভিব্যক্তি থাকার দরুণ ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের বিষয়-সন্নিবেশ সুদীর্ঘকালের মধ্যে ব্যাপ্ত, পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় সর্ব্বদাই কালাতীত। প্রাকৃতিক ঘটনাকে পরীক্ষাগারে এনে সহজ করা চলে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা পরীক্ষাগারে আনা যায় না, তারা জটিল ও বিচিত্র থেকেই যায়; সেইজন্য পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যয় বর্জ্জন করতে করতে তৈরী হয়, অর্থাৎ নৈতিবিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু ইতিহাসের বিষয়কে অ-প্রত্যক্ষভাবে জানা গেলেও ঐতিহাসিক প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ-জ্ঞানলব্ধ, বর্জ্জন করলে তার অস্তিত্ব ভিন্নপ্রকৃতির হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাকে না। অনেকটা সহযোগ ও অ-সহযোগনীতির মতন। ঐতিহাসিক প্রত্যয় আরো গতিশীল, ও কর্ম্ম-নিয়ামক। পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যয় সম্বন্ধে সচেতন হলে প্রকৃতির ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয় না, কিংবা প্রকৃতিকে ভিন্ন পথে চালিত করা যায় না, শুধু বিজ্ঞানই অগ্রসর হয়, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের সাহায্যে, অর্থাৎ তার সম্বন্ধে সচেতন হলে সামাজিক প্রগতি ও পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুবৃত্তি গড্ডলিকা প্রবাহের মতন, পদার্থ-বিজ্ঞানের অনুবৃত্তি পর পর, চলচ্চিত্রে ফিল্মের ফোটোর মতনই। ইতিহাসের অতীত বর্ত্তমানে জাগ্রত হয় এবং ভবিষ্যতের আভাস দেয়, বরফের গোলার মত বড় হতে হতে চলে, পরের মধ্যে পূর্ব্ব অন্তত আংশিকভাবে অনুবিষ্ট হয়। এইজন্য ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের মধ্যে মূল্যাবধারণ থাকেই থাকে, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যয়ের মধ্যে থাকলেই সর্ব্বনাশ। অবশ্য এইসব পার্থক্য আপেক্ষিক। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্য কমে আসবেই আসবে, কিন্তু মূল্যজ্ঞান ও মূল্যবিচারকে একেবারে বর্জ্জন করতে ঐতিহাসিক

কখনও পারবেন কিনা জানিনা। কারণ পদার্থ-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মানুষ হলেও তাঁর বিষয় মানুষ নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক ডিটেকটিভ কিংবা জুরী হলেও মানুষ এবং তাঁর বিষয়ও মানুষ। এক্ষেত্রে মূল্য-বর্জ্জন ঐতিহাসিকের পক্ষে নিতান্তই কষ্টসাধ্য। মানুষ হয়ত অন্য মানুষকে যন্ত্র কিংবা সংখ্যায় পরিণত করতে চায়, কিন্তু নিজে হতে আপত্তি করে। অবশ্য যদি মূল্য-জ্ঞান খাঁটি সত্য ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে ঐতিহাসিককে অন্য বৈজ্ঞানিকের মতন পূরোপূরি নির্ম্মমভাবে নৈর্ব্যক্তিক না হলেও চলবে, তাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি লাঞ্ছিত হবে না। বিজ্ঞানের আদৎ কথা সত্যপ্রিয়তা, সেটা ঠিক্ মূল্যজ্ঞানের প্রতিকূল নয়।

শ্রেণী ও বিরোধ পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক প্রত্যয়। বিরোধ সম্বন্ধে পরে লিখব। শ্রেণী বল্লেই দুটি মানসিক অবস্থা সূচিত হয়। (১) শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের মধ্যে একতা ও সাম্যভাব। সমভাব ও একতার জন্য সীমার মধ্যে সহানুভূতি জন্মায়; তাকে consciousness of kind-এর পরিবর্ত্তে feeling of kind বলা চলে; কারণ সচেতন অবস্থা সব সময় থাকে না, পরে আসে। (২) যারা অন্য শ্রেণীর জীব তাদের সম্বন্ধে নিজেদের উচ্চ কিংবা নিম্নশ্রেণীর জীব বলে স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ধারণা। এই ভাবগুলি বহুভাবের সমষ্টি, কারণ উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর একটি দুটি নয়, সমাজ বহুশ্রেণীতে বিভক্ত; অথচ প্রত্যেক শ্রেণী কোন না কোন স্থানে অন্য শ্রেণীকে স্পর্শ করেই আছে। ভাবগুলি নির্ভর করে শিক্ষা দীক্ষা, জীবন-যাত্রার উপায়, পরস্পরের আলাপ-পরিচয়, দূর কিংবা নিকট সম্বন্ধের ওপর, নানারকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অ-সমতার ওপর। এই হল মরিস্ গীনস্‌বার্গের মতে শ্রেণীর অর্থ। তাঁর মতে, শ্রেণীর সংজ্ঞার জন্য কোন উদ্দেশ্য কিংবা স্বার্থ প্রতিপন্ন করবার প্রয়োজন নেই, কারণ খুব কম শ্রেণীই সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সম্বন্ধে সজ্ঞান। বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যা সমাজতত্ত্বের বেলা সঙ্গত হলেও আমরা যেভাবে ইতিহাসকে বুঝতে চেষ্টা করছি সেভাবে অর্থ বহন করে না। "আমরা একদলের" মনোভাবটি ইতিহাসের অন্য ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; সেটি প্রধানত আর্থিক ব্যবহারের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট; সজ্ঞান কিংবা অজ্ঞান অবস্থার ওপর তার

মৌলিক অস্তিত্ব নির্ভর না করলেও চেতনার ওপর তার পরিপুষ্টি ও সার্থকতা নির্ভর করে। যখন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য উৎপাদনের অধিকারকে কেন্দ্র ক'রে কোন লোকসমষ্টি তৈরী করে তখনই শ্রেণীর উৎপত্তি। উৎপাদন অতি পুরাতন, শ্রেণীও অতি পুরাতন; উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও অধিকার বদলাচ্ছে, শ্রেণীর রূপ বদলাচ্ছে; কিন্তু শ্রেণীও থাকছে, যেমন উৎপাদন ও অধিকার থাকছে। এক শ্রেণীর সীমা-নির্ণয় হয় অন্যান্য স্বার্থ-গণ্ডীর দ্বারা। তারা সর্ব্বদাই বাধা দিতে থাকে, কারণ উৎপাদন-শক্তি একই সমাজে এককালে এত প্রচুর নয় যে সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিভক্ত হয়ে সব দলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। কখনই করতে পারেনা, যতক্ষণ সমগ্র সমাজে সম্পত্তিগত সম্বন্ধ রাষ্ট্রের দ্বারা পরিষ্কারভাবে স্থিরীকৃত, এবং সম্পত্তি জনসাধারণের বদলে ব্যক্তির দ্বারাই অধিকৃত, অর্থাৎ যতক্ষণ অধিকার ভেদ থাকে। তা ছাড়া, সব শ্রেণীর মধ্যে যন্ত্র আবিষ্কার করার উপযুক্ত জ্ঞান এবং অন্যের আবিষ্কারকে অনুকরণ করে উৎপাদন শক্তিকে বৃদ্ধি করার সুযোগও সমান নয়। সেইজন্য শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের বীজ থাকবেই থাকবে। বিরোধ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীও আরো দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। বিরোধের তাৎপর্য্যই হল উৎপাদন শক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তার, অর্থাৎ অন্য শ্রেণীর ওপর প্রভুত্ব-স্থাপন। ব্যক্তিগতভাবে প্রভুত্ব-স্থাপনের অর্থ নেতৃত্ব; কিন্তু তার আদিতে জীবগত পার্থক্য থাকলেও তার অন্তত নিত্যতা ও চিরস্থায়িত্বের জন্য আর্থিক বৈষম্যই দায়ী। প্রভু নিজের পদত্যাগে সর্ব্বদাই অনিচ্ছুক, সেইজন্য প্রভুত্বরক্ষার অনিবার্য্য-পদ্ধতি অনৌদার্য্য ও 'জবরদস্তী'। তা ছাড়া সর্ব্বপ্রকার আধিপত্যের মধ্যে লাভের আশা রয়েইছে। মুনাফার আশাই শ্রেণীকে চালিত করে। শ্রেণী সেই জন্য কখনই লোকাশ্রেয়কে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মঙ্গল আংশিক। আদৎ কথা এই যে, সামাজিক অভিব্যক্তি ও সমসাময়িক ব্যবহারের মধ্যে বিরোধ ও সন্ধি, প্রভুত্ব ও দাসত্ব, লাভ ও ক্ষতি, সামাজিক কল্যাণ ও শ্রেণীর স্বার্থ এই চিরন্তন বিপরীত প্রবাহ ঐতিহাসিককে লক্ষ্য করতে হবে। শ্রেণী প্রত্যয়টি এই বিপরীত প্রবাহের বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের মধ্যে বিরোধ সূচিত হচ্ছে বটে, কিন্তু বিরোধ প্রত্যয়টি অনেকের মতে আরো ব্যাপক। বিরোধ

বিশ্বেরই নিয়ম, সে নিয়মের মানবিক প্রকাশ যখন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে হয় তখন সেই বিরোধের আশ্রয়কে শ্রেণী, এবং সেই বিরোধকে শ্রেণী-বিরোধ বলা চলে। আমার মতে শ্রেণী ও বিরোধ সম্পূর্ণ পৃথক প্রত্যয় নয়।

একাধিক পণ্ডিতের মতে শ্রেণী-প্রত্যয়ের কোন সার্থকতা নেই, কারণ সেটিকে জাতিভেদের জাতি (caste), ব্যবসায়ের বৃত্তি (vocation, কিংবা profession) ও শিল্পজীবিকা (craft) থেকে পৃথক করা যায় না। এই মতকে গ্রাহ্য করতে আমি অনিচ্ছুক, কারণ শ্রেণীর পূর্ব্বোক্ত অর্থে তাকে অতি সহজেই পৃথক করা চলে। সমাজে একাধিক শ্রেণী আছে, তারা পরস্পর মিশে আছে—এবং ব্যক্তি একাধিক জনমণ্ডলীর আশ্রয়ভুক্ত, এ দুটি আপত্তি নয়, প্রত্যয় স্থাপনের বিপত্তি মাত্র। জাতিভেদের জাতি জন্মগত-সংস্কার, এতদিন তার মূল্য ধর্ম্মের দ্বারা নিরূপিত হয়ে এসেছে। শ্রেণীর সংজ্ঞায় ধর্ম্মসংস্কারের স্থান নেই, থাকলেও প্রলেপের মতন। সুপ্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত কিংবা জাতিভেদ সমর্থিত না হলেও, সংখ্যার দিক থেকে বলা চলে যে সমাজের মধ্যে গুণগত বিভাগ আছে। অবশ্য ইতিহাসের ও বর্ত্তমান সমাজের শ্রেণী এবং গুণগত সাংখ্যিক বিভাগ এক নয়। যাদুবিদ্যা ছাড়া অন্য কোন বিদ্যার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বুদ্ধিতে ও চরিত্রে স্বভাবতই সব চেয়ে উঁচুস্তরের এবং শূদ্রেরা সবচেয়ে নীচুস্তরের। বিদেশী সমাজে যেখানে শ্রেণী পুরাতন হয়ে জাতির সংস্কার গ্রহণ করছে সেখানেও ঐকথা খাটে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের জাতি ধর্ম্মের প্রত্যয় মাত্র, জাতিগত অধিকারের মধ্যে আর্থিক স্বার্থের ও আধি-ভৌতিকের প্রভাব থাকলেও সে অধিকার আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের আবরণে প্রচ্ছন্ন। জাতির প্রকৃতি হল পারমার্থিকের সাহায্যে কিংবা আশ্রয়ে সমাজের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করা। অথচ বাইরে থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সেই স্থান ও মর্য্যাদা আপনা হতেই স্থির হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, আপনা হতে কিছুই স্থির হয় না। যে শক্তি সামাজিক অবস্থান নির্দ্দেশ করে সে হল উৎপাদন-নামক সামাজিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, উৎপাদক-জনসমূহের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য জন-সমূহের সম্বন্ধ, অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকার ও অর্থ-রোজগারের ব্যবস্থা।

ধর্ম্ম-সংস্কার ও অভ্যাসের দ্বারা এই শক্তির প্রকাশ ও পরিণতি ব্যাহত হয়, ইতিহাসের প্রকৃতি ঢাকা পড়ে। শ্রেণীপ্রত্যয়ের দ্বারাই সে শক্তির পূর্ণ-পরিণতি সম্ভব হয়, অর্থাৎ ইতিহাসের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়।

বৃত্তি অনেক প্রকারের। শিল্পবৃত্তি, (craft) ব্যবসা-বৃত্তি, (vocation) এবং profession, যেমন ডাক্তারী, ওকালতী, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি। আমাদের পুরাতন ইতিহাসে শ্রেণী ও গণ আছে; প্রথমটি হল সম-ব্যবসায়ীর দল, দ্বিতীয়টি হল এমন দলের বৃত্তি যাতে একাধিক ব্যবসায়ীর সাহায্য নিতে হয়। এখন তাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। ইন্দোর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে খুঁজলে তাদের সন্ধান মেলে, কিন্তু তাদের মূল শুকিয়ে গিয়েছে। আমরা যে অর্থে শ্রেণী বলছি তার সঙ্গে সে সব শ্রেণীর মূলগত কোন যোগ নেই। তারা এতদিন সংস্কারের পরগাছায় আচ্ছন্ন থেকেও বেঁচে ছিল, পরগাছা সরিয়ে নেবার পর দেখা গেল যে তারা মরে গিয়েছে। সংস্কার-পুষ্ট জাতির আদিতে একপ্রকার উৎপাদন-শক্তি কাজ করত; শ্রমবিভাগ, যোগ্যতা, ও শিক্ষা-নবীশীর সুবিধা অনুসারে সে শক্তি বিভক্ত হয়ে বৃত্তির সৃষ্টি করেছিল; একজাতি অন্য একাধিক জাতিতে বিভক্ত ও একাধিক জাতি একটি জাতিতে পরিণত হওয়ার মধ্যেও সে শক্তি কাজ করে এসেছে। আজকাল যে শক্তির দ্বারা জাতিবিভাগ কিংবা জাতিগঠন হচ্ছে তার পরিচয় অর্থনীতিতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ধর্ম্মসংস্কারের ইতিহাসে, কিংবা রাজনৈতিক লাভের লোভে। কিন্তু আদৎ ব্যাপারটি অন্যরূপ, যদিও রূপ এখনও প্রকট হয়নি। আজ ব্রিটিশ অধিরাজ্যের আশীর্ব্বাদে ভারতবর্ষের অন্ততঃ পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনের রীতিনীতি বদলেছে। সমাজ সেই নতুন শক্তি ধারণ করতে পারছে না, পুরানো বোতল যেমন নতুন মদ ধারণ করতে পারে না। তাই সমাজে বিপ্লব এসেছে, সেই আধার ও আধেয়র মধ্যে বিরোধের ফলে সত্যকারের শ্রেণী তৈরী হবার সুযোগ তৈরী হচ্ছে। এখনও নতুন শ্রেণী তৈরী হয়ত হয়নি, কেননা এই বিরোধটি প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নয়, গৃহ-বিবাদ মাত্র, তাই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দেখছি। নতুন শ্রেণী যদি হয়েও থাকে তবুও সে শ্রেণী ইতিহাসের পটে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন নয়। নট এসে হাজির হয়নি, দর্শকবৃন্দের মধ্যে

একজনকে ধরে ক'রে নামান গেল, তিনিও নটযশপ্রার্থী অথচ শঙ্কিতচিত্ত, আশ্বাস দেওয়া গেল উৎকৃষ্ট স্মারক আছেন; কিন্তু প্রম্পটিংএর জোরে কতদূর চলে? বিশেষতঃ যখন প্রতিপক্ষের নিজের কথাই মনে নেই। এ অবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, তাই একটু ভুলচুক হতেই হবে। এখন আমার বক্তব্য এই যে, কি হিন্দু কি য়ুরোপীয় সমাজে (চীনদেশেও) জাতি, কারুশ্রেণী ও সমবৃত্তিধারী জনসঙ্ঘের ব্যবস্থান নিরূপিত হত উৎপাদনের রীতি নীতির দ্বারা। কৃষিপ্রধান সমাজে কারুশিল্প প্রস্তুত হত সৌখীন সম্প্রদায়ের ভোগতৃপ্তির জন্য, কর্ষণ-বৃত্তির অতিরিক্ত কাজ হিসেবে। চাহিদা না এলে উৎপাদনই হত না। তখন এক জমীদার-সম্প্রদায়ই নিজেদের অস্তিত্ব, কর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরাই হলেন তখনকার একমাত্র শ্রেণী, আমাদের অর্থে। এখন কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়া উল্‌টে গিয়েছে, (যদিও সম্পত্তির প্রকৃতি ও রূপ একই রয়েছে)। শিল্পীর সংখ্যা আর মুষ্টিমেয় নেই, সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের পুরাতন গুণ লুপ্ত হয়েছে। তারা ছিল শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ, যত লোক বাড়ল, ততই শিল্প-জ্ঞানের বদলে শুধু শ্রম করবার দৈহিক শক্তি ও বিশেষ জ্ঞানের বদলে সাধারণ-বুদ্ধি ও তৎপরতার আবশ্যক হল। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রমিকের বৃত্তি স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে, অন্যবৃত্তির ওপর নির্ভর করছে না, কেননা কৃষি-কার্য্যে মুনাফা কম, কুটীরশিল্পও নষ্ট হয়েছে। চাহিদা আছে কি নেই শ্রমিক-শ্রেণীকে বুঝতে হয় না, তাদের কর্ত্তব্য শুধু খাটা, সবই বোঝেন তাঁদের প্রভুরা, তাও হিসাবে গোলমাল হয়, ফলে অতিরিক্ত উৎপাদনই হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যক্ষ চাহিদা এখন কলের, কল চালিয়ে রাখতেই হবে, কল বন্ধ হলেই সর্ব্বনাশ হবে। কলই এখন শ্রমিকের প্রভু। তাছাড়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তির শ্রম ছিল হাতের, শিল্প ছিল প্রথা-সঙ্গত; প্রথার পরিবর্ত্তন কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা হতে পারত না, সামান্য যে একটু আধটু পরিবর্ত্তন হত তা হাতে কাজ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তারই দ্বারা, ধীরে, অতিধীরে, সংস্কারকে খাতির করে। এখন বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে প্রত্যহই নতুন কল তৈরী হচ্ছে, শ্রমিকও শিল্পীর অভিজ্ঞতার মূল্য কমে আসছে, সে অভিজ্ঞতা বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার কোন সুযোগ নেই—শ্রমবিভাগ

আরো বিভক্ত ও বিশেষ হচ্ছে। শ্রমিকদল বিজ্ঞান জানেনা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তারা করতে পারেনা, তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই। প্রভু-শ্রেণীর ধারণা এই যে শ্রমিকেরা শুধু শ্রম করতেই জানে, বিজ্ঞানশিক্ষার উপযুক্ত নয় তারা। প্রমাণও মিলছে বড় বড় অধ্যাপকের বইতে; সুপ্রজনন বিদ্যাই নাকি তাই বলছে! উচ্চশিক্ষায় খরচও অত্যধিক, সব উচ্চবিদ্যালয়ও প্রোফেশনালদের হাতে, সে বিদ্যালয়ের টাকাকড়িও দিয়েছেন বড়লোকেরা, জমীদার ও কলের মালিকরা। অতএব তাঁদের সন্তানরাই বৈজ্ঞানিক হবেন, বড় বড় প্রোফেশনে যোগ দেবেন।

এ বিবরণ আজকালকার অবস্থার। ইতিমধ্যে অতি গোপনে একটি নতুন শ্রেণী গোকুলে বেড়ে উঠেছে। তার নাম প্রোফেশন। কারুশিল্প দৈহিক শ্রমে পরিণত হবার পূর্ব্বে একটি বিশেষজ্ঞের দল তৈরী হয়। তাঁরা মস্তিষ্কের দ্বারা হাতের কাজকে অর্থাৎ কারুশিল্পকে সহজ করে দিলেন, অর্থাৎ শ্রমবিভাগকে আরো বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। মোটা রবারকে টেনে পাতলা করা যায়, আরো টানলে ছিঁড়ে যায়। তাই আজ প্রোফেশনের উত্তমাঙ্গটি অর্থাৎ পণ্ডিতবর্গ সমাজ-দেহ থেকে বিচ্যুত হতে বসেছেন; সমাজ এখন ছিন্নমস্তা। পণ্ডিতেরা সামাজিক-ব্যবহার রূপ উদ্দেশ্যকে বর্জ্জন করেছেন ও প্রতিশোধে সমাজও তাদেরকে বর্জ্জন করছেন। বর্ত্তমান যুগান্তরের সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হল এই—পণ্ডিতে যা বলছেন, দেশনেতারা তার বিপরীত কাজ করছেন। পণ্ডিতে চাইছেন স্বাধীন-বাণিজ্য কিংবা বাণিজ্যে শান্তি, ঘটছে ঠিক তার উলটোটি, ট্যারিফের দেয়াল উঁচু হয়েই চলেছে, বিরোধ বেড়েই চলেছে। অত্যধিক শ্রমবিভাগের ফলে, বুদ্ধি ও কর্ম্মের, বিজ্ঞান ও প্রয়োগশিল্পের, মতামত ও ব্যবহারের, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে সামাজিক বন্ধনটি ছিঁড়ে গিয়েছে। তারই দরুণ ধনীরা যারা শুধু শ্রমিক তাদেরকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন। প্রোফেশন-গুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা হল এই—তাদের উৎসাহে যেমন বিজ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে, তেমনি তাদেরই কর্ম্মফলে শ্রমিকের অধোগতি সাধিত হয়েছে। ভাল ও মন্দ একই কার্য্যের কর্ম্মফল—ঐতিহাসিক নিয়তির রীতিই তাই। জ্ঞানের দ্বারাই এ নিয়তির কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

এক্ষেত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রোফেশনগুলি এক একটি শ্রেণী। তা নয়, কারণ উৎপাদন-শক্তিকে বাড়িয়েও তারা উৎপাদন-শক্তির ওপর অধিকার বিস্তার করেনি, তারা সমাজ-ধনের অল্পাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে। তাও দক্ষিণা হিসেবে। কারণ, তারা নিষ্কাম হলে কি হয়, অন্য একটি শ্রেণী বেশই সকাম। বিশেষজ্ঞের দল আজ এই শ্রেণীর আজ্ঞাবহ দাসানুদাস, নিতান্তই অনুগত ভৃত্য। তা ছাড়া তাঁরা নিজেদের কর্ম্মের ঐতিহাসিক ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন নন্। তাঁদের ধর্ম্ম "মা ফলেষু কদাচন।" জ্ঞানযোগীর দলকে শ্রেণী বলতে কুণ্ঠা হয়। শ্রেণীর ধর্ম্ম কর্ম্মযোগের।

য়ুরোপের প্রোফেশনের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে। গোড়ায় জনকয়েক ব্যবসায়ী অবসরকালে নিজেদের মধ্যে সামাজিকভাবে মেলামেশা ও স্ফূর্ত্তির ফাঁকে নিজেদের ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনা করতেন। পরে তাঁরা ভদ্র অবস্থার উপযোগী আয় দাবী করলেন। অকারণে তাঁরা দাবী পেশ করেননি। তাঁরা বহুদিন ধরে শিক্ষানবীশী করেছেন, ফলে তাঁদের অনেক অভিজ্ঞতাও হয়েছে, এবং সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তাঁরা বিশেষ জ্ঞানও অর্জ্জন করেছেন, যার ফলে সমাজের উপকার হয়েছে, ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়েছে। একটি বিশেষ জ্ঞান-পদ্ধতি তাঁদের করায়ত্ত, এবং সেই টেকনিকের প্রয়োগে তাঁরাই একমাত্র দক্ষ, অন্যে নয়। এই হল কার-সণ্ডার্সের মতে প্রোফেশনের ইতিহাস। হোইটহেডের নতুন বই থেকে কয়টি লাইন উদ্ধৃত করে দিচ্ছি;—

Profession means an avocation whose activities are subjected to theoretical analysis and are modified by theoretical conclusions derived from that analysis.

অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্টি হবে থিওরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং থিওরী প্রতিষ্ঠিত হবে বৃত্তিলব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর। সিডনী ওয়েবের মতে প্রত্যেক প্রোফেশনের পিছনে সৃজনী-শক্তি, অধিকার ও সম্পত্তিজ্ঞান, এবং সহানুভূতির প্রেরণা আছে। এই মতটির মূল্য হয়ত খুব বেশী নয়, কারণ প্রায় সব দলের মূলেই আছে এই তিন প্রকারের প্রবৃত্তি। তাদের সাহায্যে শ্রেণীকে বৃত্তি থেকে পৃথক করা যায় না। অন্য দুটি সংজ্ঞার দোষ ও অসম্পূর্ণতা

পূর্ব্বেই দেখিয়েছি, তবু সংজ্ঞা দুটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য শুধু এই দেখান যে প্রোফেশনের বিশেষত্ব অন্যমতাবলম্বী ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের কাছেও ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষের প্রোফেশনগুলি নিতান্ত খোলাখুলি ভাবেই বিদেশী ধনী-সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার জন্যই সৃষ্ট ও লালিত পালিত।

অতএব শ্রেণী বলতে আমরা এই কয়টি প্রস্তাব গ্রাহ্য করি। (১) উৎপাদন শক্তিকে কেন্দ্র করে জনসঙ্ঘ গড়ে ওঠে; (২) ইতিহাস-নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক একটি জনসঙ্ঘের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; উৎপাদনটি সামাজিক ব্যাপার এবং সম্পর্কটি রাষ্ট্রের দ্বারা সাধারণত স্থিরীকৃত, ও আইনের দ্বারা অনুমোদিত; (৩) সম্পর্কস্থাপনের পর সামাজিক শ্রম ও সম্পত্তি এই জনসঙ্ঘের মধ্যে বিভক্ত হয়, পরে সেই বিভাগ রাষ্ট্রের দ্বারা চিরন্তন ব'লে ঘোষিত হয়। এই প্রকার জনসঙ্ঘকে শ্রেণী বলা হচ্ছে। অতএব ঐতিহাসিক প্রগতিতে শ্রেণীর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। শ্রেণী-বিরোধের জন্যই সমাজ বর্ত্তমান আকার ধারণ করেছে। পুরাতন পুঁথি ঘাটা ছাড়া যদি বর্ত্তমানের সঙ্গে ইতিহাসের কোন যোগ থাকে, ইতিহাস যদি সমসাময়িক বিবৃতি হয়, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত দেয় এবং নিয়ামক হয়, অর্থাৎ ইতিহাস যদি কেবল পৌনঃপুনিক ইতিবৃত্ত না হয়ে গতিশীল ও কর্ম্মনিয়ামক হয়, তাহলে শ্রেণী-প্রত্যয়টি এই অর্থেই গ্রহণ করতে হবে, ও শ্রেণী-বিরোধকে ঐতিহাসিক প্রগতির একটি মূল শক্তি স্বীকার করতেই হবে। (৪) জনসঙ্ঘ ঘনীভূত হবার প্রকৃষ্ট উপায় হল বিরোধ; (৫) বিরোধের প্রকৃতিই হল লাভের আশা ও উৎপাদন-কেন্দ্রের ওপর একাধিপত্য বিস্তার। অন্য ভাষায় বলতে গেলে,

"Classes are groups of people, such that one group may appropriate to itself the toil of the other owing to the difference of their (historic) situation, which is itself determined by the mode of their economic life."—Moscow Dialogues. (Hecker)

(৬) নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন না হলে শ্রেণী হয়না, এবং শ্রেণী-বিরোধ সম্বন্ধে সজ্ঞান না হলে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়না। বলা বাহুল্য সব প্রতিজ্ঞাই একটি মূলসূত্রের চারপাশে দানা বেঁধে রয়েছে।

(৭) অনেকের মতে অর্থ-নৈতিক ও ঐতিহাসিক উৎপত্তি ছাড়া শ্রেণীর অন্য উৎপত্তি আছে, যেমন ধর্ম্মসংস্কার, সামাজিক সংস্কার, রাষ্ট্রের রীতিনীতি। রাজনৈতিক কারণগুলি বিরোধের মধ্যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, তাই আমাদের সংজ্ঞায় তারা ইতিপূর্ব্বেই গৃহীত হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের সামাজিক কারণগুলি মূলত অর্থ-নৈতিক। ধর্ম্ম-সংস্কারের পার্থক্যে যে সামাজিক বিভাগ হয় সেটি শ্রেণীবিভাগ নয়। অনেক সময় সংস্কারগত পার্থক্য শ্রেণীবিভাগকে বাধা দেয়, কিংবা প্রচ্ছন্ন রাখে। তাই ব'লে এই কারণগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তারা আছে এবং সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে। তাদের ইমারৎ সুদৃঢ়, তবে তাদেরও ভিত্তি অর্থ নৈতিক মনে রাখা চাই।

গত অধ্যায়ে শ্রেণীর পুরানো ইতিহাস বর্ণনা করেছি। এই অধ্যায়ে ইতিবৃত্ত ও সমসাময়িক ইতিহাসের ধর্ম্ম বোঝাবার জন্য একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যয় ব্যাখ্যা করলাম। ভবিষ্যতে শ্রেণী কি আকার নেবে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন যাঁর নখদর্পণে বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তর্কবুদ্ধির দিক থেকে বলা চলে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-জ্ঞান, উৎপাদনের ওপর একাধিপত্য এবং স্বার্থবুদ্ধি কমলে বিরোধের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হবে, ও সেই সঙ্গে শ্রেণীও ব্যাপক হবে, সমাজের মধ্যে প্রসারিত হবে। তখন শ্রেণীবিরোধের ভীষণতা থাকবে না। বিরোধ একপ্রকারে না হোক অন্য প্রকারে থাকবে, কেননা বাধা-বিপত্তি, বিবাদ ও বিরোধের মধ্য দিয়ে অগ্রগতিই হল বোধ হয় বিশ্ব-চরাচরের নিয়ম। বিরোধের অবসানে বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সচেতনভাবে এই বিশ্বশক্তিকে শ্রেণীবিভাগ তুলে দেবার কাজে নিয়োজিত করাই ঐতিহাসিকের একমাত্র সামাজিক কর্ত্তব্য। সমাজের দিক থেকেও বটে, ব্যক্তির দিক থেকেও তাই, কারণ শ্রেণীতে বিভক্ত হবার জন্যই মানুষ মানুষ হতে পারছে না। অথচ এ না হয়ে উপায় ছিল না। সমাজের প্রকৃতিতে যে সব অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্য, বিরোধ-বিসম্বাদ রয়েছে তাদেরকে প্রকাশ, খণ্ডন ও সমন্বয় করতে করতেই সমাজের অভিব্যক্তি হয়েছে ও হবে। যখন সচেতনভাবে কোন একটি মণ্ডলীর দ্বারা এই

কার্য্য সাধিত হয় তখন সেই কার্য্যের নাম হল শ্রেণী-বিরোধ। এই হল শ্রেণীবিরোধের প্রকৃত তাৎপর্য্য। আমি জানি, এই অধ্যায়ে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা স্থাপন করা হলনা। আমরা যেভাবে ইতিহাস বুঝতে চেষ্টা করছি তার সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা খাপ খায়না। আমাদের প্রত্যয় পথ দেখিয়ে দেয়, অগ্রসর হতে সাহায্য করে, গন্তব্য নির্দ্দেশ করে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যৌনাতীত

(Supra-sex)

অধ্যাপক উস্‌পেন্‌স্কির (Ouspensky) নাম সুধীসমাজে প্রায় সর্ব্বত্র সমাদৃত। এই আচার্য্যকল্প রুষ মনস্বী একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কবি। উস্‌পেন্‌স্কি কোন দিন কোন কবিতা রচনা করিয়াছেন, জানা নাই—কিন্তু তথাপি তিনি কবি। কবি না হইলে, মর্ম্মরের সজাগ স্বপ্ন আগ্রার তাজমহল এবং সিংহলের মারকত-চক্ষু বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি কখনও ভূমানন্দে বিভোর হইতেন না। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার Tertium Organum নামক যুগান্তরকারী গ্রন্থ রাশিয়ান্ ভাষায় প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের আমেরিক্যান অনুবাদক মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন—From one point of view, it it a terrible book; there is revolution in it—a revolution of the very poles of thought। ঐ গ্রন্থে উস্‌পেন্‌স্কি বৈদান্তিক চিন্তার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—As a matter of principle, it is not important which we regard as First Cause—spirit or matter. It is essential to recognise their unity. First cause—'সর্ব্বকারণ-কারণ', বিশ্বের অমূল মূল একমেবাদ্বিতীয়ম্—যতঃ প্রধান-পুরুষৌ।

সম্প্রতি অধ্যাপক উস্‌পেন্‌স্কির বিরাট্ গ্রন্থ A New Model of the Universeএর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক Kegan Paul, Trench, Trubner and Co Ltd, London, 1931. প্রকাশক গ্রন্থের উপনাম দিয়াছেন—Principles of the Psychological method in its application to problems of Science, Religion and Art. ৫৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বৃহৎ গ্রন্থ—গভীর, গম্ভীর, মৌলিক চিন্তায় পরিপূর্ণ—অনেক শিখিবার ও ভাবিবার কথা আছে।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নাম—Sex and Evolution। ঐ অধ্যায় পাঠ করিয়া, এ দেশে আমরা যাহাকে 'ঊর্দ্ধরেতাঃ' বলি, সে সম্বন্ধে এক নূতন আলোক-রশ্মির সাক্ষাৎ পাইয়াছি—'পরিচয়ে'র পাঠককে তাহার ভাগী করিতে চাই। প্রাচীন সত্য-সকল নবীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তা দ্বারা কিরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে, ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন।

এ দেশের ঋষিরা মানবকে 'শিশ্নোদর-পরায়ণ' বলিয়াছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ বিশেষণ সার্থক বটে। বুভুক্ষা ও রিরংসা—ক্ষুধা ও কাম—Hunger and Sex—মানবের এই দুইটি প্রবলতম বৃত্তি। এই দুইয়ের মধ্যে কাম ক্ষুধার অপেক্ষাও দুর্দম। সেই জন্যই আমাদের আদিপিতা মনু মানবকে সতর্ক করিয়াছেন ঃ—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাসম্ অপি কর্ষতি॥

উস্‌পেন্‌স্কি এই কামকে 'love' বলিয়াছেন—'love' শব্দকে প্রেমের প্রতিশব্দ-রূপে স্বতন্ত্র রাখিয়া, কামকে 'lust' বলিলেই ভাল হয়। কারণ,

কাম আর প্রেমে হয় বহুত অন্তর,
এক অন্ধ তমঃ, অন্য উজ্জ্বল ভাস্কর।

This attraction of the sexes to one another, 'love', constitutes one of the chief motive forces in life, and its intensity and the forms of its manifestation determine almost all other characteristics and qualities in man.—A new Model of the Universe, p. 516.

এই যে কাম—স্ত্রী পুরুষের মিথঃ-আকর্ষণ—রিরংসা—এই কাম-সৃষ্টিতে নিসর্গের উদ্দেশ্য কি? মূল উদ্দেশ্য বংশরক্ষা।

In creating 'love', nature has only one aim—the continuation of life.—p 516.

কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যতটা পর্য্যাপ্ত, নিসর্গ তদপেক্ষা অনেক বেশি কাম জীব-হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়াছেন।

Nature has created in man much more 'love' than is actually necessary for the purpose of continuation of life.

সেই জন্যই কি William Blake lustকে 'bounty of God' বলিয়াছেন ? অথচ—How small a proportion of sex-energy is actually used for the continuance of life ! (Ouspensky) *

এই যে অতিরিক্ত কাম-শক্তি—ইহার ব্যবহার কি ? All this surplus of 'love' must be used up somehow.

ঐ অতিরিক্ত কাম-শক্তির প্রথম ব্যবহার 'in keeping up of the 'breed', the preservation of the species at a *definite level'*, by maintaining what are called 'secondary sexual characters' viz those definite anatomical and physiological traits, characteristic of man as well as of woman respectively.

স্ত্রী পুরুষের লিঙ্গভেদই তাহাদের মুখ্য প্রভেদ বটে। সেই জন্য জীব-বিজ্ঞান উহাকে প্রাথমিক বা primary character বলেন। তা' ছাড়াও নর ও নারীর মধ্যে পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্বসূচক কতকগুলি চিহ্ন আছে (যেমন পুরুষের গোঁপদাড়ি, স্ত্রী-লোকের স্তনজঘন)। ইহারা অমুখ্য হইলেও স্ত্রী পুরুষের ভেদ-ব্যাবর্ত্তক। ইহাদিগকে জীব-বৈজ্ঞানিক secondary sexual characters বলেন। ঐ অমুখ্য characters সম্পর্কে উস্‌পেনস্কির বক্তব্য এই :—

They are all those features (apart from the sex organs themselves) which make man and woman different from and unlike each other : e. g. difference in the lines of the body, different distribution of muscles and fat in the body, different distribution of hair on the body, a different voice, and all

---

* তবে এ লঘুক্রিয়ার জন্য এত বহ্বারম্ভ কেন ? ইহার উত্তরে উস্‌পেনস্কি বলেন :—

That is evidently Nature's way. Nature creates an immense pressure, an immense (intense) tension, in order to attain a certain aim, but uses, in actual fact, for the attainment of this aim, an infinitesimal fraction of the energy created. Why ? Because, without this immense inflow of force, probably the original aim would not be attained. So she blinds man by this surplus of energy, makes him a slave and so forces him to serve the purpose of nature.

that makes up masculine and feminine psychology (that is difference in instincts, sensations, tastes, temperament, emotions &c.).

এই সকল অমুখ্য বা secondary character-সমূহের সৌষ্ঠব ও স্থিরতা—মুখ্য পুং ও স্ত্রী লক্ষণের অর্থাৎ Primary sexual character-এর উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উস্‌পেন্‌স্কি বলিতেছেন—

Abundance and richness of secondary characters points to an improving, an ascending type. On the other hand, the decline of the type is always indicated by the weakening and alteration of secondary characters.

শুধু তাই নহে—ইহাও প্রমাণসিদ্ধ যে, কি পুরুষে কি রমণীতে, জননেন্দ্রিয়ের বিক্ষতি, অবনতি বা পরিবর্ত্তনের ফলে ঐ সকল প্রাগুক্ত অমুখ্য বা secondary characterগুলিও আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং পুরুষে স্ত্রীর এবং স্ত্রীতে পুরুষের লক্ষণ সকল প্রাদুর্ভূত হয় ('appearance of masculine characters in a woman and of feminine characters in a man') *। এ সম্পর্কে উস্‌পেন্‌স্কির উক্তি আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

It has been established beyond doubt that both for man and woman, a weakening or an anatomical change of the essential parts of the sex organs or their injury, leads to a complete alteration of the external type and to a change in the secondary characters, different for man and woman, but following a certain definite system, that is to say, in a man, an injury to his sex organs and the derangement of their functions cause him to resemble either a child or an old woman and in a woman the same thing causes her to resemble a man.

কচিৎ কদাচ যে যৌন পরিবর্ত্তন বা লিঙ্গব্যত্যয়ের কথা (transformation of sex) শুনা যায়, উহারও মূলতঃ ব্যাপার ওই। মহাভারতে স্ত্রী

* In the case of weakening of direct functions or injury to the sex-organs, the secondary characters are immediately modified, become weaker or even disappear.

শিখণ্ডীর নপুংসকত্ব-প্রাপ্তি পৌরাণিক কল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, এদেশের ও বিদেশের হাঁসপাতালের নথিতে ঐরূপ পরিবর্ত্তনের কাহিনী বিরল হইলেও একেবারে অজ্ঞাত নহে। এ প্রসঙ্গে এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ক্রুর সাক্ষ্য স্মরণ করা ভাল। ডাক্তার ক্রু (who is the head of the Animal-breeding Department of the University) বলেন—'A hen which had laid many broods of eggs from which chickens had been reared, began in old age to assume the plumage and manners of a cock. The bird actually succeeded in 'treading'—that is fertilising—other hens which then laid eggs. * * * When it was killed. it was found that the ovary or egg-producing organ had been destroyed by disease, but that a testis or spermatozoon-producing organ had been budded off the cells lining the body cavity.

এ সম্পর্কে ডাঃ ক্রুর সিদ্ধান্ত এইরূপ ঃ—

An individual of one "determined" sex can be so transformed at a later period that it will fulfil its life as a member of the opposite sex. In insects there are many such instances, and it is not infrequent that a particular insect which began life as a female and thus passed through the earlier stages of development, later on switched over and became a more or less complete functional male. * * * Frogs, fowls, pigeons and goats also provide frequent examples of sex transformation. In frogs there had been cases of an adult female becoming a male and subsequently the father of a family consisting solely of daughters ইত্যাদি।

সে যাহা হ'ক, আমরা আসল কথায় ফিরিয়া যাই। আসল কথা এইযে, where you have a man with the features and character of a woman or viceversa, it indicates firstly degeneration and secondly wrong development that is usually under-development of the primary characters; কারণ, where as a high development of these traits points to a sound type, a weak or a wrong expression definitely points to a degenerating type (Ouspensky).

এই সকল প্রমাণে উস্পেন্স্কি বলেন যে, it is clear that the surplus

of sex energy is used precisely for the improvement of the breed.

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই প্রকৃতিদত্ত কামশক্তি (sex energy) মানবের মধ্যে এতই প্রভূত ও প্রচুর যে, বংশরক্ষা কার্য্যে ও সন্ততির সৌকর্য্যেই (improvement of the breed), উহা নিঃশেষিত হয় না। উহার যে surplus বা অতিরেক থাকে, আমরা প্রায়শঃ তাহার অপ-ব্যবহার করি। উস্‌পেন্‌স্কি বলেন—

Under ordinary conditions it is used up by being transformed into other emotions and other kinds of energy, which often are contradictory, harmful from the point of view of evolution, pathological, incompatible with one another, and destructive.

এই কামশক্তি ব্যাহত বা প্রতিহত হইয়া বিপথগামী হইলে, কিরূপ ধ্বংসকারী হয় ও কেমন সংহার মূর্ত্তি ধারণ করে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সীতারাম-উপন্যাসে অমর তুলিকায় তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। বুঝিয়া দেখিলে, উস্‌পেন্‌স্কির উক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রণ গীতার সেই প্রাচীন বাক্যেরই সম্প্রসারণ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বস্তুতঃ এ পথে পদক্ষেপ করিলে নিসর্গের অভিসন্ধি ব্যর্থ করা হয়, প্রকৃতিদত্ত কামশক্তির অতিরেকের (surplusএর) অসদ্‌ব্যবহার করা হয়। এখন প্রশ্ন এই :—এই অতিরিক্ত কামশক্তির প্রকৃত সদ্‌ব্যবহার কি? (যে জন্য 'the energy of sex is created in much greater quantity than is necessary for the continance of life'.) উস্‌পেন্‌স্কি বলেন—to curb sex-energy and utilise it *in the interests of inner evolution*—that is, the evolution of man into superman, his development in the direction of the acquisition by him of higher consciousness and the opening up of his latent forces and faculties অর্থাৎ অতিরিক্ত কামশক্তির তখনই সদ্ব্যবহার করা হয়, যখন উহাকে সংযত করিয়া বিবর্ত্তনের উচ্চ প্রয়োজনে,

মানুষের মধ্যে অব্যক্ত শক্তি ও সম্ভাবনার বিস্ফুরণে, মানুষের সম্বিৎকে উচ্চতর ভূমিকায় উত্তোলনে—এক কথায় মানবের অতিমানবে বিকাশসাধনে প্রযুক্ত করা হয়। যাহারা ঐরূপ করিতে পারেন তাঁহারাই যৌনাতীত—উস্‌পেন্‌স্কি যাহাকে 'Supra-sex' বলিয়াছেন। তিনি যাহাকে 'supra sex' বলিলেন, আমরা এ দেশে তাহাকে 'অপ্রাকৃত কাম' বলি—'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদনমোহন'। ইহারই নাম কাম-বিজয়, মন্মথ-মন্মথ হওয়া—'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ'—'মন্মথের মন মথে' (চরিতামৃত)।

প্রাকৃত কাম=Normal Sex। ঐ অ-প্রাকৃত কাম=Super-normal বা অতি-প্রাকৃত Sex (supra-sex)। তা' ছাড়া আর এক প্রকার কাম দেখা যায়, যাহাকে abnormal বা ঊন-প্রাকৃত কাম বলা যাইতে পারে। কামের এই বিকৃত, বীভৎস, বিপরীত রূপকে অধ্যাপক উস্‌পেন্‌স্কি 'Infra sex' বলিয়াছেন এবং ঐ ঊনপ্রাকৃত কাম হইতে প্রাকৃত, বিশেষতঃ অপ্রাকৃত কামের বৈরূপ্য বুঝাইবার জন্য অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন। কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার সবিস্তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'অপ্রাকৃত' কাম (super sex) বুঝিবার জন্য যেটুকু দরকার আমরা মাত্র তাহারই উল্লেখ করিব।

প্রকৃত কথা এই, অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত কামে (supra sexএ) প্রাকৃত ও ঊনপ্রাকৃত—উভয়বিধ কামই অবসিত, তিরোহিত, উন্নীত হইয়া উচ্চতর ভূমিকায় প্রেমে পরিণত হয়—'where everything that is determined first as infra-sex and second as normal sex is *eliminated*'—'where sex sensations *disappear* in the light of mystical experiences.'

ঐ যে Infra-sex বা উন-প্রাকৃত কাম, উস্‌পেন্‌স্কি বলেন উহার স্বালক্ষণ্য (characteristic) এই ঃ

> Arrested development or degeneration, sometimes accompanied by a strengthening and an exaggerated development of sex desires and sex sensations.

ঐ Infra-sexএর কুৎসিত, কদাকার জুগুপ্সিত মূর্ত্তি আমাদের সকলেরই পরিচিত।

In its several forms, from impotence to homo-sexuality or unnatural inclinations......sex abnormalities, all perversions including abnormal sex desires or abnormal abstinence, disgust of sex, fear of sex, indifference to sex, interest in one's own sex—sometimes bordering on manias and phobias, that is, on pathological proclivities and pathological fears.

সময় সময় ঐ Infra-sex ভীষণ ও ভয়ানক মূর্ত্তিতেও দেখা দেয়, যেমন ইডিপাসে ও ওথেলোতে—

When all emotions belonging to sex become inevitably connected with irritation, suspicion and jealousy and seek to avenge 'outraged honor' or 'injured feelings' by committing murders or other crimes—thus having resemblance to delusional insanity or homocidal mania.

প্রাকৃত কাম কিন্তু সহজ স্বচ্ছন্দ নিরাপদ ব্যাপার; ইহাতে ঊন-প্রাকৃতের ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত নাই। সংযমের সীমা অতিক্রম না করিলে উহার সহিত অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ও ব্যাপারের অসামঞ্জস্যও ঘটে না।

For *normal* man, sex contains no danger. In a normal human being, sex harmonises with all other functions, including the emotional and the intellectual. There is no antagonism between sex and other functions, as in infra-sex, where there is constant disharmony between sex and the other sides of inner life. (In normal sex) there is no inner discord between sex and other functions, especially intellectual or higher emotional functions, as is the case in infra-sex.

প্রাকৃত কামের নিকট যৌনসম্বন্ধ সাহজিক ব্যাপার; উহার মধ্যে যেমন বিস্ময় নাই, তেমনি বিদ্রূপও নাই।

With regard to normal sex, there is no laughter in it. The function of sex can not be comic, it can not be an object of joke.

ঊন-প্রাকৃত কাম ইহার ঠিক বিপরীত।

It derides sex, takes it as a joke, tries to find something *comic* in it.

ইহার ফলে একরূপ অধম কলার সৃষ্টি হয়—যাহার নাম Pornography। প্রাকৃত কামের সহকারী সুকুমার কলা (Erotic Art) ভিন্ন

প্রকৃতির—প্রাচীন গ্রীস, রোম, ও ভারতবর্ষে ঐ কলার সুষমা প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ কলায় ও Pornographyতে আকাশ পাতাল ভেদ।

Infra-sex gives rise to a kind of pseudo-art, which is of course quite different from erotic art, as in the Greek and Roman worlds and in ancient India.

ঊন-প্রাকৃত কাম (Infra-sex) কখনও কখনও ধর্ম্ম বা নীতির ছদ্মবেশ পরিয়া দেখা দেয়, কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই তাহার স্ব-রূপ ধরা পড়ে; তখন বুঝা যায় 'it is pseudo-morality and pseudo saintliness.' ঐ ভাবে নারীমাত্রেই নরকস্য দ্বারং এবং 'স্বাঙ্গ-জুগুপ্সা'ই শুচিতার চরম। এ প্রসঙ্গে উস্‌পেন্‌স্কি বলিয়াছেন—

With people of infra sex, woman is the instrument of the devil and man is the tempter. With them, thc ideal of 'purity' is sexual impotence, infantile, senile or pathological......It is very characteristic that infra-sex continually holds in suspicion and mercilessly condemns normal sex and its manifestations, while it finds an excuse for people of 'intermediate sex' as well as for various abnormal means of sexual satisfaction...... People of this group are coloured by the psychology of the 'lupanar'—in which sex is connected with what is lowest in man and is surrounded with an atmosphere of uncleanliness, in which mud is thrown on sex. Having taken infra sex for supra sex, people have begun to regard normal sex from the stand point of infra sex, as something anomalous, unclean; hindering the salvation or the liberation of man.

প্রাকৃত ও ঊন-প্রাকৃত কাম সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হইল। এইবার অ-প্রাকৃত কামের পরিচয় দিবার চেষ্টা করি।

ঊন-প্রাকৃত কামের aberrations ছাড়িয়া দিয়া যদি প্রাকৃত কামের সাহজিক ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখিতে পাই অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতি-দত্ত কাম-শক্তির অন্যায় অপচয় করা হয়—it is wasted unproductively in ordinary life (Ouspensky)। ঐ অপচয়ের নিন্দা আমরা এদেশে নানা ছন্দে শুনিয়াছি—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ।

চৈনিক যোগ-দীপিকা 'আই চিনে'রও ঐ কথা—The fool wastes the most precious jewel of his body in uncontrolled pleasure, and does not know how to conserve the power of his seed. অথচ ঐ শক্তির সদ্‌ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা ও যোগ্যতা নিসর্গ আমাদের হাতে পূর্ণ মাত্রাতেই দিয়াছেন। ঐ সদ্‌ব্যবহার কি ?

The utilisation of this energy, which is wasted unproductively in ordinary life, creates in a man's soul the force which leads to the *super-human.* (Ouspensky) The seed that is conserved is transformed into power, and the power, when there is enough of it, makes the creatively *strong* body (I'chin).—অর্থাৎ যাহাকে যোগের পরিভাষায় 'কায়সম্পদ্' বলে। কায়সম্পদ্ কি ?

রূপলাবণ্য-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ—যোগসূত্র, ৩।৪৬

দেহ বজ্রের মত দৃঢ় হয়—কেবল তাহাই নহে, তখন শরীর হইতে একটা ছটা (লাবণ্য) বিচ্ছুরিত হয়। ইহাকেই রেতঃকে ওজে পরিণত করা বলে—the sublimation of the seed into power. উস্‌পেন্‌স্কি ইহার নাম দিয়াছেন 'Transmutation, that is the transformation of the sex energy into energy of a high order.' চৈনিক যোগদীপিকা ইহাকেই 'the backward-flowing method বলিয়াছেন—

If it is not allowed to flow outward but is led back by the force of thought, so that it penetrates the crucible of the creative and refreshes heart and body and nourishes them, that also is the backward-flowing method. Therefore it is said: The meaning of the Elixir of life depends entirely on the backward-flowing method.

ইহাকেই এ দেশে 'ঊর্দ্ধ-রেতাঃ' হওয়া বলে। মানব স্বভাবতঃ অর্ব্বাক্-স্রোতঃ (outward-flowing); তাহার পক্ষে ঊর্দ্ধ-স্রোতঃ হওয়ার অর্থ অতিমানব হওয়া। পৌরুষ, প্রযত্ন, উত্তম, উদ্‌যোগ—এক কথায় যোগ-প্রণালী দ্বারা এ অসাধ্য সাধন সিদ্ধ করিতে হয়।

As to the third aim of nature, viz evolution of man towards superman, it requires *conscious* action on the part of the man himself—the intentional use of sex energy for the purposes of inner evolution.

প্রশ্ন হইবে ঊর্দ্ধ-রেতাঃ হওয়া সম্ভব কিনা ? যাহাকে Backward-flowing method বলা হইল, সেই Transmutation (রেতঃকে ওজে পরিণত করা) বিজ্ঞান-সিদ্ধ কি না ? উস্‌পেন্‌স্কি বলেন—

This idea of transmutation is much nearer to *modern* scientific thought than might be supposed, and is supported by the new science of *endocrenology* or the study of the glands of internal secretion.

কিরূপে ? বিষয়টা বুঝিতে হইলে যাহাকে গ্ল্যাণ্ড (gland) বা গণ্ড বলে, তৎসম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের শরীর পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ঐ শরীরে তিন জাতীয় গণ্ড বা gland আছে—প্রথম বহিঃস্রাবী গণ্ড (glands with only external secretions)—যাহাদের ক্ষরণ বহির্মুখ—যেমন salivary glands, tear glands, nasal glands, kidney (লালা-নিঃস্রাবী, অশ্রুনিঃস্রাবী, কফনিঃস্রাবী, পিত্তনিঃস্রাবী গণ্ড)। দ্বিতীয় অন্তঃস্রাবী গণ্ড—যাহাদের ক্ষরণ অন্তর্মুখ—যাহাদিগকে endocrine বা ductless glands বলে (with only internal secretions)—যেমন thyroid gland, pineal gland, pituitary body 'which is visualised as leader of the endocrine system'। এবং তৃতীয় উভস্রাবী গণ্ড—যাহাদিগের ক্ষরণ উভয়মুখ—অন্তঃ ও বহিঃ অর্থাৎ glands of both internal and external secretions। এই উভস্রাবী গণ্ডের মধ্যে প্রধান—যৌনগণ্ড (sexual glands)—বীজ-কোষ, জরায়ু প্রভৃতি। It is established by physiology that the sex glands are at the same time glands of external and of internal secretion.

যৌনগণ্ডের বহিঃক্ষরণ আমাদের সুপরিচিত, কিন্তু উহার যে অন্তঃক্ষরণ আছে এবং ঐ ক্ষরণ দ্বারা যে নিসর্গের নিগূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ হয়, ইহা হয়ত আমরা অনেকে জানিনা। উস্‌পেনস্কি বলিতেছেন :—

The internal secretion of the sex glands is the chief factor in creating and regulatiug the development of secondary sexual characters. To such an extent is this so that in the case of injured sex glands or in the case of castration, when internal secretion ceases or is impaired, secondary characters disappear or become modified, and a man becomes a degenerate type of infra sex.

গত ৮০ বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা গণ্ডতত্ত্ব, বিশেষতঃ অন্তঃস্রাবী গণ্ড লইয়া অনেক আলোচনা গবেষণা করিয়াছেন—তাহার ফলে দেহ-বিজ্ঞানের এক নূতন বিভাগ (Endocrinology) ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। এ আলোচনার সূত্রপাত করেন Claude Bernard। পরে Addison, Brown-Sequard—বিশেষতঃ নিউইয়র্কের ডাঃ বার্ম্যান (Berman) ঐ সূচনায় অনেক নূতন তথ্য সংযোগ করিয়াছেন। উস্পেন্স্কি সমাদরের সহিত ডাঃ বার্ম্যানের The Glands regulating Personality ও The Personal Equation গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমাদের যাহা স্বভাব—স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে—কোন নূতন সত্যের সন্ধান পাইলে, তাঁহারা তাহার প্রাণান্ত না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নন—গণ্ডতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে।* নেপোলিয়ন যে ওয়াটার্লু যুদ্ধে পরাজিত হন, তাহার হেতু তাঁহার pituitary glandএর স্তিমিত ক্ষরণ!

Thus Dr. Bernam explains all the failures of Napoleon's last campaigns, ending in the catastrophe of Waterloo, by the weakening of the secretions of the pituitary gland.

---

* According to the data of endocrinology, all the physical properties and functions of man ; growth, nourishment, structure of the body, functioning of different organs, and also all the psychic life, intellectual and emotional, the whole psychic make-up of a man, his activity, his energy, his strength—all this depends on the properties and on the character of the activity of the glands of internal secretion, which produce motive-power for the working of the organs, the nervous system, the brain, and so on.

অর্থাৎ মানুষ গণ্ডস্রাবের হস্তে যন্ত্রারূঢ় ক্রীড়নক—'a marionette controlled by glandular secretions !'

যে যাহা হ'ক, আমরা যৌনগণ্ডের (sexual glandsএর) আলোচনায় ফিরিয়া যাই এবং দেখি ঊর্দ্ধস্রোতা সম্বন্ধে তদ্দ্বারা কিছু নূতন আলোক পাই কিনা ?

যৌন গণ্ডের অন্তঃক্ষরণের বিষয় (internal secretion) আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ ক্ষরণের উদ্দেশ্য ও ফলও আলোচিত হইয়াছে। উস্‌পেন্‌স্কি বলেন ঐ ব্যাপারে আমরা রেতের ওজে ঐকদেশিক পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি।

The internal secretion of the sex-glands is the *transmutation* already recognised by Science. The normal life of the organism and the conservation of secondary characters depend on this transmutation.

এই পরিণতি যদি আর এক গ্রাম ঊর্দ্ধে উঠাইতে পারি অর্থাৎ যদি যৌনগণ্ডের ক্ষরণকে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ করিতে পারি, তাহা হইলেই যোগের অনুমোদিত backward-flowing method বা ঊর্দ্ধরেতা হওয়ার প্রণালীতে উপনীত হই।

In the process of evolution sex energy, as it were, turns inward within the organism and creates in it a new life, capable of ever new, of eternal regeneration.

উস্‌পেন্‌স্কি আরও বলিতেছেন ঃ—

The esoteric idea differs from the modern scientific view only in the admission of the possibility of the transmutation being increased and brought to a degree of totally incomprehensible and unknown intensity, which creates a new type of man (that is the type of man belonging to supra-sex).

ইহাই যৌনাতীত হওয়া। উস্‌পেন্‌স্কি বলেন, বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা নূতন কথা বটে কিন্তু প্রজ্ঞান বা অধ্যাত্ম বিদ্যার কাছে ইহা অপরিচিত নহে। All this is new for modern thought but in reality approaching the esoteric more and more nearly.

ইহার পর উস্পেন্স্কি একটি জটিল সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন। এই যে Transmutation (রেতের ওজে পরিণয়ন)—ইহা কি কাম অঙ্গীকার করিয়া না কাম প্রত্যাহার করিয়া? ইহা কি কামের বর্জ্জনে না কামের যোজনে সাধন করিতে হইবে—'in opposition to sex or through sex'?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ঐ সাধনা কাম-সংযুক্ত কি কাম-বিযুক্ত হইবে তাহা সাধনকারীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

(1) There are types of people for whom the attainment of supra sex is possible only through a struggle against sex and (2) there are other types of people for whom the attainment of supra sex is possible without the struggle against sex. (Ouspensky)

রাজযোগের পথ—বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট প্রভৃতি যে পথ প্রদর্শন ও যে পথে বিচরণ করিয়াছেন—সে ঐ প্রথম পথ। এ পথ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পথ (complete sex abstinence and asceticism)। রাজ-যোগের ভিত্তিভূমি যম-নিয়ম এবং পঞ্চ যমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই মুখ্য।

অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহাঃ যমাঃ

—যোগসূত্র, ২।৩০

কারণ, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বীর্য্যলাভ অসম্ভব—ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ (২।৩৮ সূত্র)। বুদ্ধ-শাসনে দেখিতে পাই, যাঁহারা গৃহস্থ (শ্রাবক), স্বদার-সেবা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও, যাঁহারা শ্রমণ (প্রব্রজ্যাবলম্বী) কামচর্চ্চা তাঁহাদের পক্ষে একেবারে বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের জন্য বিধি—complete abstinence। কারণ, 'the point of view is that sex life is a hindrance to the salvation of man'।

যিশুখৃষ্ট বলিতেন, কামক্রিয়া ত' দূরের কথা, যদি কামিনীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত কর, তবেও তুমি পতিত হইবে—who looks after a woman to lust with her, has already committed adultery in his heart। তাঁহার কঠোর অনুশাসন পাঠকের স্মরণে আসিবে—

For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men, and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. (Matt. 19,12),—অর্থাৎ

স্ত্রী হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা,
তারাই ধরে ধর্ম্মের ধ্বজা।

অপর পক্ষে সহজিয়া ও পঞ্চমকার সাধক তান্ত্রিকের যে পথ—those who admit the possibility of the transmutation of sex-energy in conditions of normal sex life and normal expenditure of sex energy—ডাক ডাকিনীরা এবং জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে পথ ঐ দ্বিতীয় পথ। ঐ পথে 'প্রকৃতি', সাধনের প্রধান সহায়। ডাকার্ণব বলেন—

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জু।
প্রজ্ঞোপায়ই সিজ্ঝউ কজ্জু॥ বৌদ্ধগান ও দোঁহা, ১৬১ পৃষ্ঠা

'রমণই পরম মহাসুখ—ইহাই প্রজ্ঞার উপায়, ইহা হইতেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি।'

সহজাচার্য্য গুণ্ডরী-পাদের উক্তি এই—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

'হে যোগিনী! তোমা বিনা একক্ষণও রহিতে নারি। তোমার মুখ চুম্বিয়া কমল-রস পান করি।'

আর একজন সহজিয়া কৃষ্ণপাদের আকাঙ্ক্ষা এই—

আলো ডোম্বি! তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ণু কাপালি জোই লাগ॥

'ওলো ডোমি! তোর সাথে আমি সাঙ্গাতি করিব। কাহ্ণ (কৃষ্ণপাদ) নির্ঘৃণ কাপালিক—এই তাহার 'লাগ'।' সহজিয়ারা বলেন—সহজপথই এক মাত্র পথ—যদি ভববন্ধ খণ্ডন করিতে চাও—তবে 'সইপর রজ্জহ'।

অরে বট! (মূঢ়) সহজ সইপর রজ্জহ।
মা ভববন্ধগন্ধ পড়ি বজ্জহ॥

ইহাই সুরনদী-যমুনা, ইহাই গঙ্গাসাগর, ইহাই কাশীপ্রয়াগ, ইহাই চন্দ্রসূর্য্য।

এথুসে সুরসরি জমুনা, এথুসে গঙ্গাসাঅরু।
এথু পআগ বণারসি, এথুসে চন্দ দিআ-অরু॥

এক শ্রেণীর বৈষ্ণব সাধক এই সহজিয়া ভাবে ভাবিত। সেইজন্য জয়দেবের "বিলাস কলাসু কুতূহলম্", সেইজন্য জয়দেব নিজের বিশেষণ দিয়াছেন—'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী'—'শ্রীজয়দেবে কৃতরতি (?) সেবে'। সেইজন্য চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী—'রজকিনী প্রেম, যেন কাঁচা হেম'। সেইজন্য বিদ্যাপতির পক্ষে শিবসিংহের রাণী 'লছিমা দেবী পরমাণ'।

তান্ত্রিকের যে পঞ্চমকার—মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন—এ পঞ্চকের মধ্যে পঞ্চম মৈথুনই প্রধান।

বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যমাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনা নৈব প্রপূজয়েৎ॥

*　　　*　　　*

কণ্ঠে কণ্ঠং মুখে বক্ত্রং বক্ষোজং চোরসি প্রিয়ে!
তস্যৈ কুলরসং দেবি! পায়য়িত্বা যথোচিতম্।
স্বয়ং পীত্বা জপেৎ মন্ত্রং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা॥

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ সকল ব্যাপার কেবল কামুকতা ও ব্যভিচার নহে—ভিত্তি ইহার ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত।

বিলিখ্য ভুবি দেবেশি! তত্র কান্তাং সমানয়েৎ।
তদ্গাত্রে পূজয়েৎ দেবীং নানাভরণসংযুতাম্।
নিশীথে তু জপেৎ মন্ত্রং একান্তে কান্তয়া সহ॥

*　　　*　　　*

লেপয়েৎ দিব্য গন্ধেন ভূষণৈর্ভূষয়েৎ স্বয়ং।
রময়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধি-হেতবে॥

এই শ্রেণীর সাধকেরা 'saw the way to transmutation, not in opposition to sex but through sex.

শুধু ভারতবর্ষের সহজিয়া ধর্ম্মে এবং তান্ত্রিক সাধনায় ও যোনিলিঙ্গ-পূজায় নহে—উস্‌পেন্‌স্কি বলেন এ প্রণালীর ধর্ম্মসাধন বহুবিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল।

To this category belong those forms of religious understanding, in which sex is regarded as an expression of the Deity in man and is an object of worship, as in the religions of Greece and Rome and the ancient cults of Crete, Asia and Egypt.

কামনদীতে অবগাহন করিয়া কাম-জয় কিরূপে সম্ভব, তাহার ধারণা করা কঠিন। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন ঃ—

ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কামের উপভোগ দ্বারা কখনও কাম নিবৃত্ত হয় না—পরন্তু ঘৃতভোজী অগ্নির ন্যায় আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আরও দেখুন বাসনার ত' ইয়ত্তা নাই—'It grows by what it feeds upon.'

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাদ্ অতিতৃষং ত্যজেৎ॥

'এই ভূমণ্ডলে যত কিছু ভোগ্যবস্তু আছে—ধান্য, হিরণ্য, পশু, রমণী—বাসনা এমনই বিশ্বভুক্ যে, সে সমস্তই একটি প্রাণীর জন্যও পর্য্যাপ্ত নয়—অতএব 'কামিনী কাঞ্চন' বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।' শুনা যায় বিষস্য বিষম্ ঔষধম্—তান্ত্রিক সাধকের পঞ্চম মকার-সাধন এবং সহজিয়ার 'প্রকৃতি'-সম্ভাষণ কি সেই ধরণের 'সদৃশ' চিকিৎসা? Similia similibus curanter.

সে যাহা হ'ক, এ কথা নিঃসংশয়, 'প্রকৃতি'কে দ্বার করিয়া সাধন অপেক্ষা কামবিজয়ের একটা প্রকৃষ্টতর পন্থা আছে—সে প্রণালীতে 'জহরকা পুরিয়া' গ্রাস করিতে হয় না, বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করা যায়—অমৃতং বা বিষম্ ঈশ্বরেচ্ছয়া। সে প্রণালী ভগবানে কামার্পণ—তাঁহাকে প্রিয়তম—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ জানিয়া, তাঁহাকে কান্তভাবে ভজন—চৈতন্য মহাপ্রভু গোপীভাবের অনুকরণ করিয়া যে প্রণালী 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' অপরকে শিখাইয়াছিলেন।

বাইবেলের 'Song of Solomon'এ—.

Let him kiss me with the kisses of his mouth, For thy love is better than wine......Behold thou art fair, my beloved,

yea pleasant—also our bed is green……His left hand is under my head—and his right hand doth embrace me……By night on my bed—I sought him, whom my soul loveth ; I sought him, but I found him not.

সুফিদিগের সাকী ও পেয়ালার অন্তরালে—

অতীত যা' তার দুখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর—
দিল্-পিয়ারা সাকী ! গো আজ পেয়ালা ভ'রে ঘুচাও মোর

* * * *

এক লহমা সময় আছে, সর্ব্বনাশের মধ্যে তোর—
ভোগ-সায়রে ডুব দিয়ে কর্ একটা নিমেষ নেশায় ভোর !

—ওমরখৈয়াম (শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ)

—বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জক্রীড়ার রূপকের মধ্যে ঐ কান্তভাবে ভজনের উজ্জ্বল রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐরূপ ভজনকারীর নিকট নর-নারীর প্রাকৃত ভেদ তিরোহিত হয়। তাঁহার অপ্রাকৃত কাম বা প্রেম-দৃষ্টিতে এ ভব-বৃন্দাবনে (মীরা বাইয়ের ভাষায়) শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—আর সকলেই প্রকৃতি হইয়া যায়। *

প্রকৃতি ত পুরুষকেই চায়—পুরুষের সহিতই 'সঙ্গম' বাঞ্ছা করে—অতএব সেই 'মহান্ বৈ পুরুষঃ' ভগবানে কামার্পণ ভিন্ন তাহার গত্যন্তর কি ? এ ভজনে কামের বর্জ্জন করিতে হয় না—শোধন করিতে হয়—suppression করিতে হয় না, sublimation করিতে হয়।

অনুধাবন করিলে, এ প্রণালীর ভজনের একটা গভীর আধ্যাত্মিক ভিত্তি ধরিতে পারা যায়। উস্পেন্স্কি ঠিকই বলিয়াছেন, of all ordinary human experiences, only sex sensations approach those which we call mystical.

---

* If thy soul is to go into higher spiritual blessedness, it must become woman—yes, however manly you may be among men. (F. W. Newman)। এখানেও type-ভেদ লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীর সাধক (Psycho-analysisএর ভাষায় যাঁহারা চণ্ডীদাস-complexএর লোক) 'প্রকৃতি'কে দ্বার করিয়া সাধনা করেন এবং সিদ্ধ হ'ন—অপর শ্রেণীর সাধক (যাঁহারা চৈতন্য-complexএর লোক) তাঁহারা নিজকে 'প্রকৃতি' করিয়া 'উত্তম পুরুষ' ভগবানে কামার্পণ করিয়া কাম বিজয় করেন।

সেইজন্য প্রাচীনেরা রতিসুখকে 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদর' বলিতেন। উপনিষদের নিম্নোক্ত উপমারও সার্থকতা ওই—

স যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্
এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং
কিঞ্চ বেদ নান্তরম্—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।২১

'যেমন প্রিয়া রমণী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য অন্তর কিছুই জ্ঞান থাকে না—তেমনি এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য-অন্তর কিছুই জানে না।'

Of all we know in life, only in love is there a taste of the mystical, a taste of ecstacy. Nothing else in our life brings us so near to the limit of human possibilities, beyond which begins the unknown. And in this lies without doubt the chief cause of the terrible power of sex over human life. (Ouspensky)

সেইজন্যই কামের প্রতিক্রিয়ায় এত অবসাদ, অবসানে এত নির্বেদ।

In love and all sex sensations, there is a strange melancholy, and a strange sadness. The more a man feels, the stronger in him is this sensation of farewell, this sensation of parting.

কেন এমন হয়? উস্পেন্স্কি বলেন—

In a man (or woman) of strong feeling, sex sensations awaken certain new states of consciousness, new emotions. And these new emotions change emotions of sex, cause them to fade and disappear.

প্রাকৃত কাম ক্রিয়াতেই যখন এই সম্ভাবনা, তখন যাঁহারা ভগবানে কামার্পণ করিয়া প্রাকৃত কামকে প্রেমে বা অপ্রাকৃত কামে রূপান্তরিত করিয়াছেন, যাঁহারা যৌনাতীত (supra-sex) হইয়াছেন, তাঁহারা? Love, 'sex', these are but a foretaste of mystical sensations.........Consequently in true mysticism, there is no sacrifice of feeling. Mystical sensations are sensations of the same category as the sensations of love, only infinitely higher and more complex. (Ouspensky).

অতএব যিনি যৌনাতীত, যিনি অ-প্রাকৃতকামী, যিনি শ্রীরাধার মহাভাবে ভাবিত হইয়া সেই চির-সুন্দরে কামার্পণ করিয়া তাঁহাকে মধুরভাবে ভজন করেন, তাঁহার প্রাকৃত কামানন্দ যে অপ্রাকৃত ভূমানন্দে উল্লসিত হয়— তাঁহার যে 'But at the same time sex-sensations disappear in the light of mystical experiences'—ইহার ধারণা কঠিন নয়। কিন্তু সে অনুভূতির বর্ণনা ?

সখিরে ! কি পুছসি অনুভব মোয় ?
সোইক পীরিতি, অনুরাগ বাখানিতে
নিতি নিতি নূতন হোয়।

'There always remains in it an element of the miraculous and the impossible. And there is no fading of his own feeling.' 'This is the new consciousness, for the definition and description of which there are no words.'

সেইজন্য নারদ ইহাকে 'মূকাস্বাদনবৎ' বলিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির বর্ণনা আরও হৃদয়গ্রাহী—

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল !

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মাছি

(ক্যাথ্‌রিন্‌ ম্যান্‌সফিল্‌ডএর "দি ফ্লাই" হইতে)

অফিসের কর্ত্তা ছিলেন বুড়ো উড্‌ফিল্‌ডের পুরাণো বন্ধু। তাঁরই ডেস্কের পাশে একখানি সবুজ চাম্‌ড়ায় মোড়া, হাতল-দেওয়া চেয়ারে সে বসেছিল। ছোট ছেলেরা যেমন ঠেলাগাড়ীর ভিতর থেকে উঁকি মারে, বুড়ো উড্‌ফিল্‌ড তা'র প্রশস্ত চেয়ারখানি থেকে ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে, "তা' তুমি এ ঘরটীতে বেশ আরামে আছ কিন্তু!"

তা'র কথাবার্ত্তা শেষ হ'য়ে গিছ্‌ল; এইবার তার বিদায় নেবার সময়। কিন্তু আসলে তা'র যাবার ইচ্ছা ছিল না। কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ কর্‌বার পরে যখন্‌ তার হঠাৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ হোল, তা'র পর থেকেই তা'র স্ত্রী ও মেয়েরা তাকে কড়া নিয়মে বেঁধে ফেলেছিল। সপ্তাহের মধ্যে সব কয়দিন সে বাড়ীর মধ্যে-ই আবদ্ধ থাক্‌ত, কেবল একটি দিন ছাড়া। মঙ্গলবারে সে ছুটি পেত। ঐ দিনটীতে সে যথারীতি ভদ্রবেশে সজ্জিত হ'য়ে সহরে যাবার অনুমতি পেত। অবশ্য সহরে গিয়ে সে কী করত, সেটা তার স্ত্রী ও কন্যারা কেউই ভেবে ঠিক্‌ কর্‌তে পার্‌ত না। বোধ করি, সেখানে গিয়ে বন্ধু বান্ধবদের বিরক্তি উৎপাদন কর্‌ত। হয়ত বা তাই। কিন্তু তাকে দোষ দেওয়া যায় না। পতনোন্মুখ শেষ কয়টী পল্লবের প্রতি গাছের যেরূপ নিবিড় অথচ স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, জীবনের মেয়াদ্‌ ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শেষ গুটী কয়েক আনন্দ-উপাদানের উপর মানুষের মনে সেই রকম গভীর মমতা আপনা হ'তেই জমে ওঠে।

চুরুট খেতে খেতে বুড়ো উড্‌ফিল্‌ড বন্ধুর দিকে উৎসুক নয়নে তাকিয়েছিল। অফিসের কর্ত্তা বসেছিলেন তাঁর নিজস্ব আসনটীতে। তার চেয়ে বয়সে বছর পাঁচেকের বড়ই হবেন, কিন্তু দিব্যি নধরকান্তি। স্বাস্থ্য এখনও অটুট্‌ এবং অফিসের সকল কাজেই তিনি কর্ণধার বিশেষ। মানুষটীর দিকে খানিকক্ষণ চাইলে মনে আপনি উৎসাহ আসে।

বৃদ্ধ বল্‌লে, "সত্যি, এ যায়গাটীতে তুমি দিব্যি আরামে আছ।" চোখে তার উজ্জ্বল, প্রশংসমান দৃষ্টি।

কর্ত্তা কাগজ-কাটা ছুরী দিয়ে টাইমস্ পত্রিকাখানি কাটতে কাটতে বল্‌লেন, "কথাটা সত্যি বটে।" প্রকৃতপক্ষে এই নিজস্ব ঘরটী ছিল তাঁর কাছে অহঙ্কারের বস্তু। তিনি চাইতেন যে পাঁচজনে, বিশেষ ক'রে উড্‌ফিল্‌ড এই ঘরটীর তারিফ্ করে, গলাবন্ধ-জড়ানো এই ক্ষীণ ও ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধটীর চোখের সাম্‌নে নিজের ঘরটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে তাঁর মনে বিশেষ রকমের আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠ্‌ত।

গত কয় সপ্তাহ ধ'রে যেমন আর সবাইকে শুনিয়েছেন, তেম্‌নি সুরে বন্ধুকে বল্‌লেন, "ঘরটায় সম্প্রতি কিছু অদল-বদল করানো গেছে হে!" বড় বড় সাদা গোল দাগ-দেওয়া ঘোর লাল গাল্‌চেটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লেন, "এটা নতুন কিনেছি।" টেবিলটার দিকে একটু শিরঃকম্পন ক'রে বল্‌লেন, "এসব নতুন আস্‌বাব।" দূরে তামার বাসনে পাঁচটী মুক্তাস্বচ্ছ সসেজ্ রাখা ছিল সেই দিকে পরম উৎসাহ-ভরে হাত নেড়ে জানালেন, "আর ওটা হোল গরম কর্‌বার বৈদ্যুতিক প্রণালী।"

কিন্তু একটা জিনিষের প্রতি তিনি উড্‌ফিল্‌ডের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌লেন না। যেটী তিনি কৌশলে এড়িয়ে গেলেন, সেটী হ'ল টেবিলের উপর সযত্ন-রক্ষিত একখানি ফটোগ্রাফ্। ছবিখানি একটী যুবকের প্রতিকৃতি। পরনে তার খাকী পোষাক, আর মুখে কেমন একটা বিসদৃশ গম্ভীর ভাব। ছেলেটীর পিছনদিকে সেই আদিকালের আলোকচিত্রের পটভূমিকা, আর মাথার উপরে ঘনিয়ে-ওঠা মামুলী মেঘের রাশি। ছবিখানি নূতন নয়; আজ ছয়বৎসর হ'ল ঐ জায়গাটীতে বসানো রয়েছে।

বৃদ্ধ উড্‌ফিল্‌ড বল্‌লে, "দেখো, তোমায় একটা কথা বল্‌বার ছিল।" এই ব'লে সে একটু থাম্‌ল। স্মরণ কর্‌বার ব্যর্থ চেষ্টায় তার চোখ অশ্রু-সজল হয়ে এল।

"এই দেখো! কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম,—এখন আর কিছুতেই মনে আন্‌তে পারছিনা। অথচ কী আশ্চর্য্য! সকালে যখন বাড়ী থেকে বেরোই, ঐ কথাটাই তোমায় বল্‌ব ব'লে মনে মনে ঠিক্ ক'রে রেখেছিলাম।

সহসা তার হাত কেঁপে গেল। কথার অসঙ্গতির জন্য গণ্ডদেশে রক্তোচ্ছ্বাস পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল।

কর্ত্তা ভাব্‌লেন, আহা বেচারী! ওর দেহমন দেখ্‌ছি সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। তাঁর হৃদয় বন্ধুর প্রতি সমবেদনায় ভ'রে গেল। তার দিকে একটু কৌতুকভরে তাকিয়ে বল্‌লেন, "দেখ,তোমার এখন কি দরকার জানো? আমার কাছে এমন একটা ওষুধ আছে, তার কয়েক ফোঁটা পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে। বাইরের এই কন্‌কনে শীত তোমার অঙ্গস্পর্শ কর্‌তে পার্‌বেনা। সত্যি এতো ভাল জিনিষ যে মুখে বল্‌বার নয়। সেবনের ফল একেবারে নির্দ্দোষ, এতে ছোট ছেলেটার পর্য্যন্ত কোনও ক্ষতি হয় না।"

এই ব'লে তিনি নিজের ঘড়ির চেন্‌ থেকে একটী ছোট্ট চাবী বা'র ক'রে ডেস্কের তলাকার একটা দেরাজ খুল্‌লেন। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটী কালো রঙের ছোট চ্যাপটা বোতল।

"এই হ'ল তোমার সেই ওষুধ। যে লোকটী আমায় এনে দিয়েছিল, সে আমায় অতি গোপনে জানায় যে এ চীজ্‌ খাস্‌ উইণ্ড্‌সর প্রাসাদের ভাণ্ডারে এতদিন আত্মগোপন করে বাস কর্‌ছিল।"

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে বুড়ো ত একেবারে অবাক্‌। কর্ত্তা যদি হঠাৎ একটা খরগোসের ছানা বা'র ক'রে তার সাম্‌নে ধর্‌তেন, তাতেও বোধ করি সে এতটা বিস্মিত হ'ত না। ক্ষীণ ও সন্দিগ্ধস্বরে সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "হুইস্কী, না।"

কর্ত্তা সস্নেহে বোতলটী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মার্কা দেখালেন। হুইস্কীই বটে!

উড্‌ফিল্‌ড আবেগভরে বন্ধুকে বল্‌লে, "তুমি বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বে না ভাই, বাড়ীতে ও সব জিনিষ আমাকে ছুঁতে দেয় না।

তার কণ্ঠস্বর শুন্‌লে কথাটা অবিশ্বাস করা শক্ত। বৃদ্ধের বিগলিত মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছিল সে এইবার বুঝি কেঁদে ফেলে।

"ও কথা যখন তুল্‌লে, তখন বলি। এবিষয়ে মেয়েদের চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা সচরাচর আরও একটু গভীর হ'য়ে থাকে।" টেবিলের উপর দুটো বড় গেলাস রেখে কর্ত্তা সেগুলোতে বেশ খানিকটা ক'রে পানীয় ঢাল্‌লেন, তারপর একটা এগিয়ে দিলেন উড্‌ফিল্‌ডের দিকে।

"খেয়ে ফেলো দিকি! নিজেই পরখ্ ক'রে দেখো সত্যি উপকার হয় কিনা। আহা! তাই ব'লে জল মিশিয়োনা যেন! এমন খাঁটী ও দুর্লভ জিনিষের অপমান অমার্জ্জনীয়।" এই ব'লে এক নিঃশ্বাসে নিজের গেলাসটী শূন্য ক'রে রুমাল দিয়ে সযত্নে গোঁফ মুছে ফেল্লেন।

বুড়ো উড্‌ফিল্ড ততক্ষণে তারিয়ে তারিয়ে অমৃতস্বাদ গ্রহণ কর্‌ছিল। কর্ত্তা তার দিকে চেয়ে একটু চোখ্ টিপ্‌লেন। বৃদ্ধ এইবার তা'র মুখস্থ তরল পদার্থটী গলাধঃকরণ করলে। অসহ্য পুলকে কিছুক্ষণ তা'র বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'লনা। তারপর অতি সংক্ষিপ্তভাবে বল্লে, "হুবহু বাদামের মত স্বাদ।" ততক্ষণে তা'র সমস্ত শরীরটা আরামপ্রদ উত্তাপে ছেয়ে গেছে। অনড় স্নায়ুগুলোর মধ্যে রক্তস্রোত সঞ্চালিত হবার ফলে খেই-হারাণো কথাটা আবার ফিরে এল। চেয়ারে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে সে বল্লে, "যাক, এবার মনে পড়েছে। শোনো, তোমার জান্‌বার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমার মেয়েরা গত সপ্তাহে গিয়েছিল বেল্‌জিয়মে বেড়াতে। উদ্দেশ্য ছিল রেজির সমাধি দেখ্‌তে যাবে। সেখানে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তারা হঠাৎ এসে পড়ে তোমার ছেলের কবরের পাশে। অনুমান হ'ল তা'দের সমাধি দুটী খুবই কাছাকাছি।"

বৃদ্ধ একটু থাম্‌ল। কর্ত্তা কোনও জবাব দিলেন না। কেবল তাঁর চোখের পাতা ঈষৎ কেঁপে উঠ্‌ল। বোঝা গেল, তিনি অবহিত হ'য়ে শুন্‌ছেন।

"মেয়েরা বল্‌ছিল যে জায়গাটী অতি পরিপাটী। এমন যত্ন ক'রে রেখেছে যে চমৎকার, দেখ্‌লে তৃপ্তি হয়। স্বদেশেও বোধ হয় এতটা সম্ভব হ'ত না। তুমি বোধ হয় ওধারে যাওনি কখনো?"

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লেন, "মোটেই না।" নানা কারণে তাঁর যাওয়া ঘটে ওঠেনি। বৃদ্ধ ব'লে যেতে লাগ্‌ল, "গোরস্থানটা বেশ বিস্তৃত, অনেক মাইল-ব্যাপী। এতো পরিষ্কার যে সাজানো বাগান বল্‌লেও অত্যুক্তি হয়না। সব কবরের উপরই নানা রঙের ফুল গজিয়েছে। আর মধ্যে মধ্যে সুন্দর চওড়া রাস্তা…"তা'র বল্‌বার ধরণ থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে সুন্দর প্রশস্ত পথগুলির প্রতি তার বিশেষ মমতা আছে। কিছুক্ষণ বাক্যস্রোত

বন্ধ রইল। তারপর আবার বৃদ্ধের মুখ খুলে গেল, "তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'বে যে একটিন্ জামের জন্য মেয়েগুলোর কাছ থেকে ওরা কত আদায় ক'রেছিল। শুন্‌বে তবে? দশ ফ্রাঁ। একে দিনে ডাকাতি ছাড়া আর কি বলি? গার্ট্রুড্ আমায় ব'লে কি জানো? এইটুকু একরত্তি একটা ছোট টিন্, হাফ্ ক্রাউনের চেয়ে বোধ হয় দেখ্‌তে বড় নয়। আর তার কিনা মুখে এক চামচ তুল্‌তে না তুল্‌তেই দাম হেঁকে বস্‌ল দশ ফ্রাঁ! নচ্ছার পাজীরা সব! ওদের জব্দ করবার জন্য গার্ট্রুড্ সঙ্গে করে টিন্‌টা বাড়ী নিয়ে এসেছিল। ঠিক্ করেছে সে। নয় কি, তুমিই বলোনা? এ তো আমাদের মনের উপর ব্যবসাদারী। বিদেশে আমরা গেছি আত্মীয় স্বজনদের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু দেখ্‌তে। তাই ওরা ঠাউরে নিয়েছে, যা' চাইবে তাই আমাদের দিতে হ'বে। এইটে হোল সত্যি কথা।" সজোর মন্তব্য ক'রে বৃদ্ধ উড্‌ফিল্ড্ এইবার যাবার জন্য উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালে। কর্ত্তা অন্যমনস্কভাবে বলে উঠ্‌লেন "ঠিক্ বলেছ।" কিন্তু কি যে ঠিক্, সে বিষয়ে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট র'য়ে গেল। তারপর ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে বন্ধুর পিছু পিছু দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে তা'কে বিদায় দিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে তাঁর শূন্য ও উদাস দৃষ্টি। এদিকে, কুকুর যেমন প্রভুর সঙ্গে বেড়াতে যাবার আশায় অধীরভাবে ছট্‌ফট্ করে, অফিসের দাসী তেমনি করেই তাঁরই প্রতীক্ষায় একবার ক'রে ঘরের ভিতর আস্‌ছিল, আবার ফিরে যাচ্ছিল। মনিব সচেতন হয়ে বল্‌লেন, "মেসী! আরো আধ ঘণ্টাটাক্ আমি আছি। ইতিমধ্যে কেউ যদি আসে, বোলো দেখা হবে না। কারুর সঙ্গেই নয়, বুঝ্‌লে?"

"যে আজ্ঞে।"

দরজা বন্ধ ক'রে কর্ত্তা গাল্‌চের উপর দিয়ে গম্ভীর, সশব্দ পদক্ষেপে ফিরে এলেন। তারপর স্বীয় স্থূলকায় দেহটা স্প্রিং চেয়ারে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে টেবিলের উপর ঝুঁকে সহসা দুহাত দিয়ে মুখ ঢাক্‌লেন। তাঁর মনে কাঁদ্‌বার বাসনা প্রবলভাবে জেগে উঠ্‌ল। সব দিকে সুবন্দোবস্ত ক'রে এইবার তিনি রীতিমত ভদ্রোচিত শোক প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হলেন।

যখন বৃদ্ধ উড্‌ফিল্‌ড হঠাৎ তাঁর ছেলের সমাধির কথা উল্লেখ ক'রে বস্‌ল, তখন তাঁর মনে গুরুতর আঘাত লেগেছিল। আর সে ব্যথা এমনি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, যে মনে হোল বুঝি বা পৃথিবী সহসা দ্বিধা হ'য়ে গেছে। তাঁর চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল একটী মর্ম্মান্তিক দৃশ্য,—তাঁর ছেলে শুয়ে রয়েছে কবরের মধ্যে আর উড্‌ফিল্‌ডের মেয়েরা তার দিকে চেয়ে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। কি আশ্চর্য্য! ভাব্‌তেও অদ্ভুত লাগে যে মাঝে দীর্ঘ ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে, তবুও মৃতপুত্রের যে শেষ স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে জাগরূক রয়েছে সেটী হ'ল—সমর-বেশে সজ্জিত, অক্ষতদেহ, চিরনিদ্রিত একটু যুবকের প্রতিকৃতি। বেদনায় তাঁর হৃদয় মথিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অদম্য উচ্ছ্বাসে মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, "বাছা আমার!" কিন্তু এখনও চোখে অশ্রুর আবির্ভাব হয়নি। কই, আগে ত এমন হ'ত না! প্রথম প্রথম ছেলের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে, এমন কি দু এক বছর বাদেও, তার কথা স্মরণ কর্‌তে কর্‌তেই এমন অসহ্য শোকে তিনি অধীর হ'য়ে উঠ্‌তেন যে খুব খানিকটা অশ্রুবর্ষণ না হ'য়ে গেলে তাঁর হৃদয় কিছুতেই শান্ত হ'ত না। সে সব দিনে তিনি সকলের কাছেই জোর গলায় ব'লে বেড়িয়েছেন যে কালক্ষেপে শোকের গুরুত্ব কিছু লাঘব হয় না। সময়-গুণে অন্য লোকে হয়ত আবার সুস্থ ও সমাহিত হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর যে বিয়োগব্যথা, সে চিরস্থায়ী। বাস্তবিক তাই নাকি কখনো সম্ভব? সে যে ছিল তাঁর একমাত্র সন্তান। তার জন্মগ্রহণের পর থেকে তিনি পরম অধ্যবসায়ের সহিত এই সুবৃহৎ ব্যবসাটী গড়ে তুলেছিলেন। আর আজ সেই ছেলেই যখন তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেল, তখন এই প্রাণহীন কাজের বোঝা ব'য়ে বেড়াবার কি দরকার? জীবন আজ তাঁর কাছে বিফল, অলীক স্বপ্ন মাত্র। মনে মনে এযাবৎ তিনি এই আশা পোষণ ক'রে এসেছেন যে একদিন সুদূর ভবিষ্যতে পুত্র তাঁর আসনটী অধিকার কর্‌বে এবং তাঁরই পরিত্যক্ত কর্ম্মভার নিজস্কন্ধে সগৌরবে তুলে নেবে। নতুবা, এই যে দিনের পর দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম, অর্থকরী ব্যবসায়ের কাছে হীন দাসত্ব স্বীকার আর আত্মাকে সকল প্রকার বিলাসসুখ থেকে বঞ্চিত করা, এসব কেমন ক'রে সম্ভব হোত?

সেই আশা ত আর একটু হ'লেই সফল হ'তে বসেছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ছেলেটী বছর খানেক ধ'রে অফিসে শিক্ষানবিশী কর্‌ছিল। প্রতিদিন একসঙ্গে পিতাপুত্র কাজে বেরোতেন, আবার এক ট্রেণেই ঘরে ফির্‌তেন। অমন ছেলের বাপ ব'লে কত লোকই না স্বেচ্ছায় এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে! সত্যি সে তার নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে কি সুন্দর ও সহজভাবে প্রবেশ ক'রেছিল! অফিসের সমস্ত লোক তা'র নম্র সৌজন্যে মুগ্ধ ছিল। সামান্য কেরাণী থেকে আরম্ভ ক'রে বৃদ্ধ দাসী মেসী অবধি সবাই তার সুখ্যাতিতে মুখর হ'য়ে উঠ্‌ত। কিন্তু এতো আদর ও প্রশংসাতেও সে নষ্ট হয়নি। সকলের সঙ্গে সরল বাক্যালাপ ও অমায়িক ব্যবহার ছিল তা'র প্রধান গুণ। চোখে তা'র সর্ব্বদাই উজ্জ্বল দীপ্তি ও বালকসুলভ চাহনি, আর সব কথাতেই সেই অপূর্ব্ব বলার ভঙ্গী,—"কী অদ্ভুত!"

কিন্তু সে সব আজ অতীত। পুরাণো কথা ভাব্‌লে এখন মনে হয় এসব ঘটনা বুঝি বা কোনো কালেই জীবনে ঘটেনি। সেই দিনের স্মৃতিটা কিন্তু আজো সুস্পষ্ট ও তীব্র, যেদিন মেসী তাঁর হাতে নির্ম্মম বার্ত্তাবহ টেলিগ্রামখানা তুলে দিলে, "আপনাকে জানাইতে অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করিতেছি যে………"

অফিস্ থেকে সেদিন যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি আর সে মানুষ নন্। এক মুহূর্ত্তে তাঁর জীবনসৌধ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

ছ' বছর আগে। ছ'বছর……উঃ! সময় কী ভীষণ শীঘ্র কেটে যায়। মনে হচ্ছে এ ব্যাপার যেন কাল হ'য়েছিল। কর্ত্তা মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। তাঁর কি বুদ্ধিলোপ হ'ল? মথার ভিতরে কিরকম যেন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। মনে বল সঞ্চার ক'রেও তিনি আর প্রকৃতিস্থ হ'তে পার্‌ছেন না। চেয়ার ছেড়ে পায়চারী কর্‌লে কেমন হয়? পুত্রের ছবিখানির দিকে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন। এখানা কিন্তু তাঁর মনোমত নয়। মুখের ভাবটা ঠিক্ ওঠেনি, কেমন যেন আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক। এ রকম প্রাণহীন ও কঠিন ছাপ তা'র মুখে ত কোনদিন ছিলনা।

হঠাৎ কর্ত্তার নজর পড়্‌ল তাঁর দোয়াত্‌দানীর দিকে। বড় দোয়াতটীর মধ্যে দেখ্‌লেন একটী মাছি উড়ে পড়েছে। আহা! আলোয় বেরিয়ে

আস্‌বার জন্য তার কি ক্ষীণ অথচ দুরন্ত প্রয়াস! ছোট ছোট পাগুলি যেন বল্‌ছে "আর পারিনা, আমায় সাহার্য্য কর।" কিন্তু দোয়াতের ভিতরটা বড় পিছল ও মসৃণ। মাছিটা উঠ্‌তে চেষ্টা ক'রে আবার প'ড়ে গেল। দোয়াতের ভিতরে কালীর মধ্যে সে সাঁতার কাটতে লাগল। কর্ত্তা একটা কলম দিয়ে ভয়ার্ত্ত জীবটাকে বাইরে তুলে ফেলে তা'কে একটুক্‌রো ব্লটিং কাগজের উপর ঝেড়ে রাখ্‌লেন। এক মুহূর্ত্তের জন্য মাছিটা চুপ্ ক'রে প'ড়ে রইল। গা দিয়ে তার কালী ঝর্‌ছে, খানিকটা ব্লটিং কাগজে শুকিয়ে গেল। তার পর ধীরে ধীরে সাম্‌নের পাগুলি একটু নড়্‌ল। তাই দিয়ে কাগজের উপরটা আঁকড়ে ধ'রে মাছিটা তা'র সিক্ত দেহটা টেনে খাড়া করল্। এইবার শরীর সংস্কারের আয়োজন সুরু হ'ল। একটা পা একবার পাখার উপর তুলে দেয়, আবার পরমূহূর্ত্তেই নামিয়ে নেয়। এই ভাবে খানিকক্ষণ গাত্র-মার্জ্জন চল্‌লো। ক্ষণিক বিরতির পর মাছিটা পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে ক্ষুদ্র পাখা দুটী বিস্তার করতে চেষ্টা করলে। সফলতার আনন্দে সে দিশেহারা হ'য়ে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্। তারপর বিড়ালের মত অখণ্ড মনোযোগের সহিত নিজের কালী-মাখা মুখখানি পরিচ্ছন্ন কর্‌তে বসে গেল। যে রকম হাস্যকর ভঙ্গীতে মাছিটা তার ছোট ছোট পাগুলি নিয়ে ঘসাঘসি করছিলো তা'থেকে কল্পনা করা কঠিন নয় যে কতটা আশাতীত পুনরুজ্জীবনের আনন্দে তা'র মন প্রাণ উচ্ছল! ভীষণ বিপদ্ কেটে গিয়েছে। অতি কষ্টে এ যাত্রা বেঁচে গিয়ে সে এখন অনাবিষ্কৃত ভবিষ্যতের পথে নূতন জয়যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে কর্ত্তার মগজে সহসা নব প্রেরণার উদ্বোধন হ'ল। কলমটা তিনি কালির মধ্যে ডুবিয়ে নিলেন। পরে নিজের সুপুষ্ট কব্জিখানা অতি সন্তর্পণে ব্লটিং কাগজের উপর রাখ্‌লেন। মাছিটা এইবার যেই পাখা মেলে উড়্‌তে যাবে, অমনি উপর থেকে নাম্‌ল মসীর বিন্দুপাত। এ আবার কি? কিছুই ঠাহর হয় না যে! অনাগত নব বিপদের সূচনায় ক্ষুদ্র প্রাণীটী বিস্ময়ে স্তব্ধ ও ভয়ে মুহ্যমান হ'য়ে পড়্‌ল। পাছে আবার কিছু সাংঘাতিক ঘটে, এই ভেবে সে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইল। আর নড়্‌বার নাম নেই। তারপর সাহসে ভর ক'রে অতি কষ্টে টল্‌তে টল্‌তে

অগ্রসর হোল। প্রথমে সামনের পাগুলি ঈষৎ কম্পমান; তারপর প্রতিটী পদক্ষেপ স্থির এবং সুনিশ্চিত হ'য়ে এল। যাত্রা আবার গোড়া থেকে সুরু হোল।

কর্ত্তা ভাব্‌লেন, "কী ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু জীব!" বাস্তবিক এই নগণ্য প্রাণীটীর সাহস ও স্থৈর্য্য দেখে তাঁর মনে অবিমিশ্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হোল। এই ত হোল কঠিন বাধা-বিপত্তিকে আয়ত্ত কর্‌বার প্রকৃষ্ট মনোভাব। সমস্যাবহুল জীবনকে এই ভাবেই ত বরণ করা উচিত; কখনও হাল ছাড়্‌তে নেই। প্রশ্নটা তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই...। কিন্তু ততক্ষণে মাছিটা তা'র দুরূহ কার্য্য সমাধা করেছে। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি কলমটা ডুবিয়ে কালিতে ভ'রে নিলেন। তারপর তা'র নূতন পরিষ্কার করা গায়ের উপর আর একটী বড় ফোঁটা লক্ষ্য ক'রে ঝেড়ে দিলেন। এইবার কোথায় যাবে বাছা?

প্রতীক্ষাকুল নীরবতায় মুহূর্ত্তগুলি দীর্ঘ হ'য়ে উঠ্‌ল। আরে, মাছিটা যে আবার সামনের শুঁড়গুলো নাড়ছে! কর্ত্তার মন থেকে দুশ্চিন্তার ভার অপসৃত হ'ল। মাছিটার উপর ঝুঁকে প'ড়ে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লেন, "সাবাস্, ক্ষুদে সয়তান!" একবার খেয়াল হোল, যে আস্তে আস্তে ওর গায়ের উপর ফুঁ দিয়ে আত্মরক্ষায় সাহায্য করলে বেশ হয়। কিন্তু তা' কর্‌বার দরকার হোলনা। কর্ত্তা লক্ষ্য ক'রে দে্‌খলেন যে এবার তা'র প্রচেষ্টা বড় ভীরু ও ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে, যেন আর পার্‌ছেনা। ঠিক্ কর্‌লেন, আর একবার, এবং সেটাই হবে চরম পরীক্ষা।

শেষই বটে! যেমনি ভিজে ব্লটিং কাগজের উপর আর একটী কালীর ফোঁটা পড়্‌ল, মাছিটা অমনি হাত পা গুটিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। নড়বার শক্তি তা'র ফুরিয়েছে। পেছনের পাগুলি গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে গিয়েছে; সামনের দুটীও অদৃশ্যপ্রায়! কর্ত্তা উত্তেজিত স্বরে বল্‌লেন, "উঠে পড়্‌ চট্‌পট্‌।" বৃথাই উৎসাহবাক্য। প্রাণস্পন্দ তা'র জন্মের মত থেমে গিয়েছে। নিবের ডগাটা দিয়ে তা'কে একটু নেড়ে দিলেন; নড়্‌লনা।

কাগজ-কাটা ছুরীর সাহায্যে মৃতদেহটা তুলে নিয়ে কর্ত্তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে সেটীকে সযত্নে নিক্ষেপ কর্‌লেন।

তারপর কর্ম্মশেষের বিরাট্ শূন্যতা। মনের ভিতর থেকে একটা বিশ্রী ভাব জেগে উঠ্ল। ক্রমশঃ সেই অস্বস্তিবোধ এত বাড়্তে লাগল যে কর্ত্তা সত্যিই ভীত হ'য়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ঘণ্টাটা টিপে ধরলেন মেসীকে ডাক্বার জন্য। মেসী এলে তাকে কতকটা রুক্ষ-স্বরেই আদেশ কর্লেন, "নতুন এক শিট্ ব্লটিং কাগজ এনে রাখো, শীগগির।"

দাসী চ'লে গেল। কর্ত্তা তখন ভাব্তে লাগলেন, এর আগে তিনি কি বিষয় নিয়ে চিন্তা কর্ছিলেন। উঃ; ঘামে সারা গাটা ভিজে গেছে। রুমালটা কলারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তাইত! এতক্ষণ আত্মস্থ হয়ে…

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কথাটা কিছুতেই মনে পড়ল্ না……

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতা-গুচ্ছ

শোক ও সান্ত্বনা

মুখখানি শুকায়েছে তার
নিদারুণ শোকে
ভাই তার নাই মরলোক্‌।
অধরে করুণ হাসিধার
অসিধার সম
নীরবে চিরিছে হিয়া মম।
গৃহ-কাজে জোড়া দুই হাত
রাঁধিছে বাড়িছে
না জানিয়া এ হিয়া ফাড়িছে।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ
পৃথিবীতে হায়
সে আমারে বুঝাইতে চায়।

মন তার দূরে দূরে দূরে
উড়িতে উড়িতে
নাড়া দেয় কাঁকণে চুড়িতে।
স্মৃতি তার লুকাইয়া ঘুরে
খেলাঘর খুঁজি
আঁচল খসিছে তাই বুঝি ?
আঁখি হতে নামে না প্রপাত
ক্ষীণ বাষ্প-রেখা
সিক্তপ্রায় আঁখিপাতে লেখা।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ
পৃথিবীতে হায়
সে আমারে বুঝাইতে চায়।

আমি তারে পারিব বলিতে
হেন বাণী কই ?
কখনো বা মৌন হয়ে রই।
কখনো বা ভুলায়ে তুলিতে
পাড়ি অন্য কথা
যদি হয় শোকের অন্যথা।
বিতর্কের করি সূত্রপাত
রাজনীতি তুলি
সংবাদ পত্রিকাখানা খুলি।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ
এই পৃথিবীতে
আমি তারে চাই বুঝাইতে।

বুঝে লয় চকিতে সে ছল
মহা তর্ক করে
চতুর্গুণ উৎসাহের ভরে।
দুহাতে সরায় বিশৃঙ্খল
কেশ বা কেশর
তর্ককালে প্রতিবন্ধ ওর।
পাছে কারো লাগিবে আঘাত
কেহ নাহি বলে
যে কথা শ্বসিছে হৃদিতলে।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ
পৃথিবীতে হায়
দুঁহু দোঁহে বুঝাইতে চায়॥

লীলাময় রায়

শার্দ্দূলের ব্যথা

জরাতুর নখহীন দন্তহীন কামনা আমার
হৃদয়-গুহার তলে অশ্রু-আঁখি করে হাহাকার।
সম্মুখের বনপথে শঙ্কাশূন্য মন্থর-চরণ
সুন্দরী যৌবনময়ী হরিণীরা করে বিচরণ
অহরহ ; চারুগ্রীবা লীলাভরে বাঁকায়ে বাঁকায়ে
ঘৃণাগূঢ় বিদ্রূপের মৃত্যুনীল গরল মাখায়ে
অপাঙ্গ-কুটিল কালো বিচঞ্চল নয়নের শর
মোর বক্ষ লক্ষ্য করি ওরা আজ হানে নিরন্তর।

ওদের নধরদেহ পরিপূর্ণ পেশল কোমল,
ওদের চিক্কণ কান্ত রোমাবলী বিচিত্র উজ্জ্বল,
ওদের চপল পায়ে মধুচ্ছন্দ চটুল নর্ত্তন,
ওদের অলস অঙ্গে বলয়িত মৃদু আবর্ত্তন,
ওদের আবেশে আধো-নিমীলিত আয়ত নয়ন,
ওদের ত্বকের গন্ধ...একদিন মোর দেহমন—
যেদিন জীবন মম যৌবনের ছিল নাট্যশালা,
সংক্ষুব্ধ রক্তের ধারা বক্ষে বহি আগুনের জ্বালা
ছুটিত উত্তালবেগে, সেইদিন—এই দেহমন
পলকে উন্মত্ত করি জাগাইত রোম-হরষণ।
বিবশ বিহ্বল আমি উদ্বেলিত ক্ষুধায় নিষ্ঠুর
অমনি ওদের বুকে ঝাঁপাইয়া করিতাম চূর
যৌবনের সর্ব্ব গর্ব্ব।...

বুভুক্ষার ক্ষণিক বিরাম—
মধুর আলস্যভরে গুহাতলে আঁখি মুদিতাম।
আবার বাহিরে আসি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ চরণে
দেহ ঢাকি বনানীর ঘনশ্যামে গূঢ় আবরণে

প্রতীক্ষায় রহিতাম কোনো এক নির্ঝর-কিনারে,
কিম্বা কোনো ছায়াচ্ছন্ন ম্লান-পদ্ম পল্বলের ধারে।
ওপাশে পল্লবতৃণ অকস্মাৎ উঠিত দুলিয়া ;
ক্ষণপরে শঙ্কায়ত সচকিত নয়ন তুলিয়া
হরিণী দাঁড়া'তো আসি সাবধানে—সর্ব্বদেহ মম
শিহরি উঠিত কাঁপি ভূমিকম্পে বসুন্ধরাসম।
নিমেষে ফেনিল লাভা উল্লাসে করিয়া উদ্গীরণ
ঝিমা'য়ে আসিত মোর তৃপ্তি-ক্লান্ত বহ্নিগিরি মন।

সেই-ওরা আজি মোর সম্মুখে নির্ভয়ে চ'লে যায়,
আমি শুধু চেয়ে থাকি শক্তিহীন মূঢ় বুভুক্ষায়!

আজো আমি বেঁচে আছি! কেন আছি? একি অভিশাপ!
তরুণ মনেরে ঘিরে মুমূর্ষু জীবন—মহাপাপ।
এ পাপ আমার নয় ; হে ঈশ্বর, তুমি অপরাধী—
তুমিই রচনা করো (কেন করো ?) দেহের সমাধি
না ফুরাতে লালায়িত হৃদয়ের লোলুপ যৌবন!
জরাতুর ইন্দ্রিয়ের কারাগারে অসহায় মন
অবিরাম কাঁদে যতো স্বর্গে ততো হাসে ভগবান্
লীলার আনন্দে—হায়, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্!

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

সনেট

(রুপার্ট ব্রুকের অনুসরণে)

আলোক-চুম্বিত তনু, বায়ু ক্ষিপ্র-গতি,
লভিনু শয়ন মোরা তৃণশয্যাপরে,

তুমি প্রিয়া বলেছিলে ম্লান খিন্ন স্বরে
"আলো, বায়ু, বিহগকাকলী, বসুমতী
মায়া-ঘেরা রবে অচঞ্চল, যবে জরা
করিবে হরণ নয়নের রূপ-শিখা।"
"রহিবে অম্লান সদা জীবন-বর্ত্তিকা
প্রেমিকের ওষ্ঠাধরে; লভিয়াছি মোরা
শ্রেষ্ঠ স্বর্গ হেথা, হে মোর অন্তরতম।
মোরা গাহি জীবনের গান সুনির্ভরে;
মোরা সত্যব্রতী, ধরিত্রীতে শ্রেষ্ঠতম।
বরণ করিব মোরা অকুণ্ঠ অন্তরে
মৃত্যুর অসূর্য্য অন্ধকার"—এত বলি
উল্লসি উঠিনু যবে—তুমি গেলে চলি।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

সনেট

(উইলফ্রিড গিবসন হইতে)

সহসা পল্লবঘন ছায়া-লোক ছাড়ি
উত্তরিনু মোরা স্বপ্নলোকে; বীতছায়া
শুভ্র চন্দ্রালোক হেথা রচিয়াছে মায়াঃ
নিস্পন্দ, বিষণ্ণ, মৌন, একখানি বাড়ী
চন্দ্রিকা-প্লাবনে মগ্ন! বিমূঢ় বিস্ময়ে
রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইনু তোরণের পাশে,
সুচির বৎসর যেথা ভুঞ্জিবার আশে
এসেছিনু, তারই পানে চাহিনু সভয়ে!
এ কোন অজ্ঞাত লোক, ধরা হ'তে দূরে?
নয়ত এ প্রেত-পুরী? বিস্ময়-উচ্ছল

নিবিড় রহস্যলোকে আলোক-বন্যায়
মোহাচ্ছন্ন রহিনু দাঁড়ায়ে ভীতিভরে—
মনে হ'ল কত ছায়া-প্রেমিকযুগল
গভীর নিদ্রায় মগ্ন মোদেরই শয্যায়।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

বুভুক্ষা

(এরিসা কেনেল্ রচিত Hunger Infinite অবলম্বনে)

মানুষের ক্ষুধা
একান্ত বন্ধনহীন, অসংযত তুরঙ্গম সম
অসহায় অন্ধ গতি, লজ্জাহীন নৃশংস নির্ম্মম,
পিষিয়া শোষিয়া চায় নিঃশেষিতে রূপের বসুধা!
আকাশের নীল
ম্লান করি উঠে তার বিষাক্ত ফুৎকার—
নীরন্ধ্র খনির গর্ভে গুমরায় তার হাহাকার ;
ধূমায়িত আরক্ত সর্পিল,
সংখ্যাতীত লোল জিহ্বা মেঘে মেঘে করি প্রসারণ
ছুটিছে সে দিকে দিকে, নাহি জানে নিজ গতি-সীমা,
অপার চলার গর্ব্বে বাড়ে তার উলঙ্গ গরিমা,
ছন্দোহীন উন্মত্ত গর্জ্জন !

প'ড়ে আছে প্রাণহীন পথ—
আদিম সৃষ্টির বুকে অতিকায় সরিসৃপবৎ
পিচ্-ক্লিষ্ট ক্লেদাক্ত নিশ্চল—
বিকট ঘর্ঘর স্বনে ছুটিয়াছে বুভুক্ষার রথ,
অগ্নিময় শতচক্রে বিচ্ছুরিয়া উত্তপ্ত গরল !

বিক্ষত বিকৃত-গাত্র বসুন্ধরা খালি পাশ ফিরে
বহ্নিমান্ বিষ-বাষ্প সঞ্চারিছে দীর্ণ বক্ষ চিরে;
মৃতপ্রায় মাটির জঠরে—
তবু চলে জয়রথ অহোরাত্র দুরন্ত ঘর্ঘরে !

শুধু ক্ষুধা, মানুষের ক্ষুধা—
তীব্র, তীক্ষ্ণ, তিলে তিলে গিলিছে বসুধা !
স্বপ্ন নাই, শান্তি নাই, নাই তৃপ্তি-প্রাপ্তির উল্লাস ;
রুদ্ধ অপূর্ণতা ভারে হাহাকারে লুটায় বাতাস
ভিত্তির প্রকোষ্ঠ-গাত্রে, ইষ্টকে, প্রস্তরে—
লৌহ-উদ্বন্ধন-পিষ্ট শ্লথ-স্রোত সরিতে-সাগরে !

নগরীর লক্ষ দীপাধার
ঝিমায়ে ঝিমায়ে জ্বলে, অনির্ব্বাণ দীপ্র বুভুক্ষার
বীভৎস প্রেতিনী মূর্ত্তি······আপিঙ্গল, পাংশুল, সবুজ,
দিগন্তের কণ্ঠ রুধি অভ্রংলিহ চিমনী ও গম্বুজ
ঘোষিছে উদ্ধত কণ্ঠে, "চাই খাদ্য চাই !"
হাপর ফেলিছে শ্বাস, মাথা কুটি লুটিছে নেহাই
শ্রান্তিহীন হাতুড়ি-প্রহারে।
অগ্নিময় দ্রব লৌহ লেলিহান শত বাহু মেলি,
হুহু ক'রে ছুটে চলে পারদাক্ত ধাতু-বর্ম্ম ঠেলি,
ডাইসের অন্ধ কক্ষে, অন্ধতম মৃত্যু-অভিসারে !

বিশ্বব্যাপী একি যন্ত্রশালা !
সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি-কুণ্ডে অহোরাত্র কালানল জ্বালা !
সন্নত ফলক-শীর্ষে লম্বমান ধাতুময় তারে,
আবদ্ধ বিদ্যুৎ-ফণী ফুঁসিয়া-শ্বসিয়া বারে বারে,

অভিমানে আছড়ায় ফণা ;
প্রচণ্ড তাণ্ডবে তার শিহরায় ত্রস্ত দিগঙ্গনা !
টলে পৃথ্বী, টলে অভ্র, অন্তর্দাহে জাগে ভূকম্পন,
নিরুদ্ধ ক্ষুধার দাপে বেপমান গগন-পবন !

কামান-গর্জ্জনে,
গন্ধকের কটুগন্ধে, পিণ্ডীকৃত বারুদ স্ফুরণে,
দিকে দিকে জাগে আর্ত্তনাদ—
দুঃসহ সে ধ্বংস-যজ্ঞে কি প্রচ্ছন্ন ক্ষুধার সংবাদ !
অর্থ-গৃধ্নু বাণিজ্যের ক্ষুধা,
অসতর্ক মৃত্যু সম বাহু-বন্ধে বাঁধিয়া বসুধা,
আপন আবর্ত্ত মাঝে আপনারে ফিরায়ে ঘুরারে,
সহস্র ধ্বংসের বীজ জলে-স্থলে ফেলিছে ছড়ায়ে !
ছিন্নশির, ছিন্নবাহু, নাসারন্ধ্রে মস্তিষ্কক্ষরণ,
গতপ্রাণ লক্ষ নর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে ;
ক্লান্তিহীন শত যান শবদেহ করিছে বহন,
কবরে, চিকিৎসালয়ে, অনিবার্য্য মরণের ছায়ে !
নাহি কারো ক্ষোভ—
ভাঙ্গুর সমাধিস্তম্ভে মুমূর্ষুর আছে কোন্ লোভ ?
অপার ক্ষুধার ফাঁদে আপনারে দহিয়া নিঃশেষে,
ক্রূর সভ্যতার ভক্ষ্য লক্ষ প্রাণ ফুরায় নিমেষে !
শত-সৌধ-কিরীটিনী নিঃসঙ্কোচা লো নগ্না নগরী,
ধূলি-ধূম-সমাচ্ছন্ন এ প্রদোষে আজি প্রশ্ন করি—
এখনো মিটেনি ক্ষুধা ? লম্ফনে ঘর্ষণে
শিহরি রোমাঞ্চি উঠে সুবিশাল দেহ-আয়তন,
রাত্রিদিন ক্লান্তিহীন রূঢ় আলিঙ্গনে
নয়নে ফেনায়ে উঠে বিষ-খিন্ন পিঙ্গল মরণ !
তবু এ কুলটা ক্ষুধা অকৃপণ দেহ-পরিধিরে,

উদ্ভ্রান্ত পতঙ্গ সম গুঞ্জরিয়া কাঁদে ঘিরে ঘিরে ?
একবার শূন্য হতে আসে নাকি স্বচ্ছন্দ বাতাস ?
বস্তুর পাহাড় ভেদি, বন্ধহীন অসহ্য প্রকাশ
ফুটাইয়া তুলে নাকি অভিনব একটি প্রভাত—
স্বর্ণাভ অরুণালোকে পরিপূর্ণ সহজ সুন্দর,
জাগ্রত বিহঙ্গ-গীতে, জলস্থল, গগন-পবন,
অরণ্য প্রান্তর,
পরিতৃপ্ত, সুধাসিক্ত, মুখরিত, অগাধ, অবাধ,
মুক্তির আনন্দ-গানে—
এ করাল রাত্রি-অবসানে !

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শাশ্বতী

শ্যামলী বরষা সাঁঝের আঙিনাপরে
এলায়ে দিয়েছে শ্রান্ত শিথিল কায়া,
ছাড়া পেয়ে আজ লুকাচুরি খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো ছায়া।
অলখ শরৎ দাঁড়ালো সমীপে এসে,
শুনি সমীরণে তারি মৃদঙ্গধ্বনি ;
প্রতীক্ষণের অচল নিরুদ্দেশে
উতলা হয়েছে অকারণ আগমনী।
কুহেলীকলুষ দীর্ঘ দিনের সীমা
এখুনি হারাবে কৌমুদীজাগরে যে,
বিরহবিজন ধৈর্য্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে।

মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি,
নবান্নভোজে তাহারো আসন পাতা ;
পাছে চাহে শুধু আমারি উদাস আঁখি,
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ॥

একদা এমনি বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে আসি সহসা হাত রেখেছিলো হাতে,
চেয়েছিলো মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সেদিনো এমনি ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিলো তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া যত পাওয়া
খুঁজেছিলো তার আনত দিঠির মানে ;
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিলো কালের চিরচঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্ত্যে আনিলো ধ্রুবতারকারে ধ'রে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্ব্বলতা
প্রলয়ের পথ দিলো অবারিত ক'রে ॥

আজি সে-রজনী ফিরেছে সগৌরবে,
অধরা আবার ডাকে সুধাসঙ্কেতে ;
মদমুকুলিত তারি দেহসৌরভে
অনামা কুসুম আঁধারে উঠেছে মেতে।

আজিকে আকাশ নীল তারি আঁখিসম ;
সে রোমরাজির কোমলতা নব ঘাসে ;
তাহার রসনা পুন বলে—"প্রিয়তম" ;
আজি সে কেবল আরকারে ভালবাসে।
স্মৃতি-পিপীলিকা তাই এ-মাধুরী হ'রে
অমার রন্ধ্রে পুঞ্জিত করে কণা ;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

প্রিয়া ও পৃথিবী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
পৃথিবীর পথে—বুদ্ধদেব বসু।
উর্ব্বশী ও আর্টেমিস্—শ্রীবিষ্ণু দে।
প্রকাশক :— গ্রন্থকারমণ্ডলী।

কোজাগরী—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। প্রকাশক—প্রবাসী প্রেস।

অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু তিনজনই ক্ষমতাশালী নবীন লেখক। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম তুইজন বাংলা সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে নবীন ও প্রবীণ বর্ত্তমান সকল লেখকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ইঁহাদের তুইজনেরই রচনার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অমাবস্যা" সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

> অদ্ভুতের অবতারণার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র জবরদস্তি নেই। একটি নিবিড় আবেগ স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়ে দীপ্তি পাচ্ছে, শ্রাবণের সজল সন্ধ্যা-মেঘের গভীরতার থেকে বিচ্ছুরিত সূর্য্যাস্তরশ্মির মতো।

বুদ্ধদেবের প্রথম কবিতার বই "বন্দীর বন্দনা" সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ঐ একই কথা প্রায় একই ভাষায় বলিয়াছেন :

> এই রচনাগুলি জলভরা ঘন মেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্য্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত। ভয় ছিল পাছে সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের গলদ্‌ঘর্ম্ম প্রয়াস দেখা যায়।

অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেবের নব প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিবার কারণ কি পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কারণ এই যে এই তুইখানি বইয়েরই আচ্ছাদন-পত্রে রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট সযত্নে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাই স্বভাবতই তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং (পাঠক আমার মনের তুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিবেন) সহজেই মনকে তাহা প্রভাবান্বিত করে—অবশ্য আমি শুধু আমার মনের কথা বলিতেছি। তাই অত্যন্ত আশার সঙ্গে "প্রিয়া ও পৃথিবী" এবং "পৃথিবীর পথে" বই তুইখানি পড়িতে আরম্ভ করি এবং গভীর অধ্যবসায়সহকারে আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করি। বই তুইখানি আকারে ক্ষুদ্র, পড়িতে সময় বেশি লাগে না। তবু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল, কেননা মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে প্রথমবার পড়িয়া এমন একটি কবিতা এই তুইখানি বইয়ের ভিতর খুঁজিয়া পাই নাই, অথচ রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহাদের রচনা একেবারে সাধারণ বলিয়া ফেলিয়া দিতেও সাহস হয় না (পাঠক আমার ভীরুতা আবার মার্জ্জনা করিবেন)। তাই বার বার বই তুইখানি পড়ি—এই আশায় যে অনেক বড় লেখকেরই রচনার সৌন্দর্য্য প্রথমে ধরা পড়ে না, বারম্বার চেষ্টার পর পড়ে, ইঁহাদের সম্বন্ধেও হয় ত তাহাই হইবে। তুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই, তাই প্রত্যাশিত আনন্দের অভাবে সচেষ্ট অধ্যবসায়ের নিতান্তই প্রয়োজন ছিল।

তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন ইঁহাদের কবিতা আমার খারাপ লাগিয়াছে। এমন সুলিখিত কবিতা বাংলা ভাষায় সচরাচর পড়া যায় না। ভাষা ও ছন্দের উপর ইঁহাদের (বিশেষ করিয়া অচিন্ত্যকুমারের) দখল প্রশংসনীয়। এই দুইটি বইয়ের মধ্যে বোধ হয় এমন একটিও কবিতা নাই যাহা অশ্রাব্য বা অপাঠ্য। কিন্তু এমন কবিতাও একটি নাই যাহা বারবার পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে মনের উপর যাহার প্রভাব গভীরতর হয়।

ভাষার ও ছন্দের নৈপুণ্য সত্ত্বেও এইরূপ হইবার কারণ কি? প্রকৃত কবিত্ব শক্তির অভাব? ঠিক তাহা মনে হয় না। বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমার যে প্রকৃত কবি তাহাতে আমার অন্তত সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কথা মনে হয় যে তাঁহারা এখনো নিজেদের ভাষা খুঁজিয়া পান নাই। উচ্চশ্রেণীর রচনামাত্রেরই যাহা প্রধান লক্ষণ—ষ্টাইল—বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্যকুমারের রচনায় তাহার আভাসমাত্র নাই। ভাষার ও ভঙ্গীর যে নৈপুণ্য ইঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন তাহা ইঁহাদের স্বকীয় নহে, রবীন্দ্রনাথের বিপুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত। তাই নবীন লেখক হইলেও ইঁহাদের ভাষার আশ্চর্য্য পরিণতি দেখা যায়, অন্তত অচিন্ত্যকুমারের রচনায়, বুদ্ধদেবের তুলনায় তাঁহার হাত অনেক পাকা। তবে মনে রাখিতে হইবে বুদ্ধদেবের "পৃথিবীর পথে"র কবিতাগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে —১৯২৬-২৮ সালে—রচিত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে রবীন্দ্রনাথের ভাষা কি তাঁহার মৌরসী পাট্টা, অন্য কোনো লেখক কি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না? প্রতি দেশেই বড় বড় লেখকের রচনার মধ্য দিয়া ভাষার ক্রমোন্নতি হয়। রামমোহনের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা একটির পর একটি প্রতিভাশালী লেখকের হাতে নব নব শক্তি ও সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। এই শক্তি ও সম্পদ তো কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল লেখকেরই তাহাতে সমান অধিকার আছে। অবশ্য। কিন্তু রচনাভঙ্গী বা ষ্টাইল সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা চলে না—তাহা প্রতিভাবান লেখকমাত্রকেই স্বকীয় শক্তিতে অর্জ্জন করিতে হয়। কোনও লেখক যতই প্রতিভাশালী হোন্ না কেন, তাঁহার প্রথম বয়সের রচনার এই ষ্টাইল থাকে অসম্পূর্ণ এবং অপরিণত, কিন্তু তবু তাহা সম্পূর্ণ স্বকীয়। রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যা সঙ্গীত" পুস্তকে এই উক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন সন্ধ্যা সঙ্গীতে তিনি প্রথম নিজের সুর আবিষ্কার করেন। কাব্য হিসাবে এই বইখানি হয়তো উচ্চশ্রেণীর নহে—ইহার ভাষা ও ভঙ্গী অসংহত, অপরিণত, কিন্তু তবু ইহার ষ্টাইল কবির নিজস্ব, অন্য কাহারও নহে, ইহাতে কবি যাহা বলিতে চাহেন তাহা খুব মনোগ্রাহী ভাবে না হইলেও নিজের মতন করিয়া বলিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে রচিত "ভানুসিংহের পদাবলী"র ভাষা ও ভঙ্গী ইহার তুলনায় অনেক নিপুণ, কিন্তু তাহা কবির নিজস্ব নহে, যদিও "ভানুসিংহের পদাবলী"র মধ্যে প্রকৃত কাব্যের পরিচয় একাধিক স্থানে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবু "পৃথিবীর পথে" এবং "প্রিয়া ও পৃথিবী"র পরিণত ভাষা ও রচনাভঙ্গী তরুণ লেখকদ্বয় কি ভাবে সংগ্রহ করিলেন তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া এত কথা আসিয়া পড়িল, তাহার কারণ, আমাদের সৌভাগ্য হউক বা দুর্ভাগ্য হউক, বাংলা সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

এত ব্যাপক যে তাঁহাকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের আলোচনা চলেনা। বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমার যে-লেখকমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বাংলা সাহিত্যকে নবতর উন্মেষের পথে লইয়া গিয়াছেন এই দাবী তাঁহাদের নিজেদের মুখেই শোনা যায়। অনেক সময়ে জোর করিয়া উৎকট এবং অস্বাভাবিক রচনাভঙ্গী বা বিষয়বস্তুর সাহায্যে তাঁহারা নিজেদের নবীনত্ব ঘোষণা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। যাহাই হউক, বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্যের পূর্ব্বপ্রকাশিত দুইটি কাব্যগ্রন্থে অন্তত তাঁহাদের রচনা যে এই জাতীয় 'সৃষ্টিছাড়া নূতনত্ব'কে অবলম্বন করিয়া উৎকর্ষ অর্জ্জন করে নাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রশংসায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান দুইটি কাব্যগ্রন্থসম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা চলে। ইহাদের রচনাভঙ্গীতে যদি কোথাও সামান্যমাত্র উৎকটতা থাকিত তাহা হইলে হয়তো ইহারা এতটা বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত হইতনা। তবে বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও ইহাদের উৎকর্ষ আছে, কিন্তু সে উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে সৃজনী প্রতিভার দুর্নিবার আবেগের ভিতর দিয়া নহে, পরন্তু আভরণের প্রতিফলিত দীপ্তিতে। তাই মনে হয় এই দুইটি লেখকের মধ্যে যে-প্রকৃত কবিত্বশক্তি আছে এই আভরণভারে তাহা আজ চাপা পড়িয়াছে। যদি তাঁহাদের কাব্যপ্রতিভার অন্তর্নিহিত শক্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী না হয় তাহা হইলে একদিন হয়তো স্বকীয় আলোকে তাহা দীপ্যমান হইবে, কিন্তু আলোচ্য পুস্তকদ্বয়ে তাহার পরিচয় অতি সামান্যই পাওয়া যায়।

আরো একটু কথা বলিবার আছে। তাহা এই যে শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই যে ইঁহাদের উপর পড়িয়াছে তাহা নহে। বাংলাদেশের আরো দুই একটি কবির প্রভাব ইঁহাদের রচনায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধদেবের 'বিরহীর চিঠি' কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সজল হাওয়া হিম-আঙুলে
দিকনা তোমার খোপা খুলে;
কুন্দ কলি পড়ুক খসে'
ছড়াক বায়ে পরাগ-মুঠি।
বৃষ্টি তোমায় আদর করুক
পায়ের নখের আলতা খুঁটি।

এই কয়টি লাইন সত্যেন্দ্রনাথ লিখিতে পারিতেন। অবশ্য ইহার পরবর্ত্তী কয়টি লাইনের ভাষা সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ধার-করা হইলেও ভাব বুদ্ধদেবের নিজস্ব:

আঁচল ঈষৎ আলগা হ'লেও, নাই বা তা'রে বাঁধলে আবার,
গোপন তব গন্ধ সুধা, আজ ধরারে দাও কিছু ধার।

অচিন্ত্যকুমারের একটি কবিতা "লীলাবধূ ও আত্মা-বধূর"—কয়েকটি পংক্তি:

চটুলোল চারুনেত্র, কি বিচিত্র ভ্রুলতাবিভ্রম!
মঞ্জুল যৌবনকুঞ্জে উগ্রগন্ধ ফুটেছে বকুল;
বিকচ রুচির গণ্ড স্ফুটোন্মুখ, কবি মনোরম,
সুখ-পূর্ণিমার পার্শ্বে অমাবস্যা কালো এলোচুল!

অত্যন্ত সুলিখিত, সমস্ত কবিতাটি সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব কি ইহাতে সুস্পষ্ট নহে?

অচিন্ত্যকুমারের 'প্রিয়া ও পৃথিবী' বইটির নামকরণ হইয়াছে যে-কবিতাটির নামে সেই কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা গেল ঃ—

> আজি তুমি পলাতকা, মুক্তপক্ষ পাখী উদাসীন,
> ক্লান্ত, দূরনভচারী দিগন্তের সীমান্তে বিলীন।
> বিদ্যুৎ ফুরায়ে গেছে, কখন বিদায় নিল মেঘ,
> অবিচল শূন্যতার নভোব্যাপী নিস্তব্ধ উদ্বেগ
> আবরিয়া রহিয়াছে হৃদয়ের অনন্ত পরিধি,
> চাহিনা ঘৃণিত মৃত্যু, তব গুপ্ত হীন প্রতিনিধি।

এই পংক্তি কয়েকটিতে কাহার প্রভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পরের প্রভাব লেখক[illegible] যে সহজে আপন করিয়া লইতে পারেন তাহার সুন্দর পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। এই কবিতাটির মধ্যে যে-উৎকর্ষ দেখা যায় বুদ্ধদেবের বইতে তাহা কোথাও নাই, অচিন্ত্যকুমারের বইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বোধ হয় মাত্র এই একটি কবিতাতে।

'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস্' প্রণেতা শ্রীবিষ্ণু দে বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের দলভুক্ত এবং তাঁহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ এবং বোধহয় তাই তাঁহাদের অপেক্ষাও নবীনতার দাবী বেশি রাখেন—অন্তত তাঁহার কবিতা পড়িয়া সেই ধারণা হয়। অচিন্ত্যকুমারের রচনায় যে-মাধুর্য্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিষ্ণুবাবুর রচনায় তাহা বিরল। মাঝে মাঝে তাঁহার ভাষা ঠিক উগ্র না হইলেও একটু অদ্ভুত লাগে এবং অনেকস্থলেই তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়না। এই দুর্ব্বোধ্যতা বোধ হয় লেখকের অভিপ্রেত। শ্রীবিষ্ণুদে শুধু তাঁহার বইয়ের নামকরণে বিদেশী শব্দ অবতারণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বইটির ভিতরকার অনেক কবিতাতেও তাহা করিয়াছেন। "ড্যানায়" "ওরাওন", "ডিয়োটিমা," "স্থসি" "ম্যামথ" "নেয়াড" "নেপচুন", "ট্রিষ্টান," "ইসোল্ড্" এমনকি "নোজগে"—"চিরজীবী নোজাগ আমার"—প্রভৃতি নানা বিজাতীয় চেতন ও অচেতন নায়ক-নায়িকা এই ক্ষুদ্র বইটির অল্প-সংখ্যক পাতায় ভিড় করিয়া ভাষাতত্ত্বের এবং পুরাতত্ত্বের এক জটিল সংমিশ্রণ সৃষ্টি করিয়াছে। আরো আছে—'ষ্টিলনীল' সাগর এবং 'সিল্কমসৃণ' ললাট। এই জাতীয় বিশেষণ লেখকের দৃষ্টিশক্তির এবং স্পর্শশক্তির সূক্ষ্মতার পরিচায়ক। শ্রীবিষ্ণু দে নবীন কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যে-অদ্ভুতের অবতারণা বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্যকুমারের রচনায় নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ পরম আশ্বস্তি বোধ করিয়াছেন বিষ্ণুর কবিতায় তাহা মাঝে মাঝে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার রচনা-শক্তির উৎকর্ষের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্যকুমারের লেখায় দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য রচনা-শক্তি বলিতে শুধু ভাষার নৈপুণ্যের কথা নয়—সমগ্রভাবে কাব্যসৃষ্টির কথা বলিতেছি। এই তিনটি নবীন লেখকের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কবিতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সব সময়ে সুন্দরভাবে না হউক অনিবার্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, একমাত্র তাঁহারই রচনায় 'ষ্টাইল'-এর আভাস পাওয়া যায়, তাহা অপরিণত এবং অবশ্যই অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিবহুল, কিন্তু তবু তাহা ষ্টাইল। কিন্তু 'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস' পুস্তকের একটি কবিতা—'উর্ব্বশী'—এই সকল ত্রুটিও অসম্পূর্ণতাকে কাটাইয়া উঠিয়াছে মনে হয়। এই পত্রিকায় কবিতাটি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাই তাহার উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কয়েকমাত্র পংক্তিতে কবিতাটি সম্পূর্ণ। কিন্তু এই কয়েকটি পংক্তির সংহত আবেগে জলস্থলআকাশের বিপুল মায়া আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই

বিরাট পটভূমিকার উপর নরনারীর নিবিড় কামনা অসীম ব্যাপ্তিতে পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের "কোজাগরী"র সহিত আলোচ্য অপর তিনটি পুস্তকের ভাবগত বা ভাষাগত কোনো সাদৃশ্যই নাই। প্যারীমোহনকে এখনও ঠিক প্রবীণ বলা চলে না, কিন্তু অবশ্য তিনি অভিজ্ঞ লেখক। মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাঁহার কবিতার সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয় বহুদিনের। বেশ সহজপাঠ্য কবিতা তিনি লেখেন, ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার দখল আছে, কোনো 'থিওরী'র বালাই তাঁহার নাই। তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে আহরিত, ইহা তাঁহার মনের প্রসারের পরিচায়ক।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

Collected Poems—Herbert Palmer (Benn).
News from the Mountain—Richard Church
(Dent & Sons)

হারবার্ট পামার Cinder Thursday লিখে ব্যঙ্গরসিক (Satirist) বলে' নাম করেছিলেন। এই বইখানিতেও Cinder Thursdayর কয়েকটি কবিতা আছে, তাছাড়া ১৯৩১ পর্য্যন্ত তাঁর যত কবিতা বেরিয়েছে প্রায় সবগুলিই এতে স্থান পেয়েছে। বইটির পরিষ্কার ছাপা, অনাড়ম্বর প্রচ্ছদপট, সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। তবু মনে একটুখানি আশঙ্কা নিয়ে বইখানা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম,—অতি-আধুনিকতার কুয়াসা কাটিয়ে কিছু বুঝতে পারার ভরসা কম বলেই। সময়ের হিসেব দিয়ে বিচার করলে Palmer অতি-আধুনিক দলেই পড়েন। বইখানা প্রকাশিত হয়েছে এই বছরে, যদিও অনেকগুলি কবিতা আগেই নানা জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। দু'একটা কবিতা পড়বার পরেই মনে হ'ল অনেক দিনের পুরোণো সুর আবার ফিরে' পাচ্ছি। নিতান্ত সহজ সুরে এই আধুনিক কবি নিজের অনুভূতি বলে' গেছেন, কোথাও বাধা পায় নি। প্রকৃতির উদার আবেষ্টনে মানুষের মন চিরদিন মুক্তি পেয়ে এসেছে; মানবমনের এই চিরন্তন অনুভূতি কবির কথায় রূপ পেয়েছে।

"And yet, when I go walking through the woods,
On frosty days, and watch the falling snow,
I would renounce all culture's radiant moods
To live in ice-lands with the Eskimo."—'Snow'.

'Talking Water-এও এইভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। Nature in War-Timeএ যুদ্ধের বিভীষিকা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কতখানি নষ্ট করে তার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রকৃতি মূক, তা' না হ'লে মানুষের এই তাণ্ডবলীলার প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠত।

"If flowers could speak
And leaves and plants knew words
In what strange phrase of chiding would they seek.
To tell their anger at this clash of swords.

* * * * *

Shrapnel crushes them in its fierce caress;
The black guns chant a paean of their skill.
But little recks the world in its distress
The sorrow that is silent on the hill."

অনেকগুলি কবিতাই গত মহাযুদ্ধের ছবি দৃষ্টির সামনে এনে দেয়। যুদ্ধের শেষে মানুষের মনে যে বিতৃষ্ণা জেগেছিল কবিতাগুলিতে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এতে একদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই যুদ্ধের যে একটা বিরাট সৌন্দর্য্য আছে, তাও মনকে স্পর্শ করে।

"I wonder if they'll come to-night!
The round moon rolls in silvery light,
No sound throbs on the windless air.

* * * * *

For oh, to hear the mad guns go,
And watch the starry night aglow
With radiance of crackling fires
And the white searchlight's quivering spires"—Air Raid"

Air Raid এর মত ঘটনাও সুন্দর কবিতায় রূপান্তরিত হ'তে পারে, আধুনিক অনেক ঘটনা বা দৃশ্যের মত—Palmer তা' দেখিয়েছেন। মনে হয় যুদ্ধের এই দুই বিপরীত দিক কবির মনকে সমভাবেই স্পর্শ করেছে। যুদ্ধের প্রলয়লীলার অন্তরালে যে করুণ কাব্যরচনা চলেছে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি; The Epic of Two Foeman তার দৃষ্টান্ত।

"And the Angel of Death beat lightly
That they heard not his great drum's roll
As into the storm-wracked sunset
Soul was flung forth upon soul;
For the Highlander sobbed o'er the German.—
He was staring up at the sky.
Clatter! Whizz! Boom! Went the battle.
And the old red drummer passed by.
And eyes met eyes in the dim light;
And their souls like lashing rain
Smote together, locked, and were blended
In the shimmering whirlpools of Pain."

মানুষের ছোটখাট সুখ, দুঃখ, অনুভূতিও Plmerএর সার্থক লেখনীতে সুন্দর রূপ ধরেছে। এঁর কবিতায় কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্য যেমন আছে, তেমনই এঁর ভাষার কুহক মনে যে জাল বোনে তা' সহজে ছেঁড়ে না।

News from the Mountains—Richard Church-এর লেখা ছোট কবিতার বই। বইখানির ওপরে কবির Portrait। তাঁর বুদ্ধিমার্জ্জিত মুখের ভাবুকতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কবিতাগুলির মধ্যে একটি ভাবসমন্বয় আছে। বইখানির নামকরণে সেই ভাবধারার আভাস পাওয়া যায়।

"To you who creep below
Upon the ocean-bed of air,
I sound this trumpet-blare
From my island peak of snow."

এই কথাগুলি দিয়ে প্রথম কবিতা—News from the Mountain আরম্ভ হয়েছে। এই কবিতারই শেষে কবি বলেছেন,—

"Here stand I careless of my lovely dead,
Those whom I mourned below.
Cruel as stars,
And passionless as moonlight, I look down
Upon the waves of that mercurial sea
Which lies in lazy grandeur on human earth,
Where all I was, and even might be, sleeps,
Sleeps on beneath the drug of material air.
Now without mercy, I wake to solitude,
Lift up the silver trumpet of my madness
And blow defiance over the huddled world."

এই কবিতাটিকে বইখানির মুখবন্ধ বলে' ধরা যেতে পারে।

Churchকে অনেক সময়ে 'cold and austere' বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর lyric কবিতাগুলি পড়লে তাঁর প্রতি এই দোষারোপ ন্যায়সঙ্গত মনে হয় না। রিচার্ড চার্চ্চকে প্রধানতঃ lyric কবিই বলা চলে। সুন্দর ভাষায় লেখা ছোট কবিতাগুলি সহজ সৌন্দর্য্যে মন ভরে' দেয়। এই বইখানির শেষ কবিতা Silence এর দৃষ্টান্ত।

"Ah ! quiet in the woodland !
The beech-trees are still.
The cloud-shadows wander
Over the hill.
Farewell to the reaper ;
Farewell to the sun.
The tumult is over,
The task is done."

অল্প কথায় ছবি ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ! The Cornish Cliffএ কয়েকটি কথায়,—

"Night fell on the open Sea ;
And the ancient harbour folded
Its arms. One, two, and three,
The lamps in cottage windows gleamed
Down the dark water, shook and streamed,
While the last gull scolded."—

যে ছবিটি চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তা' তুলি দিয়ে আঁকা ছবির মতই স্পষ্ট ও সুন্দর। Caprice in Trafalgar Squareএ "Yesterday the sun came flirting to the fountains ;" এবং Supertitionএ—"All night the wind moaned Under the rooftree,"র মত lineগুলিও এই রকম ছবি মনে আনে। মানবজীবন, তার গভীর বেদনা, সূক্ষ্ম অনুভূতিও অনেকগুলি lyricএ প্রকাশ পেয়েছে। Crevasse, In the Beginning, The Prison, The Sound Within প্রভৃতিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"Withont misgiving, to be lost
A mile above the plain,
Enveloped in a mountain mist.
And the day dying.
Soundless, sightless, in the height,
Creatures of space we stood,
Defiant of the drums of fate
Patrolling through our blood."

—The Sound Within.

'The Musician at Rest' কবিতাটি J. E. Churchএর স্মৃতিতে লেখা। যিনি সুরকে রূপ দিতেন, তাঁর কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে চিরদিনের মত,—

"They have put him out of sound,
Into his silent sleeping place
Under the ground.'.

তবু যেন তাঁর সমাধির চারিপাশে অশ্রুত সঙ্গীত ভেসে বেড়াচ্ছে।

"How lovely the echo of music
That lingers about his grave,
Echo of the singing thoughts
He shaped and gave."

In After Years, The Difference, Then and Now, As Plato Says, An Exile, The Pagan, Night in Middle Life, Winter Gratitude প্রভৃতি কবিতাগুলির বিচার রসগ্রাহী পাঠক করবেন; সবগুলির কথা বলতে গেলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা।

Refutation কবিতাটি উদ্ধৃত করে' বইখানির পরিচয় শেষ করছি।

"I crumble in my fingers
This handful of sweet mould.
How passionate its savour.
I breathe it, and inspire
The life inherent,
The violet-promise,
The prophecy of wheat.
Here is my substance,
My lasting life :
Here is my strength
To challenge Plato
Who denied his own mother
In this handful of earth."

A Receiptএ কবি বলছেন

"Let the poem end
Serenely, and with grace."

তাঁর কবিতায় একথা সার্থক হয় নি কি ?

শ্রীশোভা সরকার

Psychology of Sex—by Havelock Ellis.—1933.

এখানি বিজ্ঞান পুস্তক। লেখক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক যৌনবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে এ সম্বন্ধে Studies in the Psychology of Sex নামে যে বৃহৎ সাত খণ্ড পুস্তক রচনা করেন তাতেই তিনি প্রসিদ্ধ হন। সে বই সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য নয়, তবু অনেকে হয়তো পড়ে থাকবেন। এ নূতন বইখানি অনেকটা তারই সারমর্ম্ম, তাছাড়া ইতি-মধ্যে আরও যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তাও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। অথচ বইখানি ছোট করে লেখাতে একখণ্ডেই সমাপ্ত হয়েছে। বিশেষ করে ডাক্তারী ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের এ সম্বন্ধে কিছু পড়ে রাখা দরকার, সেই উদ্দেশ্যেই এই manual for students রচিত হয়েছে। কিন্তু এভাবে বইখানি লেখাতে সাধারণের পক্ষেও ভাল হইয়াছে। আগেকার বই সাধারণের পড়বার উপযুক্ত ছিল না, কারণ মানুষের গোপন প্রবৃত্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে তাতে যে সব আবর্জ্জনা ঘেঁটে বের করা হয়েছিল, সাধারণের মন সেই দিকেই কৌতূহলী হয়ে উঠতো,—তাতে আসল কথা চাপা পড়ে যেতো। লোকে ভাবতো মানুষ বুঝি ভিতরে ভিতরে এমনই ভয়ানক প্রাণী। এ বইয়ে সে সমস্তই ছেঁটে ফেলা হয়েছে। ইনি এখন স্পষ্টই বলেছেন যে যৌন ব্যাপারটা আমরা অতিরঞ্জিত করে বুঝেছি, আমাদের সে ধারণার সংশোধন করতে হবে। জিনিষটাকে

ঠিকমত বুঝতে হলে নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে দেখা দরকার। আমরা বরাবর জানি যে সৃষ্টিরক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষের বিভাগ হওয়া প্রয়োজন,—নইলে প্রজনন হয় না। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানে জানা যায় যে প্রজননের এই একমাত্র উপায় নয়, প্রকৃতির হাতে এ ছাড়া আরও উপায় আছে। জীবজগতে তার যথেষ্ট উদাহরণ। নিম্নস্তরের অনেক জীবের স্ত্রী-পুরুষ বিভাগ নেই,—একই প্রাণীর অংশবিশেষ অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিংবা আপনা আপনি বিভক্ত হয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়। মানুষের মধ্যে যৌনবৃত্তির আরোপ দেখে বোঝা যায় যে প্রজনন ছাড়াও তার অন্য উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং প্রজননতত্ত্ব আর যৌনতত্ত্ব পৃথক জিনিষ, এবং পৃথকভাবে তার আলোচনা করা যেতে পারে। যৌন-সম্মিলন ছাড়াও যেমন প্রজনন হয়,—প্রজনন বাদ দিয়েও তেমনি যৌনসম্মিলন সম্ভব হতে পারে, এও দেখা যায়। তাতে কিছু অনিষ্ট হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হয় এবং প্রজননক্রিয়াকে ইচ্ছাধীন করা যায়। এই সকল ধারণা থেকেই তার নানা রকম উপায় আবিষ্কৃত হচ্ছে ও সেটাকে সভ্যজগৎ গর্হিত বলছে না।

Sex penetrates the whole person; a man is what his sex is। যৌনচৈতন্য মানুষের মজ্জায় মজ্জায়। রস বাদ দিয়ে রসগোল্লা যেমন কষ্টকল্পনা,—যৌনপ্রবৃত্তি বাদ দিলে মানুষও তাই। মানুষ যখনই ভাবে "আমি", তখনই সে ভাবে, হয় "পুরুষ-আমি", নয় "স্ত্রী-আমি"। বিশেষণটুকু বাদ দিয়ে বিশেষ্য হওয়াটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু এই বিশেষণের অনেক সময় অদল-বদল হয়ে যায়, এবং এই অব্যবস্থিততাই জীবের স্বভাব। কে কখন পুরুষ কে নারী, তার ঠিক থাকে না। "There is no such thing as a purely male or female animal; all animals contain elements of both sexes in some degree"। সুতরাং কাকে বলা যাবে পুরুষ, কাকে বলবো স্ত্রী? এর সহজ উত্তর হচ্ছে, যার মধ্যে পুরুষ-বীজ আছে সেই পুরুষ, আর যার স্ত্রী-বীজ আছে সেই স্ত্রী। কিন্তু এখন আর সে কথাও বলা চলবে না। জীব-বিজ্ঞানের মতে একথা ভুল। এখানে এসে পড়ে ভ্রূণজীবনের কথা, যেখানে পার্থক্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। ভ্রূণ প্রথম অবস্থায় থাকে ক্লীব, এবং একই জৈবকণা পুষ্টির তারতম্যে পরে রূপান্তর গ্রহণ করে, নতুবা স্ত্রীভ্রূণ ও পুরুষ-ভ্রূণ বলে কোন পৃথক বস্তু নেই। এখানে পুষ্টির তারতম্য ঘটায় অণ্ডগ্রন্থি (Testes glands)। যেখানে অণ্ডগ্রন্থি দেখা দেয় সেখানে তার রসক্রিয়ার ফলে ভ্রূণ হয়ে যায় পুরুষ, যেখানে তার অভাব থাকে, সেখানে ভ্রূণ হয়ে যায় নারী। প্রথম প্রভেদের এই একমাত্র পদ্ধতি। এর মধ্যে অণ্ডগ্রন্থি যার শীঘ্র দেখা দেয় তার পৌরুষভাব প্রচুর থাকে, যার কিছু বিলম্বে আসে, পুরুষ হলেও তার কতকটা নারীভাব এসে পড়ে। আর এক গ্রন্থি এড্রিন্যাল—তাও কতক পৌরুষভাব আনে। যে ভ্রূণের মধ্যে অণ্ডগ্রন্থি নেই অথচ এড্রিন্যাল ক্রিয়াশীল, সেইগুলিই পুরুষভাবাপন্ন স্ত্রী হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, পুরুষ আর স্ত্রীর মধ্যে যে তফাৎ, তার মধ্যেও নানা রকম intersexual elements থাকে। এই থেকেই চরিত্রগত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি,—বলা যেতে পারে এ সব গ্রন্থিরসের লীলা। কেবল জন্মকালে নয়, মানুষের জীবনভোরই প্রণালীবিহীন গ্রন্থিগুলি (Ductless glands) নিত্য রস সরবরাহ করতে থাকে, এবং তারই

সামঞ্জস্যের দ্বারা মানুষের চরিত্রের ওজন বজায় থাকে। কারণ রস দুরকমের হয়, উত্তেজক (hormones) আর দমনকারক (chalones)। এই দুই প্রকার রসের প্রভাবে স্নায়ুমণ্ডলীও দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে—Sympathetic ও Parasympathetic। রস ও স্নায়ুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, কখনও রস চালায় স্নায়ুকে, কখনও স্নায়ু চালায় রসকে। অতএব মানুষের মনের কল তৈরী হয়েছে স্নায়ু আর গ্রন্থি দিয়ে।

বিজ্ঞানের এই সব নূতন তত্ত্ব। দেখা যাচ্ছে মানুষের বিচিত্র চরিত্রের জন্য গ্রন্থিগুলিই কতকটা দায়ী। কিন্তু কেবল তাই নয়, মানুষের সামাজিক শিক্ষা দীক্ষারও দায়িত্ব আছে। আগেকার চেয়ে যৌনবিকৃতি এখন বেশী দেখা যাচ্ছে, তার কারণ আগেকার সভ্যতা ছিল সরল, এখনকার সভ্যতা জটিল। একদিকে যেমন বেড়েছে প্রলোভন ও উত্তেজনা, অন্যদিকে তেমনি বেড়েছে নানা রকম বাধা বিঘ্ন। কিন্তু মানুষ তবু সেই আদিম জন্তু। কাজেই ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে দ্বন্দ্ব। এর ফলে মানুষ যা হয়ে ওঠে তা আমরা নিত্যই দেখতে পাই। তাই বলে কিন্তু যেখানেই দেখবো মানুষের যৌনবৃত্তির মামুলি নিয়ম বজায় নেই, যেখানেই কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যাবে, সেখানেই তাকে বলবো perverse বা বিকৃত, এটা ঠিক নয়। Abnormality বা অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত হয়ে আছে। জীবজন্তুর মধ্যেও নানা রকম বিকৃতি দেখা যায়, সেগুলি স্বাভাবিক। মানুষেরও যে সকল বিকৃতি হয়, তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলেই বুঝি তার অধিকাংশই স্বাভাবিক—, অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত (acquired) নয়, জন্মগত (congenital)। অতএব দোষ দেওয়া চলে না,—তাকে সহজ বলেই মানতে হয়। এই কথাটাই নূতন করে শিখতে হবে যে মানুষের যৌন অভিব্যক্তি মাত্রেই সহজ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা অতিরিক্ততা-দুষ্ট না হয়। অতিরিক্ততাই অস্বাভাবিক—এবং সেটা বেশীর ভাগই কৃত্রিম সামাজিক দমননীতির অতিরিক্ততার প্রতিক্রিয়া। বাধা না থাকলে এ বিপত্তিও থাকতো না। বাধা আছে বলে যেটা ঢাকা দিতে যাই, সেটা নানাভাবে স্নায়ুবিপর্য্যয় ঘটায়,—বাঁধ দিয়ে বানের জল রোধ করলে যেমন তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মোটামুটি তাকে বলি স্নায়ুদৌর্ব্বল্য—আর স্নায়ু বিগড়ে গেলে গ্রন্থিও বিগড়ে যায়। বাড়াবাড়ি হলেই তখন সেটা রোগ—তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। ঔষধের দ্বারা গ্রন্থিগুলিকে কতক সামলানো যায় বটে কিন্তু এর আসল চিকিৎসা হচ্ছে চাপা দেওয়া মনকে মুক্তি দেওয়া ও বাধা-দ্বন্দ্বের যত কিছু ইতিহাস খুঁজে খুঁজে বের করা। সমস্ত রুদ্ধ কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনই মানুষ শাপমুক্ত হয়। গোপন পাপ প্রকাশ হলে তা আর পাপ থাকে না। Freud থেকে আরম্ভ করে আমাদের গিরীন্দ্রশেখর পর্য্যন্ত এই চিকিৎসাই করে থাকেন। কিন্তু তাতে ত সকল মানুষের দুঃখ ঘোচে না! দুঃখ ঘোচে Preventionএর দ্বারা,—অর্থাৎ আগে থেকে সাবধান করে দিলে।

এজন্য গোড়া থেকে,—অর্থাৎ ছেলেবেলা থেকে কাজ সুরু করতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই অল্পে অল্পে আমাদের যে ইন্দ্রিয়চৈতন্য জন্মায়,—তা পুষ্ট হয়ে ওঠে কতকগুলি কুশিক্ষা ও ভুল ধারণার ভিতর দিয়ে। ছেলেবেলায় খেলাচ্ছলে যা করা হয় সেগুলো তত দোষের হয় না,—যত হয় চারদিক থেকে তা পাপ বলে জানিয়ে দেওয়াতে। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জিনিষটার ওপর রং লাগিয়ে এমন

বিকৃত করে ফেলি যে তাকে রং ছাড়িয়ে সহজ করে আনতে অনেক বয়স কেটে যায়। ইন্দ্রিয়সম্পর্ক মাত্রকেই আমরা যেভাবে গোপন করে রাখি,—আর তার থেকে এর যে অর্থ দাঁড়িয়ে যায় সেটাই মস্ত ভুল, এবং ছেলেবেলা থেকেই সে ভুলের সুরু। আমরা এই শিখি ও শেখাই যে জিনিষটা উপভোগ্য কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত—কারণ এতে স্বাস্থ্য ও মনের হানি হয়। মনের হানি অবশ্য মন থেকেই তৈরী করা, কিন্তু এতে স্বাস্থ্যের বাস্তবিক হানি হয় না। একথা হ্যাভলক এলিস্ প্রমাণ করে দিয়েছেন। এটা ভাল করে দেখিয়েছেন যে ইন্দ্রিয়ের অতিব্যবহারে অনিষ্ট হয়,—অব্যবহারেও কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত সহজ ব্যবহারে কোনো ক্ষতি হয় না,—বয়সকালেও না, ছেলেবেলাতেও না। উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন বর্ব্বর মানুষদের জীবন। নিউ গিনির ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপের অধিবাসীরা ছেলে মেয়েদের উলঙ্গ রাখে, একসঙ্গে মিশতে কোনো বাধা দেয় না, তাদের সুমুখে যৌনবিষয়ের কথা বলা অশ্লীল বলে কেউ বিবেচনা করে না, এমন কি দরকার হলে তাদের কাছে বাপ মায়েরা নিজেদের আচ্ছাদন সম্পূর্ণ খুলে ফেলতেও দ্বিধা করে না,—অর্থাৎ এ সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে কিছু গোপন করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। আর ছেলেবেলা থেকে এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে তাদের কাছে কিছুই রহস্যময় থাকে না। তাই তাদের মন থাকে সুস্থ এবং অশ্লীলতা সম্বন্ধে অচেতন। তাই বলে তাদের শালীনতার অভাব আছে বা শ্রদ্ধা সমীহ নেই একথা মনে করলে ভুল হবে। এসব হচ্ছে মনের ধর্ম্ম, কোনো সামাজিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এদের স্নায়ুদৌর্ব্বল্য মোটেই নেই। ছেলেবেলায় যা কিছু করে, বয়স হলে তা ভুলে যায়। কিন্তু যেহেতু আমরা একে পাপ বলে জানি, সেইজন্য তার দাগ বুড়োবয়স পর্য্যন্ত আমাদের মনে লেগে থাকে। অন্য প্রাণীরাও যেটাকে সহজভাবে দেখে, আমরা বুদ্ধিমান জীব তাকে দেখি বাঁকাভাবে। আমাদের পুরুষানুক্রমে এমনি চলছে—এবং তজ্জনিত বিকৃতি বংশগত দোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এই ভুল ভাঙ্‌তে হলে বর্ত্তমান সামাজিক চাল বদলাতে হবে। ছেলেদের কুশিক্ষার বদলে সুশিক্ষার উপায় করতে হবে, আর ছেলেদের বাপ মায়েরাই তার ভার নেবেন। ছেলেরা বাপ মায়েরই কাছে প্রথম এ-সব কথা জানতে চায়। এটা তাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি। এতে বাধা দিয়ে কিছু লাভ নেই, যখন জানবেই তখন যতটা সম্ভব সহজভাবে অল্পে অল্পে জানিয়ে দেওয়াই ভাল। এ-ছাড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিথ্যা লজ্জার প্রশ্রয় না দিয়ে কিছুক্ষণ করে তাদের উলঙ্গ হতে দেওয়া ও তাদের কোনো অসভ্য আচরণ দেখলে নিষ্ঠুর পীড়ন করে তাদের মনে ভয় জন্মে না দিয়ে ভাল কথায় তাদের বুঝিয়ে দেওয়া ভাল। এ-সকল কেবল এলিসেরই মত নয়,—Bertrand Russelও এ কথা বলেছেন, ও আজকালকার অনেক মনীষী লোক এই কথা বলছেন। এমন কি "how a baby is born ; what every child should know" প্রভৃতি অনেক বইও বেরিয়েছে। অনেক child guidance clinicও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন যে কথা প্রথম বলতে আরম্ভ করে, তার অনেক কাল পরে সে কাজ করতে আরম্ভ করে। বলতে বলতে হয়তো অনেক দিন কেটে যাবে। কিন্তু তার পর হয়তো এমন দিন আসবে যখন অশ্লীলতা বলে কিছু কথা থাকবে না,—তা চাপা দেওয়ার জন্য কেউ ব্যস্তও হবে না।

অস্বাভাবিক বিকৃতিগুলির আলোচনার পর ইনি মানুষের স্বাভাবিক যৌনবৃত্তির আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে ভালবাসা বৃত্তিটি বড় স্থান পেয়েছে। পূর্ব্বে এটা কবিদেরই সম্পদ ছিল, কোনো Psychologyর বইয়ে এর স্থান ছিল না। কিন্তু এখন সে দিন নেই। ভালবাসা এখন আর্ট হিসাবে মনস্তত্ত্ববিদের আলোচ্য। আজকাল অনেকে বলে থাকেন ভালবাসা একটা কথার কথা, খুঁজে দেখতে গেলেই বেরিয়ে পড়ে মেকি। কিন্তু ইনি বলেন যে জিনিষটা দামী বলেই তার এত মেকি বেরোয়, যেমন আসল হীরা দামী বলে বাজারে তার এত রকম মেকি। মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ভালবাসা। Physiologyর ভাষায় একে বলা হয়—sexual instinct manifested through cerebral centres। ইনি বলেন এতে আসল কথাটা বাদ গেল। ভালবাসার মধ্যে নানারকম শরীরসম্পর্ক প্রভৃতি তো আছেই, তা ছাড়া আরো কিছু আছে। স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসায় যৌনসম্বন্ধটা কিছুদিনের মধ্যেই পিছিয়ে পড়ে যায়, তার পর দেখা যায় যে মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, এও সেই একই জিনিষ। মানুষের জীবনে এ এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তি, এর আখ্যা দেওয়া কঠিন। Love is difficult to define as life itself and probably for the same reasons. In all its forms love plays a part in society only less important than that of the instinct to live। অপরকে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুতে মানুষ নিজের সত্তার উপলব্ধি করতে পারে না। Struggle for existence অর্থাৎ স্বার্থরক্ষাই জীবের ধর্ম্ম, কিন্তু তার চেয়ে বৃহত্তর ধর্ম্ম হচ্ছে প্রেম, যার দ্বারা স্বার্থ সার্থক হতে পারে। এই প্রেমের একটা অবলম্বন চাই—অর্থাৎ এটা দ্বিতীয় ব্যক্তি সাপেক্ষ। আর কোনো-না-কোনো আকারে সেই প্রেম মানুষের চাই, নইলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

এ সম্বন্ধে ইনি যে কথা বলেছেন তা একেবারে কবির মতই শোনায়—
There can be no self without others and the craving for others, and we can not put aside others and the emotions which others excite without first putting aside the self. So that properly speaking love is involved in life and if love is an illusion, then life itself is an illusion"। অতবড় বৈজ্ঞানিকের মুখে এ কথা শুনলে অনেকটা আশা হয়।

এর পরই আছে বিবাহের কথা—অর্থাৎ প্রেমকে স্থায়ী আশ্রয় দেবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত। অপর পক্ষে, সৃষ্টিরক্ষা বজায় করে একজোড়া মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য আইনকানুন ঘেরা বাঁধা-রাস্তা। বহুকাল থেকে মানুষের সমাজে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত তা টি঳কে রয়েছে, যেহেতু এটা মানুষের প্রকৃতিগত naive desire to assist Nature by adding to what is normal the categorical imperative of custom and law। কিন্তু বিবাহ যে কেবল যৌনসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই করা হয় আর একদিনের মধ্যেই সে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এ কথা যেন কেউ মনে না করেন; "Marriage is much more than a sexual relationship. There are many marriages in which no sexual relationship ever takes place. It is as so many investigations show, compatibility which is the chief clue to satisfac-

tion in marriage"—অর্থাৎ আসলে এটা একটা হৃদয়জয়ের ব্যাপার। একজন চেতন মানুষকে আর একজন অপরিচিতের আত্মীয় করে তুলতে বিস্তর মেহনৎ ও সময়ের দরকার,—বিশেষতঃ আজকালকার দিনে দুজনের কেউই যখন বোকা নয়। এ-কথাটা বিশেষ করে মনে বুঝে রাখা দরকার। নইলে যে দিন বিবাহের গাঁটছড়া বাঁধা হবে তার পর থেকেই স্ত্রী অমনি স্বামীকে ডাকবে "জীবনবল্লভ" বলে,—এই প্রত্যাশা নিয়ে যিনি বিবাহ করেন তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বিবাহ হচ্ছে একটা সাধনা,—একটা বিশেষ আর্ট,—এবং বহুদিনের পর তাতে সাফল্য মেলে। "Marriage is really an achievement and often a very slow achievement. It can not be reached at a bound. Years may be needed before a relationship called marriage in the full and deep sense is achieved"। এই কথাটা আগে থেকে না জানার দরুণ মানুষের অনেক অশান্তি জন্মায়, এবং তাই থেকে সংসারে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়।

অনেকে বলে থাকেন, বিবাহে কোন সুখ নেই। আজকাল অনেক সময় দেখা যায় বাস্তবিক সেটা সত্য কথা। কিন্তু এলিস বলেন যে এতটা হোতো না যদি society did not so often disturb the vision of the young and misguide their first steps। আগে থেকে সমস্ত জেনে শুনে প্রস্তুত হ'য়ে যদি বিবাহ করা যায় তা হলে এ রকম অশান্তিও হয় না, এত ডাইভোর্সও হয় না। দোষ অনুষ্ঠানের নয়, দোষ মানুষের নিজের।

বিবাহ করে সত্য সত্যই মানুষ সুখী কিংবা অসুখী তা জানবার জন্য এক হাজার বিবাহিত নরনারীর জীবন-বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করা হয়েছিল। জানতে পারা গেছে যে তাতে স্বামীদের মধ্যে শতকরা ৫১জন ও স্ত্রীদের মধ্যে ৪৫ জন সুখী, বাকী অসুখী। অবশ্য বিবাহে কতটা সুখ আশা করতে পারা যায় এ সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরকম নয়। যাকে মনে করা যায় অসুখী তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় সে হয়তো ভুল বোঝে, কিংবা ভুল বলে, কিংবা দুবার দুরকম বলে। ইনি বলেন—Even when marraige remains imperfect, we find on deeper insight in most cases that many compensations have been achieved। বিবাহে মিল হতে অনেক সময় লাগে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ একরকম করে আপোষে মিল হয়েই যায়।

বিবাহের বয়স সম্বন্ধে এঁর মত যে বেশী বয়স অপেক্ষা কম বয়সে বিবাহই ভাল। অনেক পরীক্ষা করে তিনি বলেছেন যে বেশী বয়সে শরীর মন দুইই পেকে যায়, তখন দুটি কঠিন পদার্থকে একসঙ্গে জোড়া কঠিন হয়। নরম থাকতে থাকতে জুড়লে ভাল জোড় খায়। শরীরের তরফ থেকেও বলা যেতে পারে যে অল্প বয়সে প্রসবের কষ্ট হয় না, কিন্তু বেশী বয়সে হাড় শক্ত হয়ে যাবার পর প্রথম প্রসব বড় কষ্টের হয় ও প্রায়ই তাতে বিপদ ঘটে। কোন্ বয়স বিবাহের উপযুক্ত প্রকৃতি তার সীমা নির্দ্দেশ করে দিয়েছে—আমাদের সেটা মানা উচিত। It is a mistake to suppose that early adolescence is unfavourable. Nature has fixed the time limit at puberty. When we postpone the relationship to a still later period, we lay up for ourselves troubles."

অবিবাহিত ও বিবাহিত জীবনের পরস্পর তুলনা করে ইনি বলেন বিবাহিত জীবনই মোটের উপর ভাল। মনুষ্যজীবন সম্পূর্ণ উপভোগ করতে চাইলে বিবাহ করাই যুক্তিযুক্ত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এ কথা বাদ দিয়েও বিবাহের অন্য তাৎপর্য্য আছে। নিজের স্বার্থের মধ্যে মানুষ যখন আর একজনকে জড়িয়ে নেয়,—তখন স্বার্থবুদ্ধির অতীত হ'য়ে মানুষের জীবনে যে একটা নূতনতর হেতু এসে দেখা দেয়,—আর তা থেকে জীবনের যে নবতর উন্মেষ ঘটতে থাকে,—সেটা মানুষের উপলব্ধি হওয়া দরকার, কিন্তু বিবাহ ছাড়া আর কিছুতে তা হয় না। আমরা একে বলি "সংস্কার"। পূর্ব্বকালে দার্শনিকরা যুক্তিতর্কের দ্বারা যে সংস্কার মানুষের কর্ত্তব্য বলেছিলেন, আর এখনকার বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষদৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে স্বতঃসিদ্ধে এসে উপস্থিত হয়েছেন,—দুদিক থেকে সেই একই কথা। "There can be no doubt whatever that this condition even in the absence of children leads to the richest and deepest life experience."। এর মধ্যে অনেক দুঃখ আছে তা ঠিক, কিন্তু দুঃখের মধ্য দিয়ে ছাড়া জীবনের আস্বাদ মেলে না। সবই যদি সরল ও সুখের হোতো তা হলে it would be a feeble image of the world failing to give satisfactions to those who have drunk deeply of life।

অনেকে বলেন মানুষের যে সহজ শক্তি আছে, তা এই এক পথেই খরচ না করে যদি তাকে অন্য দিকে নিয়োগ করা যায়, তাতেও জীবনের উপভোগ হতে পারে, অথচ পৃথিবীর অনেক কাজ হয়। কিন্তু এক ভাবের instinctকে অন্য ভাবে খাটানো, যাকে বলা হয় sublimation বা পর্য্যবেশন, সে বড় শক্ত এবং তাতে অযথা অনেক অপচয় হয়। Dynamic forceকে অবশ্য নিষ্ক্রিয়ভাবে চেপে রাখা যায় না, তাতে নানা অনিষ্ট ঘটে। আর একে যত বড় উঁচুদরের কাজে লাগানো যাক—কৃত্রিম প্রয়োগ হেতু তাতে অতিরিক্ত শক্তিক্ষয় ও অবসাদ ঘটে। বয়লারে যতটা ষ্টীম উৎপন্ন হয়, তার অল্পটুকুই এঞ্জিন চালানোতে খরচ হয়, বাকী অনেকটা নীচুপথে অনর্থক নিকাশ হয়ে যায়। এঞ্জিন ষ্টীমের উপযোগী হওয়া দরকার।

আরও অনেক কথা ইনি বলেছেন যে সব কথা এখানে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। ইনি বলেন আজকাল সাধারণের পক্ষে এ সকল বিষয় শিখে রাখা ভাল। এখনকার দিনে এটা শিক্ষার জিনিষ বলেই মনে করতে হবে—It is certain that in civilisation such knowledge has to be taught। আর এ সম্বন্ধে কারোই দ্বিধা থাকা উচিত নয়,—we should not be ashamed to speak of what God was not ashamed to create। সাধারণে এসব কথা না বুঝতে পারলে প্রায় ডাক্তারদের কাছে যায়। সেইজন্য আজকালকার ডাক্তারদেরও এগুলি জেনে রাখা উচিত, সে কথা বার বার করে বলেছেন। শরীর-বিদ্যা সম্বন্ধে সব শিখে এ বিদ্যার কিছু না জানলে মস্ত একটা ফাঁক থেকে যায়। আজকালকার দিনে তাতে চলে না। তাতে রোগীর আসল রোগ ধরা যায় না, চিকিৎসায় ভুল হ'তে পারে এবং আনাড়ির মত উপদেশ দিয়ে নানারকম ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। Preventive Medicine হিসাবে এ-বিদ্যা তাদের আয়ত্ত করা দরকার।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

মহাপ্রস্থানের পথে—শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল
প্রকাশক আর্য্যপাবলিশিং হাউস্।

সাধারণতঃ ভ্রমণকাহিনী বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি মহাপ্রস্থানের পথে সেই জাতীয় পুস্তক নহে। মাসিক পত্রিকার পাতায় সাধারণতঃ যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার তালিকা, না হয় লেখকের গৃহীত ফটোগ্রাফ্-এর সাহায্যে নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা থাকে। এই সব বৃত্তান্তের একমাত্র আকর্ষণ ফটোগ্রাফ-গুলির। বলাবাহুল্য, এই প্রকার মোটরে কাশ্মীর যাত্রা অথবা সাইকেলে ভূ-প্রদক্ষিণ লেখকদের ঐশ্বর্য্য কিম্বা সাহসের পরিচায়ক হইলেও সাহিত্যপদবাচ্য নয়। বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যে একাধিক ভ্রমণকাহিনী সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যেও দুই তিন প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার "ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে" তিনি ছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতার ছাত্র এবং সমালোচক, 'জাপানযাত্রী' এবং 'যাত্রী'তে তিনি হইলেন দার্শনিক। পারস্যদেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার ঘটক। রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁহারা ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, একমাত্র জলধর সেন মহাশয় ব্যতীত আর সকলেই রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো যুগের লিখন-ভঙ্গীর অনুগামী। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' এই শ্রেণীর লেখার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য সাহিত্য রচনা।

প্রবোধবাবুর পুস্তকখানিতে কোনো পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভঙ্গী অনুকৃত হয় নাই ইহা তাঁহার লেখার একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য গুণের মধ্যে তার সুললিত স্বচ্ছন্দ মসৃণ ভাষাও উপভোগ্য। কিন্তু তাঁহার রচনার প্রধান গুণ এই যে তাহার বৃত্তান্তে একটি শিক্ষিত ভদ্র ও আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই লেখকের কাছে কোনো অন্ধ ভক্তির আহ্বান আসে নাই, পথ চলার নেশা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল। পথের কষ্ট সহ্য করিবার যে প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার উৎস ধর্ম্ম-প্রাণতা নহে, অজানা ও দুর্গম স্থানের প্রতি সহজ আকর্ষণ। হিমালয়ের পথে তীর্থের সন্ধান অপেক্ষা সহযাত্রীদের সাহচর্য্য তাঁহার নিকট বেশি মূল্যবান ছিল। বইখানি পড়িলে মনে হয় তিনি বিশুদ্ধ পর্য্যটক এবং তাহার মন উন্মুক্ত ও সজাগ।

কিন্তু আমার মনে হয়, যেখানে কেবলমাত্র যাত্রার আনন্দ সেখানে অতি শীঘ্র অবসাদ আসিয়া পড়ে। মনে হয় যে, প্রবোধকুমার মানব জীবনের অপরিসীম সম্ভাবনায় আস্থা রাখেন। আদর্শবাদীর নিকট, সাহিত্যে ও জীবনে "স্বর্গরাজ্যের" প্রতিষ্ঠা-কল্পনা স্বাভাবিক কিন্তু সেই সূত্রে যদি অতি পুরাতন সামাজিক সমস্যা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সেটি একটু অবান্তর ঠেকে। মাঝে ঈষৎ একটানা মনে হইলেও উপক্রমণিকা হইতে পরিশেষ পর্য্যন্ত কাহিনীর রূপটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রবন্ধাকারে আরম্ভ হইয়া শেষে ইহা উপন্যাসের আকার ধারণ করিয়াছে। সে যাহাই হউক্ দুই রূপই সাহিত্যের।—ইহাই বোধহয় পাঠক পাঠিকার নিকট যথেষ্ট।

শ্রীছায়াদেবী

The Inter-pretation of the Atom—By Professor F. Soddy—(John Murray).

রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর রশ্মিক্ষরণ আবিষ্কৃত হবার পর রসায়ণশাস্ত্র এক নূতন কলেবর লাভ করেছে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচুর বই প্রকাশিত হলেও শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে তেমন কোন বই প্রকাশিত হয় নি। The Interpretation of the Atom মূলতঃ এই অভাব দূর করবার জন্য লেখা। এ কাজের জন্য গ্রন্থকারের চেয়ে যোগ্যতর লেখক পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। রেডিয়াম আবিষ্কারের প্রথমাবস্থায় সডি স্বয়ং ও রাদারফোর্ডের সহযোগিতায় এই বিষয়ে নানা মূল্যবান আবিষ্কার করে বিষয়টির খুব উন্নতিসাধন করেছিলেন ও ১৯২১ অব্দে কেমিষ্ট্রিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। দুটি বিশিষ্ট আবিষ্কার Isotopes ও Displacement Law সডির দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে বইখানি লেখা তা সুচারুরূপেই সম্পাদিত হয়েছে। কেমিষ্ট্রি, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনেও এই বইটি ধৈর্য্য ধরে পড়া ও এর সারসংগ্রহ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে রাদারফোর্ডের দু' তিন বছর পূর্ব্বের প্রকাশিত বই—Radiations from Radioactive Substances এতই তথ্য ও তত্ত্বসঙ্কুল যে তার অনুধাবনা করা বৈজ্ঞানিক ও ছাত্র সমাজেই শোভা পায়, সাধারণের নয়; তা ছাড়া রাদারফোর্ডের বইটি পদার্থ বিজ্ঞানেরই অঙ্গীভূত, রসায়ণ সম্পর্কিত ব্যাপার তাতে অতি অল্পের মধ্যে সারা হয়েছে।

আজ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার মানবের জ্ঞানলিপ্সা ও বিচারের বিষয় হয়ে এসেছে তার মধ্যে দু'একটি ছাড়া পদার্থের মূল উপাদানের তুল্য আর কোন প্রহেলিকাময় প্রাচীন জিজ্ঞাসা আছে কিনা সন্দেহ। মনে হয় বহুকাল থেকেই অন্ততঃ একশ্রেণীর লোকের বিশ্বাস ছিল যে পদার্থজগৎ অখণ্ড বস্তুর খেলা নয়, দর্শনাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের সমষ্টিতে গঠিত। প্রাচীন যুগে প্রথম বৈশেষিক সূত্রকার (কণাদ) সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে প্রত্যেক পদার্থের মূলে রয়েছে সেই পদার্থের অদৃশ্য, অবিভাজ্য নিত্যদ্রব্য—অনু। পদার্থের রূপ গন্ধ স্পর্শাদি সমস্ত লক্ষণ এই মূল অনুরই সমষ্টিগত লক্ষণ। এই মূলগত লক্ষণ ছাড়া আর এক শ্রেণীর লক্ষণের কথা কণাদ উল্লেখ করে গেছেন যা পদার্থ লাভ করে সংযোগ বিয়োগ ও সমবায় ফলে। বৈশেষিক সূত্রকারের এই অনু ও আধুনিক বিজ্ঞানের Molecube এক। সংখ্য সূত্রেও অনুর কথা সবিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। Lucretius ও অনুকেই পদার্থের মূল উপাদান বলে স্থির করেছিলেন। আজকালকার বীক্ষণাগার ও যন্ত্রপাতির তুল্য কোন ব্যবহারিক সাহায্য ব্যতিরেকেও কেবল সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচন করে প্রাচীন দার্শনিকেরা যে কত খাঁটি নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন তা ভেবে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। এমন বহুবার দেখা গেছে যে পূর্ব্বে যা শুধু মানবের কল্পনাতেই উদিত হয়েছে তা পরে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গৃহীত হয়েছে। বাস্তবিক বিজ্ঞানের অনেক সম্পদবান আবিষ্কার যৌক্তিকতার ফলে আরব্ধ না হয়ে হয়েছিল স্পর্দ্ধান্বিত কল্পনাবলে—যে সব কল্পনা আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব থেকেই সূচিত হয়েছিল। কেউ কেউ এমন মনে করতে সুরু করেছেন যে এই বিশ্বনিখিলের আদি সত্ত্বা মন বা জ্ঞান জাতীয়, তাই যা কিছু আছে ও সম্ভব তার কল্পনা

মানসে আপনাহতেই জাগরিত হয়। এক সময়ে পারদকে সোনায় বা হীন ধাতুকে শ্রেষ্ঠতর ধাতুতে রূপান্তরিত করার কল্পনা করে অনেক জ্ঞানী গুণী অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছিলেন ও লোকসমাজে উৎপীড়িত ও উপহসিত হয়েছিলেন, আর আজ রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতু থেকে অন্য ধাতুতে রূপান্তরগ্রহণ চোখের সামনেই আপনাথেকে সম্পাদিত হচ্ছে। কে বলতে পারে আরও কত অন্ধ বিশ্বাস একদিন বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রমাণিত হবে না।

Atomic Theory এখন বিজ্ঞানের বিগত যুগের কথা। বইটিতে যে প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে সেটা বিজ্ঞানের আধুনিক যুগের, সেটা atom বা অনুর গঠন পদ্ধতি। এটুকু বোধ হয় বলা ভাল যে প্রাচীনেরা যে পর্য্যন্ত পৌঁছেছিলেন সে হল mobcules বা অণু,—পরবর্ত্তীরা অর্থাৎ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তা হল atom বা পরমাণু ও মৌলিকপদার্থ elements। এর পর আবার বিজ্ঞান নূতন করে যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তাই হল বইখানির আলোচ্য বিষয়। নব্যবিজ্ঞান মতে মৌলিকপদার্থ একেবারে মৌলিক নয়। মৌলিকপদার্থের আদিতে রয়েছে proton ও electron, সম-তড়িৎকণা ও বিষম-তড়িৎকণা, এদেরই বিভিন্ন সমবায়ে বিভিন্ন মৌলিকপদার্থের সৃষ্টি। অণুর কেন্দ্রীয় স্থানে এই দুই প্রকৃতির তড়িৎকণা কতকগুলি মিলে জমাট বেঁধে থাকে, সেটাকে বলা যেতে পারে কেন্দ্র-পিণ্ড, আবার এরই চতুর্দ্দিকে আর কতকগুলি বিষম তড়িৎ-কণা পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। এই আধুনিক তত্ত্বের সূত্রপাত হয়েছে রেডিয়াম প্রভৃতির ধাতুর আচরণ থেকে। সডি তাঁর বইখানির প্রথমার্দ্ধ এই সকল ধাতুর ও তাদের রশ্মিক্ষরণের বিবরণ দিয়ে পূর্ণ করেছেন। এমন চিত্তাকর্ষক বিষয় বিজ্ঞানে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। এখানে ঐ বিবরণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়াও প্রায় অসাধ্য। খুব সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে এই সব ধাতু আপনাহতেই তিনপ্রকার রশ্মিক্ষরণ করে ও ফলে এক মৌলিক পদার্থ থেকে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। রশ্মিগুলি হল সমতড়িতাণুর ঝাঁক, বিষমতড়িতাণুর ঝাঁক ও xray তুল্য একরকম আলোকরশ্মি। অবশ্য এগুলি সমান ভাবে বিক্ষিপ্ত হয় না, পরিমাণের ইতরবিশেষ আছে। সম তড়িতাণুক্ষরণের ফলে ধাতু একধাপ নীচের মৌলিকপদার্থে উপস্থিত হয়, বিষয় তড়িতাণুক্ষরণের ফলে একধাপ উপরের মৌলিকপদার্থে উন্নীত হয়। এরই নাম Displacement law। এই রকমে ইউরেনিয়াম ধাতু ৫।৬ ধাপ ওঠা নামা করে রেডিয়ামে ও রেডিয়াম আট নয় ধাপ ওঠানামা করে সীসকে এসে হাজির হয়। সমস্তটাই স্বস্ফুরিত, স্বপ্রবর্ত্তিত, কোন উপায়ে এর গতিবিধি পরিবর্ত্তিত করা যায় না। সে যাই হ'ক প্রাচীন লোকেরা যে পারদ থেকে সোনা লাভ করার স্বপ্ন দেখতেন সে কি এই সব স্বপ্রবর্ত্তিত ব্যাপার থেকে খুব তফাৎ? এতদিন একরকম তাই ধারণা ছিল বটে,—অর্থাৎ এতদিন মনে করা হত যে আপনা হতে যখন পারদ সোনা হচ্ছে না তখন কে এই অসাধ্য সাধন করতে পারবে। কিন্তু গত বৎসর কৃত্রিম উপায়েও ধাতু থেকে এই রকম সম ও বিষম তড়িতাণুক্ষরণ করা গেছে। সুতরাং এক ধাতুকে কৃত্রিম উপায়ে রূপান্তরিত করা একেবারে নিছক স্বপ্ন নাও হতে পারে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ধাতুথেকে এই রশ্মিক্ষরণ সৃষ্টির একটা বিপরীত ক্রিয়া, সুতরাং এটা ও অনুমিত হয় যে ঘটনাচক্রের যোগাযোগে যেমন আপনাহতেই মৌলিক

পদার্থের স্বতঃপ্রবর্ত্তিত ধ্বংস সাধন হচ্ছে তেমনি নিশ্চয় এমন কোন যোগাযোগ এক সময়ে হয়ে ছিল যখন মৌলিকপদার্থের সৃষ্টি সম্ভাবিত হয়েছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এ ব্যাপারে আমরা সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হয়েছি। পণ্ডিতেরা এখন মনে করেন যে সমস্ত মৌলিকপদার্থই হাইড্রোজন থেকে সম্ভূত অর্থাৎ এঁরা মনে করেন যে সম ও বিষম তড়িৎকণা যদৃচ্ছা একজোট হয়ে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না। তৎপরির্ত্তে প্রথমে দুটি হাইড্রোজেন অণু ও দুটি বিষম তড়িৎকণা একত্র যুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম কেন্দ্র উৎপন্ন করে, পরে এই হিলিয়াম কেন্দ্রের সমবায়ে অন্যান্য মৌলিকপদার্থের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ব্যাপারটা যেরকম সহজভাবে বর্ণিত হ'লে আসলে অবশ্য সেটা অত সহজ নয়। যা হক নব্য বিজ্ঞান পর্য্যালোচনার ফলে একটা খুব অভাবনীয় কাজ শেষ করা হয়েছে, সে হ'ল এই যে যত রকম মৌলিক পদার্থ বিশ্বে তৈরী হতে পারে তার ফর্দ্দ করে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ করে ফেলা হয়েছে। এদের সংখ্যা মাত্র ৯২টি ও তার মধ্যে ৯১টি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, বাকি একটি আবিষ্কৃত হতে বোধ হয় বেশীদিন দেরি নেই, সেটি আবিষ্কৃত হয়ে গেলে আর নতুন কোন মৌলিকপদার্থ আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ করবার অবশিষ্ট কিছু থাকবে না। ভাবতে বড় চমক লাগে যে জ্ঞানের একটা দিক এমন নিঃশেষিত ভাবে সম্পূর্ণতা পেতে পারে!

এ সব ছড়া atom এর গঠন সম্বন্ধে আরও অনেক গুরু ও লঘু প্রমাণ আছে—যথা বর্ণচ্ছত্রের বিশ্লেষণ, অণু ও পরমাণুর নানা আচরণ, নানা রকম প্রেক্ষণ (experiments) ইত্যাদি। এ সবের চেয়েও সার কথা এই যে অণু পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি সিদ্ধ হয়েছে Qumtum theory, Election theory, Wave mechanics, Relativity প্রভৃতির সমবেত সহযোগীতায়। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে যে সডি এ সকলের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করতে ও এগুলিকে আজগুবি বলতে ছাড়েন নি। তিনি বইটির মুখবন্ধে লিখেছেন "The fundamental reconstruction of our outlook upon the world of matter, energy, space and time which is now being attempted mainly as the consequences of the Succeses of the theory of Relativity, seems to neglect the ordinary phenomena of nature in favour of the exceptional." আর এক জায়গায় লিখেছেন—nothing ought to be allowed to be assumed which is not directly amenable to observation." প্রত্যক্ষগোচর জিনিষকে তিনি তথ্য থেকে বহু উর্দ্ধে স্থাপন করেছেন কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর হয় কতটুকু? তা' ছাড়া যেখানে তথ্য প্রত্যক্ষগোচর জিনিষকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে সেখানে তিনি তথ্যকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি কিন্তু সেই একই তথ্য যতটুকু নিজেকে পদার্থ-বিজ্ঞান ও গণিতের সূত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে ততটুকুকে তিনি অস্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। In no other subject is there such a confusing set of phenomena or such a mass of numerical data of unsurpassed accuracy as in spectroscopy, and it is a veritable triumph that the assumptions necessary to account for them should also serve to explain the number of chemical elements।"—আবার "It is also, in this very field that the wave mechanics has achieved

its greatest triumph, so far, in the prediction of two different kinds of Hydrogen gas, which when looked for, were found"। নব্য বিজ্ঞানের পরিকল্পনাগুলিকে কেবল আজগুবি বলা নিতান্ত কাঁচা কাজ, কেননা দশটি আজগুবি পরিকল্পনা একত্র হয়েও কখন শত শত প্রত্যক্ষগোচর ব্যাপারকে হুবহু অঙ্কের হিসাবে মিলিয়ে দিতে পারে না, তা ছাড়া আবার যা কখনও পূর্ব্বে দেখা যায় নি এমন সব জিনিষ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। কিন্তু নব্য বিজ্ঞান তাই করেছে— হাইড্রোজেনের কথা সডি নিজেই বলেছেন তা' ছাড়া একটি দুটি নয় অনেকগুলি অদৃষ্টপূর্ব ও অজানিত মৌলিক পদার্থের খবর ও নব্যবিজ্ঞান এনে দিয়েছে যাদের পরে খুঁজে পাওয়া গেছে। মনে হয় সডি পদার্থ বিজ্ঞানে ও গণিতে বড় কাঁচা নতুবা তাঁর এরকম অশোভন অবৈজ্ঞানিকপণার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অতি অল্পদিন আগেই প্লাঙ্ক বলেছেন যে বিজ্ঞান তত্ত্বানুসন্ধানের একটা সঙ্কেত মাত্র, বিজ্ঞান সর্ব্বসংশয়হারী জ্ঞানের পরিসমাপ্তি নয়। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সমাপ্তিতেই পৌছান কিন্তু লক্ষ্যে পৌছান এক কথা ও সেপথে অগ্রসর হওয়া আর এক কথা। বিজ্ঞান যদি সে লক্ষ্যে এত সহজেই পৌছাতে পারত তা হলে সডির মত বৈজ্ঞানিকদের দানাপানির সম্বল শেষ হত।

বইখানিতে অতি চমৎকার অনেকগুলি ছবি ও ফটো সংগ্রহীত হয়েছে।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Odyssey of Homer,—Newly translated into English Prose by T. E. Shaw (Oxford).

হোমরের Odyssey-র যত অনুবাদ আমরা পড়িয়াছি তাহার মধ্যে ইহা, অনুবাদক স্বীকার না করিলেও সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও চিত্তোদ্দীপক। মুখ্যতঃ না হইলেও গৌণতঃ প্রত্যেক অনুবাদই ব্যাখ্যা। Odyssey-র এই নূতন অনুবাদটীও একটী ব্যাখ্যা যাহার মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যের একটী বিশিষ্ট কীর্ত্তিকে আধুনিক চিন্তার মাপকাঠিতে বিচার করা হইয়াছে।

অনুবাদক T. E. Shaw-এর কুল ও শীলের কোন পরিচয়ই যদি আমাদিগের না থাকিত, তাহা হইলেও মুখবন্ধের মন্তব্যগুলি ও অনুবাদের বিশিষ্ট ভঙ্গী হইতে তাহার সম্বন্ধে এই কয়েকটী বিষয়ের ধারণা করা মোটেই শক্ত হইত না। প্রথমতঃ, T. E. Shaw একজন Anglo-saxon—ইংরাজ; দ্বিতীয়তঃ তিনি একজন খৃষ্টান, ও তৃতীয়তঃ তিনি একজন বিংশতি শতাব্দীর লোক।

ইংরাজ বলিয়া তিনি তাঁহার Beowulfকে ভুলিতে পারেন না ; আর সেই সঙ্গে সাগর ও সাগরিক বেষ্টনী হতে আপনাকে মুক্ত করতেও পারেন না। তাই যখন তিনি বলিলেন ; "He (Homer) had sailed upon and watched the sea with a palpitant concern, seafaring being not his trade" তখন তাঁহার কোন নূতন কথাই বলা হইল না। বলা হইল মাত্র সেই পুরানো কথা—গ্রীক সভ্যতা মূলতঃ—নাগরিক, এংলো স্যাক্সন্ (টিউটনিক বা স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ান) সভ্যতার মত সাগরিক নহে, যে সভ্যতার সাহিত্যিক অভিব্যক্তির প্রথম অধ্যায়ে সাগরীয় আবেষ্টনীর ছাপ সুস্পষ্ট।

আবার যখন তিনি বলিলেন যে ধর্ম্মভ্রষ্ট নারীর (যথা হেলেনএর) প্রতি গ্রীক বীরগণের male condescensionএর সহিত ভৃত্যের প্রতি য়ুলিসিসের 'charity of head and heart' তুলনা করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না, তখনও তিনি বড় একটা ভুল করিয়া বসিলেন। 'male condescension towards inglorious woman অর্থাৎ ভ্রষ্টা নারীর প্রতি পুরুষের অনুকম্পা মহাকাব্য যুগের একটী সাধারণ ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম বিংশতি শতাব্দীতেও একেবারে লোপ পায় নাই অর্থাৎ য়ুরোপে তাহা শতকরা পাঁচ ও ভারতবর্ষে শতকরা পঁচানব্বই হারে নৈতিক ও সামাজিক জীবনে এখনও বিদ্যমান। আর charity (অর্থাৎ বিশিষ্ট রং ও রূপযুক্ত প্রেম) একটী খাঁটি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অর্থাৎ ইহা গ্রীক ধর্ম্ম নয়। গ্রীকচরিত্রের কোন অংশে ইহা আরোপ করা একেবারে—আগাগোড়া—ভুল। Bible ও Plato পাশাপাশি রাখিয়া আর একবার আমাদের অর্জ্জিত ভাবগুলিকে ঝালাইয়া লইলেই সম্যক উপলব্ধি হবে।

Shaw মহাশয়ের আর একটী অভিযোগ এই যে হোমরের অডিসি গল্পটীর প্রত্যেক বড় ঘটনাই হোমরের হাতে পড়িয়া উপরে না উঠিয়া ফসকাইয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে। ইহার উদাহরণ shaw এর মতে অডিসির একাদশ সর্গ—নরকবর্ণনা। শুদ্ধ ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষাকে সজোরে ঝাঁঝাল করিতে গেলেই সে ভাষা প্রায়ই ঝাঁঝাল না হইয়া ধোঁয়াটে হইয়া পড়ে। Shaw মহাশয় কি এই আশা করিয়াছিলেন যে অডিসির একাদশ সর্গ Danteএর Infernoএর বিপুল গভীর epic আকার ধারণা করিবে ? সে আশা কিন্তু হোমরের অনেক পাঠকই করেন না।

Shaw মহাশয় লিখিয়াছেন 'Epic belongs to early man and this Homer lived too long after the heroic age to feel *assured* and *large* ; ইহাও নূতন তথ্য নহে। Merry, Munro প্রমুখ গ্রীকবিদ্ পণ্ডিতেরা বহু পূর্ব্বে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। 'At any rate there can be doubt that the Iliad and Odyssey do not present themselves to us as first attempts in Epic poetry ; their finish and prefection point to the climax rather than to the commencement of art. This view is corroborated by the allusion in the Homeric poems to other bards such as Phenius in Othaca and Demodocus at the Phaeacian court' (Merry).

আমাদের বিশ্বাস যে হোমরেরও আত্ম-প্রত্যয় ছিল—ছিল না (এস্থলে Shaw ঠিকই বলিয়াছেন) তাহার বিপুলতা-বোধ। তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডগুলির উপর নজর রাখিলে আমাদের মহাকাব্য সম্বন্ধে মামুলী অনেক ধারণা মন হইতে অনেকটা

ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক মহাকাব্যেই যে একটা বিরাট space sense (দেশ-বোধ) থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাই কুরুক্ষেত্রের বিপুলতা ইলিয়াডে মেলে না আর অডিসি-চিত্রের কোথাও Valhallaর স্থান নাই। কিন্তু এতাদৃশ দেশ-বোধ না থাকিলেও হোমরের মহাকাব্য মহান্ বলিতেই হইবে, কারণ মাত্র ব্যাপকতাই মহত্ত্ব নয় যদিচ ব্যাপক হইয়াও মহাকাব্য মহান্ হইতে পারে (যথা মহাভারত, আইসল্যাণ্ডের saga ইত্যাদি)। বহু বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত সমালোচকের একবার কয়েক মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তিনিও অনেকটা ঈদৃশ মন্তব্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

এত কবি থাকিতে Shaw মহাশয়ের হোমরের সহিত ভিক্টোরিয়া যুগের Morris-এর তুলনা করার সার্থকতা কি? ইহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। তবে মনে হয় এই কারণে। Morris ছিলেন ঘরের লোক ও প্রায় সমসাময়িক। হোমরের সংক্রমণ হইতে আপনাকে প্রাণপণ বাঁচাইতে গিয়া Shaw মহাশয়, ভিক্টোরিয়া যুগের বাস্তবতার মধ্যে যে কবি কিছুকালের জন্যও Earthly Paradise সৃষ্টি করিয়া লোকের মন ভুলাইতে পারিয়াছিলেন তাঁহার সংক্রমণের গণ্ডীর মধ্যে ধরা পড়িলেন। তাই তিনি বললেন—(Homer) had less poetry (than Morris) আর হোমরের ব্যঞ্জনার (style) সমস্ত আকর্ষণী শক্তিকে তিনি মাত্র মাধুর্য্যে নিঃশেষিত করিলেন।

Shaw মহাশয়ের মুখবন্ধে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ার্থ নানা মানদণ্ডের যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহার মূলে আছে তাঁহার একটী ছোট অহমিকা। 'For years we were digging up a city of *roughly* the Odysseus period &c। Shaw-এর পূর্ব্বে জর্ম্মান পণ্ডিত Schliemann ও (১৮২২—১৮৯০) তাঁহার বহুবৎসরব্যাপী excavations'এর ফল Ilios (১৮৮১) ও Troja (১৮৮৪) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; আর পরবর্ত্তী গ্রীকৃবিদ্ পণ্ডিতবর্গ সেই সকল archaeological আবিষ্কার সমূহের সহিত হোমর অঙ্কিত চিত্রের যোগাযোগ দেখাইয়াছেন। যতক্ষণ না Shaw মহাশয় টীকা ও টিপ্পনীর সাহায্যে তাঁহার আবিষ্কার সমূহের সহিত হোমরের চিত্রের গরমিল না দেখান ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবাদটী মোটেই convincing হইবে না ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

উপরি-উক্ত অহমিকার ঝোঁকে shaw মহাশয় বলিলেন—(Homer was) "a lover of old bric-a-brac, though as muddled an antiquary as Walter Scott." এই উক্তিটিও কোনরূপে হোমরের পক্ষে অপবাদজনক নহে। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় বা আধুনিক কোন জীবনই সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না—ইহা aesthetic impossibility। হইতে পারে আংশিক ভাবে আর old bric-a-brac দিয়া—তবে সেটা হইবে imaginatively transfigured। আর antiquary হিসাবে Scott ও Homer'এ দোষ থাকলেও কেহই মাত্র উহার দরুণ ছোট নহেন।

Shaw বলেন—(Homer) "does make a hotch-potch of periods"। Roughly the Odysseus period বলিয়া Shaw মহাশয় নিজের চর্ম্ম বাঁচাইলেন; কিন্তু অডিসির বেলায় তিনি গোড়াতেই ধরিয়া বসিলেন যে ইহা একটী "single, authentic, un-edited work of art"।

Shaw বলেন যে মূলতঃ অডিসির গল্পটীই তাঁকে আকৃষ্ট করিয়াছে—obviously the tale was the thing। আর পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে "ধূর্ত্ত", "বিড়ালধর্ম্মী" Penelope, "আত্মাভিমানী" অডিসিউস, তাঁহার priggish পুত্র টেলিমেকাস্ ও master-prig মেনেলাউস্—অর্থাৎ অডিসি-কাহিনীর সকল মুখ্য চরিত্রের মধ্যে কোনটীই হোমরের নয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি—তাহারা যদি কেহই হোমর-কল্পিতও না হয় বা যুগানুভূতি-প্রসূতও না হয়, তাহা হইলে তাহারা আবির্ভূত হইল কোথা হইতে? মোট কথা এই—"কাহিনীটী হইবে সত্য আর তাহার মধ্যগত চরিত্র হইবে মিথ্যা"—Shawএর মনোগত ঈদৃশ ছবি হইতেছে একটী psychological impossibility। আর Shawএর ঐ চোখা চোখা বিশেষণগুলি!—সে বিষয়ে ঝগড়া ত হইতেই পারে—তবে সে ঝগড়া এখানে স্থানাভাবে উহ্য রহিল।

সমস্ত বইখানি নাড়িতে চাড়িতে ও তারই সঙ্গে ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্-বিশ্লিষ্ট হোমরের diginity, majesty ইত্যাদি গুণাবলী একে একে ভুলিতে ভুলিতে, Shaw সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা হয় যে তিনি (যেন) কোন আধুনিক সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে ঐ *Excavation Party*'র অনুগামী *Special Correspondent*। তাঁহার মুখবন্ধটী একটী ছোট সুন্দর *Write-up* আর তাঁর অনুবাদ একটি উদাহরণ-পরিপূর্ণ বিবরণ—এ বিবরণটীতে *archaelogy*'র মধ্য দিয়া হোমর যুগের অনাদি সত্য পাইবার লোভে তৎসম্বন্ধে উপযোগী, কৃচ্ছ্রলভ্য, আর্ট হিসাবে শান্ত—চুড়ান্ত সত্যকে আধুনিকতার coordinates'এর অনুপাতে অতি উপাদেয় ভাবে বিকৃত করা হইয়াছে। যথা:—(ক) Only Odysseus tarried, shut up by *Lady* Calypso, a nymph and very Goddess in her hewn-out caves (পৃ—১)। এস্থলে Lady কথাটির প্রয়োগে Calypso প্রাচীন যুগ হইতে মধ্যযুগে অবতীর্ণা হইলেন। (খ)...... and the three merry bachelors are always wanting clothes newly washed when they go *out to dances* (পৃ—৮৬)। (গ) The mother packed tasty meats in a *travelling-box* ইত্যাদি (পৃ—৮৬)। [এ দুই স্থলে Nausicaa'র ভ্রাতৃগণ ও মাতাঠাকুরাণী প্রাচীন যুগ হইতে এক লাফে মধ্যযুগ পার হইয়া অবতীর্ণ হইলেন একেবারে বিংশতি শতাব্দীর ইংরাজ রাজধানী লণ্ডন সহরে]।

শ্রীগঙ্গাচরণ কর

ভারত ও ইন্দোচীন:—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্চী।

এক সময়ে আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দুর স্থান কেবল হিন্দুস্থানের মধ্যেই এবং তাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা ভারতের চতুঃসীমার ভিতরে আবদ্ধ। স্মিথ্ সাহেবের বই পড়ে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ঐক্যসম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় ছিলুম্। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে সমগ্র ভারতের কতদূর মিলন সাধিত হয়েছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মতদ্বৈধ থাকায় আমাদের ঔদাসীন্যের অবধি ছিলনা। আজকাল পুরাবৃত্ত অনুশীলনের

ফলে আমাদের সে ভ্রান্ত ধারণা ও ঔদাসীন্য দূর হয়েছে। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন যে হিন্দুস্থানের বাইরে ভারতের অনেকগুলি উপনিবেশ ছিল, যাদের ভাবগত মিলন হেতু উপহিন্দুস্থান নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিছু কাল পূর্ব্বে এই বিস্মৃত যুগের যে, গৌরবময় অধ্যায়ের পাঠোদ্ধার হয়েছে, তার ফলে আমরা জেনেছি যে ভারতের অতীত একেবারে শূন্যগর্ভ ছিলনা। এটুকু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে বৌদ্ধদের যত্নে ও পরিশ্রমেই ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্ভব হয়েছিল।

প্রবোধবাবু ইন্দোচীন ভ্রমণ করে এসেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ফল এই বই-খানি। এই পুস্তিকাটি কেবল ভ্রমণকাহিনী নয়, আবার একে ঠিক্ ঐতিহাসিক প্রবন্ধও বলা চলেনা। এখানি মুখ্যত বিদেশ প্রসঙ্গ, আর সেই প্রসঙ্গে কম্বোজ ও চম্পায় হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় গৌরব ও স্থপতি শিল্পের একটি সুন্দর পরিচয়। বইখানি নিশ্চয়ই পাঠকের মনে ভারতের বিচিত্র অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক করবে। যাঁরা পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র, তাঁদের জন্য "বৃহত্তর ভারতের" গ্রন্থাবলী রয়েছে। কিন্তু যাঁরা বিশেষজ্ঞ নন্ তাঁদের কাছে এই প্রাঞ্জল বইখানি সুখপাঠ্য হবে। প্রবোধ বাবুর ভাষার একটি বিশেষ গুণ আছে। সংযত হলেও তাতে বর্ণনার উজ্জ্বলতা আছে; বিষয়-বস্তুর স্বকীয় গৌরব সত্ত্বেও, লেখার নিজস্ব ভঙ্গী কোথাও ম্লান হয়নি। যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যিক স্পর্শ থাক্‌লে ঐতিহাসিক কাহিনী লোভনীয় হয়, তার পরিচয় এই পুস্তকের অনেক স্থানেই মিলেছে।

প্রবোধবাবু দেখিয়েছেন যে মানুষের শ্রেষ্ঠদান হ'ল সভ্যতার আলোকদান। প্রাচীন কালে একদিন ভারত-সন্তানেরা যে কম্বোজ ও চম্পায় এসে সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন, তা এখনও ঐ এঙ্কোর ভাট্ বায়ন-মন্দির ও শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দিরে প্রস্তরের উপর হিন্দুদের অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য দেখ্‌লেই বোঝা যায়। কিন্তু এই আধিপত্যের ভিতর কোনো বিসদৃশ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ছিলনা; যা ছিল তা ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উদারতা ও মহত্ত্ব। জ্ঞান ও সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ভারতের অন্তরের ও বাহিরের মিলন সার্থক হয়েছিল। এক চোলরাজ রাজেন্দ্র দেব ছাড়া কোনো হিন্দুরাজাই ক্ষণিক জয়লিপ্সার বশবর্ত্তী হয়ে এ অঞ্চলে পদার্পণ করেন্ নি। সুতরাং মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক যে আনামী অথবা চীন-তিব্বতীয় আক্রমণে মহেন্দ্রবর্ম্মণ, সূর্য্যবর্ম্মণ প্রমুখ কীর্ত্তিমান্ রাজাদের গৌরবময় যুগ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেছে! অথচ নিকটেই যবদ্বীপে ও বলীদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্পূর্ণ বিদেশীয় সংস্পর্শে এসেও এখনও টিঁকে রয়েছে এবং স্থানীয় হিন্দুরা সযত্নে তাদের স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্য রক্ষা করে চলেছে। চম্পায় হিন্দুদের বংশধর যে এখনও বর্ত্তমান, তার একমাত্র নিদর্শন ক্ষীয়মান, মুষ্টিমেয় "চ্যাম" জনসংখ্যা। যে বিরাট্ সভ্যতা ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, তার এই আকস্মিক বিলোপের কারণ আর যাই হোক্ ভারতবাসী ও অধিবাসীদের মধ্যে কৃত্রিম সংযোগ অথবা প্রাণহীন ঐক্য বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। সে যাই হোক্, ইন্দোচীনের মন্দির-গুলি যে এখনও ভারতের সমৃদ্ধ যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার জন্য ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই ফরাসীদের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। প্রবোধবাবু ফরাসী ঐতিহাসিকদের কর্ম্মনিষ্ঠা ও সশ্রদ্ধ মনোভাব লক্ষ্য করেছেন। এটী অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সুদূর হ্যানয়ের প্রাচ্য বিদ্যাপীঠে যে একদল নিঃস্বার্থ ঐতিহাসিক গভীর অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করে

যাচ্ছেন, তাঁদের প্রেরণার উৎসমূলে আছে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাসূচক দৃষ্টি, আর সে দৃষ্টি কার্জ্জনী কৃপাকটাক্ষ নয়। সুতরাং ফরাসী মনীষী ভ্যালেরি ইতিহাসের অনুশীলন যতই বিপত্তিসূচক বলুন্ না কেন, এক্ষেত্রে সে চর্চ্চায় ফরাসীদের বুর্জোয়া মনোভাব অথবা শাসনতন্ত্রের মর্য্যদা কিছু মাত্র ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা নেই। বরং তাঁদের রাষ্ট্রীয় অধিকার যে অটুট্ আছে তার নমুনা প্রবোধবাবুর বইতে কিছু কিছু মেলে।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"The Great Offensive"—by Maurice Hindus—Gollancz.

মরিস হিণ্ডাস আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ জার্নালিষ্ট হলেও রাশিয়ার কোন ক্ষুদ্র গ্রামে কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন এবং স্বদেশের মাটি ও ভাবার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার পর বিদেশ-যাত্রা করেন। বিপ্লবের পর ১৯২৩ সালে তিনি প্রথম রাশিয়াতে ফেরেন এবং তারপর প্রায় প্রতিবৎসরই মাতৃভূমির সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন; সঙ্গে দোভাষী নেবার প্রয়োজন হয়নি। নামের ডঙ্কা তাঁর অগ্রগামী হয়নি, সুতরাং সোভিয়েট প্রচার বিভাগের আতিথেয়তা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন। স্বনামধন্য দার্শনিক Dewey 'Humanity Uprooted' বইটির মুখপত্রে বলেছেন—'প্রতিক্রিয়া প্রবল মানবমনের এমনই স্বভাব যে, যে কোন সামাজিক-সমস্যার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হলে প্রাপ্ত-বিদ্যা, সংস্কার ও রুচি সেই সঙ্গে অপরিহার্য্যের মত এসে পড়ে। হিণ্ডাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি বিপ্লবজনিত ঘাত-প্রতিঘাতে মানবহৃদয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ গভীর অনুকম্পার সহিত অনুভব করলেও, শিল্পীর মত নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। আমার মনে হয় হিণ্ডাসের এই নিরপেক্ষতার মূলে আছে শিল্পসাধনার গভীরতা। সেইজন্য রচনাগুলি সাংবাদিক সাহিত্যচাতুর্য্যের পর্য্যায়ভুক্ত না হয়ে লালিত্যে ও ভাবের ঘনত্বে এত মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে।

যখন প্রাচ্যদিগন্ত বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধসাহিত্যে সমাকুল—সংবাদপত্রের সৌজন্যে সুধীবৃন্দ বলশেভিক নীতি-শৈথিল্যের এক বিকট চিত্রে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন—সেই সময় মরিস হিণ্ডাস অনাড়ম্বরভাবে বাস্তব চিত্রটি উন্মোচন করেন। Red Bread বইখানির আদ্যোপান্ত বিপ্লবক্ষুব্ধ মানবহৃদয়ের জ্বালাময় কাহিনী। মাটি হতে উৎক্ষিপ্ত কৃষাণের বুকভাঙ্গা রোদন, সৃষ্টির দ্যোতনা ও নবীনের মুক্তির আনন্দের মিলিত ব্যঞ্জনা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্ফুট হয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ করেছে। বিপরীতমুখী ঝটিকাবর্ত্তের অন্তঃস্থলে রাশিয়ার যে সনাতন স্বরূপটি অবিধ্বস্ত রয়ে গেছে তার ক্ষীণ পরিস্পন্দ কোন বিদেশীর মর্ম্মস্থানে ছন্দিত হত না নিশ্চয়, অথচ এমন রাশিয়ান বিরল যে হয় বিপ্লব-পীড়িত বা বিপ্লব-চালিত নয়।

আলোচ্য বইটি পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের পর্য্যালোচনা—অপেক্ষাকৃত ব্যাপকচিত্র, সঙ্কল্পের অবসানে রচিত। এতে নেই ছোট ছোট মানবজীবনের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস, আছে বিরাট অভিযানের সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র। সঙ্কল্প গ্রহণকালে বিদ্যমান ব্যক্তিত্ব ও শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের অবসন্ন কঙ্কাল যাত্রাপথে ধূলি গ্রহণ করে আর ওঠেনি। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় পাঁচ

বৎসর—সে ত পলকমাত্র। কিন্তু এই পলকের মধ্যে কত যুগ যুগান্তরের কাল-প্রবাহ সংহত হয়ে সেই চাপে কত অতীতকালের সঞ্চিত পাপ পুণ্যের ভাণ্ডার নিষ্পেষিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। হিণ্ডাস এই সন্ধিক্ষণকে বিপ্লব হতে অধিকতর স্মরণীয় মনে করেন। নবীনের সহিত প্রাচীন মানবের যে অন্তিম সংগ্রাম হয়ে গেল তার ফলাফলের অন্তরালে ধ্বংসের ইঙ্গিত তার বিস্ময়মুগ্ধ উচ্ছ্বাসের তলে তলে তিক্ততার সমাবেশ করেছে। কিন্তু ফলাফলের অঙ্কপাতই বইটির অলঙ্কার—ভাষার লালিত্যে সে অলঙ্কার সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটায়নি শিল্পপ্রতিভার গুণে।

১৯২৮ সাল বলশেভিকদের দারুণ দুরবস্থার সময়। কৃষাণদের অসন্তোষে গগন বিদীর্ণ। ইংরাজ রাজনৈতিক সম্বন্ধচ্ছেদ করেছে। আমেরিকা উদাসীন, ফ্রান্স ও পোলাণ্ড খড়্গহস্ত, জার্ম্মানী ও তুর্কী দুর্ব্বল, ইতালীর সহানুভূতি সীমাবদ্ধ। বাহির দ্বারে শত্রু—ঘরে অন্তর্দ্বন্দ্বের তাড়নে জীবনীশক্তি মুহ্যমান। এমন দিনে ট্রট্স্কীর সহিত ষ্টালিনের মতভেদ বেধে গেল। ট্রট্স্কী বিদায়কালে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেলেন যে সব অনুচরবর্গ তাদের মধ্যে অনেকে সোভিশেট রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ষ্টালিন ও অবশিষ্ট নেতৃবর্গ দায়িত্বভার গ্রহণ করে দেখলেন তাঁদের নূতন সমাজের কণ্ঠনালীকে শত্রুর মুষ্টিমুক্ত করতে হলে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিক দুঃসাধ্য সাধনের মন্ত্র সেই সময় গৃহীত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তি ও ভূগর্ভস্থ জড় পদার্থের সহযোগে যন্ত্র উৎপাদনক্ষম হয় না। চাই দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, নিপুণতা যা শতাধিক বর্ষের ক্রম-বিবর্ত্তনেই সম্ভব।

যন্ত্রভীরু টল্ষ্টয়ের প্রচারচেষ্টায় ও পূর্ব্বতন-শাসকগণের আলস্যজড়িত বিবর্ত্তন-ভীরুতায়, রাশিয়ার ত্রিসীমার মধ্যে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি। য়ুরোপীয় সুধীবৃন্দ সোভিয়েটের অসম্ভব সঙ্কল্পের বাতুলতায় বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেছিলেন "বাগ্মিতার সম্মোহনে যদি বা মানবহৃদয়ে প্রলয় সৃষ্টি সম্ভব, হৃদয়হীন খনিজদ্রব্যকে যন্ত্রপাতিতে পরিণত করতে হলে চাই আলাদীনের প্রদীপ।"

অতীতের জগদ্দল পাথর ঠেলে ফেলতে পারলে ক্ষুদ্র মানব-শক্তি যে কতখানি মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে, তা আমাদের কল্পনার অতীত, কারণ সে জগতে সময়ের আক্ষেপিক পরিমণ্ডল ভিন্ন।

হিণ্ডাস ১৯৩৩ সালের যে রূপচিত্র এঁকেছেন আলোচ্য বইটিতে—আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে সত্যই মনে হয় আলাদীনের প্রদীপের কথা। পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প চার বৎসর তিনমাসে পূরণ করা হয়েছে। গলদের তালিকা হয়তো বড় হবে। একটি প্রধান গলদ—দেশে আজ অবধি খাদ্যাভাব দূর হয়নি। কিন্তু কল কব্জা, যন্ত্রপাতি, অটোমোবিল, এরোপ্লেন অস্ত্র-সম্ভার ইত্যাদির নির্ম্মাণে আজ রাশিয়া যে সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীল হতে পেরেছে এ কম কথা নয়। বৃহৎ যন্ত্র ও খনিজদ্রব্যের উৎপাদনে এই কৃষি-প্রধান অলস জাতি আজ জগতে শ্রেষ্ঠ ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট আমেরিকাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। চার বৎসরের গতিতে অনেক বিষয়ে ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীকে পিছনে ফেলেছে। তুলনা-মূলক অঙ্কপাতে সঙ্কল্পের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপিত হবার নয় বলে হিণ্ডাসের বই হতে প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেবার লোভ সম্বরণ করলাম। আমাদের গভীরভাবে প্রণিধান করা উচিত—সঙ্কল্পের অগ্নিদীক্ষায় পূত ও পরিশুদ্ধ যে নবীন মানবের অভ্যুত্থান হয়েছে তার অন্তর্নিহিত সত্তাটুকু। অগ্নিদীক্ষা কথাটি আতিশয্যোক্তির মত অনেকের কানে বাজতে পারে। তাঁদের স্মরণ

করিয়ে দিতে চাই—যে বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীর দল যখন কর্ম্মপ্রেরণার উন্মাদনায় গা ভাসিয়ে ছিল উৎসবের আনন্দ ছিল তাদের একমাত্র পাথেয়। ভীষণ বিভীষিকাময় যাত্রাপথে তাদের পাথেয় ফুরিয়ে গিয়ে কলকারখানার অগ্নিপিণ্ড, ইস্পাতের নির্ম্মম কঠিনতা, হিমাদ্রীর মত কুঠিন অভ্রভেদী ক্লেশ, চাষীর বুকভাঙ্গা ক্রন্দন হৃদয়ের কোমল প্রতিক্রিয়া প্রবণ তারগুলিকে একে একে ছিন্ন করেছে। স্ত্রী পুরুষ স্বেচ্ছায় প্রিয়সংসর্গকে দ্বিধা বিভক্ত করে স্বার্থের অন্তিম আকর্ষণ হতে সঙ্কল্পের মন্ত্রটি জাগিয়ে রেখেছে।

বিপ্লবের প্রবল ঝটিকার আবর্ত্তে যে শৈথিল্যের উন্মাদনা নবীন মনে উচ্ছৃখলতা এনেছিল সে ক্ষণটিকে রোমানভ অমর করে রেখেছেন তাঁর অতুলনীয় ছোট গল্প Without Flowersএ। আজ নূতন সমাজের নবতর আদর্শবাদ ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অন্তরালে সে ক্ষণটি লীন হয়েছে। জগতের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় বিশ্ববিদ্যালয় যথেচ্ছাচারিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র। রাশিয়ার ছাত্র-ছাত্রীর অবাধ মেলামেশায় কোন অন্তরায় নেই। শয়ন-কক্ষ ভিন্ন হলেও যাতায়াতের পথে প্রহরী মোতায়েন নেই, লোক-লজ্জার বালাই নেই—অথচ সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক শৃঙ্খলার যে মাধুর্য্য ও শালীনতা পাই, তা আর কোথাও দেখা যায় না। হিণ্ডাস্ কারণ অনুসন্ধান করেন নি—কেননা তাঁর পুস্তকে অপ্রামাণ্য অনুমানের বাড়াবাড়ি নেই। তবে তাঁরই বর্ণিত আর একটি চিত্র হতে কিছু উদ্ধৃত করে দেখালে আশা করি নবীন রাশিয়ার নৈতিক আদর্শের মূলে অনেকখানি আলোকপাত করতে পারবো।

কোন বিখ্যাত মার্কিন মহিলা হিণ্ডাসকে বলেন তিনি রাশিয়াতে গেলে কখনই সন্তানের জন্মদান করবেন না কারণ সন্তানকে যখন হারাতেই হবে তখন মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? এ মনোভাব বোধ করি বিশ্বজনীন। কিন্তু হিণ্ডাস রুষ ছাত্রীদের এই প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হোক বা না হোক তারা সকলেই জননী হতে চায়। সন্তান-কামনা-শূন্য মিলন তাদের ধারণায় বিলাসিতার ন্যায় পরিহার্য্য। ষ্টেট সন্তানকে গ্রাস করবে এ আপত্তি তাদের মনে উদিত হয় না, কারণ দেশাত্মবোধের গৌরবেই সন্তানকামনার উৎপত্তি। মাতৃত্বের এই গৌরব নবীন রাশিয়ায় শ্রীলতার ও শিষ্টতার মূল পরিবর্ত্তন করেছে, শাসনভীতির পরিবর্ত্তে দায়িত্ববোধ লোকচিত্ত অধিকার করেছে। সহুরে যুবতীদের মধ্যে নারী সুলভ ছলা কলা ও অঙ্গরাগ প্রসাধনের অভাব দেখে বহু বিদেশী পর্য্যটক হিণ্ডাসকে প্রশ্ন করেছেন রুষ রমণীর নারীত্ব অপরিস্ফুট কিনা। যৌন সম্পর্কিত ব্যাপারে নীরব অনাড়ম্বর প্রশান্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার চক্ষে অলীক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক বলে হিণ্ডাস বিপ্লবপ্রসূত এই বিস্ময়-চিত্রটিকে উজ্জ্বলতর করে এঁকেছেন। তিনি বলেন নবীন রাশিয়াতে সৌষ্ঠবজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধের সাড়া পড়ে গেছে নূতন সমাজের মানুষকে অতিমানুষ করে তোলবার আগ্রহে। নগ্নদেহের সঙ্কোচ সম্পত্তিজ্ঞানের সহিত লোকচিত্ত হতে মুছে গেছে। গ্রীষ্মের দিনে নদীতটে যে অগণন নরনারীকে অর্দ্ধ বা সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে বিচরণ করতে দেখা যায় তার মূলে নিয়ম ভঙ্গের বাহ্যাড়ম্বর নেই—আছে বিরাট সহজতা।

একত্রিত কৃষিপদ্ধতির অনুষ্ঠান পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের প্রধান অঙ্গ ছিল। এক সময় পদ্ধতির সাফল্যের উপর বিপ্লবের মরণ বাঁচন নির্ভর করেছিল। ১৯২৩ সালে যেখানে চাষীরা Kolozএর নাম গল্পেও শোনেনি আজ সেখানে পাঁচ ভাগের চার ভাগ জমি একত্রিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট চাষীদের ও কারিকরদের সম্প্রতি ক্রয় বিক্রয়ের

অধিকার দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী আজ সম্পূর্ণ নির্ম্মূল। শতকরা বিশজন স্বতন্ত্র চাষীর উপস্থিতিতে ভবিষ্যতে বিপ্লবের কোন অকল্যাণ আশঙ্কা করা যায় না। পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে এই যথেষ্ট। কিন্তু এই দুঃসাধ্য-সাধনে নবীন কর্ম্মীর মর্ম্মস্থল যে দুর্ব্বহ আত্মবিশ্লেষণে যে অসহ্য নৈরাশ্যে যে দারুণ বেদনায় পীড়িত হয়েছে, তার বর্ণনাই হিণ্ডাসের পুস্তকখানিকে অমর করে রাখবে। রুষ চাষীর মত আদিম অপরিবর্ত্তিত মানুষকে মাটি হতে সমূলে উৎপাটিত করে নূতন অনভ্যস্ত পরিমণ্ডলে অসহায়ের মত গ্রথিত করে দিলে, তার যুগ যুগ সঞ্চিত বংশানুক্রমে আহৃত সম্পত্তি, সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করলে, সে বাক্‌সর্ব্বস্ব নিরীহ প্রাণী যে বিলাপের আতিশয্যে গগন বিদীর্ণ করবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু শুধু চক্ষের জল ফেলেই সে মাটির কামড় ছাড়েনি—আপন প্রথামত নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিঘাত করেছে—বালক কর্ম্মীকে দগ্ধে মেরেছে, মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে, গৃহপালিত পশু নির্দ্দয়ের মত জবাই করেছে, প্রতি পথে বাধার সৃষ্টি করেছে—অবশেষে অবসন্ন হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে যখন তাদের নিজেদের নবীনেরা বিপ্লবের অলৌকিক স্পর্শে পর হয়ে দেবতা ও ভূতে বিশ্বাস হারানোর সঙ্গে সঙ্গে গুরুভক্তি ত্যাগ করেছে।

স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ববাদের ধ্বংসের পর শিশু-চিত্তের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটেছে। পিতামাতা বিপ্লবের পরিপন্থী হলে সে গৃহ ত্যাগ করতে, কিংবা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রদান করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। নবীনের উপর আজ রাশিয়াতে যেরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য অর্পিত হয়েছে বোধ করি মানব ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

বিপ্লবের তিনটি মহৎ কীর্ত্তি জগৎকে অবিসংবাদিতরূপে বিস্ময়মুগ্ধ করেছে; এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সমানভাবে অসভ্যের পর্য্যায়ভুক্ত করে দিয়েছে। তার একটি হচ্ছে কারাগার ও দণ্ডবিধির আমূল পরিবর্ত্তন, আর একটি গণিকাবৃত্তির উচ্ছেদ ও তৃতীয়টি সামরিক পদমর্য্যাদা-বৈষম্যের নিরাকরণ। হিণ্ডাস তাঁহার সুললিত ভাষায় তিনটি বিভিন্ন অধ্যায় অলঙ্কৃত করেছেন সোভিয়েট পরীক্ষার এই তিনটি সাফল্যচিত্র অঙ্কনে। চিত্র ত্রয় আমাকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু সমালোচনাটি দীর্ঘ হয়ে পড়ছে বলে সংক্ষিপ্তসার দিতে নিবৃত্ত হলাম।

বিপ্লবের পূর্ব্বে জগতের সাহিত্য-আকাশ রুষ-শিল্পীর সৃজন-প্রতিভায় প্রতিভাত হয়েছিল অপূর্ব্ব বিভাসে। সে সময় শিল্পীর সৃষ্টিশক্তি নিত্য নিয়ত উদ্বুদ্ধ করেছে ধর্ম্মের প্রেরণা। ঘটনাগ্রন্থন ও চরিত্র-চিত্রন হয়েছিল পুরাতন সামাজিক পরিবেষ্টনের মধ্যে। ধর্ম্ম ও ব্যক্তিত্ববাদের উপক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-রচনার ধারা রূপকারের বৃত্তিকে উপেক্ষা করে বেষ্টনীর মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হয়ে মহামানবীয় সত্তাটুকু হারিয়ে বসে। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত সৃজনের প্রেরণা নিরুদ্ধ হয়—ঘরোয়া যুদ্ধ বিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানবের অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপলব্ধির স্বল্প-পরিসর পরিধির মধ্যে। ক্রমে বিপ্লব-বিরোধী ঐক্যবাদিদের পৌর্ব্বাপর্য্য বিপর্য্যয়ের ব্যঙ্গ চিত্র সাহিত্যিকের সৃষ্টিশক্তি অধিকার করে বসলো। কবির উদ্ভাবনা শক্তি নবতর সমস্যার বঙ্কিমপ্রবাহ হতে কোন পরম উপলব্ধিই সংগ্রহ করতে পারল না। এমন দুরবস্থার দিনে নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার তরঙ্গ এসে নবীন বেলায় দোলন লাগিয়ে দিল। রোমানভের অতুলনীয় ছোট গল্প Without Flowers সেই ক্ষীণটিকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হল। The Embezzlers,

Moon on the Right, Dog Lane, Squaring the Circle, Three Pairs of Stocking, The New Table of Commandments সেই সময়ই রচিত। তারপর যখন পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের ঝটিকা এসে দেশব্যাপী রাষ্ট্র-গঠনের আলোড়ন জাগিয়ে দিল তখন শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হল। Rapp অর্থাৎ Proletarian Writers Society শিল্পীর দ্বারে প্রহরী হয়ে বসলো। Volozhin তাঁর একটিও রচনা ছাপাতে সাহস পেলেন না। Alexei Tolstoi সাহিত্য ছেড়ে ইতিহাসে মনোনিয়োগ করলেন। Babelএর ছোট গল্পের প্রতিভা স্তম্ভিত হয়ে গেল। Naked Yearএর লেখক Pylnyak প্রচার-মূলক গ্রন্থ রচনায় আত্মসমর্পণ করিলেন—কিন্তু বলশেভিক আত্ম-সমালোচন-রীতি কোন রুচি অরুচি নৈতিকপদ্ধতি বা রাষ্ট্রিক-বিধি ব্যবস্থার অবিসংবাদিত্ব গ্রাহ্য করে না—Rappএর বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল হয়ে উঠতে ১৯৩২ সালে এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে শিল্পীর শৃঙ্খলমোচন করা হল। বিপ্লববিরুদ্ধ শিল্পরচনার পথে প্রহরী মোতায়েন রইল বটে—হিণ্ডাস তবু বলেন গত বৎসর গ্রীষ্মের সময় তিনি যখন রাশিয়াতে গমন করেন শিল্পীর বাধামুক্ত উচ্ছ্বাসের আতিশয্য তাঁকে বিস্মিত করে। শিল্পী আজ সেখানে ইঞ্জিনিয়ারের সমতুল্য আদর পাচ্ছেন। অশন ব্যসনের জন্য তাকে চিন্তিত হতে হয় না কারণ রাশিয়াতে শিল্প চাহিদার বিরতি নেই। শিক্ষার বিস্তৃতিই বোধ করি এ চাহিদার কারণ—১৯১৭ সালে যে দেশ অজ্ঞতায় মুহ্যমান ছিল, ১৯২০ সালে সেথায় শতকরা ৩২ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়—আজ পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের অবসানে সারা রাশিয়া অনুসন্ধান করলে শতকরা মাত্র ৯ জন নিরক্ষরের সাক্ষাৎ মিলবে।

অনেকে মনে করেন রাশিয়াতে নিরীশ্বরবাদীদের সাফল্য কতকটা বাহ্যিক। আসলে বলশেভিকবাদ ধর্ম্মের নামান্তর হয়ে মানবহৃদয়ের চিরন্তন পূজাপ্রবৃত্তিটিকে দখল করে বসেছে। পূর্ব্বতন ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ পৌরোহিত্য-প্রথা ইত্যাদি বিশ্বাস নাকি ভেক্ বদল করে যেমন তেমনি বিদ্যমান আছে। এই মতবাদটি সম্পূর্ণ অমূলক নয়—কারণ বলশেভিকদের উৎসবামোদের ব্যবস্থা, আত্মশোধন ইত্যাদি কতকগুলি রীতির সহিত গির্জ্জা-পদ্ধতির কিছু কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। লোকচিত্তে মার্কস-ইজম ও লেনিন্-ইজম fundamentalismএর মত দৃঢ়ভাবে আসন গ্রহণ করেছে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—গোঁড়া খৃষ্টানদের মধ্যে তর্ক উঠলে যেমন পরস্পর, পুঁথির দোহাই পাড়তে থাকে তেমনি ষ্টালিন ও ট্রট্স্কীর বাক্‌যুদ্ধ যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন উভয়ে পরস্পরের প্রতি লেনিন্ ও মার্ক্স মার্কা বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন।

হিণ্ডাস এই প্রচলিত মতবাদটিকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত বলশেভিকবাদের মূলগত ঐক্য নেই—তার প্রমাণ—প্রথমতঃ বলশেভিকরা প্রার্থনা করে না, ঊর্দ্ধলোকের সহিত কোন আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ রাখেনি, তাদের নীতিতে বিপ্লব-বিরুদ্ধাচারীর ক্ষমা নেই। দ্বিতীয়তঃ মার্কস-নীতির মূল তত্ত্বই হচ্ছে প্রগতির নিরুদ্দিষ্ট চংক্রামণ, যেমন প্রবহমান নদীর জোয়ার, ভাঁটা, দোলন আছে—নেই স্থিতি। তারা সাম্যবাদকেও মানব-সমাজের চরম উপলব্ধি মানে না—বলে পন্থা।

বলশেভিকবাদের জগদ্ব্যাপী বিপ্লব আনয়নের মোহ কেটেছে বলে মনে হয়। ষ্টালিন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে চালনা করেছেন সার্ব্বভৌমিক শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হতে

বিপরীত মুখে। শ্রেণীবিরোধের দ্বারা জগতের সর্ব্বত্র বিপ্লব আনয়ন সম্ভব কিনা এ সমস্যা :আজও তর্কাধীন তবে হিণ্ডাস ট্রট্স্কীর সহিত একমত হয়ে বলেছেন যে দেশে মধ্যসত্বোপভোগী শ্রেণী প্রবল সেখানে বিরোধের দ্বারা শ্রমিকের উত্থান সম্ভবপর নয়। শ্রেণীবৈষম্য নিরাকরণের আর কি উপায় আছে হিণ্ডাস সে কথা বলেন নি।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Acharya Ray Commomaretion Volume—
Edited by Hirendranath Dutt, Meghnad Saha Satyacharan Law and others. Published by N. C. Paul, Calcutta Oriental Press, 9 Panchanan Ghosh Lane, Calcutta.

সপ্ততিতম বৎসর উপনীত হওয়ায় আচার্য্য রায়ের প্রাক্তন ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এই জয়ন্তী-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই ঋষিতুল্য ব্রহ্মচারী, পরহিতসর্ব্বস্ব অধ্যাপকের সম্যক্ সম্বর্দ্ধনা করতে পারায় বাংলাদেশের গৌরববৃদ্ধি হল। এই সম্বর্দ্ধনায় যেমন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও দেশের অন্যান্য গণ্যমান্য লোক যোগ দিয়েছেন তেমনি বিদেশের বহু মনীষী যোগদান করে গ্রন্থটিকে মর্য্যাদাবান করেছেন। মহাত্মাজীও আচার্য্যদেবের প্রশস্তি করেছেন।—গ্রন্থটি প্রধানতঃ প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই বেশী কিন্তু এগুলি অধিকাংশ স্থলেই সাধারণোপযোগী করে লেখা। এ ছাড়া নানা বিষয়ে নানারূপ প্রবন্ধাদি সংগৃহীত হওয়ায় গ্রন্থটি বড়ই উপভোগ্য হয়েছে। গ্রন্থটির কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর, ছাপা অপেক্ষাকৃত খারাপ, যা' হোক এই গ্রন্থ সঙ্কলনের মত একটি দুরূহ কাজ সুসম্পাদিত করার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

প্রবন্ধগুলীর সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। যেগুলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কেবল সেইগুলিই আমি উল্লেখ করব। বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে অধ্যাপক নিখিল সেনের রচিত "ব্রহ্মাণ্ডের আকার" সকলের চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য। অধ্যাপক সেন Expanding Universe সম্বন্ধে সারগর্ভ মৌলিক গবেষণা করেছেন; বাংলায় লেখা তাঁর এই মনোরম প্রবন্ধ সাধারণের কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই আধুনিক সমস্যার পরিচয় উপস্থিত করবে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের "বাঙ্গালী জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা" প্রবন্ধে তাঁর অননুকরণীয় বাংলা লেখার ভঙ্গীতে আধুনিক কালোপযোগী রাষ্ট্রনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যে—বাঙ্গালীজাতি বিশ্বের রাষ্ট্রমণ্ডলে একটি মজবুত ও কর্ম্মঠ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে। কথাটা অন্ততঃ মুখরোচক লাগে। ডক্টর সত্যচরণ লাহার "ঋতুসংহারে দুইটি পাখী" প্রবন্ধে ক্রৌঞ্চ ও কারণ্ডব সম্বন্ধে আলোচনা অতি সুখপাঠ্য। "বাংলার পল্লীগীতি" প্রবন্ধে খগেন্দ্রবাবু বাংলার এই লুপ্তমান গীতিছন্দোময় জীবনবিকাশের অন্তর্ধান নিয়ে বিলাপ করে পাঠককে বড় নিরাশ করেছেন, কেননা পাঠক অধ্যাপক খগেন্দ্রবাবুর মত লেখকের নিকট থেকে অন্ততঃ এই বিষয়ে একটা চলনসই বিবরণ শোনবার প্রত্যাশা করে কিন্তু তা না লিখে তিনি শুধু বিলাপ করেছেন

যে সে সারিগান, সে বাউল আর নেই! ইংরাজী প্রবন্ধের মধ্যে ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক স্থনীতিবাবুর লেখা তানসেনের কবি প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানেও সাধারণ শ্রেণীর উচ্ছ্বাস হয়েছে মুখ্য, আর সুদৃঢ় যুক্তি ও বিশ্লেষণ যা পাঠকের বুদ্ধি-বিচারকে প্রবুদ্ধ করবে ও যা আমরা স্থনীতির বাবুর মত প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপকের কাছে আশা করতে পারি, তা হয়েছে গৌণ। প্রবন্ধে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হল দুটি; ১ম—তানসেন একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন ও ২য়,—ধ্রুপদ style হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদি ও মূল style, মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব থেকেই তা প্রচলিত। তানসেন যে কবি ছিলেন সে কোন ধরণের কবি? গীতিকারদের কবি আখ্যা দেওয়া কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বটে, সে হিসাবে শুধু তানসেন কেন সকল ভাল গীতিকারই ভাল কবি। কিন্তু কবিতা ও কবি শব্দ এখন কি আমরা ঐ অর্থে ব্যবহার করি? তানসেন যে কতবড় Composer ছিলেন সে কথা আর নূতন করে প্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই কিন্তু তিনি যে একজন বড় কবি এ কথা প্রতিপন্ন করতে গেলে নিষ্ফল প্রয়াস হবে। অপরদিকে আমরা এই কথাই বলে আসছি যে যতদূর জানা যায় তাতে ধ্রুপদ ষ্টাইল যে পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল তার কোন নিদর্শন নেই। যদি অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে প্রাচীন ধ্রুব-পদ ও ধ্রুপদ একই বা যদি তিনি বলতে চান যে ধারাবাহিকতার নিয়ম মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে ধ্রুপদ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে, বা আর্য্যসভ্যতার গোড়া পত্তন থেকেই ছিল, তবে আমরা বলব যে এ সিদ্ধান্ত অনুমান-সিদ্ধ হতে পারে কিন্তু প্রমাণসিদ্ধ নয়। তিনি বলেছেন কাদম্বরীর মহাশ্বেতা বনের মধ্যে মন্দিরে গিয়ে আর কোন গান করেছিলেন ধ্রুপদ বিনা বা মেঘদূতের যক্ষ রামগিরিতে আর কোন গান করত ধ্রুপদ বিনা! অধ্যাপক মহাশয় ভাষাতত্ত্বে অসাধারণ পণ্ডিত, তাঁর কীর্ত্তি পর্ব্বতপ্রমাণ,—তাঁর কাছে আমরা এ রকমের বিচার ও সিদ্ধান্ত আশা করি না। তাঁর কাছে আমরা চাই সেই শ্রেণীর যাচাই করা মজবুত প্রমাণ যা তিনি তাঁর ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় প্রয়োগ করে থাকেন। ধ্রুপদ style ব্যাপারটা একটু technical, স্থতরাং স্থনীতিবাবু কেবল নিজের মত প্রচার না করে গান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মত দিলেন না কেন? শুনতে পাই পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীকে ভারতের বিশেষজ্ঞরা দ্বিতীয় তানসেন বলেন; তিনি সারাজীবন এ বিষয়ের চর্চ্চায় অতিবাহিত করেছেন ও গান ও গানের ইতিহাস সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পুস্তক রচনা করেছেম। তাঁর মতামত স্থনীতিবাবু কেন গ্রহণ করলেন না?

প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি বিষয়ে প্রবন্ধ আছে যা আচার্য্যরায়ের বড় প্রিয়বস্তু ছিল, সে হল "The Hindu College and Reforming Young Bengal"। মনে পড়ে যখন তাঁর ক্লাসে পড়তাম তখন কতবার তিনি অধ্যাপনার বিষয় ছেড়ে এই বিষয়ে বক্তৃতা করে আমাদের তন্ময় করতেন। বিষয়টি সম্বন্ধে এই স্থচারু প্রবন্ধ লিখে ডক্টর স্থশীল কুমার দে বাংলার বিদ্বৎসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্যে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জনের "The Mysteries of Matter" উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে পদার্থ ও তার গঠন সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে অল্পের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু উচ্ছ্বাসের মুখে প্রিয়দাবাবু লিখেছেন যে 5000 B. C.তে (আর এক স্থানে 3000 B. C.) হিন্দু ও গ্রীক

দার্শনিকরা molecular Theoryর পত্তন করেছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় রসায়ণ শাস্ত্রে এতই নিমজ্জিত যে ঐতিহাসিক দিন তারিখের সংবাদ নেবার সময় পান নি। এলাহাবাদের অধ্যাপক অমিয় ব্যানার্জ্জীর Modern Science and Influence অতি পরিপাটি রচনা। জৈব বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর চিত্র-সম্বলিত প্রবন্ধ রয়েছে, কিন্তু সাধারণোপযোগী করে না লেখায় একটু নিরস লাগে। এর মধ্যে ডক্টর হরেন রায়ের A peep into the microscopic world অপেক্ষাকৃত সুপাঠ্য। সুকুমার বাবুর Time in ancient, medearl and modern chroudlogy খুব মনোজ্ঞ প্রবন্ধ কিন্তু এখানেও ঋগ্বেদকে একেবারে ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ তে স্থাপন করা হয়েছে, তিলকের Orionএর পথানুসরণ করে। সুকুমার বাবু কি জানেন না যে তিলকের বেদের কাল নিদ্ধারণকে এখন আর খুব প্রমাণ্য বলে ধরা হয় না? রাধাকমল বাবুর Environment Control of population movement অতি বিচক্ষণ রচনা। পরিশেষে আমি অধ্যাপক সাহার Need for a Hydraulic Laboratory in Bengalএর উল্লেখ করি। বিষয়টি সম্বন্ধে জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহা মহাশয় একটি মহোপকার করেছেন; আশাকরি তাঁর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হবে।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

What I Owe to Christ—C. F. Andrews (Holder and Stoughton.)

এণ্ড্রুস্ সাহেবের এই বইখানা পড়ে বড় ভালো লাগলো, পূতচরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুর জীবনকথা বিশেষভাবে তাঁর জীবনে যীশুখৃষ্টের প্রভাব কতখানি, তা সুন্দর সরল ভাষায় লেখা।

ধার্ম্মিক পিতা, ধর্ম্মপ্রাণা কর্ত্তব্যপরায়ণা জননী শৈশবেই তাঁর মনের সম্মুখে যীশুখৃষ্টের অপূর্ব্ব জীবনকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছিলেন—উপদেশ বা মৌখিক শিক্ষায় ততটা নয়, যতটা নিজেদের জীবন দিয়ে। যীশুখৃষ্ট এণ্ড্রুজের কাছে চিরদিন জীবন্ত—পূর্ণ মহিমায়, প্রেমের ঠাকুররূপে যীশু তাঁর জীবনে প্রতিনিয়ত দেখা দিয়েছেন। সন্দেহের কালিমা, নৈরাশ্যের অন্ধকার এসেছে—মন দিশাহারা হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্রাইষ্ট তাঁকে ছাড়েন নি, পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কত ভাগ রয়েছে—সকলেই এক খৃষ্টকে বিশ্বাস করেন, তথাপি মতের কত বিভিন্নতা। এই সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে কেমন ভাবে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত-ভূমিতে এসে দাঁড়ালেন—সেই ইতিহাস একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। এক এক করে সীমাবদ্ধতা তাঁকে পীড়া দিতে লাগলো, কিন্তু বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে অবশেষে তিনি বিবেকানুমোদিত পথে এসে প'ড়লেন—বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে এসে তাঁর অন্তর তৃপ্তি পেল। আরও বেশী নিবিড় করে তিনি খৃষ্টকে জীবনে উপলব্ধি করলেন—পাশ্চাত্য এবং খ্রীষ্টান জগতের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে একদিকে বিশালতর জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ হল, অপর দিকে খৃষ্টের জীবন ও তাঁর বাণীর

গভীরতর মর্ম্ম উপলব্ধি করলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ত্রই মহাপুরুষেরা যে একই সত্য প্রচার করেছেন, ধর্ম্মের মূলভিত্তি যে এক, এই সমন্বয়ে তাঁর মন আনন্দে পূর্ণ হোল।

বইখানির প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত মাতা পিতার বন্দনায় এণ্ড্রুজের জীবনের একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশবে অনুকূল গৃহ এবং আবহাওয়া মানুষের কতই না দরকার। বইয়ের শেষ কয়টি লাইন পরম উপভোগ্য হয়েছে। পুস্তকখানিতে আমরা আরেকটি জিনিব দেখতে পাই—সাধুসঙ্গ রূপ সৌভাগ্য এণ্ড্রুজের খুব। বিশপ ওয়েষ্টকট, রেভারেণ্ড ষ্টোক্‌স্, সাধু সুন্দর সিং, প্রোফেসার সুশীল রুদ্র, মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর জীবনে কখন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেন, গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি বর্ণনা করেছেন। রত্নই রত্ন চেনে—এণ্ড্রুজের জীবনসৌরভ এঁদের মোহিত করেছে তাও আমরা জানি। এঁরা, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ, নানাদিকে এণ্ড্রুজের জীবনপথে প্রভাব এবং আলো বিতরণ করেছেন—কিন্তু সকলের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রভু যীশুখৃষ্টের প্রকাশ দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। গান্ধীর কথা একজায়গায় বলেছেন—He is so entirely Hindu, yet so supremely Christian.

এক একটি জায়গায় বড় ভালো লেগেছে—রেভারেণ্ড ষ্টোক্‌স্ যাঁদের সঙ্গে কাজ করতে গেলেন, সম্যক্‌ভাবে তাদেরই একজন হবার জন্য তাদেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করে সেখানে সমস্ত জীবন তাদের কাজে বিলিয়ে দেবার সঙ্কল্প করলেন। তাঁর বিবাহ, বিশেষতঃ এই বিবাহ, এখানকার এবং বিলাতের ইংরাজদের মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য জাগায়। বলা বাহুল্য অধিকাংশ লোকেই ষ্টোক্‌সের কাজে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হলেন—এণ্ড্রুজ কিন্তু তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

The Celibate life……can only be regarded as right and justifiable in exceptional circumstaces and for exceptional causes, after all, as Christ himself seems to imply, it is at best a mutilated life on this earth of ours, as nature has framed it, not the normal life of mankind. Then to admit the celibate life to a higher rank than the natural, wholesome married life of man and woman, is to wander astray from Christ and his word.

তাঁদের "Imitation of Jesus" ভেঙ্গে গেল, কিন্তু একদিক্ ভেঙ্গে আরেক দিক্ যে গড়ে তা বেশ সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন।……"Except it die," he said, "it abideth alone, but if it die, it beareth much fruit."। তাঁদের "Imitation of Jesus"—দলটি ভেঙ্গে গেল, কিন্তু তার ফলে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। বাঁধা-ধরা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে দলের অনেকে আপন আপন জীবনকে সুন্দর ভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন—যেমন সাধু সুন্দর সিং। গণ্ডীর ভিতরে হয়তো তেমন ফুটতো না।

এণ্ড্রুজ বিয়ে করেন নি—তাঁর কাজের সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র পরিবার নিয়ে স্থির জীবন যাপন করা কষ্টকর—হয়তো এই জন্যই তাঁর মনও ঐদিকে যায় নি। বিয়ে না করলেও তাঁর জীবনে নারীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় প্রীতিতে তাঁর

মন সরস ছিল। এক জায়গায় লিখেছেন "I have never known the happiness of marriage. This has been denied me and the loss has been undoubtedly great". শৈশবে মায়ের কাছে এবং পরেও বহুস্থানে মেয়েদের সংস্পর্শে এসে তিনি শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। Without the inspiration of woman's intuitive faith I might have lost my own." (১৩২ পৃঃ)

এই একনিষ্ঠ খৃষ্টান সাধক ও উদার কর্ম্মীর জীবনের স্বচ্ছ সরল ছবিটি পরম উপভোগ্য।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন

কথাগুচ্ছ—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ; এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার।

বাংলা গল্পের এই প্রথম চয়নিকাকে আমরা বাংলার সাহিত্য-আসরে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করি। ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে এ রকম গল্প-সংগ্রহ বহুপূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে সে সব ভাষা নূতন করে বল ও প্রেরণা লাভ করেছে। বাংলা গল্প-সাহিত্যের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে তার এমন সম্পদ পরিলক্ষিত হবে যে এতদিন ধরে তার চয়নিকা রচনা ফেলে রাখা অমার্জ্জনীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। অতএব কথাগুচ্ছের সম্পাদক ও প্রকাশক এ অভাবটি দূর করবার ভার নেওয়ায় ধন্যবাদার্হ হয়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পর নিশ্চয় আবার নূতন কেতায় নূতন বাছাই করে অন্যান্য গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হবে কিন্তু কথাগুচ্ছ যে এ কাজে অগ্রণী তা চিরদিনই স্বীকৃত হয়ে আসবে।

সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন ফরাসীগল্প যেমন ফরাসী দেশের বাংলা গল্পও তেমনি বাংলা দেশের জীবন-স্পন্দন প্রতিবিম্বিত করে। বোধ হয় ছোট গল্পের ধর্ম্মই এই ; জীবনের সঙ্গে তার যোগ অতি নিকট ও খুব স্পষ্ট। অন্যদিকে যাকে আমরা বলি উপন্যাস তার যোগ জীবনের সঙ্গে হল একটু কুটুম্বিতার, একটু আড়ম্বরের। কথাগুচ্ছে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি ভূমিকা লিখে জগতের সাহিত্যে গল্প-কথার পরিচয় পত্র দান করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে গ্রীস রোমের সাহিত্যের কথা যাই হোক, ভারতের সাহিত্যের আদি হল মুখে মুখে রচিত গল্প, আর সে সব গল্প জীবন ও জগৎ থেকে সংগ্রহীত ; অর্থাৎ এই সব গল্পের মধ্যে জীবন-স্পন্দন প্রতিবিম্বিত।

কথাগুচ্ছের গল্পগুলি যে ধারায় সজ্জিত হয়েছে তাতে হয়ত বাংলার জীবন-স্পন্দন তেমন করে স্পন্দিত হয় নি ; এর কারণও সম্পাদক মহাশয়ের জবানবন্দী থেকে কতকটা ধরা যায়। তিনি জানিয়েছেন যে গল্পগুলি বিশেষ কোন পদ্ধতি অনুসারে সজ্জিত হয় নি, প্রত্যেক লেখকের বৈশিষ্ট্যময় লেখা সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়েছে এবং অনেক স্থলে লেখক স্বয়ং গল্প বাছাই করে দিয়েছেন। আগুপিছু করে সাজানোর একটা ধারা আছে ; তাতে রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্প "অপরিচিতা" ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' আছে সব শেষে, গোড়ার দিকে রয়েছে লোকান্তরিত লেখকদের গল্প, তার প্রথমেই শোভা পাচ্ছে প্রভাতবাবুর "আদরিণী"

ও "ফুলের মূল্য"। মধ্যবর্ত্তী স্থান দখল করে আছে প্রমথবাবু, শরৎচন্দ্র থেকে সুরু করে আধুনিক লেখক লেখিকা—বিভূতিবাবু, মনীন্দ্রলাল, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্রমিত্র, মনোজবসু, সীতাদেবী, শান্তাদেবী—প্রভৃতিদের গল্প,—কতকটা লেখকদের আবির্ভাব অনুসারে পর পর সাজান। মোট গল্প সংখ্যা ছত্রিশটি।

যে ছুটি কথা উঠেছে অর্থাৎ জীবনস্পন্দনের প্রতিবিম্ব ও লেখকদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে প্রথমটি যেমন সর্ব্বত্র ফুটে ওঠেনি দ্বিতীয়টি সম্বন্ধেও তেমনি সর্ব্বত্র নিঃসন্দিহান হওয়া যায় না। গল্পের নির্ব্বাচন সর্ব্বত্র লেখকের বৈশিষ্ট্য ফোটাবার উপযোগী হয় নি। রবীন্দ্রনাথের "অপরিচিতা' তাঁর গল্পগুলির ভেতর থেকে যে খুব ভাল বাছাই তা বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় ছাড়া আর কেউই স্বীকার করবে না। শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' তার কাঁচা হাতের ছাপ লুকাতে পারে না; এটি তাঁর প্রথম গল্প বলে দেওয়া হয়েছে না তাঁর বৈশিষ্ট্য বিকাশের জন্য দেওয়া হয়েছে তা ভাল বোঝা যায় না। তেমনি 'অভাগীর সর্গে'র যদি কিছু দাবী থাকে ত সে ছোট বলে, নতুবা নিশ্চয়ই শরৎবাবুর অনেক গল্প আছে যা তাঁর প্রতিভা প্রকৃষ্টতর রূপে ব্যক্ত করে। কেদারবাবুর নন্দোৎসব সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা; এর চেয়ে তাঁর ঢের ভাল গল্প রয়েছে। মনিলাল, জলধরবাবু প্রভৃতি অনেকের সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য এই একই। অপর পক্ষে প্রভাতবাবু, রবীন্দ্রমৈত্র ও আধুনিক উদীয়মান লেখকদের গল্পের বাছাই যথোপযোগী হয়েছে। আধুনিক লেখকদের গল্পের মধ্যে একটা মুস্কিল আছে, তাঁদের অনেকেরই লেখার ধাতই এখনও দানা বেঁধে স্থায়িত্ব লাভ করেনি, নতুবা যে কলমথেকে অচিন্ত্যকুমারের 'রুদ্রের আবির্ভাব' বার হয়েছে তা থেকে যে কেমন করে গোছা গোছা নিকৃষ্ট লেখা বার হচ্ছে এর আমি কোন মীমাংসা করতে পারিনে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ও আধুনিক লেখকদের যে ধারাবাহিকতায় কথাগুচ্ছের গল্পগুলি সজ্জিত তা থেকে বাংলাগল্পের একটা প্রগতি বিকাশ পাচ্ছে। অন্ততঃ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে প্রভাতবাবু ও শরৎচন্দ্র ছাড়া কোন পূর্ব্ববর্ত্তী গল্প-লেখকই প্রেমেন্দ্রমিত্র শৈলজানন্দ প্রভৃতি আধুনিক গল্পলেখকদের রচনার উচ্চস্তরে পৌছাতে পারেন নি। জীবনস্পন্দনের প্রতিবিম্বই হক আর আপন নির্ব্বিকল্প সৃষ্টিই হক গল্পের স্বরূপ এদের কাছে যেমন সত্য ভাবে ধরা পড়েছে তেমন ভাবে এদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের কাছে ধরা পড়েনি। বাস্তবিক এই পূর্ব্ববর্ত্তীদের লেখা গল্প পড়লে এটা না মনে হয়ে যায় না যে তাঁরা গল্প না লিখে গল্প লেখার "শ্রীচরণকমলেষু" পাঠ মক্স করে এসেছেন মাত্র। চৌধুরী মহাশয় ভূমিকায় বাংলাগল্পের সূত্রপাত সম্পর্কে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ থেকে বাঙ্গলা গল্প স্ফুরিত হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে,—যে কারণেই হক,—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আধুনিক লেখকদের ওপর যে রকম পূর্ণভাবে বর্ষিত হয়েছে, এদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের ওপর তেমন ভাবে হয়নি। আর একদিকে,—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবুজপত্র, বলাকা যুগের সময় থেকেই পূর্ণ স্বরূপ ও শক্তি লাভ করেছে। এখন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ভরা জোয়ার আর আধুনিক লেখকদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে এক প্রভাতবাবু ও চৌধুরী মহাশয় ছাড়া এমন কেউই ছিলেন না যিনি আপন মৌলিকত্বের ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতেন।

আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলবার আছে। এদের কেউ কেউ sex story ও বস্তির গল্প বলবার দুর্জ্জয় সাহসিকতা দেখিয়েছেন কিন্তু গুচ্ছকথা থেকে

এশ্রেণীর গল্প সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে! এটা এখন সুবিদিত যে sex জীবন-স্পন্দনের একটা প্রধান উৎস ; কই sex কাব্যে আরাধনা করতে ত বাধে না, বিদেশী ভাষায় লেখা গল্পে ও সিনেমায় উপভোগ করতে বাধে না ? বাংলাগল্পের চয়নিকাতে এ শ্রেণীর গল্প বাদ দিলে কি জীবন প্রতিবিম্ব ক্ষুণ্ণ হবে না ? তবে যদি সম্পাদক মহাশয় এমন sex story না খুঁজে পেয়ে থাকেন যার কোন সাহিত্যিক দাবী আছে তবে সে আলাদা কথা। সম্পাদক মহাশয় বুদ্ধদেব বাবুর কোন গল্পকেও এই গল্প সংগ্রহে স্থান দেন নি, এ পক্ষপাত্বিতের ও কোন কারণ অনুমান করা যায় না ; আমার মনে হয় এতে গুচ্ছকথা নিজেই বঞ্চিত হয়েছে। অথবা বুদ্ধদেব বাবু আজকাল লেখায় যে রকম শৈথিল্য আনয়ন করেছেন তাতে সম্পাদক মহাশয়ের নির্ব্বাচন পদ্ধতির একটা সাফাই থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আরও অনেক গল্পলেখক রয়েছেন যাঁদের বাদ দিয়ে সম্পাদক মহাশয় গুচ্ছকথাকে বঞ্চিত করেছেন ; অথচ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা একপৃষ্ঠার জঘন্য বাজে গল্প কেন দেওয়া হয়েছে তাও বোঝা শক্ত।

একদিন হয়ত বাংলা গল্পের চয়নিকা ইংরাজীতে অনুদিত হবে। আমার মনে হয় সে দিন অচিন্তবাবু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ প্রভৃতির গল্প বিশ্বের সাহিত্য আসরে আপন ঠাঁই করে নিতে পারবে। প্রভাতবাবু, চৌধুরী মহাশয়ের গল্প সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই। "আদরিণী", "কুলের মূল্য" 'রুদ্রের আবির্ভাব', 'পুঁইমাচা', 'অসমাপ্ত, 'মোট বারো' বিশ্বের সাহিত্যে একেবারে নগণ্য হবে না।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Nationalism in the Soviet union—Hans Kohn ,—
George Routledge & Sons.

"বিশ্বের বিত্তহীন সম্প্রদায় একীভূত হও" এই বাণী ঘোষণা করা যে রাষ্ট্রের ব্রত, সেই রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের কোনস্থান আছে কিনা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কলেজে যে সকল বই পড়াইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় তাহাতে লেখা আছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী—কেননা রাশিয়ার বিশাল প্রাচ্য সাম্রাজ্য এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মনে খট্‌কা বাধিত যে যে বলশেভিকগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাম্রাজ্য-বাদীদের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে, তাহারা নিজে কেমন করিয়া সাম্রাজ্য শাসন করে ? এতদিন এই সমস্যা-সমাধানের কোন সূত্র পাই নাই কেননা রাশিয়া সম্বন্ধে যে সকল বই সচরাচর হাতে পড়ে তাহাতে সোভিয়েটের অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দোষ ত্রুটী বা প্রশংসার কথাই দেখা যায়—পুরাতন রুশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্যজাতিগুলির বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা বিশেষ পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ ডাঃ হান্স কোন্ আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া কেবল যে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু বিংশশতাব্দীর রাষ্ট্রীয় প্রগতির একটি বিশিষ্ট ধারার সন্ধান দিয়াছেন। ডাঃ হান্স কোন্ প্রাচ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ সম্বন্ধে "A History of

Nationalism in the east" ও Nationalism and Imperialism in the Hither East" নামক দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া সুধী সমাজে যশোভাজন হইয়াছেন। রাশিয়া সম্বন্ধেও ইহা তাঁহার প্রথম গ্রন্থ নহে—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "বিপ্লবের অর্থ ও নিয়তি" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি রাশিয়ায় যাইয়া সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রে জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন ও সেই অনুসন্ধানের ফল এই গ্রন্থে তিনি পাঠকবৃন্দকে উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে রাশিয়ার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতী করিবার কোন নিদর্শন নাই—আছে শুধু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্রমবিকাশের ধারা নির্দ্দেশের প্রচেষ্টা।

বর্ত্তমান সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৫টি বিভিন্ন জাতি বাস করে—১৪৭টি ভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। এই জাতিগুলির মধ্যে সংখ্যানুসারে ৫টি প্রধান। ১৫কোটি ৮৪ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা রাশিয়ান ৫৩·০৫ জন, উক্রানিয়ান ২১·২৭ জন, হোয়াইট্ রাশিয়ান্ ৩·২৩জন, কাজাক ২·৭১জন উজবেক ২·৬৬জন। অন্যান্য জাতির লোকসংখ্যা শতকরা দুইজনেরও কম। ১৮৫টি জাতির মধ্যে কয়েকটি মাত্র বিপ্লবের পূর্ব্বে সভ্যতার দাবী করিতে পারিত। অন্যান্যগুলি রাশিয়ান্ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে সভ্যতার আলোক লাভে বঞ্চিত ছিল। সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রের অনুন্নত লোকসংখ্যাকে উৎপত্তি ও ভাষার বিভিন্নতা হিসাবে চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ফিনিশ—উগ্রিয়ান জাতিসমূহ (races)। ইহারা মধ্য ও উত্তরপূর্ব্ব রাশিয়ার জলা ও জঙ্গলময় ভূমিতে বাস করে। এই বিভাগের অন্তর্গত কোমি, মারি, মোউভিন প্রভৃতি জাতি ক্রমান্বয়ে রাশিয়ানগণের দ্বারা উর্ব্বরভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া নিতান্ত নিঃস্ব ও বর্ব্বর অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ তুর্কোতাতার জাতি সমূহ। ইহাদের মধ্যে ভোল্‌গা ও ক্রিমিয়ার তাতারগণ ও চুভাশ (Tschuvash) জাতি কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল—কিন্তু এই বিভাগের বাশকির, কাজাক, কিরঘিজ প্রভৃতি শাখা নিরন্ন ও জ্ঞানহীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল। মধ্য এশিয়ার উজবেকগণ সামন্ততন্ত্রমূলক সভ্যতার অধিকারী ছিল ও প্যান-ইস্‌লামের সমর্থন করিত। কিন্তু তাহাদের পশ্চিম প্রান্তের প্রতিবেশী যাযাবর তুর্কোমানগণ—সভ্যতার কোন ধার ধারিত না। দক্ষিণ ককাশাসের আজারবৈজানের তুর্কগণ আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। তৃতীয়তঃ ককেশিয়ান্ জাতিসমূহের মধ্যে জর্জ্জিয়ান্ ও আর্ম্মেনিয়ানগণ অনেকদিন হইতেই জাতীয়তাবাদের উপাসক ছিল। চতুর্থতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মোঙ্গলগণও হীন অবস্থায় বসবাস করিতেছিল।

জারের শাসিত রাশিয়ান্ সাম্রাজ্যে সর্ব্ব প্রথম ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ও জাতীয় ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের বাণী ঘোষিত হয়। যদিও ঐ সময়ে অধীন জাতিগুলি কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার পায় নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য অনুভূত হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নব্যতুর্ক বিদ্রোহের ফলে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মুসলমান জনসমূহের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে থাকে। সেই সময়ে জারের শাসনযন্ত্র অধীন জাতিসমূহের উপর রাশিয়ান সভ্যতার বোঝা চাপাইয়া দিবার অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছিল। শাসন ও বিচার কার্য্যে, বিদ্যালয়ে ও সভাসমিতিতে রাশিয়ান ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত না। এমন কি হোয়াইট রাশিয়ান ও

উক্রানিয়ান ভাষায় গ্রন্থ ও সংবাদ পত্র প্রকাশ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। সকল প্রকার লাভজনক রাজকার্য্যে রাশিয়ানগণ নিযুক্ত হইত—অধীন জাতিদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করিত তবে তাহাকে রাশিয়ায় আসিতে হইত। অধীন জাতিরা সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার (civil rights) হইতে বঞ্চিত ছিল। এই প্রকার ব্যবহারের ফলে তাহাদের মনে রাশিয়ার কবল হইতে মুক্ত হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময়ে জাতীয় ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের (National self-determination) বাণী শুনিতে শুনিতে তাহারা নিজের নিজের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের বিপ্লবের পর দেখা গেল যে রাশিয়া তাহার পশ্চিমের সাম্রাজ্য—যাহার মধ্যে ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়া ও পোল্যাণ্ড ছিল—ছাড়িয়া দিতে তো বাধ্য হইয়াছেই—উক্রানিয়া, আজারবৈজান, জর্জ্জিয়া ও আর্ম্মেনিয়াতেও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এমন কি সাইবেরিয়াতেও বলশেভিক বিরোধীদলের নেতৃত্বে নূতন রাষ্ট্র সংগঠিত হইতেছে।

এই অবস্থায় বলশেভিকগণ পোল্যাণ্ড ও ব্যাল্টিক সাগরের উপকূলের রাষ্ট্রসমূহের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইলেন। ঐ সকল স্থানে পাশ্চাত্যভাব ও ধনিকতন্ত্রবাদের এতদূর প্রসার হইয়াছিল যে সোভিয়েটের শাসন মধ্যে উহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলে অনর্থক গৃহবিবাদ বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে বলশেভিকগণ জোরের সহিত প্রচারকার্য্য ও ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন। ফলে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আজারবৈজান, আর্ম্মেনিয়া ও জর্জ্জিয়াতে স্বতন্ত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে বলশেভিক সৈন্যদল বৈকাল সরোবরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ ও ওম্স্ক, টোম্স্ক, ইর্কুট্স্ক প্রভৃতি স্থান পুনরায় অধিকার করিয়া লইল। তৎপরে কম্যুনিষ্ট দলের সাধারণ সম্পাদক ষ্টালিন সোভিয়েট তন্ত্রাবলম্বী সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের মহাসভায় একতার সুবিধা ব্যাখ্যা করিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে অন্যান্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত রাশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রের সন্ধি হইল। ১৯২৩ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে (1) the Russian Socialist Federated Soviet Republic, (2) the Ukranian Socialist Soviet Republic (3) the Transcaucasian Socialist Federated Soviet Republic (4) the Whip Russian Socialist Soviet Republic (5) the Uzbekistan Socialist Soviet Republic (6) the Turkmenistan Socialist Soviet Republic এবং (7) the Tadrikistan Socialist Soviet Republic প্রধানতঃ এই সাতটি যুক্তরাষ্ট্র লইয়া Union of Socialist Soviet Republics (U.S.S.R.) গঠিত হয়। U.S.S.R.এর মধ্যে ৪২টি স্বতন্ত্র খণ্ড আছে। তন্মধ্যে ৯টি যুক্তরাষ্ট্র federal member states) ১৫টি স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিকদেশ (autonomous republics) ও ১৮টী স্বতন্ত্র জনপদ (autonomous regions)।

এই বিশাল রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে প্রত্যেকজাতি কি নীতির ফলে একইকালে জাতীয়তাবাদের ও কম্যুনিষ্ঠবাদের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে তাহাই বর্ণনা করা ডাঃ হান্স কোনের উদ্দেশ্য। তিনি দেখাইয়াছেন যে বলশেভিক বিপ্লবের বহুপূর্ব্ব হইতেই লেনিন রাশিয়ার অধীন জাতিদের সমস্যা আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

লেনিন অবশ্য পরস্পর যুধ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে মানব সমাজকে বিভক্ত দেখিতে চাহিতেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন বিভিন্ন জাতির লোকের অবাধ মিলনের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তম অর্থনৈতিক সঙ্ঘ। কিন্তু এরূপ সঙ্ঘ স্থাপন করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে সাম্যের প্রয়োজন। যদি এক জাতি অপর জাতির উপর সামান্য অত্যাচারও করে, যদি কোন ভাষা বা জাতিকে সামান্য প্রাধান্যও দেওয়া হয়, যদি কোন জাতিবিশেষের হাতে রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে জাতীয়তা-বাদের হলাহল সমগ্র সমাজদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্ঘকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে—বিভিন্ন জাতির শ্রমিকের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ কল্পনার কুহেলিকায় মিলাইয়া যাইবে। সুতরাং সমস্ত জাতিকে সমান অধিকার দিয়া, সমান অবস্থায় উন্নয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উন্নততর জাতীয় সাম্যে উপনীত হইলে বিভিন্ন জাতির বিত্তহীনদের মধ্যে আন্তর্জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি পাইবে। লেনিন এরূপ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন যাহার ফলে জাতীয় ভাব বৃদ্ধি পাইয়া উহা আন্তর্জাতিক ভাবে অন্তর্লীন হইতে পারে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ষ্টালিন "Martism and the National question" নামক যে পুস্তিকা লেখেন তাহাতে লেনিনের উক্ত মতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়ঃ—

"At this difficult moment a high mission falls upon the Social Democracy—to take up its position against nationalism, to keep the masses out of the general current. The Social Democracy and it alone can do this, by opposing to nationalism the proven weapon of internationalism, the unity and indivisibility of the class struggle. The higher the wave of nationalism rises, the more loudly must the voice of the Social Democracy be raised for the fraternity and unity of the proletarians of all nationalities of Russia.........

This is why the workers are fighting and will fight against every policy of national oppression in all its forms, from the subtlest to the crudest. This is why the Social Democracy of all countries is proclaiming the right of the peoples to self-determination."

বিপ্লবের চারিবৎসর পূর্ব্বে যে নীতি স্থিরীকৃত হইয়াছিল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে U. S. S. R. স্থাপিত হইবার পর তাহাই অনুসৃত হয়। এই নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক জাতির স্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বীকার করা হইয়াছে—এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিকে সমান অধিকার দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসন-সমিতিকে (The Union Central Execution Committee) দুই কক্ষে (Chambers) বিভক্ত করা হইয়াছে—প্রথমতঃ Soviet of the Union নামক কক্ষ—প্রত্যেক সাধারণতন্ত্র হইতে জন সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রায় চারিশত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ Soviet of Nationalities নামক কক্ষে প্রত্যেক জাতি হইতে সমান সংখ্যক

প্রতিনিধি (প্রায় ১৩০ জন) লওয়া হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির আভ্যন্তরীণ শাসনভারও রাশিয়ানদের হাতে না রাখিয়া জাতির উপযুক্ত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

যেরূপ রাজনৈতিক বিষয়ে সেইরূপ ভাষাও শিক্ষা বিষয়ে প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি শিক্ষা ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজের নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে পারে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র উক্ত ক্ষমতা দিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই, পরন্তু প্রত্যেক জাতির ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য অশেষ বিধ চেষ্টা করিতেছে। এমন অনেক জাতি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ছিল যাহাদের সাহিত্য দূরে থাকুক অক্ষর পর্য্যন্ত ছিল না। তাহাদের মধ্যে ল্যাটিন অক্ষর প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে; তাহাদের পাঠ্যপুস্তক লেখান হইয়াছে; তাহাদের স্বজাতীয় শিক্ষককে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করা হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে সাহিত্য ছিল অথচ সাহিত্য মধ্যযুগীয় ধর্ম্মভাব প্রণোদিত ছিল ও সাধুভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহাদের সাহিত্যকে নবভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ডাঃ হান্সকোন্ গ্রন্থের পরিশিষ্টে কোন ভাষায় কতগুলি বই কতখানি করিয়া সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ছাপিয়াছে তাহার তালিকা দিয়াছেন। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। প্রত্যেক জাতির নৃত্য গীত, কবিতা, কারু ও চারু শিল্প যাহাতে পুনরায় প্রচলিত হয় ও সমৃদ্ধিলাভ করে তাহার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু জাতীয়ভাবের পরিপোষক রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যও ভাষা শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার বহিরঙ্গ রূপকে উৎসাহ দিলেও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট জাতির সভ্যতার অন্তরঙ্গরূপ বা সাধনাকে (culture) হত্যা করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। এ বিষয়ে তাহাদের মন্ত্র "Death to the national culture"। সকল জাতির সকল লোককে একভাবে অনুপ্রাণিত করিতে না পারিলে কম্যুনিজিমের আন্তর্জাতিক রূপ ব্যর্থ হইয়া যাইবে আশঙ্কায় এই নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির নিজের নিজের ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক পুস্তকে কম্যুনিজিমের মূলনীতি প্রচার করা হইতেছে। আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠানগুলিকেও কম্যুনিজিম প্রচারের বাহন করা হইয়াছে। অর্থনীতিতে প্রত্যেক সাধারণতন্ত্রকে কম্যুনিষ্ট করা হইয়াছে ও প্রত্যেক জাতির উৎপাদন প্রণালীকে কারখানার আদর্শে পরিবর্ত্তিত করা হইতেছে। সামাজিক ব্যাপারেও প্রত্যেক জাতির আচার ব্যবহারকে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট আদর্শে সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগুলির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে। তাতার বালিকারা এখন সরকারী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেছে। মধ্য এশিয়ার মুসলমান নারীদের শিক্ষার জন্য যাযাবর-পাঠাগার, ধাত্রী, চিকিৎসক প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রাচ্য সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে ১৫০০ জন নারী গ্রাম্য সোভিয়েটের সভাপতি হইয়াছে। উজবেকিস্তানে ১৮ জন নারী নেতৃপদ পাইয়াছে, একজন তথাকার কেন্দ্রীয় শাসন-সমিতির সভ্য হইয়াছে। কাজাকিস্তানের প্রধান বিচারালয়ে একজন নারী প্রধান বিচারপতি হইয়াছে। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে নারীর পক্ষে এই সকল পদ পাওয়া যে কিরূপ কষ্টকর তাহা আর আমাদের দেশের

লোককে বুঝাইতে হইবে না। কম্যুনিষ্টদের অসাধারণ প্রচারকার্য্যের ফলেই গত ছয় বৎসরের মধ্যে মুসলমান সমাজে এই অসম্ভব পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে।

একদিকে জাতীয়তাবাদের পোষণ অন্যদিকে উহার নিষ্পেষণ বর্ত্তমান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে চলিতেছে। ইহার মধ্যে কোন নীতি অধিকতর কার্য্যকরী হইবে সে কথা বলা কঠিন। হান্সকোন্ বলেন কম্যুনিষ্টদের সাধারণ সাফল্যের উপর জাতীয়তার সহিত আন্তর্জাতীয়তার মিলন প্রচেষ্টার কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিতেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে দুইটি নজির দাখিল করিতে চাই। রাশিয়ান্ কম্যুনিষ্টদের মতন আর্য্যগণও তাঁহাদের সাধনাধারা ভারতের অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন অথচ অন্যান্য জাতির ভাষা ধর্ম্ম ও সভ্যতার বহিরঙ্গ রূপের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু সাধনগত ঐক্য (যাহাকে ডাঃ রাধাকুমুদ Fundamental Unity বলিয়াছেন) ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য আনিতে পারে নাই—বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। আবার ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসিয়া ভারতের সমস্ত প্রদেশ এক শিক্ষা, এক সভ্যতা, এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সমগ্র ভারতের মধ্যে জাতীয় বোধ উদ্বুদ্ধ হইলেও এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের বিরোধ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। সাধনাগত ও অবস্থাগত ঐক্য ভাষাও দেশগত অনৈক্যকে পরাভূত করিতে পারে এরূপ প্রমাণ আমরা অন্ততঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে পাই না।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ, ১৩৪০

পরিচয়

বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'

বুদ্ধদেব কি নাস্তিক ছিলেন? এদেশে ও বিদেশে অল্পদর্শী লোকে তাহাই ভাবে বটে। এমন কি, বাল্মীকি-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বুদ্ধদেবকে স্পষ্টভাষায় 'নাস্তিক' বলা হইয়াছে (ঐ শ্লোক খুব সম্ভব প্রক্ষিপ্ত)—

যথা হি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ
তথাগতং নাস্তিকম্ অত্র বিদ্ধি—অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯।৩৪

(অনেকেই বোধ হয় জানেন, বুদ্ধদেবের একটি নাম 'তথাগত')। প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে বুদ্ধদেবকে যে, মায়া-মোহের অবতার বলা হইয়াছে, সেও ঐ ধরণের কথা। বুদ্ধদেব নাকি অসুর-মোহনের জন্য এবং বিভ্রান্ত অসুরদের সহজে সংহারের জন্য নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিলেন। এ মতে সম্মতি দিবার আগে বুঝিতে হয় 'নাস্তিক' বলিলে কি বুঝায়?

এ দেশের আদর্শ নাস্তিক চার্ব্বাক। চার্ব্বাক একাধারে জড়বাদী (Materialist), উচ্ছেদবাদী (Nihilist), দৃষ্টবাদী (Positivist), সংশয়বাদী, হেতুবাদী (Rationalist), প্রেয়ঃবাদী (Hedonist), দেহবাদী, অনাত্মবাদী ও ইহ-সর্ব্বস্ববাদী। তাঁহার বৈনাশিক দৃষ্টিতে পাপপুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, স্বর্গনরক নাই, পরলোক নাই, পুনর্জন্ম নাই, ঋষি নাই, দেবতা নাই, ঈশ্বর নাই, মোক্ষ-নির্ব্বাণ নাই। সেই জন্য 'সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহ'কার চার্ব্বাককে 'নাস্তিক-শিরোমণি' বলিয়াছেন। অতএব নাস্তিকতার পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে চার্ব্বাকমতের আলোচনা করা আবশ্যক।

'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' চার্ব্বাকমতের যে সার সংগ্রহ আছে, তাহাতে দেখা যায়, চার্ব্বাক দেহাতিরিক্ত আত্মা মানিতেন না—দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ। তবে চৈতন্যের উদয় হয় কিরূপে? চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যমুপজায়তে—ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ এই চারি ভূত মিলিত হইয়া দেহ রচনা করে; ঐ ভূতচতুষ্ঠয়ের বিকারে 'কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়েতে'। ঐরূপে সঞ্জাত চৈতন্যই আত্মা—স এবাত্মা ন চাপরঃ। বলা বাহুল্য দেহের নাশের সহিতই ঐ আত্মার বিনাশ হয়—Survival of Man বাজে কথা—অতএব দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ।

ইহ-সর্ব্বস্ব চার্ব্বাকের দৃষ্টিতে স্বর্গ নরক, পরলোক, পুনর্জ্জন্ম থাকিতেই পারে না—ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। অতএব, ভস্মী-ভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? স্বর্গ ত' নাই-ই—আর নরক? কণ্টকাদি-জন্যং দুঃখমেব নরকম্। আর ধর্ম্মাধর্ম্ম? সে ত' উন্মত্তের প্রলাপোক্তি। যাহাই অনুকূল-বেদনীয় (pleasant), তাহাই উপাদেয়;—এবং যে কিছু প্রতিকূল-বেদনীয় (unpleasant), তাহাই হেয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম যখন নাই, তজ্জনিত অদৃষ্টও থাকিতে পারে না—অতঃ তৎসাধ্যম্ অদৃষ্টাদিকমপি নাস্তি।

যদি প্রশ্ন উঠাও—'যদি অদৃষ্ট নাই, তবে এই বিচিত্র বিশ্বের ব্যবস্থা হইল কিরূপে? ইহা কি আকস্মিক (accidental)?' চার্ব্বাকের উত্তর সহজ—স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ।

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শ স্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতংতস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্-ব্যবস্থিতিঃ॥

'অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীততা, বায়ুর শীতল-স্পর্শতার ন্যায় জগদ্-বৈচিত্র্যও স্বভাবসিদ্ধ।'

জগতে দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু তাহার ভয়ে সুখ ত্যাগ করা ভীরুতা, মুর্খতা।

তস্মাৎ দুঃখভয়াৎ নানুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুম্ উচিতম্ * * যদি কশ্চিৎ ভীরুঃ দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ, তর্হি স পশুবৎ মুর্খো ভবেৎ। তবেই—যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

—বিশেষতঃ যখন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্তেরই উচ্ছেদ হইবে। অতএব Eat, drink and be merry, for tomorrow you die.

যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।

সেই জন্য (চার্ব্বাকমতে) সুখই জীবের লক্ষ্য, এবং সমস্ত সুখের মধ্যে আবার অঙ্গনালিঙ্গনই চরম, পরম সুখ—'পুরুষার্থ'।

অঙ্গনালিঙ্গনাদি-জন্যং সুখম্ এব পুরুষার্থঃ।

বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিধিনিষেধ দ্বারা আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়, কিন্তু ঐ বেদের প্রামাণ্য কি ?

ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ—

যে বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও আসুর-প্রকৃতির লোকের রচিত—ঐ বেদ মানিতে হইবে ? কেন ?

বেদকে লোকে 'আগম' বলে—বেদ নাকি আগম-প্রমাণ সিদ্ধ ! চার্ব্বাক বলেন, প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত প্রমাণই নাই—অনুমানই অসিদ্ধ—আগম ত' বহুদূরের কথা !

প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদেঃ অনঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ।

অতএব বহু বিড়ম্বিতের উদ্ধারসাধনার্থ এই রমণীয় চার্ব্বাকমতের শরণ লও—বহূণাং প্রাণিনাম্ অনুগ্রহার্থং চার্ব্বাকমতম্ আশ্রয়ণীয়মিতি রমণীয়ম্ (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)।

চার্ব্বাকমতের একটি নাম 'লোকায়ত' — (wide-spread)। সর্ব্বদর্শনকার বলেন, এ নাম সার্থক (লোকায়তম্ ইত্যন্বর্থম্ অপরং নামধেয়ম্)—নাস্তিকতা জীবের চিত্তে এতই নিরূঢ় ! এ মতের আরম্ভ কবে ? ইহার প্রবর্ত্তক কে ? সর্ব্বদর্শনে চার্ব্বাকমতকে বৃহস্পতি-মতানুসারী বলা হইয়াছে এবং বৃহস্পতির নামের সহিত সংযুক্ত কয়েকটা বচনও উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাঃ ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥

এই বৃহস্পতি কে ?

বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডেও আমরা এক নাস্তিকের সাক্ষাৎ পাই—জাবালি। তিনি কি বৃহস্পতির শিষ্য না গুরু?

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধ্য বনবাস স্বীকার করিয়াছেন—ভরতের সানুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ভারত-সাম্রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—এমন সময় জাবালি তাঁহার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত। তিনি রামচন্দ্রকে বুঝাইতেছেন :—

"শ্রীরাম! উন্মত্তের ন্যায় এ কি তোমার আচরণ? উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ঃ। পিতৃসত্য? দশরথ তোমার কে?

ন তে কশ্চিৎ দশরথঃ ত্বং চ তস্য ন কশ্চন।

পিতাপুত্র? এই সম্বন্ধ!

ন কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিম্ আপ্যং কস্য কেনচিৎ।
যদ্ একো জায়তে জন্তুঃ এক এব বিনশ্যতি ॥—১০৯।৩

দেখ, প্রত্যক্ষই সার—পরোক্ষ বলিয়া কোন কিছু নাই।

প্রত্যক্ষং যৎ তদ্ আতিষ্ঠ, পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু।

পরলোক? ইহলোকই সর্ব্বস্ব—পরলোক আবার কি?

স নাস্তি পরম্ ইত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে! দান, দীক্ষা, তপস্যা, ত্যাগ—মূর্খ-প্রতারণার জন্য এ-সকল বুদ্ধিজীবীর উদ্ভাবন।

দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপঃ তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাই—যাহারা ধর্ম্মের জন্য, পুরুষার্থের জন্য, কষ্ট স্বীকার করে, তাহারা কৃপা-পাত্র—তান্ তান্ শোচামি, নেতরান্। কেন?

তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য, বিনাশং প্রেত্য লেভিরে।

দেহের অতিরিক্ত যখন আত্মা নাই—তখন শরীরের সহিত আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী নহে কি? অতএব যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে অন্নের অপব্যয় উপদ্রব বই আর কি? 'মরা গরুতে কখন ঘাস খায় না।'

অষ্টকা পিতৃদৈবত্যম্ ইত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিম্ অশিষ্যতি?—১০৮।১৪

এই সকল উক্তিদ্বারা জাবালি শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মব্রত টলাইতে পারেন নাই। জাবালির বক্তৃতা শুনিয়া রাম বলিলেন—এ কি 'সুনাস্তিক' ধর্ম্ম-দ্রোহী মত!

ধর্ম্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্ব্বস্য চোচ্যতে

'ধর্ম্মই সমস্তের মূল—সত্যেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।'

একঃপালয়তে লোকম্ একঃপালয়তে কুলম্।
মজ্জত্যেকোহি নিরয়ে একঃ স্বর্গে মহীয়তে॥—১০৯।১৫

অতএব দেখা যাইতেছে, সেই সুপ্রাচীন রামায়ণ-যুগেও ভারতবর্ষে নাস্তিকমতের প্রচার ছিল।

বুদ্ধদেবের সময়েও নাস্তিকমতের অভাব ছিল না। মজ্ঝিম-নিকায়ে তিনি এইরূপে ঐ মতের বিবৃতি দিয়াছেন ঃ—

নত্থি দিন্নং, নত্থি য়িট্ঠং (ইট্ঠং), নত্থি হুতং, নত্থি সুকত-দুক্কতানং কম্মানং ফলং বিপাকো, নত্থি অয়ং লোকো নত্থি পরো লোকো, নত্থি মাতা নত্থি পিতা, নত্থি সত্তা ওপপাতিকা, নত্থি লোকে সমনব্রাহ্মণা সম্মগ্‌গতা সম্মা-পটিপন্না যে ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সয়ং (স্বয়ং) অভিঞ্‌ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তি।

চাতুম্মহাভূতিকো অয়ং পুরিসো। যদা কালং করোতি, পঠবী পঠবীকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আপো আপোকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, তেজো তেজোকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, বায়ো বায়োকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আকাসং ইন্দ্রিয়ানি সংকমন্তি। আসন্দি-পঞ্চমা পুরিসা মতং (মৃতং) আদায় গচ্ছন্তি, যাব আলাহনা পদানি পঞ্‌ঞায়ন্তি, কাপোতকানি অট্ঠীনি ভবন্তি। ভস্‌সন্তহুতিয়ো দত্তুপঞ্‌ঞতং যদ্ ইদং দানং। তেসং তুচ্ছং মুসা বিলাপো যে কেচি অত্থিক বাদং (আস্তিক বাদং) বদন্তি। বালে চ পণ্ডিতে চ কায়স্‌স ভেদা উচ্ছিজ্জন্তি বিনস্‌সন্তি, ন হোন্তি পরং মরণা তি।*

---

* এই পালি মূলের ইংরাজি অনুবাদ এই :—
There is no such thing as alms or sacrifice or offering. There is neither fruit nor result of good or evil deeds. There is no such thing as this world or the next. There is neither father nor mother, nor beings springing into life without them. There are in the world no recluses or Brahmins who have reached the highest point, who walk perfectly, who having understood and realized, by themselves alone, both this world and the next, make their wisdom known to others. A human being is built up of the four elements. When he dies, the earthy in him returns and relapses to the earth, the fluid to the water, the heat to the fire, the windy to the air, and his senses pass into space. The four bearers, on the bier as a fifth, take his dead body away; till they reach the burning-ground, men utter forth eulogies, but there his bones are bleached and his offerings end in ashes. It is a doctrine of fools, this talk of gifts. It is an empty lie, mere idle talk, when men say there is profit therein. Fools and wise alike, on the dissolution of the body, are cut off, annihilated and after death they are not.—Majjhima Nikaya, 76th Discourse—Translated by Lord Chambers.

অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয়ে নির্ম্মিত যে দেহ, উহাই জীব। দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। শ্মশানেই মানুষের সব শেষ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতি ক্ষিতিতে, অপ্ জলে, তেজঃ অগ্নিতে, মরুৎ বায়ুতে, ইন্দ্রিয় সকল আকাশে মিশাইয়া যায়। অজ্ঞ বিজ্ঞ, সকলেই দেহের নাশের সহিত বিনষ্ট, উচ্ছিন্ন হয়—আর তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। ইহলোক পরলোক—এরূপ ভেদ করা মূর্খতা। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ, কর্ম্মফল—এ সমস্ত অলীক কথা। দান শীল ত্যাগ কৃত্য—এ সকলই পণ্ড শ্রম—নিরর্থক ও নিষ্ফল। উহা is a doctrine of fools—বালিশ-বাদ মাত্র।

বুদ্ধদেবের যুগে যে সকল 'পণ্ডিতেরা' এই নাস্তিক মত প্রচার করিতেন, তাঁহারা চার্ব্বাকের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন কি না, জানা নাই—তবে তাঁহারা যে তাঁহার সহোদর ভাই, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। বুদ্ধদেব ঐ নাস্তিক মতের মণ্ডন করেন নাই—স্পষ্ট বাক্যে খণ্ডন করিয়াছেন—সমর্থন ত' দূরের কথা, যুক্তিদ্বারা নিরসন করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, যদি এই নাস্তিক মত সুস্থিত, সত্যোপেত হইত, তাহা হইলে সমস্ত নৈতিক প্রচেষ্টাই নিরর্থক হইত। (Every moral action upon the earth would be purposeless). তাঁহার শ্রীমুখের বাণী এই ঃ— স চে ইমস্স ভোতো সত্থুনো সচ্চং বচনং অকতেন মে এত্থ কতং, অবুসিতেন সে এত্থ বুসিতং, উভোপি মযং এত্থ সমসমা সামঞ্ঞং পত্তা × × অতিরেকং (superarrogation) খো পন ইমস্স ভোতো সত্থুনো নগ্গিযং মুণ্ডিযং উক্কুটিকপ্পধানং কেসমস্সুলোচনং; যোহং পুত্তসংবাধসয়নং অজ্ঝাবসন্তো, কাসিক চন্দনং পচ্চনুভোন্তো, মালাগন্ধবিলেপনং ধারন্তো জাতরূপরজতং সাদিযন্তো ইমিনা ভোতা সত্থারা সমসমগতিকো ভবিস্সামি অভিসম্পরাযং। সো অব্রহ্মচরিযাবাসো অযংতি ইতি বিদিত্বা ব্রহ্মচরিযা নিব্বিজ্জ পক্কমতি। *

---

* এই পালি মূলের ইংরাজী অনুবাদ এই :—This dear teacher sets up such a meaning, such a doctrine : (to wit the materialistic one as reproduced above). If it is true what he is saying, then every moral action upon the earth is purposeless. Then we both are grown exactly the same......... Therefore it is too much if this dear teacher goes naked, shaves his crown, crouches down on his heels, plucks out both hair and beard ; and if I, living in a house full of children, using silk and sandal wood, ornaments and odoriferous ointments, finding pleasure in gold and silver, shall have in future just the same fate as this dear teacher : And he perceives : 'This is not the path to truth' and turns away unsatisfied from such path.

অর্থাৎ তাহা হইলে বিনা সাধনে, বিনা প্রযত্নে, ধর্ম্মজীবন উদ্‌যাপিত হইতে পারিত। যিনি বিলাসসুখে নিমগ্ন থাকিয়া সংসার-স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন আর যিনি কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া, পার্থিব ভোগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, ভিক্ষু হইয়া ব্রত ধারণ করেন—এই দুই ব্যক্তির দেহান্তে পরলোক-গতি তুল্যমূল্য হইত। তাহা কখন সম্ভব নহে। অতএব নাস্তিকমত হেয় ও অগ্রাহ্য—'Recognising that this is an antithesis to the higher life the man turns away in disgust।' মানুষের মধ্যে একটা স্বারসিক (স্বভাবসিদ্ধ) moral instinct আছে—জড়বাদীর সযত্ন-রচিত তর্কতরী ঐ অচলে লাগিয়া বানচাল হইয়া যায় (Materialism is already wrecked on the fact of the existence of moral and therefore unselfish actions.—George Grimm)।*

উচিত-অনুচিত সম্পর্কে এই যে সহজাত-সংস্কার, এই যে স্বারসিক বিবেক—বুদ্ধ-দেশিত ধর্ম্মের উহাই ভিত্তি-ফলক, উহাই স্তম্ভধারক (corner-stone)।

যিনি নাস্তিক, তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ মানেন না—অথচ নীতিবাদ বুদ্ধদেবের সমস্ত শিক্ষার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই জন্য পাশ্চাত্যেরা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন উচ্চাঙ্গের নীতি, এমন high and noble ethics জগতের অন্য কোন ধর্ম্মে দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মপদ—যাহা

---

* এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক ডু'প্রেল (DuPrel) বুদ্ধদেবের যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, আমরা এই পাদটীকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Man is the highest fact of nature, and morality is his highest function. * * * But moral instinct is illogical, if human individuality exists only between the cradle and the grave. If the visible part of our career alone had validity, and we went towards our annihilation with full consciousness, then we should resemble men condemned to death, only that our way to the scaffold would be a little longer, and the time uncertain when we should reach it. The law allows the condemned criminal the satisfaction of his wishes for the last days of his life, as was already the case with the ancient Greeks. But we ought to make this claim for the satisfaction of our wishes, for the whole duration of our life, neglecting all preparations for the other world, if as materialists we look upon death as annihilation.

বুদ্ধদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত সুভাষিতের সার-সংগ্রহ—তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে এ সম্পর্কে সন্দেহমাত্র থাকে না।

ধর্ম্মপদ বলেন—ধর্ম্মপীতী সুখং সেতি বিপ্পসন্নেন চেতসা—পণ্ডিত-বগ্‌গো 'ধর্ম্ম পালনকারী প্রসন্নচিত্তে সুখে বাস করেন'। কারণ, পুণ্যের ফলই সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ।

দুক্‌খো পাপস্‌স উচ্চয়ো × × সুখো পুঞ্‌ঞস্‌স উচ্চয়ো—পাপ বগ্‌গো।

সুধু জীবিতমানে নয়, জীবনান্তেও ঐ নিয়ম।

পুঞ্‌ঞং সুখং জীবিত সঙ্‌খয়ম্‌হি × ×
পাপানাং অকরণং সুখং—নাগবগ্‌গো

দেখা যায়, বুদ্ধদেব পাপপুণ্যের 'বিপাক' মানিতেন—সেই মনুর প্রাচীন কথা—ফলতি গৌরিব।

মধুবা মঞ্‌ঞতী বালো যাব পাপং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ দুক্‌খং নিগচ্ছতি॥—বাল বগ্‌গো

'মূর্খ পাপকে মধুমান্ মনে করে—যতদিন না পাপের বিপাক হয়—যখন বিপাক হয়, তখন দুঃখ ভোগ করিতে হয়।'

পাপোপি পস্‌সতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্চতি
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ পাপানি পস্‌সতি॥
ভদ্রোপি পস্‌সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি ভদ্রং অথ ভদ্রানি পস্‌সতি॥

অর্থাৎ পাপের বিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ—পরে দুঃখ এবং পুণ্যের বিপাক না হওয়া পর্য্যন্তই দুঃখ—পরে সুখ।

অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্ঝতি।
সেহি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্‌গিদড্‌ঢো ব তপ্পতি॥—দণ্ডবগ্‌গো

'মূর্খ পাপ করিবার সময় বুঝিতে পারে না—পরে কিন্তু ঐ দুর্বুদ্ধি অগ্নিদগ্ধের ন্যায় তাপিত হয়।' তখন বুঝে—পাপানং অকরণং সুখং।

চার্ব্বাক অঙ্গনালিঙ্গনকেই পরম সুখ বলিয়াছেন—বুদ্ধদেব কিন্তু পরদারসেবীর অশেষ দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়াছেন।

চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো
আপজ্জতী পরদারূপসেবী।
অপুঞ্‌ঞলাভং, ন নিকামসেয্যং
নিন্দং ততীয়ং নিরয়ং চতুত্থং॥—নিরয়বগ্‌গো

'পরদারসেবী প্রমত্ত নর—অপুণ্য, অশান্তি, নিন্দা ও নরক—এ চতুর্বিধ দশা প্রাপ্ত হয়'—অতএব 'তস্মা নরো পরদারং ন সেবে'। বুদ্ধদেবের শিক্ষা এই—পাপকারীকে স্বকৃত পাপের ভার বহিতেই হইবে—ভোগ (retribution) ভিন্ন তাহার ক্ষয় নাই, অর্থাৎ নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প-কোটিশতৈরপি। সেইজন্য তিনি বলিতেছেন ঃ—

> ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্ঝে
> ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স।
> ন বিজ্জতী সো জগতী প্পদেসো
> যত্থ ট্ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা ॥

'অন্তরিক্ষে, সমুদ্রগর্ভে, পর্ব্বত-বিবরে—এমন স্থান জগতে কোথায়, যেখানে গিয়া পাপকর্ম্মীর নিষ্কৃতি আছে ?'

বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট ধর্ম্ম-নীতি কত উচ্চ, কত উদার, কত মহান্—তাহার পরিচয় দেওয়া কঠিন নহে। তিনি বলেন—

> ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
> অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥—যমকবগ্গো

'এ জগতে বৈরের দ্বারা বৈর কখনও শমিত হয় না—অবৈরের দ্বারাই বৈর শমিত হয়—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।' অতএব,

> অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
> জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং ॥—কোধবগ্গো

'ক্রোধনকে অক্রোধ দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা, অসাধুকে সাধু দ্বারা; মিথ্যুককে সত্য দ্বারা জয় করিবে।'

শম, দম, সত্য, সহিষ্ণুতা—ইহাকে জীবনের মূলমন্ত্র করিবে—

> যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মোচ অহিংসা সঞ্ঞমো দমো।
> স বে বন্তমলো ধীরো থেরো তি পবুচ্চতি—ধম্মট্ঠবগ্গো

যাঁহাতে সত্য ধর্ম্ম অহিংসা সংযম দম প্রতিষ্ঠিত, সেই নির্ধূতমল ধীর ব্যক্তিই থের (স্থবির)-নামের যোগ্য। তিনিই কাষায়-বস্ত্র ধারণ করিবার অধিকারী—

> যো চ বন্তকসাবস্স সীলেসু সুসমাহিতো।
> উপেতো দমসচ্চেন সবে কাসাবম্ অরহতি ॥—যমকবগ্গো

যিনি রাগ দ্বেষ মোহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ত্যাগী, জ্ঞানী, মুক্তচিত্ত—তিনিই শ্রমণ হইবার উপযুক্ত ।*

রাগং দোসঞ্চ পহায় মোহং
সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো ।
অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা
স ভাগবা সামঞ্‌ঞস্‌স হোতি ॥—যমকবগ্‌গো

কেবল বাক্যবাগীশ নয়, যাঁহার বাক্য ও কর্ম্ম সমঞ্জস, যাহার মুখ ও মন এক—তিনিই শ্রমণ-নামের যোগ্য ।

বহুম্পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো ।
গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামঞ্‌ঞস্‌স হোতি ॥

অর্থাৎ বহু 'সংহিতা' আওড়াইয়া ফল কি ? যদি না তৎকর হও—গোপাল যেমন পরের গরুর গণনা করে, তোমারও দেখি সেই দশা—শ্রামণ্য তোমার বহু দূরে ! দেখ—সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো কারণ, তথাগতেরা ধর্ম্মের দেশনা করেন মাত্র—করণা তোমাকেই করিতে হইবে—তুম্মেহি কিচ্চং (কৃত্যং) আতপ্পং অক্‌খাতারো তথাগতা (মগ্‌গবগ্‌গো)—Your feet must tread the path, the Tathagata can only point the way.

---

* বুদ্ধদেবের ধর্ম্মনীতির এইরূপে Madame Blavatsky একস্থলে সারসংগ্রহ করিয়াছেন :—Crush out your Pride. Speak evil of no one. Kill thine arrogance. Be kind and gentle to all ; merciful to every living creature, forgive those who harm thee, help those who need thy help, resist not thine enemies. Destroy thy passions, for they are the armies of *Mara,* and scatter them as the elephant scatters a bamboo hut. Lust not, desire nothing ; all the objects thou pinest for, the world over, could no more satisfy thy lust, than all the sea-water could quench thy thirst. That which alone satisfies man is wisdom—be wise. Be ye without hatred, without selfishness, without hypocrisy. Be tolerant with the intolerant, charitable and compassionate with the hard-hearted, gentle with the violent, detached from everything amidst those who are attached to all, in this world of illusion. Harm no mortal creature. Do that which thou wouldest like to see done by all others.

তথাগত বুদ্ধ যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যে মার্গের দেশনা দিয়াছেন—তাহার নাম ‘মজ্ঝিমা পটিপদা’ (the middle way.) It is neither the habitual practice of sensuality (a low un-worthy way) nor the habitual practice of asceticism. There is a middle path, O Bikkhus, avoiding these two extremes—a path that bestows understanding, which leads to peace of mind, to the higher wisdom, to Nirvana. (Buddhist suttas. pp 146—8).

তত্র ভিক্খবে! যায়ং মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা, চক্খুকরণী ঞানকরণী উপসমায় অভিঞ্ঞায় সংবোধায় নিব্বাণায় সংবত্তাতি অদুক্খো এসো ধম্মো অনুপঘাতো অনুপায়ামো অপরিলাহো সম্মাপটিপদা—তস্মা এসো ধম্মো সরণো—

মজ্ঝিমনিকায়, ১৩৯ সূত্ত

সেই গীতার কথা—

যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥—৬।১৭

‘আহার বিহার, নিদ্রা জাগরণ—সমস্ত কর্ম্মে যুক্ত (harmonised) হইতে হইবে—‘অত্যন্ত’ (extreme) বর্জ্জন করিতে হইবে—কারণ সর্ব্বম্ অত্যন্ত গর্হিতম্।

লক্ষ্য করা উচিত, বুদ্ধদেবের যে ‘মজ্ঝিমা পটিপদা’ (Middle Path) উহাই গ্রীকগুরু এরিস্টটলের (Aristotle's) Doctrine of the Mean। রোমান্ প্রবচন (Proverb)—elephas medius tutissimus (the middle elephant is the safest) ইহারই অনুরূপকথা।

বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের মত ইহলোক-সর্ব্বস্ব ছিলেন না—তিনি পরলোক, স্বর্গ-নরক মানিতেন। তিনি বলিতেন, পুণ্য-পাপের ফল ইহলোকেই নিঃশেষ হয় না। ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিংলোকে পরম্হি চ (লোকবগ্‌গো) আর যে পাপকারী—যে আত্মসুখান্বেষী হইয়া পরপীড়া দেয়?

অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ ন লভতে সুখং—দণ্ডবগ্‌গো

অর্থাৎ যে পাপী, তাহার 'ইহামুত্র' (ইহলোক-পরলোকে) দুঃখ—এবং যিনি পুণ্যকারী, তাঁহার ইহামুত্র সুখ।

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি, পাপকারী উভয়ত্থ সোচতি।
ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্ঞো-উভয়ত্থ মোদতি॥—যমকবগ্গো

এক কথায়, ইহলোকেই দেহের সহিত সব অবসান হয় না—দেহান্তে (পেচ্চ=প্রেত্য) যে পরলোক-গতি হয়, সুখাস্পদ হইলে তাহার নাম স্বর্গ এবং দুঃখাস্পদ হইলে তাহার নাম নরক।

সগ্গং সুগতিনো যন্তি নিরয়ং পাপকম্মিনো—পাপবগ্গো
কায়স্স ভেদা দুপ্পঞ্ঞো নিরয়ং সো পপজ্জতি।—দণ্ডবগ্গো
অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি—নিরয়বগ্গো
নিরয়=নরক (Hell)*

কারণ, বুদ্ধদেবের মতে 'our present existence is not our whole life, it is only a tiny section of our life. (George Grimm)। অতএব যদি পরলোক (Survival after Death) থাকে, তবে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কিরূপে 'direct his efforts toward the utmost possible unrestrained satisfaction of his sense-cravings but must also take into account the consequences that in a future life may follow upon such brutal egoism (Ibid)—কিরূপে শ্রেয়ঃ বর্জ্জন করিয়া প্রেয়ঃ বরণ করিবেন ?

অন্যৎ প্রেয়ো অন্যদ্ উতৈব শ্রেয়ঃ—উপনিষদ্। অতএব ভোগের পথ ('Primrose Path of Dalliance') ঠিক নয়—ত্যাগের পথে বিচরণ করিতে হইবে—প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া নিবৃত্তিকে বরণ করিতে হইবে—কারণ,

অঞ্ঞাহি লাভূপনিসা অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী—বালবগ্গো

---

* মজ্ঝিম নিকায়ে এ অবস্থার আভাস দিয়া বুদ্ধদেব বলিয়াছেন ;—Rather, Bikhus ! might this one-eyed turtle get its neck into the one-holed drum-net than a fool once sunk into this depth, come again into the world of men. But why so ? Because there is monks ! no just conduct, no straightforward conduct, no whole-some acting, no charitable acting.

অর্থাৎ বুদ্ধদেব প্রেয়ঃবাদী (Hedonist) নন, তিনি শ্রেয়ঃবাদী। যদি পরলোক থাকে, তবে ইহলোককে সর্ব্বস্ব করিলে চলিবে কেন ? সেই জন্য বুদ্ধদেব জীবকে পরলোকের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন—

উপনীত বয়ো চ দানি সি × ×
পাথেয্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি—মলবগ্গো

'মৃত্যু সন্নিকট—শীঘ্রই ভবপারে যাত্রা করিতে হইবে। হে যাত্রি! সে মহাযাত্রার জন্য কি পাথেয় সংগ্রহ করিলে ?' প্রবৃত্তিমার্গী ইহলোকের ক্ষণিক সুখের জন্য লালায়িত ('the materialist lives for the moment') কিন্তু দীর্ঘদর্শী বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে 'the momentary pleasure is as nothing' —তাঁহার লক্ষ্য পামোজ্জ'—অন্তহীন সুখ, পরা শান্তি, অনুত্তর যোগক্ষেম।

ততো পামোজ্জবহুলো দুক্‌খস্সন্তং করিস্সতি—ভিক্‌খুবগ্গো

ফুসন্তি ধীরা নির্ব্বাণং যোগক্‌খেমং অনুত্তরং——অপ্পমাদবগ্গো

অতএব His gospel is not self-indulgence but self-restraint—তাঁহার লক্ষ্য ভোগ নয়, ত্যাগ—সংযোজন নয়, বিসর্জ্জন—অর্জ্জন নয়, বর্জ্জন—আদান নয়, প্রদান—কামের প্রচয় নয়, 'তন্‌হা' (তৃষ্ণার) বিজয়—মমত্বের প্রসার নয়, অহংত্বের সংকোচ।

সব্বসো নামরূপস্মিং যস্স নত্থি মমায়িতং—ভিক্‌খুবগ্গো

অর্থাৎ 'not enhancement but effacement of Egoism'.

সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্ত-পরিয়োদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং—বুদ্ধবগ্গো

'পাপের অকরণ, কুশলের (পুণ্যের) অনুষ্ঠান ও চিত্তের নির্ম্মলীকরণ—বুদ্ধের ইহাই অনুশাসন'। তাঁহার উপদেশ এই :—

যস্স পাপং কতং কম্ম কুসলেন পিথীয়তি।
সোহমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভা মুত্তোব চন্দিমা ॥—লোকবগ্গো

'যাঁহার কৃত পাপ কর্ম্ম, কুশল (পুণ্যকর্ম্ম) দ্বারা আবৃত হয়, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই লোক উদ্ভাসিত করেন।' তাঁহার উপদিষ্ট যে

পঞ্চশীল—যাহা শ্রাবক শ্রমণ সকলেরই অনুষ্ঠেয় এবং যাহার সৌরভকে তিনি অনুত্তর বলিয়াছেন—

চন্দনং তগরং বাপি উপ্পলং অথ বস্সিকী।
এতেসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো ॥—পুপ্ফবগ্গো

(বস্সিকী = চামেলি)

—ঐ পঞ্চশীল সমস্তই Moral Precepts.

প্রাণিহত্যা, মিথ্যাকথা, পরদার, মদ্যপান, পরস্বগ্রহণ—এই সকল দুরাচার বর্জ্জন করিতে হইবে—

যো পাণম্ অতি পাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি।
লোকে অদিন্নং আদিয়তি পরদারঞ্চ গচ্ছতি ॥
সুরামেরেয় পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি।
ইধেবম্ এসো লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো ॥—মলবগ্গো

(পাণম্ = প্রাণম্)

এবং ইন্দ্রিয়ের বেগ সংবরণ করিয়া, চিত্তের বহির্মুখ বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া, —কামনা বাসনা তন্হার সংযম করিয়া অত্মস্থ হইতে হইবে।

চক্খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্হায় সংবরো
কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো।
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বথ সংবরো ॥—ভিক্খুবগ্গো

অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ জিহ্বা কায় বাক্য মন—সর্ব্বত্র সংবৃত হও। সংবরণ, সংযমন, সংকোচন, সংমার্জ্জন—ইহাকেই জীবনের ধারা কর—কারণ, ইহাই দুঃখহানির উপায়।

সব্বথ সংবুতো ভিক্খু সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।

দেখ, সংগ্রামে সহস্রগুণিত সহস্র যোদ্ধাকে জয় করা অপেক্ষা আত্ম-জয় (self-mastery) শ্রেষ্ঠ—যিনি আত্মজয়ী, তিনিই জেতৃতম—কারণ, অত্তা হি কিল দুদ্দমো।

যো সহস্সং সহস্সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে।
একঞ্চ জেয্যম্ অত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো ॥—সহস্সবগ্গো

বুঝিয়া চল—জীবনতরীকে ভারি করিও না—Lesson your denominator (Carlyle)—সেচন দ্বারা ঐ নৌকাকে লঘু ক'র—তবেই অনায়াসে পরপারে উপনীত হইবে।

সিঞ্চ ভিক্‌খু! ইমংনাবং, সিত্তা তে লহুমেস্‌সতি—ভিক্‌খুবগ্‌গো

মুঞ্চ পুরে, মুঞ্চ পচ্ছতো, মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্স পারগূ—তন্‌হাবগ্‌গো

'সামনে, পিছনে, মধ্যে—যাহা কিছু সমস্ত বর্জ্জন, বিসর্জ্জন ক'র—হে ভবপারের যাত্রী!'—তবেই ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।

সর্ব্বদা সতর্ক রও—প্রমত্ত হইও না—মা চ পামদো (ভিক্‌খুবগ্‌গো) —অপ্রমাদরত হও—Cultivate ceaseless mindfulness.

অপ্পমাদরতা হোথ সচিত্তম্ অনুরক্‌খথ——নাগবগ্‌গো

সাবধান! জলপ্লাবন আসিয়া যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লয়, কামের প্লাবন অসতর্ক তোমাকে যেন সেরূপ ভাসাইয়া লয় না।

তং পুত্তপসুসম্মতং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তংগামং মহোঘো ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি—মগ্‌গবগ্‌গো

(পুত্তপসুসম্মতং=পুত্রপশুসংমত্তং)
উট্ঠানেন 'পমাদেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ।
দীপং করিয়াথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি॥—অপ্পমাদবগ্‌গো

'প্রবুদ্ধ, অপ্রমত্ত, সংযত, দান্ত হইয়া মেধাবী ব্যক্তি দ্বীপ (refuge) রচনা করেন, যেন বন্যা তাঁহাকে ভাসাইয়া না লয়।'

এই অপ্রমাদের উপর বুদ্ধদেব বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন—

অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্‌ঠং ব রক্‌খতি।
× × অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং।
(পপ্পোতি=প্রাপ্নোতি)

'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের মত সযত্নে রক্ষা করেন।' 'অপ্রমত্ত ব্যক্তি ধ্যানযোগে বিপুল সুখ লাভ করেন।' এমন কি, দেহত্যাগের পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের শেষ বাণী এই অপ্রমাদ সম্পর্কে।

হন্ত দানী ভিক্‌খবে! আমন্তয়ামি বো
বয়ধম্মা সঙ্‌খারা—অপ্পমাদেন সম্পাদয়েথ॥

বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট যে 'ব্রহ্মচরিয়', তাঁহার নির্দ্দিষ্ট যে scheme of life,—যদি এককথায় তাহার নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে বলিতে হয় উহা বিশুদ্ধি-মার্গ, উহার লক্ষ্য Sanctification। যিনি ঐ লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে 'বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং' (the highest has been lived), যিনি বলিতে পারেন Consummation Est ('It is finished')—তাঁহার 'নিব্বানম্ অন্তিকে'—তিনি 'বুদ্ধ' হইয়াছেন, তিনি 'ব্রাহ্মণ' হইয়াছেন।

অসত্তং সু-গতং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।
সঙ্গাতিগং বিসংবুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।
উক্খিত্ত পলিঘং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥—ব্রাহ্মণবগ্গো

'যিনি অনাসক্ত, সুগত, বুদ্ধ, যিনি সঙ্গাতীত, মায়াতীত, বিসংযুক্ত, তাঁহাকেই বলি 'ব্রাহ্মণ'।' বৃহদারণ্যক-উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে আমরা এই কথাই শুনিয়াছিলাম।

নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি,
—বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি—বৃহ, ৪।৪।২৩

'পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। তিনি বিপাপ, বিমল, বিচিকিৎস হইয়া 'ব্রাহ্মণ' হন।' যিনি 'ব্রাহ্মণ' তাঁহার চর্য্যা কিরূপ? স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব (বৃহ, ৩।৫।১)—By living as chance may determine অর্থাৎ তিনি যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ (গীতা)—বুদ্ধদেব ধর্ম্মপদে যাহাকে 'আহারে চ অনিস্সিতো (অনিঃস্থতঃ)' বলিয়াছেন।

ঐ 'ব্রাহ্মণে'র মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এই ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

এষো নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা ন কনীয়ান্

'ব্রাহ্মণের ইহাই চিরন্তন মহিমা যে, তিনি কর্ম্মদ্বারা উপচিত বা অপচিত হন না' অর্থাৎ তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক ৩।১।৩

বুদ্ধদেব এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥

কারণ, পদ্মপত্রে যেমন জল-স্পর্শ হয় না, ব্রাহ্মণে তেমনি কর্ম্মের সংশ্লেষ হয় না। 'পদ্মপত্র-মিবাম্ভসা' (গীতা)।

Just as O Brahmin, the blue, red or white lotus-flower, originated in the water, grown up in the water, stands there towering above the water, untouched by the water ; just so, Brahmin, I remain.—অঙ্গুত্তর নিকায় II.

অতএব 'ব্রাহ্মণ' হওয়া বেশ সুকঠিন! বুদ্ধদেবের শিক্ষা এই যে, 'ব্রাহ্মণ' হইতে হইলে 'শ্রাবক'কে ওক (গৃহ) হইতে অনোকে গিয়া (ওকা অনোকং আগম্ম), অনাগারিক 'শ্রমণ' হইয়া, সংসার ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে হইবে, ভিক্ষু হইতে হইবে।

যোধ কামে পহত্বান অনাগারে পরিব্বজে
অসংসট্ঠং গহট্ঠেহি, অনাগারে হি চূভয়ং।
অনোক-সারিং অপ্পিচ্ছং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥—ব্রাহ্মণবগ্গো

ভিক্ষু বিবেকে যত্ন করিবেন (বিবেকে যথ দূরমং) এবং 'জান-ঝান-পঞ্ঞা'-পরায়ণ হইয়া অর্থাৎ জ্ঞান, ধ্যান ও প্রজ্ঞায় সুস্থিত হইয়া সম্বোধি লাভের জন্য যত্ন করিবেন।

যেসং সম্বোধি-অঙ্গেসু সম্মাচিত্তং সুভাবিতং—পণ্ডিতবগ্গো

তিনি নিন্দাস্তুতি তুল্যমূল্য করিবেন—যেমন একঘন শৈল বাতে প্রচলিত হয় না, এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা (পণ্ডিতবগ্গো)

সুখকে ও দুঃখকে সমান বোধ করিবেন—

সুখেন ফুট্ঠা অথবা দুক্খেন।
ন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্সয়ন্তি ॥

কারণ,—

আয়ন্তীং নাভিনন্দতি, পথামন্তীং ন সোচতি।
সংজ্ঞাসংগামজিং মুত্তং তং অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥ *—উদান, ১।৮

---

* The coming does not make him glad,
The going does not make him sad,
The monk from longing all released,
Him do I call a Brahmana.

—এবং পুণ্যপাপ-বিহীন হইবেন।

পুঞ্ঞ পাপ পহীনস্স নত্থি জাগরতো ভয়ং—চিত্তবগ্গো

তখন জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতি তাঁহার নিকট অভিন্ন হইবে—

উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং—সুখবগ্গো

কারণ, তিনি এতদিনে কাম-লতাকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া (তংচ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্ঞায় ছিন্দথ)—এবং 'কামতো বিপ্পমুত্ত'—কাম হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়া অকাম, নিষ্কাম হইয়াছেন।

বারি পোক্খর পত্তেব আরগ্গেরিব সাসপো।
যো ন লিপ্পতি কামেসু তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

—পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, সূচ্যগ্রে সর্ষপের ন্যায়, কামেতে 'ব্রাহ্মণ' লিপ্ত হয় না। কারণ, যিনি 'ব্রাহ্মণ', যিনি 'তন্হায় বিপ্পমুত্তস্স'—যিনি 'বীততন্হো অনাদানো'—তিনি রাগং চ দোসঞ্চ পহায় মোহং—রাগ, দ্বেষ ও মোহের অতীত হইয়াছেন। *

যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতঃ।
সাসপোরিব আরগ্গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥
(মক্খ=কাপট্য)

কারণ, তিনি সর্ব্বধর্ম্মে অনুপলিপ্ত হইয়া (সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো), সমস্ত আশ্রব (ক্লেশের) ঊর্দ্ধে উঠিয়া, কৃতকৃত্য, অনাসব হইয়াছেন (যস্সাসবা পরিক্খীনা)—

ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং।
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

তিনি অনঙ্গন (নিরঞ্জন)—(নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গনো), অনপেক্ষ (অনপেক্খিনো কামসুখং বিহায়) হইয়া নিরাশী, নিবৃত হইয়াছেন।

আসা যস্স ন বিজ্জন্তি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।
নিরাসয়ং বিসংযুক্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥
অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতং।
সাদানেসু অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

* অরাগো অদোসো অমোহো অনঙ্গনো অসংকিলিট্ঠ চিত্তো—মজ্ঝিমনিকায়, Fifth Discourse

তিনি এমনই অনাদান, জোতিষ্মান্ (খীনাসবা জুতীমন্তো) যে, দেবতারা, এমন কি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাও তাঁহার মহিমার প্রশংসা করেন।

দেবাপি তং পসংসন্তি বহ্মুণাপি পসংসিতো।—কোধবগ্‌গো

'ব্রাহ্মণ' তিনি—যিনি সঙ্গাতিগ, যিনি সর্ব্বসংযোজন-বিমুক্ত (freed from all fetters), যিনি বিসংযুক্ত—যাঁহার

যস্‌স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি
বীতদ্দরং বিসংঞ্‌ঞুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

—এক কথায় যিনি অকিঞ্চন (হিত্বা কামে অকিঞ্চনো—যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং)—যাহার পূর্ব্বে, পশ্চাতে বা মধ্যে কিছু নাই—তিনিই ব্রাহ্মণ।

যস্‌স পুরে চ পচ্চা চ মজ্‌ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং।
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

এরূপ ব্রাহ্মণের নির্ব্বাণ সন্নিকটে (স বে নিব্বানসন্তিকে)—তিনি সেই অভূত অজাত অচ্যুত অকৃত অমৃত পদে, সেই প্রামোজ্য-বহুল বিপুল সুখে, সেই 'ভূমানন্দে' নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

ততো পামোজ্জবহুলং দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সসি—ভিক্‌খুবগ্‌গো

যে বুদ্ধদেবের এই মত, এই পথ—যাঁহার এই দীক্ষা-শিক্ষা, এই লক্ষ্য-ধ্যেয়, তিনি যদি নাস্তিক হন, তবে—? কিন্তু 'সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ'। যাঁহারা 'Advocatus Diaboli', তাঁহাদের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই। এই সকল তথা-কথিত আস্তিকেরা বুদ্ধদেবের বিপক্ষে কি বিবিধ নাস্তিকতার অভিযোগ আনয়ন করেন, আগামীবারে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিলেত-সম্বন্ধে রঙ্গ চড়িয়ে প্রবন্ধ লেখা আমার পক্ষে বড় কঠিন। ও দেশের সভ্যতা কখনই তেমন রপ্ত করতে পারি নেই। পারি নেই বলেই, হয়ত, আমার মনের ভাব কতকটা সেই কথামালার আঙ্গুর-লুব্ধ শেয়ালের মত। কপালের জোরে ও আঙ্গুরে অনেকেই মিষ্টরস পেয়েছেন। আমি সে রসে বঞ্চিত।

তবু পাঠক যেন দয়া ক'রে ধ'রে নেবেন না যে আমার মনের অবস্থা, "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।" সাহেবদের অনেক গুণ আমার টেরা চোখকেও এড়াতে পারে নেই। সেগুলোর কথা অবশ্য বলব। তবে সেখানেও গলদ অনেক। আমি যা দেখেছিলাম, সে সব ত আজ নেই। শুনতে পাই, ইংরেজ তার সাবেক রোষ্ট বিফ্ ও বিয়ারের সভ্যতা ছেড়ে snacks and cocktail-এর পন্থা নিয়েছে। Snacks and cocktail-এর বাঙ্গালা তরজমা করতে পারলাম না। চাট ও মদ বললে অনেকে চটবেন। মোটের উপর, বোধ হয় আমার এখনকার কথা বেশী কিছু না বলাই ভাল, কেননা পুরানো মানুষ পুরানো কথা লিখতে বসেছি।

আমাদের কালে ইংরেজ সত্যিই Punch পত্রিকার জন বুলের মতন ছিল। পোষাকের কথা বলছি না, কারণ ও পোষাক তখন চ'লে গেছে। কিন্তু চরিত্রে বিশেষ কিছু তফাৎ হয় নেই। একটু বুদ্ধিহীন, একটু হাঁদা, আর পুরোদস্তুর একগুঁয়ে। চটক নেই, লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ে না, তবে এককথার মানুষ। তাদের বাড়ী ঘর দোর, তাদের সমাজ, তাদের রাষ্ট্র সব নিরেট পোক্ত ভিতের উপর তৈরী। তোতাবুলি দরকার মত আওড়ায় কিন্তু হুজুগে প'ড়ে নিজের নাক কান কাটে না। এক কথায় অজ-bourgeois, বিংশ শতকের জুজু।

কিন্তু এই ইংরেজকে আমার ভাল লেগেছিল। এদের ঘর-বাড়ী ছিল। এরা হোটেলে হোটেলে ঘুরে ব্যাণ্ডের তালে খানা খেয়ে বেড়াত না। আড্ডায় আড্ডায় নিত্য নূতন উত্তেজনা খুঁজে বেড়াতে হত না এদের। বনেদী

ঘরে পর্য্যন্ত কতকটা ছা-পোষা গেরস্তের ধরণ-ধারণ ছিল। বাড়ী ছিল, বাড়ীর উপর টান ছিল, তাই এদের অতিথি-সৎকারও আশ্চর্য্য সুন্দর ছিল। খানার টেবিলে গিন্নী সামনে একটা হাঁড়ি নিয়ে বসে সুরুয়া পরিবেশন করতেন, কর্ত্তা রোষ্ট মাংসের চাঙ্গড়া থেকে বেছে বেছে ফালি কেটে সবায়ের পাতে দিতেন। চায়ের টেবিলে অতিথির জন্য একটা না একটা কিছু ঘরের মেয়েদের তৈরী খাবার থাকত। আমাদের ছেলেবেলা থেকে পরিচিত একটা হৃদ্যতা, আনন্দের ভাব সে দেশেও সর্ব্বত্র দেখতে পেতাম।

কলেজে রেন-গিন্নী স্বয়ং চা ঢেলে দিতেন, সুরুয়া পরিবেশন করতেন, প্লেটের উপর খাবার তুলে দিতেন। আমার ব্যারিষ্টারি আড্ডায় (Gray's Inn) চার চার জনে এক এক Mess করে খেতে বসতে হত। তার মধ্যে একজন হত কাপ্তান। সেই অতিথি-সৎকারের অভিনয় করত। নিতান্ত ভেটেরাখানা না হলে চাকর দিয়ে খাবার পরিবেশন হতনা। অবশ্য রাজা-রাজড়ার কথা আলাদা। তাঁদের বাড়ীতে কি হত আমি কোথা থেকে জানব!

নিত্যকার ব্যবহারেও ইংরেজ ভদ্রলোকের আদব-কায়দা আমার বড় ভাল লেগেছিল। ফরাসীদের মতন কথায় কথায় মাথা নীচু করা কি টুপি তোলা, চোস্ত জবানে আলাপ করা এদের না থাকলেও একটা গম্ভীর নির্ব্বাক খানদানী চাল সব কাজে দেখা যেত।

ইংরেজের আর একটা গুণ নিতান্ত অন্ধ ছাড়া সবাই দেখতে পেত। সেটা ওদের অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্য্য। ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু মহাভূজঃ, আমাদের কাব্যেই আছে, ঘরে নেই। ওদের ভদ্রসমাজে কিন্তু শতকরা পঁচিশ জনের বেলা ঐ বর্ণনা খাটে, অন্ততঃ আমার সময়ে খাটত। তাদের পাশে আমাদের অধিকাংশ কৃষ্ণকায়কে হাস্যাস্পদ দেখাত, বিশেষ ক'রে যখন আখাড়ায় কি সমুদ্রের ধারে গা খুলতে হত। এমন কি জার্ম্মান ও ফরাসী সাহেব যারা সব রকমে ইংরেজের সমকক্ষ, তারাও এ বিষয়ে ইংরেজের তুলনায় অনেক নিরেস। কেন যে এমনটা হয়েছে বলা শক্ত। অনেক ইংরেজের মুখে শুনেছি যে এই দৈহিক আদর্শ তারা সাবেক গ্রীকদের কাছ থেকে পেয়েছে। কিন্তু এত লোক থাকতে শুধু এরাই গ্রীক আদর্শ পেলে কোথা থেকে!

আমি ত ইংরেজের রূপ নিয়ে এতটা উৎসাহ দেখাচ্ছি, কিন্তু একজন

সাহেব নিজে কি ব'লে গেছেন সেটাও প্রণিধান-যোগ্য। সেকালের নামজাদা মুসাফের লিভিংষ্টোন সাহেব কাফ্রীদেশের জুলুদের দেখে লিখে গেছেন, এদের শরীরের গড়ন এত চমৎকার যে এদের সাক্ষাতে পোষাক খুলতে আমার ভয়ানক লজ্জা করে।

পুরুষের কথা যখন এত বল্‌লাম, মেয়েদের কথাও কিছু বলতে হয়। তবে আমার ঘাড়ে একটা বই মাথা নেই। কালো চোখের সঙ্গে নীল চোখের তুলনা আমি করতে পারব না। কালো কুন্তলের সঙ্গে লাল হলদে কুন্তলের তুলনা করতে আমি অক্ষম! কবির কথায়, "তোমরা সবাই ভালো"। তবে এইটুক শুধু বলব, যে সে যুগের ইঙ্গসুন্দরীদের চলা-ফেরাতে একটু আড়ষ্ট ভাব ছিল, একটু যেন কমনীয়তার অভাব নজরে পড়ত। এ বিষয়ে তাঁরা ফরাসী সুন্দরীদের চেয়ে অনেক খাটো ছিলেন। তেমনই, complexion বা চামড়ার সৌন্দর্য্যেও ইংলণ্ডীয়ারা হার মানতেন। ছোট জাতের ফরাসিনীদের চামড়াও এদের চেয়ে বেশী চিকন মোলায়েম ছিল। একথা সবাই নাও মানতে পারেন। যাঁদের চোখে চামড়ার রঙ্গটাই সব, তাঁরা অবশ্য ইংরেজকে prize দেবেন, কেননা বেশীর ভাগ ফরাসিনীর রঙ্গ ঠিক সাদা নয়, খুব ফিকে একটু গজদন্তের আভা আছে। বর্ণ-সম্বন্ধে আমার নিজের মতামত কতকটা কাফ্রীদের মতন। বিকট সাদা রঙ্গ আমি দেখতে পারি না। তার চেয়ে নিখুঁত কালোও আমার ঢের ভাল লাগে। যখনই ইংরেজের সঙ্গে গা খুলে ঘুরেছি, তখনই মনে হয়েছে যে ওদের ঐ সুন্দর সুঠাম শরীর আরও কত সুন্দর হত যদি অমন ফ্যাকফেকে সাদা না হত। রোদে পুড়ে ওদের মুখের রঙ্গ কেমন চমৎকার হয়ে যায়, গাটা কেন হয় না!

কি কথা বলতে কোথায় এসে পড়লাম! স্ত্রীলোকের রূপের কথা হচ্ছিল। সে সৌন্দর্য্যের আদর্শ যুগে যুগে বদলে যাচ্ছে। মরালগামিনী বললে এখন আর বোধহয় কোন অর্থবোধ হয় না। চকিতনয়নী কথাটাই লোপ পেয়েছে, কেননা আর ত কেউ চকিত হয় না! লতার মত দেহযষ্ঠি, সেও আর শোনা যায় না। এক রইল লাঠির মত দেহযষ্ঠি। সেটা যে যায় নেই, তা আমরা পথে ঘাটেই দেখতে পাই। বিলেতের কথা বলছি, সুতরাং এদেশের কেউ রাগ করবেন না।

রূপের কথা বলতে গেলে এটা ভুললে চলবে না, যে সভ্যজগতে রূপ অনেকটা বেশ-প্রসাধনের উপর নির্ভর করে। আমার সময়ে পুরুষের কাপড় এক ইংরেজ দরজীরাই কাটতে জানত। তেমনই আবার মেয়েদের কাপড় পারিস ছাড়া কোথাও হত না। ভিয়েনাতে কতক কতক হত। এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। যখন মার্কিন আর স্পেনে লড়াই বাধল আর স্পেনের রাজা হেরে যেতে লাগলেন, তখন তার উপর ফরাসীদের দরদ উথলে উঠল। পারিসের খবরের কাগজগুলো দিবারাত্র পৃথিবীকে এই বোঝাতে লাগল, যে ভুঁইফোড় মার্কিনরা জবরদস্তী ক'রে একটা নির্বিরোধী বনেদী বংশের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে। আর তাদের বেইজ্জৎ করছে। মার্কিন কাগজগুলো চটে ফরাসীদের শাসাতে আরম্ভ করলে, যে পারিস সহরের দরজীরা মার্কিন অন্নে পরিপুষ্ট, এইবার তাদের জব্দ করব, আমরা ভিয়েনাতে কাপড় করাব। ফরাসী কাগজওয়ালারা পালটা জবাব দিলে, যে মার্কিনদের যা গড়ন ওদের গায়ে কাপড় বসান পণ্ডশ্রম, মজুরী পোষায় না। যাহোক এ সব অসভ্য কথা কাটাকাটির কোন ফল হল না, কেননা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার কিছু দিন পরেই মার্কিন সুন্দরীরা কাপড় করাতে দলে দলে পারিসেই দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করলেন। ভিয়েনার কিছু সুবিধা হল না।

আমার নিজের গল্প আবার বলি। শরৎকালে মাস চারেকের জন্য কলেজ বন্ধ হয়। ছুটিটা কোথায় কাটাব, এই নিয়ে নানা জল্পনা করতে লাগলাম। বাবার পরিচিত এক ইংরেজ পরিবার নিমন্ত্রণ করলেন, তাঁদের কাছে দূর পাড়াগাঁয়ে মাসখানেক কাটাবার জন্য। কিন্তু যেতে সাহস হল না। বিলেতে ব'সে ইঙ্গ-ভারতীয় আবহাওয়া সহ্য করতে পারব কিনা, কি বলতে কি ব'লে ফেলব, তারাই বা কি ভাববে, কাজ নেই, ভেবে নিমন্ত্রণ নিলাম না। ফরাসী ভাষা শিখছিলাম, সেটা রপ্ত করার মতলবে পারিস চ'লে গেলাম। কপাল জোরে এক মধ্যবিত্ত ফরাসী পরিবারের মাঝে থাকবার সুযোগ মিলল। খুব ভাল লাগল। তাদের আত্মীয় স্বজন অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। মোটের উপর দেখলাম, যে ফরাসীদের চাল-চলন একটু একটু আমাদের মতন। হো-হো করে হাসে, চেঁচিয়ে কথা কয়, ভুঁড়ি দুলিয়ে চলে; পেটুকের মত খায়। কালো সাদার ভেদজ্ঞান ওদের ইংরেজের মত প্রখর নয়। ইংলণ্ডে আমরা

রাস্তায় বের হলে যেমন সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে থাকত, ছোঁড়াগুলো 'Blackie Blackie,' ব'লে চেঁচাত পারিসে তা মোটে দেখি নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সের কি স্পেনের অনেক লোকের মুখের রঙ্গ এত কালো বা পাটকিলে যে হঠাৎ তাদের সঙ্গে ভারতীয় লোকের তফাৎ বোঝা যেত না। তাই বোধ হয় আমাদের ততটা আজগুবী দেখাত না ওদের চোখে। তবে সহ্যের একটা সীমা আছে ত! একদিন এক দল কাফ্রী মুসলমান তাদের স্বদেশী পোষাক পরে সরকারী বাগানে বেড়াচ্ছিল আর খুব হাল্লা করে নিজের ভাষায় কথা কইছিল। এক দল রাস্তার ছোঁড়া খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলে, তারপর তাদের পিছু নিলে আর হাততালি দিয়ে 'boule de neige' (snow-ball) ব'লে ঠাট্টা করতে লাগল। কাফ্রীরা চুপ ক'রে গেল।

ইংলণ্ডেও যে আমাদের অপমান করবার ইচ্ছাতে কালা বলে ডাকত, তা আমার মনে হয় না। অত বড় সাম্রাজ্যের মালিক হলেও, ইংরেজের তখনকার দিনে বড্ড কুনো ভাব ছিল। একটু কিছু আজগুবি দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। বোধহয় বুঝতও না যে ওটা অভদ্রতা। আমাদের কেউ কেউ কিন্তু এতটা না বুঝে ভয়ানক চ'টে উঠতেন। সিং বলে আমার এক বিশালকায় বন্ধু ছিল। অত্যন্ত ভাল মানুষ। ইংরেজী বেশী বলতে পারত না। জিমিদার ঘরানার আওলাদ, মেট্রিক কোনক্রমে পাশ হয়েছে, ইজ্জৎকে লিয়ে তার লায়ার হওয়ার খাহেশ, নইলে ঘরে টাকার অভাব নেই। দুজনে আমরা রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় এক বছর কুড়িকের কুলী ছোঁড়া "কালা" ব'লে ডেকেছে। যেই ডাকা, কি সিংজী এক হাত বাড়িয়ে বেচারার ঘাড় ধ'রে তাকে শূন্যে তুলে ফেললে। তুলে নানা রকম গালিগালাজ করতে লেগে গেল। আমি বন্ধুর হাতে পায়ে ধ'রে কত কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা ক'রে বাড়ী নিয়ে গেলাম। কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করলে না যে লোকটা ইচ্ছা করে অপমান করতে চায় নেই।

আর এক দিন হল কি, আমরা তিন জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি উলউইচ শহরে। তিন জনেরই ঘোড়সওয়ারী পোষাক, হাতে চাবুক। এক শুঁড়ীর দোকানের পাশ দিয়ে চলেছি। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড navvy (কুলী মজুর) ব'লে উঠল, "হ্যালো ব্লাকী!" আমাদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে

বেঁটে, রোগা, তিনি তৎক্ষণাৎ "হারামজাদা!" ব'লে গর্জ্জন ক'রে লোকটার মুখের উপর মারলেন এক চাবুক। সাদা একটা দাগ প'ড়ে গেল বেচারার লাল টকটকে মুখে। সে দু তিন বার ঢোক গিলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "এ কি রকম ব্যবহার, এ কি জুলুম!" লোকটা ইচ্ছা করলে আমাদের তিন জনকেই ধরাশায়ী করতে পারত পাঁচ মিনিটে। যাই হোক, আমি তার পিঠ চাপড়ে একটা শিলিং বকশীস দিয়ে ঠাণ্ডা করলাম। সে বার বার বললে "আমি কি দোষ করেছি, কি দোষ করেছি?" আমার বন্ধুর সঙ্গে প্রায় ঝগড়া হয়ে গেল এই ব্যাপার নিয়ে। তিনি আমায় কাপুরুষ, দেশদ্রোহী ইত্যাদি অনেক কিছু বললেন।

আর একদিন, দূর দেহাতে আমি অনেকখানা বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে গাঁয়ে ফিরছি, এমন সময় দেখি এক চাষা তার গাড়ীতে ঘাস বোঝাই ক'রে চলেছে। আমি বললাম, "আমাকে গাঁয়ে পৌঁছে দেবে হে?" সে টপ ক'রে লাফিয়ে ভুঁইয়ে নেমে টুপি তুলে বললে, "গুড্ ইভনিং ব্লাকী। আসুন, নিশ্চয় পৌঁছে দেব।" লোকটা আমাকে বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিলে, এক পয়সাও নিলে না। কি করে মনে করব যে সে আমায় অপমান করবার জন্য কালা আদমী বলেছিল?

আর এক রকমের একটা গল্প বলি। সেখানেও পাঠক দেখবেন যে অপমান করার চেয়ে ছেলেখেলা করবার ইচ্ছাটাই বেশী। আমরা সব খানা খাচ্ছি আমাদের Inn-এ। আমার বন্ধু সিং আর আমি এক মেসে বসেছি। অদূরে এক মেসে পল পিটার পিলে নামে এক মাদ্রাজী বন্ধু খাচ্ছেন। পিলে ভদ্রলোকটী খুব কালো, ছোট্ট, আর পেট মোটা। লম্বা গলাবন্ধ কোট পরতেন। মাথায় খুব জ্বলজ্বলে লাল সোনালী পাগড়ী। মুখটি খুব বুদ্ধিমানের মত নয়। মহাজন সভার প্রতিনিধি হয়ে বিলেতে এসেছেন। সেই সুযোগে ব্যারিষ্টার হওয়ার কাজটাও কতক এগিয়ে রাখছেন। সাহেবদের সঙ্গে কথা কওয়ার সময় খুব অমায়িক হাসি হাসতেন। ইংরেজ ছেলেরা তাঁর যে নামটা দিয়েছিল সেটা খুব সম্মানসূচক নয়। হঠাৎ একজন ছোকরা পিলের পাগড়ীটা টপ্ ক'রে তুলে নিয়ে চালিয়ে দিলে আর একজনের কাছে। দেখতে দেখতে পাগড়ী চ'লে গেল বহু দূর। বেচারা দাঁড়িয়ে উঠে, "My turban, please" বলে কাকুতি মিনতি করলে লাগল। সবাই হেসে উঠল। কিন্তু

বন্ধু সিং রক্তচক্ষু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, রোষ্ট্ কাটার ছোরাটা হাতে নিয়ে। অস্ত্র তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার পাগড়ীতে যদি কেউ হাত দিত ত,—" পিলের পাগড়ী ফিরে এল দু মিনিটে। আমি সিংজীর কোটের ল্যাজ ধ'রে টেনে বসিয়ে দিলাম। সে তখনও রাগে ফুলছে, "পাগড়ী খুলে নেওয়ায় আর মাথা কেটে ফেলায় তফাৎ কি!" আমি বললাম, "ঐ সব পাঁচরকম ভেবেই আমরা বাঙ্গালীরা পাগড়ী বাঁধি না।" তখন সিং হেসে উঠল। আমি সময় বুঝে বললাম, "সিং, তুই ফার্স্ বুঝিস্ না। সব তাতেই ট্রাজেডী দেখিস্।" সত্যি অপমান কেউ করেনা তা নয়। তবে রজ্জুতে সর্প ভ্রম ক'রে লাভ কি!

১৮৯৬ সালে লণ্ডনে আমি মোটর গাড়ী দেখি নেই। শুনেছিলাম যে যুবরাজ এডওয়ার্ডের একখানা আছে। পারিসে অনেকগুলি দেখলাম। কিন্তু এমন বেঢপ অদ্ভুত যান, যে আজকের দিনে লোকে রাস্তায় দেখলে হেসেই আকুল হবে। প্রায় টমটমের মত উঁচু গাড়ী, ছোট্ট বনেট্, খাড়া হয়ে বসে একটা লোহার দাণ্ডা ধ'রে চালাতে হয়। আর আওয়াজ, এখনকার ভদ্রবংশীয় মোটর সাইকেলও অত ফট্‌ফটাফট্ আওয়াজ করতে পারবে না! অধিকাংশ গাড়ীর আবার মাথার উপর রঙ্গীন চাঁদোয়া খাটান। সেই চন্দ্রাতপতলে দু'তিনজন জুলজুলে দাড়ীওয়ালা ছোকরা ফরাসীবাবু সিগারেট-মুখে গল্প করতে করতে চলেছে, দেখে ভারী মজা লাগত। সব গিয়ে জমা হত সরকারী বাগান—Bois de Boulogne-এ, এক বড় নামজাদা কাফীখানায়। পাশে এক কৃত্রিম জলপ্রপাত ছিল ব'লে তার নাম, Cafe de la Cascade। বড় বড় বাবুলোকের আড্ডা কিনা, তাই ওখানে খাবার দাবারের অসম্ভব দাম নিত। গরীব লোকের গতায়াত ছিল না। আমি কিন্তু রোজ ঐ কাফেতে গিয়ে জুটতাম, আর দুদণ্ড বসে একটা লেমনেড খেয়ে বাড়ী ফিরতাম। লেমনেডের দাম লাগত প্রায় এক টাকা। তখনকার দিনে বাইসিকেলও একটা সৌখীন চিজ ছিল। আমি প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে একখানা লণ্ডন থেকে কিনে নিয়ে গেছলাম। সেটা থাকত পার্কেই এক দোকানে। রোজ সকাল বাসে ক'রে গিয়ে বাইসিকেল চ'ড়ে বাগানে ঘুরতাম। এই সূত্রে দুচারজন ফরাসী বাবুলোকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। এক আধবার তারা মোটরেও চড়িয়েছিল। মোটে ভাল লাগে

নেই। রূপ শব্দ ও গন্ধ, তিনটেই এমন বিকট যে রস কিছুই পেলাম না। তারচেয়ে আমার দুচাকার পা-গাড়ী চড়ে ঢের বেশী আনন্দ পেতাম।

আমি যাঁদের বাড়ীতে ছিলাম, তাঁরা খুব সাদাসিধে লোক। পরিবারে মাত্র একটী পুরুষ মানুষ। তিনি সবদিন বাড়ী ফিরতেন না, দেরী হলে কারখানাতেই রাত কাটাতেন। যাঁদের সঙ্গে আমি দিনযাপন করতাম, তাঁরা সবাই স্ত্রীলোক। সব চেয়ে বড় ছিলেন বুড়ী দিদিমা। তাঁর বয়স সত্তর। আর সব চেয়ে ছোট একটী কুড়ি বছরের মেয়ে, Suzanne। সবাই আমার বন্ধু ও মুরুব্বী ছিলেন। তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে আমার মতন নাবালকের ডিনারের পর বাড়ীর বার হওয়া উচিত নয়। কাজেই এ যাত্রা আমার পারিসের নাচগান দেখা হল না। Champs d'Elysee দিয়ে যেতে যেতে সব নাচ ঘরের রোশনাইয়ের দিকে লুব্ধনয়নে চাইতাম আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম যে এবার পারিসে এলে হোটেলে থাকব। মাদাম, মাসীমা ও দিদিমাকে কিছু বলতে পারতাম না কিন্তু মেয়েটাকে খুব শাসাতাম। একদিন তাকে খুব গম্ভীর ভাবে বললাম, "স্যু, এর শোধ আমি নেব। একদিন তোকে নিয়ে এমনি উধাও হয়ে যাব যে তোর দাদা কেঁদে মরবে।" স্যু একটু মুখরা ছিল। আর আমিও না ভেবে চিন্তে মূর্খের মতন তাকে আমার দেশের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা, ইতিপূর্ব্বেই ব'লে ফেলেছিলাম। কাজেই সেও খুব মুখনাড়া দিত আমাকে। বলত, "রোস না, তোমার স্ত্রীকে সব লিখে দিচ্ছি। নাচঘরে যাওয়া বের করছি।" বুড়ী দিদিমার সঙ্গে আমার নিত্য রহস্য ছিল যে আমি তাঁকে আমার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার ক'রে দেশে নিয়ে যাব। আমার বন্ধু রায়কে সাক্ষী মেনে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলাম যে আমাদের সমাজে বহু বিবাহ ধর্ম্ম-সম্মত। দিদিমাও থিয়েটারী ঢঙ্গে রোজ দুহাত তুলে উত্তর দিতেন, "বাপরে! সে আমি কিছুতেই পারব না, ভাই। যে বাঘ, ভালুক ও সাপের দৌরাত্ম্য তোমার দেশে!" এই রকম খোশগল্পে অমূল্য সন্ধ্যাবেলাগুলো কাটত। দিনের বেলা সারা পারিস চ'ষে বেড়াতাম, কখন একা, কখন রায়ের সঙ্গে। কোন কোন দিন রায়ের বন্ধু মাদমোয়াজেলও থাকতেন। আমার রাগ ধরল, "এইত মাদমোয়াজেল আমাদের সঙ্গে কেমন বেড়ায়, স্যু কেন যাবে না!" বললাম তাকে, "আজ

তোকে যেতে হবে আমাদের দলে বেড়াতে।" সে উত্তর দিলে, "মাকে জিজ্ঞাসা করব।" একটু পড়ে মাসীমা এসে বললেন, "ম্যসিঅ, আজ স্যু আর আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাব। নিয়ে যাবে?" খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, "তার চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি হতে পারে।" গেলাম দুজনকে নিয়ে বেড়াতে সেদিন। আর কিন্তু কখনও স্যুকে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলি নেই। একদিন তার দাদা আমাকে বেড়াতে বেড়াতে বললে, "মশায়, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে ফ্রান্সে কুমারী মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে বেড়াতে যায় না। ইংলণ্ডের মতন ত নয়! এখানে লোকে বড় নিন্দা করে। আপনি বিরক্ত হবেন না।" আমি হেসে উত্তর দিলাম, "দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। আমি ত ইংরেজ নই। আমাদের দেশে আরও কড়াকড়ি।"

খেমটা নাচ ত দেখা হল না। কি করা যায়? একদিন এঁদের সবাইকে নিয়ে অপেরা দেখতে গেলাম। মেয়েরা ইভনিং পোষাক পরলেন বটে, কিন্তু গলা পর্য্যন্ত ঢাকা। ইংলণ্ডে শুনেছিলাম যে ফরাসী মেয়েরা ভয়ানক নির্লজ্জ, অর্দ্ধেক গা বের ক'রে খানায়, থিয়েটারে যায়। গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "পারিসে যাদিকে ঐ রকম গা খুলে বেরোতে দেখ, ওরা ভাল স্ত্রীলোক নয়।" সত্য মিথ্যা ঠিক করতে পারলাম না, তবে বুঝলাম যে, আমার বন্ধুরা bourgeois, যারা বিংশ শতকের ভাষায় "wallow in the mire of chastity"। কয়েক সপ্তাহ পারিস দেখার পর মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলাম যে ইংরেজ ও মার্কিন বাবুরা পারিসে যে সমস্ত স্ত্রীলোকের সংসর্গে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ান, তাদের ফরাসী ভাষায় আধ-সংসারী বলে, তাদের সঙ্গে গেরস্ত ঘরের মেয়েছেলের কোন সম্পর্ক নেই। পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি। এসব সেই যুগের কথা, যখন মার্কিন দেশের মহিলারা টেবিলের leg (পায়া) বলাটাও নির্লজ্জতা মনে করতেন। সে যুগ গেছে, আপদ গেছে!

অপেরা খুব চমৎকার লাগল। ওস্তাদী বিলেতী সঙ্গীতের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। তবু বেশ উপভোগ করতে পারলাম। দুটো পালার একটা ছিল Cavallieri Rusticana। তার গান ও গৎ এত সুন্দর যে অতি বড় আনাড়ীও মোহিত হয়ে যায়। ইংলণ্ডের অপেরা আমি দেখি নেই।

কিন্তু কি প্রকাণ্ড অরকেষ্ট্রা পারিসের এই অপেরায়। নানা রকমের বেহালাই যে কত ছিল তার ইয়ত্তা নেই। একটা দৃশ্য ছিল সুইস্ দেশের পাহাড় ধ'সে পড়ার। এই ভীষণ ব্যাপারের সমস্ত আওয়াজটা অরকেষ্ট্রা থেকে বের হল। আর একটা দৃশ্য ছিল, একটী মেয়ে পাহাড়ের ঝরণায় জল ভরছে। তারও সমস্ত ধ্বনি নকল করলে অরকেষ্ট্রা। ছেলেবেলা থেকে স্বদেশী সংগীতকলার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল, সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বাবুর কল্যাণে। কিন্তু এ এক নূতন ব্যাপার। একটা নূতন আনন্দের দরজা খুলে গেল আমার সামনে। পরে একে একে সব বড় অপেরার পালাই শুনেছি।

একটা কথা এইখানেই আমি কবুল করি। ইংলণ্ডের অপেরা যেমন দেখি নেই, তেমনই ওখানের জাতীয় চিত্রশালা, বড় গির্জ্জা, রাজবাড়ী, কিছুই কখন দেখা হয় নেই। কিন্তু পারিসে এই ধরণের জিনিস সবই বারবার দেখেছি। এর বিশেষ কারণ কিছু দেখাতে পারি না। যে মানুষ চার বছরেও একবার ব্রিটিশ মিউজিয়ম কি ওয়েষ্টমিনষ্টার-এবী দেখে নেই, সে আর কৈফিয়ৎ কি দেবে! তার দুর্দ্দৈব!

পারিসে যত বড় বড় গির্জ্জা ছিল সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে আমার ভাল লাগত মাদেলিন গির্জ্জা। সেখানকার হাওয়াতে কেমন একটা শান্তির ভাব ছিল। একদিন করলাম কি, আমাদের মাসীমার সঙ্গে মেরী মূর্ত্তির সামনে নীরবে দুঘণ্টা হাঁটু গেড়ে ব'সে রইলাম। অদ্ভুত-দর্শন কিছু অদৃষ্টে হল না, কিন্তু মনটা বড় হালকা বোধ হতে লাগল। বাড়ীর পথে মাসী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি খৃষ্টান-মন্দিরে পূজা করলে, তোমাদের ব্রাহ্মণেরা চটবে না?" আমি উত্তর দিলাম, "আমাদের হিন্দু ধর্ম্মগুরুরা ওরকম একচোখো ন'ন।" সত্যি বললাম কি না, কে জানে!

আমার এই এক বাতিক ছিল। যেখানে সেখানে যখন তখন খুব জোর গলায় প্রচার করতাম, যে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্ম কোথাও নেই, এই ধর্ম্মের কোলে সকল পন্থা সকল বিশ্বাসেরই স্থান আছে। একবার জব্দও হলাম খুব। সেটা আরও বছরখানেক পরের কথা। জেনিভা সহরে এক ছোট হোটেলে ছুটী কাটাচ্ছি। হোটেলটী সহরের বড় বড় সরাইখানার মত নয়। ফ্রেঞ্চ সীমান্তের কাছে বাগানের মাঝখানে ছোট্ট একটী বাড়ী,

সবসুদ্ধ জনাপনেরো কুড়ির থাকবার ব্যবস্থা। আমরা নানা দেশের লোক সেখানে ছিলাম। তার মধ্যে এক মার্কিন মহিলা তাঁর ছোট ছেলেটীকে নিয়ে বাস করছিলেন। মহিলাটীর স্বামী মানোয়ারী জাহাজে কাজ করতেন। জাহাজ ভূমধ্যসাগরে কোন বিশেষ কাজে মোতায়েন ছিল। সাহেব সুবিধা পেলেই এসে দুই একদিন জেনিভায় কাটিয়ে যেতেন। আমার ভাব হল প্রথম তাঁর বাচ্চা টেডীর সঙ্গে। সে বাগানের বেঞ্চে আমার পাশে ব'সে রোজ গল্প শুনত। মেম সাহেব দূরে দূরে থাকতেন। একদিন সোজা আমাদের কাছে চ'লে এসে সলজ্জভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, "আমিও বসতে পারি কি? তারপর একদিন জরীর উর্দ্দী পরা বাপ এলেন। তিনি সটান আমার কাছে এসে, এক গাল হেসে, আমার হাতে মোচড় দিয়ে নাকি-সুরে বল্‌লেন, "আপনি টেডীর বন্ধু! আমিও দু'দিন ব'সে আপনার দেশের রূপকথা শুনব। May I ?" মজার কথা নয়! ছ'ফুট লম্বা, বিশাল-ছাতী লালমুখো এই খোকাটী ব'সে দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প শুনবে! হাসি চেপে উত্তর দিলাম, "তা বেশ ত! আমার পুঁজী এখনও ফুরোয় নেই।" টেডীর মহা আনন্দ। বললে, "হ্যাঁ বাবা, খুব ভাল গল্প!" এই ভাবে এঁদের সঙ্গে ব'নে গেল। একদিন হল কি, খেয়ে-দেয়ে দুতিনজন ফরাসী বন্ধুর সঙ্গে দালানে ব'সে রাজনীতিক তর্ক-বিতর্ক করছি, খুব জোর গলায় ভারতের দুর্দ্দশার বর্ণনা করছি,(সেই বছর পুণাতে বিনা-বিচারে জেলে দেওয়ার সূত্রপাত হয়েছে) এমন সময় মার্কিন মহিলাটী এসে আমাকে ডাকলেন। আমি উঠে যেতেই বললেন, "আমার ঘরের বাহিরে যে balcony বারান্দা আছে, একবার আসবেন সেইখানে!" আমি ত তখন ছেলেমানুষ, অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব, তবু মনে হল যে মানোয়ারী সাহেবের আপত্তি থাকতে পারে আমার এই রকম যাওয়া আসাতে। জিজ্ঞাসা করলাম, "লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব এসেছেন নাকি! তাঁকে ত খানার সময় দেখলাম না।" Mrs C. হয়ত আমার এসিয়াটীক মনোভাব বুঝলেন। কেন না হেসে উত্তর দিলেন, "না, সে আসে নেই। কিন্তু আমার দেশের কয়েকজন বন্ধু এসেছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।" গেলাম মেম-সাহেবের বারান্দায়। দেখি, জনা তিন চার সাহেব-মেম ব'সে রয়েছেন। তাঁরা উঠে আমাকে খুব

আদর-অভ্যর্থনা করলেন। এক বৃদ্ধা বললেন, "আপনার নাম ত দত্ত? আপনি নিশ্চয় স্বামীজীর আত্মীয়। আমরা সবাই তাঁর ভক্ত। আপনার কাছে হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনব।" শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। কি ভয়ানক! আমি ত Mrs C.-র কাছে এক দিনও বেদান্ত দর্শনের নাম করি নেই। তাঁর ছেলেকে রূপকথা বলি, এই অপরাধ। ভদ্রমহিলাকে ভাল মানুষ ব'লে জানতাম। তিনি আমার সঙ্গে এই দুশমনী করলেন! তাড়াতাড়ি বললাম, "আজ্ঞে না, আমি স্বামীজীর আত্মীয় নই, তাঁকে কখন চক্ষে দেখি নেই। আমি আইন পড়ছি, ধর্ম্মের কিছুই জানি না।" আমার কথা কেউ কানেও তুললেন না। বৃদ্ধা বললেন, "আপনি হিন্দু ত! প্রত্যেক হিন্দুরই ভেডাণ্টে জন্মগত অধিকার। আপনি যা জানেন তাই বলুন। তাতেই আমাদের লাভ।" গোরিং গাঁয়ের চাষাদের কাছে হিন্দুধর্ম্ম কি তা বোঝাতাম বটে। পারিসে ম্যুতেল পরিবারের কাছেও সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভাব নিয়ে বড়াই করেছি। কিন্তু এই বিবেকানন্দ ভক্তদের কি বলব! যাই হোক বাঙ্গালীর ছেলে কথায় হার মানবো! স্বামীজীর জাতভাইও ত বটে! জুড়ে দিলাম যম-নচিকেতার গল্প। সেটা জানা ছিল। মার্কিনরা, বিশেষ ক'রে বৃদ্ধাটী "বি-ই-উ-টী-ফুল" ইত্যাদি ব'লে আমাকে উৎসাহিত করলেন। সেদিনকার মত রেহাই পেলাম। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে কেতাবগুলো হাতড়ে হাতড়ে রমেশ বাবুর "Ancient India" টেনে বের করলাম। রাত দুটো পর্য্যন্ত সেটা প'ড়ে অনেক কিছু বাগালাম। সেই বিদ্যার জোরে দুটী দিন চালালাম ধর্ম্মব্যাখ্যা। তেসরা দিনে মার্কিন দল চ'লে গেলেন। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এদের দলে একটী বছর পনেরো ষোলোর ছোকরা ছিল। দিব্যি দুর্বৃত্ত চালাক ছেলে। যাবার আগে সে আমাকে ব'লে গেল, You are a cute fella. How nicely you hoaxed the old birds! তুমি খুব ঘুঘু ছেলে, কি বোকা বানিয়েছ ঐ বুড়ো-বুড়ীদের!"

পারিসের কথা বলি, আমি বুর্বঁ রাজাদের ভক্ত ছিলাম না। ফরাসীরা তাদের মাথা কেটেছিল, বেশ করেছিল, এই আমার মনোভাব ছিল। তবু, ভেরসাইয়ের রাজবাড়ীতে চতুর্দ্দশ লুই কি মারী আন্তোয়ানেতের যে সব চিহ্ন ছিল তা দেখে মনে বড় কষ্ট হত। কষ্ট হত, তবু বার বার দেখতে যেতাম।

তাদের বাসের ঘর, ঘরসজ্জা, মায় বিছানা পর্য্যন্ত সাজানো ছিল। এই রাজ-বাড়ী কত পুরানো স্মৃতিতে ভরা। লুইয়ের লাভালিয়ের ও মন্তেস্পাঁর সঙ্গে যৌবনে প্রেমলীলা—তাঁর বুড়ো-বয়সে বুড়ী মেন্তেনঁর হুকুম-বরদারী—পরের যুগে পম্পাদূর ও দ্যুবারী কর্ত্তৃক শনৈঃ শনৈঃ ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ সাধন—ত্রিয়ানঁতে নবীন সুন্দরী আন্তোয়ানেতের লীলাখেলা—তারপর সর্ব্বশেষ দৃশ্য, ক্ষুধার্ত্ত পারিসিয়ান canaille-এর (জনতার) অভিযান—এ সবই ত ঘটেছিল এই ভেরসাইতে। জরী-জড়োয়া-পরা রাজা রাণীর ভিড়ের মাঝখান থেকে এক একবার উঁকী মারত একটী কালো বেঁটে পাগড়ীবাঁধা মূর্ত্তি—দ্যুবারীর পোষা বাঁদর জামর—Zamor। বাঙ্গালীর ছেলে সে, ফিরিঙ্গী ডাকাতে তাকে ধ'রে নিয়ে গেছল ছেলেবেলায় কোন্ নদীতীরে ছোট্ট গ্রাম থেকে। পাগড়ী বেঁধে ভাঁড়ামী করত, রাজা রাণীর মন যোগাত। কিন্তু তার অন্তরের আগুন কোনদিন নেবে নেই। ১৭৯০ সালের ভীষণ তাণ্ডবে ফরাসীর সঙ্গে নেচেছিল এই অনামা বাঙ্গালী ক্রীতদাস।

লুভরে কি কি দেখেছিলাম এখন ভুলে গেছি। দুটো জিনিস শুধু মনে আছে। এক, Venus de Milo'র মূর্ত্তি। দ্বিতীয়, সেকন্দর ও পুরুরাজের ছবি। Venus-এর মূর্ত্তিটি জগদ্বিখ্যাত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ফরাসীরা একে রেখে দিয়েছে আদর করে এক আলাদা ঘরে, চারিদিকে লাল মখমলের পরদা ঝুলছে। সুন্দরের উপযুক্ত সমাদর! কিন্তু আমার এইটুকু দোষ চোখে পড়েছিল, যে এ মানবীর মূর্ত্তি, দেবত্বের চিহ্ন মাত্র নেই।

পুরুরাজের ছবি আমাকে মোহিত করেছিল। আজও মনে আঁকা রয়েছে। জগজ্জয়ী সেকেন্দর বসে রয়েছেন ঘোড়ার উপর, সম্মুখে বিজিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দু নৃপতি, তাকে ধরে রয়েছে গ্রীক সেনানীরা। কি আশ্চর্য্য চোখ এই পুরুরাজের! কি কথা কইছে ঐ চোখ! "আমার শরীর শেকলে বেঁধেছ সম্রাট্! কিন্তু মনকে বাঁধতে পারবে না তুমি!" মনকেও কিন্তু বাঁধলেন সেকেন্দর! যে সুতো দিয়ে বেঁধেছিলেন, সে সুতো ত আজও পাওয়া যায়!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

হোয়াইট্‌হেডের দর্শন *

প্রোফেসার হোয়াইটহেডের নাম দার্শনিক-সমাজে সুপরিচিত। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় সমান পারদর্শী বর্ত্তমান সময়ে অন্য কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। বৈজ্ঞানিক হইয়াও দর্শন-সম্বন্ধে সুগভীর কথা যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হোয়াইটহেডের দর্শন-বিষয়ক লেখা প্রায়ই সহজে বুঝিতে পারা যায় না। সেইজন্য তাঁহাকে যতদূর প্রশংসা করা হয়, তাঁহার তত্ত্বের সহিত সাধারণের ততদূর পরিচয় আছে বলিয়া মনে হয় না।

Adventures of Ideas নামে একখানি পুস্তক তিনি কিছু দিন হইল প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অনেক যায়গা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু দার্শনিকভাগ তাঁহার অন্যান্য দার্শনিক লেখার মতই দুর্ব্বোধ্য। পুস্তকখানি চারিভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে সমাজতত্ত্ব-সম্বন্ধে (sociological), দ্বিতীয় ভাগে বহির্জ্জগত-সম্বন্ধে (cosmological), তৃতীয়ভাগে দর্শন-সম্বন্ধে (philosophical) এবং চতুর্থভাগে সভ্যতা-সম্বন্ধে (civilisation) আলোচনা রহিয়াছে।

প্রথম ভাগ

প্রাচীন (পাশ্চাত্য) সভ্যতায় দুইটী জিনিষ বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ছিল দাসত্ব; প্রায় হাজার বছর ধরিয়া যাহার ঘরে দাসদাসী ছিল তাহাকেই ভদ্র বলা হইত। দ্বিতীয়টী নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার। নৈতিক তত্ত্বের জোরেই সমাজের দোষগুণ বিচার করিতে পারা যায়। প্লেটো কিংবা ষ্টোইক নীতিবিদেরা দাসত্বপ্রথার কোন আলোচনা অথবা দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এমন চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন যাহাতে দাসত্বপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছিল। বিশেষভাবে প্লেটোই মানবাত্মার বৌদ্ধিক ও নৈতিক মহত্ত্বের

* Adventures of Ideas. By A. N. Whitehead [Cambridge University Press. 12s. 6d. net.]

ধারণা আনিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় ছয়শত বৎসর ধরিয়া ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে এই ধারণা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তারপরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। মানবাত্মার গৌরবসম্বন্ধে প্লেটোর প্রচারিত তত্ত্ব খৃষ্টীয় ধর্ম্মের খুবই অনুকূল। খৃষ্টানগণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাতে এমনই প্রাণসঞ্চার করিয়া দিলেন যে তাহার জোরে বহু বৎসর পরে দাসত্ব-প্রথা সমাজে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

দার্শনিক শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচারের জোরে এইটুকু সামাজিক উন্নতি সম্ভবপর হইল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানবাত্মার মহত্ত্ব এবং মানবজাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সব কথা বলা হয়, তাহা কতদূর সত্য! মানুষ মানুষ বলিয়াই কি মহান ? সব মানুষই কি এক ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ? তাই যদি সত্য হয়, তবে ডারুইন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার করিলেন, তাহার অর্থ ও মূল্য কি ? সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে শুধু যোগ্যতমেরাই টিঁকিয়া থাকিতে পারে এবং অযোগ্যেরা পরাজিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত, প্রকৃতি এক স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদিগকে বাছিয়া লন। এই যে স্বাভাবিক চয়নের (natural selection) বৈজ্ঞানিক নিয়ম, ইহার কাছেও মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের কথা নিতান্ত অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

এই প্রশ্নের উত্তরে হোয়াইটহেড প্রথমতঃ বলেন, বিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা নিয়াই বাদ বিবাদ চলিতেছে, এমতাবস্থায় বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া আমাদের ধার্ম্মিক ও সামাজিক ধারণাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়না। দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক নিয়মের এই অর্থ নয় যে পদার্থরাশি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। নিয়মই জোর করিয়া, বস্তুসকল কি রকম চলিবে, তাহা ঠিক করিয়া দেয়না। কিন্তু বস্তুর মোটামুটি চালচলনের ধরণেরই নামই নিয়ম। বস্তুর গতিবিধি কিছুতেই বদলায় না, এমন নয়। মানুষের ক্রিয়াকলাপের উপর তাহার ধার্ম্মিক আদর্শের প্রভাব পড়িয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে এই আদর্শের মিল বা সামঞ্জস্য না থাকিলেও আমাদের অবস্থা ও কার্য্যকলাপ এই আদর্শ অনুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারার নামই সামাজিক বা ধার্ম্মিক উন্নতি সম্পাদন করা। সুতরাং

বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদের ধার্ম্মিক বা সামাজিক আদর্শের কোন মূল্য নাই—একথা বলিতে পারা যায় না; কেননা নিয়ম বলিয়া আগে থেকে গড়া কোন রকমের এক কঠিন ছাঁচ পড়িয়া নাই, যাহার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের খাপ না খাওয়ালেই চলিবে না। কিন্তু আমাদের সাধারণ ব্যবহার যেমন হইবে, নিয়মও তেমনি তৈরী হইবে। আমাদের আদর্শ অনুযায়ী ব্যবহার বদলাইলে নিয়মও বদলাইবে। কোন ভৌতিক নিয়মের বাঁধনে আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে রুদ্ধ হইয়া নাই।

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দুইটী বিষয়ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ব্যক্তিগত নিরপেক্ষতা (individual absoluteness) এবং ব্যক্তিগত সাপেক্ষতা (individual relativity); দুইই সভ্যতার অঙ্গ। কখন কখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে বেশী মূল্য দেওয়া হইয়াছে, কখন কখন সমাজের কল্যাণের, সমষ্টিগত জীবনের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুইটী পরস্পর বিরোধী নয়। স্বাধীনতার মূল্য কিসে? কোন ব্যক্তিকে আর দশজনের মত না চলিয়া তাহার ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে কেন? শুধু গতানুগতিক ভাবে চলিলে পুরাতন বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র। নূতন কিছুর সৃষ্টি হইতে পারে না। নূতন মূল্যবান কিছুর যাহাতে সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার জন্যই সকলকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন দৃষ্টিতে সমাজের কল্যাণ হইতে পারে এবং সামাজিক কল্যাণ-সাধনেও আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চরিতার্থ হইতে পারে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানুষের জীবন বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কোন অবস্থায়ই কোন ব্যক্তি একেবারে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না; কিন্তু সভ্যতার ব্যাপারে মানুষকে, রাজকীয় নিয়মের ততটা নয় যতটা নিজ নিজ বিভাগীয় সংঘ-মতের শাসনে থাকিতে হয়। উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক প্রভৃতি সকলকেই তাহাদের নিজ নিজ বিভাগীয় সংঘ-মতের অধীনে থাকিতে হয়। কিন্তু এই শাসনে কখনই ব্যক্তিকে ব্যক্তি-হিসাবে পরাধীন থাকিতে হয় না। তাহার বিদ্যা ও দক্ষতার বিচার হয় মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে নানা অর্থনীতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র অধিকারের দাবী

আজকাল আর কেহ মানিবেনা। কিন্তু এখানেও হয়ত স্বাধীনতার পোষণ দ্বারাই আমাদের সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারাতেই স্বাধীনতার সার্থকতা। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং সকলেই ভাল ভাবে থাকিতে চায়। সুতরাং প্রথমতঃ সকলের মঙ্গলজনক কতকগুলি সর্ব্বসাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই লোকে স্বাধীনতা চাহিয়া থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রজীবনে স্বাধীনতা বলিতে তাহাকেই বোঝা উচিত যাহার বলে সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের বিভিন্ন দান সমাজের সাধারণ কল্যাণের অনুকূল হইতে পারে। সামাজিক কল্যাণের সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার সামঞ্জস্য রাখিতে পারিলে ব্যক্তির কার্য্যকারিতাও বর্দ্ধিত হয়, স্বাধীনতাও সার্থক হয়।

সামাজিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্য রকমের স্বাধীনতাও আছে। যে স্বাধীনতা প্লেটো খুঁজিতেছিলেন এবং যাহাকে মুক্তি নামে অভিহিত করিতে পারা যায়, আমরা তাহার কথাই বলিতেছি। এ স্বাধীনতা জ্ঞানদ্বারাই অর্জ্জন করিতে হয়; যে বাধা ও বিরোধহীন তত্ত্ব, যে সুর বা রস বা আনন্দ, (harmony) বিশ্বের মূলে রহিয়াছে, তার উপলব্ধি হইলে এবং আমাদের আত্মাকে তদনুযায়ী করিতে পারিলেই এ মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

সভ্যজগতে আমাদের সামাজিক কার্য্যকলাপে পরস্পরের সহিত মিল রাখিবার দরকার হয়। অনেক সময় মানুষ স্বভাবের জোরে আপনা হইতেই অপরের সহিত মিল রাখিয়া চলে। অনেক সময় সমাজের অন্যান্য লোকের চাপে তাহাকে সকলের সঙ্গে মিল রাখিতে হয় এবং অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া সাধারণ পথে আনিতে হয়। জোর না করিয়া শুধু বুঝাইয়া (by persuation) মানুষকে বিশিষ্ট কোন পথে যত বেশী আনিতে পারা যাইবে, ততই সভ্যতার বেশী উন্নতি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জ্ঞানবিস্তার, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি সভ্য মানবের কার্য্য-কলাপ শুধু জোরের উপর নির্ভর করিয়া চলে না। লোককে বুঝাইয়া আপন মতে আনিতে হয় এবং নিজের জিনিষ কিনাইতে পারা যায়। কখন কখন বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যেখানে যেখানে বলপ্রয়োগ অপরি-হার্য্য হয়, সেখানেই সভ্যতা নিজের কাজ করিতে পারিল না এবং আমাদের অসভ্যতা প্রকাশ পাইল বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মজগতে যাহা কিছু মূল্যবান তাহাই ইউরোপ মিশর, পালেষ্টাইন ও গ্রীস এই তিনটী প্রাচীন দেশ হইতে পাইয়াছে। মিশর থেকে যন্ত্রকলাসম্বন্ধীয় (technological) ধারণাগুলি আসিয়াছে, পালেষ্টাইন বিশ্বসম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কল্পনা (religious cosmology) দিয়াছে, এবং গ্রীস হইতে সেই সব সুনির্দ্দিষ্ট সাধারণ ধারণাগুলি (generalisations) আসিয়াছে, যাহার জোরে দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে।

নিয়মের (law) কল্পনা জ্ঞানরাজ্যের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলেই রহিয়াছে। হোয়াইটহেড নিয়ম সম্বন্ধে চারিটী বিভিন্ন কল্পনার আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম কল্পনাতে নিয়ম বস্তুর অন্তর্নিহিত (immanent) বলিয়া ধরা হয়। যে সব প্রাকৃতিক বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, নিয়ম তাহাদের সত্তারই অঙ্গ। বস্তুর সত্তার মধ্যে যে ঐক্য আছে, সে ঐক্যই তাহাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায়। তাহাকেই নিয়ম বলি। নিয়ম বস্তুর সত্তাকেই প্রকাশ করে, বস্তুতে যাহা নিরীক্ষণ করিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিমাত্রকে এখানে নিয়ম বলা হইতেছে না, নিয়মের এই কল্পনাতে বস্তুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মও পরিবর্ত্তিত হয় বুঝিতে হইবে। সুতরাং শাশ্বত কোন নিয়মের বাঁধনে জগতের ক্রমোন্নতি চলিয়াছে একথা বলিতে পারা যাইবে না। এই মতে কোন বস্তুরই নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন সত্তা থাকিতে পারে না। পরস্পরের সহিত ব্যবহারেই তাহাদের সত্তা প্রকাশ পায়। আমাদের কাছে যেগুলি বস্তুর গুণধর্ম্ম বলিয়া লাগে, সেগুলি পরস্পরের সহিত বস্তুর কি রকম সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রকাশ করে মাত্র। ইহাতে বাহ্য (external) সম্বন্ধ না মানিয়া আভ্যন্তরিক (internal) সম্বন্ধই মানিতে হয়।

ইহারই ঠিক বিপরীত মত নিয়মের দ্বিতীয় কল্পনাতে পাওয়া যায়। সেমতে সম্বন্ধকে বাহ্য বলিয়াই মানা হয়। সম্বন্ধ হইলে বা অসম্বন্ধ থাকিলে বস্তুর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারা যায়। নিয়ম বাহিরের থেকে বস্তুর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে (imposed) মাত্র। (একাজ ভগবানই করিয়াছেন)।

তৃতীয় মতে নিয়ম শুধু সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (description) মাত্র। পর পর যে সব বস্তু দেখিয়া গেলাম, তাহাতে প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান কোন রকমের একাকার গঠন দেখিতে পাইলাম এবং তাহাকেই নিয়ম বলিতেছি তাহা নহে। নিয়ম বলিয়া কোন পদার্থ বস্তুর ভিতরেও নাই, বাহির হইতেও চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিই নিয়ম।

অতি আধুনিককালে নিয়মকে, শুধু বিবৃতি নয়, ব্যাবহারিক ব্যাখ্যা (conventional interpretation) বলিয়া ধরা হয়। ইহাই নিয়মের চতুর্থ কল্পনা। অনেক সময় আমরা জাগতিক কোন ঘটনাবলীর কথা না ভাবিয়াই বুদ্ধিবৃত্তির চালনা দ্বারা (যথা গণিত শাস্ত্রে) নানা রকমের কল্পনার কাঠামো (ideal constructions) রচনা করিয়া থাকি। পরে দেখা যায় যে, ঐ গুলির দ্বারা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে বুঝাইতে বা ব্যক্ত করিতে পারা যায়। প্রাকৃতিক তথ্য প্রকাশ করিবার যে বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে, তাহা নহে। একই কথা যেমন খুসী না হইলেও, নানাভাবে ব্যক্ত করিতে পারা যায়। এখন যদি বিশেষ কোন ভাবে (কোন নিয়মের দ্বারা) তাহা ব্যক্ত করা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সাময়িক চাল (convention) অনুসারে আমাদের মনোযোগ ঐ বিশিষ্ট প্রকারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মূলে আর কোন বস্তুগত অর্থ নিহিত নাই।

হোয়াইটহেড দেখাইয়াছেন, নিয়মের কল্পনার সঙ্গে বিশ্ব সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা বদলাইয়াছে।

আজকালকার গণিতসম্মত পদার্থ বিজ্ঞান (mathematical physics) প্লেটোর মতের খুব অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশকালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বস্তু-বিষয়ে আমাদের যে কল্পনা হইয়াছে, তাহার আভাস প্লেটোতেও পাওয়া যায়। বিশ্বের সব পদার্থই যে পরস্পর-সাপেক্ষ, একে অন্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে কথা প্লেটোর সর্ব্বাধারের (Receptacle) কল্পাতেও পাওয়া যায়। দার্শনিক বিচার ব্যতীত এই সমস্তের স্থির নিশ্চয় হইতে পারে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যাহাকে নিতান্ত নিশ্চিত

বলিয়া লাগে, সূক্ষ্ম বিচারে তাহাকে নানা অনিশ্চিততা ও অস্পষ্টতার আবরণে প্রচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। কোন বিষয়ের চরমকথা যে বিজ্ঞানের হাতে নাই, সে কথা বুঝাইয়া দেওয়াও দর্শনের একটা কাজ।

ধর্ম্মেরও একটা দার্শনিক দিক আছে। জগতের সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ, মানবাত্মার বহুত্বের সঙ্গে বিশ্বের ঐক্যের কি করিয়া সামঞ্জস্য হয়, এই সব কথার বিচারে দর্শনের আলোচনা করা দরকার। এই সব কথার সন্তোষ-জনক মীমাংসা করিতে হইলে, দেখাইতে হইবে যে জগতের জন্য ভগবানের, এবং ভগবানের জন্য জগতের দরকার আছে। প্লেটো যেমন বুঝিয়াছিলেন, আমাদেরও বুঝিতে হইবে, যে সংসার চালনায় ভগবানের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আদর্শের মহিমাতেই পাওয়া যায়, ভৌতিক শক্তিতে নয়। ভগবানের মধ্যে যে সব আদর্শ (ideal) বিদ্যমান রহিয়াছে, সেগুলিই, জোর করিয়া নয়, কিন্তু নিজের মহিমায়, যেন বুঝাইয়াই (persuasion), সৃষ্টিকে নূতনভাবে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে।

তৃতীয় ভাগ

পুস্তকের তৃতীয় ভাগে হোয়াইটহেড তাঁহার দর্শনের কথা বলিয়াছেন। এই কথাগুলি বুঝিতে হইলে তাঁহার দর্শনের গোড়ার মোটামুটি কয়েকটা কথা জানা আবশ্যক। সবচেয়ে মুখ্য কথা হইয়াছে এই যে, যাহা কিছু আছে তাহাই গতিশীল। সবই চলন্ত। কিছুই দাঁড়াইয়া নাই। এই অবিরত সার্ব্বভৌম চলা বা নিখিল ক্রিয়াই হোয়াইট্‌হেডীয় দর্শনের মূলতত্ত্ব। ব্যর্গ-সোঁর দর্শনেও এই চলন্ত ক্রিয়ার কথা মুখ্যভাবে আছে; কিন্তু সে ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় না এবং তাহাতে যেন কিছুই গঠিত হইয়া উঠে না। হোয়াইটহেডের সে রকম মত নয়। হোয়াইটহেড যে নিখিল ক্রিয়াকে বিশ্বের মূলতত্ত্ব বলিয়া মানেন, তাহাতে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু গড়িয়া উঠিতেছে এবং আবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। যাহা কিছু বাস্তবিক আছে তাহাকে সক্রিয় বর্ত্তমান বস্তু (actual entity) বলা যাক। এই অবিচ্ছেদ্য ক্রিয়ার দুইটা দিক আছে। প্রথমতঃ ক্রিয়াতে একটা বস্তু গঠিত হইয়া উঠিতেছে এবং আপন পূর্ণতার দিকে যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই বর্ত্তমান বস্তুটী আপন

পূর্ণতালাভ করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ক্রিয়াতে যেন দুইটা টান রহিয়াছে, একটানে বস্তু "আছে"-র দিকে আসে এবং অন্য টানে "নাই"-র দিকে যায়। কিন্তু ধ্বংস হইয়া কোন বস্তু একেবারে "নাই" হইয়া যায় না, অন্য কোন বর্ত্তমান বস্তু গঠনের উপাদান হইয়া উঠে মাত্র। একেবারে "নাই" হইতে যেমন কখন কিছু আসে না, তেমনি কিছুই একেবারে "নাই" হইয়া যায় না। বর্ত্তমান বস্তু যখন অতীত হইয়া যায়, তখন তার স্বকীয় সত্তা নষ্ট হইল বলিয়া এক অর্থে সে মরিয়া গেল বলিতে পারা যায় কিন্তু আরেক অর্থে সে মরিয়া অমরত্ব লাভ করিল ইহাও বলিতে হইবে। কেন না সে একেবারে নাই হইয়া গেল না, উপাদানরূপে অন্যবস্তুর অঙ্গীভূত হইয়া রহিল। এই রকম গড়াভাঙার কাজ অফুরন্ত ভাবে চলিয়াছে।

এক বর্ত্তমান বস্তু অন্য এক বর্ত্তমান বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং যখন এক বর্ত্তমান বস্তু ধ্বংস হইয়া গেল তখন ঠিক তেমনভাবে সে আর কখনও আসিবে না। কিন্তু আমরা আর এক রকম পদার্থ দেখিতে পাই, সেগুলি সব সময়ই এক রকম থাকে। হিমালয় পর্ব্বত ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সামান্য মাটীর গোলকের গোলাকৃতি সব সময়ই এক থাকিবে। এই বস্তুটী ভাঙিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই একই গোলাকৃতি অন্য বস্তুতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। গোলাকার সব বস্তু নষ্ট হইয়া গেলেও, যখনই কোন গোল বস্তুর সৃষ্টি হইবে, তখনই সেই একই গোলাকৃতি আবার দেখা দিবে। এই রকম শাদা, কাল, গোল, লম্বা প্রভৃতি একার্থক পদার্থকে নিত্য বিষয় (eternal objects) বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বস্তুর যেমন নির্দ্দিষ্ট দেশ কাল রহিয়াছে, নিত্য বিষয়ের তেমন কিছু নাই। বর্ত্তমান বস্তু নিত্য বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়াই নির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করে।

একবস্তু অন্য বস্তুর সহিত অসম্বদ্ধ হইয়া নাই। কিন্তু সম্বন্ধ কি করিয়া হয়? যখনই আমি কোন বস্তু অনুভব করি, তখনই সেই বস্তু আমার সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়। কিছুতেই যদি কোন বস্তুর অনুভূতি আমাতে না হয়, তবে সে বস্তু আমার সঙ্গে সম্বদ্ধ বলিয়া বলা যাইতে পারে না। এই অনুভূতির (feeling) দ্বারাই এক বস্তু অন্য বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ বা সংস্পৃষ্ট হয় বুঝিতে হইবে। অনুভূতি বলিতে জ্ঞান বুঝিতে হইবেনা। আমাদের অনুভূতিতে

অনেক সময় জ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু সব সময় থাকে না এবং উদ্ভিদাদির কিম্বা অণু পরমাণুর কখনই জ্ঞান আছে বলিয়া বলা যায় না। কিন্তু অনুভব সকলেরই রহিয়াছে। বাস্তবিক অনুভূতি ব্যতিরেকে কোন সত্তার কল্পনাই করা যায় না। যে কোন বস্তুর কথা ভাবিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে তাহার উপর অন্য কোন না কোন বস্তুর ক্রিয়া সর্ব্বদাই হইতেছে। ইহাই তাহার অনুভব। এক কথায় অনুভূতিই বর্ত্তমানত্বের অর্থ বলিলেও চলে।

যখন কোন বস্তু বর্ত্তমান অবস্থায় থাকে, তখন সে তার পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী বস্তুকে অনুভব করে। কিন্তু যখন সে অতীত হইয়া যায়, তখন তাহার নিজের অনুভব না থাকিলেও সে তাহার পরবর্ত্তী বর্ত্তমান বস্তুর অনুভবের বিষয় হয়। প্রত্যেক বস্তুতেই অন্য বস্তুর অনুভব রহিয়াছে। কোন বস্তুই ঠিক আপনাতে আবদ্ধ নাই। এক বস্তুর সত্তা অনুভূতির ভিতর দিয়া অন্য বস্তুর সত্তাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। ইহাকেই হোয়াইটহেড আপেক্ষিকতার নিয়ম (law of relativity) বলেন।

এই সব প্রাথমিক কথা মনে রাখিয়া এখন হোয়াইটহেড দর্শন-সম্বন্ধে এই পুস্তকে কি বলিয়াছেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। যাহাকে আমরা 'বর্ত্তমান বস্তু' (actual entity) বলিয়াছি, তাহাকে 'অনুভবক্ষণ' (occasion of experience)ও বলিতে পারা যায়। ক্ষণ বলিতে শুধু কাল মাত্র বুঝিতে হইবে না। দেশ ও কাল সম্বন্ধে আজকাল বিশেষজ্ঞদের যে ধারণা হইয়াছে, তাহাতে দেশকে কাল হইতে এবং কালকে দেশ হইতে পৃথক করিতে বা পৃথকভাবে বুঝিতে পারা যায় না। দেশ কাল মিলিয়াই এক বাস্তব পদার্থ। যাহা কালগত, তাহা দেশগতও বটে। এক দৃষ্টিতে যাহাকে ক্ষণ বলা হইল, তাহাকেই অন্য দৃষ্টিতে অণু বলাও যাইতে পারে। তবে দেশ কাল হইতে আমরা অনুভবক্ষণ বা বর্ত্তমান বস্তু পাইনা। অনুভবক্ষণই মৌলিক বস্তু ; তাহা হইতেই আমরা দেশ কালের কল্পনা রচনা করিয়া থাকি।

এই অনুভবক্ষণ কি দিয়া গঠিত ? বিষয় ও বিষয়ী দিয়াই অনুভব গঠিত ; কিন্তু বিষয়ী ও বিষয়কে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে বুঝিতে হইবে না। কেননা অনুভব জ্ঞানমূলক (cognitive) নহে, ভাবনামূলক (emotional)

মাত্র। অত্যন্ত গোড়ার কথা এক বস্তু অন্য বস্তুকে কি রকম জানিল, তাহা নহে। এক বস্তুর কাছে অন্য বস্তু কি রকম লাগিল। এক বস্তুর উপর অন্য বস্তু কি রকম ভাবনা বা সংস্কার জন্মাইল, ইহাই প্রধান কথা। এই বিশ্বে জ্ঞান শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকটী প্রাণীতে মাঝে মাঝে দেখা যায় মাত্র।

অনুভব ক্ষণকেই যখন বিষয়-সম্পর্কে তাহার বিশিষ্ট ক্রিয়ার সহিত ভাবিয়া থাকি, তখন তাহাকে বিষয়ী-রূপে পাই। এই বিশিষ্ট ক্রিয়া অনুভব বা ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে-ই বিষয়, যে এ ভাবনা বা অনুভব কোন বিষয়ীতে উৎপাদন করে। ফলে এই হইল যে, বিষয় হইতেই বিষয়ীর সৃষ্টি হয়। সার্ব্বভৌম চলার অগ্রসর হইবার তাড়নায়, যে এই মুহূর্ত্তে বিষয়ী ছিল, সে-ই অনুভূতির পূর্ণতা লাভ করিয়া বিষয়রূপে পরিণত হয়, তাহার পরবর্ত্তী বিষয়ীকে সৃষ্টি করে এবং তাহার অনুভূতির বিষয় হয়। বিষয়ীই জড়তা লাভ করিয়া বিষয়রূপে পরিণত হয়। বিষয় পুরাতন পদার্থ। নূতন হইয়া যাহা আসে, তাহা বিষয়ী। বিষয়ীতেই সৃষ্টির নবীনতা প্রকাশ পায়।

এক অনুভবেরই সীমাহীন অন্তহীন স্রোত চলিয়াছে বলিয়াও ভাবিতে পারা যায়; ইহতে অনুভবক্ষণের ব্যক্তিত্ব বা ঐক্য কি করিয়া আসে? ভাবনার বিশেষ ঐক্য হইতেই অনুভবক্ষণের ব্যক্তিত্ব বুঝিতে হয়। অনুভবের প্রবাহ চলিয়াছে বটে, এবং তাহাতে কোথাও কোন রকমের বিচ্ছিন্নতা পাওয়া যায় না, ইহাও সত্য, তবুও ইহার মাঝে আপেক্ষিকভাবে ব্যক্তিগত পূর্ণতা রহিয়াছে; তাহাতেই আমরা অনুভবক্ষণের সৃষ্টি ও ধ্বংস বুঝিতে পারি।

হোয়াইটহেড বলেন, আমরা যে প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত এক বলিয়া বুঝি তাহা খুবই ভ্রমাত্মক। শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যাহা পাই, তাহাতে ভূত ভবিষ্যতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু অতীত যে বর্ত্তমানে আসিয়া ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষে পাই। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা বুঝিবার নয়, সুতরাং আমাদের অতীন্দ্রিয় অথবা নিরিন্দ্রিয় (non-sensuous) প্রত্যক্ষ রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই নিরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উদাহরণ স্বরূপ আমাদের নিজের সম্বন্ধে অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণের জ্ঞানের কথা বলা যাইতে পারে। এই জ্ঞান আছে বলিয়াই স্মৃতি ও ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের জ্ঞান সম্ভবপর হইয়া থাকে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পরস্পরের মাঝে মিশিয়া রহিয়াছে। এক অন্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। প্রত্যেক অনুভবক্ষণই আপনার ব্যক্তিগত পূর্ণতা লাভের পর পরবর্ত্তী অনুভবক্ষণে বিষয়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে অতীত ও বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মাঝে কি রকম থাকে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ভবিষ্যৎও অতীতের মাঝে কি করিয়া থাকে? অত্যন্ত সুদূর ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া অদূর ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের একেবারে অব্যবহিত ভবিষ্যৎ যে কি, তাহা আমরা এখনই অনুভব করিতে পারি। আর ভবিষ্যৎ যখন অতীত ও বর্ত্তমান হইতে উঠিয়া আসিতেছে, তখন বর্ত্তমানে বা অতীতে যে ভবিষ্যৎ একবারে কিছুই নাই, একথা বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান বা অতীতের মাঝে ভবিষ্যৎ সশরীরে বিদ্যমান না থাকিলেও তাহার পূর্ব্বাভাস (anticipation) নিশ্চয়ই রহিয়াছে। বিশেষতঃ ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলা যখন অতীত ও বর্ত্তমানের কাজ, তখন, এক দৃষ্টিতে যেমন কার্য্য কারণের মাঝে আছে বলিতে হয়, তেমনি ভবিষ্যৎও বর্ত্তমান এবং অতীতের মাঝে রহিয়াছে বলিতে হইবে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পরস্পরের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সমকালীন (contemporary) 'বর্ত্তমান বস্তু' পরস্পরের মধ্যে কি রকমে রহিয়াছে? ভূত ভবিষ্যতের মাঝে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহারা পরস্পরের মাঝে আছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাদিগকেই সমকালীন বলা হয়, যাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই। ইহারা পরস্পরের মধ্যে কি করিয়া থাকিবে? হোয়াইট্‌হেড স্বীকার করেন যে সমকালীন বস্তু সাক্ষাৎ ভাবে পরস্পরের মধ্যে নাই। কিন্তু তাহারাও পরোক্ষভাবে পরস্পরের মধ্যে রহিয়াছে। সমকালীন বস্তুর অতীত এক। এবং বর্ত্তমান যখন অতীতেও থাকে, তখন সমকালীন বস্তুও পরস্পরের অতীতে রহিয়াছে একথা বলিতে পারা যায়। আর অতীত যখন বর্ত্তমানে আছে, তখন সমকালীন বস্তুই অতীতের ভিতর দিয়া পরস্পরের মধ্যে রহিয়াছে একথাও বলিতে পারা যাইবে। এই রকম বিশ্বের যাবতীয় বস্তু একে অন্যের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বের এক মহান্ অখণ্ড শরীরের (organic whole) কথা আমরা ভাবিতে পারি।

তাহারপর হোয়াইটহেড দেখাইয়াছেন, বহু বর্ত্তমান বস্তু বা অনুভবক্ষণ মিলিত হইয়া কি করিয়া নানা 'সংঘ' (nexus) ও 'সমাজের' (society) সৃষ্টি করে। কি করিয়া এক বস্তু অন্য বস্তুতে অন্তর্নিবিষ্ট (immanent) হইয়া থাকে। তাহা এই মাত্র বলা হইয়াছে। একরাশি (set) বস্তু যদি পরস্পরের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া আছে বুঝিতে হইবে। আমাদের অনুভূতিতে সংঘের বিভিন্ন বস্তু এক রকম কাজ করে বলিয়াই তাহারা এক সংঘে আছে বলিয়া বলা হয়। শুদ্ধ দৈশিক সংঘের (spatial nexus) সব অবয়বই সমকালীন; তাহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। শুদ্ধ কালিক সংঘের (temporal nexus) কোন অবয়বই সমকালীন নয়।

কোন সংঘের প্রত্যেক অবয়বের যদি একটী সাধারণ রূপ থাকে এবং সেই সাধারণ রূপ যদি ঐ সংঘে জন্মাইতেই ঐ অবয়বের আসিয়া থাকে, তবে ঐ সংঘকে সমাজ বলে। শুধু সমকালীন বস্তু বা ব্যক্তি নিয়া সমাজ গঠিত হয় না। সমাজের পূর্ব্বাপর ব্যবস্থা থাকে। যে সব অনুভবক্ষণ নিয়া আমাদের মানসিক জীবন গঠিত, তাহাও একটী সমাজ বিশেষ। ঘট-পটাদিও এক একটী বৃহৎ সমাজ। এক সমাজের ভিতর অন্য সমাজ থাকিতে পারে। এই রকম সমাজের ভিতর সমাজ তাহার ভিতরে অন্য সমাজ এই রকম অসংখ্য ভাবে রহিয়াছে। এই যে মানব শরীর, ইহাও একটী প্রকাণ্ড সমাজ বিশেষ। এই সমাজের অন্তর্গত রক্ত, মাংস, অস্থি-সমাজ রহিয়াছে। তার ভিতরে জীবাণুর সমাজ রহিয়াছে। তার ভিতরে আবার অণু পরমাণুর সমাজ রহিয়াছে। এই গুলি দৈশিক ভাবে বুঝিতে হইবে না। শরীরটা শুধু দেশ-বিশেষ নয়, ইহা কালেও রহিয়াছে। সুতরাং কালিক ভাবেও এই সমাজ-রাশিকে বুঝিতে হইবে। আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে একটী ক্ষুদ্র জড় বস্তু বলিয়া মনে হয়, তাহাকে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক দৃষ্টিতে এক বিপুল অনুসংঘের পরিমিত সময়ব্যাপী জীবনের ইতিহাস বলিলেও চলে।

ইহার পরে গ্রন্থকার 'আভাস' ও 'সত্তার' (appearance and reality) কথা বলিয়াছেন। আভাসের স্বরূপ বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান বস্তু ও অনুভূতি সম্বন্ধে আরো দুই একটী কথা এখানে জানা দরকার। প্রত্যেক

বস্তুরই দুইটা দিক আছে। একটা ভৌতিক (physical) আরেকটা অভৌতিক (mental)। বস্তুর স্বরূপ তাহার অনুভূতিতেই প্রকাশ পায়। সুতরাং বস্তুর ভৌতিক ও অভৌতিক দিক তাহার ভৌতিক অনুভূতি (physical feeling) ও অভৌতিক অনুভূতিতে (conceptual feeling) প্রকাশ পায়। কোন ব্যক্তি যদি আমাকে চপেটাঘাত করে, তাহা হইলে আমি গণ্ড দেশে শুধু তাহার হস্তেরই স্পর্শ অনুভব করি তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ও অপমানও বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু ভৌতিক অনুভূতিতে শুধু স্পর্শই আসিতে পারে, ইহার ফলে যে ক্রোধ বা অপমানবোধ জন্মিল, আমার অভৌতিক অনুভূতিই তাহার কারণ। ভৌতিক অনুভূতির ফলে হস্তের উষ্ণতা গণ্ডদেশে সংক্রামিত হইয়াছিল মাত্র। সুতরাং দেখা গেল ভৌতিক অনুভূতিতে এক বর্ত্তমান বস্তু অপর বর্ত্তমান বস্তুতে অনুভূত হয় এবং যখন কোন বস্তু এই রকমভাবে অনুভূত হয়, তখন একের অনুভূতির পুনরাবৃত্তি অন্য বস্তুতে হইয়া থাকে। উপরের দৃষ্টান্তে ভৌতিক অনুভূতির ফলে হস্তের উষ্ণতা (অনুভূতি) গণ্ডে পুনরাবৃত্ত হইল মাত্র। যে অনুভূতিতে নিত্য বিষয় অনুভূত হয় তাহাকে অভৌতিক অনুভূতি বলে। নিত্য বিষয় কোন বর্ত্তমান বস্তু নয়। আমরা কল্পনাতেও যে সব বিষয় পাই, তাহাকেও নিত্য বিষয় বলিতে হয় কেননা তাহা বর্ত্তমান জগতের কোন বস্তু নয়, অথচ যে কোন সময়ে তাহারা আবির্ভূত হইতে পারে। উপরের দৃষ্টান্তে ক্রোধ বা অপমান-বোধের মূলে অনেকটা অভৌতিক অনুভূতির কাজ রহিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর যেমন ভৌতিক অনুভূতি আছে, তেমনি অভৌতিক অনুভূতিও আছে। প্রত্যেক অনুভবক্ষণ তার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণের পুনরাবৃত্তি মাত্র নহে। অনেকটা পুনরাবৃত্তি বটে, তাহাই ভৌতিক অনুভূতির লক্ষণ। কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে আবার একেবারে নূতনও বটে, ইহাই অভৌতিক অনুভূতির লক্ষণ। যে কোন মুহূর্ত্তে বিশ্ব তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তের অনেকটা অনুরূপ। কিন্তু অনেকটা নূতনও বটে। এই নবীনতা অভৌতিক অনুভূতির ফলেই আসিয়া থাকে। প্রত্যেক অণুতে যেন এক প্রকারের কল্পনাশক্তি রহিয়াছে, যাহাতে সে আগেকার অবস্থার শুধু পুনরাবৃত্তি না করিয়া নূতন অবস্থা লাভ করে, নূতন পথে চলিতে পারে। ইহাই তাহার অভৌতিক অনুভূতি। এর

ফলেই পরে জীবন, মন ও জ্ঞানের উদয় হয়। নবীনতা বা স্বাতন্ত্র্যই এসবের প্রাণ।

সমস্ত বর্ত্তমান বস্তুই ভৌতিক অনুভূতিতে আসিতে পারে। সমস্তের মূলেই ভৌতিক অনুভূতি আছে। কিন্তু যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই ভৌতিক অনুভূতিতে অনুভব করিতে পায় যায়। ভৌতিক অনুভূতি অনেকটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের নামান্তর মাত্র। ভৌতিক অনুভূতির সঙ্গে অভৌতিক অনুভূতি মিলাইয়া আমরা অতীতকে বর্ত্তমান বলিয়া দেখিয়া থাকি। ইহাই আভাস। কিঞ্চিৎক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী টেবিল আমরা ভৌতিক অনুভূতিতে পাই এবং তাহাই অভৌতিক অনুভূতির সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বর্ত্তমান টেবিলের 'আভাস' প্রদান করে। এই আভাসের ফলে বস্তুর সহিত ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়াছে। কেননা যাহা বাস্তবে বহু ও জটিল, তাহা আভাসে এক ও সরল হইয়া আমাদের অনুভবে আসে। আমরা জানি টেবিল একটী প্রকাণ্ড সমাজ-বিশেষ; কিন্তু তাহার বহু অবয়ব ও জটিল গঠন আমাদের আভাসিক জ্ঞানে মোটেই উদয় হয় না। আমরা সোজা এক টেবিল বলিয়াই আভাসে পাই।

এই ভাগের শেষ পরিচ্ছেদে দার্শনিক প্রক্রিয়ার (philosophic method) কথা আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে হোয়াইটহেড আধুনিক দর্শনের দুইটী ভুল দেখাইয়াছেন। প্রথমটী এই যে, আমরা মনে করিয়া থাকি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত দেহ দিয়াই আমরা বিশ্বকে অনুভব করি। দ্বিতীয় ভুল এই যে, আমরা ভাবি, অনুভূতির স্বরূপ শুধু অন্তর্নিরীক্ষণ (introspection) দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি। যে সব অনুভূতি সজ্ঞানে হয়, তাহাই অন্ত-র্নিরীক্ষণ দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে; তাহা অতি সামান্য মাত্র। আমাদের বোঝা উচিত, আমাদের অনুভূতি অতি নিবিড় ভাবে সমস্ত শরীর হইতে উঠিতেছে। ইহার জন্যই এত সহজে আমরা আমাদের নিজকে শরীরের সঙ্গে একীভূত বলিয়া মনে করি।

চতুর্থ ভাগ

গ্রন্থের শেষভাগে সত্য, সৌন্দর্য্য, শান্তি প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

কোন আভাস যখন বাস্তবের অনুযায়ী হয়, তখন তাহাকে সত্য বলা যায়। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে, যদি দুইটী বিষয় এমন হয় যে, তাহারা একটী অন্যটীর অঙ্গীভূত না হইলেও তাহাদের মধ্যে আকারের ঐক্য রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধ আছে, যাহাকে আমরা সত্য বলিয়া অভিহিত করি। এখানে বলা হইল, যে কোন দুই বিষয়ের মধ্যেই সত্যের সম্বন্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা বাস্তবের সঙ্গে আভাসের সম্বন্ধ-বিশেষকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকি।

আমরা সাধারণতঃ কোন কথা বা প্রতিজ্ঞা (proposition) অথবা প্রত্যক্ষজ্ঞানের (perception) সম্পর্কে সত্য মিথ্যার কথা ভাবিয়া থাকি। 'প্রতিজ্ঞা' সম্বন্ধে হোয়াইটহেডের মত অন্যান্য তার্কিকদের মত হইতে অনেকটা ভিন্ন। সে সবের আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটি এই বলিতে পারা যায় যে হোয়াইটহেডের মতে কোন বর্ত্তমান বস্তুই প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য (subject) হয় এবং কোন নিত্য বিষয় প্রতিজ্ঞার 'বিধেয়' (predicate) হইয়া থাকে। যে নিত্য বিষয়টী প্রতিজ্ঞার বিধেয়, তাহার দৃষ্টান্ত (instance) রূপে যদি উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা সত্য হয়।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে, হোয়াইটহেডের মতে, আমরা শরীরে যাহা অনুভব করিয়া থাকি, তাহাই সমকালীন বাহ্যদেশে আরোপ করিয়া থাকি। ইহাতেই আভাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যাহা আমরা আভাসে পাই, তাহা কি বাহ্য-দেশের গঠনে বা উপাদানে কোন রকমে নিহিত আছে? হোয়াইটহেড বলেন, এই রকম আছে বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু আভাসে যাহা আছে, তাহা যদি বাস্তবে না থাকে, তবে আভাস বাস্তবের অনুযায়ী কি করিয়া হয়? এই কথার আলোচনায় সৌন্দর্য্যের কথা উঠে।

যখন প্রত্যেক অবয়ব অবয়বান্তরের উপযোগী (adapted) হইয়া উঠে, তখনই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। উপযোগী হওয়ার অর্থই কোন উদ্দেশ্যের

উপযোগী হওয়া। এখানে এক অন্যের উপযোগী হওয়ার অর্থ কি ? একের অনুভূতিতে যদি অপরের অনুভূতি লোপ পাইয়া বা ম্লান হইয়া না যায়, তাহা হইলেই তাহারা পরস্পরের উপযোগী হইল বুঝিতে হইবে। যখন শুধু অবয়ব নিয়া কথা, তখন আমরা গৌণ অর্থে সৌন্দর্য্য পাই। বিভিন্ন অবয়বের বিভিন্ন অনুভূতি হইতে পূর্ণাবয়বীরও এক অনুভূতি আমাদের হইয়া থাকে। পূর্ণাবয়বীর এক অনুভূতি দ্বারা যদি বিভিন্ন অবয়বের বিভিন্ন অনুভূতি স্পষ্ট ও গভীরতর হইয়া উঠে এবং সেই রকম যদি বিভিন্ন অবয়বের বিভিন্ন অনুভূতির দ্বারা পূর্ণাবয়বীর এক অনুভূতি স্পষ্ট ও গভীরতর হইয়া উঠে তাহা সকলেই মুখ্য অর্থে আমরা, সৌন্দর্য্য পাই। পরস্পরের সহিত মিল বা সামঞ্জস্যই (harmony) সৌন্দর্য্যের প্রাণ।

সৌন্দর্য্য সত্য হইতেও ব্যাপক ও গোড়ার কথা। সত্য শুধু বাস্তবের সহিত আভাসের সম্বন্ধেই পর্য্যবসিত। কিন্তু সৌন্দর্য্য বাস্তবের নানা অংশের পরস্পর সম্বন্ধ, আভাসের নানা অংশের পরস্পর সম্বন্ধ এবং বাস্তবের সহিত আভাসের সম্বন্ধ এই সকলের সঙ্গেই সংস্পৃষ্ট। সত্যের অন্য প্রয়োজনও থাকিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য্যানুভূতির অন্য কোন প্রয়োজন নাই; ইহা এক প্রকারের পরমার্থ বলিলেও চলে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের জন্য সত্যেরও আবশ্যক আছে; এ সত্য ততটা বৌদ্ধিক নয়, যতটা আনুভূতিক। যে সত্যে সৌন্দর্য্য নাই, তাহা অতি তুচ্ছ। যে সৌন্দর্য্যে সত্য নাই, তাহা অত্যন্ত হালকা। তাই আভাসের নিজের সৌন্দর্য্য থাকিলেও, তাহা বাস্তবানুযায়ী না হইলে সেই সৌন্দর্য্যের গভীরতা বা গাম্ভীর্য্য বা বিরাটত্ব (massiveness) থাকে না। (আভাসিক সৌন্দর্য্যের গভীরতা দিয়াই কি আভাসের বাস্তবানুযায়িত্বরূপ সত্যতা বুঝিতে হইবে ?)

হোয়াইটহেডের মতে যে সমাজে সত্য, সৌন্দর্য্য, কলা, উদ্ভাবনী-চেষ্টা (adventure) ও শান্তি, এই পাঁচটী গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সভ্য বলা যায়। জগতে কিছুই যখন স্থির হইয়া নাই, সমস্ত বস্তুই যখন চলন্ত, তখন সভ্যতা কখনই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইবে, অথবা অবনতির দিকে যাইবে।

যাহা কিছু ঘটে, তাহাই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যাহা কিছু সম্ভবপর, তাহাই

ঘটে না। কোন স্থলবিশেষে হাজার বস্তু সম্ভবপর হইলেও এক বস্তুই অন্য সবকে ঘটিতে না দিয়া বাস্তবে ঘটিয়া থাকে। যেখানে যাহা ঘটে, সেখানে অন্য অনেক কিছু হইতে পারিত, এবং তাহাদের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই থাকে। সুতরাং যেখানে কোন রকমের সভ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে অন্য অনেক রকমেরও সম্ভাবনা থাকে। যাহা সম্ভবপর, তাহা বাস্তবে পরিণত করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। একই রকমের সভ্যতার যদি বারবার পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে, তবে তাহা প্রথমে যতই ভাল হউক না কেন, আস্তে আস্তে সব সরসতা হারাইয়া বিরক্তিকর ও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। কোন সভ্যতার সজীবতা রক্ষা করিতে হইলে তার মাঝে উদ্ভাবনী-চেষ্টার বীজ থাকা চাই। নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার, নূতন পথে চলিবার, সামর্থ্য না থাকিলে কোন সভ্যতাকেই বাঁচাইয়া রাখা যায় না। শিল্পকলাও সভ্যতার এক বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু এই সব থাকিলেও যদি শান্তি না থাকে, তবে সভ্যতার পূর্ণতা-লাভ হয় না। শান্তির অনুভূতি গভীর তাত্ত্বিক দৃষ্টি (metaphysical insight) হইতে আসে। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টি কথায় প্রকাশ করিবার ব্যাবহারিক জ্ঞানের মত নয়। ইহা এক রকমের অসীমের উপলব্ধি, যাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত দাবী-দাওয়া চুপ হইয়া যায়, এবং বিশ্বের অন্তরে যে নানা বিরোধের উপরেও সামঞ্জস্য বিরাজমান রহিয়াছে, তারই অনুভূতি আমাদের প্রাণে আসে।

এই গ্রন্থে হোয়াইটহেড নানা গূঢ় ও সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সেগুলি শুধু তাঁহার পুস্তক মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। হোয়াইটহেডের বক্তব্য ইংরেজীতেও সহজভাবে ব্যক্ত করা কঠিন। উপরে যাহা লেখা হইল তাহা হইতে কোন রকমের অর্থবোধ হয় কি না এবং তাহাতে হোয়াইটহেডের মতামতের কোন আভাস পাওয়া যায় কি না সহৃদয় পাঠক প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন।

শ্রীরাসবিহারী দাস

রবীন্দ্রকাব্যে তত্ত্ববিচার

রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে যে সত্ত্ব যে তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা লইয়া ইতিপূর্ব্বেই কিছু কিছু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং কবিই তাঁহার কোনোকোনা প্রবন্ধের মধ্যে (যথা "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে, "আমার ধর্ম্ম" প্রবন্ধে এবং কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত "মানুষের ধর্ম্ম" শীর্ষক বক্তৃতাগুলিতে) তাঁহার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূলকথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমালোচকেরাও এই তত্ত্বটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন; এই আলোচনাগুলির সারমর্ম্ম পরিস্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিকাশ ও বিভিন্ন তত্ত্বের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে ও বিস্তারিতভাবে আমূল বিচারের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। এই বিষয়ে যতবেশী বিভিন্ন দিক দিয়া যত গভীরভাবে আলোচনা হইবে ততই আমাদের ধারণা আরো সুস্পষ্ট হইবে, অন্যদিকে খণ্ড কবিতা ও খণ্ড রচনাগুলিরও তাৎপর্য্য ও অর্থগ্রহণও আমাদের পক্ষে আরো সরল হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব্যাপকভাবে এই রচনাগুলির ক্রমপরিণতি অনুসারেই আলোচনার পক্ষপাতী, বস্তুতঃ এইরূপ আলোচনাতেই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল পাওয়া যাইতে পারে। কবি তাঁহার একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে এই কথাই লিখিয়াছেন ঃ—

"খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্য্যটি কি তাহাও আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি;—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।"

গদ্যপ্রবন্ধগুলি এ বিষয়ে অনেক সাহায্যই করিবে, কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে কবিতাতেই কবির জীবনের সত্য অনেক ভালো করিয়া ফুটিয়াছে, সাহিত্যরচনাতেই কবির সর্ব্বাপেক্ষা সত্য পরিচয় পাওয়া যাইবে, অন্যত্র নহে ঃ

"যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্ম্মব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি। সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে

ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লোকের প্রকৃতি নিজের পরিচয় দেয়—সেটা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্চি।" (সবুজপত্র, ১৩২৪, ৩৯৭ পৃঃ)

এখানে আমরা কবির সাহিত্যরচনা এবং সমালোচকগণের ব্যাখা উভয়েরই উপর নির্ভর করিয়া কবির তত্ত্বকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমালোচকদের মধ্যে প্রথমেই পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতে হয়। বস্তুতঃ কবির রচনাগুলির স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির ধারাকে অবলম্বন করিয়া আলোচনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন বোধহয় তিনিই করেন। ব্যাপকভাবে সমগ্র কাব্যগ্রন্থটির ব্যাখ্যার সূত্রপাত তিনিই করিয়া গিয়াছেন।

১৩১৮ সালে অজিতবাবুর "রবীন্দ্রনাথ" প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তাহার কয়েক বৎসর পরে "কাব্যপরিক্রমা" বাহির হয়। তাহার পর ত কত বৎসরই অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অজিতবাবুর প্রবন্ধগুলিই রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার পক্ষে আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়।

সম্প্রতি "কাব্যপরিক্রমার" দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই উপলক্ষে গ্রন্থখানি আবার পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। অজিতবাবুর অন্যান্য রচনাও এই সঙ্গে পড়িয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থে অজিতকুমার নানাস্থলে বারবার করিয়া রবীন্দ্রকাব্যের মূলসুরেরই দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; আমরা প্রথমে এইটিকেই বুঝিতে চেষ্টা করিব। অজিতকুমার লিখিতেছেন ঃ—"বিশ্বকে, মানুষের জীবনকে নানাদিক দিয়া উপলব্ধি করিয়া এই ব্যাকুলতাই কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে উৎসারিত করিয়াছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।......কবির কাব্যের মধ্যে আমরা তাঁহার সেই বিশ্ব-অভিসার-যাত্রার ভ্রমণের ইতিহাস দেখিতে পাই।......আমরা তাঁহার সমস্ত কাব্য-গ্রন্থাবলীতে ইহাই দেখিয়াছি—বিশ্ব-উপলব্ধির জন্য উৎকণ্ঠা এবং বারম্বার তাহার বাধা হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াস।"

কিন্তু এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূলসুরটির সন্ধান করিতে গিয়া অজিতকুমার কাব্যের অন্যান্য দিকে দৃষ্টি না দিয়া কাব্যের তত্ত্বের দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন, কাব্য-হিসাবে রচনাগুলির বিচার না করিয়া এই তত্ত্ব লইয়াই

ব্যস্ত আছেন। আমাদের দেশের ও পশ্চিমের ধর্ম্ম দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের নানা মতামত ও তত্ত্ব আনিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাতে আমরা তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গভীর চিন্তাশীলতারই পরিচয় পাই। তবে কোনো কোনো স্থলে এই নিছক তত্ত্বালোচনা, কবিতার মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্বেষণের চেষ্টা, কাব্যের রসগ্রহণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে নাই। জটিল তত্ত্বের অবতারণা অনেকসময়েই কবিতাগুলিকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিবার অন্তরায় হইয়াই উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "জীবনদেবতার" আলোচনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে "কাব্য-পরিক্রমা"র "নিবেদনে" অজিতকুমার নিজেই বলিয়াছেন ঃ—"জীবনদেবতার তত্ত্ব সম্যক বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া অনেকে উহা অলস কল্পনা মাত্র মনে করেন। এ কালের জীবতত্ত্বে অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা হইতে মনস্তত্ত্বে ব্যক্তিত্বের মূল ও মানবচৈতন্য-সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে, "জীবনদেবতা"র ভাবের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহার প্রসঙ্গে সেই সকল তত্ত্বের আলোচনা উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

"জীবনদেবতা" প্রবন্ধের প্রায় গোড়াতেই অজিতকুমার বলিতেছেন ঃ—"জীবনদেবতার আইডিয়ার সঙ্গে যদি দর্শনবিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখা যায় তবে ইহাই বলিব, যে এ আইডিয়াটী সত্য, এ নিছক কল্পনা নয়।" পরে এই বিষয়ে অবতরণ করিয়া সমালোচক ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, তাঁহার পরবর্ত্তী চেলাদের মতামত, স্যামুয়েল বাট্‌লার, ফেক্‌নার, ব্যর্গসঁ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের তত্ত্ব লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন। অথচ এই যে এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ করিয়া জীবনদেবতার আইডিয়াটির সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এই আলোচিত তত্ত্বগুলির মূল্য এখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে। পরিশিষ্টে অজিতকুমার নিজেই লিখিয়াছেন, "জীবনদেবতা প্রবন্ধে আমরা জীবতত্ত্বের যে সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছি তাহা পণ্ডিত-সমাজে এখন অগ্রাহ্য।...শুধু জীবতত্ত্ব নয়, মনস্তত্ত্বেও ঠিক এই রকম একটা মতের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।"

বস্তুতঃ কবির জীবনে যে সত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রমাণের জন্য দর্শন বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্বেষণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কবির

আইডিয়া সর্ব্ব কালেই সর্ব্ব অবস্থাতেই সত্য, তাহার প্রমাণপত্র কাব্যের ভিতরেই রহিয়াছে। তাহাকে নিছক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বসম্বন্ধে প্রথম আলোচ্য বিষয় তাঁহার কাব্য এবং তাঁহার জীবন এই উভয়ের যোগাযোগ।

সাধারণভাবে কাব্য ও জীবনের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয়ে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির এই দুই বিকাশের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে হইবে। এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সমালোচকগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

প্রথম যৌবন হইতেই কবি একথা বলিয়া আসিতেছেন যে তাঁহার সাহিত্য-রচনা তাঁহার জীবনেরই বহিস্ফুরণ। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে (সন্ধ্যা-সঙ্গীতের যুগে) প্রকাশিত বিবিধপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"এ গ্রন্থ মনের ইতিহাসের এক অংশ। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে মনের গঠনকার্য্য চলিতেছে। এই মহাশিল্পশালা এক নিমেষকালও বন্ধ থাকে না। এই কোলাহলময় পৃথিবীতে লক্ষলক্ষ কোটিকোটি মানবের অভ্যন্তরে অনবরত কি নির্ম্মাণকার্য্যই চলিতেছে। অবিশ্রাম কত কি আসিতেছে, যাইতেছে, ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, বর্দ্ধিত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল পরিবর্ত্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে।" (বিবিধ প্রসঙ্গ, সমাপন, ১৪৩ পৃঃ)

অনেক বৎসর পরে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থেও কবি এইভাবের কথা বলিয়াছেন ঃ—

"জগতের মধ্যে যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে—সেই অনির্ব্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে ;—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে ; যাহা চোখের সম্মুখে মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে ; যাহা অশরীর-ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহা যদি কবির কাব্যে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে ;—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী।" (বঙ্গভাষার লেখক [১৩১১] ৯৮৩-৯৮৪ পৃঃ)

এ বিষয়ে অজিতকুমার লিখিতেছেন :—

"কবির কাব্য-রচনা ও জীবন-রচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই কাব্যে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।"..."রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে এমন একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলে নাই।"........"কোন কবির কাব্য যে তাঁহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোন অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কোন কবির জীবনে ঘটিয়াছে কিনা জানি না।" (কাব্য-পরিক্রমা, ১৫৭-১৫৮ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনার মধ্যেই তাঁহার জীবনের ছবি কিছু পরিমাণে দেখা দিয়াছে; পরিণত জীবনের কোন কোন কাব্যে ইহা অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অজিতকুমার লিখিয়াছেন ঃ—"গীতাঞ্জলির এই সাধনার কবিতাগুলি——ইহাই আশ্চর্য্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। এ যেন কবির প্রতিদিনের ডায়ারী—শুধু প্রভেদ এই যে মানুষ ডায়ারী লিখিবার কালে প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু সচেতন না হইয়া পারে না। এই কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে।" (কাব্য-পরিক্রমা, ১৪০-১৪১ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ জীবনরসের রসিক, "জীবন-শিল্পী"; তাঁহার কাব্যে যেমন তাঁহার জীবনের প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহার জীবনও একখানি কাব্য। "রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে এবং অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁর জীবন।" (জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন, এই উভয়ের যোগাযোগ, পরস্পরের সম্বন্ধ ও প্রভাব এবং বিকাশের ও পরিণতির আসল প্রকৃতি, এ সকল বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা নিতান্তই প্রয়োজন।

আরেকটি আলোচ্য বিষয়, রবীন্দ্রনাথের রচনার মূল সুর। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা। এই আলোচনার

মধ্যেই অন্যান্য কথাগুলি আসিয়া পড়িতেছে, নানাদিক দিয়া ইহাকেই স্পষ্ট করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

অজিতকুমার বলিতেছেন :—

"আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এই সর্ব্বানুভূতিই কবির জীবনের ও কাব্যের মূল সুর ; অন্যান্য সমস্ত বৈচিত্র্য—সৌন্দর্য্য, প্রেম, স্বদেশানুরাগ, সমস্ত সুখ দুঃখ বেদনা এই মূল সুরের দ্বারা বৃহৎ বিশ্বব্যাপী একটি প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে সন্ধ্যা-সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকল কাব্যের মধ্যেই যেখানেই জীবন কোন প্রবৃত্তির ভিতরে বাঁধা পড়িতেছে, সেইখানেই আপনার অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া আপনার চেয়ে যাহা বড় তাহাকে পাইবার কান্না লাগিয়াই আছে, এই মূল সুরের মধ্যেই সেই ক্রন্দনের অর্থ নিহিত। এই সুরই কবির জীবনের সকল বিচিত্রতাকে গাঁথিয়া তুলিয়াছে—এই সুরই বারম্বার ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছাড়াইয়া বিরাটের সঙ্গে তাঁহার জীবনকে যুক্ত করিয়াছে।" (রবীন্দ্রনাথ, পৃ: ১২-১৩)

এই "সর্ব্বানুভূতি"র প্রকৃত পরিপূর্ণ অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রকৃতির সঙ্গে যোগের ভাবকে অজিতকুমার একস্থানে সর্ব্বানুভূতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। "সমস্ত জলস্থল আকাশকে সমস্ত মনুষ্য-সমাজকে আপনার চৈতন্যে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই সর্ব্বানুভূতি।" অন্যত্র বলিতেছেন ঃ—"এই সাধনার মধ্যে কবি এখনও নিমগ্ন হইয়া আছেন, সকল সত্যকে রসময় করিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার সাধনায়, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে মানব ইতিহাসকে একের মধ্যে অখণ্ড করিয়া বোধ করিবার সাধনায়।" এই পরম একের উপলব্ধিই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এই সর্ব্বানুভূতির মূল কথা এই যে, সকলকে লইয়াই অনন্ত, সীমাকে লইয়াই অসীম, অসীমের মধ্যে যেমন সীমা বিরাজ করিতেছে, তেমনই সীমার মধ্যে অসীম তাঁহার আপন সুর বাজাইতেছেন। "সীমা সীমাবদ্ধ নহে তাহা অতল-স্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে।" (জীবন-স্মৃতি, পৃঃ ১৭১)

মহর্ষির জীবনেও এই সাধনাই দেখিতে পাই, এই পরম সত্যের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি, শ্রেষ্ঠ বিকাশ তাঁহার একটি উক্তির মধ্যে দেখিতে পাই ঃ— "সাধকদিগকে এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই

ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন।.........আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারিনা। কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তরে ভাবি, কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের বাহিরে ভাবি, কখনো ভাবি যে তিনি আপনাতে আপনি রহিয়াছেন। কিন্তু একই সময়ে সেই অবাতপ্রাণিত নিত্য জাগ্রত পুরুষ আপনাতে আপনি শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, আমাদের অন্তরে জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন, এবং বহির্জ্জগতে জীবের কাম্য বস্তু সকল বিধান করিতেছেন।......... যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান—দেখিতে পান যে তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, তিনিই পরম যোগী।——তিনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" (অজিতকুমারের 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,' ১৯০-১৯১ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এই তিনেরই উপলব্ধি, তিনি সব কিছুর বাহিরে একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন, বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি অসীমেরই আনন্দের প্রকাশ দেখিতেছেন, আবার মানব-ইতিহাসে এবং নরনারীর হৃদয়ের খেলায় বিরাট পুরুষের চিন্ময়তার ও প্রেমের পরিচয় পাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে যে বিশ্বাতীত আছেন সেই অনন্তেরও পূজারী। এই কথাটিই ভাল করিয়া বুঝিতে চাই।

প্রথম যৌবনে কবি ব্রহ্মের যে আভাস পাইয়াছিলেন, তাহা কেবল "বৃহতের আস্বাদনে", "বিরাট অসীমের সহিত একান্ত যোগে"। মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির কবি না বলিয়া আকাশের কবি বলিতেই ইচ্ছা হয়। জানিনা, শেলী ও হুইট্ম্যান্ ব্যতীত আর কোন্ কবি বলিতে পারিতেন ঃ—

আঁধার কোণে থাকিস্ তোরা,
জানিস কিরে কত সে সুখ,
আকাশ পানে চাহিলে পরে
আকাশ পানে তুলিলে মুখ !
সুদূর দূ-র, সুনীল নী-ল,
সুদূরে পাখী উড়িয়া যায় !
সুনীল দূরে ফুটিছে তারা
সুদূর হতে আসিছে বায়।
... ...

চাহিয়া আছে আমার মুখে
কিরণময় আমারি সুখে
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে।
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ ভরা প্রাণ।...
(প্রভাত সঙ্গীত, ১৮০৫ শক, ১১৩-১১৪ পৃঃ)

আকাশ তাঁহাকে কী গভীর টানেই টানিয়াছে ; "আকাশের পাখী" আকাশে বিচরণ করিয়াই আনন্দ পাইয়াছেন, অসীম-নীলিমা-পিয়াসী কবি অনন্তনীল আকাশেই আত্মার তৃপ্তি পান ঃ

আকাশের পাখী তুমি ছিলে···
(মানসী—কবির প্রতি নিবেদন)
আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী
(হৃদয় আকাশ—কড়ি ও কোমল)
দেখি দেখি আরো দেখি
অসীম উদার শূন্যে
আরো দূরে—আরো দূরে যাই—
দেখি আজ এ অনন্তে
আপনা হারায়ে ফেলে
আর যেন খুঁজিয়া না পাই।—
অসীমে সুনীলে শূন্যে
বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
তারে যেন দেখা নাহি যায়—
নিশীথের মাঝে শুধু
মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবিয়ে কোথায়
... ...
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিশায়ে মিলায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।
(পূর্ণিমায়—ছবি ও গান)

বিশাল আকাশে কবি যে আনন্দ পাইয়াছেন, যে স্বাধীনতার যে বৃহতের আস্বাদন, সেই আনন্দই সকলের হৃদয়ে বিলাইয়া দিতে চান। তিনি অনন্তের কূলে কুসুম তুলিয়া ছোট ছোট ফুলে মালা গাঁথিতেছেন, তাঁহার আশা আছে ঃ

ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা,—গভীর আশ্বাস,
মনে আনে রবিকর নিমেষ স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

(ছোট ফুল—কড়ি ও কোমল)

বৃহৎ আকাশের আনন্দ অমৃত ধারার আস্বাদ পাইয়া কবির যে অনির্ব্বচনীয় উল্লাস ও আনন্দ তাহা অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে, নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্র 'খেয়া' হইতে উদ্ধৃত ঃ

আজ কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জ্জন গান?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরাণ?
গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,
শব্দবিহীন শূন্যপরে
ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে,
সঙ্গীবিহীন নির্ম্মমতায়
মিশে যাব অবাধ সুখে,
উড়ে যাব ঊর্দ্ধমুখে,
গেয়ে যাব পূর্ণ সুরে
অর্থবিহীন কলকথায়?
আপন মনের পাইনে দিশা,
ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা,
যখন করি বাঁধনহারা
এই আনন্দ-অমৃত-পান।

(নীড় ও আকাশ)

অসীমের ক্ষুধা বৃহতের পিপাসা অতি প্রবল ভাবেই কিশোর কবির চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল ; বাহিরের সঙ্গে তাঁহার জীবনের একটি অতি সহজ যোগ ছিল ; কিন্তু ইহাকে ঠিক সর্ব্বানুভূতি বলা যায় না ; এ যেন কেবলমাত্র বাহিরের দৃষ্টিতেই জগৎকে দেখিবার প্রয়াস, সমস্ত চিত্ত, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বিশ্বকে প্রাণে লইবার বাসনা নয় ; এই ব্যাপ্তি অনির্দ্দিষ্ট আভাসেরই ব্যাপ্তি। কিন্তু কবি এ অবস্থাকেও অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাঁহার চিত্ত জাগিয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত তাঁহার সহযোগটি হারাইয়া গেল।

আবার প্রভাত-সঙ্গীতে কবি আপনাকে ফিরিয়া পাইলেন, তাঁহার শিশুকালের বিশ্বকে আবার নূতন করিয়া পাইলেন। সীমার সমস্ত বন্ধন, সমস্ত তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের আনন্দরূপটি হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন।

"দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত।......শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।...... এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানা লোকালয়ে নানা কাজে নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।......সেই পৃথিবী-ব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ-চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য্যনৃত্যের আভাস পাইতাম।" (জীবনস্মৃতি, ১৫৬-৭ পৃঃ)

আকাশের অসীমের ব্যাপ্তি অপেক্ষা সীমার মধ্যেই অসীমের গভীরতাই এখন কবির চিত্তকে আকর্ষণ করিত। "নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। ...এক এক দিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত, দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে।" পূর্ব্বে বৃহৎকে অনন্তকে দেখিবার জন্যই ব্যাকুলতা ছিল, এখন সেই বিশ্বের বৃহতের অনন্তের মধ্যে বিধৃত প্রত্যেকটি সীমাবদ্ধ বিশেষকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, সীমার মধ্যেই অসীমের খেলা দেখিতে পাইলেন ; অশেষ যে বিশেষের বাহিরে নহে, তিনি যে বিশেষকে লইয়াই আছেন, তাহার স্পষ্ট আভাস পাইলেন। হৃদয়ের পথ দিয়াই

অসীমের পরিচয় পাইলেন। "একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবী করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোন কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়।...প্রেম একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষবিশেষের মধ্য দিয়াই অপ্রত্যক্ষ অশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন সে যাহা পায় তাহা কেবল নিজের মনের একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে—বাহিরের সহিত, প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবটি সর্ব্বাঙ্গীণ সত্য হইয়া উঠে।" (জীবনস্মৃতি, ১৬১ পৃঃ)

কবি যখন 'প্রভাত-সঙ্গীত' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিতেছিলেন, তখন "আলোচনা" শীর্ষক ছোট ছোট গদ্য প্রবন্ধে এই নাটিকাখানির ভিতর-কার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ-গুলিতে রবীন্দ্রনাথ সীমার অসীমের সহিত মিলনের কথাই লিখিয়াছেন, এবং সেই সময়ে এই তত্ত্বটির প্রকাশ এখানেই পূর্ণভাবে পাওয়া গিয়াছিল।

"আলোচনা"র কথা এখানে বিস্তৃতভাবে লিখিবার প্রয়োজন নাই; তবে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কাব্যগুলির ভিতরকার ভাবের এমন সহজ সুন্দর তত্ত্বব্যাখ্যা ত বেশী দেখি নাই। যে তত্ত্ব তাঁহার অধিকাংশ রচনার মধ্যে পাই, সেই সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সৌন্দর্য্যস্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটী বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি নিঃশ্বাস পূরিতেছেন এবং ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন সুর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্য্যই তাঁহার আহ্বানগান। সৌন্দর্য্যই সেই দৈববাণী।......সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে? জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে, 'রাধে, তুমি আমার,'—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—'তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস।'......জগতের সৌন্দর্য্য অসীম সৌন্দর্য্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্য্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র শোভায় তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই আজ জগতের সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর দেখিতেছি। আমাদের হৃদয়ও যদি সুন্দর না হয়, তবে তিনি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিবেন?

অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্য্যের মালা লইয়া মালা-বদল করিয়াছে। তিনি নিজের সৌন্দর্য্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিবাহ-বন্ধন।*

(রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ, আলোচনা, ১১৭০-১১৭১ পৃঃ)

মিষ্টিসিজমের ভিতরকার কথা এইটিই, লীলাতত্ত্বেরও কথা ইহাই। শ্রীমতী ইভেলিন আন্ডারহিল্ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন ঃ—

Mystical thinkers agree in thinking that there is a mutual attraction between the Spark of the soul, the free divine germ in man, and the fount from which it came forth. "We long for the Absolute only in so far as in us the Absolute also longs, and seeks, through our very temporal striving, the peace that is now here in time, but only, and yet absolutely in Eternity". "He it is that desireth in thee and He it is that is desired. ·He is all and He doth all if thou couldst see Him." The Homeward journey of man's spirit, then, due to the push of a divine life within answering to the pull of a divine life without···Thou needst not call Him from a distance; to wait until thou openest is harder for Him than for thee. He needs thee a thousand times more than thou canst need Him.

(An Introduction to Mysticism, pp. 158-159)

অজিতকুমার "কাব্য-পরিক্রমার"র "গীতিমাল্য" প্রবন্ধটিতে বৈষ্ণব-তত্ত্বের সার কথাটি অতি সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

লীলাতত্ত্বের কথা এই যে, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল বস্তু, সকল বৈচিত্র্য, মানব-জীবনের সকল ঘটনা, সকল উত্থান পতন, সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু—সমস্তই শ্রীভগবানের রসলীলা বলিয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। ভগবান অনাদি অনন্ত নির্ব্বিকল্প হইয়াও প্রেমে অনন্তের মধ্যে ধরা দিয়াছেন; সেইজন্যই তো কোথাও অন্তের আর অন্ত পাওয়া যায় না।... সমস্ত জীবনের এই সুখ-দুঃখ-বিচিত্র পথ তাঁহারি অভিসারের পথ। এই পথেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলন; এই পথেই কত বিচিত্র রূপ ধরিয়া তিনি দেখা দিতেছেন। এই যে বিশ্ব ও মানবজীবনের সকল বৈচিত্র্যকে ভগবানের প্রেমের লীলা বলিয়া অনুভূতি, বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের ইহাই সার কথা। (কাব্যপরিক্রমা, ১৫০ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যের ক্রমপরিণতির ধারাটির স্বরূপ কি? কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার জীবনে অনেকগুলি অবস্থা, অনেকগুলি স্তর দেখা গিয়াছে, তিনি ক্রমাগতই তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর

হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি বার বার প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যে, সমগ্রের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। "নদীর বাঁকের মত ক্রমাগত একটা হইতে অন্যটায়, একরস হইতে অন্য রসে তাঁহার স্বভাব আপনার সার্থকতা খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে এবং অবশেষে ধর্ম্মের মধ্যে আপনার সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।" কোনও সমালোচক নাকি একথাও ভাবিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্য একদা নিসর্গ ও নারীর বন্ধনে রূপজগতে আবদ্ধ ছিল, তাহারপর একদিন মুক্তিলাভ করিয়া তাহা অরূপের পথে যাত্রা করিল এবং অবশেষে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া অরূপের প্রেরণায় তাহা নবরূপ পরিগ্রহ করিল।

কেহ কেহ এইভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া কবির কাব্য ও জীবনের আলোচনা করিয়াছেন। তবে কবি স্বয়ং এভাবে আলোচনা করিতে চাহেন না। "আমি আত্মাকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে, বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।" (বঙ্গভাষার লেখক, ৯৭৭ পৃঃ) "এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি।" (৯৮১ পৃঃ)

বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে পাইবার জন্য তিনি চিরকালই ব্যাকুল, এই বৃহৎ বিরাটের ব্যাপ্তিই তাঁহাকে প্রথমে আকর্ষণ করিয়াছিল, বাহির, বাহির বলিয়াই, তাঁহার প্রিয় ছিল, দূর, দূর বলিয়াই, তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিল। তাঁহার কবি-জীবনের প্রারম্ভে সীমা ও রূপের জগতে তিনি আবদ্ধ ছিলেন একথা বলা যায় না, বরং ইহাই বলিতে হয় যে "প্রভাত সঙ্গীতের" কবি অসীম সুদূরের পিয়াসীরূপেই দেখা দিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার প্রাণ-নির্ঝরিণী যখন গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন হইতেই তাঁহার পরিপূর্ণ জীবনের প্রথম প্রকাশ। দৃষ্টির এই আকস্মিক আবরণ উন্মোচন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই আনন্দময় উপলব্ধি, এইটি প্রথমে অখণ্ডভাবে দেখা দিয়া তাহারপরে জীবনের বিচিত্রতায় খণ্ড খণ্ড পথ বাহিয়া আবার ঐ অখণ্ড সৌন্দর্য্যের দৃষ্টিলাভ করিবার দিকে শেষ বয়সে কবিকে তপস্যায় নিযুক্ত রাখিয়াছে। এক মুহূর্ত্তেই কবি অসীমের একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে

পাইলেন, কেবল যে অসীমকে দেখিতে পাইলেন তাহা নয়, অসীমের মধ্যে বিধৃত সীমারও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিল ; সে সৌন্দর্য্য, সে মাধুর্য্য অসীমেরই ; বিশ্বপ্রকৃতিতে সর্ব্বত্র কণায় কণায় যে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া আছে, আবার মানবজগতের অন্তরে অন্তরে সেই মাধুর্য্য, সেই প্রেম, সেই অনির্ব্বচনীয় রসধারা প্রবাহিত হইতেছে।

"দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্য্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সে দিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ীর দেয়ালগুলো পর্য্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে স্বরূপ কখনও তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময় সুন্দর।... দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত।...আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।...সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া চলিয়াছে।...একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম।... বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটিকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে আমরা যখন পরম পরিণামটিকে যেন অনির্ব্বচনীয় রূপে জানিতে পারি।" (জীবনস্মৃতি)

"সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূতভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।"

(মানুষের ধর্ম্ম, পরিশিষ্ট, ১০৫ পৃঃ)

আমরা যখন বলি যে মানবের আত্মা সীমা হইতে অসীমের দিকে, ক্ষুদ্র হইতে বিরাটের দিকে, অন্ত হইতে অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখনও বোধহয় পরিপূর্ণ সত্যটিকে বুঝাইয়া বলিতে পারি না, ত্যাগ করিয়া, অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়াটাই শেষ কথা নয়।

বোধহয় একথা বলিলে এ বিষয়টিকে খানিকটা বুঝিতে পারা যাইবে, যে সমস্ত কিছুকে, সমগ্রকে অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়াই জীবনের সার্থকতালাভ করা যায়, ত্যাগের দ্বারা নয়, বাসনা-রাহিত্যের দ্বারাই ; বর্জ্জনের দ্বারা নয়, গ্রহণের দ্বারাই বিশ্বকে ভোগ করিতে হইবে। "সংসারকে অতিক্রম করার অর্থ সংসারকে ব্রহ্মের মধ্যে সত্য করিয়া জানা।" সমস্ত

জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা অধিকৃত (inhabited) রূপে (ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং) দেখিতে হইবে, আবার সমস্ত জগতের অতীত বিরাট পুরুষকেও তাহার বাহিরে দেখিতে হইবে। তিনি যেখানে সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেখানে তিনি সত্য ; আবার তাহার বাহিরেও তাঁহার সত্তা চিরবিরাজমান। মানবের আত্মাকে এই বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধির সাধনা করিতে হইবে, আবার সেই বিশ্বাতীতেরও জন্য তাহার অসীম ক্ষুধা তাহাকে গভীরের স্পর্শ আনিয়া দিতেছে।

"Mystic পুরুষ ধ্যানশক্তিতে তার ফলাফলবিহীন সাধনায় বাস্তবের আবরণ একটার পর একটা যতই মোচন করেছে ততই রসের লোকে, অধ্যাত্মলোকে সে ভূমার পরিচয় পেয়েছে।··· পুরুষ Mystic, অতল রসের ডুবারী, ধ্যানী।··· পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গ'ড়ে তোলে। 'We are the dreamers of dreams', এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্ত্তির মধ্যে নিরন্তর রূপ পরিগ্রহ করচে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় ব'লেই বিশেষের অতিবাহুল্যকে বর্জ্জন করে।··· মোটকথা, বাস্তবের মধ্যে যে সব বিশেষের বাহুল্য আছে তা'কে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। এই জন্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্যা, এই জন্যে সন্ন্যাসের সাধনায় পুরুষের এতো আগ্রহ। এবং এই জন্যেই ভাবরাজ্যে পুরুষের সৃষ্টি এতো বেশী উৎকর্ষ এবং জ্ঞানরাজ্যে এতো বেশী সম্পদ লাভ করেছে।" (যাত্রী)

রবীন্দ্রনাথের এই সমগ্রের তৃষ্ণা, সমগ্রের দৃষ্টি, এই সমগ্রতার পিপাসা তাঁহার আত্মিক ও মানসিক বিকাশের, তাঁহার সাধনার একটি মূল কথা ; তিনি বাস্তবকে পরিপূর্ণ সত্যের দৃষ্টিতে দেখিতে চাহিয়াছেন, বাস্তবকে গ্রহণ করিয়াই তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন। "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থে "প্রণাম" কবিতাটিতে তাঁহার সাধনার কথাই প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশী কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে।···

রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রকে, বিশেষকে ধ্যানের দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, সেইজন্য তাহাকে সমগ্রের মধ্যে সত্যভাবেই দেখিতে পাইয়াছেন, এই সাধনই তাঁহাকে অবশেষে আবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যেই উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

"সুখ দুঃখ আলোক অন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে একে খণ্ডে খণ্ডে নানা সুরে এবং নানাছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে—অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দ্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।" (জীবনস্মৃতি)

সৌন্দর্য্য তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিয়াছে, এই সৌন্দর্য্যের সাধনায় তিনি অসীমেরই সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, সেখানেও তিনি অন্তরের আনন্দরসে অরূপ রতনেরই উপলব্ধি করিয়াছেন। রূপ সত্য হইতে পারে, রূপ পূর্ণতার একটি প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু রূপের মধ্যে সমগ্রের পূর্ণ প্রকাশ নাই, সেইজন্যই রূপের অন্তরালে আনন্দরূপমমৃতম্‌কে দেখিতে চাহিয়াছেন। "গীতায় আছে কর্ম্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্চে তার নিষ্কামরূপ। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্ম্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধ রূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয় "মা গৃধঃ", লোভ কোরো না। সৌন্দর্য্যভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম্ম" (যাত্রী)। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-ভোগের, সেই সত্যদৃষ্টির, সুন্দরের মধ্যে সেই অনন্তের স্পর্শ লাভেরই ইতিহাস।

তাঁহার মনে যখন প্রেম জাগিয়াছে, সেও তাঁহার অন্তরকেই জাগাইয়াছে, তাঁহাকে ক্ষুদ্রতার বন্ধনে বাঁধিতে পারে নাই।

"পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তা'র প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোন মেয়েকে ভালবাসে তখন তা'কে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বারবার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ান্ পড়ে দেখো। মেয়েরা একথা জানে। পুরুষের এই প্রার্থনা মেয়েদের বিশেষ করে সৃষ্টি করতে থাকে। কেননা প্রার্থনার বেগ প্রার্থনার তাপ, মানুষের সংসারে সৃষ্টির একটা প্রধান শক্তি।··· পুরুষের সংসারে সত্যকার মেয়ে তো কেবলমাত্র চোখের দেখার নয়, সেতো ধ্যানের জিনিষও বটে। সে যে শরীরী অশরীরী দু'য়ে মিলিয়ে, পৃথিবী যেমন নিজের মাটি ধুলো এবং নিজের চারদিকের অসীম আকাশ ও বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে।" (যাত্রী)

প্রেম ও সৌন্দর্য্যের এই তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। অতীন্দ্রিয় অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্যনীয় সত্যের সহিত অন্তরের সুগভীর মিলটিকে উপলব্ধি করিয়াই তিনি আত্মার তৃপ্তি পাইয়াছেন।

কবি প্রথম জীবনে সত্যবোধের যে আভাস পাইয়াছিলেন তাহা বৃহতের আস্বাদনে। অসীমের অনন্তের সমগ্রতার স্বাভাবিক পিপাসা তাঁহার জীবনেরই প্রেরণা, সেই পিপাসাই তাঁহাকে জীবনের পথে চালাইতেছে। তিনি ধ্যান-শক্তিতে বাস্তবের আবরণ মোচন করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, সীমার মধ্যেই অসীমের সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে উপলব্ধি করিতেছেন, আবার এইভাবে অসীম শূন্যতায় যে বিরাট অনন্ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার দিকেই ছুটিয়া চলিতেছেন। তাঁহার অন্তরের আনন্দ তাঁহাকে বাহিরের দিকেই লইয়া গিয়াছিল আবার সেই আনন্দই তাঁহাকে অন্তরের অভিমুখেই ফিরাইয়া আনিয়াছে।

বস্তুতঃ এই লীলা তাঁহার জীবনদেবতারই খেলা, তাঁহার দোসরেরই মায়া। তিনিই মানবের আত্মাকে বাঁধন পরাইতেছেন, আবার নিজেই সেই বাঁধন খুলিয়া দিতেছেন; তিনি স্বয়ং এই বাঁধন পরিতেছেন, আবার সেই বাঁধন হইতে লীলাভরে অন্তর্হিত হইতেছেন। "বিশ্ব খেলোয়াড়ের" এই খেলাই আমরা সর্ব্বত্র দেখিতেছি, "বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না।" (চতুরঙ্গ, ১০০ পৃঃ)

"হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী,-ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।" (পূরবী)

এই খেলার সাথী খেলাতেই নিমন্ত্রণ করেন, খেলার গুরু লীলার সঙ্গী হইতেই চাহেন ঃ—

"জানি জানি তুমি আমার চাওনা পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথী।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেবো তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশীর রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।" (খেলা, পূরবী ৮৯ পৃঃ)

এই লীলারই আর একটি অঙ্গ জীবাত্মার অনন্তকালে অনন্ত পথে যাত্রা এবং প্রত্যাবর্ত্তন ; কবির আত্মা পরমাত্মার সহিত একান্ত নিবিড় মিলন সম্ভোগ করিতেছিল, তথা হইতে বাহির হইয়া অনেক কালের যাত্রা অনেক দূরের পথ অতিক্রম করিয়া আবার সেই অন্তরের ঠাকুরের কাছেই ফিরিয়া আসে। লীলাতত্ত্বের এই দিকটি 'গীতিমাল্যে' প্রকাশ পাইয়াছে ঃ

"সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড় কঠিন সাধনা, যার
বড় সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে,
বাহির ভুবন ঘুরে মিলে
অন্তরের ঠাকুর॥

আমি আমায় করব বড়
এইত আমার মায়া ;—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙীন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে,
ডাকবে তারে নানা সুরে,
আপনারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া॥

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা,
দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা ;—
এরি মাঝে আপনাকে যে
বাঁধা রেখে বস্‌লে সেজে,
সোজা কিছুই রাখলেনা, সব
মধুর বাঁকে বাঁকা॥

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া আসায়
কাটে সকল বেলা॥

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ

শিক্ষা ও সমাজ *

বারট্রাণ্ড রাসেল অনেকদিন আগে সমাজের পুনর্গঠনের ধারা আলোচনা করিয়া স্বাধীনতার পন্থানির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর শিক্ষার সহিত স্বাধীনতার গভীরযোগ উপলব্ধি করিয়া তিনি সমাজ-গঠন হইতে শিক্ষার ক্ষেত্রে নামেন এবং তাঁহার কল্পিত স্বাধীনতার উপযোগী শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করেন On Education নামক গ্রন্থে। এই ধরণের শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এক বিদ্যালয়ও খুলিয়াছিলেন। সে বিদ্যালয়ের সফলতা বিচার করিবার সময় এখনও হয় নাই; তবে শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার মতামতের বিচারে তাঁহার শিক্ষায়তনের কথা ওঠে না। সম্প্রতি এ বিষয়ে তিনি Education and the Social Order নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার শিক্ষার ফিলজফির আর একটু বিস্তৃত ও নূতনতর পরিচয় পাওয়া গেল।

On Education গ্রন্থে তিনি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাসম্বন্ধে যে মত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা অল্পবিস্তরভাবে পাশ্চাত্যজগতের শিক্ষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা অনেক পূর্ব্বেই স্বীকৃত ছিল। শিশুর স্বাধীনতার দাবী সেদেশে অনেকদিন হইতেই শোনা গিয়াছে; এ বিষয়ে রাসেল অগ্রণী নহেন; বরং Rousseau-কে বর্ত্তমানকালে এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলিলে সকলেই হয়ত' ভীত হইয়া উঠিবেন। শিশুকে তাহার নিজের গতিতে নিজের পথে চলিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে একথা এদেশের শিক্ষাধিকারীগণের পক্ষে কার্য্যতঃ স্বীকার করা কঠিন; যদিচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মুখে হয়ত' এ মত সমর্থন করিতেও পারেন। এমন কি শিশুর যে নিজের কোন বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার যে জীবন পথে চলিবার নিজস্ব একটি ভঙ্গি আছে বা থাকিতে পারে তাঁহাদের পক্ষে এ কথা মানাই কঠিন হইয়া ওঠে। শিশুর ব্যক্তিত্ব না মানিলে তাহার স্বাতন্ত্র্যের কথা উঠিতে পারে না। রাসেল তাঁহার On Education গ্রন্থে শিশুর স্বাতন্ত্র্যের দাবী

---

* Education and the Social Order—By Bertrand Russell.

করিয়াছেন এবং তাহার শিক্ষার প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রণালী মনস্তত্ত্বের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত মনস্তত্ত্বের বিশেষ যোগ নাই; এমন কি সে যোগ যে থাকা দরকার তাহাও আমরা ঠিক বুঝি না। তবুও গ্রন্থখানি সকলেরই পড়া উচিত।)

On Education গ্রন্থে রাসেল যে তত্ত্বের অবতারণা করিয়া বিশেষ একদিক্ হইতে তাহার বিচার করিয়াছিলেন Education and the Social Order নামক গ্রন্থে তাহারই অন্য একটা দিক্ হইতে বিস্তৃততর বিচার করিয়াছেন। সমাজ ও শিক্ষার কি যোগ তাহাই বর্ত্তমান গ্রন্থের বিচার্য্য বস্তু।

আলোচ্য গ্রন্থে এই কয়টি অধ্যায় আছে: The Individual Versus the Citizen ; The Negative Theory of Education ; Education and Heredity ; Education and Discipline ; Home Versus School ; Aristocrats, Democrats and Bureaucrats ; The Herd in Education ; Religion in Education ; Sex in Education ; Patriotism in Education ; Class-feeling in Education ; Competition in Education ; Education under Communism ; Education and Economics ; Propaganda in Education ; The Reconciliation of Individuality and Citizenship।

অধ্যায়গুলির নাম পড়িলে হয়ত' মনে হইতে পারে শিক্ষার আলোচনায় সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন তত্ত্বই এমন কি যৌন-সম্বন্ধের আলোচনা পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। ধান ভানিতে এই শিবের গীতের বিপুল আয়োজনে, শিক্ষার আলোচনায় আপাতপ্রতীয়মান এত অবান্তর বিষয়ের সমাবেশে সহসা চমকিত হইয়া ওঠা আমাদের পক্ষে সহজ হইতে পারে; কিন্তু ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারিব ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কারণ, সত্যই শিক্ষার ক্ষেত্র এত সুদূর বিস্তৃত যে তাহার আলোচনায় ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সকলই আসিয়া পড়ে। Pestalozzi অনেক দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, It is life that teaches,

জীবনই শিক্ষা দেয়; কথাটা শুনিতে মনে হয় অত্যন্ত মামুলি; কিন্তু তাহার যে গভীর অর্থ আছে তাহা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না এবং চোখে পড়িলেও, মুখে স্বীকার করিলেও শিক্ষাপ্রণালীগঠনের সময় এই উক্তির অন্তর্নিহিত সত্যকে আমরা কার্য্যতঃ অস্বীকার করিয়া চলি। জীবনই একমাত্র শিক্ষক একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে না মানিয়া উপায় নাই যে জীবনে সমাজনীতি, অর্থনীতি, কামনীতি প্রভৃতি যে বিভিন্ন নীতির ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রিয়া চলিতেছে শিক্ষানীতির আলোচনায় তাহাদের সকলেরই বিচারের অবশ্যপ্রয়োজন রহিয়াছে। যে দেশে শিক্ষার সহিত জীবনের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ শুধু সেই দেশেই শিক্ষানীতির আলোচনা সংক্ষেপে সারা যায়। অথচ আমাদের দেশেই একদিন শিক্ষাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল, তখন ধর্ম্মের অর্থ ছিল ব্যাপক, শিক্ষার ক্ষেত্রও তাই ছিল সমগ্র জাতীয় জীবনে বিস্তৃত। অর্থ, সমাজ, কাম, মোক্ষ সকলেরই বিচার সেদিন শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ললিতবিস্তরে সিদ্ধার্থের শিক্ষনীয় বিষয়গুলির যে বিস্তৃত তালিকা দেখিতে পাই তাহার পিছনে জীবনের একটি বিশেষ ফিলজফির পরিচয় রহিয়াছে। তাহার পর জাতীয় জীবনে বিভাগ আসিল, ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সকলেরই ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইল। তাই দেখি আজ যিনি সমাজনীতির চর্চ্চা করেন তাঁহার বিদ্যার সহিত জীবতত্ত্বের বিশেষ যোগ নাই; রাজনৈতিক অর্থনীতির ধার ধারেন না; শিক্ষক শিক্ষাকে শুধু পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। জীবন যে অখণ্ড, একক একথা আমরা ভুলিয়া যাই কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে জীবনকে এইরূপ অখণ্ডভাবে দেখার একটা প্রয়াস বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বারট্রাণ্ড রাসেল এই ভাবেই শিক্ষানীতিকে সমগ্ররূপে দেখিতে গিয়া নানাবিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

রাসেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, এদিকে আবার তিনি কম্যুনিজ্‌মের পক্ষপাতী; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও কম্যুনিজ্‌ম এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের উপাসনা একসঙ্গে কেমন ভাবে হইতে পারে এ প্রশ্ন আমাদের মনে সহজেই উঠিতে পারে। তাহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব নহে। কোন্‌টার উপর জোর দিব তাহারই উপর উত্তরের প্রকৃতি নির্ভর করে; আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-

বাদী কিন্তু বর্ত্তমান সমাজপ্রণালীতে ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব, হয়ত' কম্যুনিজ্‌মের কতকটা কাটছাঁট করিয়া তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া যে সমাজ গড়িয়া উঠা সম্ভব, তাহাতেই আমার মনোমত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সহজলভ্য হইতে পারে। কম্যুনিজ্‌মকে আমি ততটাই ভালবাসি যতটা আমার শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হইবে। কম্যুনিজ্‌মগঠিত সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থান না থাকিলেও বর্ত্তমান সমাজে কম্যুনিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী করে, না হইলে কম্যুনিজ্‌মের প্রচার সম্ভব হইবে না; তাহা ছাড়া শেষ যে লক্ষ্য, সুন্দরতর জগৎ সৃষ্টি করা, সেখানে কম্যুনিষ্ট ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী মিলিবে; তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জগতের ভিত্তি পূর্ণতর ব্যক্তি, কম্যুনিষ্টের জগৎ পূর্ণতর সমষ্টির জগৎ।

সৌভাগ্যক্রমে জীবন ন্যায়শাস্ত্রের বিধান শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া চলে না; তাই জীবনে বিরোধের মিলন দেখিতে পাই; না হইলে জীবন অচল হইত। ব্যক্তি ও সমষ্টি কোনটাকেই বাদ দিয়া চলে না, একটাকে বাদ দিলে অন্যটাও অচল হইয়া পড়ে। তবে কেহ জোর দেন একটার উপর কেহবা দেন অপরটার উপর। বুদ্ধদেবের মধ্যপথ compromise নহে; আর যদি তাহা compromise-ই হয় তবে জীবনটাই আগাগোড়া compromise। রাসেল জোর দিয়াছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে সমাজরক্ষার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কতকটা খর্ব্ব করিতে হইবে।

"Individualism, although it is important not to forget its just claims, needs, in a densely populated industrial world, to be more controlled..................than in former times. (২৪৩ পৃষ্ঠা)

"A sense of citizenship, of social co-operation, is therefore more necessary than it used to be; but it remains important that this should be secured without too great a diminution of individual judgment and individual initiative." (২৪৪পৃষ্ঠা)

সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কতটা খর্ব্ব করিতে হইবে তাহাই লইয়া বিচার।

সমগ্র গ্রন্থে রাসেল দেখাইয়াছেন বর্ত্তমান সমাজধারা তাঁহার মতে কতভাবে জগতের ও ব্যক্তির দুঃখের জন্য দায়ী। তিনি বুঝিয়াছেন বর্ত্তমান সমাজধারা ক্যাপিটালিজ্‌মের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহারই জন্য এত দুঃখ; ক্যাপিটালিজ্‌মের ধ্বংসের জন্য তিনি বরং কম্যুনিজ্‌মের সহায়তাগ্রহণ করিবেন এবং পরে কম্যুনিজ্‌মের সংস্কার করিয়া তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তির উপর নূতনজগৎ ও নূতন সমাজ গড়িবেন। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন ঃ

"The establishment of an international authority sufficiently strong to impose its settlement of disputes upon recalcitrant States is, I am convinced, the most important reform from an educational as well as from every other point of view. There are, however, formidable obstacles to the establishment of such an authority, obstacles much more formidable than most pacifists realise.........Until the issue between Communism and Capitalism is decided in one way or another, world peace cannot be secure, whatever machinery may be created. And it is difficult to see how this issue can be decided except by the victory of Communism, at any rate throughout Europe. Capitalism can no longer bring contentment. * * * It seems, therefore, not improbable that the shortest road to world peace lies through Russian propaganda." (পৃষ্ঠা ২৩৩।২৩৪)

অর্থাৎ জগতে একচ্ছত্র এক শক্তির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত শান্তি অসম্ভব। ক্যাপিটালিজ্‌ম্ সে শান্তি আনিতে পারিবে না, কম্যুনিজ্‌ম্ হয়ত' আনিতে পারে। সুতরাং য়ুরোপে অন্ততঃ কম্যুনিজ্‌মের জয় ব্যতীত শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। অবশ্য গ্রন্থের অন্যত্র রাসেল কম্যুনিজ্‌মের বিচার করিয়া তাহার দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মোটামুটি ইহাই তাঁহার সমাজ-সম্বন্ধে মতামত। এবং সেই মতের অনুযায়ী করিয়া তিনি শিক্ষাপ্রণালীর বিচার এখানে করিয়াছেন।

রাসেলের এই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত লইয়া বিচার চলিতে পারে; কিন্তু শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলা তাঁহার প্রাথমিকসিদ্ধান্তনির্ব্বিশেষে আমাদের প্রণিধানযোগ্য। এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁহাদের সহিত

মতের সমস্তটা মিল না হইলেও তাঁহাদের রচনা উপভোগ্য। রাসেল তাঁহাদের অন্যতম।

রাসেলের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত তাহা হইলে দেখা গেল মোটামুটি দুইটা, প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, দ্বিতীয় ক্যাপিটালিজ্‌মের পরিবর্ত্তে নূতনতর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। দুইটার মধ্যে প্রথমটাকেই এক হিসাবে তাঁহার সর্ব্বপ্রাথমিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাসেল যে ভাবী সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী তাহারও মূলনীতি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর জগতের ভাবী সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে; আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।

গ্রন্থের প্রথমেই রাসেল প্রশ্ন তুলিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে, শিক্ষা দিব কিসের জন্য, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য, না, নাগরিক সৃষ্টি করিবার জন্য? বর্ত্তমান রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশের বাধা পড়ে। আর রাসেল ত' বর্ত্তমান রাষ্ট্রের সত্তা স্বীকারই করেন না সুতরাং প্রশ্নের উত্তর সহজেই পাওয়া গেল যে ব্যক্তিত্বের বিকাশই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাপ্রণালী সেই উদ্দেশ্যেই গঠিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে এই প্রশ্নের সুদীর্ঘ বিচারে অবশ্য তিনি নাগরিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষাপ্রণালীর সৃষ্টি তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ব্যক্তির মঙ্গল কিসে এ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন; তাঁহার কল্পিত পূর্ণবিকশিত ব্যক্তিত্বের আদর্শের বিচার এখানে প্রয়োজন নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে এইভাবে পূর্ণবিকশিত ব্যক্তির সহিত বর্ত্তমানকালীন রাষ্ট্রের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং উভয়ের স্বার্থ (বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিধিতে) এক নহে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটা সুন্দর কথা বলিয়াছেনঃ

"The English admire Boadicea, whom they would treat exactly as the Romans did if she were to appear in modern India" (পৃষ্ঠা ১৩)।

নাগরিক সৃষ্টিই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইলে জগতের দুঃখ স্থায়ী করাই হইবে, সমাজবিধির পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে না। কোন রাষ্ট্রই বর্ত্তমান বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চাহেনা। তাহা ছাড়া এই উদ্দেশ্য গ্রহণ করিলে আর

একটা অভাব হইবে ; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মূলে রহিয়াছে জিজ্ঞাসার ভাব ; বৈজ্ঞানিক না বুঝিয়া কোন কিছু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। পরিবর্ত্তনের মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ; সুতরাং নাগরিকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে গঠিত শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষার্থীর অন্তরে এই জিজ্ঞাসার ভাব জাগাইতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিক রাসেলের এই প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধে ইহাও একটা মস্তবড় যুক্তি। এই অধ্যায়ের উপসংহারে রাসেল কিন্তু সাবধানী হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক শিক্ষার এই আদর্শের খানিকটা গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

"Education in citizenship has grave dangers. Nevertheless, the argument in favour of some education to produce social cohesion is overwhelming."

এখানে তিনি social cohesion-এর উদ্দেশ্য বিচার করিয়া বলিয়াছেন সমগ্র জগৎকে অখণ্ডভাবে দেখিবার যে বোধ, নিখিলবিশ্বের নাগরিক হইবার যে বুদ্ধি, তাহা একান্ত প্রয়োজন।

"When once the world as a single economic and political unit has become secure, it will be possible for individual culture to survive. But until that time our whole civilisation remains in jeopardy. Considered *sub specie aeternitatis* the education of the individual is to my mind a finer thing than the education of the citizen ; but considered politically, in relation to the needs of time, the education of the citizen must, I fear, take the first place.

অবশ্য এখানে তিনি নাগরিক শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি কেন ব্যক্তির শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োজন তাহাই বিচার করিয়াছেন এবং আবশ্যিক শিক্ষার দোষ দেখাইয়াছেন। যেখানে আমরা একটি শিশুকে চাপ দিয়া শাস্তি দিয়া ভাল কাজ করিতে শিখাই সেখানে আমরা মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক সত্যকে অবজ্ঞা করি। আমরা ভুলিয়া যাই যে শাসন ও সংযম এক নহে, সংযম আত্মজাত ও শাসন বহির্জাত। বহির্জাত শাসনের ফলে আজ না হয় আমাদের অন্তরস্থিত নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি বিকাশ লাভ করিল না, কিন্তু সেগুলি অবচেতনায় প্রচ্ছন্ন আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং পরে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া কদর্য্য পথে আত্মপ্রকাশ করিয়া

আমাদের জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিল। ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত অবচেতনার প্রভাব আমাদের জীবনে কি ভাবে কতভাবে কাজ করিতেছে তাহা আমরা এখনও বুঝি না।

অবশ্য রাসেল স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের পার্থক্যবিচার করিয়াছেন; শিশুকে কোন্ বিষয়গুলি কতকটা জোর দিয়া শিখাইতে হইবে তাহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহার মত, শিশুকে স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহার শিক্ষায় তাহার বিরুদ্ধাচরণের পরিবর্ত্তে সাহচর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বাঁরট্রাণ্ড রাসেলের এই সিদ্ধান্ত বোধ করি কোন শিক্ষাতাত্ত্বিকই অস্বীকার করেন না।

বর্ত্তমানে সমাজে যে শ্রেণীর ধন ও বংশগত অভিজাত্য রহিয়াছে রাসেল তাহার বিরুদ্ধে। তিনি অবশ্য বুদ্ধির আভিজাত্য স্বীকার ও দাবী করেন; এইজন্যই যে শিশু বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে তাহার শিক্ষার জন্য তিনি স্বতন্ত্র ব্যবস্থার বিধান দিয়াছেন। ধনাভিজাত্য ও বংশাভিজাত্য কিভাবে শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার বিচার প্রসঙ্গে তিনি বংশানুক্রমের (heredity) বিচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি সুপ্রজনন-বিদ্যার সমর্থকদের মতের কতকটা খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন শিক্ষার প্রভাব বংশানুক্রমের প্রভাবের চেয়ে কম ত' নহেই বরং বেশী। নিছক বংশানুক্রমবাদীছাড়া সকলেই বোধ করি রাসেলের এমতের পোষকতা করিবেন।

ইহার পর কথা উঠিয়াছে discipline বা শাসন লইয়া। Discipline অর্থে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহা বাহ্যবস্তু; অবশ্য যদি কেহ discipline-এর অর্থ ব্যাপক করিয়া স্বনিয়ন্ত্রণকেও ইহার মধ্যে আনিয়া ফেলেন তবে কোন তর্কই উঠে না; কিন্তু মুখে সে অর্থ স্বীকার করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে আমরা discipline-এর অর্থ করিয়াছি বাহির হইতে শাসন। এই শাসনের সহিত পুরস্কার তিরস্কারের গভীর যোগ আছে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী শাসনের বেড়াজালে এমনই ভাবে আবদ্ধ যে আমরা আচারকেও বাহিরের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। শাসন করিয়া বাহ্য আচার কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে সত্য কিন্তু সে আচার

চিরদিনই বাহ্য ব্যাপার থাকিয়া যায়। ইহাকে ভিতরের বস্তু করিতে গেলে শাসনছাড়া অন্যপথ অবলম্বন করিতে হয়। অবচেতনা সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনস্তাত্ত্বিকগণের ও রাসেলের মত পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাঁহারা বলেন পুরস্কার তিরস্কারের শাসনে সত্যাচারের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয় না; জীবনে দ্বন্দ্ব থাকিয়াই যায়। সুতরাং শিশুকে কতকটা তাহার অলক্ষ্যে ও কতকটা তাহার সাহচর্য্যে এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে হইবে যে সে সহজেই স্বনিয়ন্ত্রণ শেখে, বাহ্য শাসনদ্বারা তাহাকে শিখাইবার প্রয়োজন হয়ই না।

মানুষের সামাজিক জীবনের মূলে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া চলিতেছে, দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা। দ্বন্দ্বও যেমন সহযোগিতাও তেমনি মানুষের সহজাতবৃত্তি। বর্ত্তমানকালের রাষ্ট্র ও সমাজে কিন্তু প্রতিযোগিতা অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বৃত্তিরই বিশেষ আদর। "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" ইহাই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজের নীতি। যন্ত্রমূলক সভ্যতার প্রথম যুগে রাষ্ট্র যখন যান্ত্রিক উন্নতি বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিল তখন এই নীতির কতকটা প্রয়োজন ছিল। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতিও কতকটা এই নীতির ফল বলা যাইতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই নীতির ক্রিয়া আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি; পুরস্কার-তিরস্কার নীতিও এই নীতির প্রতিধ্বনি মাত্র। যে ছাত্র যোগ্য তাহার আদর ও অযোগ্য যে তাহার অনাদর শিক্ষকমাত্রেই প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে করিয়া থাকেন। ইহার ফল কতদূর গড়ায় তাহা হয়ত অনেকেই ভাবেন না। তাঁহারা একথাও বলেন যে অযোগ্যের অনাদর করা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে, শুধু যোগ্যের সম্মান তাঁহারা দিতে চাহেন। তাঁহাদের সরলচিত্ততায় সন্দেহ নাই করিলাম; কিন্তু দশটি শিশুর মধ্যে তাঁহারা দুইটিকে পুরস্কার দিয়া অপর আটটিকে পরোক্ষভাবে যে অপমান করেন তাহা তাঁহাদের মনে আঘাত করিতে না পারে কিন্তু শিশুচিত্তে তাহা কতটা বাজে তাহা বোধ করি যে কেহ শিক্ষাজীবনে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন। বাল্যকালে এক পুরস্কার বিতরণ সভায় একজন শ্রদ্ধেয় বক্তাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম failures are the pillars of success অর্থাৎ পরাজয়ের ভিত্তির উপর জয়ের প্রতিষ্ঠা। কথাটা শুনিতে

মন্দ লাগে না কিন্তু তাহার সারবত্তা কয়জনের জীবনে সত্য ? অতি অল্প সংখ্যক শিশু আছে যাহারা বার বার ঘা খাইয়াও উছমহীন হইয়া পড়ে না। বাকি যাহারা আঘাত-অসহিষ্ণু বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায়, যেখানে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নীতির আদর সেখানে, তাহারা সমাজের অতিঅল্প কাজেই লাগে; ব্যর্থতায়, অপমানে তাহাদের সামান্য যেটুকু শক্তি আছে—হয়ত' যাহার অনুশীলন করিলে তাহারা আরো শক্তিশালী হইতে পারিত—তাহাও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ নহে যে জীবনে তারতম্য ভেদাভেদ লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। যে কোন সমাজেই—এমন কি কম্যুনিষ্ট সমাজেও যোগ্যতমকে বাছিয়া সমাজের দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাহাদেরই উপর দিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা চিরদিনই অল্প হইবে, বাকিকে লইয়াই কথা। কিভাবে তাহাদের ক্ষীণ শক্তির পূর্ণতম বিকাশ হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাসেলের সহিত আমরা এ বিষয়ে একমত যে প্রতিদ্বন্দ্বনীতির আশ্রয় গ্রহণে এ উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বনীতিই আজ সকল দেশের সকল সমাজে বলবৎ রহিয়াছে। তাহার অন্যথা না হইলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও অন্য নীতির অনুসরণ সম্ভব নহে। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন সমাজ-গঠনে অন্য নীতি অনুসৃত হইয়াছে; তাই এবং শুধু সেই কারণেই রাসেল কম্যুনিজ্‌মের পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি কম্যুনিজম ও শিক্ষা-শীর্ষক অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিভাবে অন্য নানা কারণে কম্যুনিজ্‌মের আমলেও তাঁহার মনোমত শিক্ষা দেওয়া হইবে না। মানসিক স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, যাহা রাসেলের শিক্ষার চরম লক্ষ্য, কম্যুনিষ্ট সে-স্বাধীনতা দিতে নারাজ। সে কম্যুনিজ্‌মের পক্ষে "প্রোপাগ্যাণ্ডা" করিবে; কিন্তু যেখানেই "প্রোপাগ্যাণ্ডা" সেখানেই স্বাধীনতা অগ্রাহ্য। ধর্ম্ম এমনই এক রকম "প্রোপাগ্যাণ্ডা", তাহা মানুষের সহজ বুদ্ধিকে পরাধীনতার বেড়াজালে নানাভাবে বাঁধে, রাসেলের এই মত, সুতরাং তিনি শিক্ষায় ধর্ম্মের স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন। গোষ্ঠীও ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিতে চাহে না, পরোক্ষে হউক, প্রত্যক্ষভাবে হউক গোষ্ঠী নিজের মত ব্যক্তির উপর চালাইতে চাহে; সুতরাং সে রকমের "প্রোপাগ্যাণ্ডা" হইতেও ব্যক্তিকে, শিশুচিত্তকে মুক্তি দিতে হইবে, ইহাই রাসেলের মত। অবশ্য তিনি প্রত্যেক

শিশুর জন্য পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করিতে চাহেন না। তিনি সাবধানী, জীবনটাই যে নানাভাবে suggestion দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং সে suggestion-এর সবটাই যে খারাপ নহে একথাও তিনি স্বীকার করেন। জীবন ভরিয়াই নানাভাবের "প্রোপাগ্যাণ্ডা" চলে, পরিণতবয়স্ক পিতামাতা নানাভাবে তাহাদের জীবন দিয়াই এই "প্রোপাগ্যাণ্ডা" চালান, এবং এরূপ প্রোপাগ্যাণ্ডার হাত হইতে মুক্তি নাই এবং তাহার সবটাই যে খারাপ নহে তাহা রাসেল স্বীকার করিয়াছেন। তিনি চাহেন যতটুকু সম্ভব সেই "প্রোপাগ্যাণ্ডা"কে কম করিতে হইবে। ধর্ম্মের সম্বন্ধে রাসেলের যে উক্তি তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন না, তবুও এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি প্রণিধান-যোগ্য, তাহাতে ভাবিবার অনেক কথা আছে।

ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বিরোধকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান সমাজের গঠন-পদ্ধতি; আর রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের বিরোধ আজিকার আন্তর্জাতিক নীতি। তাহারও মূলে সেই প্রতিদ্বন্দ্বনীতি; রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাহার রূপ হইয়াছে স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেমও এক প্রকার "প্রোপাগ্যাণ্ডা"। স্বদেশপ্রেমের দুইরূপ—আমি আমার দেশকে ভালবাসি, এ একপ্রকারের স্বদেশপ্রেম, ইহাতে ভেদাভেদ বুদ্ধি নাই, তোমার দেশ ছোট বা বড় তাহার প্রশ্নই ইহাতে উঠে না। কিন্তু আর এক প্রকারের স্বদেশপ্রেমের মূলে বিদেশের প্রতি ঘৃণা বিদেশকে ছোট করিয়া দেখার ভাব রহিয়াছে, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া ইম্পীরিয়ালিজ্‌মে পরিণত হয়; whiteman's burden সেই প্রকারের নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্বদেশপ্রেমের ফল। মূলতঃ স্বদেশপ্রেম এই দুই প্রকারের হইলেও কার্য্যতঃ আমরা শেষোক্তশ্রেণীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাশ্চাত্যদেশে পদে পদে পাই।

রাসেল এই প্রকারের স্বদেশপ্রেমের ঘোরতর বিরোধী। বিদেশের ঈর্ষা ও ঘৃণা-উপজাত এই স্বদেশপ্রেমই আজ জগতের সকল দুঃখের জন্য দায়ী। তাহারই জন্য আজ অস্ত্রনিরাকরণ-বৈঠক ব্যর্থ হয়, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ পঙ্গু হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই স্বদেশপ্রেমের আদর্শের অখণ্ড প্রতাপ। ইহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। এই স্বদেশপ্রেমের দোহাই দিয়া আমরা সত্যের অপলাপ করিতে, শিশুচিত্তকে মিথ্যা মতের দ্বারা কণ্টকাকীর্ণ

করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না। যদি কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে যায় তাহাকে অবজ্ঞা করিতে, শাসন করিতে, defeatist বলিয়া উপহাস করিতে দ্বিধা করি না। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি দ্বারা এরূপ চেষ্টাকে চূর্ণ করিতে আমাদের লজ্জা আসে না। জগতে যতদিন এ শ্রেণীর স্বদেশপ্রেমের প্রভাব থাকিবে ততদিন শান্তি নাই; শিক্ষার মুক্তি, চিত্তের স্বাধীনতা, অপ্রতিহত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সত্যানুসন্ধানের উপায় নাই।

সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া এক রাষ্ট্রের সৃষ্টিই এই দুঃখ হইতে মুক্তির উপায়। সেইরূপ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ওয়েলস্ ও অন্যান্য মনীষীগণ করিয়াছেন; কিন্তু সে কল্পনা কোন দিন সার্থক হইবে কি না কেহ বলিতে পারে না, অন্ততঃ বর্ত্তমানকালে পরস্পর-ভীতি ও হিংসাপ্রপীড়িত জগতে তাহার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

বারট্রাণ্ড রাসেল তবুও সাহস হারান নাই; শিক্ষার উপর তাঁহার সমূহ বিশ্বাস। শিক্ষাকে স্বাধীন করিলে চিত্তে স্বাধীনতা আসিবে এবং স্বাধীনচিত্ত সহযোগিতার আদর্শ দ্বারা প্রণোদিত মানুষকে দিয়াই ভাবী সেই সমাজ গড়িয়া উঠিবে যেখানে আজিকার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

গ্রন্থের উপসংহারে রাসেল যে কয়টা কথা লিখিয়াছেন তাহা দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন:

"Our world is a mad world. Ever since 1914, it has ceased to be constructive, because men will not follow their intelligence in creating international co-operation, but persist in retaining the division of mankind into hostile groups. This collective failure to use the intelligence that men possess for purposes of self-preservation is due, in the main, to the insane and destructive impulses which lurk in the unconscious of those who have been unwisely handled in infancy, childhood and adolescence. Inspite of continually improving technique in production, we all grow poorer. Inspite of being well aware of the horrors of the next war, we continue to cultivate in the young those sentiments which will make it inevitable. Inspite of Science, we react against the habit of considering

problems rationally. Inspite of increasing command over nature, most men feel more hopeless and impotent than they have felt since the Middle Ages. The source of all this does not lie in the external world, nor does it lie in the purely cognitive part of our nature, since we know more than men ever knew before. It lies in our passions ; it lies in our emotional habits; it lies in the sentiments instilled in youth and in the phobias created in infancy. The cure for our problem is to make men sane, and to make men sane they must be educated sanely. At present the various factors we have been considering all tend towards social disaster. * * The world has become so intolerably tense, so charged with hatred, so filled with misfortune and pain that men have lost the power of balanced judgment which is needed for emergence from the slough in which mankind is staggering. Our age is so painful that many of the best men have been seized with despair. But there is no rational ground for despair ; the means of happiness for the human race exist, and it is only necessary that the human race should choose to use them." (পৃষ্ঠা ২৪৬-৪৮)

অর্থাৎ আজ আমরা পাগলের জগতে বাস করিতেছি ; সেখানে দুঃখ দ্বন্দ্ব বিরোধ বুদ্ধিভ্রংশ দিন দিন দুঃখ বাড়াইয়াই চলিয়াছে। এদিকে আমাদের সুখশান্তির আয়োজন অসীম রহিয়াছে। পানীমে থাকিয়াও মীন এই যে পিয়াসী হইয়া রহিয়াছে ইহার মূল কারণ বাহিরে নহে আমাদেরই অন্তরে। কুশিক্ষার জন্য আমাদের অবচেতনায় যে নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি একদা সুপ্ত ছিল বাহিরের সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহারই ক্রিয়ায় জগতে এই দুঃখের উৎপত্তি। আমাদের শুভবুদ্ধি সেই অবচেতনাস্থিত নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির নিকট পরাজিত।

আমাদের অন্তরস্থিত শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার একমাত্র উপায় সুশিক্ষাদান। আজ নৈরাশ্যের বহু কারণ থাকা সত্বেও আমাদের সাহসে বুক বাঁধিতে হইবে ; কারণ, নৈরাশ্যনিরাকরণের উপায় আমাদেরই হাতে রহিয়াছে। এখন প্রয়োজন শুধু সেই উপায় প্রয়োগ।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

"ফাউষ্ট" *

ব্যক্তির জীবনে দেখি এক বয়সের একটি আইডিয়া দিন দিন পরিণত হতে হতে পরবর্ত্তী বয়সে যেই সম্পূর্ণ হয় অমনি সমাপ্ত হয়। তখন আর মনের ভিতর তার খোঁজ পাওয়া যায় না, তার আশ্রয়স্থল তখন স্মৃতি।

জাতির জীবনেও সেইরূপ। তবে জাতির জীবন হচ্ছে বড় স্কেলের ব্যাপার। যেমন তার আকার তেমনি তার আয়ু। তার সামান্য দুই দশ শতাব্দীর ইতিহাসে কত ঘটনা, কত অঘটন, কত রাজ্য ভাঙাগড়া, কত পতন অভ্যুদয়। এত কিছুর মধ্যেও এক একটি আইডিয়া জাতির মানসে স্পষ্টতা লাভ করছে। পরিশেষে একটি অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে, একটি অন্দোলনে বা বিপ্লবে, একখানি কাব্যে বা কীর্ত্তিতে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।

ইউরোপের মধ্যযুগে এমনি একটি আইডিয়া ছিল সয়তানের সঙ্গে চুক্তি। সয়তানকে লোকে ঘৃণা করত, গাল পাড়্‌ত, ভয় করত অথচ সয়তানের আকর্ষণও তলে তলে অনুভব করত। ফাউষ্ট নামে সত্যিকার এক পণ্ডিত নাকি সয়তানের কাছে পরকাল বিক্রয় করে ইহকালে সয়তানের শক্তি কিনেছিল। অতবড় যাদুকর নাকি আর ছিল না। মুখে ফাউষ্টের মুণ্ডপাত করলেও মনে তার সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল সকলের। তার বিষয়ে রচিত হয়েছিল অনেক গ্রন্থ, চলিত হয়েছিল অনেক কাহিনী, অভিনীত হয়েছিল অনেক পালা। সেগুলিতে তার শোচনীয় পরিণাম—তার অপমৃত্যু ও সয়তানের অধিকারে তার আত্মার দুর্গতি—আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছিল বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন লোকটা যে সুখের জীবন, সখের জীবন, যখন-যা-খুসীর জীবন কাটিয়ে গেল তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছিল সাড়ম্বরে।

ফাউষ্ট হতভাগাটা যে অমন একটা চুক্তি করে নিতান্তই ঠকে গেল মধ্যযুগের শেষভাগের মানুষ অন্তরে তা স্বীকার করতে পারছিল না। পরকালের ভয় যতই কমে আসছিল ইহকালের সম্ভাবনা ততই বৃহৎ মনে হচ্ছিল। বিজ্ঞান এল, প্রকৃতির বস্ত্রহরণ হতে থাকল, সয়তানী যন্ত্রপাতির

---

* পরিকল্পিত পুস্তক "ইউরোপের বাণী" থেকে।

সাহায্যে এঞ্জিনিয়ার একে একে বহু অসাধ্যসাধন করল। তখন যাদুকর ফাউষ্টের উপর শ্রদ্ধা জাত হল। সয়তানের খুর, লাঙ্গুল ও শিং খসে গেল। সয়তান বলা হল বিশ্বসংসারের অন্তর্নিহিত সেই পরশ্রীকাতরতাকে যা অহরহ ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ায়, সাজানো বাগান শুকিয়ে দেয়, যজ্ঞ পণ্ড করে, ভালকে দিয়ে ভালর সর্ব্বনাশ ঘটায়। এমন যে সয়তান সে মানব-সংসারে ভদ্রবেশী।

কালক্রমে ফাউষ্ট ও সয়তান উভয়ের বিবর্ত্তন হয়েছিল জনগণের কল্পনায়। Goethe যখন উভয়ের চুক্তির আইডিয়াটিকে পূর্ণতা দিয়ে চুকিয়ে দেবার সঙ্কল্প করলেন ততদিনে ফাউষ্টের পরিণাম-সম্বন্ধে লোকের রুচি বদ্‌লেছে। লেসিং বল্লেন, ফাউষ্টের ত স্বর্গে যাবার কথা। মৃত্যুর পরে তার আত্মা সয়তানের খপ্‌পরে পড়্‌বে এ যে অসহ্য।

অথচ যে মানুষ সাক্ষাৎ সয়তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মর্ত্ত্যকেই পরম বলে গণ্য কর্‌ল, স্বর্গের চিন্তা মনে আন্‌ল না, তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলে পাপ পুণ্যের পরিমাণ ভেদ থাকে না। আর সয়তানকেও তার শিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌লে অন্যায় হয়। Goethe এই সমস্ত কারণে চুক্তির মধ্যে একটি ফ্যাঁকড়া রাখ্‌লেন। ফাউষ্ট বল্ল সয়তানকে, "তুমি আমাকে যা দেখাবে যা দেবে যেখানে নিয়ে যে অবস্থায় রাখ্‌বে তাতে যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্তোষ হয়, তাতে যদি আমি আসক্ত হই তবেই আমার আত্মা তোমার হবে।" সয়তান জান্‌ত মানুষের বাচ্চার দৌড় কত দূর। বল্ল, "বহুৎ খুব।" শেষ পর্য্যন্ত সয়তান ফাউষ্টের সঙ্গে পার্‌ল না। ফাউষ্ট বলে, "হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনোখানে।" কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। "নেতি, নেতি।" একশ বছর বয়স হল, তবু সে নিরলস, নিত্য উদ্যত। একটু আরাম কি বিশ্রাম তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থাণু কর্‌ল না। তার অন্তহীন চলার মাঝখানে এল মৃত্যু। এমন মানুষের আত্মার উপর কি সয়তানের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব, না সঙ্গত?

তবু সে স্বর্গে যেতে পারে না। স্বর্গে যাবার পক্ষে তার যোগ্যতা যথেষ্ট নয়। সে পাপে আট্‌কে থাকেনি বটে, কিন্তু পাপের জন্য সে অনুতপ্ত নয়, পুণ্যের প্রতি তার আগ্রহ নেই। পুণ্যের প্রতি সে একদিন আকৃষ্ট

হয়েছিল, পুণ্যবতীতে অনুরক্ত হয়েছিল, সয়তানের প্রেরণায় সেই পুণ্যশীলাকে ভ্রষ্টা করে পলায়ন করেছিল। তার সেই প্রিয়া তার হয়ে প্রার্থনা কর্‌ল, কুমারী-জননীর সকাশে, কুমারী-জননীর করুণাকে তার প্রতি উন্মুখ কর্‌ল, ভাগবত করুণায় হল ফাউষ্টের স্বর্গলাভ।

এইখানে Goethe-এর "ফাউষ্টের" বিশিষ্টতা। ফাউষ্টের আখ্যানের মধ্যে গ্রেচেনকে—কল্যাণীকে, সতীকে—প্রক্ষিপ্ত কর্‌লেন তিনিই। বিবর্ত্তনের মধ্যে এই তাঁর প্রবর্ত্তন। এর দ্বারা বিবর্ত্তনের সমাপ্তি ঘট্‌ল, ফাউষ্টের পরিণাম হল চিরকালের সর্ব্ব মানবের অভিলষিত।

এ ছাড়া তিনি আখ্যানটিকে যথেচ্ছ পল্লবিত কর্‌লেন। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল তাঁর দ্বারা পল্লবিত হতে হতে আখ্যানটি হয়ে উঠ্‌ল উপলক্ষ মাত্র। মানবাত্মার মহানিয়তিকে সূত্র করে গ্রথিত হল রাজনীতি, অর্থনীতি, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, করুণাতত্ত্ব, সৃষ্টিবাদ, বিবর্ত্তনবাদ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানব-শিশু-নির্ম্মাণ, সমুদ্র-শোষণ করে ভূখণ্ডবিস্তার ইত্যাদি প্রাচীন ও আধুনিক ভাবনা। Goethe-র "ফাউষ্ট" যেন একখানি মহাভারতসার।

লোক-সাহিত্যকে সাহিত্যে—প্রাকৃতকে সংস্কৃতে—উন্নীত কর্‌বার উদাহরণ এই প্রথম নয়। কালিদাসের শকুন্তলা, শেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যাম্‌লেট্‌, প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডীসকল মূলত লোকমনের কল্পনা। প্রতিভাশালীরা লোক-কল্পনার অসম্পূর্ণ আলেখ্যের উপর তুলিকা স্পর্শ করে তাকে, চিরকালের মত সম্পূর্ণ করে দেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা লোক-সত্যেরও মর্য্যাদা রক্ষা হয়, প্রতিভাশালীকে কালের বিচার-সম্বন্ধে সন্দিহান হতে হয় না। আমার একার জিনিষ সকলের হাতে দিলে আমাকে ঝুঁকি নিতে হয়, কে জানে হয়ত ওরা আমার অসাক্ষাতে ওর তত্ত্ব নেবে না। সকলের ঘরের জিনিষ আমার হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফিরিয়ে দিলে সকলের হয়ে থাক্‌বে—উপরন্তু আমার হয়ে থাক্‌বে। কালিদাস বা শেক্‌স্‌পীয়ার বা Goethe যদি গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিজের হাতে বানাতেন তবে সেটা হত একটা এক্সপেরিমেণ্ট্‌, যার কাজ শাড়ীর পাড়ে ফুল তোলা তার পক্ষে শাড়ী বোনার মত। অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় ত হতই, তার পর সে এক্সপেরিমেণ্ট্‌ কখনোই নিপুণ হস্তের নির্ম্মিত হত না। প্রতিভাশালীদেরও অধিকারের সীমা আছে। সীমার বাইরে

গিয়ে শক্তিক্ষয় করতে তাঁরা স্বভাবত পরাঙ্‌মুখ। অবশ্য সীমার অর্থ কৃত্রিম গণ্ডী নয়। সীমা হচ্ছে স্বধর্ম্মের সীমা।

বহু জনের পায়ে চলার পথ বহু দিনের পরীক্ষিত। নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে নূতন একটা পথ না কেটে সেই পথে চল্‌তে প্রতিভাশালীদের দ্বিধা নেই। তাঁরা জানেন যে তাঁদের ব্যবহারের দরুণ প্রাচীন পথ চির-নবীন বলে মনে হবে। তাঁদের স্বীকৃতির দরুণ গ্রাম্য পথ রাজপথ বলে গণ্য হবে।

Goethe-র "ফাউষ্ট" কাব্য কিম্বা উপন্যাস না হয়ে নাটক হল কেন?—কাব্যের প্রাণ বেদনা, উপন্যাসের প্রাণ বিবরণ, চিত্রের প্রাণ বর্ণনা, নাটকের প্রাণ সজ্ঘটন। লোকচিত্তের ফাউষ্টে বেদনা ছিলনা, বেদনার সূচনা করলেন Goethe স্বয়ং—গ্রেচেনের প্রেমে, বিষাদে, উন্মাদে। কিন্তু কাব্যের পক্ষে সেই যথেষ্ট নয়; বিষয়ের মর্ম্ম নয় সে। আর উপন্যাসের পক্ষে যা প্রাণস্বরূপ তা ক্রিয়া নয়, ক্রিয়ার বিবরণ। লোকচিত্তের ফাউষ্ট ক্রিয়ারত। তাই ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোজনা নিয়ে Goethe-র "ফাউষ্ট" হল নাটক। তার সবগুলি বাইরের ঘটনা নয়। বাইরের যেগুলি সেগুলি যথাযথ নয়। কোথায় ঘট্‌ছে, কবে ঘট্‌ছে—এ সমস্ত গৌণ। ঘট্‌ছে—এইটে মুখ্য। ফাউষ্ট ত মধ্যযুগের মানুষ। সে ধরে রাখ্‌ল প্রাগৈতিহাসিক হেলেনাকে। তাদের যে সন্তান হল সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হয়ে উঠ্‌ল, উড়তে গিয়ে মারা গেল। যেন বাস্তব নয়, ইন্দ্রজাল। যাঁরা সাধারণ নাটকের মত করে "ফাউষ্ট" পড়্‌বেন তাঁরা বাস্তব ও ইন্দ্রজাল এর একটার থেকে অপরটাকে পৃথক না করতে পেরে উদ্‌ভ্রান্ত হবেন। ইন্দ্রজালের গুণ, তা অসম্ভবকে সম্ভব বোধ করায়। দেশকালের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। রূপকথা ও ইন্দ্রজাল, এদের জাত্ এক। লোকচিত্তের ফাউষ্ট ত ঐন্দ্রজালিক, তার কাহিনী রূপকথা। সয়তান যে ভদ্রলোক সেজে এল এ যদি বিশ্বাস হয় তবে হেলেনা ও ফাউষ্ট যে মিলিত হল ও সেই মিলন যে সন্তফলপ্রদ হল এতে অবিশ্বাস অরসিকত্ব।

বহির্বিশ্বে ও অন্তর্বিশ্বে যে দুটি—ও দুই জড়িয়ে একটি—ঘটনা-পরম্পরা রয়েছে সেই ঘটনা-পরম্পরা-সম্বন্ধে বিশেষ বোধ না থাক্‌লে "ফাউষ্ট" কিম্বা কোন বিশুদ্ধ নাটক বোঝা যায় না। সাধারণত অভিনয় আমরা দেখি

উপন্যাসের। পড়ি আমরা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে গল্প। তার সঙ্গে থাকে ছবি মেশানো। এদানী ছবির ভাগ বেড়েছে। সাজ-আসবাব আলো ইত্যাদির উপর থাকে চোখ আর কথাবার্ত্তার দিকে যায় কান। এর মধ্যে নাট্যবোধ কোথায়; ষ্টেশনে পৌঁছতে একটি মিনিট দেরি হয়ে গেছে সাম্‌নে দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে কিছুই কর্‌তে পারছিনে, অনড় হয়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছি, নিজের এই অসহায়তা মন্দও লাগছে না বুক যেন ট্রেনের চলার সঙ্গীতে তাল দিচ্ছে—এই ত নাট্যবোধ।

পুত্তলিকার অভিনয় Goethe-র আশৈশব প্রিয় ছিল। এক অদৃশ্য হস্ত ঝুলন্ত পুত্তলীদের চালন কর্‌ছে, তাদের মুখের কথা অপরে বলে যাচ্ছে, তাদের অঙ্গভঙ্গী কৌতুককর অথচ মুখভাব অবিকৃত। চরিত্রের বিকাশ নেই, কিন্তু ঘটনার লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্যাভিমুখিত্ব নাটকের ধর্ম্ম। গল্পেরও এটা একটা গুণ, কিন্তু গল্পের ধর্ম্ম তার বিস্তার তার অপ্রাসঙ্গিকতা। পাকা কথকরা কি কিছুতে গল্প শেষ কর্‌তে চান্; কিম্বা গল্পের শেষটা ফাঁস করে দিতে? নাটকের শেষ কিন্তু আন্দাজ করা যায়। তা জেনে নিয়েও আমরা নাটক দেখ্‌তে কম আগ্রহী হইনে। এর প্রকৃত কারণ আমরা নিজকে ছেড়ে দিয়ে অসহায় ভাবে ভেসে যেতে ভালবাসি, বাঁচি আর মরি। ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে পড়ে পিছনের চাপে আপনা-আপনি এগিয়ে যাবার রোমাঞ্চ আমাদের অস্থির করে। তাই ভিড় দেখ্‌লেই ভিড়ে যাই। বিশুদ্ধ ঘটনার টান যেন সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের গ্রাস। রক্ষা নেই জেনেও নিজেকে সাম্‌লাতে পারিনে।

"ফাউষ্টে" অনেক রকম অনেক ভিড়। নাগরিকদের উৎসব, ডাকিনীদের শিবরাত্রি (walpurgis night), পরীরাজ্যের স্বপ্ন, মহারাজ সভা, পারিষদগণের ছদ্মবেশবিলাস, পৌরাণিক গ্রীসের শিবরাত্রি, হেলেনার কোরাস, রাজশিবির, কুমারীজননীর আশ্রম—প্রত্যেকটিতে অগণিত ব্যক্তির আবর্ত্তন, গতিচাঞ্চল্য, কলগুঞ্জন। এদের বিচিত্র সত্তাও ঘটনার সামিল। ফাউষ্ট এদের মধ্যে পড়ে যেন আপনা-আপনি এগিয়ে চলেছে। সাথী মেফিষ্টোফেলিস—সয়তান। তার কাজ হল কথায় কথায় ব্যঙ্গ, উপহাস, অবজ্ঞা, কুৎসিত সমালোচনা।

"ফাউষ্টের" দুই প্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে—একটি তাৎকালীন, অন্যটি নিত্যকালীন। তাৎকালীন ব্যাখ্যাটি এই। মধ্যযুগের মানব থিওলজির তত্ত্বকেই সত্য বলে বিশ্বাস কর্‌ত। সেই বিশ্বাস তাকে একান্ত আশ্বাস দিত। যাহা নাই বাইবেলে তাহা নাই ধরাতলে। এমন সময় রিনেসেন্স এসে তার মনে জাগিয়ে দিল সৌন্দর্য্যের ধ্যান, জ্বালিয়ে দিল অনির্ব্বাণ সংশয়। সে যে কত পুঁথি পড়্‌ল তার সুমারি হয় না। এত পড়েও যার দিশা পেল না তার জন্য ভানুমতী শিখ্‌ল, যে পন্থা দুর্গম তাকে আরব্য উপন্যাসের ভৌতিক আসনে বসে আশু অতিক্রম কর্‌বার চেষ্টা দেখ্‌ল।

সংশয়ের নাম সয়তান। সয়তান হচ্ছে জিজ্ঞাসা, চ্যালেঞ্জ, বিদ্রোহ, ছিদ্রান্বেষ, অভিমান। সয়তানকে গোলাম করে, গুরু করে, মধ্যযুগের মানব আধুনিক হয়ে উঠল। হল বৈজ্ঞানিক হল যন্ত্ররাজ, ছেঁচল সাগর, কাট্‌ল (সুয়েজ পানামা) খাল, আশা রাখল আকাশে ওড়্‌বার, অভিপ্রায় কর্‌ল মানবশিশু নির্ম্মাণের; সম্ভাবনার অবধি নেই, আধুনিক মানব কোনখানে থাম্‌বে? কতদূরে গিয়ে বল্‌বে, এই আমার সামর্থ্যের সীমানা, এই পর্য্যন্ত জয় করে আমি নিশানা রেখে দাঁড়ি টান্‌লুম। আধুনিক মানব জীবনকর্ম্মে ক্ষান্তি না দিতেই আসে মৃত্যু। মৃত্যুর পর কি সে অনুতাপে দগ্ধ হবে? গ্লানি বোধ কর্‌বে, লজ্জিত হবে? না। যদিও সে স্বর্গকামনা করেনি, ভগবানকে ডাকে নি, তবু সেও ভাগবত করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উন্নতমনা, নিরলস, নিরাসক্ত। সে ত ঊর্দ্ধাভিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কেউ কি তার হাত ধরে তাকে তুলে নেবে না? নেবে।

মানুষ আপন চেষ্টায় ত্রাণ পেতে পারে না, তাকে ত্রাণ করবার জন্য স্বর্গ থেকে করুণা নেমে আসে। এমনিতে কোনো ব্যক্তি করুণার যোগ্য নয়, শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরাও নন্। করুণা কেউ দাবী কর্‌তে পারে না; সেটা প্রভুর খুসীর খয়রাৎ। এই হল খ্রীষ্টীয় করুণাতত্ত্ব, grace-এর কথা। এই তত্ত্বের সঙ্গে Goethe একরকম সন্ধি কর্‌লেন্। যদিও প্রকৃত পক্ষে করুণা হল ভগবানের অহেতুক দান, তার পাত্রাপাত্র নেই, তবু সচেষ্ট ব্যক্তি তার আশা রাখ্‌তে পারে। ফাউষ্টের মত কর্ম্মী তার দ্বারা অবশেষে ত্রাণ লাভ করে থাকে। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" ফাউষ্ট তাই

করতে করতে ঠিক একশ বছর বেঁচেছিল। তার একটা গতি না করলে খ্রীষ্টীয় ভগবান আধুনিকদের নিকট মুখ দেখাবেন কি করে?

ক্রিশ্চিয়ানিটীর সঙ্গে ত এই মর্ম্মে সন্ধি হল। কিন্তু মধ্যযুগের মানবের ছিল তে-টানা। টান্‌ছিল তাকে অযুত সম্ভাবনাবিশিষ্ট ভবিষ্যৎ—প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব, যন্ত্রকৌশল, বিজ্ঞান দৃষ্টি, পার্থিব হিত। টান্‌ছিল তাকে মৃত্যুর পরপারে অতিমর্ত্ত্য পুণ্য, জাগ্রত করুণা, চির নবীন কলেবর, অক্ষয় স্বর্গ। আবার উদ্বেগ-ভাবনাশূন্য স্বাস্থ্য-সুষমা-সামঞ্জস্যের প্রতি, নীতিহীন দ্বিধাহীন কৃত্রিমতাহীন যৌবনের প্রতি, মানবজাতির স্বর্ণাভ অতীতের প্রতিও তার টান ছিল। ফাউষ্টের তিন দিকে তিন আকর্ষণ—সয়তান, গ্রেচেন, হেলেনা। তিন জনকেই স্বীকার করে তিনজনের সঙ্গে তিনরকম বোঝাপড়া করা দরকার ছিল।

সয়তান যদি হয় সংশয়ের প্রতিরূপক, গ্রেচেন যদি হয় ক্রিশ্চিয়ানিটীর, তবে হেলেনা হচ্ছে মানবসৌন্দর্য্যের। আজো ইউরোপের ধ্যানে হেলেনার রূপই চিরন্তনী সুন্দরীর রূপ। ভারতবর্ষে তার তুলনীয় নেই। আমাদের রূপের আদর্শ অপ্সরাতে বা দেবীতে নিবদ্ধ রয়েছে, মানবীতে রক্তমাংস পরিগ্রহ করেনি। হেলেনার কথায় একমাত্র শ্রীরাধার কথাই মনে আসে, কিন্তু শ্রীরাধাতে প্রমূর্ত্ত হয়েছে আমাদের প্রেমের আদর্শ—যার তুলনীয় ইউরোপে নেই।

মধ্যযুগের মানব হেলেনাকে উপেক্ষা করে জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীণ করতে পারত না। যারা হেলেনার আহ্বান শুন্‌ত তাদের ইহকাল-পরকাল যেত, আর যারা শুন্‌ত না তারা ছিল অবিদগ্ধ, অনাগরিক। ফাউষ্ট হেলেনার সঙ্গে মিলিত হল অথচ সেই মিলনে ভ্রমরের মত পদ্মসমাধি পেল না। হেলেনাকে অতিক্রম করে গেল। সৌন্দর্য্য ও সন্ধিৎসা সঙ্গত হয়ে যার জন্ম দিল সে কথা শোনে না, শূন্যে লাফ দিতে দিতে ছুটে চলে, সে চায় সংগ্রাম, সে চায় যশ। প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সন্তান দুরন্ত আধুনিকতা। তার কপালে আছে অপঘাত। কিন্তু কি বিমোহন তার তারুণ্য।

"ফাউষ্টে"র নিত্যকালীন ব্যাখ্যা তাকে জাতিনির্ব্বিশেষে সর্ব্বমানবের করেছে। সে আমাদেরও।

মানুষের মধ্যে যে বহির্মুখীনতা আছে তাকে কেউ বলেছে সয়তান, কেউ বলেছে মার, কেউ বলেছে রিপু। তার সঙ্গে মানুষের যেন দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। তাকে দমন করা, তার উপর জয়ী হওয়া, এই যেন মানুষের সাধনা। এই সাধনার মধ্যে সত্য যতটুকু থাকুক, একে অবলম্বন করলে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে একাসনে বসে রইতে হয়, প্রকৃতির রূপ গন্ধ গান হয় নিষ্ফল নিরর্থক। এ সাধনায় সিদ্ধি যদি বা আসে তবে যেন pyrrhic victory, তাতে প্রাপ্তির ভাগ ক্ষুদ্র।

এ ছাড়া অন্য এক সাধনা যে সম্ভব তা আমাদের জানা ছিল না। এতে পাপেরও স্থান আছে প্রলোভনেরও মূল্য আছে, সয়তানকে এ সাধনা শত্রু বলে না। কারুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব নেই, কারুর উপর জয় নেই, সকলে সহায়। সৌন্দর্য্যকে সম্ভোগ করতে হয়, বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে হয়, প্রবৃত্ত হতে হয় নব নব অসাধ্যসাধনে। এই সাধনার মন্ত্র—এক এক করে ছাড়িয়ে চল, আটকে থেক না। মানবাত্মার আসক্তি সাজে না, বিশ্রাম নেই, আরাম ভয়াবহ। ভোগ কর, কিন্তু ভোগের পরক্ষণে ত্যাগ কর। ত্যাগের বেদনাকে এড়াতে চেয়ো না। ভালও যথেষ্ট ভাল নয়। ভালও আজ বাদে কাল ভাল নয়। ভাল মন্দ দুইই নিতে হবে, ছাড়তে হবে। পাপ কর, কিন্তু পাপে জড়িয়ে যেয়ো না। প্রলোভনের অনুবর্ত্তন কর, কিন্তু অধীন হোয়ো না। এইভাবে চরিত্র পাক পূর্ণতা, চরিত্রবলের দ্বারা অক্ষত থাক। জীবন বৈচিত্র্যে ভরে উঠুক, উপলব্ধিতে আসুক সমৃদ্ধি, সত্যের সঙ্গে পরিচয় হোক সত্যতর।

মানুষ যদি কোনোখানে বাধা না পড়ে, ক্ষান্তি না দেয়, তবে প্রকৃতির নিয়মে তার মৃত্যু হলেও মৃত্যুতে তার বিরতি নেই। তার চলা এবার মর্ত্ত্যে নয়, অতিমর্ত্ত্য লোকে। এবার তার সাথী সয়তান নয়, শাশ্বতী। এই বিশ্বের অন্তর্লোকবাসিনী যে নারী মর্ত্ত্যলোকে মানবের সঙ্গিনী হতে পারল না, মর্ত্ত্যে যার পরিসর সঙ্কীর্ণ বলে অসীমের অভিসারক যাকে পরিত্যাগ করল, স্বর্গে সেই নারী ভাগবত করুণাবাহিনী, তারই নিত্য প্রার্থনা ভাগবত করুণাকে আবাহন করে আনল, গঙ্গোদকের মত মানবের শীর্ষে ছিটিয়ে দিল, মানব ধরল দিব্য কলেবর। একটি কেন্দ্রে স্থিত হয়ে সে করেছে আপনাকে

নিস্পৃহ, সে রেখেছে মুহূর্তের প্রেমকে চিরন্তন করে, তার তপস্যা তার প্রিয়তমকে ঘিরে। সেই কল্যাণরূপিনী যদি প্রদর্শক না হয় তবে মানব—যে মানব অভিজ্ঞতার চরমে গিয়ে—মৃত্যুতে উপনীত হয়ে—অমৃতের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, পায়চারি করতে থাক্‌বে, প্রবেশ পাবে না। নারী তাকে ছাড়পত্র এনে দেয়, ভিতরে নিয়ে যায়, ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর লোকে ক্রমাগত নিয়ে চলে। সেই নিরুদ্দেশ ঊর্দ্ধ যাত্রাই নিরন্তর স্বর্গভোগ। সে ভোগ নারী-সমন্বিত।

পরম সঙ্গিনীর প্রশস্তিতে Goethe-র ফাউষ্ট সমাপ্ত হল। স্থান বৈকুণ্ঠ, কাল চিরকাল। প্রশস্তিকারকরা স্বর্গীয় চারণ।

All things corruptible
Are but reflection.
Earth's insufficiency
Here finds perfection.
Here the ineffable
Wrought is with love,
The Eternal-Womanly
Draws us above.*

লীলাময় রায়

* A. G. Latham-এর অনুবাদ। (Everyman's)

এই জীবন

যখন করোনার সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে রায় দিলেন, 'সাবিত্রী দেবী, খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করেছেন', তখন খগেনবাবু সব কথা সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছেন ব'লে মনে হ'ল না। সাহেব চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন, কিন্তু খগেনবাবু চেয়ারে বসেই রয়েছেন দেখে উকীল বাবু তাঁর জামা ধ'রে টান দিলেন। তাই খগেনবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন, মুখ থেকে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে গেল, 'মহাশয়, ধন্যবাদ'। সাহেব দুঃখ জানিয়ে চলে যাবার পর উকীল মহাশয় তাঁকে বাইরে এনে ট্যাক্‌সীতে তুলে দিলেন। গাড়ি ছাড়বার পূর্ব্বে তিনি খগেনবাবুকে তাঁর একটি ছোট্ট কর্ত্তব্যের কথা লজ্জার সহিত স্মরণ করাতে বাধ্য হলেন। পকেট থেকে একখানি নোট বার ক'রে তাঁকে দেওয়াতে তিনি বল্‌লেন, 'চিরকাল আদর্শ নিয়ে থাকলে চলে না, খগেনবাবু, আমরাও যুবা-বয়সে ঐ রকমই ছিলাম; কি আর বল্‌ব, তবে যদি কখনও উপকারে আসি, সত্যি কৃতজ্ঞ হব। ভুলবেন না, আমি ঐ কোণের চেয়ারেই বসি, লোকে যে যাই বলুকগে, আপনি তোয়াক্কা করবেন না। আমি অন্ততঃ আপনাকে বুঝেছি, আমি উকীল, পুলিশ্‌কোর্টে দশ বছর ঘুরছি, মানুষ চিনতে আর বাকী নেই। মেয়েমানুষ হিংসেতে সব করতে পারে, কেবল ছেলের মা হতে পারে না, এই দেখুন না, পাঁচটি মেয়ে। হাঁ, এই নিন রায়টা, নচেৎ মড়া ছাড়বে না।' গাড়ী ছুটল মেডিকেল কলেজের দিকে।

বড়বাজার ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর কোণে পুলিশ গাড়ি থামিয়ে দিলে, এঞ্জিনের ধক্ ধক্ শব্দ হতে লাগল। পাশেই একটি রিকশ'র ওপর একটি স্থূলকায় ভদ্রলোক বসেছিলেন। পায়ের কাছে একটা মস্ত মোট, খুব বড় সতরঞ্চি হবে। রিকশওয়ালা হাঁফাচ্ছে। সারি বন্দী গাড়ি গড়ের মাঠের দিকে ছোটবার জন্য তৈরী। দেরী দেখে রিকশ'র ভদ্রলোক আলাপ জমাতে লাগলেন, 'এই যে খগেনবাবু! আজ খেলা দেখতে যাবেন না? আমি যাব না, কেবল ভিড় খাও, আর পয়সা খরচ কর। ট্যাক্‌সীতে বসে

সিগারেট খাবেন না।' খগেনবাবু সিগারেটটা উলটে পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। ফাঁক দিয়ে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছিল, হাতটা ট্যাক্সীর বাইরে রাখলেন। কোথায় যেন এঁকে দেখেছেন মনে হল। হাঁ হাঁ মনে পড়েছে—ভদ্রলোক বিবাহাদি শুভকার্য্যে বাড়ী সাজান, তাঁর শ্বশুরবাড়ীর পরিচিত, তাঁরই বিবাহে প্যাণ্ডাল সাজিয়েছিলেন, বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রে সামিয়ানা পুড়ে যায়, পরের দিন নতুন আসরের কোণে গোটাকয়েক পোড়া বাঁশ জড় করা ছিল মনে আছে। ভদ্রলোকের অত টাকা লোক্সান হওয়াতে পরে মাথা খারাপ হয়েছিল, বিকারের খেয়ালে আগুন আগুন করে চেঁচাতেন নাকি। পুলিশম্যান বাঁশী বাজালে, ট্যাক্সীর মিটারে বার আনা উঠেছে। গাড়ি বেঁকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে এল। তাঁরও মাথা খারাপ হবে নাকি? না, তাঁর কেন হবে? তিনি তিলমাত্র দোষ করেন নি। সাবিত্রীর স্বভাবই ছিল তাই—সন্দেহ, আর সন্দেহ। এধারে ভালমানুষ ছিল, বিবাহের কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত ত কোন গোলমাল করে নি, তারপর, তারপর কোথা থেকে তার বন্ধুর দল জুটল, সব শিক্ষিতা। মাসীমা ঠিকই বলতেন, 'শিক্ষার মুখে ছাই, শিক্ষার দ্বারা ভালবাসতে শেখে না, ভালবাসাতে শেখায়।' তিনি অল্প কথায় অমনি জ্ঞানের কথা কইতেন। তাঁর ঐ অপবাদ। তিনি কিনা তাঁর বোনপোর সব দোষ ঢাকতেন, যার ওপর তার মন পড়েছে তাকে আদর করে বাড়ীতে আনতেন, নিজের বাড়ীর বৌএর ওপর জাতক্রোধ, কারণ কি? আর 'বোনপো আর দেওরঝির সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে দু'দিক থেকেই সুবিধা হত, সেটা হয় নি!' ছিঃ ছিঃ—মাসীমার কেবল দোষ ছিল, ছেলেকে পশুর মতন ভালবাসা, অন্ধ স্নেহ। তাঁর উচ্চশিক্ষা ছিল না, ছিল হৃদয়। হৃদয়ের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল, সেই জন্য তিনি কেবল ভালবাসতেই জানতেন, প্রথমে ছেলেকে, ছেলে বই বোনপো কখনও ভাবেন নি, তার পর ছেলের বৌকে। নিজের প্রতি কোন মায়াই তাঁর ছিল না। সেই মাসীমাকে বিয়ের অল্পদিনের পরই কাশীবাসী হতে হল। ও ধরণের স্ত্রীলোক কখনও নিজকে ভালবাসার সামগ্রী করে তোলে না, নানা প্রকার মনোহারী সাজসজ্জার দ্বারা। আর সাবিত্রীর বন্ধুরা, রমলা দেবী, সাবিত্রীও! দামী সাড়ি, সেঁটে পরা, হাতকাটা ব্লাউস, ঢিলে খোঁপা, চোখে সুর্ম্মা, পায়ে

নাগ্‌রা, তাদের হৃদয় কোথায়? হৃদয় হয়ত আছে, তবে হিংসায় পোরা, মাৎসর্য্যে ভর্ত্তি। এ শিক্ষার মুখে ছাই!

ট্যাক্সী মর্গের সামনে এল। ভাড়া চুকিয়ে খগেনবাবু নেমে পড়লেন। অঙ্গনে দুটি পাহারাওয়ালা, আর অনেকগুলি মোটর রয়েছে। সকলের কি একই দশা? নিশ্চয়ই ডাক্তারদের। একটি তার মধ্যে পরিচিত গাড়ি, শেভ্রলেট নতুন মডেলের। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ ধরণের গাড়ি কিনলেন আশানাথবাবু, স্ত্রী রমলা দেবীর জন্য, সেই গাড়ি চড়ে সাবিত্রী সারা কোলকাতা ঘুরে এলেন, আশানাথবাবু এখনও চড়েন নি বোধহয়, কিনে দিয়েই কর্ত্তব্যে তাঁর ছুটি হয়ে গিয়েছিল। নতুন গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে ফেরবার পর খগেনবাবু দেখেছিলেন তাঁর স্ত্রীর চোখে সুরমা, গালে ও ঠোঁটে রং, পরণে লাল ডগ্‌ডগে সাড়ি, সাড়িটা নিশ্চয়ই রমলা দেবীর। খগেনবাবু ঘোর রং পছন্দ করতেন না, এবং ঐ রকম সাজসজ্জার উগ্রতা তাঁকে পীড়া দিত। পত্নীবন্ধুর অনুকরণে তাঁর স্ত্রীর রুচিবিকার ঘটছে দেখে তিনি বরাবরই প্রতিবাদ করতেন, ফল হত না। এবার প্রতিবাদ করেছিলেন সকলের সমক্ষে। উত্তর পেয়েছিলেন, 'তোমরা যখন মাছরাঙ্গা পাখী সেজে টেনিস খেলতে যাও, তার বেলা?' খগেনবাবু উত্তর করেছিলেন, 'কৈ, আমার ব্লেজার নেই ত?' সাবিত্রীর বদলে রমলা দেবীই উত্তর করেছিলেন, 'আপনার নেই বটে, কিন্তু আপনাদের থাকে, আপনি মিশুক নন্, নিজের কাজ নিয়েই থাকেন, আপনভোলা। যারা সমাজে মেশে তাদের ব্লেজার থাকে। আপনি নিজের সম্বন্ধে কেয়ারলেস্ বলে সাবিত্রীও তাই হবে? আপনি সত্যই সাবিত্রীকে ভালবাসেন, নিজের মতো ক'রে গড়তে চান, নয় কি?' খগেনবাবুর মনে একটা প্রশ্ন উঠছিল, নিজে তা হলে চাপা রং ব্যবহার করেন কেন? কিন্তু রমলা দেবীর হাসিমুখের সাংঘাতিক প্রশ্নকে ঠাট্টা ভেবে চুপ করে রইলেন, সাবিত্রীর ইঙ্গিতে হাসিমুখে বাড়ীতে পদার্পণ করতে অনুরোধ করেছিলেন, রমলা দেবী আসেন নি, গাড়ির দরজা নিজে খুলে দিতে হয়েছিল, সাবিত্রীর চোখের তাড়নায়। আজ রমলা দেবী এসেছেন মৃতবন্ধুর দেহের প্রতি শেষ সম্মান জ্ঞাপন করতে, খৃষ্টান হলে যেমন মালা নিয়ে যেতেন গোরস্থানে। এ দুদিন খুবই করেছেন, কিন্তু আজ এখানে

ধাওয়া করা উচিত হয় নি নিশ্চয়ই। সাবিত্রীর সঙ্গে, খগেনবাবুর অনেক কথা কইবার প্রয়োজন ছিল। আজ তিনি অনেক প্রাণের কথা কইবেন, মনে মনে তার সঙ্গে, এই ভেবেছিলেন, কিন্তু গাড়ি দেখেই তাঁর মন কেমন আপনা থেকেই বিমর্ষ হয়ে গেল। আজ ওদের আসবার দরকার ছিল না, আসাটা অশোভন হয়েছে। সাবিত্রীর বন্ধু স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল আজও কি তাকে অপসৃত করবার সুযোগ মিলবে না। কি অদ্ভুত মর্‌বিড্ রুচি এই মহিলাটির! পরের উপকার ইনি করবেনই করবেন, রোজ না পরের উন্নতি করলে রাতে ঘুম হয় না, নিশ্চয়ই এঁর ঘরে বিবেকানন্দের ছবি, আর টেবিলে মহাত্মাজীর দেহের ওপর অস্ত্রোপচারের চীনে মাটির মডেল আছে, আশানাথবাবুও ধারে কোথায় কি করেছেন কে জানে? কেন যে রমলা দেবী নার্স কি লেডী ডাক্তার হলেন না ভগবানই জানেন! আশ্রম খুললেও পারতেন, বিবাহিতের সংসারে শান্তি বিরাজ করত!

মর্গের মধ্যে কন্‌কনে হাওয়া। চার ধারে কাচের আলমারী, সর্ব্বত্র সাদা পাথরের টেবিল, একটার চার পাশে ডাক্তার ও ছাত্রের দল, সাদা ওভার-অলপরা, ডাক্তারের হাতে সাদা রবারের দস্তানা, ছাত্রদের মুখে ব্যস্ততা ও অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য, সব মুখ বুজে কাজ করছে, কাজ আর কি! ডাক্তার সাহেব পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, খগেনবাবুকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এলেন। করোনারের রায় দেখাতে ডাক্তার সাহেব অ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে বল্লেন, 'মল্লিক, পাঁচ নম্বরের লাস খালাস হল, ছেলেদের তা হলে ছুটি, আবার এলে দেখা যাবে।' ডাক্তার সাহেব ঘড়ির দিকে চেয়ে দ্রুত পদে বেড়িয়ে গেলেন। পাশের একটা গা-আলমারী থেকে ডালা বেরিয়ে এল, পা দুটো একদম হল্‌দে, বাকী অঙ্গ ঢাকা, পায়ে সেই ছেলেবয়সে গরম দুধ পড়ে যাওয়ার দাগ। এক জন সিনীয়র ছাত্র এগিয়ে এসে বল্লেন, 'লোকজন এনেছেন ত' না আমাদের দলকে খবর দেবো, পাঁচটাকা ক্লাবে চাঁদা দিলেই হবে।' পিছন থেকে একটি মহিলা — রমলা দেবী — সব সাদার মধ্যে রং-এর শিখা — সাবিত্রীর বন্ধু এগিয়ে এসে বল্লেন, 'খগেনবাবু ওটুকু আর হতে দেবেন না, আত্মীয়-স্বজন ডাকুনগে—যান,—না হয়, আমার গাড়িটাই নিয়ে যান—ড্রাইভারকে আপনি ত চেনেন—আচ্ছা চলুন আমিই না হয় যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।' 'না আপ-

নাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি একলাই নিয়ে আসছি।' 'সে কি হয়! আপনি পারবেন না, আমারও কর্ত্তব্য আছে, আপনাকে এ অবস্থায় একলা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।' 'কোন ভয় নেই আমার সম্বন্ধে' 'লোকজন কোথায় পাবেন ?' 'লোকজন, আচ্ছা, ক'জন চাই, আমার সব বন্ধুরা আছেন বটে, কিন্তু—' 'তাদের খবর দিয়ে আজ কাজ নেই, খবর তারা পরে পেলেই হবে; আজকের দিনটা না হয় আমার কথা শুনুন, চিরজীবনই স্বাধীন থাকবেন, আর কখনও আপনাকে বিরক্ত করবনা।' রমলা দেবীর চোখের কোণে জল দেখে খগেনবাবু আর আপত্তি করলেন্ না—লোকই বা তিনি কোথায় পাবেন ? বাইরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলেন, সামনের সীটে নয় একেবারে রমলা দেবীর পাশে। কি রকম অস্বস্তি হচ্ছিল, অথচ মজার, পরিহাসের। তিনি মোটরে তাঁর এক বন্ধুপত্নীর পাশে বসে তাঁকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যান, লোকে দেখতে পায়, সঙ্গে কেউ ছিলনা, তাইতে কত না গণ্ডগোল হ'ল; এই রমলা দেবীর এক মহাবচন উদ্ধৃত করে সাবিত্রী তাঁকে তর্কে পরাস্ত করে, 'কৈ কোন্ সমাজে কোন্ পুরুষ অন্যের স্ত্রীকে তাঁর স্বামীর অবর্ত্তমানে পাশে বসিয়ে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যায়?' খগেনবাবু বিলেৎ-ফেরৎ ছিলেন না, হিন্দুঘরের সন্তান, বড় ঘরে মেশেন নি তাই তাঁর মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। রমলা দেবী উচ্চ শিক্ষিতা, বিলেৎ-ফেরৎ সমাজের কন্যা না হ'লেও সেই সমাজের মহিলা, আধুনিক ইংরিজি সাহিত্য-পড়া, ডিকেন্স, থ্যাকারে. চার্লস রীডের ভক্ত, লুকিয়ে লেডী চ্যাটার্লির 'লাভার'ও পড়েছিলেন, খগেনবাবু প্রমাণ পেয়েছিলেন। আজ সেই রমলা দেবীর পাশে বসে চলেছেন, তবে থিয়েটার দেখতে নয়, শবযাত্রার যোগাড় করতে। আনন্দোপভোগের নিয়ম থেকে নিরানন্দের উপকরণটা অন্ততঃ ভিন্ন হবেই হবে, তবে ঐ যা সাবিত্রীর দেহটা এখনও নিঃশেষিত হয়নি। গাড়ির এক কোণে আলগোছে খগেনবাবু বসে রইলেন, তাঁর দৃষ্টি রাস্তার দিকে। পূর্ববঙ্গীয়দের জামা কাপড়ের দোকান অতিক্রম করে গাড়ি মির্জ্জাপুরের এক গলিতে প্রবেশ করলো; মোড়ের মাথায় একটি গান্ধিটুপি পরা ছেলে আনন্দবাজার বিক্রী করছিল, খগেনবাবুর কেনবার ইচ্ছা থাকলেও সাহস হলনা, পাছে নিজের খবর নিজেকে পড়তে হয়। রমলা দেবী এক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ

করলেন, খগেনবাবু আর নামলেন না। রমলা দেবীর ফিরতে দেরী হবে দেখে তিনি মোড়ের উপর এক চায়ের দোকানে এক কাপ চা তাড়াতাড়ি তৈয়ারী করতে অর্ডার দিলেন। পাছে চা'র নেশা রমলা দেবীর কাছে বিসদৃশ ঠেকে এই লজ্জায় ডিসে ঢেলে অল্প সময়ের মধ্যেই চা পান শেষ করলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'তেই দেখলেন, জন কয়েক সুদর্শন যুবক নেটের গেঞ্জী পরে, কাঁধে টার্কিশ তোয়ালে ফেলে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিমন্ত্রণ-বাড়ীর মেয়ে খাওয়ানোর দিন তেতালার ছাদের কোণে কর্ম্মের অপেক্ষায় যেমন দাঁড়িয়ে থাকে। রমলা দেবী একজনকে সম্বোধন করে বললেন, 'আচ্ছা বিমল, বিজন সুজনদের খবর দিলে কেমন হয়?' 'আগেই খবর পাঠানো হয়েছে, তারা খাট নিয়ে আসছে।' রমলা দেবী পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনিই — — —, খগেন-বাবু, আমি আর যাবনা, এরাই যাবে, খগেনবাবুর শরীরটা খারাপ, দেখো তোমরা ওঁকে নিয়ে এখানেই এসো।'

গাড়িতে চারজন যুবক উঠ্‌লেন, ছাড়বার সময় রমলা দেবী একটি ছেলের হাতে কি একটা গুঁজে দিলেন, বাকি কয়জন হেঁটে চললেন। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই মর্গের দরজায় গাড়ি এল, সকলে নামলেন। খগেনবাবু ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশের হুকুম পাওয়া গিয়েছে, আপনারাই বা'র করুন না?' 'আগে খাট আসুক।' 'ততক্ষণ?' 'ততক্ষণ আর কি করবেন, চলুন, কলেজের রেষ্টুরেণ্টে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্, আপনিও কিছু খেয়ে নিন, ভাল খাবার দেয়, ভেজাল দেবার যো নেই, এটা মেডিকেল কলেজ, বেলগেছেও নয় বাজারও নয়।' খগেনবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন, 'বেশতো, বেশতো, চলুন না।' বলেই কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন কিছু নেই। তাঁর মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে একজন বললেন, 'আচ্ছা আপনি থাকুন, আপনার শরীর খারাপ, আমরা আস্‌ছি।' 'এ ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়' বলে খগেনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

যুবকবৃন্দ চলে গেলে খগেনবাবু আজ এই প্রথম একলা হ'লেন। একলা তিনি মনে মনে বহুদিনই হ'য়েছিলেন। হয়তো, জন্মেছিলেন ভীষণ একলা হ'য়ে, যমজ-আত্মার একটি হ'য়ে নয়। মনে কেউ যমজ

হয়না, দেহে-ই হয়। কবিরা কি ভীষণ মিথ্যা কথাই না লিখতে পারেন? সেই মিথ্যা কথার জন্য কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে যদি তাঁরা জানতেন তা হলে, তা হলে তাঁরা ··· কি লেখা ছেড়ে দিতেন? কখনই নয়। তাঁরা অত্যন্ত অসামাজিক জীব, সমাজের কল্যাণ-কামনায় তাঁরা ব্যস্ত নন, অথচ সুখ্যাতিটুকু চাই। মানুষ হ'ল একলা, সে সজারুর মতন থাকে গর্ত্তের মধ্যে, গর্ত্তের মুখে কত পাতা, কত কুটো দিয়ে নানারকমের বাধা স্থষ্টি করছে পাছে শত্রু আক্রমণ করে। গর্ত্তের মধ্যে সজারু থাকে শঙ্কিত চিত্তে, বাইরের হাওয়া প্রবেশ করলো, ভেতরে সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো, ঐ বুঝি এল! এক নিঝুম গোধূলিতে সে বেরিয়ে পড়লো খাদ্যের অনুসন্ধানে, বাইরে এসে তা'র পা আর চলে না, গর্ত্তের মুখের কাছে এসে আর এগোতে চায়না, ছুটোছুটি করে; কোথা থেকে ঝমর্ ঝমর্ শব্দ আসছে! আবার ভেতরে যাওয়া ও বাইরে আসা। ওধারে ক্ষুধার তাড়না। সেই বাইরে আসতেই হয়, সেই ঝমর্ ঝমর্ শব্দ সারা দেহ বেষ্টন করে বাজ্‌তে থাকে, বাগানের কাঁটা বেড়ার কোন এক ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে, মূল উপড়ে খেতেই হয়। কপাল গুণে ফিরে আসে আবার নিজ আবাসে, সেখানে সেই অন্ধকারের মধ্যে অন্তরীণ-বাস; কপাল দোষে আর ফিরে আসতে হয় না, বাগানের মালী কলার তেড় ছুঁড়ে তাকে মারে, কাঁটা গুটিয়ে নেবার পূর্ব্বেই আটকে যায়, তখন—তখন আবার সেই অন্ধকার! এই ত প্রকৃতির নিয়ম, এই ত জীবন! মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষের প্রকৃতিও তাই, পার্থক্য শুধু মিথ্যা আবরণের আবডালে ভীতি গোপন, পার্থক্য শুধু মালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের আত্ম-প্রবঞ্চনা, পার্থক্য কেবল কাঁটার উপর সামাজিকতার আভরণ। মাতৃগর্ভে অন্ধকার, কবরের মধ্যে অন্ধকার; মানুষে সীতার সন্তান, সীতাই হলেন আদিম মানবমাতা। অথচ এই অন্ধকারের মধ্যে এক সহযাত্রী জুটল। নিজেই পথ পায়না আবার পথ দেখাতে হবে অন্যকে; সে আবার অন্য পথ খুঁজতে ব্যগ্র নয়, মাত্র, কেবল, নিছক নির্ভরশীলা অর্থাৎ পথের কণ্টক। নিজেই এই গুহার মধ্যে ভয়েতে কাঁপছে, প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত হচ্ছে, তার উপর এই গুহাবাসিনী অন্ধকার-ধর্ম্মিণীর আত্মার কল্যাণ-কামনা করা, তাকে অভয় দেওয়া। আপনি খেতে ঠাঁই পায়না শঙ্করাকে ডাক। তাও ডাকা যেত

যদি তার অস্তিত্বে, উপস্থিতিতে ভয় দূর হত। মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, সে আবার পরের ভাবনা ভাববে! ভয় দূর করতেই সে গুহার গায়ে ছবি আঁকছে, দুরন্ত প্রকৃতির পরিতোষ বিধান করছে, তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করছে, সে আবার পরকে সাজাতে, তার তৃপ্তি সাধন করতে কতটুকু পারবে? পারেনা, শক্তির সীমা আছে সেই জন্যই পারেনা; আর নিন্দে হয়; নিন্দে হয় রমলা দেবীর মতন পত্নীর বন্ধুদের কাছে, যাঁরা আত্মসন্ধানী নন। যাঁরা থাকেন গুহার বাহিরে, গাছের ডালপালায় অন্যান্য সামাজিক জীবজন্তুর মতন। কিংবা থাকেন গাছের ফলের মধ্যে রসশোষণ করবার জন্য, ভেতরটা ভুয়ো করে দেবার জন্য, কিংবা যাঁরা পরাগ ছড়াবার জন্য ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ান। এঁদের দৃষ্টান্তে, এঁদের উপদেশেই সাবিত্রী গুটি-কেটে প্রজাপতি হয়েছিলেন। তাইত এই অঘটন ঘটল। সাবিত্রী স্বধর্ম্মেই যদি আত্মনিধন করতেন, তা হ'লে খগেনবাবুর আপত্তি ছিলনা। পিন্-এ আটকানো মরা প্রজাপতি হওয়ার চেয়ে মরা গুটি হয়ে রেশমের যোগান দেওয়া ঢের বেশী সামাজিক কাজ।

খাট এল, শব নামান হল। খগেনবাবুকে শবের কপালে সিঁদুর পরাতে হল। মুখটা নীল, পা হলদে, পায়ের শিরগুলো নীল হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। কী ঠাণ্ডা! এক বিগৎ ওপর থেকেই ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। বিমল নিজেই পায়ে আল্‌তা পরিয়ে দিলে। কোথা থেকে এরা সব শিখলে? পরনে সেই রঙ্গীন শাড়িটা। উল্‌টো মুখ করে খাটে চড়ানো হল। একটি ছেলে গায়ের উপর খদ্দরের চাদর বিছিয়ে দিলে। যেন ভৌতিক ক্রীড়ার মতন সব আপনা থেকেই, হয়ে যাচ্ছিল। রমলা দেবীর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁরই মত কর্ম্মতৎপর। খাটটা কাঁধে তোলবার সময় মুণ্ডটা নড়্‌নড়্ করে উঠ্‌ল। একজন বাহক বলে উঠলেন, 'দোহাই মা, জেগে উঠবেন না।' অগ্রবর্ত্তী বাহকদের মধ্যে যিনি বামস্কন্ধ দিয়েছিলেন তিনি বলে উঠলেন, 'কি ইয়ারকী করছিস! একটিন সিগ্‌রেট্ নে, হরি বোল বলতে নেই জানিসত?' খগেনবাবু কাঁধ দেননি, তাই তাড়াতাড়ি দোকান থেকে একটিন সিগারেট কিনতে গেলেন। কি রকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। তাঁর গলাটা বন্ধ হয়ে আসছিল, রসিকতা না করলেই চলত! হরিবোলে আপত্তি কি? হরিবোলের আওয়াজটাও যে মধুর তাও নয়, শুনলে ছেলেবেলা লেপ্

মুড়ি দিতেন, বড় হবার সঙ্গে সে ভয়টা যায়নি, কেবল মনে হত নীচু জাতেই হরিনাম করে, নামকীর্ত্তন করে, ভদ্রলোকে হয় শাক্ত, না হয় বৈদান্তিক, না হয় ব্রাহ্ম, কিংবা অবিশ্বাসী। কিন্তু এ যেন মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে! যারা আত্মহত্যা করে তারা কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা, আর সেই জন্যই কি ঈশ্বর-বিশ্বাসী শববাহীরা তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করে না? নেটের গেঞ্জী, কাঁধে তোয়ালে, মাথায় চুলের পশ্চাদাভিমুখিনতা লক্ষ্য করলে মনে ত হয় না যে এঁরা সকলেই ভগবানে বিশ্বাসী। এ যুগে কে-ই বা বিশ্বাসী? বিশ্বাসী কেউ হতে পারে না। বিশ্বাস বড় বোঝা। কাঁধ কি তাঁকে দিতেই হবে? না দিলে খারাপ দেখায়; দায় তাঁর, এদের নয়। না দিলে রমলা দেবী হয়ত কিছু মনে করতে পারেন। জীবিত অবস্থায় স্ত্রী বহন, আবার মৃতা স্ত্রীর শববাহন, দুই কাজই কি রমলা দেবীর ইচ্ছায় করতে হবে? খগেনবাবু সিগারেট্ টিন কিনে ও খুলে দ্রুতপায়ে শবযাত্রীর নাগাল ধরলেন। চিত্তরঞ্জন আভিনিউ দিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কর্ত্তব্যবোধে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন, কাঁধ দিলেন, কিন্তু পাঁচমিনিটেই গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল, কাঁধে ব্যথা উঠল, খাটটা ক্যাঁচ্-কোঁচ্ করছিল, ভয় হল এইবার বুঝি তাঁরই দোষে পড়ে যাবে। কাতরভাবে চাইতেই একজন যুবক সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, মুখে যেন একটু হাসি লেগে রয়েছে। খগেনবাবু যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন। রাস্তার আগুনে পা পুড়ে যাচ্ছিল, রাস্তার এক কলে হাত পা ও মুখ ধুলেন। বীডন্‌ষ্ট্রীট দিয়ে, চিৎপুর পার হয়ে নিমতলায় পড়লেন। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে কি একটা আছে, ডাক্তারদের বাড়ি থেকে আরম্ভ করে কাঠের দোকান, মালসার দোকান পর্য্যন্ত সবই আছে এখানে, প্রত্যেক জিনিষটাই যেন শেষ মুহূর্ত্তকে এগিয়ে আনছে। এ রাস্তায় বুড়োবুড়ি ভিন্ন অন্যলোক সহজে চোখে পড়েনা, বাকি সব হিন্দুস্থানী, মুস্কো মুস্কো, দুষ্মনের মতন চেহারা, বোধহয় 'চ্যারণে'র বংশধর মাঝিমাল্লা না হয়ে চিতের চালাকাঠ কাটে।

নিমতলার ঘাটেও কিসের ব্যস্ততা। আলো সতেজে জ্বলছে। খাট নামিয়ে দলের মধ্যে নীরব ব্যক্তিটি কনষ্টেবলের সঙ্গে ঘাটের অফিসের দিকে গেলেন, খগেনবাবুর কাছ থেকে করোনারের রায়টি চেয়ে নিয়ে। অন্যান্য

যুবকেরা খাট ছুঁয়ে খগেনবাবুকে বসে থাকতে অনুরোধ করে এক এক ক'রে অদৃশ্য হলেন। শবের মুখে পাংশুতা ভেদ ক'রে যে কমনীয়তা ফুটে উঠেছে সেটি লক্ষ্য করবার সামগ্রী। মুখের এই কোমলতা সাবিত্রীর প্রধান আকর্ষণ ছিল, এই শান্ত ও গম্ভীর মাধুরিমায় সকলে মুগ্ধ হ'তেন। ব্রাহ্মরা বল্‌তেন, 'কি মিষ্টি,' গিন্নীরা বলতেন, 'কচি', পুরুষেরা বলতেন, 'কি লাবণ্য', খগেনবাবু একে একদিন বলেছিলেন, 'মুখোস'। ব্যক্তিত্বটাই হল একটা অদৃশ্য মুখোস। খগেনবাবুর খরদৃষ্টিতে সাবিত্রীর যে প্রকৃতিটা ধরা পড়েছিল সেটি রূপে বিশুদ্ধ লাবণ্যময়ী ছিলনা; তার ধাত ছিল খানিকটা শক্ত লোহা, খানিকটা সাধারণের সন্তোষবিধানের জন্য প্রচেষ্টার খাদ, এবং সে রূপের ওপর পড়েছিল অন্যের প্রকৃতির ছাপ ও অনুকরণ। মুখের মধ্যে একটা ভয়ের চিহ্নও থাকত, সেটাকে দেখেই সাবিত্রীকে 'বনের হরিণ' কবে কে একবার বলেছিল, সাবিত্রীর মুখে তিনি শুনেছিলেন। আজ সেটা পরিস্ফুট হয়েছে! কিসের ভয়? হরিণের, আদুরে পোষা খরগোসের সন্দিগ্ধচিত্ততার, না মৃত্যুর মতন সত্যের সামনাসামনি দাঁড়াবার? হাতের চুড়িটা ঢল্ ঢলে হয়েছে, গলার হারটা উলটে গিয়েছে। খগেনবাবু ধীরে ধীরে হারটা গুছিয়ে সোজা করে দিলেন। এই হারটা নিয়ে একবার কতদীর্ঘ অভিমানের পালা হয় তাদের মধ্যে! সাবিত্রী বলেছিলেন, 'আমি হার পরলে সকলে বলে ভারী সুন্দর দেখায়, তুমি ত আমাকে মুখ ফুটে একবারও ভাল দেখাচ্ছে বলনা?' খগেনবাবু উত্তর করেন, 'তোমাকে না পরেই ভাল দেখায় কি না, তাই বলিনা।' সাবিত্রী রাগ করে হারটা গলা থেকে টেনে খুলে ফেলেন, আট্‌কাবার পিন্‌টা খারাপ হয়ে যায়, খগেন-বাবু সারিয়ে দেবার জন্য স্যাকরা ডাকেন। স্যাকরা এলে শোনেন, গহনাটা রমলা দেবী নিজের আশ্রিত অন্য এক স্যাকরার দোকানে আগেই নিজে দিয়ে এসেছেন। খগেনবাবুর একটু অভিমান হয়; সে অভিমান প্রকাশের উত্তরে সাবিত্রীর মুখ থেকে এক অদ্ভুত জবাব পান, 'তুমি পরের বৌএর গহনা ভেঙ্গে গেলে সারিয়ে দাওগে যাও, আমার জন্য তোমার কোন কষ্ট করতে হবে না।' খগেনবাবুর এক বন্ধুর স্ত্রীর কোন এক গহনা খারাপ হয়ে যায়, তিনি সেটাকে স্যাকরা বাড়ি দিয়ে এসেছিলেন, সে অবশ্য রমলা

দেবীরই আশ্রিত দোকানী-টি। কথা বেশ হেঁটে বেড়ায়! ঘটনাটি মনে পড়তেই খগেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পাশেই একটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের দেখছে। খগেনবাবু সাবিত্রীর মুখ আড়াল করে দাঁড়ালেন। আচ্ছা ভদ্রলোক ত'! ঠোঁট ভীষণ পুরু, হাতে পানের বোঁটায় চুন, চোখের কোল মিশ্ কালো, খুবলম্বা কালো চুল চোখের ওপর এসে পড়েছে, সে চোখের জ্যোতি নেই, তার সব যেন ঘুমন্ত। কী দেখছে? খগেনবাবু তার চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিলে। খগেন-বাবু আবার বসে পড়্‌লেন খাটের এক কোণে। ভয় হল খাট ভেঙ্গে যাবে, নেমে উবু হয়ে মাটিতে বসলেন, খাট ছুঁতে ভুলে গেলেন। মনে হল সে লোকটা আর নেই সেখানে। নিশ্চয়ই কোকেন খায়, ভদ্রলোকের ছেলে, তাই অত শঙ্কিত দৃষ্টি, শ্মশানচারীর মত খরদৃষ্টি নয়। সাবিত্রীর এমনই চাউনি ছিল কেন কে জানে? তাকে কে যেন জাদু করেছিল, পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা কত বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্র জানে, কিন্তু সে ত' পাড়াগেঁয়ে মেয়েই নয়, পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের ঘৃণাই করত, তার বন্ধুদের মধ্যে সকলেই উচ্চশিক্ষিতা। কি আশ্চর্য্য! সাবিত্রী বেশী দূর পর্য্যন্ত স্কুলে পড়েনি, তবু সে পাসকরা মেয়েদের প্রিয়পাত্রী ছিল। একজন খগেনবাবুকে মুখের উপরই বলেছিলেন, 'আপনি পাসেরই কদর করেন, কিন্তু দেখুন দেখি সাবিত্রীকে, বোঝা যায় যে ও পাস করেনি?' খগেনবাবু উত্তর দেন, 'সবই আপনাদের আশীর্ব্বাদে।' সে রাত্রে তিনি সাবিত্রীকে বলেন, 'তোমাকে ওঁরা অমন পেট্রনাইজ করেন সহ্য কর কেমন করে? নিজেরা পাস্‌টাস্ করে অন্যের প্রতি ও রকম অনু-কম্পা সকলেই দেখাতে পারে। আমার ভারী রাগ হয়।' সাবিত্রী রাগটাকে হিংসাই বলেছিলেন। খগেনবাবু নামে আপত্তি জানান, কিন্তু সে আপত্তি না-মঞ্জুর হয়। তিনি পূর্ব্ব হতেই অন্য অনেক সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন, তাই বোঝার ওপর শাকের আঁটি তাঁর লঘুভার মনে হল। মৃদুস্বরে এই-টুকু কেবল বলেছিলেন, 'হিংসে কার আছে আর কার নেই ভগবানই জানেন!'

এই যে সাবিত্রী আজ হল্‌দে হয়ে খাটের ওপর শুয়ে নিমতলার ঘাটে পড়ে রয়েছে তার কারণ হিংসে। ব্যাপার কি? সামান্য, অন্ততঃ সামান্য

করে নেওয়া চলত। খগেনবাবুর পিসতুতো বোন কোথা থেকে বেড়াতে এল কোলকাতায়, সাবিত্রীরই বন্ধু, সেই তাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিল। নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে বলে শেষে আফশোষ করেছে। খগেনবাবু গান ভালবাসতেন, এই মেয়েটির গলা ছিল ভারী মিষ্টি। সাবিত্রী গান গাইতে জানত না, তার দলের কেউই জানতেন না, চেষ্টা করতেন সকলে। রমলা দেবীর বিফল প্রয়াসকে সাবিত্রী চরম সার্থকতা বিবেচনা করত, খগেনবাবু করতেন না। ফলে তাঁর পিসতুতো বোন—আঁখিয়ার ('নামটা ভদ্রঘরের মেয়ের উপযুক্ত নয়'—সাবিত্রী পরে বলেছিল) আওয়াজ হয়ে উঠেছিল ভীষণ নাঁকি, আর তাল ছন্নছাড়া। সকলে তাঁরা গানের নির্ম্মম সমালোচক! যাক্ সে সব কথা না স্মরণ করাই ভাল। উবু হয়ে বসে বসে খগেনবাবুর পা টন্ টন্ ও শিরদাঁড়া ব্যথা করছিল, কাঁধেও ব্যথা, সমগ্র দেহে একটা ক্লান্তি আসছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাতেই কাঁধটা টিপতে আরম্ভ করলেন। কোলকাতা সহরেও কাঠ, ঘি, পুরুত যোগাড় করতে এত দেরী হয় না কি? শেষে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করতে হবে বোধহয়। সেটা শ্রাদ্ধের সময় করলেই হবে। না; তিনি শ্রাদ্ধ করবেন না, শ্রদ্ধা নেই তার আর শ্রাদ্ধ কি? তবে প্রায়শ্চিত্তটা মন্দ নয়। যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে—আদালতে, লোকসমক্ষে, সেই রমলা দেবীর কাছেই সাহায্য নিয়ে।

কাঠের যোগাড়-যন্ত্র হয়েছে, সাবিত্রীকে ঘি মাখিয়ে স্নান করানো হল। বড় বড় কাঠ সাজিয়ে চিতা তৈরী করে তার ওপর তোলা হল। দেহটা কী শক্ত! তার মনের মতন, নির্জীব বলেই কঠিন। এবার মুখে আগুন দেবার পালা। ঐ মুখের সঙ্গে এককালে, সে আজ থেকে বহুপূর্ব্বে, তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল, আজ গত কয়েক বৎসর ধরে ঐ মুখ থেকে নানা কথাই শুনে এসেছেন, সবগুলি মিষ্টি নয়, তবে সবই ভদ্রভাষায়। মার্জ্জিত-রুচি ঐ ঠোঁট দুটো থেকে যেন ক্ষরত। গলার আওয়াজই দু' রকমের! বন্ধুদের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় নরম, স্বামীর বেলা ঈষদুষ্ণ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক, একটা আদরের ও আদর খাবার, অন্যটি আদর প্রত্যাখ্যানের, যেন আদর না পেয়ে পেয়ে অভিমানিনীর হৃদয় ও মন শুকিয়ে গিয়েছে। হাতে আগুনের নুড়ো জ্বলছে, ওপর হাতে তাত লাগল। নুড়োটা একটু উঁচু করে ধরলেন। পুরুত

মশাই বল্লেন, 'এইবার দিন, আর বলুন মন্ত্র, ঐ দেখুন না আমার আরো তিনটে কাজ পড়ে রয়েছে'। খগেনবাবু মন্ত্রোচ্চারণ করে চুলীতে আগুন ধরালেন। কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে, অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কি দুর্গন্ধ! যেন উনুনে ফ্যান পুড়েছে, সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। খগেনবাবু আধখানা চুল বাঁধা দেখে বলেছিলেন, 'যে রাঁধে, সে চুল বাঁধেনা?' সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দিয়েছিল, 'এখান থেকে চলে যাও'। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে।··· প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট্ পুট্ করে শব্দ হতে লাগল, গা ফেটে জল বেরোচ্ছে, কি রকম হল্‌দে রংএর, বার হওয়া মাত্রই উবে যাচ্ছিল। ভীষণ ধোঁয়া! চাওয়া যায় না, চোখ জ্বালা করে, কর্ কর্ করে। হঠাৎ দড়াম ক'রে একটা কাঠ ফেটে গেল। খগেনবাবু চমকে উঠে একটা সিগারেট ধরালেন। একজন লোক লাঠি দিয়ে কাঠগুলো উল্‌টে দিলে, নিবন্ত আগুন আবার জ্বলে উঠল। এই রকম কতবার হয়েছে! নানাপ্রকারে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সাবিত্রীর মনে হয়ত সন্দেহ কমানো গেল, সাবিত্রী নিজে ডেকেই আঁখিয়ার গান শুনেছে, সে গানের সুখ্যাতি করেছে, দিন কয়েকের জন্য সংসার সুখের হয়ে উঠেছে। তার পর, তারপর, হঠাৎ একদিন চা-পার্টি থেকে এসে সে কী কাণ্ড! সাবিত্রী ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই খগেনবাবু একটু যেন চমকিত হয়েই বল্লেন, 'তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।' সাবিত্রী উত্তর করলে, 'বল কি! তোমার আঁখিয়ার চেয়ে? হঠাৎ চমকে উঠলে কেন? আর কেউ আসবে ভেবেছিলে বুঝি?' খগেনবাবুর মনটা মুসড়ে গেলেও হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'তুমি সব চেয়ে সুন্দর। এত যে সুন্দর কখনও ভাবিনি, তাই হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দে চমকে উঠলাম।' 'কখনও ভাবনি, অথচ রমলা দি সেদিন বলছিল...' 'দ্যাখ, নজীরের প্রয়োজন নেই, আমার চোখ আছে...ঐ রমলা দেবীই তোমার মাথা খাবেন, তোমার সর্ব্বনাশ করবেন'। 'তোমার চোখ আছে জানি—সেটা আঁখিয়াকে দেখবার জন্যই। রমলা দি যদি আমাকে একটু স্নেহ করেন তাহলে তোমার অত ঈর্ষা হয় কেন বলত? আমার মাথা ত' গেছেই আমার সর্ব্বনাশ যোগ্যা পাত্রীর দ্বারা হলেই ভাল হত! তুমি আঁখিয়ার মধ্যে

কি পাও বলত ?' 'ও সব কথা ছাড়, লক্ষ্মীটি।' 'আদর করতে হবেনা আমাকে, না, তোমাকে বলতেই হবে আজ।' 'ওর মধ্যে ভদ্রতা আছে, স্নেহমমতা আছে, ভাল জিনিষকে ও ভাল বলতে জানে, অনেকটা মাসীমার মতন মনে হয়, এর বেশী বলতে পারি না।' 'মাসীমার মতন! তাঁর নাম আর করতে হবে না, তোমার সঙ্গে তাঁর দেওরঝির বিয়ে দিয়ে গিন্নীপনা করতে পারলেন না, রাজ-রাণী হতে পেলেন না, তাই মনের দুঃখে কাশীবাসী হলেন। তাঁর কথা আর বোলো না। ভাল বলতে জানে! জানে ও ছলাকলা। কী রকম ব্যবহার করে ওর স্বামীর সঙ্গে তা আমার জানা আছে—ওর ননদের শ্বশুর-বাড়ী রমলাদির বোনের বাড়ীর পাশে—তুমি যদি ওর নাম কর আবার তা হলে আমি আর ভদ্রতা রাখতে পারব না, বিষ খেয়ে মরব।' এই বলে সে কানের দুল খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আবার আগুন জ্বলে ওঠে। বিষ তখন খায়নি, তবে ঐ রকম তুচ্ছ ব্যাপারেই খেয়েছিল।

আগুন প্রায় নিবে এল। রমলা দেবীর আত্মীয়েরা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। পুরোহিত ঠাকুর হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বল্লেন, 'এই বার শেষ কাজটি করতে হবে, নাভিকুণ্ডলটি বার করুন, আত্মঘাতিনীর কার্য্যে দক্ষিণা আমরা বেশী নিয়ে থাকি।' বয়োজ্যেষ্ঠটি বল্লেন, 'সে হবে এখন, বিজন বার কর ত' ভাই।' পুরোহিত ঠাকুর তখন অন্য একটি নবাগত শবের দিকে চেয়ে আছেন। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'দেরী করবেন না, ইতস্তত করছেন কেন? স্ত্রীর বুঝি সন্তান-সম্ভাবনা? তা হলে এলেন কেন? ও কি! আপনি কেন যাচ্ছেন? এ ত' স্বামীর কর্ত্তব্য, সহধর্ম্মিণী ত?' খগেনবাবু লাঠির ডগা দিয়ে ছাই ঘেঁটে একটা পোড়া মাংসপিণ্ড বার করলেন। সাবিত্রীর শেষ চিহ্ন! দুটো মাল্‌সার মধ্যে চাপা দিয়ে নাভি-কুণ্ডলীটা নিয়ে গঙ্গার ধারে অগ্রসর হলেন, অন্যান্য সকলেই এলেন। মন্ত্রোচ্চারণ করে মালসাটা যতদূর পারেন দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মনে মনে খগেনবাবু বল্লেন, 'তোমার আত্মা যদি থাকে, তবে তার তৃপ্তি হোক্।" মেয়েদের হিংসা-দ্বেষ এই নাভিকুণ্ডল থেকেই ওঠে। এইটাই যোগ-সূত্র, বংশ-পরম্পরায়। সবই এদের নাড়ির টান। কে জানে! পরজন্ম যদি থাকে তা হলে সাবিত্রী যেন আর মেয়েমানুষ হয়ে না জন্মায়,

বাঙ্গালী হিন্দু-পরিবারের মেয়ে হওয়ার চেয়ে পশুজন্মও ভাল। ছিঃ ছিঃ—ছিঃ! আত্মঘাতিনীর মানবজন্ম হয়ও না। মেয়েদের আবার আত্মা! হিন্দু-শাস্ত্রেই আছে—কি আছে খগেনবাবুর ঠিক মনে পড়ল না, তবে নিশ্চয়ই আছে ঐ ধরণের কথা। তারপর কলসী করে জল এনে চুলী নেবাবার পালা, পুরোহিত-বিদায়, বিছানা-ভাগ, পোড়া গহনা খোঁজা, শ্মশান-বন্ধু ও কনষ্টেবলকে বক্‌সীস্ দান, তারপর স্নান। তোয়ালেটার বেশ্ গন্ধ। কার তোয়ালে কে জানে?

খগেনবাবুর শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল—কাঁধে ভীষণ্ ব্যথা, কলসী বয়ে হাত টন্ টন্ করছে, ঘাটের সিঁড়ি ভেঙ্গে গোছ ফুলে উঠেছে, পায়ের তলায় পাকা ফোড়ার মতন ব্যথা, রোদ্দুর ও আগুনের তাপে মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, চোখ জ্বলছে, কর্ কর্ করছে ধোঁয়া লেগে। দু'খানা ট্যাক্‌সী আনতে বলে একটা সিগারেট ধরালেন, জিব শুক্‌নো ভাল লাগল না, একটা পান খেলে হয়, এখন খাওয়া যায়না, সিগ্‌রেটটা ফেলে দিলেন। একটা ট্যাক্‌সী এল, আর এল সেই নতুন মডেলের শেভ্রলেট। বনেটের সাদা ক্রোমিয়ম প্লেট-গুলো গ্যাসের আলোয় ঝক্ ঝক্ করে উঠল। খগেনবাবু ট্যাকসীতে উঠ্‌তে যাচ্ছিলেন—বিজন বল্লে, 'না, এই গাড়িতে উঠুন।' মন্ত্রমুগ্ধের মতন সেই গাড়িতেই উঠ্‌লেন, হুড ঢাকাই ছিল। গাড়ি বিডন্ ষ্ট্রীটে এসে পড়ল। দুধারের বাড়ীর দোতলার বারাণ্ডায় দু'একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, ভেতরে গান চলছে, 'দুল দুল্ টুল্ টুল্, ভরা যৌবন...ব্যথার ব্যথী,' সব বাংলা—সব গজলের সুর। একটা ঘরের ভেতর একটা বড় আলোকচিত্র চোখে পড়ল—মাথায় পাগড়ী-বাঁধা কোন শিক্ষিত সাধুর। গাড়ি জোরে ছুটছে—রাস্তার আলো এক একবার যাত্রীর মুখের ওপর পড়ছে, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, আবার অন্ধকার। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউএর দক্ষিণে হাওয়া, শোভা-বাজার, বাগবাজার অঞ্চলের বনেদী বাড়ীর বড় বড় গাড়ি পালতোলা নৌকোর মতন মন্থরগতিতে বাড়ী ফিরছে, এঞ্জিনের আওয়াজ নেই, সাহেবদের গাড়ি তাদের অতিক্রম করে ব্যারাকপুরের দিকে ছুটছে। সঙ্গের ট্যাক্‌সীটা এগিয়ে চলল। ট্যাক্‌সীর নম্বর অন্য ধরণের, সব T দেওয়া। খগেনবাবু গাড়িতে ভাল করে ঠেস্ দিয়ে বসলেন, চোখ বুজতে পারছিলেন না, আগুন ও আলোর

শিখা চোখ বুজলেই নেচে উঠছিল। চিরকালই জ্বলবে না কি? একটু জ্বালা কমলে শান্তি পাওয়া যায়। কবে চোখ স্নিগ্ধ হবে?

গাড়ি সেই মির্জ্জাপুরের গলির মধ্যে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব্বের গাড়িতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এক মালসা আগুনের ওপর হাত তাতাচ্ছেন। খগেনবাবু গাড়ি থেকে নেমে আগুনের দিকেই গেলেন না। সকলে একটু নিমপাতা ও মটরডাল চিবুলেন, খগেনবাবু পিছনেই দাঁড়িয়ে রইলেন। চাকরে জল ও তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—তিনি প্রথমেই হাত পা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছলেন—তোয়ালেটা ভিজিয়ে রাখা হয়েছে—বেশ গন্ধ। রমলা দেবী এক গেলাস সরবৎ নিয়ে যখন এলেন, তখন খগেনবাবু নীচের ঘরের তক্তপোষের ওপর শুয়ে, লাফিয়ে উঠে এক চুমুকে পূরো গেলাসটা নিঃশেষ করলেন। বুকটা ঠাণ্ডা হল। চোখে বড় কষ্ট হচ্ছিল, রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোলাপ জল এনে দিই?' 'বড় ভাল হয়।' রমলা দেবী গোলাপ জলের শিশি আনলেন, খগেনবাবু হাতের কোষে গোলাপজল নিয়ে চোখ ধুলেন। খানিক ক্ষণের জন্য চোখ ঠাণ্ডা হল, খগেনবাবু চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। আবার জ্বলতে লাগল, চোখ খুলে দেখেন রমলা দেবী হাতে শিশিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ধীরে মধুর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনও কষ্ট হচ্ছে না কি? একটু মাথায় দিন।' খগেনবাবু খানিকটা ঢেলে মাথায় দিলেন। 'কিন্তু চোখের ভেতরে আগুন জ্বলছে।' 'আচ্ছা, চোখ বুজে শুয়ে থাকুন, আসছি।' রমলাদেবী ড্রপার নিয়ে এলেন—খগেনবাবু উঠে বসতে চাইছিলেন। 'উঠে বসলে দেওয়া যাবেনা, শুয়েই থাকুন।' বড় তাকিয়ার ওপর মাথা রেখে খগেনবাবু শুয়ে পড়লেন, আঙ্গুল দিয়ে নিজের চোখের পাতা ফাঁক করলেন, রমলাদেবী তাঁর ডান চোখে ড্রপার দিয়ে দু' ফোঁটা গোলাপজল ফেল্‌লেন। মাথার ওপর পাখাটা জোর ঘুরছিল, বাঁ চোখে ফেলবার সময় মাথার ওপর শাড়ির অংশটা উড়ে কাঁধের ওপর নেমে গেল। সামলাতে গিয়ে বাঁ-চোখের ওপর দশ বার ফোঁটা পড়ে গেল। গড়িয়ে সেটা মুখের মধ্যে যাচ্ছিল। হাতের কাছে তোয়ালে না থাকার দরুণ রমলা দেবী 'আমি একটা অপদার্থ' বলে শাড়ির আঁচলটা দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। খানিকপরে বল্লেন, 'আবার ডান চোখটা

খুলুন, পড়েনি।' 'পড়েছে।' 'না, মাত্র দু'এক ফোঁটা, খুলুন।' বাঁ-চোখটায় আরাম হচ্ছিল, ডান চোখটায় হচ্ছিল না। খগেনবাবু ডান্ চোখটা আবার খুললেন, ফোঁটা ফেলবার সময় রমলা দেবীর হাতটা কাঁপছিল। বেশ ফর্শা দেখাচ্ছিল হাতটা, সোনার চুড়ীর রংএর সঙ্গে বেশ মিলে গিয়েছিল, মনঃসংযোগের একাগ্রতায় মুখে একটা দিব্যভাব এসেছিল। চার পাঁচ ফোঁটা পড়বার পর খগেনবাবু বল্লেন, 'আর না।' তারপর চোখ বুজে শুয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির দাস

কবিতা-গুচ্ছ

সঙ্গতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া, আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবেনা গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে ক্ষেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয়-কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।
তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।
দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখী উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রং তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।
তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধূলো,
যারা স'রে যায় তারা শুধু—লোকগুলো ;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কী রয়েচে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেচে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্ম্মে আছি বর্ম্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন ॥

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাগর-তীরে

বালুর বেলায় জল-কন্যারা না কি
মুক্তার মত শাদা হাসি হাসে গভীর রাতে,
ঢেউরা যখন কালো পাহাড়ের পাথর ঘিরে
ডানা ঝাপ্‌টায় খাঁচার পাখীর মতো ?

দূর সাগরের ঢেউএর ফেনার কোলে
জল-কন্যারা চেয়ে থাকে না কি আকাশ-পানে,
মুঠো মুঠো তারা বিছায়ে আকাশে আঁধার বুঝি
ছায়া-পথ রচি' গোপনে তাদের ডাকে ?

পাপ্‌ড়ির গালে শিশির পড়ার মতো
লঘুপদে যদি যাও কোন দিন সাগর তীরে,
ছায়ার মতন কাছে এসে ঘেঁসে দাঁড়াবে, দেখো,
ছায়াপুরী ছেড়ে জলকন্যারা সবে।

সজল নিটোল নীল আঁখি-পানে চেয়ে
স্বপন আনিও নয়নে, কয়ো না একটি কথা,
কথা যদি কও দেখিবে কোথায় মিশেছে তারা
সুমুখে সাগর করতালি দেয় শুধু।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সনেট

১

আসন্ন বিদায়ক্ষণ অস্বীকার করিবারে আর
উপায় র'ল না কোন। নিশ্চিত জানিনু চিত্তমাঝে
চঞ্চল তরণী ভরি' রজ্জুতে রজ্জুতে এবে বাজে
যাত্রার আভাসধ্বনি, বিদায়ের অশ্রু হাহাকার।
রৌদ্রধৌত নভস্তলে দাঁড়াইয়া হেরিলাম দূরে
ক্ষীণ হয়ে আসে তট, ক্ষীণতর নরনারীদল
যতক্ষণ দেখা যায় চেয়ে থাকে নিস্পন্দ নিশ্চল,—
উজ্জ্বল আলোক কাঁপে চিত্ত ভরি' বিরহের সুরে।

অসহায় বেদনায় দূর হ'তে রিক্ত আঁখি মেলি'
আমি শুধু চেয়ে থাকি। শুধু দেখি তুমি উদাসীন
নয়ন মেলিয়া সখি কুসুম-অলস করতলে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছ। নীল সিন্ধু উঠিল উদ্বেলি'
নিষ্ঠুর বিদ্রূপভরে। দেখিলাম অশ্রুবাষ্প জলে
ম্লান মুখচ্ছবি তব দূরান্তরে হয়ে এল লীন।

২

আসিয়া দেখিনু সখি দীর্ঘচ্ছন্দা দেহখানি তব।
সেই পরিচিত গৃহে, সেই পরিচিত শয্যাপরে,
এখনো সে চেনা হাসি রহিয়াছে আভাসে অধরে,
এখনো রয়েছে অঙ্গে সেই রক্ত বাসখানি নব।
শিথিল দক্ষিণ বাহু হেলায় রয়েছে পড়ি পাশে,
ললাটে অলকচূর্ণ, অনুপম মুদিত নয়ন
—সুখের শয়নে যেন রহিয়াছ স্বপনে মগন,
বুকের বসন যেন এখনো কাঁপিছে মৃদু শ্বাসে।

হৃদয় স্পন্দন মম থামি গেল সহসা নিমেষে।
সহসা মুছিল মোর ধরণীর যত রূপ হাসি।
দেখিলাম জগতের কালজীর্ণ প্রাচীন কঙ্কালে
মৃত্যুর লিখন লেখা। জানিলাম লেখা ছিল ভালে
দাঁড়ায়ে প্রাণের কাছে অসঙ্কোচে স্নিগ্ধ হাসি হেসে
সুদীর্ঘ জীবন ভরি' আর কভু ডাকিবে না আসি'।

হুমায়ুন কবির

অনুরোধ

একদিন যারা কাছে ছিল, ছিল প্রিয়
কালের প্রবাহে সখি তাদের ভুলিও।
জীবনের বন্ধুর তরঙ্গাকুল পথে
হয়তো পথের বাঁকে দৃষ্টিপথ হ'তে
অকস্মাৎ চলে যায়,—যেমনি সহসা
একদিন এসেছিল। নিশির তমসা
মূর্ত্তিখানি হয়তো মুছিল অন্ধকারে।
তুমি থামিলে না,—এলে রাত্রি পরপারে।

যারা ছিল প্রিয় একদিন, আজি তারা
কেবল মনের স্মৃতি ক্ষীণ—বস্তুহারা
দেহহীন প্রেত। স্মৃতির কঙ্কাল টানি'
প্রেম নাহি বাঁচে, শুধু চিত্তে বাড়ে গ্লানি।
পুরাতন প্রেম যদি আজি ছায়া সম,—
নামুক হৃদয় ছেয়ে বিস্মৃতির তম।

হুমায়ুন কবির

অবিনাশী

সত্য যাহা চিরকাল সত্য তাহা রবে।
একদিন মিথ্যা তারে মনে হ'তে পারে,
একদিন বেদনায় তপ্ত অশ্রুধারে
ভুলিতে চাহিবে ভালো বেসেছিলে কবে।
তবু ভুলিবে কি কভু? অন্তরের তব
ভাণ্ডারে সঞ্চিত রবে অতীতের স্মৃতি,
আনন্দ-বেদনা-অশ্রু মুখরিত গীতি
ঐশ্বর্য্য রচিবে চিত্তে নিত্য নব নব।

সংসারের স্রোতধারা দূর হতে দূরে
দুর্ব্বার আবেগভরে ফেলিবে টানিয়া
পুরাতন জীবনের ছিন্ন খণ্ডগুলি।
—তবুও হৃদয় ভরি' পরিচিত সুরে
অকস্মাৎ স্মৃতি যবে উঠিবে ধ্বনিয়া
চিত্ত স্তব্ধ চেয়ে রবে বর্ত্তমান ভুলি।

হুমায়ুন কবির

বসন্ত-বিদায়

চৈত্রের চিতার পরে রাখি বামপদ, নতমুখে
বারেক ফিরিয়া বধূ কহিলো ঃ এবার আসি তবে।—
বসন্ত বাতাসে ভাসি এসেছিনু যৌবন-উৎসবে
বাসনার পুণ্যতীর্থে ; মধুমাসে ফুটেছিনু সুখে
প্রগল্‌ভা পুষ্পসম বারংবার মর্ম্মান্ত কৌতুকে
তোমারে বিভ্রান্ত করি ; অনুরাগে তুলে নিলে যবে
দুঃসহ হৃদয়াবেগে শিহরিয়া পুলকে গৌরবে
টুটিয়া লুটিয়াছিনু বেদনা-বিহ্বল তব বুকে।—

তুমি এই পৃথিবীর বলদৃপ্ত পরুষ যৌবন—
কণ্ঠে বাণী কলবাক্, বক্ষে উষ্ণ আসঙ্গ-আশ্লেষ ;
দুরূহ সাধন-লব্ধ দিলে মোরে তব শ্রেষ্ঠ-ধন!
সে তব বিহ্বলগান ফুটিলো যা কামনা মুকুলে
দোঁহার তৃষ্ণার যজ্ঞে! আক্ষেপের নাহি অবলেশ ;
আমার যা ছিল সব রহিলো সে ঝরা ফুলে ফুলে।

সুফী মোতাহার হোসেন

তরুর উদ্বোধন

(প্রকাশ্যে)

রবি, আমায় তুমি বাসো না ভালোবাসো না
কভু বাসো না ঃ
তাই ভুলেও তুমি আমার কাছে আসো না
কই, আসো না!

আমি নিত্য তব চরণপানে
বিথারি বাহু বরণ-তানে ঃ
তবুও তুমি মেঘ-আড়ালে
পলাও ; কেন হাসো না
ফুটে হাসো না ?
না না ঃ যারেই ভালোবাসো না কেন
তরুরে ভালোবাসো না
কভু বাসো না।

(স্বগত)

বুঝি মেলিতে শাখা সূর্য্য পানে
গোপন মূলে ছায়ার টানে
র'য়েছে বাধা লুকায়ে—
মোর লুকায়ে ?
বুঝি ভালো না বেসে চাই যে ঃ ভালো
বাসুক মোরে অরুণ-আলো,
যায় না মোহ মিলায়ে
তাই মিলায়ে ?
তাই কুহেলি হেন কৃষ্ণ হয়ে
ছায় হিমে এ-বক্ষ ?
ভুলি ঃ লীলায় ফুলজীবনরস
উথলে রবি-লক্ষ্য ?

(প্রকাশ্যে)

রবি, রহিতে ফুল-লক্ষ্য তুমি চাও না
কভু চাও না ঃ
তাই এ-প্রাণমূলে তোমার সুর গাও না
কভু গাও না।

তাই　　পাতালে বাঁধি' রাখিলে মোর
নীল-উদাসী নেত্র ; ঘোর
আলোক হানি' নিচের টান
উন্মূলিতে দাও না
আজও দাও না ;
না না ঃ　যারেই তুমি চাওনা ভানু,
তরুরে কভু চাও না
স্নেহে চাও না।

(স্বগত)

বুঝি　পাতালতলও সবিতা-স্নেহ
সাধিছে ! গুহা. বিরহী—সেও
রশ্মি আজি বরিবে
প্রেমে বরিবে !
রাজা　তিমিরে মোরে পাঠাল তাই
অগ্রদূত সম ? সেথাই
নিখিল-মন মোহিবে
আরও মোহিবে ?...
তবু　কেন যে ক্ষোভ কৃষ্ণ হ'য়ে
ছায় প্রাণে অশান্তি !
ভুলি ঃ　ঊর্দ্ধমূল কুসুম-দূত
নিম্নটানই ভ্রান্তি !

(প্রকাশ্যে)

রবি,　স্বগত ছাঁদে মিছে প্রবোধে ভুলাবে
কারে ভুলাবে ?
যদি　সত্য আলো—মেঘতরাসে লুকাবে
কেন লুকাবে ?

যদি পাতালও চায় দূরিতে ধূমে,
কেন সে মোরে জড়ায়ে ঘুমে
রহে এখনও ?—কেন বা তুমি
পিপাসা নাহি পূরাবে
আজও পূরাবে ?
না না ঃ যারেই কেন দাও না ধূপ
মোর ছায়া না লুকাবে
কভু লুকাবে।

(স্বগত)

বুঝি দিবস-সুর রজনী-রাগে
জ্বলে নবীন সুষমা-ফাগে
ঝুরিয়া হোলি-দ্যোতনা
নব দ্যোতনা ?
তাই অন্ধ রসাতলও মাগিল
তোমারে ?—চিরনিশা চাহিল
তপন-অনুমোদনা
উদ্বোধনা ?
বুঝি আত্মপ্রেমই দীরঘ-শ্বাসে
নিবারে আলো-ধর্ম্ম ?
রুধে তাই কি নব-দিগ্বিজয়ে
কোটি জড়িমা-বর্ম্ম ?

(প্রকাশ্যে)

ও কী ! সহসা কার বারতা কানে পশিল
আজি পশিল ?
শুধু নহে তো কানে—অন্তরেও ধ্বনিল
সে যে ধ্বনিল !

তাই	সহসা বুঝি অচিন মায়া
ধরিল পরিচিতের কায়া ?
না বুঝি বিভাবসুর বাণী—
তবু পাষাণ সরিল
প্রাণে সরিল ।

কার	কিরণ-ভূমিকম্পে ?—বুকে
হিরণকর পশিল
কার পশিল ?

(স্ফুট)

আজি	স্বগত-ঊষা মধ্যদিনে
বিকচি'—টুটি' জাঙাল হীনে
যুগের তমী ভাসায়ে
দিল ভাসায়ে !

কাঁপি'	অতল-মূল সে-হিল্লোলে
রূপান্তর-ছন্দ-দোলে
অপ্রেমেরে লুটায়ে
দিল লুটায়ে !

তাই	মুগ্ধ অভিমান আজিকে
মুছিল ঃ জ্যোতিস্বপ্ন

উরি'	জাগর-বুকে ঝঙ্কারিল
যুগান্তর-লগ্ন !

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সৃষ্টিরহস্য

আয়ুর সোপানমার্গ বহু কষ্টে অতিক্রম করি
উন্মুক্ত মৃত্যুর প্রান্তে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়ায়েছি এসে ;
সিন্ধুর ভাস্বর আঁখি খোঁজে মোরে নিম্নে নিরুদ্দেশে,
আমার আরতিদীপ শূন্যতায় সাজায় শর্ব্বরী ॥

সম্মুখে নিখিল নাস্তি, পাছে মোর মৌন নীরবতা ,
প্রশান্তি দক্ষিণে বামে, জনহীন অন্তর বাহির ;
তবু কার আবির্ভাবে কণ্টকিত আমার শরীর,
অবচেতনার তলে গুমরে কী জাতিস্মর কথা ?

তবে কি বিরাট শূন্য শূন্য নয়, সাগরের প্রেত,
উদ্বেল বিক্ষোভ তার পরিণত অমূর্ত্ত ঈথারে ?
তবে কি দুর্ম্মর মর্ত্ত্য ক্রন্দসীতে ক্রন্দন বিথারে,
শস্যের মিসরী শবে উপ্ত বন্ধ্য ভবিষ্যের ক্ষেত ?

নির্লিপ্ত আলোর দ্বীপ নয় ওই দিব্য নীহারিকা,
কালের প্রপাতে মগ্ন বাসনার ভাসমান ফেনা ;
অবচ্ছিন্ন তারারাশি, ওরা চিরদিনকার চেনা
পশুদের স্থূল সত্তা, মূর্ত্তিমান গৃধ্নু বিভীষিকা ॥

নাই নাই মৌন নাই, সর্ব্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ ;
নির্ব্বাণ—বুদ্ধির স্বপ্ন, চিরঞ্জীব জ্বলন্ত হৃদয় ;
হয়তো মানুষ মরে, কিন্তু তার বৃত্তি বেঁচে রয় ;
জন্ম হতে জন্মান্তরে সংক্রমিত প্রত্ন মনোরথ ॥

কৃত্রিম কল্পনা ত্যাগ, নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন,
অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা, সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা ;
বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই, মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা ;
সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

বিচিত্রিতা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু চিত্রিত প্রচ্ছদ ও অনুচ্ছদসহ চমৎকার বাঁধাই।

বিচিত্রিতা কাব্যগ্রন্থখানি কয়েকখানি পরমসুন্দর চিত্রে শোভিত। স্বয়ং কবি, শিল্পী-শ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, গৌরীদেবী, সুনয়নী দেবী, প্রতিমা দেবী, নিশিকান্ত রায় চৌধুরী, মণীষী দে, প্রভৃতি চিত্রশিল্পীরা এই ছবিগুলি আঁকিয়াছেন।

এখানে কবিতা কয়টিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিব। এগুলির মূলসুর "আশীর্ব্বাদ" কবিতাটিতেই রহিয়াছে, সেটি হইতেছে পঞ্চাশ বৎসরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ। কবি ও শিল্পী উভয়েরই রচনার মধ্যে বাসন্তিক স্পর্শ রহিয়াছে, এই স্পর্শ অনন্তরেই স্পর্শ। ইহাই তাঁহাদের সৃষ্টির ভিতরকার কথা। শিল্পীকে সম্বোধন করিয়া কবি তাঁহার নিজের মনের কথাই বলিয়াছেন,—

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইসারা করে কত,
তুমিও তারে ইসারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইসারা অবিরত।
... ...
চির-বালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা প'রে।
তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে
নব বালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তা'র ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তা'রে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে॥

কবিতাগুলিতে এই বার্দ্ধক্যবিজয়ী যৌবনের আভাসই পাই, অসীমের দিকেই তার টান; সেইজন্যই অনন্ত বিশ্বের সুর এমনি করিয়া এখানে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগুলি একেবারেই স্বচ্ছন্দ, গভীর দার্শনিকতার সুর এখানে ত আছেই কিন্তু আরো বেশী আছে উপলব্ধির প্রকাশ। বিশেষের নিজস্ব আত্মগত স্বরূপটি কবির "সৃষ্টি করা দৃষ্টিতে" ধরা ত দিয়াছেই, কিন্তু তাহার পিছনে অসীম কালের যে পটটি রহিয়াছে তাহাও সকল সময়ে তাঁহার চিত্তাকাশে বিরাজ করিতেছে। মানবজীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে বিশ্বখেলোয়াড়ের খেয়ালটিকে তিনি দেখিতে পাইতেছেন। সব কিছুই তাঁহার মনে অনন্তের বাণী আনিতেছে।

বিচিত্রিতায় কবির মনের যে কথা প্রকাশ পাইয়াছে সে কথা তিনি আগে অন্যান্য কাব্যে কয়েক বারই বলিয়াছেন, এবারেও সে সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে একটি অপূর্ব্ব মহিমায়, একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে। এই নিরাভরণ, এই সরল হৃদয়াবেগ, গভীরতম অনুভূতির স্পর্শ, ইহার মূল্য নিরূপণের চেষ্টার কথা ত মনেই আসে না; সমস্ত মন দিয়াই ইহাকে উপভোগ করিতে হয়। এখানে প্রেম প্রেমাস্পদের সত্যতম সত্তাকে চাহিয়াছে, আবার সেই সঙ্গেই নিজেরই সত্যতম সত্তাকে প্রকাশ করিয়াছে।

> বারে বারে বনে বনে জন্ম লই নব নব বেশে
> নব নব দেশে।
> যুগে যুগে রূপে রূপান্তরে
> ফিরিনু সে কী সন্ধান তরে
> সৃজনের নিগূঢ় উদ্দেশে॥
> অবশেষে দেখিলাম কত জন্মপরে নাহি জানি
> ওই মুখখানি।
> বুঝিলাম আমি আজো আছি
> প্রথমের সেই কাছাকাছি
> তুমি পেলে চরমের বাণী॥
> তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
> আমাদের মিল।
> তোমার আমার মর্ম্মতলে
> একটি যে মূল সুর চলে
> প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল॥
> কী যে বলে সেই সুর, কোন্‌দিকে তাহার প্রত্যাশা,
> জানি নাই ভাষা।
> আজ সখি বুঝিলাম আমি,
> সুন্দর আমাতে আছে থামি,
> তোমাতে সে হোলো ভালোবাসা॥ (পুষ্প)

সৃষ্টিলীলার রহস্যের কথা রহিয়াছে আরো কয়েকটি কবিতায়; বিশ্বরচনার মূলে যে বাসনা, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র প্রকাশেও সেই একই বাসনা। এক বৃন্তে যুগলকে দেখিয়া কবি সেই জগৎপ্রবাহেরই ধারার স্পর্শকেই মনের মধ্যে পাইতেছেন,

> আমি থাকি একা,
> এই বাতায়নে ব'সে এক বৃন্তে যুগলকে দেখা,
> সেই মোর সার্থকতা।......
> সমস্ত বিশ্বের মর্ম্মে যে-চাঞ্চল্য তারায় তারায়
> তরঙ্গিছে প্রকাশ ধারায়
> নিখিল ভুবনে নিত্য যে-সঙ্গীত বাজে
> মূর্ত্তি নিল বনচ্ছায়ে যুগলের সাজে॥ (যুগল)

বিশ্বের মধ্যে বিশেষকে এবং বিশেষের মধ্যে বিশ্বকে দেখার সাধনাই কবির জীবনের সাধনা. সেই উপলব্ধিই কবির শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। "বিচিত্রিতা"র কয়েকটি কবিতায় সেই উপলব্ধির ধ্বনিই শুনিতে পাই। সমস্ত সুপরিচিত, অব্যবহিত বর্ত্তমান সংসারযাত্রার অন্তরালে সেই অসীম অনন্তের বোধই রহিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে "সাম্প্রতের আবরণ" মন

হইতে খসিয়া যাইতেছে, নিখিল প্রাণের ছোঁওয়া সকলেরই অন্তরকে উদাস করিয়া দিতেছে। "পসারিণী"কে কল্পনা কাব্যগ্রন্থে যখন দেখিয়াছিলাম তখন তাহার করুণ কোমল ক্লান্ত কায়টিই চোখে পড়িয়াছিল, "ঘুঘু ডাকে ঝিল্লিরবে, কি মন্ত্র শ্রবণে কবে, মুদে যাবে চোখের পলক।" বিচিত্রিতার "পসারিণী" কবিতাটিতে পসারিণীর ধ্যানের মন্ত্রটিই আকার পাইয়াছে,

আলোকে আকাশে মিলে
যে-নটন এ নিখিলে
দেখো তাহা আঁখির সম্মুখে,
বিবাট কালের মাঝে
যে ওঙ্কারধ্বনি বাজে
গুঞ্জরি উঠিল তোর বুকে।
পসারিণী. ওগো পসারিণী.
ক্ষণকাল তবে আজি ভুলে গেলি যত বিকি-কিনি।
কোথা হাট, কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা,
অনন্তের বাণী আনে
সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা॥

প্রকাশিতের মধ্যে অপ্রকাশিত, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত, দৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্যই বার বার আকার পাইতেছে, "যা দেখিছ তা'রে ঘিরেছে নিবিড় যা দেখিছনা তারি ভিড়"; পুষ্পচয়িনীর অঙ্গসাজের মধ্যে বহুদিনের আভাসই উঁকি দিতেছে,

মনে হয় যেন তুমি ভুলে-যাওয়া তুমি,—
মর্ত্ত্যভূমি
তোমারে যা' ব'লে জানে সেই পরিচয়
সম্পূর্ণ তো নয়।

কবি তাঁহার কবিতায় সেই সম্পূর্ণ পরিচয়ই দিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার প্রেমের দৃষ্টিতে সীমারও সীমা হারাইয়া গিয়াছে,

সে ছায়া তো ফিরিল না, সে আমার প্রাণে
হোলো প্রাণবান।
দেখি, ধরা পড়ে গেল কবে মোর গানে
তোমার সে দান।
* * * *
কেমনে জানিবে তুমি তারে সুর দিয়ে
দিয়েছি মহিমা।
প্রেমের অমৃত স্নানে সে যে অয়ি প্রিয়ে
হারায়েছে সীমা।

উষা-তরুণী তাহার "প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দরের" যে বর পাইয়াছে, তাহার উত্তরে প্রতিভাষণের বাণী পাঠাইতেছে,

বলো তারে, হে অজানা, জানি আমি জানি,
তুমি ধন্য, তুমি প্রিয়তম—
নিমেষে নিমেষে তুমি চিরন্তন মম।

এই গ্রন্থের শেষ কবিতা "বিদায়" যাত্রীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, কবি তাঁহার সমস্ত শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যই তাঁহাকে দান করিতেছেন,

আজি মোর চোখে
কাছের মূর্ত্তিব চেযে দূরের মূর্ত্তিতে তুমি বড়ো।
অনেক দিনের মোব সব চিন্তা করিয়াছি জড়ো,
সব স্মৃতি
অব্যক্ত সকল প্রীতি, ব্যক্ত সব গীতি,
উৎসর্গ করিনু আজি যাত্রী তুমি, তোমার উদ্দেশে
স্পর্শ যদি নাই করো যাক্ তবে ভেসে।

"বিচিত্রিতায়" কয়েকটি কবিতাতে নারীর প্রকৃত মহিমারই জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে। পূরবী, মহুয়া, পরিশেষ কাব্যগ্রন্থগুলিতে যে সুর শুনিতে পাই তাহাই আবার এখানেও ধ্বনিত হইয়াছে, "প্রকাশিতা" কবিতায় অধিকারগর্ব্বভরে অহঙ্কৃত বর তাহার ছায়েবানুগতা বধূর "ছোটো" রূপটিই দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু কবি জানেন যে একদিন এই সঙ্কোচের আবরণ দূর করিয়া বধূ তাহার সত্যরূপই প্রকাশ করিবে।

আজিকে এই যে বাজে শাঁখ
এরি মধ্যে আছে গূঢ় তব জয়ধ্বনি।
জিনি লবে তোমার সংসার, হে রমণী,
সেবার গৌরবে।
যেজন আশ্রয় তব তোমারি আশ্রয় সেই লবে। (প্রকাশিতা)

এখানে আর একটি কবিতার উল্লেখ করিব, সেটি "কুমার" এই প্রসঙ্গে খেয়ার "পথিক" ও মহুয়ার কয়েকটি কবিতা স্মর্ত্তব্য, "পথিক" একাই পথে বাহির হইতে চায়, তাহার সঙ্গিনী হইবার সাহস নারীর নাই, বরং করুণ কলগীতে সে বিদায় পথে বাধাই দিয়াছে, কিন্তু "বিচিত্রিতায়" নারী যাত্রীর রথসঙ্গিনী হইতেই চাহিয়াছে, মরুপথতাপ সহিয়া লইতেই তাহার আগ্রহ—

উদ্দেশহীন দুর্গম কোন্‌খানে
চলো দুঃসহ দুঃসাহসের টানে।
দিল আহ্বান আলস-নিদ্রা-নাশা
উদয়কূলের শৈলমূলের বাসা,
অমবালোকের নব আলোকের ভাষা
দীপ্ত হয়েছে দৃপ্ত তোমার প্রাণে॥
চাহে নাবী তব রথসঙ্গিনী হবে,
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।
অবারিত পথে আছে আগ্রহ ভরে
তব যাত্রায় আত্মদানের তরে।
গ্রহণ করিও সম্মানে সমাদরে,
জাগ্রত করি রাখিয়ো শঙ্খরবে॥

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন বিরচিত।

প্রবন্ধের বই। বেশীর ভাগ প্রবন্ধই সমালোচনামূলক। বইয়ের শেষে কতকগুলি পত্র ও গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে দৈনিক ও মাসিকপত্রে যে সব সমালোচনা বের হয়েছিল তার কিছু কিছু আছে।

আজকালকার অনেকেই স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের নাম শোনেন নি। কিন্তু তাঁর সময়ে—তাঁর সময়কে কবিবর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের যুগ ব'লে অভিহিত করেছেন—তিনি একজন বেশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক ছিলেন। তখনকার অনেক সাহিত্যিকই তাঁর সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা ক'রে সুখী হতেন। বয়সে রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় হ'লেও তিনি ছিলেন কবিবরের একজন বিশিষ্ট ও গুণমুগ্ধ বন্ধু। মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে লিখ্‌ছেন—"তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় তাঁর ছিল অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হোতো।···আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল"। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের বাড়ী ছিল—"বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি তীর্থ"।

দুঃখের বিষয় প্রিয়নাথ সেন মহাশয় বেশী লিখে যেতে পারেন নি। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁর যে সব গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি একসঙ্গে করে"প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি" নাম দিয়ে বার করা হয়েছে।

সমালোচনা দু'দিক থেকে হ'তে পারে। এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা লোকশিক্ষা বা নীতিজ্ঞান সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে ধরে নেন। আর এক শ্রেণীর সমালোচক নিছক সৌন্দর্য্যের উপাসক। এই শ্রেণীর সমালোচক সাহিত্যে যা খোঁজেন তা' রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের নিকট একখানা চিঠিতে বেশ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং আচরণের সৌন্দর্য্য সবই ললিতকলাবিধির অধিকারভুক্ত, কিন্তু সৌন্দর্য্যের হিসাবে না গিয়ে কোন প্রকার নৈতিক আবশ্যকতা, সামাজিক উপকারিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে হয়। কিন্তু ধর্ম্মনীতির সৌন্দর্য্য যে সৌন্দর্য্য নয় একথা যে বলে সে অন্ধ। গোলাপের সৌন্দর্য্য যেমন সুন্দর, সুন্দর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তেমনি সুন্দর—কেবল তা' অতিরিন্দ্রিয়ের গোচর এই যা তফাৎ।" প্রিয়নাথ সেন মহাশয়, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন বলে মনে হয়। সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারে তিনি লোকশিক্ষা বা নীতিজ্ঞানের বিশেষ আমল দেন নি। তাঁর মতে, "সকল কলাবিদ্যার যে কার্য্য—যে উদ্দেশ্য—রসসাহিত্যেরও তাহাই—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করা। এক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুমতিপত্র লইয়া ত্রিভুবনের যত্র তত্র সাহিত্যের অবারিত গতি।······কেবল সৌন্দর্য্যের উদ্ভাবন হইলেই হইল অর্থাৎ উদ্ভাবিত রস এবং বর্ণিত বস্তুকে সৌন্দর্য্যের আলোকে মণ্ডিত করিতে হইবে।" এই মাপকাঠি দিয়েই গ্রন্থকার সাহিত্যের দোষগুণ বিচার করেছেন। এমন কি Ruskin যাঁর মতে—He is the greatest artist who has embodied in the sum of his works the greatest number of the greatest ideas—সেই রাস্কিনেরও লেখার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেছেন—এই মাপকাঠিরই সাহায্যে।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে চার পাঁচটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে আবার বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমালোচনা। প্রতিকূল সমালোচনা নয়, অনুকূল সমালোচনা। এখন হয়ত রবীন্দ্রনাথের রচনা সমালোচনার বাইরে চ'লে গেছে, কেননা রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-শক্তি বিষয়ে সন্দিগ্ধ লোক এখন খুব কমই আছে। কিন্তু এমন কাল গেছে যখন বিরুদ্ধ সমালোচনাই কবিবরের ভাগ্যে জুটত বেশী। প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি সেই সময়ে লেখা। যখন প্রথম প্রকাশ হয় তখন প্রবন্ধগুলির যে দাম ছিল, সে দাম হয়ত এখন আর দেওয়া চলে না। কিন্তু তা হ'লেও, এই রচনাগুলির ভেতর এত সুগভীর পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করবার ক্ষমতার পরিচয় আছে যে মনে হয় যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার শুধু অন্ধস্তাবক না হ'তে চান, যাঁরা বুঝে শুনে কবিবরের রচনার প্রশংসা করতে চান, এই বই থেকে তাঁরা অনেক সহায়তা পাবেন।

অন্যান্য প্রবন্ধগুলির ওপরেও সেন মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী শক্তির ছাপ বেশ স্পষ্টই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। "সনেট পঞ্চাশতের" আলোচনাচ্ছলে তিনি সনেটের উৎপত্তি ও বিকাশের একটি সুন্দর ইতিহাস দিয়েছেন। তাঁর সমালোচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতারই সমালোচনা করুন অথবা প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বা রাস্কিন বা মোপাসাঁর সমালোচনা করুন, তাঁর সমালোচনা সব সময়েই তুলনামূলক। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করার পর তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষায় সমালোচনার বই খুবই কম। স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের সমালোচনা উঁচুদরের। বইখানি বাংলা-ভাষার সমালোচনা-সাহিত্য-সম্পদ বৃদ্ধি করবে তাতে সন্দেহ নেই। বাঁধাই ও ছাপা বেশ ভাল। দাম মোটে ২॥০ টাকা।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ—বি এ তত্ত্বনিধি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত—আদি ব্রাহ্ম-সমাজযন্ত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গ্রন্থকার দেশবিশ্রুত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সেক্রেটরি, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং নিজে প্রতিষ্ঠিত লেখক। ধর্ম্ম ও দর্শন-সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ প্রচার করিয়া ক্ষিতীন্দ্র বাবু বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছেন; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব ও বিবাদাস্পদ ইতিবৃত্ত সম্পর্কে এই বোধহয় তাঁহার বিশিষ্ট উদ্যম। ভট্টনারায়ণ ঠাকুর-বংশের আদিমতম পূর্ব্ব পুরুষ। জনশ্রুতি এই যে, আদিশূর নামক গৌড়াধিপ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ভট্টনারায়ণ তাঁহাদিগের অন্যতম এবং হয়ত মুখ্যতম। কোন কোন ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের এবং সঙ্গে আদিশূরের ঐতিহাসিকতা উড়াইয়া দিয়াছেন। এ গ্রন্থের

উদ্দেশ্য সেই প্রত্যাখ্যাত ঐতিহাসিকতা পুনঃস্থাপন করা। ক্ষিতীন্দ্র বাবু বাঙ্গালী জাতির অতীত কাহিনীর জন্য গৌরব অনুভব করেন এবং পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করেন—সেই জন্যই তাঁহার এই প্রয়াস। সে প্রসঙ্গে তাঁহাকে অনেক শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং বহু প্রমাণ প্রয়োগের অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে হইয়াছে—গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গীয় ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায়ে হয়ত' নূতন আলোকপাত হইবে।

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন মুদ্রা বা মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। যেখানে ঐরূপ সমসাময়িক সাক্ষ্য বিদ্যমান, সেখানে ব্যক্তি বিশেষের ঐতিহাসিকতা লইয়া বাদ বিবাদ করিতে হয় না। কিন্তু ঐরূপ সাক্ষ্যের অভাবকে নাস্তিত্বের চরম প্রমাণ মনে করা সঙ্গত কি? ঐরূপ argumentum ab silentio বিজ্ঞ ব্যক্তির বরণীয় হওয়া উচিত নহে। আলোচ্য আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে বহু কুল-পঞ্জিকা ও ঘটককারিকা রহিয়াছে—তাহারা মূলতঃ কিংবদন্তীমূলক হইলেও, পুরুষানুক্রমে লিখিত ও বংশ পরম্পরায় প্রচলিত সকল প্রাচীন বংশকারিকা অবজ্ঞা সহকারে উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে।

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণের স্থান ও কাল নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদিগের এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে আনীত অপর চারি জন ব্রাহ্মণের বিবরণ সঙ্কলনে ক্ষিতীন্দ্র বাবুকে প্রধানতঃ ঐ সকল কুলপঞ্জিকার উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। আমরা আশা করিয়াছিলাম, গ্রন্থকার ঐ সকল গ্রন্থের কাল-নির্ণয় করিয়া পৌর্ব্বাপর্য্য ও আপেক্ষিক প্রামাণিকতার নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে তিনি অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে কিন্তু মূল গ্রন্থ দেখিবার যে তাঁহার সুযোগ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। অনেক স্থলেই তাঁহাকে পরের মুখে ঝাল খাইতে হইয়াছে। আশা করি আগামী সংস্করণে তিনি এ বিষয়ে প্রণিধান করিবেন।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ কবে বাংলায় আসেন? এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ক্ষিতীশ-বংশাবলীর মতে ৯৯৯ সম্বতে (নবনবত্যধিক নবশতশতাব্দে), কোন কোন কুলগ্রন্থের মতে ৯৫৪ সম্বতে (বেদবাণাঙ্কশাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ), ভূমিকা লেখক ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের মতে ৭৭৯—৮২ খৃষ্টাব্দে এবং ক্ষিতীন্দ্রবাবুর নিজের মতে ৯৪২ খৃষ্টাব্দে। ক্ষিতীশ-বংশাবলীর রচনাকাল কি এবং উহার প্রামাণিকতা কতদূর? কুলগ্রন্থের কোনখানি প্রাচীনতম ও প্রামাণিকতম? বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম গ্রন্থের বয়ঃক্রম কত? ঐ বাচস্পতিই কি প্রসিদ্ধ 'ভামতী' প্রণেতা 'ষড়্ দর্শন ধুরীণ' বাচস্পতি মিশ্র? ক্ষিতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থে এ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা দেখিলে আমরা প্রীত হইতাম। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণই কি 'বেণীসংহার নাটককার ভট্টনারায়ণ? তাহা যদি হয়, তবে ঐ নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি নিজকে 'মৃগরাজলক্ষণ' বলিলেন কেন? তদিদং কবে মৃগরাজলক্ষণঃ ভট্টনারায়ণস্য কৃতিঃ বেণীসংহারং নাম নাটকং প্রযোক্তুম্ উদ্যতা বয়ম্। ঐ স্থানে 'মৃগরাজ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? বেণীসংহার হইতে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত 'দশ রূপকে' এবং অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি'তে বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। সেই জন্য A. A. Macdonell বলেন—Though his date

cannot be fixed with certainty, the dramatist Bhatta-narayana must have lived before 800 A. D। আলোচ্য ভট্টনারায়ণ ও বেণীসংহারের ভট্টনারায়ণ অভিন্ন হইলে, বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়নের ক্ষিতীন্দ্রবাবুর নির্দ্দিষ্ট সময় বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। সত্য বটে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে, বেণীসংহার প্রণেতা ভট্টনারায়ণ পূর্ব্বে কনৌজে ছিলেন, পরে কোন কারণ বশতঃ ৮০ বর্ষ বয়সে বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি করেন। কিন্তু ঘণ্টককারিকা ভিন্ন এ কথার প্রমাণ কি আছে? আর এক কথা। বঙ্গে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ছিলেন শ্রীহর্ষ। তাঁহার প্রসিদ্ধ নৈষধচরিত মহাকাব্য ২২ সর্গে সম্পূর্ণ—ঐ কাব্যের প্রতি স্বর্গের অন্তিম শ্লোকে তিনি নিজ পিতামাতার উল্লেখ করিয়া কিছু কিছু আত্মপরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার পিতা শ্রীহীর, মাতা মামল্ল দেবী, শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালং কারহীরঃ স্বতং শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্ল দেবী চ যম্। (ঘটকারিকায় কেহ কি এই মাতাপিতার নাম কোথাও পাইয়াছেন?)। ঐ সকল শ্লোক হইতে জানা যায় 'নৈষধচরিত' ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ছিল— যথা খণ্ডনখাদ্য, অর্ণব বর্ণন, ছিন্দ প্রশস্তি, বিজয় প্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি, স্থৈর্য্য বিচারণ-প্রকরণ ইত্যাদি। নৈষধের শেষ সর্গে শ্রীহর্ষ সগৌরবে উল্লেখ করিয়াছেন যে কান্যকুব্জপতি তাঁহাকে সমাদর করিয়া তাম্বুলদ্বয় ও আসন প্রদান করিয়াছিলে—

তাম্বুলদ্বয় আসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জে শ্বরাৎ

ঐ অবসরে তাঁহার গৌড়াগমনের কথা বলা উচিত ছিল কিন্তু তাহার উল্লেখ নাই। তবে এক শ্লোকে একটু ক্ষীণ ইঙ্গিত আছে—তিনি যে সকল প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্যতম 'গৌড়োর্ব্বীশ কুল প্রশস্তি ভণিতি' (সপ্তম সর্গের শেষ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আশা করি প্রাত্নতাত্ত্বিকেরা এ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করিবেন। ঐ গৌড়াধিপের প্রশস্তি রচনা কি শ্রীহর্ষের বঙ্গে উপনিবেশের ফল।

আদিশূর সম্বন্ধে ক্ষিতীন্দ্র বাবু অনেক আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার বিষয়েও প্রচুর মতভেদ। আইন্ আকবরিতে আদিশূর ও তাঁহার বংশীয় ৮ জন রাজার উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ উল্লেখ মাত্র কিংবদন্তীকে ভিত্তি করিয়া। কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে আদিশূর ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা হন। অপরে তাঁহার ঐতিহাসিকতাই স্বীকার করেন না। এইরূপ তাঁহার কাল লইয়া, জাতি লইয়া রাজধানী প্রভৃতি লইয়াও অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। আমি আশা করি ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সযত্ন সংকলিত এই গ্রন্থ দ্বারা ঐ সকল বিবাদাস্পদ বিষয়ে সত্যনির্দ্ধারণে যথেষ্ট সহায়তা হইবে এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি এত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

1. **World Revolution and the U. S. S. R.—**
By M. T. Florinsky, Ph. D., (Macmillan & Co.)
2. **Problems of a Socialist Government—**
By Sir Stafford Cripps & Others, (Gollancz)
3. **Problems of Peace.**
By G. P. Gooch & Others ; (George Allen & Unwin Ltd.)

জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধিয়াছে ; প্রত্যেক জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা ও আনুষঙ্গিক অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে ; ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সাজ সাজ রব উঠিয়াছে ; বিষাক্ত গ্যাসের আবহাওয়ার মধ্যে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে তাহা জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ; বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের যুদ্ধনিবারণী ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে ; এমন অবস্থায় এই যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধ বাধিল, এমন একটা আশঙ্কা যদি বৃদ্ধি পায় তবে সেটা খুব অস্বাভাবিক নহে। তবে বিপদ এই যে এই প্রকার আশঙ্কামূলক মনোভাব হইতেই অনেক সময়ে যুদ্ধ বাধিয়া থাকে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে মাদ্রাজী জ্যোতিষীরা, অন্য প্রান্ত হইতে হিন্দী ও উর্দ্দু পঞ্জিকাকারেরা ঘোষণা করিতেছেন যে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ অনেকটা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মতন, সুতরাং যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা। এরূপ সময়ে আন্ত-র্জ্জাতিক ও জাতিবিশেষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার জন্য এদেশের শিক্ষিত লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়াছে। উল্লিখিত তিনখানি বই পড়িয়া এই কৌতূহল কতকটা নিবৃত্ত হইবে ; উপরন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জটিল সমস্যার সমাধানের উপর বিশ্বশান্তি নির্ভর করিতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অনেকে মনে করেন যে রাশিয়া যুদ্ধ বাধাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া আছে ; এক হাতে মার্কস-এঞ্জেল-লেনিনের নবসংহিতা অন্য হাতে গোলাবারুদ লইয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র বুঝি জয়যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ১৯১৮ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুগের সোভিয়েট রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি আলোচনা করিয়া Florinsky দেখাইয়াছেন যে উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপনের পর প্রথম দুই বৎসর কাল (১৯১৮-২০) অবশ্য রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ সমগ্র পৃথিবীতে—বিশেষতঃ ধনিকতন্ত্রী দেশগুলিতে বিপ্লব-বাধানো প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। বলশেভিকদের মধ্যে চরমপন্থী (Left Wing) দল ভাবিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রে কম্যুনিজম্ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে অন্যান্য ধনিকপ্রধান রাষ্ট্র উহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে। একদিকে মার্কস্ ও এঞ্জেলের মতবাদ, অন্যদিকে তৎকালীন ঘটনা এই আশঙ্কার অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছিল। তজ্জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যখন Third Internationalএর অধিবেশন হইল, তখন তাহার প্রধান কার্য্য হইল পৃথিবীর জনসাধারণের মধ্যে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের বাণী প্রচার করা—দেশে দেশে শ্রেণীবিরোধকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়া অন্তর্বিপ্লব সংঘটন করা। Zinoviev এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। Third Internationalএর সহিত শোভিয়েট রাষ্ট্রের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ; উহার দ্বিতীয় কংগ্রেসের ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট করিয়া বলা হইল যে যতদিন পর্য্যন্ত না পৃথিবীর সর্ব্বত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়া রাশিয়ার সোভিয়েটের সহিত যুক্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত বিত্তহীনগণ অসি কোষবদ্ধ করিবে না।

Florinsky তাঁহার গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে লেনিন সমগ্র জগতে বিপ্লব সংঘটন করা বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই প্রধান সহকারী—ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের মধ্যে তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইল। ট্রট্স্কি মার্কসের বাণীকে অবলম্বন করিয়া দেখাইলেন যে কেবল মাত্র একটি দেশে কখনও কম্যুনিষ্ট বিপ্লব কৃতকার্য্য হইতে পারে না—সকল দেশে উহা প্রচার ও স্থাপন করিবার চেষ্টা করা উচিত। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিন্তু এরূপ শোচনীয় ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল যে বাহিরে বিপ্লব ঘটাইবার দিকে মন দিলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ধনউৎপাদন সমস্যা সমাধানে ব্যাঘাত ঘটিবে। তাই ষ্টালিন্ World Revolution এর ধুয়া ছাড়িয়া "Socialism in a single country"—অর্থাৎ আগে রাশিয়াতেই কম্যুনিজম্‌কে পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠা করা হউক, পরে অন্য দেশের কথা ভাবা যাইবে—এই নীতির সমর্থন করিলেন। তর্ক-যুদ্ধে ট্রট্স্কির পরাজয় ঘটিল; একে একে তিনি তাঁহার সমস্ত অধিকার ও পদমর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হইলেন; অবশেষে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তুরস্ক দেশে আশ্রয় লইলেন। সেই সময় হইতে রাশিয়া স্বীয় উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। এই কার্য্যে ধনিকতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা প্রয়োজন। সেইজন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র বিশ্বশান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হইল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাশিয়ার প্রতিনিধি M. Litvinov বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের Preparatory Commission on Disarmamentএ "immediate, complete, and general disarmament", সকল দেশে আশু সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ দাবী করিলেন। বলশেভিক বিপ্লবের দশ বৎসরের মধ্যে রাশিয়া রণনীতির পরিবর্ত্তে বিশ্বশান্তির উপাসক হইল। Florinsky দেখাইয়াছেন যে ইহার পর কেমন করিয়া আজ পর্য্যন্ত (১৯৩৩, ৪ঠা জুলাই) রাশিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত শান্তি স্থাপন করিয়াছে। রাশিয়া শান্তি স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছে, এমন কি মুসোলিনি ও হিট্লারের সহিতও বন্ধুত্ব করিয়াছে, এ সংবাদ বিশ্বশান্তির দিক্ হইতে খুবই আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। কিন্তু গত শতাব্দীর রাশিয়ার ইতিহাসে আমরা দেখিয়াছি যে ওয়াটর্লুর যুদ্ধের পর জার প্রথম অ্যালেকজ্যাণ্ডার বিশ্বশান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া Holy Alliance প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ বাড়িয়াই গিয়াছিল; আবার গত শতাব্দীর শেষভাগে জার দ্বিতীয় নিকোলাস্ বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্র সমূহকে নিরস্ত্রীকরণে আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহার কিছুদিন পরেই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য রাশিয়ার এই আধুনিক প্রচেষ্টা কতটা সফল হইবে সে বিষয়ে মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে।

Problems of a Socialist Government বইখানি ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের চরমপন্থীগণের ভবিষ্যৎ নীতির নির্দ্দেশ সূচনা করিতেছে। ইঁহারা স্থির করিয়াছেন যে ইঁহাদের হাতে ক্ষমতা আসিবা মাত্র ইঁহারা সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইঁহারা র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইয়া নেতার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছেন। ইঁহারা জন-সাধারণকে সমাজতন্ত্রবাদী করিয়া নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভের আশা করেন ও নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) পন্থায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন মনে করেন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ইঁহারা House of Lordsকে ধ্বংস করিবেন, Administrative Law দ্বারা রাজ্য শাসন করিবেন, ও কোন নিয়ম আইন কিনা এই প্রশ্ন করিবার অধিকার হইতে বিচারালয়কে বঞ্চিত করিবেন; House of

Commonsএর হাতে কেবলমাত্র মূল নীতি গঠনের ক্ষমতা রাখিয়া সমস্ত কার্য্যের ভার বিভিন্ন কমিটির হাতে দিবেন। ইহাতে নিয়মতান্ত্রিকতা যে কিরূপে বজায় থাকিবে তাহা বুঝা কঠিন। আবার ইঁহারা যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন তাহাতে প্রথমে সম্পত্তির মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে ও কয়েকটি মাত্র ধনউৎপাদক যন্ত্র, কারখানা, প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের অধীনে আনা হইবে। এরূপ রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক বলিতে রাশিয়ানগণ অন্ততঃ রাজী হইবেন না। যাহা হউক আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি যে ইংলণ্ডে যদি শ্রমিক দল কোন প্রকার সমাজতন্ত্র স্থাপন করিতে চাহেন, তবে ধনিক দল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিবে ও তাহার ফলে বিশ্বশান্তির বিঘ্ন ঘটিবে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই দলের মত এইরূপ—"A Socialist Government would have to cut the knot (ভারতের সাম্প্রদায়িকতার) by the immediate placing of responsibility on the Indians themselves. It would not conern itself overmuch with the " constitutional" claims of princes. It would……concentrate on safeguarding, so far as it could, the position of the great mass of Indians—peasants and industrial workers. Those Socialists who suggest that it is necessary for us to stay in India in order to do this must face the fact that we can only now stay in India at all (in a position of control, that is) by the use of military force, repression, martial law, etc. Only as a fellow working-class movement can we effectively assist our Indian fellow-workers in their own struggle for emancipation. Most certainly we cannot do it as an alien army of occupation"। এই আশ্বাসবাণীতে আশা করি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা আশ্বস্ত হইয়া পথ চাহিয়া ও কাল গুণিয়া বসিয়া থাকিবেন।

Problems of Peace বইখানি The Geneva Institute of International Relationsএ প্রদত্ত বক্তৃতার সমষ্টি। ইহাতে জেনেভার Graduate Institute of International Studiesএর Director Mr. William Rappard স্বীকার করিয়াছেন যে সুদূর প্রাচ্যে (চীন-জাপান) শান্তি রক্ষার, নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ অকৃতকার্য্য হইয়াছে; সুতরাং লীগ্ অফ্ নেশন্সের "Political vitality is to-day at a low ebb" কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Gooch সাহেব গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে বর্ত্তমানের অর্থ-নৈতিক দুর্গতি বিশ্বের সমগ্র জাতির মধ্যে অর্থ-নৈতিক ঐক্য আনয়ন করিতে পারে—"As the League was the child of the war, the only less terrible experience of the economic blizzard seems likely to produce a further advance towards the rationalization of our corporate life"। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় লিখিয়াছেন বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় দর্শনবিদ্ C. Delisle Burns। তিনি বলেন যে অর্থ-নৈতিক ঐক্য আনয়নের একমাত্র উপায় জগতের জনসাধারণের ব্যবহার-

উপযোগী দ্রব্য সম্ভারের জোগান দেওয়া। এই কার্য্যে উৎপাদকের লাভের দিকে না তাকাইয়া দরিদ্রের অভাবমোচনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। Production-এর দিক্ হইতে অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতে হইবে—মাল বিক্রয়ের বাজার খুঁজিবার জন্য মারামারি কাটাকাটি না করিয়া দরিদ্রদের খরিদ করিবার শক্তি বাড়াইয়া বাজার তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রত্যেক দেশের অর্থ-নৈতিক স্বতন্ত্রতা গঠনের আদর্শকে ত্যাগ করিয়া মহামানবের সেবায় অর্থনীতিকে নিযুক্ত করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক মনোভাবকে গঠন ও প্রচার না করিতে পারিলে যুদ্ধের আশঙ্কা বিদূরিত হইবে না। জগতের শান্তিকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে ও শান্তির উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে। এই গুরুতর দায়িত্বসম্পাদনের উপর বিশ্বশান্তি নির্ভর করিতেছে।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

The Name and Nature of Poetry—By A. E. Housman (Cambridge University Press).

Form in Modern Poetry—By Herbert Read, (Sheed and Ward).

হাউসম্যান এর জন্ম ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে। অথচ কার্য্য হিসাবে ইঁহার খ্যাতির ভিত্তি মাত্র দুখানি কবিতাগ্রন্থ; যাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ একশত চারিটি গীতিকবিতা সঙ্কলিত আছে। তিনি যে কিরূপ সাবধান লেখক তাহা বুঝিতে পারা যায় যখন মনে পড়ে যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ—এ শ্রপ্‌সায়ার ল্যাড্ প্রকাশিত হয় ১৯০৫-এ, আর দ্বিতীয় গ্রন্থ—লাষ্ট্‌পোয়েম্‌স্ ১৯২২-এ। কবিপ্রতিষ্ঠা রচিত গ্রন্থের বিপুলতার বা তালিকা দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না বলিয়াই ইংরাজী কাব্যে হাউসম্যানের স্থান অবিসংবাদিত। বাহুল্যবর্জ্জনের এ হেন উদাহরণ যে-কোন সাহিত্যে বিরল। এমন একটি লাইনও তাঁহার কবিতায় খুঁজিয়া মেলেনা যাহা শিল্পীর অখণ্ড মনঃসংযোগের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত। যতদিন কাব্যে ঘনীভূত আবেগের নিরলঙ্কার স্বচ্ছ প্রকাশের আদর থাকিবে ততদিন এই কবিটিকে বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হাউসম্যান শুধু কবি নহেন, অনন্যচিত্ত সাহিত্যসাধক। তিনি কেম্‌ব্রিজে ল্যাটিন সাহিত্যের অধ্যাপক, ও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভাষার শ্রেষ্ঠকীর্ত্তিগুলি তাঁহার নিত্য মানসসঙ্গী। তাঁহার সাহিত্যসাধনার আদর্শ যে কিরূপ অকুতোভয় উর্দ্ধমুখ তাহা নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে বোঝা যায়—

Orators and poets, sages and saints and heroes, if rare in comparison with blackberries, are commoner than returns of Halley's comet: literary critics are less common.

আজীবন সাধনার পর এই ধরণের লোক যখন কোন মতামত ব্যক্ত করেন, তখন সাহিত্যামোদী ছাত্র মাত্রেরই আনন্দিত হইবার কথা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি আকারে ছোট, পঞ্চাশ পৃষ্ঠা, ১৯৩৩এর ৯ই মে তারিখে কেম্‌ব্রিজে প্রদত্ত লেস্‌লি ষ্টীফন্ বক্তৃতার মুদ্রিত লিপি মাত্র। হঠাৎ অবাক লাগে, এইটুকু বইয়ের এ বিশাল ও দাম্ভিক নামকরণ হাউসম্যানের মতো সংযতবাক্ লোকের পক্ষে সম্ভব হইল কেমন করিয়া; তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে কেমন করিয়া ভোলা সম্ভব হইল যে পৃথিবীর যাবতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রগ্রন্থগুলি একত্র করিলে ব্যাপারটা হইয়া উঠিবে, যেন "পেলিয়ন-এর উপর ওসা চাপানো"। তাহাদেরও ত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কবিতার নামরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা ছাড়া; অথচ সে সমস্যা আজও অমীমাংসিত রহিয়াছে। বইটি শেষ করার পর একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় এ নামকরণে অবিনয়ের স্পর্দ্ধা নাই, বাক্‌সংযমের চেতনা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। হাউসম্যান ভালো করিয়াই জানেন তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে কোন সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব, যিনি যাহাই বলুন না কেন তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত মতের অতিরিক্ত কিছুই নহে। কাজেই কাহারো কিছু বলিবার থাকিলে যথাসাধ্য সংক্ষেপে ও শৃঙ্খলায় যে এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা সারা যায়, হাউসম্যানের বক্তৃতাটি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই বক্তৃতার সূচনামুখে হাউসম্যান বলিতেছেন তাঁহার প্রথম ইচ্ছা ছিল কাব্য-প্রকৃতির পরিবর্ত্তে আলোচনা করা ছন্দপ্রকৃতির, যে বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব কিছু বলিবার আছে, ও যে বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় কভেন্ট্রি, প্যাটমোর ও ফ্রেড্‌রিক মায়ার্স ব্যতীত অন্য কেহ বিশেষ কোন মৌলিক গবেষণা করেন নাই। শ্রোতৃবর্গের অধৈর্য্যের ভয়ে তিনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। আমাদের দেশেও সম্প্রতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছন্দ লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়া গেল, অভব্য কটুকাটব্যও বাদ পড়ে নাই, যদিও মূলগত গুরুতর বিষয়গুলি যে বিশেষ পরিষ্কার হইয়াছে তাহা মনে হয় না। ছন্দালোচনা বলিতে হাউসম্যান কি বোঝেন—অবশ্য ইংরাজী ছন্দ সম্বন্ধে—তাহা তুলিয়া দেওয়া গেল:

I mean such matters as these: the existence in some metres, not in others, of an inherent alternation of stresses, stronger and weaker; the presence in verse of silent and invisible feet, like rests in music; the reason why some lines of different length will combine harmoniously while others can only be so combined by great skill or good luck; why, while blank verse can be written in lines of ten or six syllables, a series of octosyllables ceases to be verse if they are not rhymed; how Coleridge, in applying the new principle which he announced in the preface to Christabel, has fallen between two stools: the necessary limit to inversion of stress, which Milton understood and Bridges overstepped; why, of two pairs of rhymes, equally correct and both consisting of the same vowels and consonants, one is richer to the mental ear and the other poorer; the office of alliteration in verse, and how its definition must be narrowed if it is to be something which can perform that office and not fail of its effect or actually defeat its purpose.

এই সুচিন্তিত মন্তব্যগুলি দিয়া হাউসম্যান আমাদের মনে যে ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলিয়াছেন, আশা করা যাক, অবিলম্বে প্রকাশিতব্য কোন পুস্তকে তিনি তাহা তৃপ্ত করিবার আয়োজন করিতেছেন। কারণ, তাঁহার তুল্য ছন্দকুশলী কবি ইংরাজী সাহিত্যেও

বিরল। অনেকের ধারণা, শেলি বা সুইনবার্ণের মতো নবছন্দের প্রবর্ত্তন ভিন্ন ছন্দ-কৌশলের পরিচয় দেওয়ার অন্য উপায় নাই। তাঁহাদের চোখেই পড়ে না, সাধারণ অতিপ্রচলিত ছন্দ ব্যবহারের অন্তরালে কি অসাধারণ প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ও ধ্বনিসামঞ্জস্য আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য, হাউসম্যানের ছন্দ-নৈপুণ্য শেষোক্ত শ্রেণীর। তাঁহার শব্দচয়নের মতো তাঁহার ছন্দ-চালনেও কোনরূপ আড়ম্বর বা আতিশয্যের আভাসও তিনি সযত্নে পরিহার করিয়াছেন।

কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে হাউসম্যানের মূলসূত্র এই যে কবিতার কাজ চিন্তা উদ্দীপন নয়, ভাব সংক্রমণ—

I think that to transfuse emotion—not to transmit thought but to set up in the reader's sense a vibration corresponding to what was felt by the writer—is the peculiar function of poetry.

এই সূত্রানুযায়ী বিচার করিয়া ড্রাইডেন, পোপ, ইত্যাদির রচনাকে কবিতা বলিতে তিনি নারাজ। ইঁহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রতি তিনি অন্ধ নহেন; তিনি জানেন, এইসব লেখককে কবি বলিয়া প্রমাণিত করিতে বর্ত্তমান ইংলণ্ডে প্রবল চেষ্টা চলিয়াছে; তিনি ইহাও মানেন ইংলণ্ডের উনিশ শতক তাহার আঠারো শতকের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুবিচার করে নাই; তবুও তাঁহার মতে—

It set a low value on the poetry of the eighteenth century, not because it differed in kind from its own, but because, even at its best, it differed in quality, as its own best poetry did not differ, from the poetry of all those ages, whether modern or ancient, English or foreign, which are acknowledged as the great ages of poetry. Tried by that standard the poetry of the eighteenth century, even when not vicious, even when sound and good, fell short.

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে হাউসম্যানের এই মূল সূত্রটির বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ আনা যাইতে পারে। নিজচিত্তই স্বভাবতঃ অর্দ্ধস্পষ্ট, পরচিত্ত অন্ধকার। কাজেই কি করিয়া বুঝিব একটা কবিতা পড়িয়া আমার মনে যে ভাবের উদয় হইতেছে, রচনাকালে কবির মনেও ঠিক সেই ভাবটিই ফুটিয়াছিল। একই কবিতা বিভিন্ন পাঠকের মনে কত অসম্ভব রকমের বিভিন্ন প্রতিঘাত ধ্বনিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা ভাবিলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। কেম্ব্রিজেরই অন্যতম অধ্যাপক, আই, এ, রিচার্ডস্ কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা লইয়া যে শিক্ষাপ্রদ পরীক্ষণ পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহার কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী তাঁহার "প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম্" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। জানিতে ইচ্ছা করে, এ সম্বন্ধে হাউসম্যানের বলিবার কি আছে। এমন কোন্ নিকষ পাথর আছে যাহার যোগে স্থির করা যাইবে, এই অসংখ্য অনুরণনের মধ্যে কোনটি সত্য, অর্থাৎ কোনটি কবির অন্তরের স্পন্দনের অনুগামী? হাউসম্যানের তরফ হইতে উত্তর দেওয়া যায় যে এই মতবিভেদে তাঁহার কিছু যায় আসে না। তিনি ত গোড়াতেই বলিয়া চুকিয়াছেন যে সাহিত্যে সকল মতই ব্যক্তিগত মত। যে রচনা পাঠে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইবে যে তাঁহার ও কবির মধ্যে ভাবসংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার নিকট সত্য কবিতা।

এ উত্তরের পিছনেও যে আর একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, অধ্যাপক হাউসম্যানের ন্যায়নিষ্ঠ মন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলে নাই।

Am I capable of recognising poetry if I come across it? Do I possess the organ by which poetry is perceived?

হাউসম্যান কিন্তু এ ধরণের প্রশ্নবর্ষণ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন, উত্তর দেবার চেষ্টাও করেন নাই, বোধহয় এই বলিয়া যে এ প্রশ্নের উত্তরদাতা দুনিয়াতে আছেন মাত্র একজন যাঁহাকে মানুষ সর্ব্বজ্ঞ কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা পায়।

সে যাহা হউক, এই প্রবন্ধে তিনি এমন একটি উক্তি করিয়াছেন যাহা তাঁহার সাহিত্যিক অন্তর্দ্দৃষ্টির নিঃসংশয় প্রকাশ। তিনি বলিতেছেন, নিছক কাব্যরসবোধ না থাকিলেও কবিতা পড়িয়া প্রভূত আনন্দলাভ করা অসম্ভব নয়। এমন কবিতা কদাচিৎ লেখা হয় যাহাতে বিশুদ্ধ কাব্যরস ভিন্ন অন্য কোনরূপ উপকরণ মিশানো নাই, এবং এই মিশ্রিত উপাদান উপভোগ করা একান্তই সহজ। তাঁহার মতে অধিকাংশ কবিতাপাঠকের আনন্দের উৎস এইখানেই। উদাহরণ হিসাবে দেখানো যায়, অনেক ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ-ভক্তই তাঁহার কবিতাকে অযথা কারণে ভালবাসেন। তাঁহারা ভালবাসেন ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের দার্শনিক মতবাদকে, যাহা বলে বহিঃপ্রকৃতি মানুষেরই মতো প্রাণবান্ অনুভূতিশীল ও মঙ্গলময়; কিন্তু ভুলিয়া যান, এ ধারণা গ্রীকদের দেবদেবী কল্পনার মতো অসার্থক।

ভক্তিরসাত্মক কবিতার রসবিচারও তাহার মতের সমর্থন করে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে ভক্তিরসের প্রাচুর্য্য—গীতাঞ্জলির অনুকরণে ও প্রতিকরণে—অসুস্থ দেহস্ফীতির মতো দীপ্যমান। তাই হাউসম্যানের উক্তিটি সম্পূর্ণ তুলিয়া দেওয়া বোধহয় অন্যায় হইবে না।

I have been told by devout women that to them the most beautiful poetry is Keble's. Keble is a poet; there are things in the Christian Year which can be admired by atheists; but what devout women most prize in it, as Keble himself would have wished, is not its poetry; and I much doubt whether any of them, if asked to pick out the best poem in the book, would turn at once to the Second Sunday after Easter. Good religious poetry, whether in Keble or Dante or Job, is likely to be most justly appreciated and most discriminatingly relished by the undevout.

কবিতাপাঠের সময় হাউসম্যান তাহাতে খোঁজেন হৃদয়োত্থিত ভাবের দ্যোতনা; তাই কবিতার অর্থ, যাহা বুঝিতে হইলে বুদ্ধি পরিচালনার প্রয়োজন, তাঁহার নিকট গৌণ পদার্থ, এমন কি অনেক সময় রসবোধের অন্তরায়।

> Tho' thou art worship'd by the names divine
> Of Jesus and Jehovah, thou art still
> The Son of Morn in weary Night's decline,
> The lost traveller's dream under the hill.

ব্লেকের এই সুবিখ্যাত লাইন কটির উপর তাঁহার মন্তব্য এই; It purports to be theology; what theological sense, if any, it may have, I cannot imagine and feel no wish to learn. It is pure and self-

existent poetry, which leaves no room in me for anything besides। এই কারণে তাঁহার কাছে ব্লেক হইতেছেন কবি, দ্যোতনক্ষমতায় ব্লেক অন্য সকল কবি হইতে শ্রেষ্ঠ, ও শেকসপিয়ারের সমতুল্য। এমনকি ব্লেকের কবিতা শেকসপিয়ারের কবিতা অপেক্ষা বিশুদ্ধতর, কেননা, শেকসপিয়ারের কাব্যে চিন্তা, দার্শনিকতা, জীবনবেদ ইত্যাদি ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। শিল্পী হিসাবে তাই শেকসপিয়ার ব্লেকের অপেক্ষা পূর্ণতর, কিন্তু ব্লেকের রচনা নিছক অবিমিশ্র কাব্য।

Shakespeare is rich in thought, and his meaning has power of itself to move us, even if the poetry is not there. Blake's meaning is often unimportant or virtually non-existent, so that we can listen with all our hearing to the celestial tune.

কবিতার এই দ্যোতনশক্তির ফলে আমাদের শরীর ইহাতে ঢের বেশী সাড়া দেয় আমাদের বুদ্ধির চাইতে। শরীর রোমাঞ্চিত হয়; দাড়ি কামাইতে গিয়া হঠাৎ কোন সাবেগ কাব্যাংশ মনে পড়িলে, ক্ষুরের গতি স্তব্ধ হয়; মেরুদণ্ড বাহিয়া শিহরণস্রোত প্রবাহিত হয়; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া চোখ জলে ভরিয়া উঠে, বক্ষে ছুরিকাঘাতের মতো তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি দেহের গভীর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তোলে।

শরীর ও মনের কিরূপ অবস্থা কবিতা রচনার পক্ষে অনুকূল, তাহার একটি উদাহরণ—কবিতাটির প্রথম অকস্মাৎ আবির্ভাব হইতে শেষ পরিমার্জ্জন পর্য্যন্ত—নিজের জীবন হইতে দিয়া হাউসম্যান তাঁহার বক্তৃতা-শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বীয় পরিচিত অধ্যাপনাকক্ষে প্রবেশ করিলেন—সাহিত্যসমালোচনার বিপদসঙ্কুলক্ষেত্র হইতে চিরবিদায়, লইয়া farewell for ever।

হারবার্ট রীড্‌ও হাউসম্যানের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও অধ্যাপক, এডিনবরায় শিল্পশাস্ত্রের। সাদৃশ্যের শেষ বোধহয় ওইখানেই। এই নবীন অধ্যাপকটি মোটেই লেখনী-লাজুক নহেন। সৃজনী ও বিচার-সাহিত্যের নানা বিভাগে ইনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়া সমসাময়িক পাঠকসমাজে আপন আসন দৃঢ় করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাহার শক্তি পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নাম পড়িয়া মনে হয় ইহাতে তাঁহার বিচার্য্য বিষয় আধুনিক ইংরাজী কবিতার গঠন-বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আধুনিক বলিতে রীড সকল যুগের সফল সকল কবিতা ধরিয়াছেন; ও 'ফর্ম্ম' কথাটির অর্থের মধ্যে কাব্যের প্রকৃতিকেও টানিয়া আনিয়াছেন। কাজেই বইটি হইয়া উঠিয়াছে সাহিত্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় জটিল প্রশ্নের গুরুভারে ভারাক্রান্ত। অথচ গ্রন্থকারের হাতে যথেষ্ট জায়গা ছিল না যাহাতে এই সমস্ত প্রশ্নের যথোচিত বিচার চলিতে পারে। সুতরাং তাঁহার "রীজন্ এণ্ড রোমান্টিসিজম্" বা "ওয়াডস্‌ওয়ার্থ" বা "ফেজেজ অব ইংলিশ পোয়েট্রি" গ্রন্থে যে সুসংবদ্ধ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় ইহাতে তাহা মেলে না। এখানে তাঁহার রচনাভঙ্গী সাহিত্যিকের উপযুক্ত না হইয়া, হইয়া উঠিয়াছে সংবাদিকের মতো; নানাবিধ বিষয়ের অবতারণা করিয়া সস্তায় বিদায় দিয়াছেন, যেন দিনগত পাপক্ষয় করিলেই হইল। অন্যের মতামতের কোটেশন-বাহুল্য তাঁহার বিদ্যাবত্তার বিস্তার সূচিত করিলেও কেমন যেন আত্মনির্ভরের অভাব জ্ঞাপন করে। তাই বলিয়া বইখানি সর্ব্বথা নিন্দনীয় নয়। জেরাল্ড ম্যানিলি হপকিন্স সম্বন্ধে (যাঁহার কবিতা লইয়া বর্ত্তমান ইংলণ্ডে প্রবল হুলুস্থুল চলিতেছে) রীড তাঁহার বক্তব্য অল্পকথায় বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন। দীর্ঘ কবিতা

কাহাকে বলে, অর্থাৎ কতখানি দীর্ঘ হইলে কবিতাকে দীর্ঘ নাম দেওয়া যায়—ইহার আলোচনাও বেশ চিত্তাকর্ষক। তবে বর্ত্তমান পুস্তকে রীড-এর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যেখানে তিনি সাহিত্য-আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। রীড্ বলেন, আজকালকার সাহিত্যবিচারে দুটি কথা অবশ্যপ্রয়োজনস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা পাওয়া যায় না যাহাতে তাহারা ব্যবহৃত হয় নাই। সে কথা দুটি, ক্যারাকটার ও পার্সন্যালিটি। তথচ কোন সাহিত্যিকই কথা দুটির অর্থ ও ব্যঞ্জনা স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন না। কাজেই সমস্ত সাহিত্য-আলোচনা মূলতঃ থাকিয়া যায় অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, রীডের মতে, নব্যমনোবিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া উপায় নাই। তাই রীড ফ্রয়েড ইয়ুং ও তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। তিনি ও দুটি কথার ব্যাখ্যা করিতে চান ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের সূত্রাবলীর সাহায্যে। রীড তাহাকেই বলেন পার্সন্যালিটি ফ্রয়েড যাহাকে বলেন ঈগো—

In every individual there is a coherent organisation of mental processes, which we call his ego.

আর রীডের মতে ক্যারাকটার তাহাই ফ্রয়েড যাহাকে "ইড্" বলেন—

That reserve of instincts and passions which we normally repress, but which are never securely under control of our conscious reason.

ক্যারাকটারের মূলে আছে এই inhibition, এই প্রতিরোধ।

Character is the result of an enduring psycho-physical disposition to inhibit instinctive impulses in accordance with a regulative principle.

এই প্রসঙ্গে গ্যেটের উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে—

Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Ein Charakter im Strome der Welt.

প্রশ্ন জাগে ক্যারাকটারের এই regulative princeple এর সহিত পার্সন্যালিটির coherent organisation-এর তফাৎ কোথায়। রীডের উত্তর,—

The coherence of personality is indeed the coherence of a natural process ; not the coherence of an arbitrary discipline. "It does not mean that one never changes, but that the changes of the world always find you ready to select your own point of view" (Ramon Fernandez).

ইহাকেই কীটস তাঁহার অধুনা সুবিখ্যাত পত্রে বলিয়াছেন—negative capability, নিজের বৈশিষ্ট্যের (ব্যক্তিত্বের নয়) বিলোপ করিয়া অন্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাময়িকভাবে একীভূত হইবার ক্ষমতা। রীডের মূল প্রতিপাদ্য এই ঃ—

Character, in short, is an impersonal ideal which the individual selects and to which he sacrifices all other claims, especially those of the sentiments or emotions. It follows that character must be placed in opposition to personality, which is the general-common-denominator of our sentiments and emotions. That is, indeed, the opposition I want to emphasise and when I have said further that all poetry, in which I include all

lyrical impulses whatever, is the product of personality, and therefore inhibited in a character, I have stated the main theme of my essay.

মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় সাহিত্যসমস্যা সমাধানের এই প্রচেষ্টা বর্ত্তমান জগতে জড়বিজ্ঞানের সর্ব্বতোমুখী দিগ্বিজয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রীড একা এ পথের পথিক নহেন। মনে হয় ইংলণ্ডে রিচার্ডস্ ও এমেরিকায় ম্যাক্স্ ইষ্টম্যান ইঁহার অপেক্ষাও বেশী অগ্রসর। ইহা সত্ত্বেও যখন রীডকে বলিতে শুনি—

Poetry is properly speaking a transcendental quality—a sudden transformation which words assume under a particular influence—and we can no more define this quality than we can define a state of grace.

তখন মনে পড়িয়া যায় অন্ধকার অবৈজ্ঞানিক যুগের অলঙ্কারগ্রন্থ ধ্বন্যালোকের উক্তি—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

No time like the Present—By Storm Jameson (Cassell)

আজকাল প্রণিধানযোগ্য গদ্যসাহিত্যের বিশেষত্ব, হচ্ছে আত্মজীবনকাহিনীর আধিক্য ও উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত অভাব। বর্ত্তমান যুগে যন্ত্রচালিত মানুষের রূপকথা চয়ন করবার বা শোনবার অবসর সময়ের সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প থেকে স্বল্পতর হতে চলেছে—এটা ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যে আত্মনিবেদনের একটি নিজস্ব মূল্য আছে। দৈনন্দিন বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার অন্তরালে সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং জীবনপথ হতে আহৃত অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি কোনও পরম উপলব্ধিতে গ্রথিত করে ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় তাতে সমসাময়িক সুধীজনের চিত্তরঞ্জন না হলেও সাহিত্যভাণ্ডার যে সমৃদ্ধিলাভ করে আলোচ্য বইখানি তার প্রমাণ।

শ্রীমতী জেমিসন আপন অভিজ্ঞতার স্বল্পতা ও জীবনের বৈচিত্র্যবিহীনতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সত্ত্বেও আত্মজীবনকাহিনী প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন তার কারণ তাঁর মতে আত্মনিবেদনই সত্যানুভূতি প্রকাশের একমাত্র উপায়। তথ্য ও সমস্যার জটিলতায় উপন্যাসের গতি নিরুদ্ধকরণে রসবৈষম্য তো ঘটেই অধিকন্তু শিল্পী তার সৃষ্ট চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে আপন উপলব্ধির সীমা অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। এটা জেমিসনের অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি। উপন্যাস রচনাকালে বক্তব্যের যে সুসীম নিশ্চয়তা তাঁর লিপিশক্তিকে উদ্বোধিত করেছে, অনতিকাল পরে সেই কথাসমষ্টিই মুদ্রামূর্ত্তি গ্রহন করে তাঁর অজ্ঞতা ও প্রগলভতার স্থায়ী নিদর্শন হয়ে রইল, এতে তাঁর দুঃখের অবধি নেই।

রসরাজ শ' বা অল্ডাস্ হাক্সলী অবশ্য সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে তথ্যবহুল সাহিত্যরচনা করেও পাঠক সমাজে আদৃত হয়েছেন। কিন্তু সে সাহিত্যের প্রসাদগুণ সৃষ্টির সুসীমতায় নয়; স্রষ্টার অত্যদ্ভুত লিপিচাতুর্য্যে। সে সাহিত্য মনোরঞ্জন করে সত্য, কিন্তু মর্ম্ম স্পর্শ করে না। মানুষের হৃদয় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে সেই সূক্ষ্ম সাধারণ অনুভূতিগুলি যা ভাষা বা ভাবের পোষাকি আভিজাত্যে অবগুণ্ঠিত নয়, ক্রোধ বা দ্বেষের অতিশয্যে অতিরঞ্জিত নয়—যার প্রকাশ আত্ম-উৎসারিত, যার দ্যোতনা সমবেদনায় পরিপূর্ণ।

এ-কথা স্বীকার্য্য যে বস্তু-বিশ্বের জীব জীবনপথে বিক্ষিপ্ত বৃহত্তর সমস্যাগুলিকে অবহেলা করে সূক্ষ্ম অনুভূতির ভাবালুতায় আপন উপলব্ধি নিরুদ্ধ করতে পারে না। অশন ও ব্যসনের অনটন ও বণ্টনবৈষম্য অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অহর্নিশি যে অব্যক্ত বিদ্রোহের সৃষ্টি করে তার প্রভাব জীবনের অনুভূতিমাত্রকেই আচ্ছন্ন করতে বাধ্য।

আলোচ্য বইখানিতে অন্তরের এতাদৃশ চিরন্তন বেদনা ও প্রতিবাদস্পৃহাকে দমন করবার চেষ্টা হয়নি এবং সেই কারণে শেষ ভাগটি এতখানি তিক্ত হয়েছে, তবু পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না তার কারণ আখ্যায়িকা আদ্যন্ত একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। আদর্শ পূর্ব্বেই বলেছি আত্মনিবেদন, অর্থাৎ আপন হৃদয়ের দ্বার অবারিত করে, ধাবমান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মানব মুসাফিরকে ক্ষণিক আত্মদর্শনে আমন্ত্রণ করা।

সুখের বিষয় বিষয়বুদ্ধি ও চেতনার তরঙ্গ এসে জীবন-বেলা আবিল করে দেবার পূর্ব্বে শৈশবকালের স্মৃতিটুকু পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার বৈরিতায় ক্ষুণ্ণ হয় না। 'পথের-পাঁচালী' প্রণেতা শৈশবকালের বিপুল আনন্দ, বিষাদ ও অসীম কৌতূহলের স্মৃতিগুলি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন বলে পরিণত বয়সে তা ভাষায় রূপান্তরিত করে আমাদের এতখানি আনন্দ দিতে পেরেছেন।

শ্রীমতী জেমিসন আলোচ্য বইখানির প্রথমভাগটি ভরিয়ে দিয়েছেন শৈশবকালের মধুর অনুভূতির ছন্দে ছন্দে; সে অনুভূতি যতখানি আনন্দে অনুপ্রাণিত ততখানি বিষাদে আচ্ছন্ন।

"I know that when I was a child my memory was single, one sight or sound could hold it all. Not far from our house there was a thicket hedge smothered in convolvulus. The big white funnel-shaped flowers, much less beautiful than a hedgeful of wild rose or may, fascinated me. They died almost as you pulled them, and lay limp and gone. Only to stand looking at one gave me indescribable happiness and then to pull it and to hope, with what passion, that it would live. That single-minded absorption becomes rarer as we grow old".

কোন দেবতার স্পর্শ পেয়ে ঔপন্যাসিক জেমিসনের কবিত্বশক্তি মূর্ত্ত হয়েছে জানি না। যে অনুভূতির কথা বলেছি তা গদ্যে বর্ণিত কিন্তু সঙ্গীতের এমন সুস্পষ্ট ঝঙ্কার শুনতে পাই কথার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে মনে হয় ভাষা গৌণ, সার্থকতাও গৌণ, সত্য শুধু ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল অনুভূতিগুলি।

অবশ্য বয়ঃবৃদ্ধির জটিলতার আবিলতায় সে সঙ্গীত অস্পষ্ট হয়ে আসা অনিবার্য্য। প্রবর্দ্ধমান বালিকার স্বপ্ন-বিভোর জীবনে একে একে অলক্ষ্যে ভীড় করে প্রবেশ করলে—বিদ্যালয়, শিক্ষয়িত্রী, সহপাঠী, জনসাধারণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সামন্তাপুঞ্জ, আরও কত কি। ভাগ্য শুভ তাই ব্রীড়াবনতা স্বল্পভাষী ছাত্রী উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত সহচর লাভ করলে। এদের দুইজন শৈশবের সহপাঠী ও আর একজনের সহিত নূতন পরিচয়। কিন্তু শৈশবে একত্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির এমনিই মহিমা যে পরিণত বয়সে এই তিনটি যুবক সহপাঠীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় একত্রে ছাত্রজীবন যাপন করতে উভয় পক্ষের কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধাবোধ হল না।

স্ত্রীপুরুষভেদে ইংরাজ জাতি তাদের ব্যাবহারিক জীবনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও কায়দাদুরস্ত বলে বিখ্যাত। বিস্মিত হতে হয় জেমিসনের ছাত্রীজীবনের এই খণ্ডচিত্রটি দেখে। সংযম ও শালীনতার কথা স্বতন্ত্র—জেমিসন সে সময় অবার একটি ছাত্রের প্রণয়মুগ্ধ সে কথা কাহারও অবিদিত ছিল না এবং সে জন্য নিষ্কণ্ঠচিত্ত সহানুভূতি পেয়েছে সে সকলের কাছে। কিন্তু অভিভাবকগণের কি অনাবিল আস্থা! কত রজনী অতিবাহিত হয়েছে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে চিমনীর স্তিমিত আলোকে, তর্কের মাঝে, গভীর তথ্যের অনুধাবনে—সে অবহেলিত, লাঞ্ছিত হয়েছে সম্পূর্ণ পক্ষপাতবর্জ্জিত ভাবে—কোন বিধিবদ্ধ লৌকিকতা সে সহজ সরল অনাড়ম্বর অন্তরঙ্গতাকে কলুষিত করে নি।

স্বাধীনদেশের ছাত্রছাত্রী তারা—সংসারের যূপকাষ্ঠে কণ্ঠ তখনও অর্পণ করেনি। অভ্রভেদী বিপুল তাদের আশা। স্বেচ্ছাচার অনাচারের বিরুদ্ধে উচ্ছল উচ্ছ্বাস ও নির্য্যাতিতের প্রতি অপার সমবেদনায় দেহমন প্লাবিত। এমন দিনে মহাযুদ্ধের তরঙ্গ এসে গ্রাস করে ফেললে একে একে সহচরদের, সহোদরকে। স্বপ্নাবিষ্ট যুবতী অকস্মাৎ বিপর্য্যয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। জাতীয়তাবোধের আকর্ষণ ও রক্তপ্রবাহের বীভৎসতা তার প্রতিক্রিয়াপ্রবণ মনে যে অব্যক্ত বিদ্রোহের সৃষ্টি করলে তার পরিসমাপ্তি যুদ্ধের অবসানেও হয়নি। সমাপ্তিহীন জ্বালাময় প্রদাহ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হতে বিচ্ছুরিত হয়ে মজ্জায় মজ্জায় অস্থিতে অস্থিতে তিক্ততা সঞ্চার করে এসেছে অহর্নিশি এবং এই তিক্ততার তীব্রতা অলোচ্য বইখানির শেষভাগে দুঃসহ করে তুলেছে পাঠকের ধৈর্য্যকে।

জেমিসন পরবর্ত্তী দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বামীপুত্রের কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করেননি। বলেছেন, দৈনন্দিন মান অভিমানের পালা, খণ্ড খণ্ড আনন্দ ও নিরানন্দের বর্ণনা পাঠকের নিকট কোন অর্থপূর্ণ বারতা বহন করে নিয়ে যাবে না। তাঁর অর্থপূর্ণ জীবনের চরম পরিসমাপ্তি হয়েছে ১৯১৪ সালে। প্রসঙ্গক্রমে প্রথম প্রণয়ের কথা উল্লেখ করেছেন কারণ জীবন তখনও আনন্দ-উৎসারণে মহিমময়, অর্থাৎ গতানুগতিকের মসীলিপ্ত অবগুণ্ঠন তখনও জীবনীশক্তির সক্রিয় পরিস্পন্দন রোধ করে নি।

শ্রীমতী জেমিসন এইখানে পরিসমাপ্তির ছেদ কেটে আখ্যায়িকা শেষ করলে মনে মনে অস্বস্তি থেকে যেত—হয়তো তাঁর পরিশীলনশক্তি জগতের উদগ্র সত্যের সম্মুখে কুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর পরিণত 'আমি'কে অধিকতর সূক্ষ্ম ও নগ্ন ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই বিশ্বের সৃষ্ট অপ্রীতিকর অতিকায় সমস্যা-গুলির

অনুশীলন করেছেন নৈতিক ভাষার সাহায্যে—বিধিবদ্ধ প্রথায় ; এবং শুনেছি তাঁর চিন্তার গভীরতা ও বুদ্ধির দীপ্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতসভায় ইতিপূর্ব্বেই প্রশংসিত হয়েছে।

আমি অন্য কারণে আকৃষ্ট হয়েছি। আমার মনে হয় ভাষার অতিরিক্ত যে গুণ অন্তরের প্রতীতিকে এইরূপ উজ্জ্বল ভাবে বহিঃপ্রকাশ করেছে তা সত্যনিষ্ঠারও অতিরিক্ত কিছু—যা কোন পুরুষের লেখনী হতে নিঃসৃত হতো না। অথচ মাতৃত্বের প্রভাব বলতেও সঙ্কুচিত হচ্ছি।

পাশ্চাত্য চিন্তাজগৎ নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা নিয়ে আজ বিব্রত। সুসভ্য জীবের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান অত্যন্ত প্রার্থনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীমতী জেমিসন আর একটি সমস্যা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করেছেন যা অধিক গুরুতর ভাবে প্রাণিধান-যোগ্য মনে করি। যন্ত্রযুগের প্রবর্ত্তনার পর হতে মানুষের বহির্জীবন অন্তর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং আজ সেই ব্যবধানের বিস্তৃতি এত গভীর হয়ে পড়েছে যে ভয় হয় অচিরে সাবধান না হলে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা বুঝি থাকবেনা। অর্থাৎ যন্ত্রের ধাবমান রথে অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা করে সুসভ্য মানব আপন মৌলিকতা হারিয়ে অবসরটুকুও সময়ের বাঁধা খাতায় লিখিয়ে ফেলেছে এবং ফলে সাধারণ মানুষ অজানিত অস্বচ্ছন্দতায় পীড়িত হয়ে দিশাহারা ভাবে নিমজ্জিত হচ্ছে গতানুগতিকের আবর্ত্তে। এবং এই বিপর্য্যয়ের প্রতিক্রিয়া সাহিত্যক্ষেত্র আচ্ছন্ন করেছে শোচনীয় ভাবে। প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় উদ্ভাবন শ্রীমতী জেমিসন করেননি, কারণ সমস্যার অনুধাবনা আত্ম-নিবেদন নয়।

সার্থকতার কথা বিচার করে দেখলে মনে হয়, লেখিকার মূল উদ্দেশ্য যাই হোক হৃদয়াবেগের এই উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব সাহিত্য-ইতিহাসে চিরকালের মত চিত্রার্পিত হয়ে থাকবে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

An Idealist View of Life—by S. Radhakrishnan (George Allen & Unwin)

Religion in the East & West—by S. Radhakrishnan (George Allen & Unwin)

Counter Attack from the East—by C. E. M. Joad (George Allen & Unwin)

Some Turns of Thought in Modern Philosophy—by George Santayana (Cambridge)

সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই মানুষ ভাবিতে সুরু করিয়াছে জীবনের অর্থ কি ? কেন এবং কোথায় তাহার সূচনা, কিসে তাহার সার্থকতা ? দিনের পর দিন, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধ দিয়াই যদি জীবনকে বিচার করিতে চাই, তাহা হইলেও তো চলে না, কারণ ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধ সকল সময়ে ধরা পড়ে কই ? ধরা পড়িলেই বা তাহাতে কি লাভ ? কেবলমাত্র "হইয়াছে" ইহা দিয়া কি হওয়ার "সার্থকতা" বিচার চলে ?

অথচ সার্থকতার প্রশ্ন না তুলিয়াও তো আমরা পারি না। হয়তো এই সার্থকতার প্রশ্ন তোলে বলিয়াই সকল জীবশ্রেণী হইতে মানুষ স্বতন্ত্র।

সার্থকতার প্রশ্ন তুলিলেই আমরা কেবলমাত্র ঘটনা বা অস্তিত্বের গণ্ডী পার হইয়া যাই। কারণ যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ঘটিয়াছে—অস্তিত্বের দিক হইতে তাহার বিষয় আর কিছুই বলিবার নাই। অস্তিত্বের মাপকাঠিতে তাই ভালো-মন্দের বিচারের কোন কথাই উঠে না—সেদিক দিয়া সার্থকতা অসার্থকতার কোন অর্থই নাই। ভালো-মন্দ সার্থক-অসার্থক প্রভৃতির বিচার কেবল তখনই ওঠে যখন কেবলমাত্র অস্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া আমরা তাহার মূল্য বিচার করিতে বসি, কিন্তু মাপকাঠি বা আদর্শ না থাকিলে মূল্য বিচার হইবে কি দিয়া? কাজেই মূল্য বিচারের অর্থ এই যে অস্তিত্ব ব্যতীতও ঘটনা বা বস্তুর অন্য একটি দিক আছে, সেদিকের সংজ্ঞা দিতে পারি বা নাই পারি তাহার সত্য অস্বীকার করিবার আমাদের উপায় নাই।

মানব-জীবনের অর্থ বিচার করিতে বসিলেই তাই প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করিয়া নেওয়া হয় যে অস্তিত্ব ভিন্ন তাহার অন্য লক্ষণ বা গুণ আছে। সেই লক্ষণ বা গুণ যে কি তাহা লইয়া মতভেদ চলিতে পারে,—চিরদিন চলিয়া আসিয়াছেও, কিন্তু সমস্ত মতভেদ সত্ত্বেও তাহার সত্তাকে কোন দিন অস্বীকার করা হয় নাই। জীবনের বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ করিনা কেন,—সমস্ত বিদ্রোহ সমস্ত প্রতিবাদের মূলে রহিয়াছে জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতি। যে আদর্শ আমরা আমাদের বুদ্ধির আলোকে আশার রঙে ফুটাইয়া তুলি, সে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে বলিয়াই তো বাস্তব জীবনের বিরুদ্ধে আমাদের এত অভিযোগ। জীবনের অতি বড় নাস্তিকও তাই জীবনের সার্থকতাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে না—তাহার সমস্ত নাস্তিবাদের মূলে রহিয়াছে আশাআশঙ্কায় কণ্টকিত জীবনের পূর্ণতার আদর্শ।

একটি কথা মানুষ বহুদিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছে। জীবনের সার্থকতা যেখানে বা যাহাই হোক না কেন, পৃথিবীর দৈনন্দিন ব্যবহারে তাহার পরিচয় মেলেনা। এখানকার অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার, রোগ-মারী-দুর্ভিক্ষ, ভাগ্যের পরিহাস আমরা বিশ্বাসের বলে স্বীকার করিয়া লইতে পারি, বলিতে পারি যে অদৃশ্যে বসিয়া মহাকাল যে মায়ার জাল বুনিতেছে, এ সমস্ত তাহারই প্রকাশ, ইহাদের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তাহাদের ব্যাবহারিক সত্য অস্বীকার করিবার উপায় কি? স্বর্গের স্বপ্নে আমরা পৃথিবীর বাস্তবকে ভুলিতে পারি, কিন্তু সে কেবলমাত্র পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া—পৃথিবীর ব্যাবহারিক সীমার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

সমস্ত বিবাদও বাধে এই প্রশ্নটিকে লইয়া। ব্যাবহারিক ছাড়াও কি কোন সত্য আছে? আর যদিই বা থাকে তবে আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধই বা কি? বুদ্ধির প্রাধান্য আমরা যদি স্বীকার করিয়া লই, বিজ্ঞানের পদেপদে বাঁধা বিচারপ্রণালীকে মানিয়া লইয়া তাহার বাহিরে কোন সত্য আছে এ কথা যদি অস্বীকার করিতে চাই, তবে পারমার্থিক সত্যকে স্বীকার করিবারও উপায় থাকে না। জীবনের সার্থকতা তখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—বড় জোর এই কথা বলা চলে যে অর্থহীন সার্থকতাহীন জীবনকে নির্ব্বিকারচিত্তে বহন করিয়া মানুষই তাহাকে সার্থকতা দান করে—মহাকালের

ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করিয়া আমরা প্রমাণ করি যে কালপ্রবাহকে অতিক্রম করিবার আমাদের ক্ষমতা আছে।

মানুষের মন কিন্তু তাহাতে শান্তি পায় না। জীবনের সমস্ত অত্যাচার অবিচার হাসিমুখে বহন করিতে সে পারে, কিন্তু কেন বহন করিবে সে কথা জানিতে মানুষের মন উৎসুক। কেবলমাত্র বহিবার জন্য বহন করা; কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বাঁচাকে মানুষ তাই বাঁচিবার প্রেরণা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না—জীবনের অতীত কোন আদর্শকে স্বীকার করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি নাই। এই আদর্শের অভিলিপ্সাতেই তাহার জীবনের পরিণতি, এই আদর্শের সিদ্ধিতেই তাহার সার্থকতা।

বুদ্ধি দিয়া কিন্তু এ আদর্শকে উপলব্ধি করা যায় না। বুদ্ধি (intellect) আমাদের কাছে যে জগৎ উদ্ঘাটিত করে, ধারণার সঙ্গে ধারণার সমাবেশে তাহার যে মূর্ত্তি প্রকাশিত; সেখানে অস্তিত্ব ব্যতীত আর কোন লক্ষণের পরিচয় মেলেনা। ধর্ম্মকে তাই বুদ্ধির অতীত বলা হইয়াছে—কাঙাল নয়ন যেখানে দ্বার হইতে বারম্বার ফিরিয়া আসে, সে সত্যসুন্দরকে উদ্ভাসিত করিবার ক্ষমতা মানুষের নগণ্য বুদ্ধির কেমন করিয়া থাকিবে, এই কথা বলিয়া মানুষ আপনাকে সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছে। তাই বলা হয় যে সৃষ্টির রহস্য অনাদি, অগম, অজ্ঞেয়। আত্মা দিয়া আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি, বুদ্ধি দিয়া তাহার ধারণা করিতে পারি না।

বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার এ দ্বন্দ্ব মানুষের সকল জ্ঞানসাধনায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। একদিকে সৃষ্টির রহস্যকে মানুষ দুর্জ্ঞেয়, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, অন্যদিকে বুদ্ধির আলোকে তাহাকে প্রকাশিত করিয়া যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে তাহাকে বুঝিতে চাহিয়াছে। ধর্ম্মের সাধনায় মানুষ যুক্তিতর্কের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছে বলিয়াছে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যাহাকে উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন কি? অন্যপক্ষে মানুষের বিজ্ঞানবোধ বিদ্রোহ করিয়া উঠিয়াছে, বলিয়াছে যে সৃষ্টির দিগন্তের মধ্যে রহস্যের স্থান নাই—রহস্য স্বীকার করার অর্থই অজ্ঞান, আপনার অক্ষমতার স্বীকৃতি। বিশ্বাস তাই ধর্ম্মের ভিত্তি। যাহা দেখিতে পারি, যাহা শুনিতে পারি, যাহা প্রকাশ করা যায়, যাহার বিচার করিতে পারি, তাহাকে তো জানি-ই, তাহার বেলা আর বিশ্বাসের স্থান কই; যাহা অদৃশ্য, অশ্রুতিগোচর, অনির্ব্বচনীয়, অজ্ঞেয়, তাহারই বেলা বিশ্বাসের কথা উঠে—তাহাকেই আমরা ভক্তি দিয়া, শ্রদ্ধা দিয়া, অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করি। বিজ্ঞানবোধ ও ধর্ম্মবোধ তাই পরস্পরবিরোধী, কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের সমন্বয়ই দর্শনের সাধনা।

দর্শনের সমন্বয়েও কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই—রক্ষিত হইতে পারেনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকদের চিন্তায় এই দুই ধারাই মিলিয়াছে, কিন্তু সেখানে কাহারো মধ্যে একটি, কাহারো মধ্যে অন্যটির প্রাধান্য। শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক যাঁহারা নন, তাঁহাদের মধ্যে এ সমন্বয়ের অভাব আরো বেশী—সেখানে কোথাও বা বিজ্ঞানবোধের একচ্ছত্র অধিকার, কোথাও বা ধর্ম্মবোধের প্রতিপত্তিতে যুক্তিতর্কের স্থান মেলে নাই। ইংরেজ দার্শনিক Hume'র চিন্তাজগতে রহস্যের স্থান নাই—সেখানে বুদ্ধি দিয়া সৃষ্টির সীমান্তকে উদ্ভাসিত করিবার চেষ্টা। কিন্তু বুদ্ধির বিজয় অভিযান বুদ্ধিরই পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যপক্ষে Plotinus'র জগতে অনুভূতির প্রাধান্য—ধর্ম্মবোধের প্রবলতায় বুদ্ধির সমস্ত বাধানিষেধ, সমস্ত বিভাগ বিচারকে অতিক্রম

করিয়া দর্শন অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। Heraclitus Plato অথবা Kantএ কিন্তু এ একদেশদর্শিতা নাই—হেরাক্লিটাস তাই একদিকে বলিয়াছেন, "যাহা দেখা যায় শোনা যায়, বোঝা যায়, আমার কাছে তাহারই মূল্য আছে", কিন্তু অন্যপক্ষে তেমনই তিনিই বলিয়াছেন, "একই নদীতে আমরা নামি এবং নামিনা—আমরা আছি কিন্তু নাই-ও।" বুদ্ধিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া Kant'রও তাই শেষ কথা—"বুদ্ধিকে সরাইয়া তাই আমি বিশ্বাসের স্থান করিয়া দিয়াছি"।

দর্শনের কোন সমন্বয়েই চিরস্থায়ী নহে। স্বাধীনতার মতন সে সমন্বয়কেও বারম্বার নূতন করিয়া সাধন করিতে হয়—সদাজাগ্রত চিত্তের একাগ্রতা দিয়াই তাহাদের বারম্বার নূতন করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়। Kant সেই জন্যই বলিয়াছেন—দর্শন বলিয়া কিছুই নাই—কেবল আছে আমাদের প্রত্যেকের দার্শনিকতা। ইয়োরোপের, অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের দর্শনের কাহিনীর সঙ্গে যাঁহার পরিচয় আছে, তিনিই একথা স্বীকার করিবেন।

বিজ্ঞানবোধ ও ধর্ম্মবোধের কোন সমন্বয়ই তাই টিঁকে নাই—কখনো একটি কখনো অন্যটির প্রাধান্যে সে সামঞ্জস্য লঙ্ঘিত হইয়া নূতন সমাধানের প্রয়োজন হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে বিজ্ঞানের জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছিল, প্রকৃতির নব নব রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া মানুষ নূতন শক্তির বলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে জয় করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বিজ্ঞানবোধের এ বিজয়স্পর্দ্ধা যে দর্শনকেও অভিভূত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন তাই প্রধানতঃ জড়বাদী, জিজ্ঞাসু এবং বুদ্ধির শক্তিতে বিশ্বাসী। রহস্যের অস্তিত্বকে সে স্বীকার করিতে চাহে নাই—সকল কিছুকেই বিশ্লেষণ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছে—বুদ্ধির গর্ব্বে বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত কিছুকেই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ধর্ম্মবোধের এ পরাজয় কিন্তু ইয়োরোপেও সকলে মানিয়া লয় নাই। বিজ্ঞান যে সমস্ত কিছুই প্রমাণ করিতে পারেনা—বিজ্ঞানের অশক্তির এই পরিচয়কেও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লোকে ধর্ম্মবোধকে আবার জাগাইতে চাহিয়াছে। বুদ্ধির (intellect) পরিবর্ত্তে অনুভূতি (intuition), যুক্তিবৃত্তির (understanding) বদলে মনোবৃত্তির (reason) আধিপত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া দর্শনকে নূতন করিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা তাই আধুনিক ইয়োরোপেও হইয়াছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা বিশেষ করিয়া এই চেষ্টার অগ্রণী, রাধাকৃষ্ণন তাঁহাদের অন্যতম।

অন্যান্য আধুনিক ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণনের প্রধান প্রভেদ এই যে রাধাকৃষ্ণনের দর্শন ভারতীয় চিন্তাধারায় অভিষিক্ত, ইয়োরোপের দর্শনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় নিগূঢ়—কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ধারা তাঁহার রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত। এই সংমিশ্রণের ফলে ইয়োরোপের দর্শনকে তিনি ভারতের দৃষ্টিতে দেখিতে চাহিয়াছেন—ভারতের দর্শনকে ইয়োরোপের পরিভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা ইয়োরোপের বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের গোড়ার কথা এই যে কেবল বুদ্ধি দিয়া জীবনকে উপলব্ধি করা যায় না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকেই বুদ্ধির শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বাঁধিয়া রাখা চলেনা—অথচ জীবন এ অভিজ্ঞতারও বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই জীবনকে বুঝিতে চাহিলে আমাদিগকে বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে—যুক্তি তর্কের রৈখিক

(linear) প্রগতিকে ছাপাইয়া তাই দর্শনের সমগ্র দৃষ্টি। ভারতবর্ষ একথা স্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই সেখানে তাহার নাম দর্শন।

An Idealist View of Lifeএ রাধাকৃষ্ণন কেবল এই কথার উপর জোর দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সেখানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বিজ্ঞান নিজেই আপনার বিজ্ঞানসম্মত পথ অনুসরণ করিলে শেষে আসিয়া রহস্যের দ্বারে না পৌঁছিয়া পারেনা। বিজ্ঞানকে সর্ব্বব্যাপী করিতে গেলে শেষে বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করিতে হয়। ধর্ম্মের জন্য মানুষের যে আকূতি, তাহাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের যুক্তিতে সত্যকে নিঃশেষ করা যায় না—অভিজ্ঞতাই বিজ্ঞানের ভিত্তি, কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে ধর্ম্মবোধের বেলা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করিবার যৌক্তিকতা কোথায় ?

যুক্তির দিক দিয়া বিজ্ঞানবোধের তাই ধর্ম্মবিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকিতে পারেনা। অন্যপক্ষে, মানুষের অন্তরের যে প্রেরণাকে ধর্ম্মবোধ পরিতৃপ্তি দেয়, তাহাকে মিটাইবার ক্ষমতাও বিজ্ঞানের নাই। সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই মানুষ আত্মার শান্তি খুঁজিয়াছে—কোথায় সে সাধনা সফল আর কোথায় তাহা নিরর্থক, সে বিচার না করিয়াও একথা বলা চলে, যে এই সাধনার বাস্তবতাই ধর্ম্মবোধের লক্ষ্যের সত্যতা নিরূপণ করে। বুদ্ধি দিয়া আমরা সে লক্ষ্যকে হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারি, কিন্তু জীবনের উদগ্রীব অভীপ্সায় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকেনা।

সমগ্রকে বুঝিবার চেষ্টায় বুদ্ধি যে যথেষ্ট নহে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু অভিজ্ঞতার সীমাভূমির মধ্যেও কেবল বুদ্ধি দিয়া আমাদের চলেনা। সাহিত্য-চিত্র-সঙ্গীত-কলার কথা ছাড়িয়া দিলেও বিজ্ঞানের রাজত্বের মধ্যেই অনুভূতির স্থান রহিয়াছে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টি—সে দৃষ্টিতে অংশ এবং সমূহকে পৃথক জানিয়াও তাহাদের সমন্বয় ধরা পড়ে। কেবল মাত্র বুদ্ধি দিয়া যুক্তির পরে যুক্তি সাজাইয়া যাহা জ্ঞাত, যাহা প্রকাশিত, তাহার সংগঠন বোঝা যাইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞাতের আবিষ্কার, অপ্রকাশিতের উদ্ভাসনে যুক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টির প্রয়োজন। এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকে একবার অন্যান্যক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইলে কেবল মাত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তাহাকে অস্বীকার করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

রাধাকৃষ্ণন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকে এই ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহার সাহায্যে জীবনের চরম সত্যকে প্রতিভাত করিতে চাহিয়াছেন। সে সত্যকে বর্ণনা করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না—এমন কি প্রকাশ করা যায় না। অনুভূতি দিয়া তাহাকে উপলব্ধি করা যায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাহা জীবনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যেমন করিয়া বিদ্যুচ্ছটায় সমস্ত অন্ধকার সহসা শিহরিয়া ওঠে। জীবনে যুক্তির স্থান অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু যুক্তি কেবলমাত্র প্রমাণ যোগায়, যাহা প্রামাণ্য তাহা কেবল অনুভূতিতেই মিলে।

বুদ্ধির অপ্রাচুর্য্য (insufficiency) এবং অনুভূতির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণে রাধাকৃষ্ণনের কৃতিত্ব, কোন নূতন বা চমকপ্রদ কথার জন্য নহে। তাঁহারই ভাষায় যাহা কিছু সত্য তাহাই চিরপুরাতন। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে চিরপুরাতন সত্যকে তিনি নূতনভাবে সাজাইয়া লোকের সামনে দাঁড় করাইয়াছেন, চিরকালের সত্যকে তিনি আধুনিক যুগের ভাষা দিয়াছেন। তাঁহার ভাষার সৌষ্ঠব এবং বোধগম্য করিবার ক্ষমতা অসাধারণ, বহু বিষয়ে বহু ব্যাপক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এই প্রকাশক্ষমতার মিলনে ধর্ম্মবোধের স্বপক্ষে তাঁহার যুক্তি এই বিজ্ঞানের যুগে এই কালের ভাষায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

Religion in the East and Westএও রাধাকৃষ্ণন সেই কথাই আবার বলিয়াছিলেন। মানুষের আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সত্যকে জানে—এই জানা যুক্তি দিয়া নহে, ধারণা দিয়া নহে। বুদ্ধি দিয়া আমরা যাহা জানি, তাহা পরোক্ষ, তাহার মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব রহিয়াছে এবং চিরদিনই থাকিবে। ধারণা এবং ধারণার বিষয় এক নহে, জ্ঞানের নায়কের সঙ্গে জ্ঞানের বস্তুর বৈষম্য বুদ্ধি কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না। অথচ এই দ্বৈতবোধকে মিটাইতে না পারিলেও আত্মার শান্তি নাই। আত্মার যে উপলব্ধি আমাদের অভিজ্ঞতার ভাষায় তাহাকে তাই ব্যক্ত করা যায় না, তাহাকে অভিজ্ঞতার মধ্যে গণ্য করাই কঠিন, কারণ সমস্ত দ্বন্দ্ব, সমস্ত বৈষম্যকে অতিক্রম করিয়া এই উপলব্ধি। পারমার্থিক সত্যের দিক দিয়া জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য তাই কেবলমাত্র মায়া—এই মায়াকে লঙ্ঘন করিবার সাধনাই মানুষের মুক্তির সাধনা। মায়ার ব্যাবহারিক সত্তাকে তাই বলিয়া অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু ব্যাবহারিক সত্যকে পারমার্থিক বলিয়া গ্রহণ করি বলিয়াই আমাদের জীবনের সমস্ত বিড়ম্বনা। তাহারও মূলে রহিয়াছে আমাদের বুদ্ধির অক্ষম স্পর্দ্ধা, কারণ অনুভূতিতে আত্মা যাহা উপলব্ধি করে, পারমার্থিক বলিয়াই তাহা অনির্ব্বচনীয়। বুদ্ধি তাহাকে জানেনা অথচ প্রকাশ করিতে চাহে, আয়ত্ত করিতে পারে না, অথচ যুক্তি দিয়া বিচার করিতে চাহে। ফলে ব্যাবহারিক পরিভাষায় বুদ্ধি যাহা প্রকাশ করে, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি নহে, অনুভূতির বিকৃতি, আত্মার উপলব্ধি নহে, কেবলমাত্র উপলব্ধির প্রাণহীন কঙ্কাল। কঙ্কাল যে প্রাণহীন, সে কথা ভুলিয়া যাই বলিয়া আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সত্যের সঙ্গে বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠিত ব্যাবহারিক সত্যের বিবাদ প্রতিমুহূর্ত্তেই চলিয়াছে। সমাজরীতির ভিত্তিও এই ব্যাবহারিক সত্য, তাই সমাজের কাছে তাহার লঙ্ঘনই পাপ, কিন্তু সমাজের ভয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে অস্বীকার করিয়া আমরা আত্মার অবমাননা করি। রাধাকৃষ্ণনের চোখে তাই বিপ্লবই সৃষ্টির ভিত্তি—প্রাচীন জীর্ণ রীতিকে লঙ্ঘন করিয়া আত্মার নিত্যাধীন প্রকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব। বুদ্ধি কিন্তু আত্মার সে সত্যকে চেনেনা—বুদ্ধিকে লঙ্ঘন করিয়া অনুভূতি দিয়াই আমরা পারমার্থিক সত্যকে পাই।

এখানে দুইটি প্রশ্নের উত্থাপন করা যাইতে পারে। পারমার্থিক সত্যকে জানিবার পক্ষে বুদ্ধি যথেষ্ট নয় একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অনুভূতিই যে পারমার্থিক সত্যকে উদ্ভাসিত করে তাহা মনে করিবার কারণ কি? অবশ্য বলা যাইতে পারে যে ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল, কাজেই তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহা বলিলেও প্রশ্ন ওঠে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কি সকল সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য? এ সংসার আমাদের সকলের ভুল হয়, অথচ সে সব ভুল অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। মরুভূমিতে মরীচিকা যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাহা অস্বীকার করিবার যেমন কোন কারণ নাই, তেমনি সে অভিজ্ঞতা যে ভ্রান্ত তাহা স্বীকার না করিয়াও উপায় নাই। কোন কিছুকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলিলেও আমাদের সন্দেহ মিটিতে পারে না—সে অভিজ্ঞতাকেও যাচাই করিবার চেষ্টা করে বলিয়াই মানুষ মানুষ। অন্ততঃপক্ষে মরীচিকা ভ্রান্তি স্বপ্ন প্রভৃতির আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার দোহাই দিলে মানুষের মন তাহাকে মানিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করিবেই।

Santayanaর বক্তব্যও তাই। তিনি বলিতে চান যে অতিআধুনিক জগতে যে অনুভূতির প্রতি বিশ্বাস আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ অভিজ্ঞতার

প্রত্যক্ষতা নহে। তাহার কারণ খুঁজিতে হইবে আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের আভ্যন্তরীণ মহাবিপ্লবে। পূর্ব্বে বিজ্ঞান রহস্যকে স্থান দেয় নাই—সৃষ্টিকে গণিতের মত বোধগম্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সেই চেষ্টার সাফল্যেই আজ প্রতিভাত হইতেছে যে গণিতও পরম রহস্যময় হইয়া উঠিতে পারে। বিজ্ঞানে হেঁয়ালী ঢুকিয়াছে বলিয়াই আজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির আদর বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সে হেঁয়ালীর কারণ তো আমাদের অজ্ঞতাও হইতে পারে। আমরা বা আমাদের যুগ এ সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই যে সৃষ্টির সত্য অজ্ঞেয়, তাহা মনে করিবার কারণ কি? অধিক সময়ে সে জ্ঞান তো আসিতেও পারে—এবং না আসিলেও বুদ্ধির যাথার্থ্যে সন্দেহ করিবার কারণ কি? জ্ঞানের অভাবের অর্থ যে আমরা জানি না। অভাবের জ্ঞানের অর্থ যে আমরা জানি যে অভাব রহিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণন অবশ্য এ কথার উত্তর দিতে পারেন যে বুদ্ধির গোড়াতেই গলদ রহিয়াছে—বুদ্ধির স্বভাবই স্ববিদ্রোহী, কাজেই আমাদের বা আর কাহারো বুদ্ধিগত জ্ঞানের পরিমাণের প্রশ্ন ওঠে না। সে কথা মানিয়া লইলেও বুদ্ধির অসাফল্যে অনুভূতির সাফল্য যে কি ভাবে প্রমাণিত হয়, সে প্রশ্ন সমস্যাই থাকিয়া যায়। তবু আধুনিক জগতের আধুনিক পরিভাষায় রাধাকৃষ্ণন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানবোধের দ্বন্দ্বের এ সমস্যা তুলিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। Joadর বইখানি রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের সম্বন্ধে—কিন্তু তাহাতে আলোচনা বা বিচারের একান্ত অভাব বলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে Joadর ভাষা সরল ও সতেজ, এবং অপরের মতামত নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। কাজেই বইখানি লঘুপাঠ্য হইলেও চিত্তগ্রাহী হইয়াছে, কিন্তু Joad'র কাছে সংবাদপত্রের বিবরণের অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের আলোচনা পাইলেই আমরা বেশী সুখী হইতাম। ইহাতেও রাধাকৃষ্ণনের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ Joad রাধাকৃষ্ণনের প্রতি শ্রদ্ধায় এত অভিভূত, যে সমালোচনা করিবার কথাই বোধ হয় তাঁহার মনে একবারও উঠে নাই।

হুমায়ুন কবির

Better Think Twice About It:—by Luigi Pirandello. Translated by Arthur and Henrie Mayne. (John Lane, the Bodley Head Ltd.)

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি ছোটগল্পের বই। তেরটি গল্প, সংগৃহীত হয়েছে লেখকের তেরখণ্ড গল্পগুচ্ছের কেতাব থেকে,—অর্থাৎ চালের বস্তায় খোঁচা মেরে ছুঁচ্‌লো 'বোমায়' ধরা একটুখানি নমুনা মাত্র।

অনুবাদক ভূমিকায় বলেছেন যে পিরাণ্ডেলোর গল্পিকার ইংরাজি তর্জ্জমা এই প্রথম বাহির হল,—যদিচ Great Short Novels of the Worldএ এই লেখকের একটি গল্প (যা' এ সংগ্রহে নেই) ইতিপূর্ব্বে বাহির হয়েছে দেখেছি। অধ্যাপক

পিরাণ্ডেলো সুপণ্ডিত এবং সাহিত্যিক।* ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রচিত পুস্তকের সংখ্যা যথা ঃ—কবিতা ৭, উপন্যাস ৭, গল্পগুচ্ছ ১৩, নাটক ২৮। এ ছাড়া তিনি সমালোচক।

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যদি যথার্থ কবি হন, কিম্বা বিকল্পে, স্বভাবকবি যদি জড়বিজ্ঞানে বা মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী হন, তবে তাঁর সাহিত্যরচনায় তত্ত্বকথাটা জারিত হয়ে হয় রস-সিন্দুর। গল্প ক'টি পড়ে, বিশেষতঃ তিন চারিটির রচন-নৈপুণ্যে, ওস্তাদের পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। বিচিত্রতা এবং প্রসারও খুব, লেখকের গলায় উদারা মুদারা তারার তিন সপ্তক স্বরের বহর এবং কারচুপি আছে।

দ্বিতীয় গল্পটির নামে বইখানির নামকরণ হয়েছে। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'র এই উপাখ্যানে করুণ, হাস্য ও বীভৎস রসের যে সমাবেশ হয়েছে, তার ভিতর সামাজিক বিধিনিষেধের বন্ধনদশায় আদিম মানবের যে ছবিটি ফুটেছে তাতে বিতৃষ্ণার সঙ্গে একটা অনুকম্পা হতভাগ্য বৃদ্ধের সম্বন্ধে স্বতঃই মনে জাগে। "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ?"—শঙ্করের এই বাক্যটির যদি এইরূপ উদ্ভট ব্যাখ্যা করা যায় যথা,—স্ত্রীগুণ অর্থাৎ নারীবশীকরণ, তদ্ভাববিরহিত পথে, কিনা বার্দ্ধক্যে, বিধিই বা কি আর নিষেধই বা কি—তা হ'লে বৃদ্ধ অধ্যাপক টোটির প্রবীণতার ও কার্য্যকলাপের একটা সহজ নিরিখ পাওয়া যায়। লোকটা নিষ্কাম স্বার্থপরতার সোনার পাথর বাটি। The Jar গল্পটি নিছক্ হাস্যরসের ভাঁড়। The Other Sonএ বৃদ্ধ ভিখারিণীর সারা-জীবনের সংগৃহীত ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলির মধ্যে কত দুঃখ, কত আশা, কত ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা' প্রতিভাশালী ও দরদী লেখকের রচনা না হ'লে এত অল্প পরিসরের মধ্যে এমন জাজ্বল্যমান্ হ'তে পার্‌ত না। ছোট্ট একটি গল্পের নখদর্পণে লেখক একটুর মধ্যে অনেকখানি আমাদের দৃষ্টিগোচর করাতে পারেন। Wet Nurseএ লেখক যাদুকরের মত ধামা চাপা দিয়ে একটি বিষবৃক্ষের বীজবপন থেকে ফলোদ্ভব পর্য্যন্ত পাঠকের চোখের সাম্‌নে দেখিয়েছেন। এটা লেখামাত্র নয়, একেবারে 'টকি' যা যুগপৎ চোখের ও কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। দাম্পত্যজীবনের দৈনিক খিটিমিটির আব-হাওয়ায় বর্দ্ধিত বাপমায়ের একমাত্র আদুরে মেয়ে পিত্রালয়ের অশান্তি কেমন করে স্বামীর ঘরে নিয়ে গেল এবং তার প্রথম সন্তানের জন্য নিযুক্ত যুবতী Wet Nurseএর কপাল পুড়্‌ল এই পরিবারের সম্পর্কে এসে, তার নিখুঁৎ চলচ্চিত্র এই গল্পটি। Chants the Epistleএ একটি নিঃসঙ্গ সত্য-সন্ধ যুবক হাসি টিটকারি গঞ্জনার মধ্যে কেমন করে একটা ঘাসের ফুলের স্নেহে প্রাণটাকে তাজা রেখে অবশেষে মিথ্যাপবাদের ফেরে পড়ে' 'ডুয়েল'এ নাম্‌ল এবং পিস্তলের গুলি বুকে নিয়ে লাঞ্ছিত জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ কর্‌ল, তারি একটা মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ। আর দুচারটি গল্প আছে যা ব্যঙ্গকৌতুকে বিশ্লেষণদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

গল্পগুলির ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও ছেদ নাই, এমন সহজ সুন্দর অবলীলা-ক্রম তা'তে। এমনি করেই ত জীবনের ছোট বড় কত ঘটনাই ঘট্‌চে, তাদের পরম্পরের মধ্যে নিগূঢ় যোগ আছে বটে কিন্তু কোথাও তালিজোড়া নাই। 'প্লট' আপন আবেগেই ঋজুকুটিল গতিতে চলেছে, কোথাও খাপছাড়া ঠেকে না। যেটা অপ্রত্যাশিত সেটা যখন ঘট্‌ল তখন মন বিনা আপত্তিতেই সায় দিলে। যেন একজনকে বরাবর বিশ্বাস করে

* গল্পলেখক হিসাবে পিরাণ্ডেলো মোপাসাঁ চেকভের সমকক্ষ এরূপ একটা খ্যাতি য়ুরোপে আছে।

এসেছি, তারপর সে এমন একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে বস্‌ল যার তীব্রদীপ্তিতে লোকটার চাল্‌বাজি আগাগোড়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল এবং রাগটা যেন তার উপর না হয়ে নিজের নির্বুদ্ধিতার উপরই হ'ল। লেখক ঠিক সময়ে এসে থাম্‌তে পারেন ও পাঠকের সুপ্রসন্ন শিরঃসঞ্চালন অর্জ্জন করেন।

একটা ট্রাজেডির সুর লেখাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে ফুটেছে মনে হয়। এটা দুঃখবাদীর কালো চশ্‌মার ভিতর দিয়ে দুনিয়াটাকে দেখা নয়। রংটা লেখকের মনে নয়, এই ধরিত্রীর গায়ের রং। বসুন্ধরা ত গৌরী নন, তিনি শ্যামাঙ্গিনী। যে দিক্‌ দিয়েই দেখি, পেয়ে অতৃপ্তির খেদ, না পাওয়ার বেদনা, পেয়ে হারানোর শোক ইত্যাদিতে সংসারটা দুঃখময়। নিপুণ শিল্পী যখন হুবহু ছবি তোল্‌বার জন্য তুলি ধরেন, তখন তাঁর মনে যত স্ফূর্ত্তিই থাকুক্‌, সেটাতে যদি তুলি না ডোবান তা' হ'লে, ছবিগুলি বোধহয় অধিকাংশ স্থলেই একটু কজ্জলাভ হবে। যে পৃথিবীর তিনভাগ লবণাম্বুরাশি তার অধিবাসী জীবদের হাসির চেয়ে অশ্রুর সম্বলটা বুঝি সেই অনুপাতে বেশী।

প্রবীণ লোকের ভাব, চিন্তা, কল্পনা ও ভাষার মধ্যে বহু অভিজ্ঞতার একটা সূক্ষ্ম নির্য্যাস না থেকে পারে না। পুরানো বেহালার সুরের মত তা'তে বহুশ্রুতি-সম্বলিত একটা মিশ্র অনুরণন মিশে থাকে। অনেকদিনের অনেক কম্পনের লিপি বেহালার রন্ধ্রে যে জমাট হয়ে আছে। তা'তে সুরের মাধুর্য্য বাড়ে বই কমে না। এই ভাব-বৈদগ্ধ্য লেখকের রচনায় পরিস্ফুট।

তবু এত কথা বলচি কেবলমাত্র তর্জ্জমা পড়ে, এবং এমন-সব ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক মণ্ডলের সম্বন্ধে, যাদের সঙ্গে আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের মত কূপ-মণ্ডূকের পরিচয় নিতান্ত পরোক্ষ। তবু যে ভাল লেগেছে তা'তে বোধহয় এই প্রমাণ হয় যে, আমাদের সকলের মধ্যেই বিশ্বমানব বিদ্যমান্‌, এবং প্রকৃত শিল্পীর রচনায় এমন কিছু আছে যার প্রকাশ হাসিকান্নার মতই সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভাবিক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

Sanctuary; Sartoris; Light in August; These Thirteen—by William Faulkner (Chatto and Windus).

আমি সাহিত্যে জঙ্গমতার পক্ষপাতী। মানবসত্য যদিও মূলত সনাতন, তবু তার অভিব্যক্তি যুগে যুগান্তরে নির্ব্বিকার থাকলে, যেটা একদিন প্রেরণারূপে দেখা দেয়, অবশেষে সেটা পরিণত হয় অন্ধ অভ্যাসে। সকল সাহিত্যস্রষ্টাই এই কথাটাকে পাকে-প্রকারে মেনে নিয়েছেন। সেইজন্যেই গ্রীক ট্রাজেডির ঐক্যত্রয় শেক্‌স্‌পীয়রের সমর্থন পায়নি, এবং রাসিন্‌ এলিজাবেথীয় নাটকের অসংহত উচ্ছ্বাসকে ভয়ের চক্ষে দেখেছিলেন। সেইজন্যেই ডিফো, ষ্টার্ণ ও ফিল্‌ডিঙ্‌-এর কথাসাহিত্য স্কট্‌, ডিকেন্‌স্‌, থ্যাকারেকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি, এবং আধুনিকেরা ভিক্টোরীয় ঔপন্যাসিকদের পদাঙ্ক ছেড়েছেন। কিন্তু পরিবর্ত্তন শুধু পরিবর্ত্তন বলেই শ্রদ্ধেয় নয়, তার পিছনে নিত্যের তাগিদ থাকলে, তবেই তা গ্রাহ্য। সুতরাং এমন বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে সাহিত্যে রূপ যে-কাজ করে, সমাজে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় টাকায়। অর্থাৎ মূল্য

জিনিসটা চিরন্তন কিন্তু মুদ্রা ক্ষণস্থায়ী। মুদ্রা মূল্যের প্রতিনিধি, কাজেই কালক্রমে কিম্বা জালিয়াতের কৃপায় যদি তার প্রতিনিধিত্বে ঘুণ ধরে তবেই তার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়ে পড়ে, নচেৎ তার আকারে-প্রকারে ইতরবিশেষ ঘটে না।

দুঃখের বিষয়, আমাদের সমসাময়িক লেখকেরা একথাটা প্রায়ই ভুলে যান। হয়তো যে-ধনতান্ত্রিক যুগে মুদ্রা মূল্যের সমকক্ষ হয়ে ওঠে, তাতে রূপ ও রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব; হয়তো বিকারনিষ্ঠ বের্গ্‌সঁ-র তত্ত্ববিদ্যায় প্রাচীনপন্থী দার্শনিকেরা যত ছিদ্র বের করেছেন তার অধিকাংশই কাল্পনিক; হয়তো—। কিন্তু কারণ সন্ধান এ ক্ষেত্রে অসার্থক, কারণ যাই হোক, এটা নিশ্চয় যে পাউণ্ড্, এলিয়ট্, জয়েস্ ইত্যাদির মতো প্রকৃত শিল্পীরাও মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তনকে শুধু পরিবর্ত্তন হিসাবেই প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন; ষ্টাইন্, ম্যাক্লাইশ, কামিংস্ প্রভৃতি বাগ্‌জীবনেরা মাত্র উদ্‌ভটতার কল্যাণেই কবি প্রতিভার অংশিদার হয়ে ওঠেন; এবং হাক্‌স্লির মতো নকলনবিশ কেবল ভেকবদলের ক্ষিপ্রতায় অর্জ্জন করেন ভাবস্বকীয়তার খ্যাতি। ষ্টেচির ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ওজোগুণ দেখি ব'লে তাঁর অপূর্ব্ব মৌলিকতা আজ অস্বীকৃত, ফর্ষ্টার-এর নিরবদ্য উপন্যাসগুলি অধুনাতনী অস্তব্যস্ততার ধার ধারেনা বলে তাঁকে আজ আমরা ভুলতে বসেছি, ইয়েটস্-এর কবিতায় শাশ্বত সত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁর বিস্ময়াবহ সততা ও সজীবতা আমাদের দৃষ্টির অগোচর।

শেষোক্ত তিন মহারথী সম্বন্ধে যা বললুম তার থেকে এমন মনে করলে অন্যায় হবে যে এঁরা চিরাচরিত পথেই দিগ্বিজয় আবদ্ধ রেখেছেন। বরং উল্‌টোটাই বেশি সত্য; মানবমনের এমন দিক খুব কমই আছে যার ভৌগলিক পরিচয় এঁদের লেখা থেকে বের করা যাবে না। এ কথা ভাবলেও ভুল হবে যে পদ্ধতির চেয়ে প্রসঙ্গের প্রতিই এঁদের বেশি নজর, অথবা কলাসৃষ্টিতে এঁরা যতখানি পারদর্শী, কলাকৌশলে ততখানি সিদ্ধহস্ত নন। গোয়টের সময় থেকেই প্রত্যেক সাত্ত্বিক সাহিত্যিক শিল্প ও স্বভাবের প্রকৃতিগত প্রভেদ অনুভব করে আসছেন; এবং উক্ত তিন লেখকের ক্ষেত্রে এই মূলগত পার্থক্য যে কেবল নীরবে স্বীকৃত হয়েছে, তা নয়, কলা এবং কৌশলের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিয়ে এঁরা বাগ্‌বিস্তারও করেছেন যথেষ্ট। কিন্তু তাহলেও, শিল্পপ্রকরণ প্রসঙ্গে এঁদের তিনজনের মতামত অনেক সম্প্রতিবিদের সিদ্ধান্ত থেকে আলাদা। প্রথম থেকেই এঁদের রচনায় একটা স্থৈর্য্য দেখা গেছে, যা আধুনিক সাহিত্যে দুর্লভ; এবং পরীক্ষায় যদিও এঁরা সতত প্রস্তুত, তবু এঁরা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলে যাননি যে পরীক্ষা শুধু তখনই সার্থক, যখন তার সাহায্যে একটা স্থায়ী ও অবিকল শিল্পসামগ্রীর সন্ধান মিলে। বহুল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এঁরা এই আর্য্যসত্যের প্রতি আস্থা রেখেছেন যে রূপ ও রসের অবিভাজ্য সামঞ্জস্যকেই সাহিত্য নামে অভিহিত করা চলে। তাই এঁদের পদ্ধতি সব সময়ে হয়তো কালোপযোগী হয় না; কিন্তু প্রসঙ্গের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক সদাসর্ব্বদা অটুট থাকে।

ফক্‌নার-এর মতো অত্যাধুনিক লেখকের আলোচনায় উক্ত ধ্রুবপদী সাহিত্যিকত্রয়ের উল্লেখ নিশ্চয়ই অবান্তর। কিন্তু লেখার ঝোঁকে ওই তিনজনের নাম কলমের মুখে দৈবাৎ এসে গেল ব'লেই আমি ওঁদের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠিনি, অনেক ভেবে চিন্তে, তবে ওঁদের এই প্রবন্ধে স্থান দিয়েছি। কারণ ওঁরা যদিও প্রায় সকল রকমেই পরস্পরের ও ফক্‌নার-এর থেকে পৃথক, তবু একটা অতিপ্রয়োজনীয় দিকে ওঁদের সঙ্গে আলোচ্য লেখকের সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য রূপজ্ঞানে। প্রথম প্রকাশিত রচনা থেকেই ওঁরা

তিনজন রূপসম্বন্ধে যে নির্ব্বিকল্প মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আসছেন, তার জোড়া ইদানিকার লেখকদের মধ্যে মাত্র ফক্‌নার-এর উপন্যাসেই আমি পেয়েছি। তার মানে এ নয় যে সাধনায় বা সিদ্ধিতে ফক্‌নার ওঁদের সমকক্ষ, তার মানে শুধু এই যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচখানা উপন্যাস ও একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করার ফলেও ফক্‌নার অন্যান্য অধুনাতনী লেখকের মতো কোনো মুদ্রাদোষের আভাস দেননি। পরীক্ষায় তাঁর উৎসাহ যদিও অপরিমেয়, তবু ঔপন্যাসিকের প্রথম কাজ যে রোমাঞ্চসঞ্চার নয় গল্প বলা, সেকথা তিনি একবারও ভোলেননি। ফলে তাঁর অনেক লেখাকেই অনেক সময়ে কষ্টপাঠ্য লেগেছে, কিন্তু কোনোটিকেই কখনো অনাবশ্যক মনে হয় নি; মাঝে মাঝে বোধ হয়েছে তাঁর কথকতার ভঙ্গী অপ্রত্যাশিত রকমের জটিল, কিন্তু বই বন্ধ করে বোঝা গেছে যে ঠিক সেই গল্পটি অভ্যস্ত উপায়ে বলা আদৌ সম্ভব ছিলো না; বহু স্থানে বহু পূর্ব্ব স্বরীর প্রভাব তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অবশেষে মানতেই হয়েছে যে আধুনিক-রুচিসম্মত আদর্শের অনুকরণে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করেননি, করেছেন উজ্জ্বলতর। যত সাম্প্রতিক শিল্পপ্রকরণ নিয়েই তিনি পরীক্ষা করুন না কেন, ফক্‌নার কখনো বিস্মৃত হননি যে ঔপন্যাসিকের প্রথম কর্ত্তব্য তাঁর চরিত্রাবলীর প্রতি,—তারা জীবন্ত, এবং জীবনে উৎকট-তার স্থান থাকলেও উদভটতা একেবারেই অচল।

হয়তো প্রশংসা একটু বেশি রকমের হয়ে গেলো। কিন্তু তাই ব'লেই এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে আমি ফক্‌নার-এর দোষ সম্বন্ধে অচেতন। তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে প্রত্যক্ষতার অভাব। আধুনিক নভেলের যেটা মুখ্য দৌর্ব্বল্য,—অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিকতা, তার আকর্ষণ ফক্‌নার যদিও গোড়া থেকেই এড়িয়ে চলেছেন, তবু জোরালো কথাকে ঘোরালো করে বলার শিশুসুলভ অভ্যাস তিনি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অবশ্য এই পরোক্ষ পদ্ধতির সমর্থনে ধ্রুপদী নজির সংগ্রহ করা শক্ত নয়। গ্রীক নাট্যকারেরাও সাধারণত তাঁদের ট্রাজেডির দুর্ঘটনা-গুলোকে দর্শকের চোখের সামনে আসতে দিতেন না, তার ফলাফল জ্ঞাপন করতেন সাক্ষীর জবানীতে। ইব্‌সনের নাটকও যে দুর্ব্বিপাকের পটভূমিতে রূপ পরিগ্রহণ করে, তা ততটা দৃষ্টিগোচর নয়, যতটা অনুমেয়। কিন্তু নাটকে এই উপায় সিদ্ধ হয়েছে ব'লেই, একে উপন্যাসে স্থান দেওয়া মার্জ্জনীয় নয়। এ কথা ভুললে চলবে না যে সাহিত্যের নাটকাদি প্রাচীন অঙ্গগুলোর সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করার জন্যেই উপন্যাসের সৃষ্টি। সুতরাং এখানেও যদি সক্রিয়তার খাতিরে সঙ্গতিকে খর্ব্ব করতে হয়, তবে উপন্যাসের আবশ্যকতা নেই। অবশ্য এই আপত্তির জবাবে ফক্‌নার বলতে পারেন যে এমনি পঙ্ককুণ্ডে তাঁর গল্পগুলির জন্ম যে সে-বিষয়ে স্পষ্টভাষণ অত্যাধুনিক সমাজেও অচল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, "স্যাংটুয়ারি" উপন্যাসটির নাম করা যেতে পারে। তার পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে, ভব্যতা তো দূরের কথা, সভ্যতার সম্পর্কও এত শিথিল যে তাদের কার্য্যাবলীর সোজা বর্ণনা একেবারেই অসম্ভব। এবং এই চরিত্রগুলির সম্বন্ধে যে-কথা খাটে, ফক্‌নার-এর অন্যান্য কুশীলবদের প্রসঙ্গেও তা প্রযোজ্য।

ফক্‌নার-এর দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে এই বিকার-নিষ্ঠা। যত দূর মনে পড়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসে সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা প্রায় শূন্য। তাঁর গ্রন্থাবলী তন্নতন্ন করে খুঁজলে এমন দু-একজন মানুষ হয়তো পাওয়া যায়, যারা নিঃস্বার্থ আদর্শের সঙ্গে একেবারে

অপরিচিত নয়; কিন্তু তারাও সাধারণ স্তরের নিচে, তাদের মধ্যেও অধিকাংশই হয় পাগল, নয় অসুস্থ, সকলেই অক্ষম ও উৎকেন্দ্রিক। অবশ্য এ অভিযোগেরও উত্তর আছে, এবং ফক্‌নার অনায়াসেই বলতে পারেন যে ঔপন্যাসিকমাত্রেই যখন সাধারণকে ছেড়ে বিশেষকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন তিনি যদি পাহাড়ে না-চড়ে খাতেই ঘুরে বেড়ান, তবে তাঁর জীবনবেদের প্রতি কটাক্ষ করা অনুচিত। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উর্দ্ধগমন আর অধোগমনের মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ নেই; দুটোই সমভূমির থেকে সমান দূরে। কাজেই উপরে উঠেও যদি বস্তুজগতের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়, তবে নিচে নেমেও তার আকর্ষণ অটুট থাকবে। তা ছাড়া আধুনিক মনস্তত্ত্ব অপ্রাকৃতকে আমল দেয়না; বিশেষজ্ঞদের মতে মনের ধর্ম্মই হচ্ছে বিকৃতি। সুতরাং যখন ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃতিস্থ বলা হয়, তখন সে-প্রশংসা তার অন্তঃপ্রকৃতির প্রাপ্য নয়, তার বহিঃপ্রকৃতিই অনিন্দ্য। অর্থাৎ তখন এইটেই বক্তব্য যে মানসিক বিশৃঙ্খলায় সে সর্ব্বসাধারণের সমকক্ষ হলেও, তার পারিপার্শ্বিক শৃঙ্খলা এমনি সুপ্রতিষ্ঠ যে আভ্যন্তরিক অশান্তি সেই শাসনে অবদমিত হয়ে যাচ্ছে।

ফক্‌নার-এর নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণ যে-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে থাকেন, সেখানে সমাজবন্ধন প্রায় অবিদ্যমান। মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাপথে স্থৈর্য্যের চলাচল নেই। নবভূভাগে সিতাসিতের সংঘর্ষ বোধহয় ওই অঞ্চলেই প্রথম বাধে; দক্ষিণীদের চাষবাসের জন্যেই দাসপ্রথার প্রচলন হয়; ভ্রাতৃবিরোধ এমেরিকার ওই দিকটাকেই কুরুক্ষেত্রের পর্য্যায়ভুক্ত করে; এবং ওইটাই লিঞ্চিঙের জন্মভূমি। মার্কিনী প্রগতির জয়ধ্বজা উত্তরাভিমুখী; সে-দেশের নাগরিক সভ্যতা উত্তরেরই দান; এমেরিকার আদর্শপ্রাণ মহামানবগণ প্রায় সকলেই উত্তরে উৎপন্ন। দক্ষিণ কৃষিপ্রধান, অলস, রক্ষণশীল। এদিককার হালচাল জমিদারি ধরণের; এরা শক্তি চায় কিন্তু শক্তি অর্জ্জন করতে জানে না, শাসনে বিশ্বাস করে কিন্তু রাষ্ট্রে আস্থা রাখেনা, স্নেহের অর্থ বোঝে কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠার ধার ধারে না। কাজেই এখনকার মানুষ সঞ্চয়ের চেয়ে অপচয়েই বেশি সিদ্ধহস্ত, সদাচারের চেয়ে অনাচারেই অধিক পটু, জীবনের চেয়ে মরণের দিকেই তাদের টান নিবিড়তর। এ-অবস্থায় উত্তরের কাছে তাদের পদে পদে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এবং এই রকম পরাজয়ের মানেই হচ্ছে গ্রাম উচ্ছেদ করে সহর গড়া, শস্য তুলে ফেলে ফ্যাক্‌টারি বসানো, পরিজনের বদলে পরজীবীদের পোষা। কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রতিযোগিতায় বাহির চিরদিন অন্তরকে হটিয়ে এসেছে; কাজেই প্রাগ্রসর উত্তর আমন্থর দক্ষিণকে স্থিতি দিতে পারে না, কেবল করে তার জীবযাত্রার উন্মূলন। ফলে বিকৃতি সেখানে প্রকৃতির নামে চলে, অত্যাচার সেখানে হয় লোকাচারের অন্তর্গত; সমাজ সেখানে সংঘের কাছে হার মানে; এবং সেই প্রতিবেশে যে সংবেদনশীল লেখকের জন্ম হয়, তার চক্ষে অনিষ্টই হয়ে ওঠে মানবজীবনের একমাত্র সত্য, একমাত্র সত্তা।

অবশ্য অনিষ্ট কেবল দক্ষিণেরই নিজস্ব সম্পত্তি নয়, উত্তরেও তার যথেষ্ট প্রকোপ এবং সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মনুষ্যজীবনের অনেকখানিকেই ওই শব্দের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়। অতএব এই দিকে ফক্‌নার-এর অতিচেতনাকে দোষ না-বলে, গুণ বলাই হয়তো শ্রেয়, এই অনিষ্টজ্ঞানই বোধহয় ফকনার্-এর স্থান-কালানুগত সাহিত্যসৃষ্টিকে একটা সার্ব্বভৌমিকতা দান করেছে, তাঁর অতিবিশেষ চরিত্রগুলিকে তুলে ধরেছে

আদর্শের নৈর্ব্যক্তিক লোকে। কিন্তু তাহলেও অনিষ্টের সঙ্গে অনিষ্টের সংঘর্ষে যে-ট্রাজেডি উদ্ভূত হয়, তার ব্যাপ্তি ও হৃদয়স্পর্শিতা আমার বিবেচনায় অল্প। তা দেখে দর্শকের চিত্ত তেমনতর শুদ্ধ হয় না, যেমন হয় ইষ্টের সঙ্গে ইষ্টের সংঘাতে। কারণ ট্রাজেডির মূলমন্ত্র ততটা দুঃখ নয়, যতটা করুণা, এবং করুণা ইষ্ট সম্বন্ধে যত সহজে জাগে, অনিষ্টের সম্পর্কে তত অনায়াসে আসেনা। সুতরাং অনিষ্টের অনুধাবন করে সাহিত্যস্রষ্টা হয়তো স্বভাবতই নিরাসক্ত থাকতে পারে, কিন্তু অনুকম্পা, যার ব্যতিরেকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি একেবারেই অসাধ্য, তার সংস্পর্শও তাকে স্বতই এড়িয়ে যায়। এইজন্যেই বোধহয় অনেক কোমলহৃদয় পাঠক ফক্‌নার-এর লেখায় একটা অমানুষিকতার পরিচয় পেয়েছেন, একটা দাক্ষিণ্যের অভাব লক্ষ্য করেছেন, বলেছেন যে 'দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফিউরি', অথবা 'স্যাংটুয়ারি'-র উপমেয় কোনো রসসাহিত্য নয়, তাদের সঙ্গে কেবল চিকিৎসাশাস্ত্রেরই তুলনা চলে।

কিন্তু ওই বই দুখানি যে নিরাসক্তি-সাধনের পদ্ধতি মাত্র, ফক্‌নার-এর চিত্তবৃত্তির আসল পরিচয় নয়, তার আভাস পাওয়া গিয়েছিলো 'সার্টোরিস্' উপাখ্যানে। এই আধ্‌পাগলা পরিবারের ইতিহাস লিখে তিনি দেখিয়েছিলেন যে কারণকর্দমে তাঁর যেমন অবাধগতি, স্বপ্নের নির্ব্বাত লোকেও তেমনি; প্রয়োজনের তাগিদে তিনি যেমন সাংবাদিক হতে পারেন, তেমনি আবশ্যকমতো গীতিকবিতাও তাঁর আয়ত্তে। বলাই বাহুল্য যে এখানেও, ফক্‌নার-এর সাধু চরিত্রগুলির যা বিশিষ্ট লক্ষণ, অর্থাৎ ব্যর্থতা, তা ভূরি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। তবু এটাও স্পষ্ট যে লেখক এখন আর কেবল অনিষ্টকেই জগতের একমাত্র উপাদান ব'লে বিবেচনা করেন না, তিনি জানেন যে বিশ্বব্যাপারে ইষ্টের মাত্রাও বেশ গণ্য। তাই সার্টোরিস্-এর পাত্রপাত্রীদের মধ্যে ভালোমন্দ দুয়েরই সন্ধান পাই; অবশেষে মন্দেরই জয় হয় বটে, কিন্তু ভালোর মামলাও যে আপীলে জিত হতে পারে, এমন ইঙ্গিত, মনে হয় যেন, লেখকের অনভিপ্রেত নয়।

এই বইখানি পড়ার পরে আমার মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলোনা যে ফক্‌নার সিদ্ধির দিক দিয়ে খুব বড় ঔপন্যাসিক না-হলেও, অন্তত সম্ভাবনার বিচারে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তাঁর প্রত্যেক বইয়েই দেখেছিলুম যে দু-এক কথায় একটা জীবন্ত চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর সমকক্ষ আধুনিক সাহিত্যে কমই আছে। অবশ্য কথোপকথন রচনায় তাঁকে হেমিংওয়ের সঙ্গে একাসনে বসাতে পারিনি, কিন্তু এ-বিদ্যাতেও তিনি এণ্ডার্স্‌ন, ডস্ পাসজ্ ইত্যাদি অধুনাতনী মহারথীদের যে বহু পশ্চাতে ছেড়ে গেছেন, তাও অল্পেই বুঝেছিলুম। তাঁর দোষগুলোর কথা পূর্ব্বেই বলেছি; এবং এগুলো আমাকে সুরু থেকেই পীড়া দিয়ে এসেছে। কিন্তু তাহলেও 'সার্টোরিস্'-এ তাঁর মনের যে-গাম্ভীর্য্যের পরিচয় পেয়েছিলুম, তাঁর চোখে যে-জাগতিক নিরীক্ষার চমক দেখেছিলুম, তার পরে তাঁর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আমার আর কোনো দ্বিধা ছিলো না; বুঝেছিলুম যে আজ না-হোক, কাল না-হোক, পাঁচ, সাত, দশ বৎসর বাদেও, তিনি একখানা স্মরণীয় উপন্যাস লিখবেনই লিখবেন। আমার এই প্রত্যাশা অচিরেই পূর্ণ হয়েছে এবং পূর্ণ হয়েছে অপ্রত্যাশিত রকমের বাহুল্যসহকারে। জানতুম অতখানি সাধনা কখনোই বিনাপুরস্কারে যাবে না, এবং তাঁর জয়যাত্রার দিনে করতালি দেবার জন্যে আমার হাত তৈরিই ছিলো; কিন্তু একথা কিছুতেই ভাবতে পারিনি যে একজন অল্পবয়সী মার্কিনী লেখক এত শীঘ্রই এমন একখানা উপন্যাস লিখবে

যার তুলনা খুঁজতে যেতে হবে প্রাচীন গ্রীসের নাট্যজগতে। অসংখ্য দোষ সত্ত্বেও ফক্‌নার-এর শেষ উপন্যাস "লাইট্ ইন্ অগাষ্ট্" ঈডিপাস-জাতীয় পুস্তক। তার অবয়বে ভেদ্যস্থান নিশ্চয়ই অনেক আছে, হয়তো শতাব্দী গুণে তার আয়ুর বিচার কোনোদিনই করতে হবে না, তবু সে যে অমৃতের পুত্র, তা অন্তত আমার কাছে তর্কাতীত।

কথাগুলোর মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে কিনা বলতে পারি না, শুধু এইটুকু জানি যে বইখানা প্রথমে পড়েছিলুম প্রায় আটমাস আগে, এবং এখনো তার প্রভাব আমার উপরে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান আছে। এই গুণ যে আধুনিক রচনাবলীর মধ্যে কত বিরল তা অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন। কিন্তু তাহলেও 'লাইট্ ইন্ অগাষ্ট'-এর আখ্যানসার সংগ্রহ করা আমার সাহসে কুলোচ্ছে না। তাছাড়া বইখানি অত্যুচ্চ শ্রেণীর, অর্থাৎ এতে গল্পটি যে-উপায়ে বা যত কটি কথায় বলা হয়েছে, তার রূপান্তর বা সংক্ষেপ একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তাই বলেই "লাইট্ ইন্ অগাষ্ট্' নির্দ্দোষ, এমন ভাবলে অন্যায় হবে। আখ্যানভাগের আপাত অসঙ্গতি, প্রত্যক্ষতার অভাব, বিষমতার প্রতি পক্ষপাত, উপকরণের অপচয়, এমনকি ব্যাকরণত্রুটি প্রভৃতি যত দোষ ফক্‌নার-এর লেখায় ইতিপূর্ব্বে দেখা গেছে, তার প্রত্যেকটিই অল্পবিস্তরভাবে এ-গ্রন্থেও উপস্থিত। কিন্তু সে-সমস্তকে অতিক্রম করে যে-লক্ষণ এই পুস্তকের প্রতি পাতায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, আমার কাছে সেইটেই হচ্ছে রসসাহিত্যের সনাতন সম্পদ। তরুণ লেখকদের মধ্যে ফক্‌নারই এইখানে প্রথম দেখিয়েছেন যে তাঁর অনুকম্পা বিশ্বব্যাপী, সে-করুণা থেকে পায়ে-চলা পথের ধূলিকণা পর্য্যন্ত বঞ্চিত নয়। সেইজন্যেই এই নীচতা ও নৃশংসতার কাহিনী পড়ে মনে মালিন্য আসে না, আসে প্রসাদ। সেইজন্যেই এই বিকৃতচেতাদের পরিচয় পেয়ে অন্তর কলুষিত হয় না, জাগে চিত্তশুদ্ধি। সেইজন্যেই নায়ক ক্রিস্‌মাস্ নিজের বিসদৃশ বিকটতা শেষ পর্য্যন্ত বজায় রেখেও হয়ে ওঠে বিশ্বমানবের প্রতিভূ। এতখানি সার্ব্বজনীনতা যে-পুস্তকের আছে, তার মধ্যে যদি সহস্র দোষও থাকে, তবু তাকে মহৎ আখ্যা দিতে কার্পণ্য করা, আমার মতে, ভীরুতা।

ফক্‌নরা-এর শেষ বই তেরোটি গল্পের সমষ্টি। এগুলির সম্বন্ধে আলাদা করে কিছুই বলার নেই, উপরের দোষগুণগুলির সবই এখানে মজুৎ। তবে কোনো গল্পই উৎকর্ষে 'লাইট্ ইন্ অগাষ্ট্'-এর সমতুল্য নয়। তার কারণ বোধহয় এই যে ফক্‌নার-এর প্রতিভা ছোটগল্পের নাতিপরিসরে তেমন করে খেলেনা। তাছাড়া এগুলি 'লাইট্ ইন্ অগাষ্ট'-এর আগে লেখা বলেই আমার বিশ্বাস। তবু বইখানি সাহিত্যা-মোদীমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য, বিশেষ করে তাঁদের যাঁদের কাছে ফক্‌নার এখনো অজ্ঞাত। তাঁরা এই গল্পগুলিতে তাঁর পরিচয় পেয়ে নিশ্চয়ই খুসি হবেন; কারণ এগুলির মধ্যে পদ্ধতির যত প্রকারভেদ আছে, তা সত্যই রোমাঞ্চকর।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বিজয়িনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মূল্য ১।০ —প্রকাশক, পপুলার এজেন্সী, ১৬৩ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজয়িনী শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নবতম গ্রন্থ অথবা নবতম রচনাবলীর অন্যতম। শৈলজানন্দ সম্প্রতি অনেকগুলি উপন্যাস বা বড় গল্প রচনা করিয়াছেন অথবা পূর্ব্ব রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সেইগুলি পাঠে মনে হয় তাহাদের রচনাকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নহে এবং বহু প্রসূতির সন্তানের মত অস্পষ্টতার নিদর্শন তাহাদের মধ্যে স্পষ্ট। এই প্রভূত প্রসবের মধ্যে গ্রন্থকারের আত্মশ্লাঘাই যে প্রবল, একথা আমাদের মনে হয় না, নিজের শক্তি-সম্বন্ধে অন্ধভক্তির স্থান তাহাতে নাই। এ বহু প্রসবের কারণ অন্য, কিন্তু কারণ যাহাই হউক ত্রুটীগুলি চোখে ঠেকিতেছে। রচনাগুলির মধ্যে গল্প পাইতেছি নিঃসন্দেহ, পাইতেছি না শিল্পীকে—আমাদের পরিচিত শৈলজানন্দকে। তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন অথবা এ আত্মবিলোপ।

বিজয়িনী বৈষ্ণবীকন্যা সুনন্দাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত বড় গল্প। উপন্যাসের মাল-মসলা ইহাতে নাই—সংগ্রহের প্রয়াস নাই। কে যেন গল্প শুনিতে চায় অতএব রচিত হইল গল্প। নায়ক হইল ধনী-গৃহের অনাদৃত পৌত্র স্নেহ-বুভুক্ষু সরল সুন্দর কিশোর—আর নায়িকা আগন্তুকা বয়ঃসন্ধিগতা বৈষ্ণবী। "হরিণের মত টানা টানা দু'টি চোখ—হাতের আঙুলগুলি ঠিক যেন চাঁপার কলির মত"—ফলে প্রেম, বাধা সমাজ। অতএব নায়িকার পরম ও চরম স্বার্থত্যাগ। ভঙ্গী তাহার প্রচুর ভাবে নাটকীয়—অবশ্য নাট্যভঙ্গী বিবর্জ্জিত এ ত্যাগ শ্রোতাকে কখনই মুগ্ধ করিত না তা স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে।

গ্রন্থকার গল্প বলিয়াছেন—ঘটনা-সংস্থানের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন যত বেশি—চরিত্র-গঠনের দিকে অমনোযোগ দিয়াছেন সেই পরিমাণ। তাহারা সেই কারণে গল্পের পাত্র-পাত্রী রহিয়া গেল, মানুষ হইয়া উঠিবার মত যত্ন বা অবকাশ পাইল না।

যে শ্রোতা বা শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে এ গল্প—সে বা তাহারা হয়ত তৃপ্ত। সহজ সাবলীল ভাষায় রচিত কাহিনীটি হয়ত অনেককেই এমনি আনন্দ দিবে। আমাদের অতৃপ্তিটুকু কিন্তু না জানাইয়া পারিলাম না।

বিজয়িনীর ছাপা ভালো, কাগজ সুন্দর এবং বাঁধানো স্থায়ী ও রুচিসঙ্গত।

শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, ১৩৯-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রামকুমার মেশিন প্রেস, ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪১

পরিচয়

রিয়ালিস্‌ট্‌

কল্যাণীয়েষু,

তোমার দুখানি বই পেয়েছি, তার একখানি অর্থাৎ "রিয়ালিস্‌ট"— কাল সায়াহ্নে বৈদ্যুতদীপালোকে পড়া শেষ করলুম ঃ—প্রথমেই পত্রের ভূমিকায় একটা কথা জানিয়ে রাখি। আজকাল কিছুদিন থেকে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছি—সেটা বয়সের ধর্ম্ম। কিছুকাল পূর্ব্বেই আমার যে মন ছিল সমুদ্রচর অষ্টপাদ জীবের মত, যে জীব তার কর্ষণীগুলো দিয়ে আলোচ্য বিষয়গুলোকে আঁকড়ে ধরে তার থেকে খাদ্য শোষণ করে নিত, তার মানসিক মাংসপেশী আজ ঢিলে হয়ে পড়েছে, সেইজন্যে সে আজ এলোমেলো চরে বেড়ায়, কিছুই ধরে বেড়ায় না। তাই হতাশ হয়ে আজকাল ছবি এঁকে কথঞ্চিৎ আত্মসম্মান রক্ষা করতে চেষ্টা করে। (আমি যে জাতের ছবি আঁকি তাতে মনোনিবেশ ব'লে কোনো বালাই নেই, মাংসাশী মন লক্ষ্য সন্ধান ক'রে শীকার করে, উদ্ভিজ্জাশী মন এদিকে ওদিকে যা পায় যেমন তেমন করে খাবলে বেড়ায়। আমার ছবির লক্ষ্য নেই, যেমন তেমন করে আঙুল চালাই, যাহোক একটা কিছু হয়ে ওঠে। বুদ্ধির চতুরাশ্রমের মধ্যে এইটেকেই বানপ্রস্থ বলা চলে—এতে সঞ্চয়ের লোভ নেই, কর্ম্মের প্রয়াস নেই; যদৃচ্ছাক্রমে নিষ্কৃতির পথে চলা।)

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার লেখা মাংসাশী মনের পথ্য—নখদন্তের জোর চাই, ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করতে না পারলে গলাধঃকরণের উপায় নেই। তাই বোধ হয় চর্ব্ব্যপদার্থকে লেহ্যরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছি। তাতে স্বাদ পাওয়া যায় না তা বলতে পারিনে কিন্তু বাদ পড়ে অনেকখানি।

তোমার বইখানি সম্বন্ধে প্রথম নালিশ এই, পাতা কেটে পড়তে হয়েছিল, সংসারে আকাটা পাতার বই হচ্ছে নববধূ, নানা দাগ পড়া খোলা পাতা পুরাতনীর, অথচ তোমার গ্রন্থের বিষয়গুলিতে খোলাখুলিভাবের অট্টহাস্য, বয়ঃপ্রাপ্ত চিত্তের সঙ্গে তার বোঝাপড়া। কিন্তু অত্যন্ত পেকে উঠেছে যে বয়ঃপ্রাপ্ত চিত্ত সে কি গল্প শুন্‌তে চায় ? তার সমস্ত ঝোঁক সন্ধান করবার দিকে—প্রকৃতি যা সাবধানে লুকিয়ে বেড়ায় তাকে টেনে বের করতে পারলে সে ভারি খুসি ; সহজ-বিশ্বাসী নাবালকদের পরে তার দয়ামায়া নেই। নাবালকেরা ধূলোবালি প্রভৃতি যা তা নিয়ে সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তারা বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তার নবীন শিক্ষানবীশ। তাতে এমন কিছু ভঙ্গী থাকে যাতে কল্পনার দৃষ্টিতে কোনো একটা রূপের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিতে পারে রূপমাত্রই ছলনা, আমাদের তত্ত্বশাস্ত্রেও বলে সৃষ্টিমাত্রই মায়া। গল্পও সৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টির মতোই সেও ছলনা। কিন্তু ভালোবেসেছি এই চিরকালের ছলাকলা,—তাই রাজার মতো আরামে বসে আমরা জাদুকরকে ডাক দিয়ে পাঠাই, ফরমাস করি ইন্দ্রজালের, বলি এমন কিছু ক'রে তোলো ঠিক মনে হবে যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি ; রূপ দেখে মজ্‌তে চাই। কেননা সংসারে চারদিকে এমন সব ব্যাপারের মধ্যে আছি ব্যবহারের ঘর্ষণে যার স্থূলবস্তু বেরিয়ে পড়েছে, যার মায়া-আবরণের লাবণ্য মুছে গেছে, কালী পড়ে দাগী হয়েছে, যা মনকে ভোলায় না। কেননা বস্তু মনকে ঘা দেয় উঁচট্ খাওয়ায়, রূপ মনকে ভোলায়। অতএব জাদুকর, ভোলাও আহত মনকে, ক্লান্তকে আরাম দাও।

সাবালক বলেন নিজেকে অমন করে ভোলানো ভালো নয়, ওতে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। রূপলুব্ধ বলে সংসারক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ঘেঁষাঘেঁষি নিয়তই হয়ে থাকে, সেখানে পালোয়ানির চর্চ্চার বিশ্রাম নেই। তাতে করে মানুষকে ভুলিয়ে দেয় এই বাঁওকষাকষি, এই ঘাড় ভাঙাভাঙি। ধূলোয় কাদায় উলট্ পালট্ খাওয়াই বিশ্বব্যাপারের পরম সত্য নয়। এটাই বস্তুত ঠকানো। অর্থাৎ চরম নয় উপকরণগুলো, চরম হচ্ছে অমৃত, রূপের সৌন্দর্য্য। মৈত্রেয়ী বলেছিলেন "উপকরণবতাং জীবিতং" তিনি চান না, তিনি চান "অমৃতম্"।

কত হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ আপন সভ্যতার মধ্যে আপন রূপসৃষ্টির উদ্ভাবন করতে চেয়েছে। কেবলি বাইরের এবং অন্তরের সাজ বানিয়েছে। সে চায় আপনাকে শোভন দেখতে, নইলে তার লজ্জা হয়, নইলে তার চারিদিকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। ভদ্র তাকে হতেই হবে, ভদ্র হওয়ার মানে এমন নয়, তার স্বভাবের উপাদানগুলোকে বাইরে মেলে দিতে হবে। হয় সেগুলোকে ভিতর থেকেই কোনো একটি উৎকর্ষের আদর্শে পরিণত করে তুল্‌তে হবে, নয় বাইরের আবরণে তার রূঢ়তাকে ঢেকে রাখতে হবে। সেই ঢাকা দেওয়া পরস্পরকে সম্মান করা, নগ্নতা অসম্মান। এমনি করে কতক সাধনার দ্বারা কতক আবরণের দ্বারা সভ্যতা আপন রূপকে পরিদৃশ্যমান করে তোলে। সভ্যতা সম্মিলিত মানবচিত্তের সৃষ্টি, এ সৃষ্টি বিজ্ঞানের দ্বারা নয়, জাদুর দ্বারা, যে জাদু রং ফলায়, রস জমায়, সুর লাগিয়ে দেয়। বিজ্ঞান-প্রবীণ একে ছেলেমানুষি বল্‌তে পারে কিন্তু এই ছেলেমানুষিই সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্ত্তা বৈজ্ঞানিক হলে বিশ্ব বীভৎস ভাবে অনাবৃত থাকত, তাহলে বৈজ্ঞানিককে ছুরি চালিয়ে নাড়িনক্ষত্র সন্ধান করতে হোতো না। বাস্তব সংসারে ঘাত সংঘাত চল্‌ছে, সেখানে রূপ সম্পূর্ণ জমে উঠ্‌তে পারছে না—এইজন্যেই মানুষ আদিকাল থেকে কেবলি বলে আস্‌ছে গল্প বলো। অবাস্তবের মহাকাশেই সত্যকে সে দেখ্‌তে চায়। বীণাযন্ত্রের তার যেমনতেমনভাবে আলগা হয়েই থাকে, সেই তার বেসুরো, মানুষ বলে না সেই তারে ঝঙ্কার লাগাও, যেহেতু আমি বাস্তবের আওয়াজ শুন্‌ব, সে বলে সাধাসুরের তারে আমি গান শুন্‌তে চাই, সংসারে সেই সুর সর্ব্বত্র শুন্‌তে পাইনে বলেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকি। মানুষ এতকাল বলে এসেছে সাধাসুরের বীণাযন্ত্রে গল্প জমাও। আজ বল্‌ছে সাধা সুর বানানো সুর—ওতে সাহিত্যের এরিস্‌টোক্রেসি। তাকে মান্‌ব না, আমি চাই যদৃচ্ছাকৃত তারের ঝঙ্কার ক্রেঙ্কার হুঙ্কার—অর্থাৎ গান চাইনে, শব্দ চাই—শব্দ ডিমক্রেসি। শব্দ নির্ম্মম বাস্তবতা, শব্দ চিৎকর্ষের আদর্শে ভোলায় না।

মানবসংসারে ভোলাবারই একটা বিভাগ আছে, যাচাই বাছাইয়ের বিভাগ, মানুষের প্রকৃতিকে অতিপ্রাকৃতে নিয়ে যাবার জন্যে যুগে যুগে তার নিরন্তর আকর্ষণ, কেবলি সে সুর বাঁধছে, রসসাহিত্য সেই বিভাগেই তো

পড়ে। যত কিছু রিট্রেঞ্চ্‌মেণ্ট্‌ সে কি আজ সেই বিভাগের উপর দিয়েই যাবে? আজ রব উঠেছে আমি স্পষ্ট কথা কব—অনেক দিন থেকে মানুষ বলেছে স্পষ্ট কথা বোলো না ঠিক কথা বলো। ঠিক কথা কাকে বলে? কাঁসরে লাঠি লাগ্‌লে সে অত্যন্ত স্পষ্টকথা কয়, তাতে বধির দেবতা ছাড়া পাড়াসুদ্ধ অন্য সকলের কান ঝালাফালা হয়ে ওঠে। জাপানী দেবমন্দিরে ঘণ্টার ধ্বনি শুনেছি, তাকে বলি ঠিক সুরের ধ্বনি,—এই ঠিক সুর অনেক যত্নে তৈরি ঘণ্টায় তবে ঠিকটি বাজে। মানুষ আপন সৃষ্টির আদর্শকে অনেক যত্নে খাঁটি করে তুলবে এই ছিল কথা—সে চেয়েছিল নিজের মূল্য কমাবে না, নিজেকে অনাদর করবে না। আজ সাহিত্য কি তার কানে কানে এই কথা বলবারই ভার নিয়েছে যে, আসলে তুমি আদরণীয় নও, যথার্থই তুমি অশ্রদ্ধেয়, অতএব ভড়ং কোরোনা। তুমি কত নোঙরা তা দেখিয়ে দিচ্ছি—নোংরা তোমার নাড়িভুঁড়ি রসরক্ত, নোংরা তোমার মগজ, তোমার হৃৎপিণ্ড, তোমার পাকযন্ত্র, তোমার চেহারাটা উপরের খোলসমাত্র, সেই চেহারার বড়াই কোরো না—যারা ছবি আঁকে তারা মিথ্যেবাদী, যারা মূর্ত্তি গড়ে তারা খোষামুদে। অতএব গল্প বলব না, জোগাব মনস্তত্ত্বের তথ্যতালিকা।

একথা বলা বাহুল্য মানুষ নিছক জন্তু নয় এই কারণেই মানুষের স্বভাবে প্রাকৃতের মধ্যেই অতিপ্রাকৃত আপনাকে উদ্ভাবিত করছে—মানব-স্বভাবের এই দ্বন্দ্ব সাহিত্যে প্রকাশ না পেলে সে সাহিত্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না এবং তাতে তার যথার্থ উপভোগ্যতা কমে। ছেলেভোলানো সাহিত্য তাকেই বলে যাতে সমস্ত কাঁটা ফেলে পাতে মাছ দেওয়া হয়—কিন্তু শুধুমাত্র কাঁটার চচ্চড়ি রাঁধাকেই যারা ওস্তাদি বলে ক্রূর হাস্য করে মাসিক পত্রদ্বারা তাদের কৃত নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জ্জনা করতে পারব না। সাহিত্য সাবালকের সাহিত্যই হোক্, কাঁটার ভয় করব না যদি তাতে পূরো মাছটাকেই পাওয়া যায়।

গল্পের ছল করে তুমি যেকথা বল্‌তে চেয়েছ ব্যাখ্যান করে আমি সেই কথাই বল্‌বার চেষ্টা করেছি। তোমার বইয়ের যে নাম দিয়েছ রিয়ালিস্‌ট্‌ তার মধ্যে বিদ্রূপের অট্টহাস্য রয়েছে। নিছক রিয়ালিজ্‌ম্‌ যে কত অদ্ভুত ও অসঙ্গত তা তোমার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছ। মানুষ দুর্ব্বৃত্ত হতে

পারে স্বভাবতই, কিন্তু মানুষ রিয়ালিস্ট্ হবার জন্যে কোমর বাঁধ্‌লে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই। অর্থাৎ সেও হয় unreal, তুমি তোমার গল্পে বারবার দেখিয়েছ আদর্শবোধে রিয়ালিজ্‌মের যারা চর্চ্চা করে তারা একটা ভঙ্গীর সাধনা করে মাত্র। তারা নিজেও ভুল্‌তে পারে না তারা রিয়ালিস্ট্ অন্যকেও ভুল্‌তে দিতে চায়না ;—তারা রিয়ালিজ্‌মের পুতুলবাজি করে। এই সঙ্গে এই কথা বলাও চলে, আদর্শবাদেরও পুতুলবাজি আছে—সেইটেই যাদের একমাত্র ব্যবসা তারা ভুলে যায় মানুষ চিরকেলে অপোগণ্ড নয়, বাস্তবের পাথরবাটিতেই সত্যের পরিবেষণ সঙ্গত—ফীডিং বট্‌ল্‌টা লজ্জাজনক।

কাল রাত সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত তোমার বইখানি পড়েছি। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে "বাঁশরী" নামক আমার নূতন লিখিত নাটকের ভিতরে ভিতরেও অবাস্তব রিয়ালিজ্‌মের প্রতি এই রকমেরই একটা হাসির আমেজ আছে। তোমার লেখনীর প্রতি আমার একমাত্র অভিযোগ এই যে, দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় যারা আরামে অনায়াসে গল্প করতে চায় তাদের প্রতি ওর কোনো মমতা নেই। *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* পত্রখানি শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

"সমর ও শান্তি"

দুটি কথায় জীবন হচ্ছে সংগ্রাম ও বিশ্রাম।

ভারতীয়রাও এমনিতর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। কিন্তু ইউরোপীরা বলতে পারেন জীবনের প্রতি অবস্থায় ত দুঃখ সুখ জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পারম্পর্য্য কোথায়। পরম্পরা যদি থাকে তবে তা সংগ্রামের ও বিশ্রামের। সংগ্রামে যে কেবলই দুঃখ তা নয়, আর বিশ্রাম যে অবিমিশ্র সুখের তাও নয়। সুখদুঃখ-নিরপেক্ষভাবে সংগ্রাম হচ্ছে সংগ্রাম এবং বিশ্রাম হচ্ছে বিশ্রাম। এবং দুই মিলিয়ে জীবন। জীবন যদি হয় পদ্য তবে 'সংগ্রাম' ও 'বিশ্রাম' বোধ হয় 'দুঃখ' ও 'সুখ' অপেক্ষা গাঢ়তর মিল।

ইউরোপের ইতিহাস—ইউরোপনির্দ্দিষ্ট অর্থে মানবের ইতিহাস—মাত্র দুটি শব্দের উলটপালট খেলা। সমর ও শান্তি। কখনো রাজাতে রাজাতে, কখনো রাজাতে প্রজাতে, কখনো বা নেশনে নেশনে সমর যেন একটার পর একটা ঢেউয়ের ভেঙ্গে পড়া। আর শান্তি যেন সেই ঢেউয়ের পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া। ফিরে গিয়ে ফের ঝাঁপিয়ে পড়বে, দেবে আর এক ছোবল। এ খেলা ফুরায় না, ফুরাবার নয়।

টলষ্টয় প্রণীত "সমর ও শান্তি" নেপোলিয়নীয় যুগের ইতিহাস। ইতিহাসের আক্ষরিক অর্থে নয়। তাই উপন্যাস-পর্য্যায়ভুক্ত। অথচ সাধারণ উপন্যাসের মত এক জোড়া নায়কনায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক বল নায়িকা বল সে হচ্ছে স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণমনসম্মান। অথবা দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে ইতিহাসের ভগ্নাংশ এবং বিষয় এর দেশকালরঞ্জিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্রপাত্রী হচ্ছে মানবকরতলরেখা।

১৮০৫ সালে রুশ সৈন্যরা অষ্ট্রিয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আউষ্টারলিৎসের রণক্ষেত্রে। হেরে যায়,

কিন্তু 'হেরে গেছি' এই ভ্রান্তিবশত। প্রকৃতপক্ষে তাদের হারবার কথা ছিল না। ১৮০৭ সালে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎকার ঘটে, বন্ধুতা হয়। ১৮২২ সালে সেই মৈত্রী পর্য্যবসিত হল শত্রুতায়। নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজো দেখেন যে প্রতিরোধ করলে নিশ্চিত পরাভব। নেপোলিয়নের সৈন্যরা অবাধে মস্কৌ প্রবেশ করল, কিন্তু মস্কৌ জনশূন্য। একটিও রাশিয়ান তাদের সহযোগিতা করতে চাইল না। কেউ জানে না কে লাগিয়ে দিল সহরে আগুন। এরা বলে ওরা লাগিয়েছে। ওরা বলে এরা লাগিয়েছে। লুটপাট করে ফরাসীরা স্থির করল ফেরা যাক। কিন্তু যে বাঘ খাঁচায় ঢুকে পেট ভরিয়েছে ছাগ মাংসে তারই মত দশা হল বাবাজিদের। যতটা পথ এসেছিলেন ঠিক ততটা পথ ফেরার মুখে বহু গুণ বোধ হল। কুটুজো ইচ্ছা করলে রাস্তায় হানা দিয়ে তাদের কেটে ফেলতেন। কিন্তু অনাবশ্যক রক্তপাতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না, তারা যখন স্বেচ্ছায় রাশিয়া ত্যাগই করছে। তাঁর কোনো কোনো সৈন্য কসাকদের দলপতি হয়ে চোরের উপর বাটপাড়ি করল। এইসব গেরিলা যুদ্ধে ও শীতে বরফে খাদ্যের অভাবে নেপোলিয়নের গ্রাঁদ আর্মে কাহিল হয়ে পড়ল, সৈন্যদের অল্পই বাঁচল। তাও হল পথি বিবর্জিত। নেপোলিয়ন চুপি চুপি দিলেন মস্ত এক লম্বা। বীর হনুমান।

এই হল কাঠামো। সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্রপাত্রীদের দিয়ে বড় বড় কাজ করাতেন। নতুবা যারা বড় বড় কাজ করেছে বলে ইতিহাসে লেখে তাদেরকেই করতেন পাত্রপাত্রী। জাতীয় গৌরবের রঙ্গে সমস্তটা হত অতিরঞ্জিত। সাধারণ ঐতিহাসিক হলে ঘটনার পশ্চাতে দেখতেন মানুষের ইচ্ছা, মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। সেনাপতিদের চাল দেওয়া, সৈনিকদের বোড়ের মত চলা, অধিককৌশলীর জয়লাভ। পরাভূত পক্ষের ঐতিহাসিক ধরতেন উঠানের দোষ—নেপোলিয়নের সর্দ্দিকে করতেন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঘটনাচক্রে কুটুজো মস্কৌ রক্ষা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সাব্যস্ত করলেন তাঁর পরামর্শ-পরিষদের সম্পূর্ণ অমতে। আর রোস্টোপশিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শহরের লোক

যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, নেপোলিয়ন থাকতে সেখানে ফিরল না। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে টলষ্টয় বলতেন এ কি আমরা না ভেবেচিন্তে করেছি, আমরা অনেকদিন থেকে মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছিলুম যে নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে দেশের ভিতরের দিকে টেনে আনব ও মস্কৌ খালি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখব।

টলষ্টয় ঋষি। তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিযোগে প্রত্যক্ষ করলেন ঘটনা কেমন করে ঘটল, কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। যারা খেলা করে তারা পরস্পরের কেরামৎ জানে। কিন্তু যুদ্ধে অপর পক্ষের সামর্থ্য পরিমাপ করবার কোনো ধ্রুব মান নেই। যারা লড়াই করে তাদের ঐটেই একমাত্র ভাবনা নয়, তারা সবাই বীরও নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষ, তাদের কারুর মনে পড়ছে ঘরসংসার, কেউ গণনা করছে কবে মাইনে পাওয়া যাবে। সেনাপতিদের একোজনের একো মত, তাদের সবাইকে এক মনে কাজ করান প্রধান সেনাপতির নিত্য সমস্যা। পদাতিকদের অনুপ্রেরণা যতটা জয় গৌরব নয় ততটা লুটতরাজ। মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েও বীরপুরুষেরা লুটের মাল আঁকড়ে থাকে। যুদ্ধ জিনিষটা একজনের হুকুমে হয় এর মত ভ্রান্তি আর নেই। যুদ্ধ হয় একবার কোনো মতে সুরু করে দিলে আপনাআপনি। থামে হয়ত একটা উড়ো কথায়। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা হেরে গেছি।" অমনি সবাই ভঙ্গ দিল।

কেন যে যুদ্ধ হয়, কেন যে মানুষ মারে ও মরে, কি যে তার অন্তিম ফল টলষ্টয় তার সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। নেপোলিয়ন হুকুম করলেন, 'যুদ্ধ হোক', আর অমনি যুদ্ধ হল এই সুলভ ব্যাখ্যায় তিনি সন্দিহান। নেপোলিয়ন নিয়তির বাহন, তাও একটা ঐরাবত কি উচ্চৈঃশ্রবা নন, প্রতিভা তাঁর নেই। মস্কৌতে তিনি আগাগোড়া নির্ব্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। সেই শহরে খাদ্য মজুত ছিল ছয় মাসের। কিন্তু নেপোলিয়ন তার হিসাব রাখলেন না। সৈন্যরা লুটপাট করে তছনছ করল। মস্কৌর ধনসম্ভার তাদের লোভ জাগিয়ে তাদেরকে এত দূর দেশে এনেছিল, সেই লোভের তাণ্ডব নাচ চল্ল। নেপোলিয়ন মোরগের মত নিশ্চিত জানতেন যে নাগরিকরা

তাঁর লম্বা চওড়া ইস্তাহার পড়ে ফিরবে, আবার দোকানপাট বসাবে। গ্রামিকরা আসবে মাছ তরকারি বেচতে। তাদেরকে তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন যে যুদ্ধে যেমন তিনি অপরাজেয় শান্তিকালেও তেমনি তিনি প্রজারঞ্জক।

রাশিয়ার জনগণকেই টলষ্টয় দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি। তারা অন্তরে উপলব্ধি করল নিয়তির অভিপ্রায়। তাই মূঢ় রোষ্টোপশিনের অনুজ্ঞায় কর্ণপাত না করে শহর ছেড়ে দিল। শহরে আগুন দিল কে তা কিন্তু বলা যায় না। হয়ত রাশিয়ানরা, হয়ত ফরাসীরা। যেই দিক সে নিয়তির ইঙ্গিতে দিয়েছে। বোঝেনি কিসের ফল কি দাঁড়াবে।

শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ করব, ফিরব না মস্কৌতে এই যে তাদের সঙ্কল্প এও কারুর নির্দ্দেশে বা শিক্ষায় নয়। এও তারা একজোট হয়ে পরস্পরের পরামর্শ নিয়ে করেনি। এ তাদের প্রত্যেকের অন্তরের আদেশ। এমন যদি না হত তবে সম্রাট বা সেনাপতিদের ইচ্ছা নেপোলিয়নের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রলয় বাধাত, প্রলয়ঙ্করের করতালি ত এক হাতে বাজে না।

শেষজীবনে টলষ্টয় যে জনগণের স্বভাব বিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন তার পূর্ব্বাভাস তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেও লক্ষ করা যায়। নামহীন পরিচয়হীন মহাজনতায় আপনাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সাধনা। পারেননি, এমনি উগ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বদ্ধমূল আভিজাত্য উন্মূল হল না। তবু তাঁর দানবিক প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়নি। দেশান্তরে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে, মহাত্মার জীবনাদর্শে। টলষ্টয়কে দ্বিখণ্ডিত করে কেউ নিয়েছে তাঁর যৌবনের অনবদ্য শিল্পিত্ব। কেউ নিয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের অপ্রতিরোধতত্ত্ব।

কিন্তু এই যে তাঁর জনগণের সহজ বিচারের প্রতি আস্থা এই তাঁর উভয় বয়সের, উভয় প্রতিকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের সঙ্কেত। শিল্পি-ঋষি ও সাধু-ঋষি মূলত ঋষি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের কোন রহস্য ধরা পড়েছে ? ধরা পড়েছে এই যে, যাবতীয় ঘটনার যথার্থ পাত্রপাত্রী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা নন। নামপরিচয়হীন নির্ব্বিশেষ জনতা যা করে

তাই হয়। এবং যা করে তা নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, খেয়ালী নয়। তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। যেমন পৃথিবীর ঘূর্ণন আমাদের অনুভূতির অতীত বলে আমরা একদা তাকে স্থাণু মনে করেছিলুম তেমনি নিয়তির ইচ্ছায় কাজ করতে থেকেও আমরা তার সম্বন্ধে অচেতন, আমরা ঠাওরাচ্ছি আমরা ইচ্ছাময়।

সমর থেকে ওঠে নিয়তির কথা। তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতির। বিচিত্র সংসারের ধারাবাহিকতায় কত রস, কত রূপ। যুদ্ধ চলেছে নেশনে নেশনে। কিন্তু অলক্ষিতে বালিকা হয়ে উঠছে বালা. বালা হয়েছে উঠছে নবযুবতী। অন্তরালে শীতের সূর্য্য সুধাবর্ষণ করে যাচ্ছে, আকাশ ঘন নীল। কে বলবে যে এই সুন্দরী ধরণী একদিন হবে রণক্ষেত্র, বারুদের ধূমে ও গন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুপক্ষীর হবে শ্বাসরোধ, পাতা ও ফুল যাবে বিবর্ণ হয়ে? টলষ্টয়ের এই গুণকে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন আইডিল, সুখসরলতার ছবি। এক হিসাবে তা সত্য। সহজ, প্রসন্ন জীবন। বিশেষ অভাব অভিযোগ নেই। নেই তেমন কোনো দ্বন্দ্ব। কারুর অতি বড় সর্ব্বনাশ ঘটে না, জীবনদেবতা সকলেরই শেষ নাগাদ একটা সদ্ব্যবস্থা করেন। কাউকে দেন সুমধুর মৃত্যু, মুখে হাসিটি লেগে থাকে। কাউকে রাখেন চিরকুমারী করে, নিজের নিস্ফলতায় সন্তুষ্ট। কেউ আরম্ভ করেছিল বিশ্বের ভাবনা ভেবে। মরতে মরতে বেচে গেল। তারপর বিয়ে করল, সুখে থাকল।

আধুনিক পাঠকের এতটা শান্তি বিশ্বাস হবে না। তবে একটু পরিতোষ হবে যে পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয় প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রায় ছিল না ঋষির। আর এও না মেনে উপায় নেই যে প্রত্যেকটি কাল্পনিক চরিত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের মত উৎরেছে। তার মানে ওরা আস্ত মানুষ, কবি ওদের দেখেছেন সকলের মাঝে, দেখিয়েছেন যথাযথরূপে। ওরা থাকলেও থাকতে পারত ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসে থাকলে আমরা বিশ্বাস করতুম ওদের জীবনযাত্রার শান্তি।

কথা হচ্ছে সমরের মত শান্তিকালেও টলষ্টয় পড়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ। সমরের যেমন নিয়তি, শান্তির তেমনি সহজ বিকাশ, বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। দ্বন্দের স্থান রণাঙ্গনে, গৃহে বড় জোর একটুখানি মান

অভিমান, সজল কলহ। একটু ব্যঙ্গ, একটু রঙ্গ। রাগ হলে, বা রাগ হওয়া উচিত বলে মনে করলে, একটা ডুয়েল। তাতে মরেও না শেষপর্য্যন্ত কোনো পক্ষ।

শান্তিও যে আজ আমাদের দিনে সমরের নামান্তর, প্রকারান্তর বলে গণ্য হবে তা ত ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সূচিত হয়নি। বিশেষত রাশিয়ায়। এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের গণ্ডী কালচিহ্নিত। যেমন খাপ তেমনি তরবারি! তথাপি সেকালের চিন্তায় জমিদার ও চাষার সম্বন্ধ কেমন হবে সে জিজ্ঞাসা ছিল।

সমসাময়িক সমস্যার চেয়ে টলষ্টয়কে ঢের বেশী আকুল করেছিল সনাতন জীবনরহস্য। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, বাঁচার মত বাঁচা কাকে বলে। এর এক একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এক এক জনের চরিত্রে দিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে নাম করা যায় নাটাশার, মারিয়ার, সোনিয়ার, হেলেনের। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় য়্যাণ্ড্রুকে, পিটারকে, নিকোলাসকে, ভোলোগোকে। যাদের অগ্রাহ্য করলুম তারা কেউ উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা শতাবধি। এত রকম এত ব্যক্তি অন্য কোন গ্রন্থে আছে? ডষ্টইয়েভ্‌স্কিও টলষ্টয়ের পিছনে পড়ে যান।

নাটাশাকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন তার শৈশব সারা হয়ে গেছে অথচ সে কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়নি। দেখতে তত সুশ্রী নয়, বরং শ্রীহীন বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে উচ্ছলিত প্রাণ। তখনো তার পুতুল খেলার অভ্যাস ভাঙ্গেনি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। তার সে হাসি সংক্রামক। এই মেয়ে বছর চারেক পরে হয়েছে ষোড়শী, ভাবাকুলা, সুদর্শনা। কিন্তু রয়েছে তেমনি প্রাণবতী! সামাজিক নৃত্যে সে এমন আনন্দ পায় যে তার নিষ্পাপ চিত্ত সকলের আনন্দ কামনা করে। তার উল্লাস যেন কোন অপ্সরার, তা দিকে দিকে সৃষ্টি করে উল্লাস। তার অখলতা, তার অকৃত্রিমতা, তার সরল মাধুরী তার প্রতি আকৃষ্ট করল য়্যাণ্ড্রুকে। য়্যাণ্ড্রু উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয়, উচ্চমনা। বয়সেও বড়। দেশের মঙ্গলের নানা পরিকল্পনা ছিল তাঁর ধ্যান। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহের স্ত্রী তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন

না। সামাজিকতার অশেষ তুচ্ছতায় তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত খুচরা খরচ হয়েছিল, বাজে খরচ। দিকদার হয়ে তিনি যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করে তাঁর তাতেও অরুচি ধরল। যাকে আদর্শ স্থানীয় বলে বিশ্বাস করেছিলেন সেই নেপোলিয়নকে নিকট থেকে দেখে বীতশ্রদ্ধ হলেন। প্রশান্ত নীল আকাশের নীচে আহত হয়ে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে হল তাঁর বুদ্ধিগম্য যাবতীয় বিষয় অসার, সার কেবল ঐ অসীম বিশ্বরহস্য। এমন যে য়্যাণ্ড্রু, তাঁরও নতুন করে বাচতে ইচ্ছা করল নাটাশার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণপ্রবাহে ভেসে। তার নেই লেশমাত্র মলিনতা, সে ঝরণা। এক বছরের জন্য য়্যাণ্ড্রু দেশের বাইরে গেলেন, ফিরে এসে নাটাশাকে বিয়ে করবেন। এই এক বছরে নাটাশা তাঁর প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য হয়ে উঠল। এল তার কুগ্রহ আনাতোল। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে প্রতারকের কবলে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। বেঁচে গেল। কিন্তু বদলে গেল। য়্যাণ্ড্রু দেশে ফিরে যা শুনলেন তাতে তাঁর জীবনের স্পৃহা লোপ পেল, নারীর কাছে তিনি কোনো রূপ মহত্ত্ব প্রত্যাশা করলেন না, এত দুর্ব্বল তারা। তিনি আবার গেলেন যুদ্ধে, এইবার মৃত্যু কামনা করে। আহত হয়ে আনীত হলেন, ঘটনাচক্রে নাটাশাদের আশ্রয়ে। মরণকালে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হল দিব্য ভাবে। তিনি ক্ষমা করলেন, তিনি ভালবাসলেন, প্রাণীমাত্রকে, সংসারকে। তাঁর মনে ব্যর্থতার নিত্য খেদ রইল না। অনুতপ্তা সেবিকা প্রিয়াকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

নাটাশাকে তার শৈশব থেকে ভালবাসত পিটার। লোকটা কেবল যে লাজুক, ভালমানুষ, কিম্ভূত কিমাকার মাথাপাগলা তাই নয়, নামগোত্রহীন সত্যকাম। তাই কাউকে কোনোদিন জানায়নি ভালবাসার কথা। হঠাৎ মারা গেলেন কাউণ্ট বেসুকো, উত্তরাধিকারী হল পিটার, বিরাট ভূসম্পত্তির তথা পদবীর। তখন তাকে লুফে নিল নাটাশাদের চেয়ে উদ্যোগসম্পন্ন, প্রতিপত্তি-মান কুরাগিন বংশ। তার বিয়ে হল যার সঙ্গে সে অসামান্য রূপবতী, সোসাইটির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, হেলেন। কোনো পক্ষে প্রেম নেই। বিভবের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের বিবাহ। দুজনেই পরম অসুখী হল। হেলেন

খুঁজল অমন অবস্থায় ওরূপ সমাজের রাণীমক্ষিকারা যা খোঁজে। আর বেচারা পিটার হল ফ্রীমেসন। চরিত্রকে দিন দিন উন্নত করতে চেষ্টা করল, বিশ্বকল্যাণ-ব্রত-রত। দোষের মধ্যে মদটা খায় অপরিমিত। তার সেই ভালবাসা তার অন্তরে রুদ্ধ থাকে। নাটাশার সঙ্গে তার সহজ বন্ধুতা। নাটাশা তাকে সরল জন্তুটি বলে সখীর মত বিশ্বাস করে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন পিটারের ধারণা জন্মাল যে, বাইবেলে যে রাক্ষসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে নেপোলিয়নই সেই রাক্ষস এবং তাকে হত্যা করবে যে সে আর কেউ নয়, সে আমাদের পিটার, যে একটা বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। পিটারের প্রয়াসের ফল হল শেষকালে এই যে পিটার অন্যান্যদের সঙ্গে ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়াল। তার চোখের সুমুখে মানুষ মরল ঘাতকের গুলিতে। তারও উপর গুলি চলবে এমন সময় তার প্রাণদণ্ড মকুপ হল, সে চলল বন্দী হয়ে ফিরন্ত ফরাসীদের সাথে। কসাকদের সাহায্যে অন্যান্য বন্দীদের সহিত তাকেও উদ্ধার করল ডেনিসো ডোলোগো প্রভৃতি গেরিলা যুদ্ধের নায়ক। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, বহু লাঞ্ছনা সয়ে যে দুঃখ আমাদের পাওনা নয় সেই দুঃখকেও কেমন ভক্তির সহিত গ্রহণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত কারাটাইয়েভ নামক একটি পরম দুঃখী ঈশ্বরবিশ্বাসীর জীবনে প্রত্যক্ষ করে পিটারের গভীর অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছিল। সৌখীন মানবহিত আর তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছিল না। সে পথ পেয়েছিল। বিষাদিনী নাটাশাকে বিয়ে করে—ততদিনে হেলেন মরেছিল—সে দস্তুরমত সংসারী হল। নাটাশা আবার সেই আনন্দময়ী। প্রকৃতি যে তাকে সহজ আনন্দ জোগায়, উদ্ভিদকে যেমন রস। সে কালক্রমে ফলভারাবনত পূর্ণবিকশিত পাদপের মত প্রসারিত, সমৃদ্ধ হল। কে তাকে দেখে চিনবে যে এ ছিল একদিন তন্বী আলোকলতা। তবু তাই তার প্রাকৃতিক পরিণতি। তা নইলে যা হত সেটা তার বিকৃতি। নাটাশা টলষ্টয়ের মানসী নারী। সে ভাল। কিন্তু সজ্ঞানে ও সাধনার দ্বারা নয়, শিক্ষার দ্বারা নয়। নীতির চুল চেরা তর্ক তার মনে ওঠে না। তার প্রাণ যা চায় সে তাই চায়। তার প্রাণ যা চায় তার ফলে অনর্থ ঘটলে সে তা ভোগে। নালিশ করতে যায় না।

য়্যাণ্ডের বোন মারিয়া হচ্ছে কতক তার রূপ হীনতার প্রতিক্রিয়ায়, কতক তার কঠোরস্বভাব জনকের তাড়নায় তপস্বিনী। তার সমবয়সিনীরা যখন খেলা করছে, লীলা করছে, শিকার করছে দুই অর্থে, মারিয়া তখন জ্যামিতির পড়া তৈরি করছে আর করছে লুকিয়ে অধ্যাত্ম চর্চ্চা। যা অমন দুঃখিনী হলে নারীমাত্রেই করে থাকে। আপনাকে সে ভাগবত জীবনের যোগ্য করছে নিষ্ঠার সহিত, বিবাহের ত প্রত্যাশা নেই। তা বলে আশা কি মরেও মরে। কতবার নিরাশ হল। অবশেষে নাটাশার ভাই নিকোলাস তার পৈত্রিক সম্পত্তির খাতিরে তাকে বিয়ে করল, অবশ্য বিয়ের আগে তাকে বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে উদ্ধার করে তার হৃদয় জিনে। তাদের বিয়ে বেশ সুখেরই হল। মারিয়ার দীর্ঘাচরিত সংযম ও সাধুতা তাকে শুদ্ধ সুবর্ণের আভা দিয়েছিল। তার রূপহীনতাকে ঢেকেছিল সেই আভা।

নিকোলাস নাটাশারই মত প্রাণময়, তবে সহাস্য নয়, সুগম্ভীর। তার সব কাজে হাত লাগান চাই, উৎসাহ তার অদম্য, ব্যগ্রতা তার মজ্জাগত। ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া খরিদ, তরুণ সৈনিকের ভাবনাশূন্য জীবনের হাজার ভাবনা, শিকার, জুয়া এই সব তার বহির্মুখিত্বের নানা দিক। তাকে ভালবাসে তাদের পরিবারের আশ্রিতা একটি মেয়ে, সোনিয়া। নিকোলাস তাকে ভালবাসে সে ভালবাসা তার অন্যান্য কাজের মত ছেলেমানুষী। কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে। কিন্তু সোনিয়ার অপরাধ সে নির্ধন। তাকে বিয়ে করলে নিকোলাসদের নষ্ট সম্পত্তি ফিরবে না। তার বাবা যে জুয়ায় সব হারিয়ে বসে রয়েছেন। নিকোলাসের মায়ের পীড়াপীড়িতে সোনিয়া তাকে তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিল। নিকোলাস বর্ত্তে গেল, সে ত কিছুতেই তার পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারত না, অথচ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবার মত বেইমান সে নয়। সোনিয়া এই কাব্যের উপেক্ষিতা।

ডোলোগো নিকোলাসের বন্ধু। কিন্তু দিব্যি বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জুয়াতে ভীষণ হারিয়ে। লোকটা অসাধারণ সাহসী, অথচ অবাধ্য। তার মনে একটা বড় দুঃখ ছিল যে সে গরীব। তাতে তাকে নির্দ্দয় করেছিল। তার আর একটা বৃহৎ ক্ষোভ সে একটিও নারী দেখল

না যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, পূজা করতে পারে। তার ধারণা রাণী থেকে দাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেক রমণীকে কেনা যায়। সে যে বেঁচে আছে তা শুধু তার মানসীকে হয়ত একদিন দেখতে পাবে এই অসম্ভব আশায়। ততদিন সে সয়তানী করবে। করবে গুণ্ডামী। তার বিধবা মা আর কুব্জা বোন আর গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া সবাইকে সে বেখাতির করবে।

টলষ্টয়ের বর্ণনাকুশলতা এমন যে পদে পদে মনে হতে থাকে টলষ্টয় স্বয়ং এসব দেখেছেন, এসব যায়গায় উপস্থিত থেকেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, মন্ত্রণা-সভায়, দরবারে, অভিজাত মহলে, ফ্রীমেসনদের আড্ডায়, গ্রামের বাড়ীতে, শিকারের পশ্চাতে, নাচের মজলিসে, চাষাদের সঙ্গে, বন্দীদের সাথে, গেরিলা দলে—সর্ব্বঘটে তিনি আছেন। কল্পনার এই পরিব্যাপ্তি, সহানুভূতির এই প্রসার বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। অবশ্য সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে তাঁর চিত্তের প্রবেশ ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে তিনি হয়ত শেষ বয়সে তাদেরই দিকে সম্পূর্ণ হেলতেন না। তারপর এত খুঁটিনাটি ভালবাসতেন বলে তার প্রতিক্রিয়াবশত শেষের দিকে একেবারে ও জিনিষ বয়কট করলেন। এক চরমপন্থা থেকে অপর চরমপন্থায় চল্লেন। টলষ্টয়ের জীবনের তথা আর্টের ট্র্যাজেডি এই।

আলোচ্যগ্রন্থে তিনি যাকে জয়যুক্ত করেছেন সে পিটার, নাটাশাযুক্ত পিটার। কারাটাইয়েভ মরণের পূর্ব্বে তাকে যে মন্ত্র দিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি তার কানে বাজতে থাকে। জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্ব্বভূতের আছে গতি। সেই গতিই ভগবান। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আছে ভগবানের অস্তিত্বকে জানবার আনন্দ। জীবনকে ভালবাসলেই ভগবানকেও ভালবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালবাসা।

লীলাময় রায়

শিল্পের সুন্দর

শিল্পী মানব যুগে যুগে অন্তরের সকল সম্পদ সংহত করে' চিরসুন্দরের অর্চ্চনা করে' এসেছে। প্রকৃতির সকল সুষমা সংগ্রহ করে' তাঁর মূর্ত্তি গড়েছে, অতরল স্বপ্ন দিয়ে তাঁর মন্দির তৈরী করেছে, হৃদয়ের ভাষাতীত সঙ্গীত দিয়ে তাঁর বন্দনা করেছে, লাবণ্যময় দেহকে নানাছন্দে আবর্ত্তিত করে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করেছে, চিত্রপটে তাঁর মূর্ত্তি নানা আকারে এঁকে চিত্তবিনোদন করেছে, কাব্যে তার লীলাকাহিনী ঝঙ্কৃত করে তুলেছে। এই সকল প্রচেষ্টা মানবসমাজের অক্ষয় সম্পদ হ'য়ে আছে ও চিরকাল আনন্দ দান করে' আসছে। কিন্তু যে সকল উপাদান দিয়ে শিল্পী তাঁর বিচিত্র অর্ঘ সাজিয়েছেন তার মধ্যে এই ধূলিমলিন জগতের নানা তুচ্ছ বস্তুও আছে। যে সকল ক্ষুদ্র রূপহীন গন্ধহীন কুসুম পথের ধারে ফুটে' মানুষের অজস্র অবহেলা ও অবজ্ঞাই কুড়িয়ে এসেছে শিল্পীর অপরূপ মালার মধ্যে গাঁথা হ'য়ে তাদের কি সুন্দরই দেখাচ্ছে, দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে থাকতে হয়। পথের ধারে নগ্নপদ ছিন্নবসন দরিদ্র বালককে মনের আনন্দে একখণ্ড তুচ্ছ আহার্য্য উপভোগ করতে ত প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু কৈ সে দৃশ্য ত মুরিলোর (Murillo) তরমুজভক্ষণনিরত দুটি মানবকের মত আমাদের মনে আনন্দ সিঞ্চন করে না! সেক্ষপিয়রের ফলস্টাফ্ বা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গদাই-পাল জগতে বড় দুর্লভ নয়। কিন্তু কবির চিত্রগুলি দেখলে যে আনন্দ পাওয়া যায় এদের সংসর্গে ত তার এক বিন্দুও পাওয়া যায় না,—বরং বিরক্তি ও ভয়ই হয়। এই সকল নগণ্য তুচ্ছ উপাদান সংগ্রহ করে' শিল্পী তাদের কোন মন্দাকিনীর ধারায় অভিষিক্ত করে' আনেন, কি আনন্দের মন্ত্র দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন যে তাদিকে আমরা এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তিরূপে দেখি, তারা মানুষকে অনন্তকাল অকাতরে অফুরন্ত আনন্দ বিতরণ করে? জিজ্ঞাসু মানবের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, শিল্পীর স্পর্শে কি কুহক আছে, শিল্পী আমাদের চোখে কি আনন্দের অঞ্জন মাখিয়ে দেন যে তাঁর হাতে জগতের তুচ্ছতম বস্তুও অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়!

শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তুর যে আলেখ্য উপহার দেন তাকে সে বস্তুর আলোক চিত্র বলে ভাবলে ভুল করা হয়। শিল্পীর আলেখ্যে আলোকচিত্রের মত আদর্শের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিল নাই, বেশভূষার সে পারিপাট্য নাই; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী মিলিয়ে দেখলে অনেক ছোটখাট অমিল ধরা পড়বে। শিল্পী যেখানে মূলের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু সে সকল চেষ্টা মানুষকে কোথাও শ্রেষ্ঠ শিল্পের মত আনন্দ দান করতে পারে নাই,—অনেক স্থলে বরং বিরক্তিই উৎপন্ন করেছে। Naplesএর সাধারণ শিল্পসংগ্রহাগারে কতকগুলি পাষাণপ্রতিমা আছে যেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে জীবন্ত মানবের প্রতিমূর্ত্তি করে তোলা হয়েছে। তাদের মাথায় কুঞ্চিত কেশের তরঙ্গ তুলে' দেওয়া হয়েছে, নীলনয়নে উজ্জ্বল তারা ও ভ্রু সংযোগ করা হয়েছে, ওষ্ঠে গণ্ডে জীবনের লালিমা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে ও বহুমূল্য পরিচ্ছদে বরবপু আবৃত করে' দেওয়া হয়েছে। এগুলি দেখে কিন্তু কোনরূপ আনন্দ ত পাওয়া যায় না;—বরং দেখতে দেখতে অসীম বিরক্তি ও জুগুপ্সা জেগে উঠে, মনে হয় যেন জীবনের একটা হাস্যকর প্রহসন হয়েছে। এইভাবে বর্ণে বর্ণে রেখায় রেখায় মূলের অনুকরণ এতই সহজ যে সাধারণ শিল্পী এই প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারেন না। এমন কি বিষয়বস্তুর একটি আলোকচিত্র নিয়ে তার উপর একটু বর্ণপ্রক্ষেপ করে' শিল্পসৃষ্টি বলে' চালানর প্রচেষ্টাও আমাদের দেশে দেখা যায়। সাহিত্যেও এইরূপ প্রকৃতির দাসসুলভ অনুকরণ প্রতিমাসে মাসিক পত্রিকার ছোট গল্পে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এই অনুকরণের সিদ্ধিও সুলভ। প্রাকৃত মানব আনন্দে বলে উঠে, "কি সুন্দর! ঠিক যেন মানুষটি বসে আছে," অথবা "বড়ই স্বাভাবিক হ'য়েছে" কিন্তু মূলে এগুলি পরিচ্ছদের দোকানের বিজ্ঞাপন বা মার্জ্জিতরুচি অভিজাত সমাজের আলোকচিত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়।

শ্রেষ্ঠশিল্পী প্রাকৃতিক সামগ্রীর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ করেন না বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম বা স্বাভাবিক সংস্থানকে কোথাও অবহেলা করে' চলেন না। প্রাকৃতিক বস্তুজগতের গঠন, আয়তন ও সংস্থান যুগযুগান্ত ধরে' জড় জগতের সঙ্গে জীবজগতের সামঞ্জস্য বিধানের ফল। তা' অতিক্রম করে'

একটা নূতনতর ও উন্নততর সমাধান মানবশিল্পীর সাধ্যায়ত্ত বলে' বোধ হয় না। সেজন্য প্রকৃতিকে মেনে নিয়ে শিল্পীকে তাঁর শিল্প সাধনায় অগ্রসর হতে হয়। মানুষের মূর্ত্তি গঠন করতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের পরস্পরের অনুপাত, অস্থি ও সন্ধির সংস্থান, দৈহিক নানা ক্রিয়ার সময় পেশীসমূহের বিকাশ প্রভৃতি নানা শারীরিক ব্যাপার লক্ষ্য করতে হয়। শিল্পানুরাগী-মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন এ বিষয়ে অবহেলার ফলে আধুনিক শিল্প কিরূপ সৌষ্ঠবহীন লাবণ্যহীন হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যেও যে স্থানে যে ঋতুতে যে ফুলফল তরুলতার বিকাশ স্বাভাবিক, শিল্পীকে তা মেনে চলতে হয়। সাহিত্যেও এ বিষয়ে অসাবধানতার ফলে মজুরদের বস্তি থেকে Chopinর Reverieর ধ্বনি ও যোগীর সাধনাশ্রমে পানাগারের দৃশ্যের অবতারণা পাওয়া যায়। যে আবেষ্টনের যে শিক্ষার মধ্যে যে বংশে যে চরিত্রের বিকাশ সম্ভব প্রকৃত সাহিত্যিক তাই দেখান। আর অন্য কিছু দেখাতে গেলে তার একটা হেতু বংশে, শিক্ষায় বা আবেষ্টনের মধ্যে তিনি দিয়ে থাকেন।

প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করে' শিল্পী বিষয়বস্তুর মধ্যে যে অর্জ্জনবর্জ্জন করেন তাতে কেবল একটি লক্ষ্য তিনি স্থির করে রাখেন,—বস্তুটির ভাব-রূপটি সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা। শিল্পীর চোখে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়টি একটি বিশেষরূপে দেখা দেয়, একটি বিশেষভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, মনে একটি বিশেষ রসানুভূতি জাগিয়ে তোলে ও তিনি সেই রূপটিই ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পান। কবিরা বলেন প্রেম অন্ধ; কবির সৃষ্ট প্রেমিক যদি উত্তর দিতে পারত ত সেও বোধ হয় বলত, "তুমিই না অন্ধ হয়ে আমায় ভালবেসেছ তাই আমায় কেবল প্রেমিক করেই এঁকেছ! বাস্তবিক কি আমি পিতার পুত্র, ভগ্নীর ভ্রাতা, সখার প্রীতিনিলয় ও দেশের সেবক নই?" প্রকৃতই শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তুর একটি দিকই দেখেন, তার অন্যান্য দিক তাঁর চোখে অস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন থাকে। তাঁর দৃষ্ট অংশটুকুকে উজ্জ্বল করে', প্রকট করে' তোলবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন এই ছায়ানিবিড় অংশগুলি ঠিক ততটুকুই প্রকাশ করে। শকুন্তলার প্রেমে মুগ্ধ দুষ্মন্তকে আমরা দেখি মার্জ্জিতরুচি বিদগ্ধবাক যুবাপুরুষরূপে, কিন্তু এই নাটকের ঘটনাটি ত রাজার রাজকার্য্যের অবসরে একটা চিত্তবিনোদনব্যাপার মাত্র। শকুন্তলাকে নিয়ে

যখন তাপসবৃদ্ধা গোতমী রাজার সভায় উপস্থিত হলেন, তখন রাজাকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁর স্বরূপে দেখতে পাওয়া যায়,—রাজনীতিবিশারদ, রাজধর্ম্মে নিরত, গম্ভীরপ্রকৃতি, বহুপত্নীক বলে' নারীসম্ভোগে রসজ্ঞ ও নারীচরিত্রের প্রতি একটু অশ্রদ্ধ। যখন তেজস্বিনী শকুন্তলা তিরস্কার করে' চোখে আঁচল দিয়ে নিরাশায় ম্রিয়মাণা হয়ে চলে' গেলেন সেই দুঃখবিহ্বল রোরুদ্যমানা মূর্ত্তির দিকে চেয়ে মুনিশাপে বিভ্রান্তচিত্ত রাজার বিস্মৃতি ভেদ করে' কোথায় একটা অনুশোচনার বেদনা জেগে উঠল ও অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে' এই রুক্ষ রূঢ় চিত্রটিকে স্নিগ্ধ করে' দিল। প্রেমিক দুষ্মন্তের দিকে চেয়ে যখন আমরা মুগ্ধ হচ্ছিলাম কবি যেন গোপনে এসে আমাদের কানে কানে একবার বলে গেলেন, ইনি কিন্তু সসাগরা ভারতের অধীশ্বর। দুষ্মন্তচিত্রের সে অংশটা কিন্তু প্রায় প্রচ্ছন্নই রয়ে গেছে। একটু অনবধানতায় এই প্রচ্ছন্ন অংশ একটু অধিক প্রকাশিত হলেই শিল্পপ্রতিভার যাদুতে আমাদের চোখের সামনে যে অপরূপ সৃষ্টি হচ্ছিল তা যেন কতকটা মলিন হয়ে উঠে। মৃচ্ছকটিকের চারুদত্ত অপূর্ব্ব প্রেমিক ও বদান্যরূপে যখন আমাদের মনোহরণ করে' নিয়েছে এমন সময় ছিন্নবসনের লজ্জায় বিপন্না তাঁর সহধর্ম্মিণীর ম্লানমূর্ত্তি ও একটি মৃৎশকটের জন্য রোদনাতুর ননীর পুতলী শিশুপুত্রের মুখখানি অতর্কিতে ঐ ছায়াচ্ছন্ন পশ্চাদ্ভূমির ভিতর থেকে আমাদের সামনে মুহূর্ত্তে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, ও মনে হ'ল যেন কবির এতক্ষণের সযত্নরচিত দেবমূর্ত্তিকে শ্মশানের পূতিগন্ধময় শবাহারী গলিতদেহ কোন কুক্কুর বামপদাঘাতে চূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল। চারুদত্ত যে উপার্জ্জনাক্ষম অতিব্যয়ী অবিমৃশ্যকারী পুত্র, হৃদয়হীন পতি ও মমতাহীন পিতা, বংশগৌরব হারিয়ে নির্লজ্জভাবে সামান্য গণিকার প্রেমে উন্মত্ত, এই কথা নিমেষে প্রকট হয়ে উঠল ও তাঁর প্রেমিকমূর্ত্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। এরূপ অনবধানতা কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে বিরল। প্রতিভাশালী শিল্পী যে সকল ছোটখাট চরিত্র সৃষ্টি করেন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাঁর পাত্রপাত্রীদের স্থাপিত করেন সেগুলি এমনই মনোরম করে' তোলেন যে অনেক সময় সেগুলিকে আরও ভাল করে' দেখবার জন্য, আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানবার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে থাকি। কিন্তু শিল্পী আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারেন

না,—তা হ'লে যে তাঁর শিল্পের যাদু ভেঙে যায়! স্নিগ্ধচরিত্রা অনসূয়া ও বাকপটু প্রিয়ংবদা চিরকালই কণ্ব দুহিতার বিবাহ দিয়ে তপোবনের ছায়ার মধ্যে আত্মগোপন করবে ও বিরহিণী ঊর্ম্মিলা চিরকালই অযোধ্যার অন্তঃপুরে মৌনী হয়ে' থাকবে। কাব্যের উপেক্ষিতাদের জন্য আমাদের মন যতই বেদনায় আতুর হয়ে উঠুক শিল্পসৃষ্টির অমোঘ প্রয়োজনে তাঁদের আর অধিক করে' পাওয়া যাবে না।

একদিকে যেমন বিষয়বস্তুর যে রূপটি শিল্পীর চোখে লাগে তার প্রতিকূল অবস্থাগুলি তিনি বর্জ্জন করেন, তেমনই তার অনুকূল অবস্থা-গুলিকে সযত্নে বিকশিত করে তোলেন। বর্ণনার কৌশলে মনে হয় যেন নয়নের চাহনি থেকে বসনবিন্যাসের ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত একই ভাবের দ্যোতক। শকুন্তলা যখন মদনসন্তপ্তা হয়ে পদ্মপত্রশয়নে অঙ্গগ্লানি দূর করছেন সেইটুকুই কবি আমাদের দেখিয়েছেন। শকুন্তলার প্রণয়বিহ্বলা মূর্ত্তিটিই আমাদের চোখে পড়ে, যেন এইখানেই তার জীবনের পরম চরিতার্থতা। শৃঙ্গাররসের অভিনয় কবির প্রতিপাদ্য, কিন্তু কণ্বমুনির শান্তরসাস্পদ তপোবনে যে এই অভিনয় হচ্ছে সে কথা কবি একবারও ভুলতে দেন না। দৃশ্যভূমি ও পশ্চাদ্ভূমির যথোচিত বিন্যাসকৌশলে কালিদাসের এই নাটকখানি একটি অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টি হয়ে আছে।

শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তুর বাহ্য আকৃতি লক্ষ্য করেন তার অন্তরের ভাবরূপটির প্রকাশক হিসাবে। বস্তুটি যে আকারে তাঁর চোখে প্রতিভাত হয় সেইটি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে গেলে তাঁকে সন্ধান করতে হয় সেই বিষয়বস্তুর অন্তর্লীন ভাবটির, তার মূলপ্রকৃতির, যার প্রেরণায় সকল কার্য্য, সকল চিন্তা, সকল আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁর বিষয়বস্তু যে জীবন-দেবতার মণিবেদিকার তলে প্রতিদিন অর্ঘ সাজিয়ে নিয়ে এসে আত্মনিবেদন করছে, যাঁকে ঘিরে মগ্নচৈতন্যের অন্তস্তল হতে নিগূঢ় বাসনারাশি আরতির সুগন্ধ ধূমের মত চিত্তটিকে সুরভিত করে' নিয়ত লীলায়িত হয়ে উঠছে, শিল্পী সেই দেবতার সন্ধান করে ফিরেন। কিরূপ আরাধনায় যে দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে দেখা দেবেন তা শিল্পী জানেন না, তাই তাঁর সাধনার বিরাম নাই। কিন্তু তিনি জানেন যে একবার তাঁর বিষয়বস্তুর

জীবন-দেবতার সাক্ষাৎ পেলে সমস্ত কঠোর সাধনা সফল হয়ে উঠবে,—যা বাস্তব জগতে অসুন্দর কর্কশ ছিল তাই শিল্প-জগতে মনোরম কমনীয় হ'য়ে উঠবে, প্রতিভার জ্যোতির্ম্ময় রশ্মিপাতে অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত ভাস্বর হয়ে উঠবে ও তাঁর সৃষ্টি জগতে অমর হ'য়ে থাকবে। শিল্পী এই ধ্যানগম্য তপস্যা-লভ্য ভাবরূপটির সন্ধান করেন। কোনো দেবতার মূর্ত্তি গঠন করতে হ'লে পবিত্রভাবে সেই দেবতার আরাধনা করতে হয়, যতক্ষণ না ধ্যাননেত্রে তাঁর রূপটি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে, শিল্পের এই অনুশাসনটি বৃথা নয়।

এই একটি রূপ ধ্যান করতে করতে শিল্পীর চোখে বিশ্বজগৎ লোপ পেয়ে যায়, নিখিল-বিশ্ব যেন সমস্ত রূপরস শব্দগন্ধ দিয়ে এই একটি বস্তুকে সৃষ্টি করে সার্থক হয়েছে। এই ধ্যানে শিল্পীর সমস্ত সত্তা যখন তাতেই মিশে যায়, তখন তাঁর চিত্তটি সেই ধ্যেয় বস্তুর আকার গ্রহণ করে। শিল্পী জীবনে যেখানে যা' কিছু মনোরম পেয়েছেন সে সমস্ত ছানিয়া এই মানসপ্রতিমা গঠন করেন। তাই যে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ তিনি করতে পারেন প্রকৃতিতে কোথাও একত্রে সে সমাবেশ পাওয়া যায় না। সারা জীবন ধরে' যা তিনি কণায় কণায় আহরণ করে' এসেছেন ও তাঁর চৈতন্যের গুপ্ততম ভাণ্ডারে হয়ত তাঁর অজ্ঞাতেই সঞ্চিত করে' রেখেছেন এই কঠোর তপস্যার বলে তা' মুহূর্ত্তের মধ্যে এক মানসী প্রতিমার মূর্ত্তিতে সংহত হয়ে' যায়। জীবনে যা' বিচ্ছিন্ন ছিল তা' একত্রিত হয়, অস্তিত্বে যে প্রবাহ সহস্র ক্ষীণ ধারায় বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত ছিল তা' একই পবিত্র সঙ্গমে মিলিত হয়ে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতীরূপে অনন্তের উদ্দেশে কলনৃত্যে আনন্দময় অভিসারে বহির্গত হয়। শিল্পী যেমন আপনার মনের সকল শক্তি একত্রে সংযত করে' একটি মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন, তেমনই তাঁর বিষয়বস্তুরও অস্তিত্বের সকল ধারাও একই পথে প্রবাহিত করেন। সেজন্য তাঁর সৃষ্টি যে ভাবের দ্যোতক হয় তা' এতই শক্তিশালী বোধ হয়, আমাদের মনকে এত গভীর ভাবে আলোড়িত করতে পারে। সূর্য্যের যে তেজ চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাকেই অতসী কাচের ভিতর দিয়ে কেন্দ্রীভূত করলে তার দাহিকাশক্তি প্রতিভাত হয়। শিল্পীর প্রতিভা এই অতসী কাচের কাজ করে। শিল্পীর সৃষ্টি দেখলে তাই আমাদের মনে হয় যে এ সকলই ত আমাদের পরিচিত সাধারণ বস্তু,

কিন্তু সেগুলি যেন কোথায় একটা সৌন্দর্য্যের সুষমা মেখে এসেছে। যাঁকে আমরা কর্ম্মরতা আভরণহীনা মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মী বলে' জানতাম তিনিই যেন আজ কোন দৈব নির্ঝরে গাত্রমার্জ্জন করে অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছেন,—স্নিগ্ধ-নয়নার বিশাল লোচনে কজ্জলরেখা টেনে কে যেন বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ সঞ্চার করে দিয়েছে, তমোনিবিড় কুঞ্চিত কেশ-কলাপে কে যেন হীরার ফুল পরিয়ে দিয়েছে ও নীলবসনের বেষ্টনে তনুটিকে ভূষিত করে' সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী-মূর্ত্তিতে আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে এনে দিয়েছে। বিশ্বসংসারে সকল বস্তুই যে এত সুন্দর, এত আনন্দের প্রস্রবণ তা' যেন শিল্পীর চোখে দেখার পূর্ব্বে আমরা বুঝি নাই। বিশ্বের বিরাট জড় দেহটা নিয়ে যেন আমরা এতদিন বিরক্ত হচ্ছিলাম, আজ শিল্পী তার জীবনদেবতার সঙ্গের আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দিলেন, সকলের ভিতর প্রাণের স্পন্দন অনুভব করলাম ও চিরসুন্দরের যে অশ্রান্ত বন্দনা-ধ্বনি সৃষ্টির প্রতি রন্ধ্র থেকে নিয়ত ঊর্দ্ধে উঠছে তা' শুনতে পেয়ে আমাদের শ্রবণ পরিতৃপ্ত হ'য়ে গেল।

শিল্পী তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অন্তরদেবতার সন্ধান করে ফিরেন ও তাঁর সাক্ষাত পেলেই সে সৃষ্টির মধ্যে অমরতার মন্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু অন্তরদেবতা ত নানা মূর্ত্তিতে পূজার উপচার গ্রহণ করেন। রুদ্রের তাণ্ডবনৃত্যে দিগ্বিদিকে প্রলয়ের প্রভঞ্জন জেগে উঠে, বিশ্বসৃষ্টি টলমল করতে থাকে, আবার তুষার-শীতল কৈলাসের শুভ্রশিখরে সমাধিমগ্ন শিবের যোগাসন-তলে চপলা প্রকৃতি নতনেত্রে যুক্ত করে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শিল্পীর ধ্যাননেত্রে জীবন-দেবতা কোন মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন তা শিল্পীর মনের, শিল্পীর শক্তির ও তার সাধনার উপর নির্ভর করে। বিলাসিতায় শিথিলপেশী মধ্যযুগের ফ্লোরেন্সে অত্যাচর জর্জ্জরিত Michael Angeloর সরল ঋজু বিদ্রোহী মন দৃঢ়তা, দৃপ্ততেজ ও সুগভীর সংযমের সাধনা করত। তাই তাঁর সমাধিভাস্কর্য্যেও (যেমন Medici সমাধির উপর ক্ষোদিত নরনারী-মূর্ত্তিতে) কোথাও শোকের অবসাদ বা নিরাশার ক্লান্তি নাই। এমন কি হংসরূপী জুপিটারের আলিঙ্গনবদ্ধা প্রেমময়ী Ledaর চিত্রে প্রণয়বিহ্বলার গদ্‌গদ তন্ময়তা নাই,—যেন তেজস্বিনী দৃপ্তা রমণী প্রেমাস্পদকে

অনুগ্রহ বিতরণ করছেন। এই Leda চিত্রই অন্য শিল্পীর চোখে কিরূপ ভিন্ন ঠেকেছে তা' অন্য দুইজন প্রতিভাশালী শিল্পী Leonardo da Vinci ও Correggioকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায়। ভিঞ্চির Lada ব্রীড়ারক্ত-কপোলা নতনয়না সুন্দরী তরুণী। সুকুমার দেহযষ্টির রেখায় রেখায় সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ তুলে' লজ্জারুদ্ধগতি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন, হংসরূপী জুপিটার দুটি পক্ষ দিয়ে তাকে প্রায় মানব-প্রেমিকের মতই আলিঙ্গন করছেন, পাশে এই মিলনের প্রণয়গ্রন্থি যমজ সন্তানদুটির ঈষৎতীর্য্যক নয়নে একটু হংসের নয়নের আভাস দেখা যাচ্ছে, সকল মূর্ত্তিগুলির দেহের ভঙ্গীতে লীলায়িত রেখায় অপূর্ব্ব সুষমা ফুটে উঠেছে, সুকুমার মুখের ডৌলের ভিতর শিল্পী বুদ্ধিমত্তা ও ভাব-প্রবণতার অতি মনোরম সমাবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাচীন গ্রীকেরা মানব-মনের ও প্রাণীজগতের মধ্যে যে ভাবসাম্য বিশ্বাস করতেন তা' যেন প্রতিভাশালী শিল্পী আপন মনে অনুভব করেছিলেন। মিকেলাঞ্জেলোর জগতে মানুষ নিয়তই বিরুদ্ধ শক্তি সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করে, জয়ী হচ্ছে ; তা এই জগৎ থেকে কতই ভিন্ন। আবার করেজ্জোর জগৎ এ থেকে কত ভিন্ন। সেখানে জীবন-সংগ্রামের দুর্ব্বার রুক্ষতা নাই, বুদ্ধিবৃত্তির উজ্জ্বলতা নাই, ভোগের ভিতর সলজ্জ সংযমও নাই,—কিন্তু অপূর্ব্ব শালীনতা আছে, আত্মদানের মধ্যে তন্ময়তা আছে। জলকেলিরতা Ledaর সঙ্গে হংসরূপী জুপিটারের মিলন এখানে কেবল প্রেমিক প্রেমিকার মিলন নয়, এ যেন মূক প্রকৃতির একটা আনন্দাভিষেক। কচি কচি তরঙ্গগুলি চঞ্চল আগ্রহে Ledaর গণ্ডে উরসে বাহুমূলে সোহাগে ভেঙে পড়ছে, তীরতরুর নবপল্লবের হরিৎ ছায়াটি চঞ্চল জলে Ledaর সুবর্ণ কুন্তল, সুগঠিত স্তনাগ্রচূড়া আদরে মৃদু মৃদু স্পর্শ করছে, প্রোদ্ভিন্নযৌবনের প্রচুর স্বাস্থ্যেপূর্ণ নিটোল দেহের লাবণ্যের ভিতর দিয়ে বালারুণ-স্পর্শে প্রফুল্লনলিনীর গর্ভপত্রের সুকোমল বর্ণবিভা দেখা যাচ্ছে, স্মিতবদনে ঈষদ্ভিন্ন অধরের অবকাশে কুন্দদন্তের আভা প্রকাশ পাচ্ছে, Ledaর বিশাল লোচনে একটা প্রেমাবেশের মোহ গাঢ় হ'য়ে এসেছে ও তার সমস্ত দেহটি যেন আত্মদানের আগ্রহে অধীর হ'য়ে উঠেছে। এই চিত্রটিতে যেন আকাশ বাতাস বৃক্ষপল্লব তরঙ্গ মানুষ হংস সমস্তই একটা মত্ততায় মদন-যজ্ঞে আহুতি হ'য়ে উঠেছে। যে প্রতিভা নিয়ে

এই তিনজন শিল্পী জন্মেছিলেন, যে শিক্ষা তাঁরা জীবনে লাভ করেছিলেন ও যে আবেষ্টনের মধ্যে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল তা' স্বতন্ত্র বলে' একই বস্তু তিনজনের নয়নে এতই ভিন্ন বলে মনে হয়েছে। বাইবেল বর্ণিত উপাখ্যান অবলম্বন করে' ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে কত না চিত্রই আঁকা হয়েছে। কিন্তু সেগুলির মূল উপাখ্যান সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে তাদের সংখ্যা বিশ পঁচিশটির বেশী নয়। এইগুলিকে মূর্ত্তি দেবার সময় শিল্পী তাঁর আপন অন্তর হতে সম্পদ সংগ্রহ করে তাদের ভূষিত করেছেন ও তাঁদের অন্তরের সম্পদ যুগিয়েছে তাঁদের প্রতিভা, তাঁদের শিক্ষা ও তাঁদের আবেষ্টনের প্রভাব।

শিল্পী যখন তাঁর অন্তরের ভাণ্ডারে সম্পদ আহরণের জন্য যান তখন সেখানে যা সংগ্রহ করা আছে তাই আনতে পারেন। সেগুলিকে তিনি পরিবর্ত্তন করে' মার্জ্জিত করে, নানাভাবে সাজিয়ে সুন্দরের পূজার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেন, কিন্তু কোথাও নূতন উপাদান প্রস্তুত করতে পারেন না। যা নাই তার নূতন সৃষ্টি বোধহয় কেবল ভগবানই পারেন। শিল্পীর মনের ভাণ্ডারে নানা অবস্থায় আহৃত উপাদান থেকে যে সৃষ্টি তিনি করেন তার উপর তাঁর প্রতিভার ছাপ দিয়ে যান। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। শিল্পীর প্রতিভার আলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতম বস্তুও মনোরম বোধ হয়। মনে হয় যেন তাঁর প্রতিভার স্পর্শে আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে, আমাদের জীবনের তন্ত্রী যেন এতদিন বেসুরা বাজছিল, তিনি তাকে স্পর্শ করতেই তা' থেকে অপূর্ব্ব রাগিণী জেগে উঠেছে। আমাদের আপনার অন্তর থেকেই যে এই আনন্দময় রাগিণী উঠছে এতেই সুখানুভূতি আরও তীব্র বোধ হয়। যেখানে বিভিন্ন কণ্ঠের বেসুরা কোলাহলসমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খেয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছিলাম, সেই সমুদ্রের উপরই শিল্পী তাঁর কুহকদণ্ড সঞ্চালন করলেন, আর সমস্ত বিক্ষুব্ধ শব্দতরঙ্গ মুহূর্ত্তে শান্ত হ'য়ে গেল ও শুধু শোনা যেতে লাগল সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর বীণার স্বর্ণতন্ত্রীর মোহময় মূর্চ্ছনা। শুনলে মনে হয় এ সঙ্গীত ত আমরা এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু এত মিষ্ট ত লাগেনি। নানা বিসংবাদী স্বরের মধ্যে তা' যে হারিয়ে যাচ্ছিল, এমন করে

হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। এখন মনে হচ্ছে এই দূরশ্রুত সঙ্গীতের ক্ষীণ তীব্র আহ্বানে আমরা যুগযুগান্ত ধরে' জন্মমৃত্যুর সাগর সাঁতার দিয়ে আজ এই জীবনের কূলে এসে দাঁড়িয়েছি। আজ এই সুরের আবেশে আনন্দে অস্তিত্বের প্রতিরন্ধ্র পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সম্বিৎ যেন মূর্চ্ছার সৈকতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়ছে। হে শিল্পী, হে সুন্দরের পূজারি, এই বিরাটবিশ্বের প্রতি রোমকূপে প্রতি মুহূর্ত্তে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যশতদল বিকশিত হ'য়ে উঠছে তুমি তার মর্ম্মস্থলের মধুকোষ থেকে অমরমন্ত্রেপূত যে সুধাবিন্দু মানুষকে চিরকালের জন্য উপহার দিয়ে গেলে তার জন্য তোমায় নমস্কার।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পারিসে যত দিন থাকবার ইচ্ছা ছিল, তা হল না। কয়েক হপ্তা বাদ এক নিমন্ত্রণ পেলাম পশ্চিম ইংলণ্ড হতে। শ্বশুর-স্থানীয় গুরুজনের আমন্ত্রণ, না বলবার উপায় ছিল না। ছুটীর তখনও অনেক দিন বাকী, পারিসেও দেখবার অনেক কিছু বাকী। তবু, করি কি, তলপী-তলপা বেঁধে রওয়ানা হলাম। ইংরেজের রাজধানী এবার আরও একঘেয়ে নিরানন্দ লাগল। একে ত লণ্ডনের চেহারা চিরদিনই ঐ রকম, তায় আবার এই মৌস্থমে, শরৎকালে, শহর একেবারে খালী। সবাই গেছে বেড়াতে বেরিয়ে। যার নিতান্ত সঙ্গতি নেই, সেই শুধু পড়ে আছে।

দু দিন দুটো নাটক দেখে নিয়ে, তিন দিনের দিন বেরিয়ে পড়লাম পেডিংটন থেকে পশ্চিম মুখে। অনেক পথ অতিক্রম করে নামলাম গিয়ে সমারসেট জেলায় Minehead বলে এক ষ্টেশনে। এই মাইন্‌হেড অঞ্চলেরই চাষারা একদিন ধর্ম্মের নামে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন টলিয়ে দিয়েছিল। পারে নেই কিছু করতে শেষ পর্য্যন্ত। দলে দলে বেচারারা প্রাণ দিয়েছিল কসাই-জজ জেফ্রিসের হাতে। কিন্তু জগৎকে তারা দেখিয়ে দিয়ে গেছল যে ইংলণ্ড আর কোন দিন রোমের হুকুম-বরদারী করবে না। ষ্টুয়ার্ট রাজাদের তখনকার মত জয় হয়েছিল, কিন্তু কদিনের জন্য!

আর সত্যিই কেথলিক ধর্ম্ম ইংরেজচরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। আমার এক ঘর কেথলিক বন্ধু ছিলেন। তাঁদের যতই দেখতাম, ততই এটা বুঝতাম। তাঁদিকে কেমন মনে হত আধা-ইংরেজ! সাধারণ ইংরেজের চেয়ে তাদের ভাব ঢের বেশী cosmopolitan, উদার ছিল।

হপ্তাখানেক রইলাম আমরা Minehead-এর কাছে পোরলক্ বলে গ্রামে, এক মুচীর দোকানের উপর তলায়। ছোট্ট গ্রাম, চারিদিকে নীচু পাহাড় ও বন। এ দেশের একটা মস্ত সুবিধা যে বনগুলোতে ঝোপ-জঙ্গল মোটে নেই, অবাধে ঘুরে বেড়ান যায়। কোথায় ঘাসের ভেতর

থেকে গোখরো সাপ ফোঁস করে বেরিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াবে, কোথায় ঝোপের মধ্য হতে বন-বরা' দাঁত উঁচিয়ে তাড়া করবে, এ সবের ভয় নেই। বনের ভেতর সাধ মিটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাব্যচর্চ্চা করা যায়। এক চিত্রকর দম্পতির সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা গ্রাম থেকে বহু দূরে বনের মাঝখানে বাড়ী নিয়েছেন। চাকর-বাকর রাখেন নেই, রান্না-বাড়া নিজেরাই করেন। গ্রাম হতে এক বুড়ী দিনান্তে এক বার এসে হাঁড়ী-কুঁড়ি মেজে ঝাড়-পোঁছ করে দিয়ে যায়। আমাদিকে একদিন এঁরা চা খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। খুব আনন্দে সারা বিকেলটা কাটিয়ে আসা গেল। বসবার ঘরে প্রকাণ্ড সেকেলে খোলা আতশ-খানা। তাইতে গাছের মোটা মোটা ডাল জ্বলছে। সবাই তার চারিদিকে বস্‌লাম। মেম-সাহেব বড় বড় রুটীর চাকতী, মোটা-মোটা নোনা মাংসের ফালি, ডেভনের মালাই ও ভাপা দই, এন্তার খাওয়ালেন। এঁরা নব-পরিণীত, কিন্তু বয়স নিতান্ত কচি নয়। রোজ এগারটার মধ্যে রেঁধে খেয়ে বেরিয়ে পড়েন ছবি আঁকতে। পাঁচ ছয় ঘণ্টা ছবি এঁকে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফেরেন। একটু বিশ্রাম করে, চা, টোষ্ট, ডিম খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়েন। এবার এঁদের উদ্দেশ্য নিছক প্রেম-চর্চ্চা। বোধ হয়, দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘোরেন। হয়ত, বেড়াতে বেড়াতে কানে কানে কত কি বলেন! কে জানে! সে সব ত আর অভিনয় ক'রে আমাদিকে দেখালেন না। তবে বনে সব নিভৃত মনোরম স্থান আমাদিকে দেখাতে দেখাতে তাঁদের চোখে-চোখে যে বিজলী খেলছিল, তা কর্ত্তারা না দেখলেও আমার চোখ এড়ায় নেই। বাবুটির বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, গিন্নীর বছর পঁচিশ, অতএব আমার চোখে বুড়ো-বুড়ী। তাদের রকম-সকম দেখে একটু মনে-মনে হেসেছিলাম বই কি! বনের নানা সুন্দর স্থানের ছবি দুজনে এঁকেছেন। কত আনন্দে, কত উৎসাহে সে সব আমাদের দেখালেন। ছবি মন্দ নয় তবে তাঁদের কাছে অমূল্য। কেন না তাঁদের জীবনের মধুমাসের কতস্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ ছবির সঙ্গে।

পোরলকে সাত দিন মন্দ কাটল না। তবে তখনও পারিসের শোক ভুলতে পারি নেই। নূতন জায়গা লিণ্টনে পৌঁছে কিন্তু সব ভুলে গেলাম। চারিদিকে কি চমৎকার দৃশ্য! গ্রীষ্মকালে টেম্‌স্‌-তীরে যে সৌন্দর্য্য

দেখেছিলাম, তার সঙ্গে এর ঢের তফাৎ। এ সম্পূর্ণ আর এক রকমের জিনিস। ছোট বড় পাহাড়ে ঘেরা গ্রামখানি। অদূরে সমুদ্র। সমতল ভূমি প্রায় নেই। রাস্তা সব উঁচু-নীচু, ঢেউ খেলানো। কাছে বন নেই। রাস্তার দুধারে সবুজ ঘাস। সমুদ্রের ধারের পাহাড়টা একেবারে খাড়া তার গা কেটে তাকের মতন এক সরু বেড়াবার পথ তৈরী করেছে। এখানকার লোকে তার নাম দিয়েছে কার্ণিশ। সেই কার্ণিশের উপর বড় জোর তিনজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে। মাথার উপর নীল আসমান, পায়ের তলায় নীল দরিয়া, একা চলতে চলতে একটু যেন স্বপ্নের আমেজ আসে। কিন্তু ঠিক স্বপ্ন দেখার মত জায়গা নয়। খুব সাবধানে চলতে হয়। সারাক্ষণ একটা ঝড়ের মতন হাওয়া পাহাড়ের গায়ে ঝাপটা মারছে। একবার পা ফসকালেই আর হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কার্ণিশের এক দিকটা থেকে হাজার খানেক হাত নামলেই লিন-মাউথ বলে আরএক গ্রাম, জেলেদের বসতি। সামনে পোস্তা-বাঁধা। তার নীচে কাতার দিয়ে মেছো ডিঙ্গী সব নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঢেউয়ের উপর নাচছে। দুচারখানা ডিঙ্গী আবার বালির উপর টেনে তোলা রয়েছে। তাদের মেরামতি চলছে। জেলেগুলোর রঙ্গ রোদে পুড়ে, নোনা জলে ভিজে, মেহগিনির মতন হয়ে গেছে। আমি ত ক্রমাগত চারিদিকে, উপর নীচে, ঘুরে বেড়াতাম। এ অঞ্চলের জেলে চাষাভূসো, সকলের সঙ্গেই যেচে আলাপ করেছিলাম। তবে আলাপ বেশীদূর এগোতে পারে নেই, ভাষা বিভ্রাটের জন্য। এদের বাঙ্গাল ইংরেজী, আর আমার বাবু-ইংলিশ, এ দুয়ের সঙ্গৎ কিছুতেই জমত না। হাতি পা নাড়াই দুপক্ষের প্রধান সম্বল ছিল। হপ্তাখানেক পরে তাইতেই কাজ চলে যেত। লিনমাউথ থেকে খানিকটা হেঁটে গেলেই এক সুন্দর বন। কতকটা পোরলকের বনের মতই তবে তার চেয়ে আরও মনোরম। সেই বনের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে লিন্ নদী। নামেই নদী, কিন্তু সত্যি একটি পাগলী নির্ঝরিণী। কোথাও পাথর থেকে পাথরে লাফ মেরে মেরে ছুটেছে,কোথাও বা বাধা পেয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, আবার কোথাও বা পাথরগুলোকে পাশ কাটিয়ে কুলু-কুলু করে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলেছে।

ভারী চমৎকার দেখতে! এ বিলেত দেশটার মজাই এই। বন, পাহাড়, নদী, মায় সমুদ্র পর্য্যন্ত, সব যেন খেলা-ঘরের দৃশ্যপট! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটুও ভয় করে না। ভয় হয় বরং এখানকার বিশালকায় রক্তবদন মানুষগুলোকে দেখলে। কিন্তু তাদের কেবল বাহিরেটা ঐ রকম। অন্তর ছেলেমানুষের। আমাদের মতন এঁচড়ে-পাকা পদার্থ এ দেশে দুর্লভ।

ইংরেজদের খাওয়া-দাওয়া কতকটা আমাদের হিন্দুস্থানীদের মতন। মোটামেঠো স্বাস্থ্যকর খাবার খানিকটা পেটে পুরলেই হল। যাতে তাকৎ হয়। সে ভোজনের ভেতর সভ্যতা বা মার্জ্জিত রুচির চিহ্নমাত্রও আমার নজরে পড়ে নেই। পাঠককে ত বলেছি যে লিণ্টনে আমি শ্বশুর বাড়ীতে বাস করছিলাম। স্বতরাং ভোজনাদি জামাই আদরেই চলছিল। গ্রাউস্ নামে এক পক্ষী ঐ মৌসুমে সকল বড় লোকেই খায়। কর্ত্তা একদিন সেই উপাদেয় পদার্থ আমার জন্য ফরমায়েশ করলেন। খবর শুনে আমি খুব খানিকটা jog trot দৌড়ে খিদে বাড়িয়ে এলাম। খানায় বসে প্রথমে মামুলী স্বরুয়া, ও ময়দার কাইসংযুক্ত সিদ্ধ মাছ খাওয়া হল। আমি তখন অজানার প্রতীক্ষায় একটু উত্তেজিত। বাড়ীওয়ালী যখন ধূমায়মান এক বড় বারকোশ হাতে প্রবেশ করলে, তখন আমি মনের আবেগে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠলাম। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একটা উৎকট গন্ধ এসে আমার নাকে ঢুকল। আমি বসে পড়লাম। কর্ত্তা একটু হেসে বললেন, "Hallo, dont you like the flavour? কি, হে গন্ধ কেমন লাগছে? ঐ ত তোমার গ্রাউস্। খেয়ে দেখ কি চমৎকার!" আমি তখন মর্ম্মাহত। এত আশায় ছাই পড়ল! আস্তে আস্তে নিবেদন করলাম, "আমাকে ক্ষমা করতে হবে। ও জিনিস মুখে দিলে ভারী মুস্কিল হবে।" পেটের তখনও খিদে মেটে নেই বটে, কিন্তু ঐ flavour খাই কি ক'রে! কর্ত্তা রাগ করলেন। নিজেও মুখে দিলেন না। বাড়ীওয়ালীকে বললেন, "নিয়ে যাও। তোমরা খাও গিয়ে।" গোটা বারো টাকা নষ্ট হল। পরে শুনলাম যে পক্ষীটি পনের দিন আগে নিহত হয়েছিল, আর ঐ রকম এক পক্ষের বাসি না হলে ও মাংসের স্বাদ ঠিক হয় না। মগেরা ঞাপি খায় বলে তাদের এত নিন্দা!

লিণ্টন অঞ্চলে তখনকার দিনে রেল ছিল না। পোরলক্ থেকে কতকটা হেঁটে আর কতকটা ফেটিন গাড়ী চেপে এসেছিলাম। ফেরবার সময় বার্ণষ্টেপলে ট্রেন ধরলাম। ষ্টেশন পর্য্যন্ত চৌদ্দ মাইল পথ এক প্রকাণ্ড মান্ধাতার আমলের ষ্টেজকোচে গেলাম। চার ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড়ার পিঠে postillion সহিস, লোক সরাবার জন্য থেকে থেকে একটা লম্বা শিঙ্গা ফুঁক্‌ছে, বেশ মজার লাগল। তবে পথে Robin Hood কি Dick Turpinএর সাক্ষাৎ না মিললে ষ্টেজ-কোচের পুরো মজাটা পাওয়া যায় কি !

এবার লণ্ডনে ফিরে আমার হষ্টেলজীবনের শৃঙ্খল খসল। ব্যাপারটা সহজে সংঘটিত হয় নেই। বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, বিশেষতঃ আমার মাষ্টার মহাশয় রেন্‌কে নিয়ে। তবে কর্ত্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত মানলেন যে আমি সাবালক হয়েছি, আমাকে আলাদা বাসা করে থাকতে দেওয়া যেতে পারে।

শৃঙ্খল খসল বলেই পাঠক যেন মনে করবেন না যে আমার জীবনটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেল। তা হয় নেই। তবে কতকটা বিশৃঙ্খল যে হল, তা নিশ্চিত। ক'মাস লণ্ডনে সাহেব-সংসর্গেই দিন কাটছিল। খাওয়া-দাওয়া, ঘোরা-ফেরা, গল্প-গুজব, সবেতেই তাঁরা প্রধান সাথী ছিলেন। মাঝে মাঝে আমার স্বদেশী গুরুজন-স্থানীয়াদের বাড়ীতে উৎপাত ক'রে আসতাম, এই পর্য্যন্ত। কিছুদিনের জন্য, পরীক্ষা পাশ করব বলে একটা উৎসাহও মনে এসেছিল। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে সব উলটে গেল। সমবয়স্ক স্বদেশী বন্ধুবান্ধব অনেক মিলল। তাঁদের কেউ কেউ আমার মতন সিবিল-সার্ব্বিসের উমেদার ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশেরই লেখাপড়ার বিশেষ বালাই ছিল না। তখনকার দিনে বার পরীক্ষার জন্য ত পড়াশুনার আবশ্যক ছিল না। আমার এই বন্ধুমণ্ডলীর কেউ কেউ গত হয়েছেন, কেউ কেউ বা আছেন। তাঁরা সবাই আমাকে এত স্নেহ করতেন, যে একবার তাঁদের নাম করে স্নেহাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা হবার নয়। আমি নানান্‌কথা লিখতে বসেছি। বৃদ্ধ বয়সে কারও নাম ক'রে কাজ নেই।

আমাদের নানাস্থানে নানা রকমের আড্ডা জমত। কোথাও বা তাস-পাশা চলত, কোথাও বা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা, কোথাও বা ভারত-উদ্ধার। বিলেতে ছাত্রজীবনে সুন্দরী-সন্ধান যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনই ব্যয়-সাপেক্ষ। আমার অর্থাভাব ছিল না, বিপদকেও ডরাতাম বলে মনে নেই। তবু একটা সেকেলে'ব্রাহ্ম কুসংস্কার সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা সম্বন্ধে আমাকে কেমন অন্ধ করে রেখেছিল। যাক্, তাতে কিছু লোকসান হয় নেই।

তরুণ বয়সে মানুষ যেটা যথার্থ চায়, সেটা excitement, উত্তেজনা। তাস খেলাতে দু পাঁচ টাকা হেরে-জিতে সেটা না পাওয়া গেলেও ভারত-উদ্ধারের কাজে তার অপ্রতুল ছিল না। তবে পাঠক হয়ত হেসে জিজ্ঞাসা করবেন, বিলেতে সাহেব সেজে আড্ডা দিয়ে দুঃখিনী জননীর কোন্ দুঃখটা মোচন করছিলে? এ কথার আমি উত্তর দেব না। আমাদের সেই বয়সের পাগলামির কথা মনে করে নিজেই যে কম হাসি, তা নয়। তবে কি জানেন, পাগলের কাণ্ড দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়, কিন্তু রাগ ত হয় না! যারা সে সময় লণ্ডন-ময় প্রকাশ্য সভা ও গুপ্ত মন্ত্রণা করে বেড়াতেন, তাঁদের অনেকেই পরের জীবনে যথেষ্ট কীর্ত্তি সঞ্চয় করেছেন। তাঁদিকে নগণ্য জ্যাটাছেলে ব'লে আবর্জ্জনাস্তূপে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া যায় না। এই ছিল আমার বন্ধুমণ্ডলী। আজ আমি সরকারী মানুষ। রাষ্ট্রনীতি আলোচনা করা আমার পক্ষে অশোভন। তবে দু চারটে গল্প না করলে আবার পুরানো কথা লেখকের কর্ত্তব্য-পালন হবে না।

পরীক্ষা পাশ করার কয়েক সপ্তাহ পরে আমরা জনাকয়েক ভারত-সচীব মহাশয়ের দপ্তর থেকে এক পত্র পেয়েছিলাম, এই মর্ম্মে—যদিচ আপনি এখনও সিবিল-সার্ব্বিসের কর্ম্মচারী নহেন, তথাপি সরকারী চাকরের রাষ্ট্রনীতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করা সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী আছে, তাহা আপনি পালন করিতে বাধ্য।

একখণ্ড নিয়মাবলীও এসেছিল চিঠির সঙ্গে। তাগীদ-সত্ত্বেও যে নিয়ম মেনে চলি নেই, এ খবর আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। ধূম দেখেছিলাম বই কি! এ সব অনেক পরের কথা, এখন মুলতুবী থাক্।

আমি হস্টেল ছেড়ে প্রথম উঠলাম এক বোর্ডিং হাউসে। সেখানে বেশী দিন টি঳কতে পারলাম না। যে সব লোকের সঙ্গে সেখানে রোজ বসতে, খেতে হত, তারা ঠিক আমাদের gentry জাতের ছিল না। পাঠক ত জানেন উনিশ শতকে জাতিভেদ কি রকম প্রবল ছিল। কার্ল মার্কসের দুন্দুভি তখনও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় নেই।

একটা বাজে গল্প বলি এই বোর্ডিং হাউসের। বাড়ীওয়ালীর একটি বছর ষোলর মেয়ে ছিল, ভারী দুষ্টু। সে আমাদের সকলের বড় প্রিয়পাত্রী ছিল। ষোল বছরের মেয়েকে সেকালে বিলেতে ত আর কেউ স্ত্রীলোক মনে করত না! আমরা Q-কে পোষা বাঁদরটির মতনই দেখতাম। ইতিমধ্যে এক মজা হল। দেশ থেকে X নামে আমার এক বন্ধু এসে সেই বাড়ীতে উঠলেন। সে ভদ্রলোক এই মেয়েটার দিকে সোজা চাইতে পারতেন না। কখনও গায়ে গা ঠেকলে বিব্রত হয়ে উঠতেন। মুখ কান লাল হয়ে যেত। মাঝে মাঝে আড় চোখে তার দিকে চাইতেও ছাড়তেন না। অথচ আমরা মেয়েটাকে ঠেলা ঠেলি ধাক্কাধাক্কি করলে বিরক্তিও প্রকাশ করতেন। একদিন গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, "মশায়, দেশে যখন চিঠি লিখবেন, Q-এর কথা কিছু লিখবেন না যেন। আমার দাদার কানে যদি কোন রকমে যায় তাহলেই হয়েছে! ষোল বছরের তরুণীর সঙ্গে এক বাড়ীতে আছি জানলে কেলেঙ্কারের শেষ থাকবে না।"

Q তরুণী শুনে আমার খুব হাসি পেলে। কিন্তু সেই বাড়ীর আর আর এক বাসিন্দা Z, সেখানে বসেছিলেন, তিনি চটে আগুন হয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, "হতভাগা! এ সব লোক বিলেতে কেন যে আসে, জানি না! থাম, দেখে নিচ্ছি ওকে।"

সন্ধ্যাবেলায় এক বাক্স চকোলেট কিনে নিয়ে এসে Z আমাকে বললেন, "ওহে মেয়েটাকে একবার ডাকত!" Q এলে পর তাকে বললেন, "বাঁদরী এক কাজ করিস্ ত তোকে এই চকোলেট দেব।" "সবটা?" "হ্যাঁ, সবটা।" "আচ্ছা কি করতে হবে, বল।" "আজ খানার পর সকলে আমরা যখন বিলিয়ার্ড ঘরে বসব, তুই আচম্‌কা গিয়ে X-এর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করবি, আর বলবি—আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি। পারবি?" মেয়েটা

আস্ত বাঁদরী। দর-দস্তুর আরম্ভ করে দিলে। আমাকে বললে, “তুমিও যদি এক বাক্স মেঠাই দাও, ত করব। নইলে পারব না। মার কাছে কানমলা খেতে হবে। আর—মাগো, যে চেহারা!” কি করি, আমি কবুল হলাম। ফলে খানার পর সকলে যখন বিলিয়ার্ড ঘরে জমায়েত হয়েছি, তখন Q বন্ধুবরকে আক্রমণ করে বেশ থিয়েটারী ঢঙ্গে প্রেম নিবেদন করলে। বন্ধুর মুখে কথা সরল না। কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিলেন। Q মার কাছে দু'চারটে কানমলা ঠিক খেলে। রাত্রে Z আর আমি X-এর দরজায় দাঁড়িয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করলাম। তিনি খিল খুললেন না। সকালবেলা নাগাদ কিন্তু ভদ্রলোক নিজকে বেশ সামলে নিলেন। চায়ের টেবিলে সবাইকে খুব হেসে “গুড্ মর্ণিং” বললেন যেন কিছুই হয় নেই। তার পর বিকেলে Q-কে এক বড় বাক্স টফী কিনে এনে দিলেন।

X ঠিক normal হিন্দুর ছেলে ছিলেন, তা আমি বলছি না। তবে গল্পটা থেকে ইংরেজ মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের যে সব অদ্ভুত নীচ ধারণা ছিল (?) তার আঁচ পাওয়া যায় বই কি! সে যাইহোক X মহাশয়ের পুরো সাহেব হতে বেশী সময় লাগল না।

এই বোর্ডিংহাউস থেকে উঠে আমি নিজের বাসা করলাম। অর্থাৎ একেবারে স্বাধীনতার ধ্বজা ওড়ালাম। আর অন্য লোকের সঙ্গে খেতেও হত না, বসতেও হত না। আড্ডা আরও বেশী জমতে লাগল। পাঠকের মনে থাকতে পারে যে ১৮৯৭ সালে দেশে নানা রকম বিভ্রাট ঘটেছিল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, প্লেগ, খুনোখুনি, কিছুই বাকী ছিলনা। এই সব ব্যাপারে প্রবাসে আমাদের মন বড় বিচলিত হয়ে উঠেছিল। দিবা রাত্র এই জটলা চলত যে আমাদেরই পাপে এই সব হচ্ছে। সেই বছর আবার রাণী বিক্টোরীয়ার জুবিলী উৎসব। কথা হল যে লণ্ডন ভারতসভা দেশের তরফ হতে মহারাণীকে একটা মানপত্র দেবেন, আর আঞ্জুমান মুসলিমের তরফ হতে আর একটা দেবেন। সীমান্তে পাঠানদের উপর অত্যাচার হয়েছে, এই অজুহতে মুসলমান মানপত্র সহজেই নাকচ করা গেল। কিন্তু ভারত সভায় দেশপূজ্য দাদাভাই আমাদের আমলই দিলেন না। আমরা সভায় রীতিমত একটা খুব শোরগোল করে বেরিয়ে এলাম। আমাদের উদ্দেশ্য

এতেই সফল হল, কেননা পরের দিন টাইম্‌স্‌ থেকে আরম্ভ করে সব খবরের কাগজেই লিখলে যে ভারতের তরুণ দল আর ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। এর পর আমরা নানা প্রকাশ্য সভায় বিনা-নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসনীতি-সম্বন্ধে আমাদের মতামত জাহির করতে লাগলাম। আমাদের কার্য্যক্রম কতকটা বে-আইনী ছিল বই কি! হঠাৎ সুযোগ বুঝে আমাদের দলের কোন নেতা দাঁড়িয়ে উঠে দুচার কথায় আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করলেই আমরা হাল্লা করে দল বেঁধে বেরিয়ে আসতাম। এই সব ব্যাপারে মহাত্মা দাদাভাই যে আমাদের উপর সত্যি অসন্তুষ্ট হতেন তা আমরা মনে করতাম না। তবে তিনি কংগ্রেস দলের কর্ত্তা, আর কংগ্রেসের ধর্ম্ম ত ছিল ভিক্ষাবৃত্তি, তাই প্রকাশ্যে তিনি আমাদের কোন আস্কারা দিতেন না। একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলাম। আমাদের সমস্ত বক্তব্য তিনি শুনলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা আমাদের মতন দুটি অর্ব্বাচীন বালককে নিয়ে তিনি কাটালেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও হাসলেন না, ঠাট্টা করলেন না। আমরা মোহিত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। এটা স্থির বুঝে এলাম যে তিনি যথার্থ সারা ভারতের নেতা, একা কংগ্রেসের নয়।

দাদাভাই এই সময়টা অত্যন্ত গরীবানা ভাবে কাটাচ্ছিলেন। দূর শহরতলীতে একখানা ছোট্ট ঘর নিয়ে থাকতেন। ঘরে আসবাবপত্রও নিতান্ত সাদা-সিধে। একটি সরু লোহার খাট, ছোট একটি লেখার টেবিল, খানদুই অতি সাধারণ কেদারা। চারিদিকে গাদা গাদা বই, কতক তাকের উপর, কতক ভুঁইয়ে পড়ে। খাটের পাশে দেওয়ালে ঝুলছে পিজ-বোর্ড কাগজে অাঁটা একখানা ব্যঙ্গ-চিত্র। নাম, "কালা আদমী কে?" বিলেতের প্রধান মন্ত্রী সল্‌স্‌বেরী গায়ের জ্বালায় দাদাভাইকে black man বলেছিলেন। সেই উপলক্ষে এই চিত্র একখানা বিলেতী কাগজে বেরিয়েছিল। চিত্র দেখে কারও সন্দেহ থাকে না যে দাদাভাই মন্ত্রী মহাশয়ের চেয়ে অনেক ফরসা।

আমরা নবভারত সভা বলে এক সমিতি করেছিলাম। ফি শনিবারে কারও না কারও বাসায় বৈঠক জমত। সমিতির কাজ-সম্বন্ধে কোন ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ছিল না। বিজ্ঞাপনাদি খোলা পোষ্টকার্ডেই যেত। তী

ছাড়া, অল্পদিনের মধ্যেই ভারতসচীবের একজন এল্‌চী এসে সমিতিতে দাখিল হলেন। তিনি কি আর বলেছিলেন যে তিনি সরকারী আদমী! বরং ভারতজননীর জন্য আমাদের চেয়েও বেশী ফুঁফিয়ে কাঁদতেন। তবে ভাবগতিকে বোঝা গেল যে তিনি আমাদের মতন বোকা নন, সমিতি করে দু পয়সা রোজগার করছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বয়সের যোগ্যই ছিল, অর্থাৎ বেজায় গরম। আমাদের দুই একজন মুরুব্বীর নাম করলেই পাঠক আন্দাজ করতে পারবেন যে কত গরম। হাতকাটা ফিনিয়ান মাইকেল ডেভিট্, যিনি সেই সবে দশটি বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছিলেন, সোশিয়ালিষ্টদের বড় কর্ত্তা হাইণ্ডম্যান, মজুরদলের দুর্দ্দান্ত নেতা টম্ ম্যান্ এঁরাই আমাদের সলা-পরামর্শ দিতেন। নবভারতের দল ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। গরম ভাবনা ও গরম বাক্য (কার্য্য ছিলই না, গরম কি ঠাণ্ডা!) আমাদের বয়সের লোকের বেশ ভালই লাগত। ক্রমশঃ দেখা গেল যে অনেকে শনিবার সন্ধ্যায় অন্য ভালমন্দ আমোদ উত্তেজনা ছেড়ে দিয়ে আমাদের বৈঠকে আসতে আরম্ভ করলে।

একদিন ডেভিট্ আমাদের দুই একজন দলপতির কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। সেই প্রস্তাব মত কাজ হলে ভারতের রাজনীতির একটু তফাৎ হত বই কি! ডেভিট্ বললেন, "আমাদের আইরিশ দলের অর্থাভাব। তোমরা যদি বছরে আট লক্ষ টাকা নগদ দাও, ত তোমাদিকে আয়র্লণ্ডের আট্‌টা seat, মেম্বরের জায়গা দিতে পারি। বিলেতসংক্রান্ত সব বিষয়ে তোমাদের আট জনকে আইরিশ নেতার হুকুম মাফিক ভোট দিতে হবে, আর ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ে আইরিশ দল তোমাদের তরফে ভোট দেবে। রেডমণ্ডের সঙ্গে কথা কয়েছি। আমি তাঁকে রাজী করতে পারব। তোমরা কংগ্রেসের কর্ত্তাদের বলে টাকাটার ব্যবস্থা কর।" এ কথায় কিন্তু দাদাভাই কানই দিলেন না। বললেন, "ও রকম কূটনীতিতে ভারতের উপকার হবে না।" বোধ হয় অভদ্রও বলেছিলেন। তখন বিক্টোরীয় ইংলণ্ডের ভব্যতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকেছে কি না!

একবার আমরা নওরোজী সাহেবকে খুব জোর জবরদস্তি করাতে তিনি প্রকাশ্য সভায় সরকারকে কড়া কড়া দু কথা শোনাতে রাজী হলেন। বেশ

জোর রকম একটা মন্তব্যের খসড়া হল। আমরা মহা উৎসাহে কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। ইংরেজ সাধারণের মনে বেশ একটু উত্তেজনা দেখা গেল। কিন্তু হঠাৎ আগের দিন আমাদের কানে এল যে একজন খুব সিনিয়ার ছাত্র মিঃ নওরোজীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে সভায় বক্তৃতা করবেন। তখন আর কিছু করবার সময় নেই। লোকটাকে দরকার হলে তুলে রাস্তায় ফেলে দিতে হবে, এই স্থির করে পরদিন আমরা চোখ পাকাতে পাকাতে সভায় গিয়ে বসলাম। আমরা ভব্যতার ধার ধারতাম না। এই আমাদের একটা বড় গর্ব্বের বিষয় ছিল। দাদাভাই যখন রায়কে ডেকে পাঠালেন, আমরা ভাবলাম একটা কিছু রফার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা আরও গরম হয়ে উঠতে লাগলাম। একটু পরে রায় একখানা কাগজ এনে আমাদের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, "এইটে M-এর Amendment, দাদাভাই বলছেন যে এতে তোমাদের অন্ততঃ কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।" পড়ে দেখি Amendment-টা আসল মন্তব্যের চেয়েও বেশী কড়া। আমরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম। একজন ছাত্র বিশ্বাসঘাত করবে, এ চিন্তা আমাদের অসহ্য হয়েছিল। M খুব জোর বক্তৃতা করলেন। বোম্বাই বন্দর ও বষ্টন বন্দরের নাম করে সরকারের উদ্দেশে যে সব কথা বললেন, তা আজকের দিনে বলা চলে না। খুব হৈ হৈ করে মিটিং ভঙ্গ হল।

যথাকালে এই সভার খবর দেশে পৌঁছল। বোম্বাই ও কলকাতার প্রবীণ মহারথীরা বড় বিচলিত হলেন। বৃদ্ধ দাদাভাই কতকগুলো বাপে-তাড়ান মায়ে-খেদান ছোঁড়ার পাল্লায় পড়ে কংগ্রেসের চিরন্তন নীতির মাথায় মুগুর মারবেন! এ তাঁরা কেমন করে সহ্য করবেন? দু পাঁচখানা কাগজে বের হল, যে বৃদ্ধ দাদাভাইয়ের ভীমরতি ধরেছে, তাঁর আর কাণ্ডা-কাণ্ড জ্ঞান নেই। আমরা শুনে আগুন হয়ে উঠলাম। এত বড় আস্পর্দ্ধা! একমাত্র স্বার্থত্যাগী দেশনেতা নওরোজী, তাঁকে কি না এই সব কথা বলে! আর বলে কে, যত স্বার্থসর্ব্বস্ব পেট-মোটা উকীল বাবুরা। আমাদের দুই একজন তৎক্ষণাৎ দেশে ফিরে গিয়ে practical steps নেওয়ার কথা উত্থাপন করলেন। কিন্তু হঠাৎ কর্ম্মবীর হওয়ার মত উদ্যম আমাদের কারও বোধ হয় ছিল না। শেষ, অনেক পরামর্শের পর স্থির হল যে আমরা দাদা-

ভাইয়ের এক শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি করিয়ে দেশে পাঠাব। খবর নিয়ে জানা গেল যে প্রায় তিনশো পাউণ্ড লাগবে। অত টাকা আমরা কোথায় পাব! আমাদের একশো পাউণ্ড জমল। তাই নিয়ে ওয়েডারবার্ণ সাহেবের কাছে দুই একজন গেলেন। এই সাহেব একজন যথার্থ ভারতবন্ধু ছিলেন, আর দাদাভাইকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমাদের সবরকমে সাহায্য করবেন বললেন, কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালেন দাদাভাই নিজে। তিনি বললেন, "আমার মূর্ত্তির সাধ হয়, ত মুখের একটা কথা খসালেই ত আমার বন্ধু তাতা কাল একটা মূর্ত্তি খাড়া করে দেবেন। তোমরা গরীব ছাত্র, আমার বন্ধু, তোমাদের পয়সা আমি কেন নেব!" আমরা প্রস্তাব করলাম যে আমরা সারা ভারতময় চার চার আনা চাঁদা সংগ্রহ করে টাকা তুলব। তাতে ত কোন আপত্তি থাকতে পারে না! ওয়েডারবর্ণ এই প্রস্তাবে দাদাভাইকে রাজী করালেন। তখন আমরা ভারতের সর্ব্বত্র কংগ্রেস আপিসে চিঠি পাঠালাম যে আমাদের একশো পাউণ্ড তৈয়ের আছে তাঁরা সকলে চেষ্টা করে আর দুশো পাউণ্ড তুলে দিন; সকলে দেখুক যে, দাদাভাই আমাদের বিশ্বস্ত নেতা। সুরেন-বাবু ও গোখলে আমাদের পত্রের একটা করে উড়ো রকমের জবাব দিলেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখলেন, "এ প্রকার কার্য্যের সহিত আমার এখন কোনও সম্পর্ক নাই।" তিনি তখন হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। বাকী ছোট বড় নেতারা কেউ রা কাড়লেন না। আমাদের রাগও হল, দুঃখও হল। একজন বন্ধু বললেন, "দেশ এখনও জানে না, আমরা কে! একদিন চিনবে।" কথাটা বেশ শোনাল। কিন্তু আমাদের চেনা অতিসহজ। আমারা সেই চিরদিনের সোনার পাথরবাটি!

এই সব ঝড় তুফানের মাঝে আমার I. C. S. তরীখানা প্রায় তলিয়ে গেছল, আর কি! কিন্তু হাল ছিল শক্ত হাতে, তাই শেষ পর্য্যন্ত কূল-কিনারা মিলল। তবে আমারা তরী কূলে লেগে মঙ্গল হল কি না, কে জানে!

পরীক্ষার বছর খানেক আগে কলেজ ঝেড়ে ফেলে দিলাম। রেন্ আমার মতন ভবঘুরের মাঝে কি দেখেছিলেন, জানি না। আমাকে এক বছর অর্দ্ধেক মাইনেতে রাখতে চাইলেন। বললেন, "আমার টাকা মারা

যাবে না। সে ভয় আমার নেই। পাশ হয়ে দেশে ফিরে বাকী টাকাটা দিও।"

আমি বোঝালাম, "মহাশয় আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়ত হয়ে উঠবে না। আপনি কেন মিছেমিছি টাকা নষ্ট করবেন। আমি পলিটিক্সে ঢুকব মনে করছি।"

সাহেব বললেন, "পলিটিক্স্ ত বেশ ভাল career (পেশা)। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধিও একটু-আধটু আছে। কিন্তু তোমাদের দেশে ত পার্লামেণ্ট নেই, সেখানে কি পলিটিক্স করবে?"

আমি চেপে গেলাম। কি হবে পাগলের খেয়াল সব বুড়োকে বলে! শেষ বৃদ্ধের সঙ্গে এক রফা করলাম! আমি অন্য কোন কলেজে যাব না, আর যদি পাশ হই ত তিনি আমাকে তাঁর ছাত্র বলে দাবী করতে পারবেন। আমি এত গোলমালেও পড়াশুনো বন্ধ করি নেই। তবে পড়াটা দাঁড়িয়ে গেছল একটা গৌণ কাজ। আর নানা রকমের ধান্দাবাজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখ্য কাজ। সাতানব্বই সালটা এই ভাবেই কাটল।

এই সালে পূজার সময় আমি স্থইস্ দেশে বেড়াতে গেছলাম। কয়েক সপ্তাহ জেনিভায় কেটেছিল। যে ক্ষুদ্র হোটেলে থাকতাম, সেখানে ইংরেজ সমাগম বড় একটা ছিল না। আমি তাই মনের সাধে দিবারাত্র নবভারত পলিটিক্স্ আওড়াতাম। কতকগুলি নানা দেশের ভবঘুরে শ্রোতাও জুটেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা খুব বক্তৃতা করছি, ইংলণ্ড সম্বন্ধে দুই একটা অভদ্র কথাও বলেছি, এমন সময় এক প্রকাণ্ড যণ্ডামার্ক লালমুখো ইংরেজ কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল। আস্তে আস্তে আমার কাঁধে হাত রেখে সে বললে, "মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে। বাহিরে বাগানে আসবেন কি?" বলে বেরিয়ে গেল।

আমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। মনে হল, আমার জীবনে একটা মস্ত শুভ মুহূর্ত্ত এসেছে। এক বছর থেকে আমি কিরীচ খেলা শিখছিলাম। পিস্তলও চলন-সই রকম মারতে পারতাম। বড় সাধ ছিল যে continent-এ দুই একটা duel লড়ব। এত দিন মোকা মেলে নেই। আজ বিধি মুখ তুলে চেয়েছেন! কাছে বসেছিল এক ফরাসী বন্ধু। তার পিঠ জোরে-

চাপড়ে বললাম, "ভাই, আমার সেকেণ্ড হবি ত?" সে হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, "mais oui, mon ami, নিশ্চয় হব। কিন্তু ইংরেজ লড়বে না।"

আমি বাহিরে যেতেই ইংরেজ ভদ্রলোকটি একটু হেসে বললেন, "বলুন, মশায়। আচ্ছা, আপনি এই হতভাগা বিদেশীগুলোর নিন্দা করেন কেন, বলুন দেখি!"

আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম। খুব নাটুকে ঢঙ্গে বললাম, আমি ইংরেজ নই, ইংলণ্ডের নিন্দা কেন করব না! আমি সত্য কথাই বলে থাকি, মিথ্যা নয়। তার প্রমাণ চান ত দিতে পারি।"

ইংরেজ তখন হাসছে। বললে, "হলেই বা সত্য! নিজেদের ঘরের কথা কি অপরকে বলতে আছে? পার্লামেণ্টে জানালে নিশ্চয় প্রতীকার হবে।"

আমি দু পা এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, "যে আসামী, তাকেই বিচারক করতে আমি প্রস্তুত নই। কিন্তু তর্ক বিতর্ক বৃথা। আপনি পিস্তল ছুড়তে পারেন?"

লোকটা হো হো করে হেসে উঠল, "ওহো! তোমার ফন্দী এতক্ষণে বুঝেছি। তুমি আমাকে duel লড়াতে চাও! আমি লড়ব না। সাফ বলে দিচ্ছি মশায়, লড়ব না।" তার পর সে আমাকে টেনে পাশে বসালে। বসিয়ে বললে, "দেখ, তুমিও তর্ক করবে না। আমিও লড়ব না। ব'স, দুজনে গল্প গুজব করা যাক্।"

ধীরে ধীরে আমার বীররস উবে গেল। সাহেব বাস্তবিক চমৎকার লোক! এক ঘণ্টা দুজনে গল্প করলাম। উঠবার সময় সে বললে, "বন্ধু, সে দিন এখনও আসে নেই। এখন থেকে রাগারাগি করে কি হবে! তবে বিনা যুদ্ধে আমরা ভারতবর্ষ ছাড়ব না, এটা নিশ্চিত।"

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

কামিনী রায়

আট বছর বয়সে কবিতারচনা সুরু এক কামিনীরায় ছাড়া বোধ হয় আর কেউ করেন নাই—পশ্চিমের Hemans, Elizabeth Barret, Cowley'ও না, আমাদের রবীন্দ্রনাথও না। নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্র শিশু-রবি তাঁর মাষ্টার মশায়ের কবিতার পাদপূরণ ক'রে দিতেন এবং মাষ্টারমশায়ের দ্বিপদ ছাত্রের হাতে চতুষ্পদতা লাভ ক'রে সুন্দরতরই হ'য়ে উঠ্‌তো। কিন্তু তাঁর রীতিমতন কবিতারচনা আরম্ভ হয় দশের পরে, তবে পনরোর আগে এবং ছাপার অক্ষরে প্রথম কবিতার বই (কবিকাহিনী) বেরোয়, মনে হয়, আঠারো শ আশী সালের কাছাকাছি। কামিনীরায়ের 'আলো ও ছায়া' বেরিয়েছিল উননব্বইএ অর্থাৎ বিশ্বকবির 'মানসী'র বছরখানেক আগে। 'আলো ও ছায়া' সঙ্কলন, 'কবিকাহিনী'র মতন একটা বড়ো কবিতা নয়।

কামিনীরায়ের সৃষ্টি অতি সঙ্কীর্ণ না হ'লেও সীমাবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের মতন বিপুল নয়। তবু দুটি কবি পাশাপাশিই চল্‌ছিলেন।

রবীন্দ্রকাব্য দেশকালের সীমা অতিক্রম ক'রে বিশ্বের বস্তু হ'য়ে উঠ্‌লো; ইউরোপ তার কণ্ঠে জয়মালা পরিয়ে দিলে। দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে বাঙলায় রবির গ্রহ-উপগ্রহ জে'গে উঠ্‌লো (আজও তা'র বিরাম নেই)। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রযুগ ব'লে একটা বিরাট যুগের নামকরণ হ'লো—যে নামকরণের আমি চিরবিরোধী; কারণ, ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে Age ব'ল্‌তে যা' বোঝায়, রবীন্দ্রযুগের 'যুগে' তা'র কোনো সার্থকতা আছে ব'লে মনে করি না। ব্যক্তিবিশেষকে যুগ আখ্যা দেওয়া যদি সঙ্গত হয়, রবীন্দ্রযুগের হয়তো অর্থ হ'তে পারে।—এতো সত্ত্বেও কামিনীরায় তাঁর পথে চল্‌তে লাগ্‌লেন একা,—নিঃসম্পর্ক একটি জ্যোতিষ্কের মতন। 'আলো ও ছায়া'র ভিতর দিয়ে তাঁর প্রথম যাত্রা যে ভাবে সুরু হ'লো, অনেক পরের 'দীপ ও ধূপ'-এর আলো-ছায়ায় তা'র রূপান্তর দে'খ্‌লাম না। রবির আলোক-পরিধির বাইরেই রইলো কামিনীর অয়নচক্র।

সত্যকার কবিরা কবি হ'য়েই জন্মগ্রহণ করেন; ওঁদের মানুফ্যাক্‌চার্ করা যায় না, যদিচ তার চেষ্টা হয় না এমন কথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ

হবে—ইংলণ্ডে ফ্যাক্‌টরি রয়েছে Poetry Society। কামিনীরায় জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন কবিপ্রতিভা। তিনি ছিলেন আবার সাহিত্যিকের কন্যা। তখনকার দিনে চণ্ডীচরণ সেনের নাম সাহিত্য-রসিকদের সুপরিচিত। কামিনীকাব্যের যখন অঙ্কুররূপ, এদেশে মধু হেম নবীন তখন কাব্যলোকের অধিদেবতা। এই তিনজনের, বিশেষ ক'রে হেম নবীনের কাছে কবি কামিনীর যে দীক্ষা হয়েছিল একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যে'তে পারে। কাব্যের ভাবরূপ তথা দেহরূপ দুদিকেই তাঁর হেম নবীনের কাছে বিপুল ঋণ। এক-দিকে তাঁর পিতা, আর একদিকে বাঙলার আধুনিক কাব্যসাহিত্যের যুগস্রষ্টা এই কবিরা তাঁর প্রতিভার যাত্রাপথের পাথেয় জুগিয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ, নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক'—'কুরুক্ষেত্র'—'প্রভাস'—এর ভিতর দিয়ে গীতার অভিনব ব্যাখ্যা—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভক্তিনিষ্ঠ, প্রেমনিষ্ঠ, সেবাব্রত কামিনীকাব্যে মিলিত রূপ পেয়েছে। সকলের মূলে চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের নির্ভীক চিন্তা—ক্ষীণসংস্কার মনের উদার চিন্তা শৈশব হ'তেই কন্যাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পিতৃপ্রভাবের সঙ্গে মণিকাঞ্চনযোগের মতন যুক্ত হয়েছিল কামিনীর উচ্চাঙ্গের পাশ্চাত্য শিক্ষা—তিনি গ্র্যাজুয়েট্ ছিলেন। এই বি-এ পাশ করার মধ্যেও একটু বৈচিত্র্য ছিল—সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি অনার্স পেয়েছিলেন।

সর্ব্বোপরি সেই যুগ—কবি যখন জ'ন্মেছিলেন, জন্মিয়েই যা'র বায়ু-প্রবাহ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গ্রহণ ক'র্‌তে সুরু করেছিলেন, সেই যুগ—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথম অংশ। 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ ক'রেছে, খরস্রোত স্তিমিত হ'য়ে এ'সেছে, অথচ আজকের এই অতি আধুনিক বা উৎ-আধুনিক উৎকটতার দূর পায়ের ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে না। ফ্যাশনের নামে দুর্নীতির চটুল লীলা অনেকটা মন্থর হ'য়ে এ'সেছে এবং বাঙালীজীবনের এক অংশে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মনীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। ওদিকে হিন্দুধর্ম্ম হাঁচিটিকটিকির বহিরাবরণ অপসারিত ক'রে গড্-আল্লা-কৃষ্ণ-খৃষ্টকে আপন গণ্ডীর ভিতর মিলিয়ে দিয়ে নিজের সর্ব্বব্যাপকতা এবং সনাতনত্ব প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। এমনতর একটা যুগ, যখন কামিনী-রায় জন্মগ্রহণ কর্‌লেন। যুগধর্ম্মের প্রভাব তাঁর প্রাণপ্রবাহে স্পন্দিত হ'য়ে

অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেল। যুগধর্ম্ম, পিতৃচরিত্র, আপনার শিক্ষা, যুগধর্ম্মের প্রতীক কবিদের কাব্য, সব তাঁর প্রতিভার আধারে সুসমঞ্জ পরিপাক পেয়ে তাঁর কাব্যসৃষ্টির ভিতর রূপায়িত হ'তে লা'গলো।

এই সকলের সঙ্গে একথাটা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে তিনি নারী ছিলেন—যাঁদের হৃদয়টা মস্তিষ্কের চেয়ে অনুপাতে বেশী তাঁদেরই একজন। তাঁর এই নারীহৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পন্দন তাঁর সৃষ্টির সর্ব্বত্রই অনুভব ক'রেছি।

কামিনীরায়ের কাব্যের এ একটা পরম বৈশিষ্ট্য যে তাঁর সত্যকার অনুভবের সঙ্গে প্রকাশের লুকোচুরি খেলা নেই। দুনিয়ায় এমন কবির অভাব নেই যাঁরা মনে যা' ভাবেন, কাব্যে তার প্রকাশ থাকে না এবং কাব্যে যা'র প্রকাশ হয়, তাঁদের জীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আন্তরিকতার এই অভাব ভাবীকালে,—যখন কবিপরিচিতি হবে গৌণ এবং কাব্যই হবে মুখ্য সেই সুদূর ভাবীকালে পাঠককে পীড়া না দিতে পারে; কিন্তু এই জাতীয় কবিদের সমকালিক বা প্রায়সমকালিক যা'রা, ব'ল্‌তেই হবে তা'রা অভিশপ্ত।

কামিনীরায়ের কাব্য ছন্দে বিচিত্র না হ'তে পারে, ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় সূক্ষ্ম সুন্দর না হ'তে পারে, রসের দিক দিয়ে ততো গভীর না হ'তে পারে—পারে কেন, বটেও—তবু কবির পরিপূর্ণ আন্তরিকতা তা'কে মধুর ক'রে তুলেছে, উপভোগ্য ক'রে তুলেছে।

তাঁর কাব্যের ভিতর প্রায় আদ্যন্তই একটা সুর লক্ষ্য ক'রেছি—Pessimism ঠিক নয়, কেমন যেন অস্বস্তির ভাব। আনন্দের গানও যেখানে তিনি গাইতে চে'য়েছেন, সেখানেও কেমন যেন একটা ক্লান্তির, একটা অবসাদের মূর্চ্ছনা বে'জে উঠেছে। জানি জীবনে তিনি অনেক আঘাত স'য়েছিলেন, বসুন্ধরা তাঁর কাছে ঠিক শান্তিনিকেতন ছিল না। ব্যক্তিগত স্পর্শই তাঁর সৃষ্টির ওপর এক মায়াময়ী ছায়ার আস্তরণ ফে'লেছিল। 'মায়াময়ী' বল্‌লাম এই জন্য যে ও'তে তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য্য তথা মাধুর্য্য বে'ড়েই গিয়েছে। এখানেও কিন্তু তাঁর প্রতিভার সম্মান ক'র্‌তেই হবে। আত্মগত স্পর্শ যেখানে কবির কাব্যকে অনুরঞ্জিত ক'রে আত্মগতত্বের সীমা লঙ্ঘন করে অর্থাৎ দরদীমাত্রেরই হৃদয়ের ধন হ'য়ে ওঠে, সেখানে সে দোষ

না হ'য়ে গুণই হ'য়ে দাঁড়ায়। এক কথায়, শিল্প যেখানে আপনরূপে আপনি সম্পূর্ণ এবং শিল্পী তা'র অন্তস্তলে সুপ্রচ্ছন্ন, শিল্প এবং শিল্পী দুইই সেখানে সার্থক। কামিনীকাব্যে এ-লক্ষণ পেয়েছি। এর বিপরীত লক্ষণ হেমচন্দ্রের অনেক কবিতাকে কাব্যলোকে প্রবেশাধিকার দেয় নাই। সত্য মিথ্যা জানি না—শুনেছি রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'য় এমনি নাকি একটা স্পর্শ আছে। থাকে ভালোই। আমাদের কাছে 'খেয়া' আত্মসম্পূর্ণ পরম কাব্য।

আজকের সাহিত্যবিচারের অতি সূক্ষ্ম মানদণ্ডে কামিনীকাব্যের ওজন যা-ই হো'ক্, তখনকার দিনে তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। নামকরা কবি তখন কেউ ছিলেন না ব'লেই কামিনীরায় যে 'এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে' হ'য়ে উঠেছিলেন এবং সে যুগের বাঙালীর সাহিত্যবিচারবোধের অতি স্থূলতার সুযোগ নিয়েই যে তিনি অনাসৃষ্টি সৃষ্টি ক'রে চ'লেছিলেন,—এমনতর নিষ্কুণ্ঠ রায়প্রকাশই বা কেমন ক'রে করি? তাঁর সৃষ্টির খ্যাতিসত্ত্বেও তা'র অনুসরণ-করণ, বা-রণন বড়ো কেউ ক'রেছে ব'লে মনে করি না। আপনাকে বহুর ভিতর বহুরূপে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয় নাই। তবু, তিনি যে কবি একথা মান্‌তেই হবে। প্রতিভার পরিমাণ সকলের মধ্যে এক নয় —না হওয়াই স্বাভাবিক। তবু, সূর্য্যের চেয়ে কম হ'লেও তারারও যে দীপ্তি আছে একথা তো স্বীকার না ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ব'ল্‌তে হবে যে চন্দ্রের ধারকরা দীপ্তির চেয়ে তারার দীপ্তির মর্য্যাদা বেশী।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'

গতবারের 'পরিচয়ে' চার্ব্বাকমতের বিবৃতি করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছিলাম, নাস্তিকেরা প্রায়ই জড়বাদী। জড়বাদের মতে এই বিচিত্র বিশাল বিশ্ব জড়-শক্তিতাড়িত অন্ধ পরমাণুপুঞ্জের যদৃচ্ছাজাত সংঘাত মাত্র—যাহাকে 'fortuitous concourse of atoms' বলে। জড়-বাদী বলেন ভূত ও ভৌতিক শক্তি—Matter ও Blind Forceই জগদ্-রচনার পক্ষে পর্য্যাপ্ত—এমন কি, জড়বাদী জড়ের মধ্যেই জীবনের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা দর্শন করেন—sees in Matter the promise and potency of Life (Tyndall)। তিনি আরও বলেন—'Life and Mind are merely by-products of the world process'—'প্রাণ ও চিত্ত এই বিশ্ব-ব্যাপারের অবান্তর ঘটনা মাত্র।

জড়বাদী দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে চৈতন্য 'মদশক্তিবৎ'—জড় অণু-পরমাণুর chemical reaction বা রাসায়নিক পরিস্পন্দ মাত্র। সেই জন্য শরীরের নাশের সহিত চৈতন্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। অতএব 'Survival of Man' কপোলকল্পনা। আর চিন্তা (Thought)? চিন্তা ত' মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র—Thought is a function of the brain। যেমন যকৃৎ পিত্ত নিঃসরণ করে, তেমনি মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিঃসৃত হয়—'As the liver secretes bile so the brain secretes thought'। অতএব ভাবনা কামনা চেষ্টনা (Thinking, Feeling, Willing)—এ সমস্তই মস্তিষ্কের স্পন্দন মাত্র (vibrations of the brain-cells)।

বুদ্ধ-মতের আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি জড়বাদের ঐ সকল নাস্তিক্য-বিজৃম্ভণার আদৌ অনুমোদন করেন না। যেহেতু, তিনি জড়বাদী নন, অধ্যাত্মবাদী—Materialist নন, Idealist। তাঁহার শিক্ষা এই—ছ-ধাতুরো অয়ং ভিক্‌খু! পুরিসো তি খো পণিতং বুত্তং—এই পুরুষ ছয় ধাতু গঠিত (I have said a man is six-elemented)।

কিঞ্চ এতং পটিচ্চ বুত্তং? পঠবী-ধাতু, আপো-ধাতু, তেজো-ধাতু বায়ো-ধাতু, আকাস-ধাতু, বিঞ্ঞান-ধাতু—মজ্‌ঝিমনিকায় (ধাতুবিভঙ্গসুত্ত)

'কি কি ধাতু-গঠিত ? পৃথিবীধাতু, অপ্ধাতু, তেজঃধাতু, বায়ু-ধাতু, আকাশ-ধাতু, এবং বিজ্ঞান-ধাতু'। প্রত্যেক ধাতুর দ্বি-বিধ প্রকাশ—বাহ্য ও আন্তর, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ Universal and Individual—পঠিবী-ধাতু সিয়া (স্যাৎ) অজ্ঝত্তিকা (আধ্যাত্মিক), সিয়া বাহিরা। এইরূপ প্রত্যেক ধাতু সম্বন্ধেই। 'বাহির' (external) যে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—ঐ পঞ্চভূতের ভগ্নাংশ (fragments) পিণ্ডীভূত (পটিচ্চ বুত্তং) হইয়া—appropriated ও individualised হইয়া আমাদের শরীর রচনা করে। বুদ্ধদেবের ভাষায় ঐ 'আধ্যাত্মিক' (individualised) পঞ্চভূতের সংঘাতজনিত দেহের নাম 'সক্কায়' (.সৎকায়) বা নামরূপ। কিন্তু 'পুরুষ' ঐ সক্কায় মাত্র নহে—পুরুষ=সক্কায়+বিজ্ঞান ধাতুর 'আধ্যাত্মিক' খণ্ড (individualised fragment), অর্থাৎ সমষ্টি-বিজ্ঞানের ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক স্বীকৃত ব্যষ্টি-বিজ্ঞান। অতএব মস্তিষ্ক সম্বিতের জনক হইতে পারে না—'Thought can not be a function of the brain'। ঐ বিজ্ঞানধাতু সম্পর্কে:বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, বিঞ্ঞাণং অনিদ্দসনং অনন্তং সর্ব্বতোপহং—It is invisible, boundless, all penetrating. (Digha-Nikya XI) অর্থাৎ 'অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ (গীতা)। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান—যাহা দেহের সহিত যুক্ত হইয়া 'পুরুষ' বা জীব রচনা করে—is the individualised aspect of the universal বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই জীবের Essence এবং ঐ Essence লোকোত্তর (ultra mundane)। (George Grimm's The Doctrine of the Buddha p. 134 দ্রষ্টব্য).

এ প্রসঙ্গে Charlotte Woods তাঁহার 'Self and its Problems গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

> Individual consciousness is the adaptation to specific purposes by the body as an organ of action, of the flow of the Universal Consciousness.

অর্থাৎ দেহ যন্ত্র, যন্ত্রী নয়—যন্ত্রী ঐ 'আধ্যাত্মিক' লোকোত্তর বিজ্ঞান। ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া 'What is Buddhism' গ্রন্থের গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

The pure white radiance of the universally diffused eternal world-soul (অর্থাৎ সেই 'বাহির' বিজ্ঞান ধাতু, which is invisible, boundless, all-penetrating) is broken by the prism of the human body into the differentiated entities we call men (পুরুষ), page 61।

এ মত কি জড়বাদের সম্পূর্ণ বিপরীত নহে ? যে বুদ্ধদেব শুধু Matter নয়, invisible, boundless, all-penetrating Spirit—শুধু পঞ্চভূত নয়, বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত ব্যাপক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রচার করিলেন—সে বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই জড়বাদী নাস্তিক নন, তিনি বিজ্ঞানবাদী আস্তিক।

এমন কি পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা তাঁহার মত বিকৃত করিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিক বারক্লির (Berkley) মতের পূর্ব্বরূপ নিপট বিজ্ঞানবাদ (Pure Idealism) প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাকে মাধ্যমিক বৌদ্ধমত বলে। এ মতে ম্যাটার এবং তৎসঙ্গে বাহ্যজগৎ (external world) একেবারে প্রত্যাখ্যাত হয়।

কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমা পুনঃ

—বিবেকবিলাস

'মাধ্যমিকেরা আত্মস্থ বিজ্ঞান (সম্বিৎ) ভিন্ন অন্য কোন সত্তা স্বীকার করে না।'

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে ঐ মত নিরাস প্রসঙ্গে এইরূপে উহার বিবৃতি করিয়াছেন ঃ—

ন হি বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থঃ অস্তি * * স্বপ্নাদিবচ্চ ইদং দ্রষ্টব্যম্। যথাহি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাদি প্রত্যয়া কিনৈব বাহ্যেন অর্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারা ভবন্তি; জাগরিত-গোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া ভবিতুম্ অর্হন্তি ইত্যবগম্যতে। * * কথং পুনরসতি ব্যাহার্থে প্রত্যয়-বৈচিত্র্যম্ উপপদ্যতে বাসনা-বৈচিত্র্যাৎ ইত্যাহ। অনাদৌ হি সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ বিজ্ঞানানাং বাসনানাং চ অন্যোন্য নিমিত্তনৈমিত্তিক-ভাবেন বৈচিত্র্যং ন বিপ্রতিষিধ্যতে--২।২।২৮ সূত্রের ভাষ্য।

"বিজ্ঞান (idea)-ব্যতিরিক্ত বাহ্যার্থ (external world) কোন কিছু নাই। স্বপ্নানুভূতির ন্যায় ইহা বুঝিতে হইবে। স্বপ্ন, মায়া (illusion), মরীচিকা (mirage) প্রভৃতিতে যেমন বাহ্য বস্তু ব্যতিরেকেও জল, জন্তু, গন্ধর্ব্বপুরী প্রভৃতির প্রতীতি হয়, জাগরিত অবস্থাতেও সেইরূপ বাহ্য বস্তু না থাকা সত্ত্বেও স্তম্ভাদির প্রত্যয় হইয়া থাকে। আপত্তি হইতে পারে, বাহ্যবস্তুর অভাবে প্রত্যয়ের বৈচিত্র্য কিরূপে সিদ্ধ হয়? উত্তর—বাসনা (সংস্কার)-বৈচিত্র্য হইতে। সংসার যখন অনাদি, তখন বিজ্ঞান হইতে বাসনা এবং ঐ বাসনা হইতে বিজ্ঞান—এই অন্যোন্যসাপেক্ষ কারণ-কার্য্য-ভাব সিদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। বীজাঙ্কুর ইহার দৃষ্টান্ত—বীজ হইতে বৃক্ষ—পুনরায় বৃক্ষ হইতে বীজ ইত্যাদি।"

বুদ্ধদেব এইরূপ 'আত্যন্তিক' (extremist) ছিলেন না। তাঁহার দর্শনে বিজ্ঞান-ধাতুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী-ধাতু প্রভৃতির অর্থাৎ বাহ্যার্থেরও যথাযথ স্থান আছে।

বুদ্ধদেবের বিপক্ষে এ আপত্তিও শুনা যায় যে, তাঁহার সম্মত যে বিজ্ঞান তাহা ক্ষণিক বিজ্ঞান—তিনি কোনরূপ শাশ্বত সত্তা মানিতেন না অর্থাৎ বুদ্ধদেব উচ্ছেদবাদী বৈনাশিক (Nihilist) ছিলেন—তাঁহার মতে, অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্ (গীতা)। এ আপত্তি একেবারে ভিত্তিহীন। বুদ্ধদেব নিজমুখে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্‌খবে! ভিক্‌খুং সেন্দা দেবা সব্রহ্মকা স-প্রজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি ইদং নিস্‌সিতং তথাগতস্স বিঞ্‌ঞাণং তি। তং কিস্‌স হেতু? দিট্‌ঠে বাহং ভিক্‌খবে! ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জোতি বদামি। এবং বাদিনং খো মং ভিক্‌খবে! এবং অভ্যাখ্যিং একে সমণব্রাহ্মণা—অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্‌ভাচিক্‌খন্তি (impeach)—'বেনসিকো সমণো গোতমো সতো সত্তন উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং (nullification) পঞ্‌ঞাপেতি তি।

যথা বাহং ভিক্‌খবে ন, যথা চায়ং ন বদামি, তথা মং তে ভান্তো সমণব্রাহ্মণা অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্ভাচিক্‌খন্তি।—মজ্ঝিমনিকায়, ২২ সুত্ত।

'হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ বিমুক্তচিত্ত—ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি বা অন্য দেবতা কেহই সেই তথাগতের বিজ্ঞানের (consciousness-এর) নিশ্রয় (বা প্রতিষ্ঠার) অন্বেষণ পান না। কেন? যেহেতু (আমি বলি) সেই তথাগত এখানে এবং এখনিই (here and now) অননুবেদ্য (untraceable)। ভিক্ষুগণ! এইরূপ বলার জন্য, এইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসত্যভাবে, তুচ্ছভাবে, মিথ্যাভাবে, অভূতভাবে (wrongly, erroneously, falsely, untruly) আমার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করেন যে 'এই শ্রমণ গৌতম বৈনাশিক, ইনি সৎ বস্তুর উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব প্রচার করেন।' আমি যাহা নই, আমি যাহা বলি না—হে ভিক্ষুগণ! এই সকল ভান্ত (good) শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অসত্যভাবে তুচ্ছভাবে মিথ্যাভাবে অভূতভাবে আমাকে সেইরূপ অভিযোগ করেন।'

ইহার পরও কি বুদ্ধদেবকে বৈনাশিক (নাস্তিত্ববাদী) বলিব? কিন্তু এ সম্পর্কে কেবল বুদ্ধদেবের অস্বীকৃতির (Disclaimer-এর) উপর নির্ভর করা অনাবশ্যক। তিনি স্বমুখে শিষ্যগণকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, বুদ্ধদেব এক অজাত অভূত অকৃত অসংখত (unborn, uncreate, unbecome, unevolved) অর্থাৎ শাশ্বত নিত্য সত্তার বিদ্যমানতা অঙ্গীকার করিতেন—যে সত্তার অস্তিত্বের উপর এই জাত, ভূত, কৃত, সংখত বিশ্বের অস্তিত্ব

(the springing-out of what is born, has become, is created and evolved) নির্ভর করিতেছে। ঐ সত্তা অজ্ঞেয় অমেয় অবাচ্য অনির্দ্দেশ্য। ঐ সত্তা ক্ষিতি নয়, অপ্ নয়, তেজ নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয়, বিজ্ঞান নয়—কিঞ্চন নয়, অকিঞ্চন নয়, সৎ নয়, অসৎ নয়—ইহলোক নয়, পরলোক নয়—চন্দ্র সূর্য্য কিছুই নয়। উহার গতি নাই, আগতি নাই, স্থিতি নাই, চ্যুতি নাই, উৎপত্তি নাই, বিলয় নাই। ঐ সত্তা অপ্রবৃত্ত, অনাধার, অনারম্ভ—উহাই দুঃখস্য অন্তঃ।

অত্থি ভিক্খবে! অজাতং অব্ভূতং অকতং অসংখতং। নো চে তং ভিক্খবে! অভবিস্সং অজাতং অব্ভূতং অকতং অসংখতং, ন ইদ্ জাতস্স ভূতস্স্ কতস্স সংখতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়েথ। যস্মা চ খো ভিক্খবে! অত্থি অজাতং অব্ভূতং অকতং অসংখতং তস্মা জাতস্স ভূতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়েতি তি।

অত্থি ভিক্খবে! তদ্ আয়তনং যত্ত ন য়েব পঠবী ন আপো ন তেজো ন বায়ো ন আকাসানং চায়তনং ন বিঞ্ঞানানং চায়তনং ন অকিঞ্চন্নায়তনং ন নেব সন্না নাসন্নায়তনং, নায়ং লোকো ন পরলোকো উভো চন্দিমা সুরিয়ো। তদ্ অহং ভিক্খবে! ন এব আগতিং বেদামি ন গতিং ন থিতিং ন চুতিং ন উপপাতিং। অপ্পতিবৈং অপ্পবত্তং অনারম্ভনং এব তং। এস এব অন্তো দুক্খস্সেতি

—উদান, ৮।১, ৩ *

---

* ইহার অনুবাদ এই :—

There is, O Bhikkus, that which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved. Unless, O Bhikkus, there were that which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved—there could not be cognised here the springing-out of what is born, has become, is created and evolved. And surely because, O Bhikkhus ! there is that, which is unborn, has not become, is uncreate and unevolved—therefore is cognisable the out-springing of what is born, has bocome, is created and evolved. (Translation in Light from East p. 57).

There is yonder realm, where neither earth is, nor water, neither fire nor air, neither the boundless realm of space nor the boundless realm of consciousness, neither this world nor another, neither moon nor sun. This I call neither coming nor going nor standing, neither origination nor annihilation. Without support, without beginning, without foundation is this. The same is the end of suffering, (Translation in Grimm's The Doctrine of the Buddha, p. 518.)

ঐ অদ্ভুত আজব সত্তাকে বুদ্ধদেব 'শূন্য' বলিয়াছেন—সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো (ধম্মপদ)। সেই জন্য 'শূন্যবাদী' বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিক অপবাদ। কিন্তু তাঁহার প্রতিপাদ্য শূন্য কি ?

যথাস্থানে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আমরা প্রতিপন্ন করিব যে, বেদান্তের যাহা ব্রহ্ম, বুদ্ধদেবের পরিভাষায় তাঁহার নাম শূন্য—কারণ, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে যিনি পূর্ণ (plenum)—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং—নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (vacuum)—নেতি নেতি—অথাত আদেশো নেতি নেতি। সেই জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত 'সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ—

'যিনি শূন্যবাদীর শূন্য, তিনিই ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম।'

উপনিষদেও এই শূন্যভাব সাধনের উপদেশ আছে—

শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ—অমৃত, ১১। শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ—মৈত্রী, ২।৪

অতএব শূন্যবাদী বলিয়া বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলা সঙ্গত নয়।

জড়বাদীরা প্রায়শঃ দৃষ্টবাদী (Positivists)—যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর নহে, তাঁহারা এমন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের নিকট ঐ Sense-perceptionই সর্ব্বস্ব। তাঁহারা প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর বুদ্ধির (Intellect-এর) সাহায্যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া অনুমান দ্বারা জ্ঞানসৌধ রচনা করিতে প্রয়াসী। অর্থাৎ তাঁহারা Rationalists—এ দেশে যাহাদের হেতুবাদী বলে। বুদ্ধির উপর যে বোধি আছে—Intellect-এর উপর যে Intuition আছে—বোধের উপর যে প্রতিবোধ আছে, এ কথা তাঁহারা জানেন না; এবং চর্ম্মচক্ষুর পশ্চাতে যে দৈবচক্ষুঃ আছে, আধিভৌতিক ইন্দ্রিয়ের পরে যে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় আছে, 'সন্নিকর্ষ'-জনিত জ্ঞানের ঊর্দ্ধে যে 'প্রাতিভ' জ্ঞান সম্ভবপর—এ কথা তাঁহারা মানেন না। বুদ্ধদেবের নিকট কিন্তু 'The unseen things are more'—দৃষ্টের অপেক্ষা অ-দৃষ্ট বৃহত্তর ছিল। তিনি চর্ম্মচক্ষুর পশ্চাতে দৈব চক্ষুঃ মানিতেন (যাহাকে তিনি the pure,

the superhuman celestial seeing বলিয়াছেন)। মজ্ঝিম নিকায়ের একস্থলে তিনি সারিপুত্রকে বলিতেছেন—

And, Sariputta, penetrating the heart and mind of a certain person I perceive: 'this person so acts, so conducts himself, follows such a course, he will come to the hell world'; and after a time, with the pure, the superhuman celestial seeing, I behold that person descend upon that sorry journey towards loss, I see him in the hell world in utter anguish.—Majjhima Nikaya, I, p. 37.

শুধু তাই নহে—তাঁহার শিক্ষা এই যে, ঐ দিব্য চক্ষুঃ সাধন দ্বারা উন্মীলিত হইলে, আমরা জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিতে পারি—

By developing the 'pure, super-human, celestial eye' we may gain an immediate perception of our existences before our birth and of the vanishing and reappearing of the other creatures. (Grimm's Doctrine of the Buddha, p 99.)

With heart thus stedfast, thus clarified and purified, clean and cleansed of things impure, the Bikkhu can call to mind his divers existences in the past—a single birth, then two, then three * * * a hundred thousand births in their details and features. Just as a man who has passed from his own village to a second and then to a third and finally back to his own village, might think how in his absence from home, he had visited these other villages and how in each he had stood, sat, spoken, been silent—in just the same way does the Bikkhu call to mind his former existences * * * his divers existences of the past in all their details and features.—মজ্ঝিম নিকায়, 39th discourse.

অবশ্য ঐ জ্ঞাননেত্রের ('eye of knowledge')-উন্মেষ বহু সাধনা সাপেক্ষ—তজ্জন্য নিয়ম সংযম করিতে হয়, কামনা বাসনার সংকোচ করিতে হয়, অহংকার-মমকার বর্জ্জন করিতে হয়—এক কথায় বুদ্ধদেব যাহাকে 'সমথ' (complete tranquility of the mind) বলেন, সেই 'সমথ' অভ্যাস করিতে হয়।

According to the Buddha, by eliminating all and every motion of will, such a complete tranquility of the mind—Samatha—must be produced, that 'thoughts about me and mine' no more arise, and on the other hand the utmost energy in perception must be produced—if the 'eye of knowledge' is to open.—Grimm. p 23

বুদ্ধদেব ঐরূপ 'সমথ' সাধন করিয়াছিলেন, ঐরূপ আত্মজয়ী হইয়াছিলেন—তাঁহার উন্মীলিত জ্ঞাননেত্রের নিকট কেবল পূর্ব্ব জন্ম ও পরলোক নয়, সমস্ত অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জগৎ ও ঐ ঐ জগতের 'অরূপ' প্রাণী, করকলিত কুবলয়বৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছিল। জাতিস্মর হইয়া তিনি যেমন জন্মান্তরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেন (বৌদ্ধেরা যাহাকে জাতক বলেন, ঐ সকল জাতক তাঁহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ মাত্র), সেইরূপ দৈবচক্ষুর দ্বারা, কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক—এমন কি আরও ঊর্দ্ধতন, সূক্ষ্মতম 'the highest worlds of light' * (যাহাকে উপনিষদে মহর্লোক, ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে)—সে সমস্ত লোকও 'দর্শন' করিতেন। কারণ, তিনি দ্রষ্টা (seer), ঋষি (ঋষ্-দর্শনে) ছিলেন—সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে—সত্য তাঁহার নিকট পরোক্ষ বিশ্রুতিমাত্র (hearsay) ছিল না—ইতি শুশ্রুমঃ ধীরাণাম্ নহে—কিন্তু অপরোক্ষ সংদৃষ্টি (Insight)-ভুক্ত ব্যাপার ছিল—বেদাহম্ এতম্—অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্—He could react to the vision of Reality। তিনি যে প্রেত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কামদেব, রূপদেব, অরূপদেব, আভাস্বর দেব, মার, ইন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্মা প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন, ঐ সকল তাঁহার প্রত্যক্ষলব্ধ দৃষ্টবিষয় ছিল—শ্রুত মাত্র নহে——'Things seen are mightier than things heard'.

ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি
—ধর্ম্মপদ, লোকবগ্‌গো

গচ্ছে দেবান সন্তিকে—কোধ বগ্‌গো

পীতিভক্‌খা ভবিস্‌সাম দেবা আভাস্বরা যথা—সুখবগ্‌গো

---

* To the heaven worlds I came now and again, to the form-worlds (রূপলোক), to the formless worlds (অরূপলোক), to the realm of neither perception nor non-perception.—Theragatha V, 258-9.

Up to the highest worlds of the gods, every existence becomes annihilated * * The 33 gods and the yama-gods, the satisfied gods, the gods who delight in fashioning, the gods who control pleasures fashioned by others, they all, bound by the fetters of desire, return into the power of Mara.—সংযুক্ত নিকায় I. p. 133.

যস্স গতিং ন জানন্তি দেবা গন্ধব্ব-মানুসাঃ
—ব্রাহ্মণ বগ্‌গো
অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেষ্ঠতং গতো
—ধম্মপদ, অপ্পমাদ বগ্‌গো
দেবা পি তং পসংসন্তি ব্রহ্মুণাপি পসংসিতো
—কোধ বগ্‌গো
নেব দেবো ন গন্ধবো ন মারো সহ ব্রহ্মুণা
—সহস্স বগ্‌গো

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্‌খুং সেন্দা দেবা সব্রহ্মকা স-পজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি —মজ্ঝিমনিকায়, ২২ সুত্ত

তেবিজ্জ সুত্তে দেখিতে পাই বুদ্ধদেব বেদবিদ্যাভিমানী বাসিষ্ঠকে বলিতেছেন ঃ—

"হে বাসিষ্ঠ! আমি তথাগত; আমাকে কেহ যদি ব্রহ্মলোকের কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি ঐ লোকের কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি—কোন্ পথে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়, তাহাও বলিতে পারি। আমি ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মলোকও জানি"

যাঁহার এই দৃষ্টি, এই অনুভূতি, তিনি Positivist (দৃষ্টবাদী) হইবেন কিরূপে? আর যিনি 'বোধি-সত্ত্ব' 'সংবুদ্ধ'—বোধি-সম্বোধির (Intuitionএর) উচ্চ ভূমিকায় অধিরূঢ়—আর্য্য-সত্য সমুদয় (যাহা বুদ্ধি-গ্রাহ্য নহে, বোধিলভ্য)* যাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতির আয়ত্ত—তিনি বুদ্ধিমাত্র-সার হেতুবাদী (Rationalist) বা হইবেন কিরূপে?

অপরোক্ষ অনুভূতি ও পরোক্ষ বিশ্রুতির ভেদ প্রদর্শন করিবার জন্য বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে এই আখ্যায়িকাটি বলিতেন ঃ—দুই বন্ধু ভ্রমণে বহির্গত হইয়া একবার এক প্রান্তরে উপনীত হইল—সম্মুখে দেখিল এক গিরিচূড়া। একবন্ধু চূড়ায় উঠিয়া দেখিল ওপারে এক মনোরম উদ্যান, এক সুরম্য কানন,

* Ultimate Realities from which the Intellect with its feeble rushlight recoils baffled—অচিন্ত্যাঃখলু যে ভাবা ন তান্ তর্কেন যোজয়েৎ—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ—but are accessible to the potent illumination of the Intuition.

এক স্বচ্ছ সরোবর। অপরকে এ সংবাদ দিলে, সে অবিশ্বাস করিয়া বলিল—'অসম্ভব! এ কখনও হয়'। সেই দ্রষ্টা বন্ধু তখন শ্রোতা বন্ধুকে চূড়ার উপর লইয়া গেল এবং সেই মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া বলিল 'বন্ধু! কি দেখিলে?' সে বলিল—'ওপারে এক মনোরম উদ্যান, এক সুরম্য কানন, এক স্বচ্ছ সরোবর।' তখন প্রথম বন্ধু বলিল—'কেন বন্ধু? এই যে বলিলে 'অসম্ভব! এ কখনও হয়? এখন সুর বদল কর কেন?' সে বলিল—'বন্ধু! তখন ত' দেখি নাই—শুনিয়াছিলাম মাত্র'—So long, dearest one, I couldnot see what was to be seen.†

এইরূপে 'দৃষ্ট' ধর্ম্ম বলিয়া বুদ্ধদেব নিজের ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম অনিতিহ' বলিতেন—অর্থাৎ the cognised in itself, the doctrine of actuality, to be seen with one's own eyes (Grimm)—স্বপ্রকাশ, স্বতঃপ্রামাণ্য, স্বানুভব-বেদ্য—free from hearsay and theorising, because he has seen (Grimm, p 19)—অতএব 'Inevitable like the paw of the lion'—সিংহের থাবার ন্যায়

† It is as if near a village or a town there were a high rock, and two friends were approaching it. Having reached it, one of them remains standing at the base of the rock. And the friend below, at the foot of the rock, cries up to the friend who has climbed up to the top of the rock: 'What now friend! are you seeing from the rock?' But that other replies: 'I see, dearest one, from the rock a serene garden, a magnificent forest, a landscape all in bloom, a bright pool of water.' But the other says: 'This is impossible, dearest one, this cannot be, that from the top of that rock you can see a serene garden, a magnificent wood, a landscape all in bloom, a bright pool of water.' Then the friend comes down from the summit, and takes his friend by the arm and leads him up the rock, and having given him a little time to rest, asks him: 'What now, friend, are you seeing from the top of the rock?' And the other one says: 'Now, friend, I see from the rock a serene garden, a magnificent wood, a landscape all in bloom, a bright pool of water.' But the other one says: 'Just now, dearest one, we heard you speaking thus: "It is impossible, it can not be, that from the top of that rock you can see a serene garden, a magnificent wood, a landscape all in bloom, a bright pool of water." And now again, we have heard you speaking thus: "I see there from the top of the rock a serene garden, a magnificent forest, a landscape all in bloom, a bright pool of water." And thereupon the first one replies: 'So long, dearest one, as this high rock was obstructiug me, of course I could not see what was to be seen.

অমোঘ। কারণ সে ধর্ম্ম—তর্কযুক্তি যাহার সম্বল, সেই ভ্রমপ্রমাদ-বহুল বুদ্ধি-লব্ধ ছিল না কিন্তু গভীর চিত্ত-একাগ্রতা-জনিত লোকোত্তর-সমাধি-প্রসূত 'holy Wisdom, able Wisdom, powerful Wisdom (Majjhima Nikaya III p. 72)-রূপ সম্বোধি-সাক্ষাৎকারের সুফল-স্বরূপ ছিল। তাঁহার সমাধি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তিনি নিজ মুখে একবার মল্লপতি পুক্কুসের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। *

এক সময় বুদ্ধদেব আতুমা গ্রামের এক খামারে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তুফান উঠিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎ চমক ঝলসিয়া উঠিল। বজ্রাঘাতে দুইজন কৃষাণ তাহাদের বলিবর্দ্দের সহিত আহত হইয়া ভূপতিত হইল। সুতরাং গ্রাম হইতে বহু জনতা সমাগত হইয়া খামারের সম্মুখে সমবেত হইল। বুদ্ধদেব খামার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; এবং জনতার মধ্যে একজনকে প্রশ্ন করিলেন—ভাই এখানে এত জনতা কেন? সে বলিল,—"ভাব! প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাতে দুইজন কৃষাণ ও তাহাদের চারিটি বলদ হত হইয়াছে। তাই জনতা। আপনি কি ইহা লক্ষ্য করেন নাই? কোথায় ছিলেন?" বুদ্ধদেব বলিলেন এখানেই ছিলাম। "তবে আপনি নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। শব্দও নিশ্চয় শুনিয়াছেন।" "কিছু না।" "তবে কি আপনি নিদ্রিত ছিলেন।" "না না, জাগরিত ছিলাম।" "তথাপি এই বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত ও বিদ্যুৎ-সম্পাত কিছুই দেখেন নাই

* Now at one time, I was staying near Atuma, in a barn. Just then in a thunderstorm, in a whirling hurricane, when the lightnings were flashing forth and the thunderbolts were crashing, not far from the barn, two peasants, brothers, were struck by the lightnings, and four draughtoxen. Then, Pukkusa, a great crowd of people came from Atuma, and stood round the two peasants, brothers, aud four oxen killed by the lightning. Now, Pukkusa, I had came out of the barn and was pacing up and down in front of the threshing-floor under the open sky. And a man out of this crowd of people came towards me, bowed and stood aside. And to the man who stood there, Pukkusa, I spoke thus: 'Why, brother, has the great crowd gathered there?'—'Just now, Sir, in the hurricane, amidst the rain pouring down with flashes of lightning and crashes of thunder, two peasants have been killed brothers, and four draughtoxen. Therefore this great crowd has assembled. But you, sir, where have you been?'—'Just here, brother, I have been.'— Then surely, sir, you have seen it?'—'Nothing, brother, have I seen.'—'But, sir, you have surely heard the noise?'—'Nothing, brother, have I heard of the noise.'—'Then, sir, were you sleeping?'—'No, brother, I was not asleep.'—'How now, sir, were you conscious?'—'Certainly, brother.'—'Then, sir, conscious and with senses awake, in the hurricane amidst the rain pouring out with flashes of lightning and crashes of thunder, you neither saw, nor yet heard the noise?'—'Certainly, brother'.

শোনেন নাই ?" "না।" "কি আশ্চর্য্য ! কি অদ্ভুত !" বুঝিয়া দেখিলে কিছুই অদ্ভুত নয়— কারণ, বুদ্ধদেব তখন খামারের মধ্যে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। ব্যুত্থিত হইবার পর জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের নামে আর এক অভিযোগ এই যে তিনি অহংপর (Egoist) ছিলেন। তিনি বলিতেন "আত্মাই আত্মার নাথ। আত্মাই আত্মার বন্ধু"।

অত্তাহি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরো সিয়া

অর্থাৎ

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥—গীতা

ইহার দ্বারা কি Egoism বুঝায় ? সত্য বটে তিনি মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তে আনন্দকে বলিয়াছিলেন—

তস্মাৎ ইহ আনন্দ ! অত্তদীপা বিহরথ, অত্ত সরণা, অনঞ্ঞসরণা—ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা। * * আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্যে লোকে অভিজ্ঝা-দোমনস্সং—২।২৬

"Therefore Oh Ananda ! Be ye lamps unto yourselves. Be ye a refuge to yourselves. Betake yourselves to no external refuge. Hold fast as a refuge to the truth. Look not for refuge to any one besides yourselves. Work out your own salvation with diligence."

ইহার সহিত তিব্বতীয় মহাযান-গ্রন্থ Voice of the Silence-এর নিম্নোক্তি তুলনীয়—Prepare thyself, for thou will have to travel on alone. The teacher can but point the way.

ইহার দ্বারা কি অহংপরতা, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা বুঝায় ? বুদ্ধদেব যে মহানিষ্ক্রামণ করিয়াছিলেন সেই অতুল্য ত্যাগের অর্থ কি ?

This will I do, who have a realm to lose,
Because I love my realm, because my heart
Beats with each throb of all the hearts that ache,
Known and unknown—these that are mine and those
Which shall be mine—a thousand million more
Save by this sacrifice I offer now.

—Light of Asia.

বুদ্ধদেব তাঁহার অনুচর শ্রমণগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

Therefore stand ye together—assist one another and strengthen one another's efforts. Be like unto brothers ; one in love, one in holiness, one in your zeal for the truth.

অর্থাৎ সেই ঋগ্বেদের প্রাচীন কথা 'সমানা বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।' এই কি অহংপরের কথা? মহাবগ্‌গে (বিনয়পিটক) দেখিতে পাই, তিনি ভিক্ষুকদিগকে উপদেশ দিতেছেন—

চরথ ভিক্‌খবে চারিকং, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায়, অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্‌সানং। দেসেথ ভিক্‌খবে ধম্মং, আদি কল্যাণং মজ্‌ঝে কল্যাণং পরিয়োসান কল্যাণং, সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ।

Go ye Oh Bhikkhus and wander forth for the gain of the many, for the welfare of the many, in compassion for the world, for the good, for the gain, for the welfare of Gods and men. Proclaim Oh Bhikkhus, the doctrine glorious. Preach ye a life of holiness, perfect and pure.

যাঁহার জগতের প্রতি এতই অনুকম্পা, যিনি বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বিশ্বের কল্যাণের জন্য এতই উৎসুক—তিনি যদি আত্মপর স্বার্থপর, তবে পরার্থপর কে?

'নাস্তিকা বেদনিন্দকাঃ।' যিনি বেদের নিন্দা করেন তিনি নাস্তিক। কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতম্।
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্॥

জীবঘাতি-যজ্ঞবিধায়ক বেদের বুদ্ধদেব যদি নিন্দাই করিয়া থাকেন, তবেই কি তিনি নাস্তিক? উপনিষদ্‌ও ত' যজ্ঞকে সংসারার্ণব-তারণে ভঙ্গুর ভেলা মাত্র বলিয়াছেন—প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা (মুণ্ডক, ২।৭) এবং যে মূঢ় ঐ ভেলায় আরোহণ করে, অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় তাহার যে অশেষ দুর্দ্দশা হয় তাহাও উপদেশ করিয়াছেন।

জংঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥—মুণ্ডক, ২।৮

গীতাতেও ত' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মকাণ্ড বেদকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন—গীতা, ২।৪৫

এবং যাহারা বেদের পুষ্পিত বাক্যদ্বারা 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন' হয়, তাহাদিগকে অবিপশ্চিৎ (মোহান্ধ) বলিয়াছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ—২।৪২

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হইলে কূপ তড়াগের যে প্রয়োজন যিনি 'বিজানন্', 'বিদুর' (illuminated), সমস্ত বেদে তাঁহারও সেই মাত্র প্রয়োজন।

> যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
> তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥—গীতা ২।৪৬

উপনিষদ্‌ও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—

> তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ হৃদি গতং ক্ষয়ম্।
> এতদ্ জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ৫

'গ্রন্থবিস্তর' অর্থাৎ mere verbiage। বুদ্ধদেবও অঙ্গুত্তর-নিকায়ে ভদ্দীয়কে বলিয়াছিলেন—

এথ তুম্হে ভদ্দীয়! মা অনুস্সবেন, মা পরম্পরায়, মা ইতিকিরায়, মা পিটকসম্পদানেন, মা তক্কহেতু, মা নয়হেতু, মা আকারপরিবিতক্কেন, মা দিট্ঠি-নিজ্ঝানক্খন্তিযা মা ভব্যরূপতায় মা সমণো নো গরূতি।

যদা তুম্হে ভদ্দীয়! অত্তনা ব জানেয্যাথ ইমে ধম্মা অকুসলা ইমে ধম্মা সাবজ্জা ইমে ধম্মা বিঞ্ঞুগরহিতা ইমে ধম্মা সমত্তা সমাদিন্না অহিতায় দুক্খায় সম্বত্তন্তীতি অথ তুম্হে ভদ্দীয়! প্রজহেয্যাথ।—অঙ্গুত্তর নিকায়, ১৯৩।২

ইহার ইংরাজি অনুবাদ এই—

Do not believe Oh Bhaddiya in hearsay, nor in traditions, nor in rumours, nor in the word handed down, nor in purely logical conclusions, nor in external semblance, nor because of agreement of anything with the views you cherish and approve of, nor because of your own thinking of anything that it is true. Neither shall you think: 'The ascetic, the Buddha himself, is my teacher'; but if you, Bhaddiya, yourself gain the insight: Such things are evil, such things lead to misfortune and suffering: Then you may reject them.

ঐ সারকথা—'gain the insight'। তাঁহার লক্ষ্য অপরোক্ষ অনুভূতি—গতানুগতিকতা নহে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া নহে।

The sole criterion of truth for him is one's own immediate, intuitive apprehension of truth, and he even admonishes his disciples to accept nothing even from himself, simply in good faith but to accept only as fact what they themselves have beheld.

সেইজন্য দেখিতে পাই তিনি মজ্ঝিমনিকায়ে ভিক্ষুদিগকে বলিতেছেন—

"* * * Then monks, what you say, is only what you yourselves have recognised, what you yourselves have comprehended, what you yourselves have understood. Is it not so?" "It is even so, lord." "Well said, monks."—Majjhima Nikaya I P. 265.

এযুগে মহামনস্বী গেটের মুখেও আমরা এইরূপ কথাই শুনিয়াছি। গেটেকে যদি কেহ কোন কিছুকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেন, গেটে বলিতেন, 'It may be true but is it true *for me*'—'হয়ত সত্য কিন্তু ইহা কি আমার পক্ষে সত্য ?' অর্থাৎ কোন কিছু যতক্ষণ না আমরা স্বানুভবের দ্বারা অপরোক্ষ ভাবে অনুভূতি করি, যতক্ষণ না realise করি—ততক্ষণ তাহা আমাদের পক্ষে real হয় না। এইজন্য বুদ্ধদেব বলিতেন—শ্রদ্ধা ভাল কিন্তু শ্রদ্ধাকে দৃষ্টির দ্বারা সুদৃঢ় করিতে হইবে।

Faith is useful but it must be grounded in *sight*. Because one has to *realise* the supreme truth in his own person.—Majjhima Nikaya 1, P 319 & P 134.

সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, বুদ্ধদেব আত্মপ্রত্যয়ের উপর অতটা নির্ভরশীল হইলেও নিজেকে 'তথাগত' বলিয়াছেন। তথাগত অর্থে Transmitter—যিনি সম্প্রদায়-সিদ্ধ সত্য-পরম্পরার প্রচার করেন। কিসের Transmitter? Transmitter of the Ancient Wisdom —সেই পুরাণী প্রজ্ঞার প্রচারক। এই মর্ম্মে চৈনিক ধর্ম্মগুরু কন্‌ফুচি (Confucius) বলিতেন—I only hand on: I cannot create new things. I believe in the Ancients and therefore love them.

বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা। বুদ্ধদেব বলিতেন যে, আমার উপদিষ্ট ধর্ম্ম is that doctrine that is peculiar to the Awakened Ones। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ ও মন্বন্তরের বুদ্ধগণ যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, আমিও সেই তত্ত্ব প্রচার করি। কারণ, বুদ্ধদেব নিজেকে চতুর্থ বুদ্ধ বলিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন বুদ্ধের নামোল্লেখ করিয়াছেন। 'অনাগতবংশে' (এ গ্রন্থ প্রায় ২১০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত) বুদ্ধদেবের এই উক্তি রক্ষিত

হইয়াছে—"হে সারিপুত্র! আমার পূর্ব্বে তিনজন বুদ্ধ হইয়াছেন—কাকুসন্ধ, কোনাগামনো এবং কাশ্যপ। আমি চতুর্থ বুদ্ধ। সম্যক্-সম্বুদ্ধ মৈত্রেয়দেব পঞ্চম বুদ্ধ হইবেন।"*

ধর্ম্মপদেও দেখিতে পাই তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেছেন 'ঋষিগণ-প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিবে'।

আরাধয়ে মগ্গমিসিপ্পবেদিতং—মগ্গবগ্গো

—এবং একাধিকবার 'বহুশ্রুতের' প্রশংসা করিয়াছেন এবং অল্পশ্রুতের নিন্দা করিয়াছেন।

তস্সাহি, ধীরঞ্চ পঞ্ঞঞ্চ বহুস্সুতঞ্চ
ধোরয়হসীলং বতবন্ত মরিয়ং॥—সুখবগ্গো
(ধৈর্য্যশীলং ব্রতবন্তং আর্য্যং)
অপ্পস্সুতায়ং পুরিসো বলিবদ্দোব জীরতি—জরাবগগো

এমন কি যিনি 'ব্রাহ্মন সম্বোধিসিদ্ধ প্রজ্ঞাসিক্ত স্নাতক' তাঁহার বিশেষণ দিয়াছেন মহর্ষি—

উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং।
অনেজং নহাতকং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ —ব্রাহ্মণ বগ্গো

অতএব বেদনিন্দার অপবাদ দিয়া বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলা খুবই অসঙ্গত।

কিন্তু সেই ভবভূতির আক্ষেপ—সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ—অপবাদের অন্ত নাই! বুদ্ধদেবের নামে চরম অপবাদ তিনি অনাত্মবাদী, তিনি নিরীশ্বরবাদী এবং 'নির্ব্বাণ' প্রচার দ্বারা তিনি নাস্তিত্ববাদী। বারান্তরে আমরা এই সকল অভিযোগের বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

* Thus the Blessed Lord replied: I will tell thee Sariputta! There have been leaders three, Kakusandhc, Konagamano and Kassopo, the Guide. I am the fourth Buddha supreme. Matteyya yet shall be in this auspicious period while yet the end we bide, Matteyya, all enlightened One. supreme on earth is He. —Anagata Vansa published in the Journal of the Pali Text Society, 1886.

দীর্ঘনিকায়ের মহাপদান সুত্তান্তে (১:৩) বুদ্ধদেব পূর্ব্ববর্ত্তীকল্পে বিপস্সী, সিখী ও বেস্সভ নামক তিনজন সম্যক্ সম্বুদ্ধের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমানকল্পীয় চারিজন বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, কাকুসন্ধ, কেনাগামন, কসসপ ও গৌতম বুদ্ধ।

ভগবতা এতদ্ অবোচঃ—ইতো সো ভিক্খবে! একনবুতো কপ্পো যং বিপস্সী ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। ইতো সো ভিক্খবে! একতিংসো কপ্পো যং সিখী ভগবা অরহং সম্মা সম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। তস্সিংয়েব খো ভিক্খবে! একতিংসে কপ্পে বেস্সভূ ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। ইমস্সিং য়েব খো ভিক্খবে! ভদ্দকপ্পে, কাকুসন্ধো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। ইমস্সিং এব খো ভিক্খবে ভদ্দকপ্পে কস্সপো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। ইমস্সিং য়েব খো ভিক্খবে ভদ্দকপ্পে অহং এতর্হি অরহং সম্মা সম্বুদ্ধো লোকে উপ্পন্নো।

অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা

সমবেত সাহিত্য-সেবীদের আমি অভিবাদন করি। ফরিদপুর সাহিত্য-পরিষদের সক্রিয় দীর্ঘজীবন কামনা করি। অভ্যর্থনা-সমিতি এবং অন্যান্য কর্ম্মিবৃন্দের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয় যে আপনারা ইচ্ছা করেই কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককে সভাপতিত্বে বরণ করেন নি। আপনাদের ইচ্ছা বিচার করা আমার কর্ত্তব্য নয়। তবে যে উদ্দেশ্যে ও মনোভাবে আপনারা আমাকে মনোনীত করেছেন সেটা বোধ হয় আমার অপরিচিত নয়। সাহিত্য-স্থষ্টি সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রাণ দিয়ে সাহিত্য আলোচনা ও উপভোগ সাধারণের করায়ত্ত। অন্তত, হওয়া উচিত, নচেৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিরর্থক ও অ-সামাজিক অপব্যয়। শিক্ষিত সমাজের কাছে জনসাধারণ বুদ্ধি ও তার প্রয়োগ প্রত্যাশা করে। প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং বিকৃত মস্তিষ্কের কথা বাদ দিলে সাধারণের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য কেবল শিক্ষার স্থবিধার তারতম্যেই ঘটে। প্রাণশক্তির মাত্রাও সর্ব্বক্ষেত্রে সমান হয় না দেখতে পাই, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মধ্য দিয়েই প্রাণ-শক্তি প্রবাহিত। অতএব যে সব অন্তত সামাজিক বাধার দরুণ শিক্ষার স্থবিধায় অসমতা, এবং প্রাণশক্তির বিভাগ ও প্রকাশে বৈষম্য ঘটে সেই সব বাধা অতিক্রমে সকলকে সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। এই আমার বিশ্বাস, আপনাদের মনোভাবও বোধ হয় খানিকটা ঐ ধরণের। বুদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের বুদ্ধি ও প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ, মার্জ্জিত, বর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত করা যায়। কতটা করা সম্ভব পরে দেখা যাবে, কেননা শুনেছি অ-সম বণ্টনই নাকি প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য ও লীলা। তাই যদি হয় তা হলে আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও তাই দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে, বর্ত্তমানের সমাজ-ঘটিত বৈষম্যের সঙ্গে সেই গূঢ় ও প্রাকৃতিক বৈষম্যের কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাচ্ছি না। আপাতত আমাদের কাজের কাজ হল এই—আমাদের মানসিক দুর্ভিক্ষের সামাজিক কারণগুলি জানা এবং জেনে সরিয়ে দেওয়া। এ কাজ একার নয়,

সকলের। আমি এই সমবেত চেষ্টায় যোগ দেবো। আমাদের সকলের স্থির বিশ্বাস যে শিক্ষালব্ধ মার্জ্জিত বুদ্ধির সাহায্যে উপভোগের বর্ত্তমান মাত্রার অর্থাৎ সমালোচনার বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সম্ভব।

অধিকতর লোকের বুদ্ধির চাষ ও প্রাণের বহতা বাড়লে সাহিত্যের মঙ্গল। তাগিদ ও চাহিদা বেশী হলে যোগান আপনা হতে বাড়ে। আমাদের সমাজে প্রকৃত সাহিত্যের চাহিদা কম, অন্য দেশের তুলনায় নেই বল্লেই হয়। কিন্তু কারণগুলি মোটামুটি একই ধরণের, কম বেশী কেবল ভাগ্যবিপর্য্যয়। কারণগুলি আমি যতদূর বুঝেছি আপনাদের বলছি। সব সমাজেই শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে, প্রধানত অর্থের জন্য একদল প্রতিপত্তি লাভ করেছেন এবং আনন্দ পাবার সুবিধা ভোগ করছেন। তাঁদের প্রতিপত্তি ও সুবিধা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিযুক্ত হচ্ছে অন্য শ্রেণীকে—যাঁদের আনন্দ ও শিক্ষা পাবার সুবিধা নেই—তাঁদেরকে, এই বন্দোবস্তেই সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষাদানে, অর্থাৎ কুশিক্ষা ও অশিক্ষায়। আমার অভিজ্ঞতা এই যে সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিপক্ষে কূটতম আপত্তি ওঠে সবচেয়ে বেশী এই প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর কাছ থেকেই। সোজাসুজি বাধাবিপত্তি তোলার কথা ছেড়ে দিচ্ছি। তাঁদের মনোবাঞ্ছা আমরা মুখরিত করি পণ্ডিতী ভাষায়, প্রকৃতিদেবীর গূঢ় অভিসন্ধি—মানুষের মধ্যে শক্তির অ-সম বিভাগ, এই তথ্যটি উদ্‌ঘাটিত করে। আমাদের যুক্তির অভাব নেই। দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এখন মজা হল এই যে এক হিসাবে সুবিধা হতে বঞ্চিতের সংখ্যা মধ্যসম্ভোপভোগী প্রতিপত্তিশালীর সংখ্যার অপেক্ষা বাংলা দেশে পঁচিশগুণ বেশী। আমার বক্তব্য হল এই যে, সংখ্যার তারতম্যে সাহিত্যের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। সংখ্যা বস্তুটি কেবল গণনকার্য্যের যন্ত্র নয়, সংখ্যার অনুপাত পরিবর্ত্তন-গুণ-বাচক। পরিমাণ যে গুণে পরিণত হয় তার প্রমাণ রসায়ন-বিদ্যার প্রতি পাতায় আছে। তাই বলি, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি ও প্রাণশক্তির প্রসার সৎসাহিত্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এই সোজা কথাটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের চেয়ে সাধারণ পাঠকই বেশী বোঝে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সৃষ্ট সাহিত্যিক হয়ত মনে ভাবেন যে সাধারণ লোকে কখনই ভাল জিনিষ উপভোগ করতে

পারবে না। তাঁরা যে 'সাধারণ রুচি' কল্পনা করে থাকেন সে রুচি তাঁদেরই সমশ্রেণী ও সমধর্ম্মী খবরের কাগজওয়ালা, তাঁদেরই আশ্রিত পণ্ডিতবর্গের রচিত সাধারণের রুচি। এই সাধারণের অস্তিত্ব নেই। আমি যে সাধারণ জনসমাজের উল্লেখ করছি তারও অস্তিত্ব নেই, তাকে সাহায্য করতে হবে রচিত হতে। প্রথমটি হল অলীক, এবং অলীক বলেই একটি শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উপায়, দ্বিতীয়টি মাত্র অপ্রসূত সম্ভাবনা, এবং সম্ভাবনা বলেই আপনাদের ও আমার অতি যত্নের সামগ্রী, আদরের বস্তু। মিথ্যাকে সত্যে অন্তত সম্ভাব্য সত্যে পরিণত করতে হবে। যে শক্তির সাহায্যে এই পরিবর্ত্তন সম্ভব সেই শক্তি একার নয়. সমাজের, যদিও সমাজের মধ্যে সেটি এখনও গুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তিকে আমরা জানতে চাই। তারই পরিণতির প্রতীক্ষায় আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। সাহিত্য-বিচার ও উপভোগ অ-সামাজিক প্রক্রিয়া নয়, সামাজিক ব্যবহারের প্রতিবেশেই সাহিত্য বুঝতে হয়, এই আমার ধারণা।

পূর্ব্বোক্ত সামাজিক শক্তির পরিণতি কখনও কি ভাবে হবে তার সঠিক খবর কেউ দিতে পারে না। তবে আমাদের বড়ই সজাগ থাকতে হবে নিশ্চয়। আর একটি কথা জোর করেই বলা চলে ঃ যে শক্তির প্রকাশে অন্য দেশের সমাজের পুরাতন শৃঙ্খল ভেঙ্গে যাচ্ছে, এবং ভেঙ্গে যাবার জন্যই সেই সব দেশের সাহিত্যের রূপ পরিবর্ত্তন ঘটছে, সে শক্তির আধার তরুণ সম্প্রদায়। চিরকালেই সমাজে তরুণ ছিল—কিন্তু তরুণের আন্দোলন ছিল না। আন্দোলনের অর্থ কোন মধ্যস্থিত ব্যাস থেকে সরে যাওয়া। মধ্যস্থিত ব্যাস হল সামাজিক শৃঙ্খলা—উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থের শৃঙ্খলা আর সামাজিক সত্তার মধ্যে যে প্রভেদ থাকতে পারে তরুণরা পূর্ব্বে বোঝেননি, তাই তাঁদের আন্দোলন আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বলেই পরিগণিত হয়ে এসেছে। আজ তাঁরা বুঝেছেন যে শ্রেণীর স্বার্থ সমাজের প্রকৃত শৃঙ্খলাও নয়, মেরুদণ্ডও নয়। শৃঙ্খলাটি কি, ব্যাসটি কোথায়, তাঁরা বোঝেন না, আন্দাজী তার একটা নাম দিয়েছেন সমাজ-সত্তা। হয়ত নামকরণও সবদেশে এখনও হয় নি। আজ যে সমগ্র বিশ্বে তরুণ আন্দোলন চলছে তার মূল কথা এই সমাজসত্তাকে অনুসন্ধান করা, আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা। তাঁদের কর্ম্মে

ও বক্তব্যে হয়ত মূলতথ্যটি ঠিক পরিস্ফুট হয় নি, একে তাঁরা তরুণ, তায় দেশের অবস্থা ভিন্ন। কিন্তু এ কথা ঠিক যে যুদ্ধের পর যুবক-যুবতীরা নানা বিষয়ে নানা মতামত প্রকাশ করছেন। শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁদের কমছে। তাঁরা বলছেন যে তাঁদের দেশের বৃদ্ধেরা এত দিন ধরে বড় বড় গালভরা কথা দিয়ে দেশকে, অর্থাৎ দেশের অন্য শ্রেণীকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের সম্পত্তি ও ক্ষমতাবৃদ্ধি করে এসেছেন ; আজ তাই যুবকদের কাছে আদর্শবাদ বড়ই কটু ঠেকছে। আজ তাঁরা নিজেরাই নতুন আদর্শ গড়ে তুলতে ব্যগ্র, যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁদের সমগ্র, ও প্রকৃত সামাজিক সত্তার ওপর। সে আদর্শ শ্রেণীগত স্বার্থের শৃঙ্খলার দ্বারা গ্রথিত নয়। যন্ত্রপ্রধান সভ্যতায় সামাজিক সত্তার বর্ত্তমান রূপ হল শ্রেণী-বিভাগ। দুঃখ এই যে, সমাজ-সত্তার প্রকৃত রূপের পরিচয় পেতে হলে এই শ্রেণী-বিভাগের বিপক্ষে বিরোধ বেধে যায়। একেই শ্রেণী-বিভাগের সম্বন্ধ বিরোধের, তার উপর সেই বিভাগের আবরণ ভেদ করতেও বিরোধ, তাই আজ বিরোধই সর্ব্বত্র প্রকট হয়েছে। তরুণরা এই বিরোধের শক্তিকে স্বীকার করে তাকেই কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়েছে। একটি প্রধান সামাজিক কাজ সাহিত্য-সৃষ্টি, সাহিত্যে সেই জন্য এত ঝাঁজ, এত উগ্রতা। তরুণের অনুচ্চারিত বক্তব্য হল এই—সমাজসত্তাকে স্বীকার কর, নচেৎ কোন কাজই করা যাবে না। আমি তরুণ না হলেও একই কথা বলি, আমাদের দেশের অবস্থায় ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানে কিছু পার্থক্য থাকলেও অন্তরের বিরোধে আমরা বোধ হয় এক। আমাদের তরুণ সাহিত্য যদি বাস্তবিকই নবযুগের সাহিত্য হতে চায়, সত্যকারের রিয়ালিষ্টিক্ হতে চায়, তা হলে তরুণ সাহিত্যিককে আমাদের প্রকৃত সমাজ-সত্তা কি বুঝতে হবে, তার রূপ পরিবর্ত্তনের শক্তিকে স্বীকার, গ্রহণ ও নিয়োগ করতে শিখতে হবে। নচেৎ তরুণ সাহিত্য তরুণ ত হবেই না, সাহিত্যও হবে না, কর্ত্তাদের ভাববিলাসের উপকরণ ও অযোগ্য অনুকরণ হবে।

আমাদের সমাজের সত্তা কি বোঝাতে পারব না। জোর করে বলতেও পারি না আমাদের সমাজে অন্য দেশের মত শ্রেণী তৈরী হচ্ছে কিনা। এইবারকার আদমসুমারিতে লেখা আছে, নতুন গণনা-পদ্ধতির

জন্য তুলনায় ভুলচুক বাদ দিয়েও চাষী-অধিকারী এবং প্রজা-চাষীর সংখ্যা ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে শতকরা ৩৫ কমেছে ; আর কেবল চাষী-মজুরের সংখ্যা বেড়েছে শত করা ৫০ জন, ৩৯০৫৬২ থেকে ৬৩৩৪৩৪ পর্য্যন্ত। বাংলা দেশে সবসুদ্ধ শতকরা একশ জন জমিদার ও অনুচরবর্গের তুলনায় ১২৯৭ চাষী মজুর আছে, যদিও গড়পড়তা গোমস্তার দল কিছু হ্রাস পেয়েছে। ফরিদপুরে চাষী মজুরদের সংখ্যা কিছু কম, শতকরা ৯৬৬ জন। ব্যবসাবৃত্তিধারীর সংখ্যা কিছু কমলেও মধ্যবিত্ত চাকুরে ও উকিল ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সব চেয়ে বেড়েছে জমিসত্বোপভোগী ভিন্ন নিজের ব্যক্তিগত আয়ভোগীর এবং চাকরবাকরের দল, প্রথমটি ১৩৬৪৬ থেকে ২৫২৬১ এবং দ্বিতীয়টি ৪৫৫২৪৬ থেকে ৮০৯৭১৫। আদমসুমারির সংজ্ঞা 'ও হিসেবেই যাঁরা জমি থেকে ধন উৎপাদন কার্য্যে ব্যাপৃত নন্ তাঁদের তুলনায় নিতান্ত ভূমিনির্ভরশীলের সংখ্যা গড়পড়তায় ষোল গুণ বেশী। সমগ্র বৃত্তি ধরলে লোকসংখ্যার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ সামাজিক ধন বৃদ্ধি করছেন। এই অনুপাত ১৯০১ সাল থেকে ক্রমেই বেড়ে আসছে। আমি কল-কারখানার শ্রমজীবীর কথা তুলছি না, এখানে এবং এই দেশে সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ বাংলা সমাজের, সে সমাজের মেরুদণ্ড জমিসত্ব। জমির অধিকার পরিবর্ত্তনেই সমাজের সত্যকার শ্রেণী তৈরী হতে পারে। চাকুরে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও যে শ্রেণী তৈরী হতে পারে না তা বলছি না। কিন্তু চাষবৃত্তিধারীর সংখ্যা এঁদের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী। অতএব সন্দেহ হয় যে গোপনে শ্রেণী তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছে। তবে বিরোধ এখনও প্রকট হয়নি নিশ্চয়। হওয়া ভাল কি মন্দ জানি না, তবে মনে হয় বিরোধও বাদ যাবে না। তবে তার ভীষণতা চেষ্টা করলে কমান যায়, বিশেষত কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে অধিকার চাওয়ার অপেক্ষা দাবীপূরণই সামাজিক অবস্থান নিরূপিত ক'রে মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অন্য দেশের ইতিহাসের সব ধাপই পরপর অতিক্রম করতে হবে তাও নয়। এমন কি ভীষণ বিরোধ বাদ দিয়েও শ্রেণীর অবসান ও সমাজ-সত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের দেশের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও আয়ের

বিভাগে অন্য উন্নত দেশের তুলনায় আপেক্ষিক কম বৈষম্য, অশিক্ষিতের সংখ্যা, আমাদের রোমাণ্টিক্ গণ-আন্দোলন, মহাপুরুষে ভক্তি, এবং আমাদের কংগ্রেসনীতি বিচার করলে সন্দেহ হয় যে জনমত জাগ্রত হয়ে ফ্যাসিজমের কোন না কোন রূপ বরণ করবে। যে সামাজিক বিপ্লব অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা সাধিত হয় তাও এদেশে সম্ভব কিনা জানি না—যদি হয়, তখনও বিরোধ উহ্য থাকবে। এ সব বিষয়ে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। কেবল বলা চলে, বিরোধকে স্বীকার করেই হোক আর অন্য কোন শক্তিকে গ্রহণ করেই হোক সাহিত্যে সমাজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদি বিরোধের ফলে সত্তার প্রতি আমাদের স্থিরদৃষ্টি ভ্রষ্ট হয় তা হলে আমাদের সাবধান হতে হবে। যদি অন্য উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেই উপায় গ্রহণ করতে হবে। তবে যাঁদের জন্য সমাজের অতএব সাহিত্যের এই দুর্দ্দশা তাঁরা কি ছেড়ে কথা কইবেন? কইবেন না; তখন ন্যায়ত ধর্ম্মত বিরোধ আনার গুরু দায়িত্ব তাঁদের ওপরই পড়া উচিত। কর্ত্তার দল এভার গ্রহণ করতে রাজি হবেন না, তাঁরা বলবেন, নিম্ন শ্রেণীরাই বিরোধ বাধিয়েছে। আমার বিশ্বাস শ্রেণীবিরোধ তাঁদেরই সৃষ্টি, এমন কি কথাটির দুষ্ট ব্যবহারটি পর্য্যন্ত। নচেৎ 'বিরোধ' সংজ্ঞাটির মধ্যে দোষ গুণ কিছুই নেই। যে আগে ব্যবহার করিতে পারে তারই জিৎ। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই যে সমাজের নতুন গঠন না বুঝে, লেখার জন্যই সাহিত্য সর্ব্বত্রই অ-বাস্তব হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে রিয়ালিষ্টিক সাহিত্য।

পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করেছি যে পুরাতন আদর্শবাদের মোহ আজ কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আদর্শবাদকে ত্যাগ করা চলে না, তরুণে ত্যাগ করতে পারে না। আমরা অনেকেই বুঝেছি যে অন্যায় দূর করা উচিত এবং সমাজকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে হবে। পুরাতন সমাজের মূলে ছিল সম্পত্তিবিভাগে বৈষম্য। সে বৈষম্য রক্ষা করার দরুণই বড় বড় মিষ্টি গালভরা কথার প্রয়োজন ছিল; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, আর্টের জন্য আর্ট, অভিজাত সম্প্রদায় ও বিদগ্ধ পুরুষের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি, ইত্যাদি। সে মূলে আজ ঘা পড়েছে, তাই বড় কথা ভুয়ো ঠেকছে। আজ মনে হচ্ছে ভগবান, ধর্ম্ম,

ব্যক্তিত্ব, আর্ট, স্বরাজ, স্বদেশপ্রেম—এ সব বাইরের এনামেল, ভেতরের লোহা হল সমাজ, দুর্ভাগ্যবশত সমাজের পতিত ও বঞ্চিত শ্রেণী, তাদের দেহ ও মনের ক্ষুধা মেটাবার অসুবিধা, অবকাশ-হীনতা। সর্ব্ব-প্রকার ক্ষুন্নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষায় তরুণরা আজ অনুপ্রাণিত। এদেশে সে আকাঙ্ক্ষার তেজ কম নানা কারণে, তবে যতটুকু আছে তাকে চেষ্টা করলে বাড়ান যায়। আমার ক্ষুধা আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, আপনাদেরই মতন। তবে আমি জানি, আপনারাও বোধ হয় জানেন যে যতদিন আকাঙ্ক্ষা না জোরাল হয়, না মেটে, ততদিন আমার বাঁচা হবে কৃমির মতন বাঁচা। কৃমির জীবন আমার আদর্শ নয়, আমি আরো ভাল করে বাঁচতে চাই, সে জন্য ভাল সাহিত্য আমাকে পেতেই হবে—কেননা সাহিত্যিক হলেন সমাজকর্ত্তা, তাঁর কাছে আমি অনেক প্রত্যাশা করি। আমরা সকলেই বাঁচতে চাই, ভাল করে, আরও ভাল করে, নতুন নতুন উপায়ে। সাহিত্য ভাল করে বাঁচবার সহায়তা করে। (রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন উন্নত হয়েছে।) সাহিত্য আমাদের আদর্শ নিরূপিত করে কিনা জানিনা, তবে যে শক্তির দ্বারা আদর্শ স্থষ্টি হয়, সেই শক্তির দ্বারাই সাহিত্যের আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিভাত হয় নিশ্চয়। সে শক্তি সমাজের, সামাজিক পরিবর্ত্তনের গতিতে তার উৎপত্তি। কেননা এই আদর্শ স্থির নয়, চিরন্তন নয়, একটি বিশেষ শ্রেণীর নয় এ আদর্শ গতিশীল, চলিষ্ণু, পরিবর্ত্তনশীল, সর্ব্বসাধারণের। সমাজও তাই; যে সমাজে অত্যাচার নেই, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি ভাল করে বাঁচতে পারে, সেই সমাজের দিকে অগ্রস্থতিই আমার ও আপনাদের আদর্শ ঠিক করে দিচ্ছে। সেই সমাজেই যে সাহিত্য হবে তাতে কাঁটা থাকবে না। সকলেই নিজের নিজের প্রকৃত ক্ষমতা অনুসারে সে সাহিত্য উপভোগ করতে পারবে। এখন সকলে আনন্দ পায় না; কেননা এ আর্থিক বৈষম্যের জন্য তারা আনন্দ উপভোগ করতে শেখেনি। আজ সৎসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা কম, অর্দ্ধশিক্ষিত, এবং সমাজ-সত্তা সম্বন্ধে অচেতন বলে সৎসাহিত্যের চাহিদা কম, নতুন সমাজে চাহিদা

বাড়বে, চাহিদা বাড়লে যোগান অন্তত খানিকটা বাড়বে আমি বিশ্বাস করি। এটুকু আপনারাও নিশ্চয় স্বীকার করেন।

'স্বীকার' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা সমাজকেই সবচেয়ে কঠিন সত্য মনে করি, মুখে অন্তত আমরা সকলেই সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তার বেশী কিছু জানি না। তাকে বদলাতে হবে আমরা বুঝি কিন্তু কি করে করব আমরা জানি না। আমরা কেউই ভবিষ্যৎ-বক্তা নই, নেতা নই, এবং সন্দেহ করি সমাজে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যবহারকে। মনে হয়, যে-সব ঘটনার দ্বারা সমাজের ভবিষ্যৎরূপ প্রবর্ত্তিত হয়, তাদের অঙ্কাধীন করা ত দূরের কথা করায়ত্ত করাও শক্ত। তবে আমরা সকলেই এই সব বিষয়ে জানতে চাই, সচেতন হতে চাই, ভবিষ্যৎকে মুঠার মধ্যে আনতে চাই। আমাদের জানবার প্রবৃত্তি আছে এবং কাজ করবার প্রবৃত্তিও আছে। এক কথায় আমরা ইতিহাসের মর্ম্মকথা বুঝতে চাই। বোঝাটা কাজ করা থেকে পৃথক ব্যবহার নয়। বুঝে কাজ করলে, কিম্বা কাজ করে বুঝলে ব্যাপারটা সহজ হবে নিশ্চয়। ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা তখনই শক্ত যখন ইতিহাস মানে নিয়তি। এতদিন ইতিহাসকে অতিপ্রাকৃতের অত্যাচার গণ্য করে এসেছি, তাকে অন্ধ শক্তি কিম্বা নিয়তি নাম দিয়েছি, ইতিহাস বলতে পুরাতন পাঁজি-পুঁথিঘাঁটা এবং প্রমাণ তর্কের ব্যবহার-ক্ষেত্রই ভেবে এসেছি, তাই আমাদের ইতিহাসকে কেবল মানতেই হয়েছে, মুখস্থই করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক দার্শনিকের মতনই, সমাজকে ব্যাখ্যাই করে এসেছেন, সমাজকে গড়ে তোলেন নি। যা হচ্ছে তাই ভাল কেননা তাই বুদ্ধির নিয়মানুযায়ী, অতএব পুরাতনের চিন্তা করা ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য আমাদের নেই, আমরা এতদিন এই ভেবে এসেছি। কিন্তু ইতিহাস সমাজেরই ইতিহাস এবং সমাজ মানুষেরই সমাজ, একথা মনে পড়েনি। আমরা বিশ্বাস করিনি যে মানসিক প্রক্রিয়ায় অনেক মিল থাকে, সেই মিলের উপরই সমাজের ভিত্তি এবং সেই ভিত্তির উপরই ইতিহাসের ইমারৎ খাড়া করা হয়েছে। অতএব সেই ইতিহাসের কোথাও না কোথাও মূলগত ঐক্য থাকবেই থাকবে

অর্থাৎ নিয়ম থাকবে। আজ আমাদের অজানিতে আমরা সকলেই ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কার করতে ব্যগ্র হয়েছি, আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ভাবনায় শান্তি দিচ্ছে না। সেজন্য নতুনতর সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত না হলেও তার ঐকান্তিক প্রয়োজন স্বীকার করি, এবং ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কার করে অন্তত আংশিকভাবে, অতিপ্রাকৃত, প্রাকৃতিক ও তথাকথিত সামাজিক নিয়তির কবল থেকে মুক্ত হতে চাই। আমরা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসিনা, নিষ্কর্ম্মা হয়ে পুরাতন মহিমায় ডুবে থাকতেও চাই না। এই প্রকার অক্ষমতা, এবং কাজ ও চিন্তার সাহায্যে ক্ষমতা-অর্জ্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই আমাদের যোগসূত্র। এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার ইচ্ছার অর্থ হল স্বীকার, সমাজ-সত্তাকে স্বীকার।

পূর্ব্বোক্ত মনোভাব নিয়ে আমি সাহিত্যসভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার মতামত যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করতে চান না, কিম্বা সাহিত্যিকের জন্যই সাহিত্য বিবেচনা করেন, কিম্বা যাঁরা পুরাতন সমাজকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে চান, তাঁদের মনঃপূত হবে না। সাহিত্য-সম্বন্ধে এতদিন যা ভাবছি, অল্পকথায় আপনাদের তাই বলব—বিস্তারিত ভাবে বলবার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বদেশের সাহিত্যই ভারি লঘু ঠেকে; ঠুনকো মনে হয়, বুনোন তার ঠাশ নয়, বিশেষ করে আমাদের সাহিত্য। **রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আমার মন্তব্যের বাইরে।** আমার ধারণা এই যে বর্ত্তমান সাহিত্যিক সাহিত্য-বস্তুর সত্তা স্বীকার করতে পারেন নি, স্বীকার করতে ভয় পান। সাহিত্যবস্তু হ'ল মানুষ এবং মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ। মানুষ সামাজিক জীব এবং মানুষের সম্বন্ধই হল সমাজ; সমাজ বদলাচ্ছে মূলত আর্থিক কারণে, ও কলকব্জা, যন্ত্র আবিষ্কার অর্থাৎ বিজ্ঞানের দৌলতে। বিজ্ঞান অর্থে কেবল নৈসর্গিক প্রকৃতিকে বশে আনা নয়, বাইরের সমাজ ও অন্তঃপ্রকৃতিকেও বশে আনা। জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় নৈসর্গিক প্রকৃতিকে জয় করা মানুষের সম্বন্ধ ও স্বভাবকে জয় করা অপেক্ষা সহজ। কিন্তু তাই বলে সমাজ ও অন্তর

আমাদের শক্তির বহির্ভূত নয়। সামাজিক ব্যবহার ও অন্তর্গত দৈহিক ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমেই আমাদের বিশদ হচ্ছে। সেই জ্ঞানবৃদ্ধির পদ্ধতি এক ভিন্ন দুই নয়। এই দুই প্রকার জ্ঞান এবং একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা বুঝেছি যে উৎপাদন-শক্তির রূপপরিবর্ত্তন হলে সমাজের রূপপরিবর্ত্তন হয়। অতএব সাহিত্য-বস্তুর পরিবর্ত্তন অস্বীকার করেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী হই। বিজ্ঞানের ফলাফল না গ্রহণ করে যে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় তার মূল্য অকালের ফুল ফলের মতনই। নতুন উৎপাদন-শক্তির তাগিদে সামাজিক পরিবর্ত্তন, সামাজিক সত্তার গঠন-পরিবর্ত্তন এবং সেই পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের আচার ব্যবহারের প্রভেদ ও সংঘাতই হল সাহিত্যের প্রকৃত সত্তা। আমার বিশ্বাস পুনরায় বলছি—বর্ত্তমান সাহিত্যের লঘুত্ব, এই প্রভেদ ও সংঘাতকে না মানার জন্য। এ দেশে আমরা সকলে সমাজসত্ত্বাকে পাশ কাটিয়ে আসছি, তাই আমাদের সাহিত্য আমাদের সমশ্রেণীর প্রাণেই কেবল সাড়া দেয়, জনসাধারণের কাছে তার কোনও আবেদন ও মূল্য নেই। অথচ সাহিত্য একতরফা ডিক্রি নয়ই নয়, কোনও আর্টই নয়। সাড়া না পেলে সাড়া দেওয়া যায় না। সাড়া না দিতে জানলে সাড়া পাওয়া যায় না। এতদিন সর্ব্বত্র, অন্তত গত কয়েক শতাব্দী ধরে, সাহিত্য ছিল ধনী-ব্যক্তির সখের সামগ্রী, সৃষ্টির নামে ধনীশ্রেণীর আত্মপ্রসাদ, এবং উপভোগের নামে নির্ধনের ও অশিক্ষিতের আত্মপ্রবঞ্চনা। এখন বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে কল ও যন্ত্র এসেছে। টান পড়েছে তার গ্রামে গ্রামে, কেবল আমাদের মগজেরই টনক্ নড়ছে না। সমাজ গেল ভেঙ্গে, মানুষের ব্যবহার গেল বদলে, অথচ সাহিত্যিক খরগোশের মতন ভাবছেন, চোখ বুজলেই বিপদ কেটে যাবে। **তা হয় না, তা হয় না, তা হয় না।** এখন চোখ খুলে দাঁড়াতে হবে, সমাজ ভাঙ্গার ও গড়ার শক্তিকে, তাকে বিজ্ঞানই বলুন বা শ্রেণী-বিরোধই বলুন—কি দুইই বলুন, আমার তাতে আপত্তি নেই, ব্যবহার করতে হবে। তবেই হবে সৎসাহিত্য, নাটকের মত নাটক, নভেলের মত নভেল, গল্পের মত গল্প—তবেই হবে সতেজ সাহিত্য যা আমাদের নেই। কেবল নেই নেই বলে আফশোষ করলে চলবে না। সামাজিক বিবর্ত্তনের শক্তির দ্বারা আমরা নব্য সাহিত্য

সৃষ্টি করব। জীবনকে অগ্রাহ্য করছি অথচ সকলকে আনন্দ দেব এ কি হয়? সামাজিক সত্তা, সমস্যা ও তার স্বীকার, নিরাকরণ বাদ দিলে সাহিত্য হয় একদেশদর্শী, প্রাণহীন, ছোট, হাল্কা, ঠুন্‌কো, বেলোয়ারী। সাহিত্যিক নিশ্চয়ই সমাজকে স্বীকার করবে, কেননা সমাজ হল মানুষের সম্বন্ধ, তবে যে শ্রেণীর হাতে সমাজ পড়েছে সে সমাজকে নয়। সাহিত্যিক সেই সামাজিক সমস্যার সমাধান করবে; কেননা যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও নেতৃত্ব করবার শক্তি ও বাসনা তার আছে, তবে সে সমস্যা ঐ ওপরকার শ্রেণীর চিন্তাবিলাস সে সমস্যা নয়, ভাঙ্গা গড়ার সমস্যা। এ যুগে বেড়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মজা দেখা কাপুরুষতা। এ সময়, অপক্ষপাতিতা, ঔদাসীন্য, মধ্যস্থতা করা, সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও শঠতা। বিজ্ঞানে শুনেছি রায় না দিলেও চলে, যদিও আমি তা বিশ্বাস করি না, কিন্তু সাহিত্যে নিজেকে বাদী-প্রতিবাদী হতেই হবে, এ যে মানুষের জীবন নিয়ে কারবার, কেবল মায়ার খেলা নয়। চাকরীস্থলে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' প্রণালীটা উপকারী, কিন্তু সাহিত্যে অচল। সাহিত্যিককে দলে নামতেই হবে, দলের হয়ে তাকে লড়তেই হবে, দল অর্থে ছোট্ট গণ্ডী নির্দ্দেশ করছিনা, হাটবাজারের কোলাহল তাকে শুনতেই হবে, জীবন নিয়ে তাকে পরীক্ষা করতেই হবে। চিরন্তন মূল্যের দোহাই দিয়ে নিজেকে কূপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে, চিরকাল ধরে ভোগসত্ব উপভোগ করবার বাসনা পোষণের জন্য তাকে দায়ী হতে হবে, জবাবদিহি পর্য্যন্ত করতে হবে। আমার সিদ্ধান্তগুলি যে সহানুভূতির নামান্তর নয় প্রমাণ করবার জন্য তাদের গোড়াকার বিচার-বাক্যগুলিকে একত্রে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। একটি অন্যের সঙ্গে যুক্তির গাঁটছড়ায় বাঁধা।

(১) সাহিত্য মনের ক্রিয়া, মন মানুষের, মানুষের মন জীবনযাত্রার একটি উপায়, জীবনের কাজ অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, প্রকৃতির সঙ্গেও। প্রথমটির নাম সমাজ-গঠন, দ্বিতীয়টির নাম বিজ্ঞান। এর একটি অন্যটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। দুটোই ক্রিয়াবাচক। অতএব সমাজে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা থেকে মানুষের মনের কোন ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, বিচ্ছিন্ন করলে মানসিক ক্রিয়াকলাপ অন্যের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে, যেমন সাহিত্য,

বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন করলে চিন্তা হয়ে ওঠে কাজের চেয়ে ঢের বেশী দরকারী জিনিষ, অতএব সত্তার বিচার হয় সেই চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত সঙ্গতি দিয়ে, যেমন দর্শনের মতো আর্টেও হওয়া উচিত বলা হচ্ছে। কিন্তু সত্য কথা অন্যধরণের। জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক নয়, কর্ম্মের জন্য জ্ঞানের উদয়, সেই জ্ঞানের সাহায্যে কর্ম্মের সুবিধা ও সুব্যবস্থা, আবার তারই ফলে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান। কাজের সেরা কাজ জীবন-যাত্রা, আরো ভাল করে, নতুনভাবে, তীব্রতর উপায়ে, ব্যাপকভাবে, সমগ্র শক্তিকে পুরোদমে খাটিয়ে, নতুন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ কোরে। সাহিত্যই জীবনের শেষ নয়, যেমন জীবনের শেষ নয় দর্শন, বিজ্ঞান, কিম্বা অন্য যে কোন আর্ট; ভাল করে জীবন চালানই সাহিত্যের শেষ, যা-তা করে, যেমনভাবে জীবন চলে আসছে তেমন ভাবে নয়। অবশ্য জীবনের অর্থ বদলে গেলে আমার বক্তব্যও বদলে যাবে। আপাতত, জ্ঞান উপায় ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অতএব বর্ত্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ যুগের সাহিত্যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের জীবন যে কেবল প্রতিফলিত হবে তাই নয়, তখনকার সমাজ-গঠন ও জীবন-যাত্রার রীতি-নীতির ইঙ্গিতও সেখানে থাকা চাই। এই হল সাহিত্যিকের যথার্থ ঋণ-পরিশোধ, এইখানেই তার নেতৃত্ব ও যথার্থ প্রতিপত্তি।

(২) সমগ্র ইতিহাসই সম-সাময়িক ইতিহাস, অর্থাৎ ইতিহাসের মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটনের সময় এখনই, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই। যাঁরা মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটন ক'রে ভবিষৎ চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দিতে পারেন সাহিত্যিক সেই দলেরই একজন। তিনিও অন্যের মতন ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কারক, তবে তিনি ইতিহাসের নিয়মাবলীকে বিচার-বাক্যে পরিণত করেন না, মানব-চরিত্রের সংঘাতে, ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে পরিস্ফুট করেন। দার্শনিকের আবিষ্কৃত নিয়ম নিরালম্ব, আবেগশূন্য, সাহিত্যিকের নিয়ম ব্যক্তির সম্পর্কিত, আবেগময়, চরিত্রের আশ্রয়ে প্রকাশিত। তাই সাহিত্যিকের আবিষ্কৃত নিয়ম আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করি। আবার সেই জন্যই এই 'স-গুণ' নিয়মের আবিষ্কারকদের অন্যের চেয়ে বেশী খাতির করি। মানুষের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের ধারা কি ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে সাহিত্যিক জানেন বলেই সাহিত্যিক কালের অধীন নন্। নিয়তির নিয়ম

জানেন বলেই সাহিত্যিক স্বাধীন, অতএব কালাতীত। সাহিত্যে চিরন্তন মূল্যের অর্থই হল এই। যে সাহিত্যিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের ইতিহাসের সামাজিক পরিবর্ত্তনের গূঢ় কথা বোঝাতে পেরেছেন তিনিই বিশ্ব-সাহিত্যিক, তিনিই দেশের প্রকৃত নেতা। আজকালকার সাহিত্যিক পরিবর্ত্তনের কিম্বা ইতিহাসের তোয়াক্কা রাখেন না, তাই নেতৃবৃন্দের প্রকোপ। সাহিত্যিকের কাছে সমাজ অনেক বেশী প্রত্যাশা করে, সাহিত্যিকের দায়িত্ব অন্যের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁরা কেবলমাত্র 'আর্টিষ্ট' হয়ে সমশ্রেণীর আনন্দবিধান করলে সমাজের আশা মেটেনা, সমাজের সাথে সম্বন্ধকে, (কর্ত্তব্যের কথা নাই তুললাম) অস্বীকার করার জন্য তাঁদের ক্ষতি হয়, অতএব আমাদের প্রত্যেকের ক্ষতি হয়।

অতএব আর্টের জন্য আর্ট বিশ্বাস করিনা, কারণ তা হলে টাকার জন্যই টাকা রোজগার, মন্দর জন্যই মন্দ, ভালর জন্যই ভাল কাজ করায় বিশ্বাস করতে হয়, আর মানতে হয় কেবল বস-বাসের জন্যই বসত বাড়ী, আরামের জন্য নয়, ভাল করে থাকবার জন্য নয়। ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এইটুকু—আর্টিষ্ট যেন নিজের কাজে ফাঁকি না দেন, সস্তায় নাম কেনার জন্য কিম্বা বড়লোক হবার জন্য তিনি যেন সততার পথ থেকে বিচ্যুত না হন। আর্টের জন্য আর্ট মানার অর্থ হল, কর্ম্ম থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা আর্টের বিষয়-বস্তু, সমাজসত্তাকে পরিত্যাগ করা, ইতিহাস না বোঝা, এবং জীবনকে দূরে সরিয়ে রাখা, উপায়কে উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন বিবেচনা করা। 'আর্টের জন্য আর্টের' যুক্তিগত সঙ্গতি হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু সে যুক্তি জীবন ও পরিবর্ত্তনের যুক্তি থেকে বিযুক্ত। কোন যুক্তি মানব? কেতাবে-পড়া সত্তার সঙ্গে অসম্পর্কিত যুক্তি, না জীবনের, পরিবর্ত্তনের, ইতিহাসের দুর্ব্বোধ্য অথচ দুর্নিবার যুক্তি? কর্ম্ম থেকে চিন্তাকে বৃন্তচ্যুত করবার জন্যই, (যাঁরা করেছেন তাদের কৃপাতেই) একটি অন্যটির বিপরীতধর্ম্মী হয়ে উঠেছে। যাঁরা যুক্তির অন্তর্নিহিত সঙ্গতির ওপরই যুক্তির সার্থকতা নির্ভর করছে প্রমাণ করতে ব্যগ্র তাঁরাই সামাজিক জীবনের, ইতিহাসের, পরিবর্ত্তনের প্রতিকূলে পাল তুলে অ-জানার উদ্দেশ্যে ভেসে চলেন। আমরা কিন্তু নিজ হাতে গড়তে চাই, আমরা ভাসতে চাই না, কুল-কিনারা

আমরা জানতে চাই, দিশেহারার অবস্থা আমাদের ভাল লাগে না। ভেসে বেড়াবার বিলাস আমাদের বরদাস্ত হয় না। আর্টের জন্য আর্ট হল অনেক ক্ষেত্রেই একটি শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ভদ্রভাষা, অর্থাৎ পরিভাষা, নিজেদের প্রতিপত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির নামান্তর, নিঃশেষিত হবার পূর্ব্বনিঃশ্বাস, এবং জনসাধারণের রসোপভোগের অন্তরায় সৃজন, অতএব রস-সৃষ্টির একটি প্রধান বিপত্তি।

সাহিত্য হল মানুষের মনের ক্রিয়া, সমাজের বাইরে মানুষ নেই, কেননা, মানুষের সম্বন্ধই হল সমাজের প্রাণ। সমাজের বাইরে আছেন যোগী-ঋষি, কিম্বা বাঘিনী-প্রতিপালিত মানবশিশু। শেষ জীবটির সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কম, প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ এখনও আছে। অবশ্য যোগীঋষির সাহিত্যিক সৃষ্টি ও মতামতের মূল্য সমাজের কাছে কম, শিষ্যের কাছেই বেশী। যতদিন না সমগ্র সমাজ শিষ্য হচ্ছে ততদিন মহাপুরুষদের কথা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। সাহিত্য এক প্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকা চাই, প্রক্রিয়াটি ঠিক্ খেলা নয়; খেলারও উদ্দেশ্য ছিল আদিম যুগে, এখনও অন্যরূপে আছে, পরেও থাকবে, অন্যরূপে। এমন কি যোগেরও একটা উদ্দেশ্য আছে, আনন্দ কিম্বা শান্তি, কিম্বা স্বরাট হওয়া। নিষ্কাম প্রক্রিয়া কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতন কথার কথা। প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকলে সে উদ্দেশ্যের মূল্য থাকা চাই। উদ্দেশ্য বাইরের কোন ভাব হলে একজনের হওয়া সম্ভব হত, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিতরের, কাজ থেকেই তার উৎপত্তি, অতএব উদ্দেশ্য একাধিক ব্যক্তির। উদ্দেশ্যের মূল্যও একজনের দান নয়। উদ্দেশ্যের মূল্য সম্বন্ধে জনকয়েকের মতামতে মিল থাকা চাই, নচেৎ সাহিত্য ডাকটিকিট-সংগ্রহের চেয়েও নীচুস্তরের খাম্‌খেয়াল হত। যাঁদের শিক্ষাদীক্ষার আনন্দ পাওয়ার ও সৃষ্টির সুবিধা ছিল এতদিন তাঁরাই ছিলেন জনকয়েক। সেই ওপরতলার বাসিন্দার মতামতে মিল থাকলেই যে কোন উদ্দেশ্য সর্ব্ব-সাধারণের বলে গৃহীত হত, সর্ব্বসাধারণকে গ্রহণ করান হত, বিচার করবার সুযোগ না দিয়ে, নানা প্রকারে। এখন জন কয়েক আর কয়েকজন মাত্র নয়, তার অর্থ আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কী আশ্চর্য্য! যখন সাহিত্য ছিল একটি মাত্র শ্রেণীর প্রক্রিয়া, তখন সে

প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামতের প্রচারকে প্রোপাগ্যাণ্ডা বলা হত না, তখন সাহিত্য হত সাহিত্যের জন্য, তার মধ্যে চিরন্তন মূল্যের আভাস পাওয়া যেত, আর এখন ঢের বেশী সংখ্যক লোকের মধ্যে মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মতের ঐক্যকে প্রোপাগ্যাণ্ডা বলেই সাহিত্যকে জাতিচ্যুত করা হচ্ছে! আমার বক্তব্য, অধিক সংখ্যক লোকের মতামতকে সংখ্যাধিক্যের জন্য, কিম্বা বিপরীত মতামত পোষণ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রোপাগ্যাণ্ডা বলা অন্যায়। যাঁদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে, স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে তাঁরা অবশ্য তাই বলবেন। তাতে এসে যায় না, তাঁরাই প্রথমে পথ দেখিয়েছেন। সাহিত্য, অন্তত নবযুগের সাহিত্য প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হতে বাধ্য। রামায়ণে, মহাভারতে আর্য্যধর্ম্ম, ক্ষাত্রধর্ম্মের তরফ্‌দারি আছে; রবীন্দ্রনাথেও আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার: পুরাতন সমাজের বিপক্ষে এবং এখনকার নতুন সমাজের তরফে কিছু বলতে গিয়েও ব্যাস বাল্মিকী রবীন্দ্রনাথকেও প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট হতে হয়েছে। জনকয়েক যখন সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মিশে যায়, কিম্বা জনসাধারণে কোন কারণে, বুঝে, না বুঝে, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার দরুণ একটি শ্রেণীকে স্বীকার করে নেয়, তখন সাহিত্যের প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট হয়ে ওঠেন প্রফেট্‌। প্রোপাগ্যাণ্ডা হল জীবনস্রোতের এই ঘাটার ঢেউ।

(৪) সাহিত্য হল মানুষের মনের ক্রিয়া, মানুষ সমাজেই জন্মায়, সমাজের মধ্যে লালিত পালিত হয়, সমাজেই তার প্রতিপত্তি, মৃত্যুর পর সমাজই তার বার্ষিকী, শতবার্ষিকী উৎসব করে। সাহিত্যিকও মানুষ। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার ক্ষমতা বেশী, কিন্তু তিনি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নন। মানুষ একপ্রকার জীব। যতক্ষণ মানুষ জীব ততক্ষণ সাহিত্যিককে প্রতিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে, নচেৎ তাঁর বাঁচা অসম্ভব। জীবজগতের এই অভিযোজন-কর্ম্মের কর্ত্তা হল জীবের সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি। গাছপালা, জন্তুজানোয়ার, সাধারণ মানব-সমাজে কিভাবে একটি গাছ, একটি জন্তু, একটি মানুষ বাঁচবে নিজের নিজের সমাজ ঠিক করে দেয়। কোথাও যে ব্যতিক্রম হয় না বল্‌ছি না, কিন্তু ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়ম নয়, এবং জীববিজ্ঞানই বল্‌ছে ব্যতিক্রমের বাঁচবার সম্ভাবনা

কম। অর্থাৎ জীবজগতে বিধান দেয় সমাজে, জীবকে এই বিধানের আনুকূল্য করতে হয়। এখন, অভিযোজন-কার্য্যের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম মানসিক ক্রিয়াতে প্রতিভাত হয় স্বীকার করলেও আমি একথা মানতে প্রস্তুত নই যে মনোময় কি চিন্ময় জগতের আইনকানুন জীবজগতের রীতি-নীতির প্রতিকূল। অতিরিক্ত কর্ম্ম কিম্বা ক্রিয়ায় প্রভেদ থাকলেও সাধারণ মানুষের সাধারণ মানসিক ক্রিয়া থেকেই সেই প্রভেদ। কতটুকু প্রভেদ জান্‌তে হলে কিসের থেকে প্রভেদ জানাটাই প্রথমে দরকার। প্রকৃতির নির্ব্বাচনই সামাজিক নির্ব্বাচনের মূলে আছে, তাদের মধ্যে অন্যপ্রকার যত প্রভেদ থাকুক না কেন। যতদূর জানা যায় ততদূর বলা চলে যে এই মনোময় জগতে এমন কোন আগন্তুক অসাধারণ গুণ আবির্ভূত হয় না, যার সম্বন্ধে জীবজগতের ধাপ থেকেই দৈবব্যাখ্যার অপেক্ষা বুদ্ধির পক্ষে বেশী সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা চলে না। জীববিজ্ঞান সম্পূর্ণতার দিকে আরো অগ্রসর হলে আত্মা, প্রতিভা প্রভৃতি যে কোন আগন্তুক ও আকস্মিক গুণের আবিষ্কারের কারণ বার করা সম্ভব হয়। তখন হয়ত টের পাওয়া যায়, আত্মা কি প্রতিভা মানে মানুষের সব শক্তির পরিণত অবস্থায় সামঞ্জস্যের 'আদুরে' নাম। মোদ্দা কথা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়েই মনের কাজকে যাচাই করতে হবে, এমন কি, সাহিত্যিকেরও মনকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল তথ্য যুক্তির সাতত্য, ঐক্য নয়। অজীব, সজীব, অতিজীব, মানবাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে প্রমাণ করতে গেলে সমাজের তৈরী যুক্তির মালা ছিঁড়ে যায়। সে মালা নতুন করে সাজান যায়, কিন্তু ছেঁড়ে না। আমি অন্তত ছেঁড়া মালা পরতে রাজী নই। রসায়নে ইয়ুরিয়া বলে একটা জিনিষ আছে, হেন্‌রী সাহেবের কাছে তার ব্যবহার আজব গোছের মনে হয়, 'ভোলার' সাহেব তাকে ভেঙ্গে যখন গড়লেন তখন তার আজবত্ব রইল না, কেননা কোন কালেই ছিল না। অজ্ঞানতাই আজবত্ব সৃষ্টি করেছিল। আগে মনে হত, শুভ্রজাতির, বড়লোকের ছেলেদের একটা নতুন শক্তি আছে, তারা বিবর্ত্তন-সোপানের উচ্চস্তরের বলেই তারা জগজ্জয়ী, বেশী বুদ্ধিমান ইত্যাদি। এখন দেখা যাচ্ছে যে শেখবার পদ্ধতি এক, কুকুর বাঁদর থেকে আরম্ভ ক'রে নর্ডিক্ ও কোটিপতির ছেলেদের পর্য্যন্ত। বিজ্ঞান আমাদের বড়ই

সাধারণ করে দিয়েছে, কারণ অনেক বিজ্ঞানই এখনও সমাজ থেকে বৃন্তচ্যুত হয় নি। বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি ক্রমেই কিন্তু সমাজ থেকে 'সরে আস্‌ছে, দার্শনিক ও অঙ্কশাস্ত্রবিদের টানের জোরে। না সরিয়ে নিলে যে তাঁদের কর্ম্মের অবসান হয়, অন্ন মারা যায়। বর্ত্তমান সমাজের আবিষ্কৃত জীবনযাত্রা চালাবার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজকাল নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত করবার চেষ্টা চলেছে। যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁদেরই সমশ্রেণীর সাহিত্যিক স্বীকার করছেন যে বিজ্ঞান একপ্রকার গুহ্যধর্ম্ম, সাহিত্যেরই মতো, অতএব সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এই চক্রান্তের ফাঁদে অনেকেই পড়েছেন। ফল কি হয়েছে আমরা জানি, বিজ্ঞান একেবারেই অবোধ্য, যেমন সাহিত্য একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। এই দুইদল ও তাঁদের পরিপোষক ধনী সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে সমাজ এখন মানুষের বাইরের জিনিষ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে জীবন বহিষ্কৃত, সাহিত্যকলা সমাজ থেকে দূরীভূত, চিন্তা থেকে কর্ম্ম, কর্ম্ম থেকে চিন্তা, জীবন থেকে আর্ট ও বিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সব হয়ে পড়ল নিষ্কাম। যেমন নিষ্কামভাবে ধনীশ্রেণী অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে এসেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসের অর্থ সমাজকে অস্বীকার করা, সমাজের পরিবর্ত্তন না মানা, এবং সেই পরিবর্ত্তনকে বুদ্ধির দ্বারা মানুষের অধীনে আনাতে আলস্য। সাহিত্যিককে সমাজসত্তা মানতেই হবে, অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাঁকে মানতেই হবে নচেৎ তাঁর সাহিত্য হবে একটি শ্রেণীর স্বার্থোপযোগী ভাববিলাস। বর্ত্তমান সাহিত্যের এত গলদ, সে সাহিত্য উপভোগে এত বিপত্তি, সাহিত্যে আভিজাত্য-অনুভব—এসব দোষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অ-প্রত্যয়ের দরুণ—অর্থাৎ জীবনের প্রতি আস্থা কম থাকার দরুণ, সমাজ-সত্তাকে গ্রহণ করলে স্বার্থে ঘা পড়বে এই ভয়ের দরুণ। যুক্তির সাতত্য রাখতে আমি শঙ্কিত হই না, কারণ যুক্তি হল সামাজিক আদান-প্রদানের রীতি-নীতি এবং পুরানো সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়লেও পুরাতন দর্শনের ভাষার সমাজ 'সত্তা'র অস্তিত্ব অটুট থাকে। আমি প্রাণবাদীর দৈবব্যাখ্যা মানি না। আত্মার বিশিষ্টতা স্বীকার করি না, বুদ্ধিতে বিশ্বাস করি, মেক্যানিষ্টিক ব্যাখ্যায় আপাতত সন্তুষ্ট, সর্ব্বক্ষেত্রেই সেই পদ্ধতি খাটাতে তৎপর, খাটাতে না পারলে অপেক্ষা করি,

অধীরভাবে দৈবশক্তির কাছে ব্যাখ্যা ভিক্ষা করি না, প্রতীক্ষা করি সেই দিনের জন্য যেদিন বৈজ্ঞানিক, সাহসভরে, সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ, চিন্তার সঙ্গে কর্ম্মের যোগ মেনে নিয়ে, সামাজিক কল্যাণরূপ সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্য স্বীকার করে, শ্রেণীর স্বার্থ ভুলে গিয়ে তার মার্জ্জিত পদ্ধতি সামাজিক সমস্যার মীমাংসা-কার্য্যে নিযুক্ত করবে। তখন হয়ত এই যুক্তির নাম হবে অন্য, তা হোক। আমি বিশ্বাস করি যে সাহিত্য সৃষ্টি কাজটাও সাহিত্যিক নামক জীবেরই একধরণের কাজ। সাহিত্যিক নামক জীবটির মনের উৎকর্ষসাধন হয়েছে, তাই বলে সে অতিজীব নয়, তাই বলে তার মনোভাব প্রকাশ করা এবং লোকের দ্বারা সে মতামত আলোচিত ও গৃহীত হওয়ার গুরু দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত নয়, অর্থাৎ সে কখনই অতিসামাজিক নয়। প্রকাশ তাকে কর্ত্তেই হবে, লোককে তাকে বোঝাতেই হবে, এবং ভাষারই দ্বারা, যে ভাষা তার একার সৃষ্টি নয়। এমন কি নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেও তাই। নচেৎ ব্যর্থতার অসাধারণত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সাহিত্যিকের মন্ত্র নয়। অতএব, জীব ও মনবিশিষ্ট জীব বলেই সমাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ তাকে বজায় রাখতে হবে। যার সঙ্গে লেন্‌দেন্ তাকে বুঝ্‌তে হয়, নচেৎ ব্যবসা চলে না, বাঁচা চলে না, ঘরের মাল ঘরেই পচে। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিক নামক মনবিশিষ্ট জীবের সংবিধানই হল সাহিত্যিকের সাহিত্য-জীবন। সাহিত্যিকের মন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সেই মনই হবে রাজা, অন্য জীব তখন প্রজার মতন তারই কথা শুনবে। কিন্তু তখনও সেই অসাধারণ মনের সঙ্গে সাধারণ জীবের মনের সম্বন্ধে ছেদ পড়বে না। এ যেন পুরুষপ্রকৃতি, কোনটা পুরুষ কোনটি প্রকৃতি বোঝা গেল না, কে কাকে চালাচ্ছে তাও জানা গেল না। কিন্তু বোঝা গেল, দুইএর সম্বন্ধেই জীবনের উৎপত্তি। আশা করি সাহিত্যিক নিজেকে জীবন্ত জীবই ভাবেন।

(৫) রূপ ও বস্তুসত্তার মধ্যে পার্থক্য মধ্যযুগের আবিষ্কৃত স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যে পার্থক্যের মতনই জীবনের পক্ষে অনাবশ্যক, অবাস্তব এবং অপকারী। মঠের মধ্যে, পুস্তকাগারে কি পরীক্ষাগারে আবদ্ধ থাকলে এই প্রকার বিভাগ স্বাভাবিক মনে হয়। সুবিধার জন্য বিভাগ করতেই হয়। কিন্তু নিজের সুবিধা যদি বাস্তব জীবনের স্কন্ধে আরোপ করা যায়,

তা হলে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়, এবং জনকয়েকের সুবিধার জন্য আমরা যাই মারা। অসভ্যজাতি কেন, গ্রীক্ হিন্দুরাও গাছপালা, নদী পাহাড়ের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করতেন, তাঁরা রূপ ও বস্তুকে একই জিনিষের ভিন্ন দিক ভাবতেন, তাই বস্তুর প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল প্রকৃত বিনয়ের। বাইরের বস্তুকে আবার জয় করবার প্রয়োজন হল, তাকে বুদ্ধির কাঠোমোর মধ্যে আনা হল, পাখী গেল উড়ে, হাতে রইল তার পালক, তখন পালকই হল পাখীর প্রতিভূ, শেষে প্রমাণিত হল, হাতে যেটা সেইটাই আদৎ জিনিষ; রূপই আসল, বস্তু-সত্তা হল নকল। কিন্তু এইভাবে জীবন চালান যায় না, কোন আর্টই সম্ভব হয় না—**বিনয় চাই। আবার গরবও চাই।** বিনয়ের জন্য রামায়ণ, যেখানে বানর হয়ে ওঠে মহাবীর, গাছ হয়ে ওঠে মহীরুহ, যেখানে পাথর হয়ে ওঠে দেবতা, পাহাড় হয়ে ওঠে গন্ধমাদন, পাখী, লতাপাতা, রামের শোকে কাঁদে। আর দাম্ভিকতার জন্য গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের হাতে প'ড়ে প্রকৃতি মহাপ্রাণী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে মহা-প্রাণ নির্গত করে, ত্রিয়ানন্ তৈরী হয়, চিত্র হয় জ্যামিতি, সুর হয় অঙ্ক, স্থাপত্য হয় কলকারখানার নকল। অতি বিনয়ও ভাল নয়, দাম্ভিকতাও ধাতে বসে না। যে ব্যক্তি সত্তাকে হৃদয়ঙ্গম করেছে সেই স্বাভাবিক পুরুষ। সেই স্বাভাবিক পুরুষ রূপ ও সত্তার মধ্যে আন্তরিকতা স্বীকার করে, বিলাসীর মতন আপেলের রং উপভোগ করবার জন্য খোলা কেটে টেবিলে সাজায় না, আপেলই রাখে। মূর্ত্তিগড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বর্ণের ছটা বিচ্ছুরিত হয় সেই বর্ণই পাকা, নচেৎ বিসর্জ্জনের সময় যে হর্‌তেল ধুয়ে যায় তাকে কাঁচা রংই বলতে হবে। রূপ ভিন্ন সত্তা সম্ভব নয়। রূপ ও সত্তার পার্থক্য মানলে সত্তার প্রতি, রূপের প্রতিও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় না। দ্বিখণ্ডিত করবার পর আবার যদি খণ্ডগুলি জোড়াও যায় তা হলেও সেই আদিম, অকৃত্রিম সত্তায় ফিরে আসা যায় না। অথচ আর্টিষ্টকে সেই আদিম অকৃত্রিত অখণ্ডিত সত্তায় ফিরে আসতেই হবে। 'শান্তিতে স্মরণ করলে' যে কবিতা হয় তার মধ্যে আর্টের চেয়ে পরমাত্মার সন্ধানই বেশী পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, 'রূপ ও সত্তা দুটি ভিন্ন বস্তু,'—এই দার্শনিক মতামত

সম্ভব হয় সেই সময় যখন সমাজে শ্রেণীবিরোধ ঘটে, তারই ফলে মনের ঐক্য বহুধা-বিভক্ত হয়ে যায়। সেইজন্য চিন্তার ক্ষেত্রেও বিভাগটি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগের সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রায় সকলেই সমাজের রূপ ও সত্তা নিয়ে চুলচেরা তর্ক তুলেছিলেন। এই সময় যে শ্রেণীবিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছিল কে না জানে ? সমাজের মধ্যে যতদিন ঐক্য থাকে, এমন কি শ্রেণীবিরোধ সুরু হয়েছে না বোঝা পর্য্যন্ত, রূপ ও সত্তা সাধারণের কাছে পৃথক মনে হয় না। আমার সন্দেহের আর একটি সমর্থন দিচ্ছি। যুদ্ধের পূর্ব্বে য়ুরোপীয়ান পণ্ডিতদের মুখে শুনতাম—সাহিত্যের বিষয় রূপ, বিজ্ঞানের বিষয় বস্তুসত্তা। আমাদের দেশেই বস্তাপচা মালের কাট্‌তি সম্ভব, তাই আজকাল অনেক যুবকদের মুখেই ঐ মতের পাণ্ডুর পুনরাবৃত্তি শুন্‌তে পাই। কিন্তু সত্য কথা এই, আর্ট ও বিজ্ঞানের মিল গরমিলের চেয়ে আন্তরিক—পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে উভয়েরই উপকার হয়। বিজ্ঞানকে উপেক্ষা ক'রে যে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে পূর্ব্বে বলেছি। বৈজ্ঞানিকও যদি আর্টিষ্টের কাছে শিক্ষানবিশী করেন তা হলে বিজ্ঞানেরই উপকার হয়। বৈজ্ঞানিক ও আর্টিষ্ট দুজনকেই সততার পথে চল্‌তে হয়, ফাঁকি দিলে কারুরই চলে না—যে রঙ্গীন কাঁচের টাইল করে তারও নয়, আবার যে স্ফটিকের গঠনপ্রণালী নিয়ে পরীক্ষা করে তারও চলে না। বিজ্ঞানেরও ইতিহাস আছে, যার জন্য আইনষ্টাইনের অঙ্ক বোঝা যায় না সাইবোলসন্—মরলি, মিনকাউস্কীর কাজের সঙ্গে পরিচিত না হলে; আবার আর্টেরও ইতিহাস আছে, যার জন্যে অবনী ঠাকুরের ছবি বোঝা যায় না অজন্তার ছবির সঙ্গে পরিচিত না হলে। দু'এরই ইতিহাস সমাজ নির্ণয় করে, সমাজের সঙ্গে দু'এরই সম্বন্ধ স্থির ও নিশ্চিত। দুইই এক-প্রকারের সংযম, এবং দু'এতেই বাদ দিতে হয় অবান্তরকে, কিন্তু দু'এতেই আসল জিনিষ বাদ পড়লে সবটাই নিরর্থক হয়ে পড়ে, অনর্থ ঘটায়, যেমন হচ্ছে—বিজ্ঞান পড়ছে 'ভূয়ো' দর্শনের গর্ত্তে, আর আর্ট পড়ছে জ্যামিতির প্যাঁচে, কিম্বা হাজির হয়েছে বড়লোকের বৈঠকখানায়। প্রকৃত সাহিত্যিক সত্তা নিয়েই ব্যস্ত, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গঠনপ্রণালীও দেখেন।

গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ কেবল রূপকার নন, তাঁরা সমাজ ভেঙ্গেছেন, সমাজ গড়েছেন, আবার রাদারফোর্ড, নীল বর্ পরমাণুর মডেল তৈরী করেই বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করেছিলেন। জীবতত্ত্বে বীজ নিয়ে পরীক্ষা হয়, আবার সেই বীজের সজ্জাপ্রণালী নিয়েও কল্পনা করার একান্ত প্রয়োজন আছে। আজকালই কেউ কেউ আর্ট ও বিজ্ঞানের পরস্পরের সম্বন্ধ স্বীকার করছেন, কারণ তাঁরা বুঝেছেন যে **সমাজে** ঐক্য আনার একান্ত প্রয়োজন। আজকালই লোকে বুঝেছে যে কারুশিল্প ও সাধারণ শিল্পের মূল এক ভিন্ন দুই নয়। কিন্তু আমরা তাঁদের কথা জানিনা, জানলেও বুঝি না, কেননা যে সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ধরণের কথা মানুষের মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ে সে পরিবর্ত্তন আমাদের সমাজে হয়ত আসেনি, অন্তত অমনভাবে প্রকট হয়নি।

(৬) আর একটি মাত্র বিচার-বাক্য আপনাদের দরবারে পেশ করব। ভাষা নিয়েই সাহিত্য। ভাষা প্রধানত মানুষের মুখের। তলিয়ে দেখতে গেলে, বাকৃতত্ত্বে, ঐ মুখের অধিকারীভেদ নেই। শিশুর কচি মুখ, শ্রীমুখ, আর পাগলের মুখ যাই হোক না কেন, মুখ-নিঃসৃত ভাষার প্রকৃতি হল এই যে সেটি নিতান্ত দৈহিক ক্রিয়ার অনুকল্প প্রক্রিয়া। ভাষা দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রতিভূ। কাজের বদলি কথা, কিন্তু কাজেই কথার উৎপত্তি। এক একটি কথা মূলত এক একটি দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রতিরূপ সংজ্ঞা। কথার পিছনে যে চিন্তা থাকে তার প্রকৃতিই হল কার্য্যের পূর্ব্বাববোধ। একেবারে অশরীরী চিন্তা নেই, শারীরিক কাজের সঙ্গে চিন্তার সম্বন্ধ সাক্ষাৎ কিম্বা অ-প্রত্যক্ষ। যত অ-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ততই ভাষার পরিণতি—সুরের দিকে। তবুও দৈহিক প্রক্রিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সূক্ষ্মতম অ-বাস্তব চিন্তার পরিণতিও দৈহিক প্রক্রিয়ায়, প্রত্যেক চিন্তার বেগ প্রশমিত হয় দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে। যে কবি ও আর্টিষ্ট সত্য কথা কন, তিনিই ঐ কথা স্বীকার করেন। ভাল গান শুনলে আমার গাল কণ্টকিত হয়ে উঠত, আবার দাড়ি কামাতে ইচ্ছে হত বললে লোকে হেসেছেন—সেদিন একজন বড় কবি বলেছেন—'কবিতা ভাল কি মন্দ পরীক্ষা করা যায় না, তবে যে কবিতা পড়লে গা শিউরে

ওঠে—গায়ে কাঁটা দেয় তাকেই ভাল কবিতা বলি।' ক্ষুরের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর একজন সাহিত্যিক যিনি একাধারে বড় কবি ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক, তিনিও কবিতা লেখার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, কবিতা লেখবার পূর্ব্বে দেহের যে টানটান ভাব থাকে কবিতা লেখবার পর তার অবসান হয়, এবং তাইতেই যা কিছু সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দ। এখন মানস-বিজ্ঞানে বলছে, যে এই পূর্ব্বাববোধের অবস্থায় মানসিক ব্যবহারগুলি স্থিরীকৃত হয় সামাজিক ব্যবহারের আদান-প্রদানের দ্বারাই। এই সামাজিক আদানপ্রদানেই বৈজ্ঞানিকে যাকে মন বলে তার উৎপত্তি, তারপর মন দেহে আশ্রয় করে, এবং আমরা বলি, একটি বিশেষ দেহের বিশিষ্ট মন। কিন্তু মনের বিশেষত্ব বাস্তবিক পক্ষে 'অতি সামাজিক' একেবারেই নয়। যদি আমরা অন্যের সঙ্গে কথা না কইতাম, তারা যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কইত, যদি কারুর সঙ্গে কারুর বাক্ বিনিময় না হতো, তা হলে আমরা নিজেদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা কইতে পারতাম না। আধুনিক সাহিত্যিকের মতে সাহিত্য হল নিজের সঙ্গে কিম্বা নিজের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে কথা কওয়া। কিন্তু বাকের প্রকৃতি ঐ হলে কি করে তা সম্ভব? বাক্ হয় স্পষ্ট, না হয় গুপ্ত ব্যবহারের প্রতিভূ, ব্যবহারের পূর্ব্বাববোধ ও প্রত্যক্ষতার সঙ্গে তার যোগ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজের সঙ্গে বাকের ও বাক্যের সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু ঐ সম্বন্ধবিষয়ে আমরা সব সময়ে সচেতন নই। ব্যাপারটাকে বিশদ করা যাক্। মানসিক ব্যবহারকে সুবিধার জন্য দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে; (১) যে ব্যবহার বাইরের নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে কোন উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সজ্জিত; এবং (২) যে ব্যবহার ভেতরকার প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারের ভাষা খামখেয়ালীর, বিকৃত মস্তিষ্কের, **সীজোফ্রেনয়েডের** আবোল-তাবোল। এপ্রকার বাক্যের সঙ্গতি নেই বলা চলে না, সঙ্গতিটুকু কোন বিশেষ কথা, ঘটনা কিম্বা ব্যক্তির অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয় মাত্র। মনে হয় যেন সে বাক্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, যদিও বক্তার কাছে হয়ত আছে। আধুনিক লেখকেরা বলেন তাঁদের নিজেদের ও দলের কাছে নিশ্চয় আছে। কেন তবু অসঙ্গত

মনে হয় বিচার করলেই বোঝা যাবে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে উদ্দীপক ও উদ্দীপনার সম্বন্ধে কোন ভাষার সঙ্গে এই আবোল তাবোল ভাষার পদ্ধতিতে পার্থক্য নেই—আছে পার্থক্য কেবল **সমাজের গ্রহণ-শীলতায়**। যে সব উদ্দীপনায় পাগলের মুখ থেকে বাক্য বেরুচ্ছে তাদেরকে সমাজ উপযুক্ত ভাবছে না। অর্থাৎ অনুষঙ্গে কোন দোষ নেই; তবু অসঙ্গত মনে হয় এইজন্য যে সমাজ অর্থ-সঙ্গতিটুকু স্বীকার করছে না। এইখানে অন্তত সমাজ কর্তা। অর্থ-সঙ্গতির শেষ আপীলও রুজু করতে হবে সাধারণের এজ্‌লাসে। যদি জনসমাজ সে আপীল গ্রাহ্য করে তবেই আধুনিক লেখকদের গুপ্তমন্ত্র সাহিত্যপদবাচ্য হবে। খানিকটা মতের ঐক্য হওয়া চাই, নচেৎ প্রকাশের কোন মূল্য থাকে না, সাহিত্যিক মনের সংবাদেরও মূল্য থাকে না। বাক্যের মধ্যে সঙ্গতি বা যুক্তির অংশটুকু বক্তার নিজের সৃষ্টি নয়। অন্তত এইখানে শুদ্ধ ব্যক্তিতন্ত্রবাদ আর টেঁকে না। তা হলে মোট কথা দাঁড়ায় এই যে, কি বাক কি বাক্যে সামাজিক সত্তা ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে। সাহিত্যিকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে সামাজিক সত্তা স্বপ্রকাশ করছে না বলে স্বীকার করা চলে না যে সামাজিক সত্তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ নেই, কিম্বা কম। হাওয়া যখন স্থির তখন মানুষে হাওয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করলেও তার চলে, কিন্তু যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীতে যখন বারুদ তৈরীর জন্য সোরা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন হাওয়া আনার প্রয়োজন হয়েছিল। জলের ওপর নৌকো-জাহাজ চালাবার সময় হাওয়া মানতে হয় কি না হয় সারেঙ্গ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাওয়া যায়। আজ আকাশে ঘনঘটা, ঝড় উঠেছে, তাই বলছি সব সাহিত্যিককে—আবহাওয়ার মতন এই সমাজ-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করুন, নচেৎ মাঝদরিয়া পর্য্যন্তও পশ্চিমী সাহিত্যের মতন যেতে হবে না—কিনারার কাছে ভরাডুবি হবে। তখন সেলুনে বসে নাচ্‌গান ও কক্‌টেল টানলে, ফষ্টিনষ্টি করলে, ঝড় লজ্জায় ইয়োলাসের থলের ভেতর আত্মগোপন করবে না। সমাজ-সত্তাকে অবহেলা করেই সব সাহিত্য হয়ে উঠেছে বেলোয়ারী চুড়ীর ব্যবসা, বড়ই ঠুন্‌কো, বড়ই হাল্‌কা, বড়ই ফাঁকা, যদিও রঙ্‌বাহার্।

এই বিপদ আমাদের আরো বেশী, কারণ পুরোনো কালে যে সমাজ মানুষের প্রত্যেক কর্ম্মে বুঝিয়ে দিত যে সে আছে, সে সমাজ আজ ভেঙ্গে গিয়েছে, সে সামাজিক সত্তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমাজ ভেঙ্গে গিয়েছে, পড়ে রয়েছে তার টুক্‌রো, তার মধ্যে একটি বলছে আমিই সব, অন্য টুক্‌রো শুনতেই পাচ্ছে না এই দাবী, যারা পাচ্ছে তারা মানছে না। সমাজ যখন নেই, অথচ একটি মাত্র শ্রেণী রয়েছে, তখন সেই শ্রেণীর সত্তাকে সমগ্র সমাজ-সত্তা বলে ভুল করা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ত' চিরকাল থাকবে না, অন্য শ্রেণী মাথা তুলবে, তখন বাধবে বিরোধ! সে বিরোধের অবস্থা কারুর কারুর কাছে অবশ্যম্ভাবী মনে হলেও বিরোধ কিছু চিরন্তন নয়। **শ্রেণীবিরোধ ইতিমধ্যের ইতিহাস**। শ্রেণীর সত্তা ভাঙ্গছে গড়ছে, তার শেষ নতুন সমাজে। শ্রেণী-সত্তাকে আশ্রয় করে বড় সাহিত্য হতেই পারে না। কোন ব্যক্তি এই শ্রেণীর আব্‌হাওয়াতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না, কোন সাহিত্যিক এই অবস্থায় বড় কিছু লিখতেই পারে না। খণ্ড সত্তায় যাদের আশ মেটে তাদের কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু বড় আর্টিষ্ট এক একটি বৃকোদর, তাই রবীন্দ্রনাথ ছোটেন অন্যদেশে, রাশিয়ায়, ক্ষুধা মেটাতে, নতুন সমাজ দেখতে। যে দিন একটি মাত্র শ্রেণী স্ব-ইচ্ছায় সমাজের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করবে সে দিন শুভদিন—কিন্তু ইতিমধ্যে কি করা যায়? আমি প্রথমেই বলেছি বাংলাদেশে যেন নতুন শ্রেণী তৈরী হচ্ছে মনে হয়; যা প্রমাণ দিয়েছি তা'ছাড়া অন্য প্রমাণও পেয়েছি। এই নতুন শ্রেণীর উত্থান ও পুরাতন শ্রেণীর পতনের মূলে যে সমাজ শক্তি আছে তাকেই সাহিত্যের কাজে লাগতে হবে। সে শক্তির নাম বিজ্ঞান, অর্থাৎ নিয়তিকে বশে আনা; তার আর একটি নাম আর্থিক-বৈষম্য অবসানের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা, বাঁচবার জন্য, ভাল করে বাঁচবার জন্য। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।'

এখন সাহিত্যে সামাজিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন কারা? যাঁরা ঐ একমাত্র শ্রেণীর চেয়ে অন্ততপক্ষে ষোলগুণ সংখ্যায় বেশী, যাঁরা উকীল ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, চাকুরে নন। যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন, ইতিহাসের নিয়ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির

দ্বারা আবিষ্কার ক'রে নিয়তির হাত থেকে মুক্ত হতে চান, সমাজের ভবিষ্যৎকে করায়ত্ত করতে চান। যাঁরা তরুণ অথচ জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক। বিশেষ ক'রে যাঁরা জমির সংস্রব ছাড়েন নি ; কেননা জমিই হল আমাদের সমাজসত্তার প্রকৃত সত্ত্ব। আমি শুনেছি পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে যাঁরা জমি চাষ করেন তাঁদের বেশীর ভাগ মুসলমান। ভাল কথা, অতএব মুসলমান সাহিত্যেকের দায়িত্বই এ ক্ষেত্রে বেশী। তাঁরা যদি কেবল আরবী ফার্সী উর্দ্দু জবান আমদানী করে বাংলা সাহিত্য বড় করতে চান, তা হলে তাঁদের চেষ্টা সফল নাও হতে পারে, কেননা হিন্দুরা আপত্তি করবে। কিন্তু তাঁরা যদি নতুন শ্রেণী-গঠনের ভার নিয়ে সমাজসত্তাকে সগৌরবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহালে সত্যই সাহিত্যের উপকার হবে। তখন সে সাহিত্য হবে সকলের; হিন্দুরাও আর আপত্তি করবে না, আনন্দে গ্রহণ করবে, আরো বড় করতে সাহায্য করবে। কারণ হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক, সমাজ এক, দুই নয়, ভাল করে বাঁচবার ব্যগ্রতায় তারা এক, তাদের গোষ্ঠীজীবন এক, অধিকারের চেয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধে তারা এক। তাদের চিন্তাধারা একই প্রণালীতে বয়। কিন্তু মানসিক সংস্কারে যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তার মূল কারণ এই মাটির সংস্রবে ও গ্রামে থাকার দরুণ তাঁরা হিন্দুদের মতন অ-বাস্তব হয়ে পড়েন নি, এখনও সত্তার সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, জমির সঙ্গে তাঁদের যোগ আছে। সেই জন্য তাঁদের ভাষায় অত প্যাঁচ নেই। লাঠির মতই তাঁদের ভাষা সোজা আসে। তাঁদের ঐতিহ্যে ধনিকতন্ত্র ফুটে উঠতে পারে নি, তাঁদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কম, জাতিবিভাগ কম, তাঁদের ধর্ম্মে সামাজিক সাম্য খুব জোরেই ঘোষিত হয়েছে। আজ পূর্ব্ববঙ্গে তাঁরা অধিকাংশই গরীব। চাকরীও তাঁরা কম করেন, সহরে বাস করতেও চান না। এত সুবিধা তাঁদেরই। অতএব তাঁদের কাছেই আমার প্রত্যাশা বেশী। তাঁরা ইচ্ছা করলে সমাজকে ও সাহিত্যকে গড়ে তুলতে পারেন। নতুন সমাজ তৈরী না হলে তাঁদের ক্ষতিই বেশী। সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা হিন্দু তাঁরাও এই কাজ গ্রহণ করুন। হিন্দু মুসলমান সমস্যা নতুন সমাজে থাকবে না, ক্ষুধার চোটে সমস্যা মিটবে বললে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হল না। নতুন সমাজ সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত হলে হিন্দু মুসলমানের

যে প্রকৃত মিলন ঘটবে তারই ফলে হবে সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। বড় কাজ একত্রে না করতে পেরেই আমাদের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, যেমন নতুন কাজ না পেয়েই পুরাতন শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যবোধ হয়েছিল। ইতিহাসের পটভূমিকায় নটের অভিনয়-অংশ সম্বন্ধে সচেতন না হলে কি করে চলবে? সাহিত্যে যে সমাজসত্তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক চেতনার প্রয়োজন। যে সেই সমাজ গড়বে, সেই বড় সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য।

সমাজসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার পর, তার সঙ্গে যুক্ত হবার পর সাহিত্যের মাত্রা ঠিক্ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। আমি যা বলতে চেষ্টা করিলাম সেটি হল কাব্য-জিজ্ঞাসার মুখবন্ধ। 'অথ' কথাটির অর্থ পরিষ্কার না হলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যেমন কচি ছেলের আবদার মনে হয়, তেম্‌নি সাহিত্যের বস্তু না বুঝলে কিম্বা তার সঙ্গে বিযুক্ত হলে কাব্য-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যের মাত্রা-নিরূপণ নিতান্তই নিরালম্ব বিচার হয়ে উঠে। 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা'। কাব্য-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে আমার বলবার বেশী কথা নেই, কেননা আমি কবিও নই, আর্টিষ্টও নই। আমি আনন্দ পেতে চাই, মিলে মিশে। নমস্কার, ধন্যবাদ।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর—সাহিত্যশাখার অভিভাষণ

নব্য-বাংলার শক্তিকেন্দ্র

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর মাত্র এক শত বৎসর অতীত হইল। এই একটি শতাব্দীর মধ্যে বাংলা দেশে যে অদ্ভুত শক্তির ফোয়ারা ছুটিয়াছে তাহা দেখিলে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। বস্তুতঃ বাংলার ইতিহাসে ইহাই স্বর্ণযুগ। গৌরবের এত উচ্চশীর্ষে বাঙ্গালী আর কখনও আরোহণ করে নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা দেশে যত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে পৃথিবীর যে কোন জাতি গৌরবান্বিত হইতে পারে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এতগুলি কর্ম্ম-বীরের এত অল্প সময়ের মধ্যে একই দেশে আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসেও দুর্লভ।

কিন্তু কেন এমন হইল? যে জাতি শত শত বৎসর ধরিয়া মরিয়াছিল কোন মন্ত্রশক্তিতে যে পুনর্জীবিত হইল? জড় পদার্থে কে প্রাণ-সঞ্চার করিল? কোন্ সোনার কাঠির পরশে ঘুমন্ত রাজকন্যা জাগ্রত হইল?

ইহাই আমাদের আজকার আলোচ্য বিষয়।

আমাদের জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের পতন এবং অভ্যুদয়ের মূলে রহিয়াছে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আমাদের ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মের দ্বারাই আমাদের উন্নতি হইয়াছে, এবং এই ধর্ম্মেই আমাদের অবনতি হইয়াছে।

ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি বুঝি সর্ব্বাগ্রে তাহারই চর্চ্চা করা উচিত। আমাদের কাছে ধর্ম্ম একটি ব্যাপক পদার্থ। সংজ্ঞা দ্বারা ইহাকে সঙ্কীর্ণ করা যায় না। কোন একটি পুস্তকে বা শাস্ত্রের মধ্যে ইহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ইহা মানুষের প্রতি প্রযুক্ত কয়েকটি আদেশ মাত্র নহে। ধর্ম্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্ম্মের জন্য নহে। মানুষ শুধু সীমাবদ্ধ জীব নহে। সে "সীমার মাঝে অসীম"। অসীমত্বের উপাদান দ্বারাই মানুষ গঠিত। যে স্বতন্ত্র, স্বাধীন। সে নিজের ইচ্ছায় যথারুচি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যে আদেশ তাহার অন্তরাত্মা হইতে উদ্ভূত হয়, সে তদনুসারেই চলে। বাহিরের আদেশ

দ্বারা মানুষকে বদ্ধ করা অসম্ভব। মানুষ "নির্যোগ-বিষয়" হইতে পারে না। শাস্ত্রাদেশ পালনের জন্য মানুষ শুধু উপকরণীভূত হইতে পারে না। "স্বতন্ত্রস্তু ইচ্ছামাত্রেনৈব মন-আদি-প্রেষয়িতৃত্বম্" (কেন-ভাষ্য)। স্বতন্ত্র মানুষ নিজেই তাহার পরমার্থ নির্ণয় করে। মনুষ শাস্ত্রাধীন হইলে তাহার নিজের পরমার্থ নির্ণয়ের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়। আমরা সমস্ত শাস্ত্রের উপর মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করি। শাস্ত্র মানুষের আলোচনার বিষয় মাত্র; শাস্ত্র মানুষের প্রভু হইতে পারে না। শাস্ত্র চর্চ্চা দ্বারা মানুষের জ্ঞানলাভের সাহায্য হয়। মানুষ শাস্ত্রের ভৃত্য নহে।

"জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রং, ন কারকং। ন তু শাস্ত্রং ভৃত্যানিব বলাৎ নিবর্ত্তয়তি নিয়োজয়তি বা। পুরুষাঃ স্বয়মেব যথারুচি সাধন-বিশেষেষু প্রবর্ত্তন্তে।" (বৃহদারণ্যক-ভাষ্য—শঙ্কর)

"শাস্ত্র জ্ঞাপক মাত্র, আদেশক নহে। শাস্ত্র মনুষকে ভৃত্যের মত বলপূর্ব্বক কর্ম্মে নিবৃত্ত বা প্রবৃত্ত করায় না। মানুষ স্বেচ্ছায় সাধনে প্রবৃত্ত হয়।"

মানুষ স্বতন্ত্র, স্বাধীন জীব। ধর্ম্ম তাহার আত্মাতে বিকশিত হয়, বাহির হইতে আসে না। মানুষের স্বাধীনতা স্বীকারই আমাদের ধর্ম্মের প্রধান তত্ত্ব।

আমাদের ধর্ম্মের দ্বিতীয় তত্ত্ব হইতেছে ধর্ম্ম-দর্শনে অবিচ্ছেদ। দর্শন ব্যতীত ধর্ম্ম কিংবা ধর্ম্ম ব্যতীত দর্শন আমাদের ধারণায় অসম্ভব। আমাদের দর্শন শুধু একটা মতবাদ মাত্র নহে। জীবনে দর্শনের প্রয়োগ করিতে হইবে; দর্শনকে সাধনে পরিণত করিতে হইবে; দর্শনানুরূপ জীবন গঠন করিতে হইবে, তবেই তো দর্শনের সার্থকতা। দর্শন অলসচিন্তার বিষয় নহে; দর্শন কর্ম্মে পরিণত করিতে হইবে, জীবনে দর্শনের উপলব্ধি করিতে হইবে। তদ্রূপ ধর্ম্মও বাহিরের সামগ্রী নহে; কয়েকটি কর্ম্মের শাস্ত্রানুগ অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত নহে। ধর্ম্ম পুস্তকে নাই; ধর্ম্ম অন্তরাত্মায়। ধর্ম্মের মূল অন্তরাত্মার দর্শনে। অন্তরাত্মার দর্শনলব্ধ সত্য জীবনে সাধন করিতে হইবে; তবেই তো ধর্ম্মলাভ হইবে। ধর্ম্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। দর্শনের পরিণতি ধর্ম্মে; ধর্ম্মের মূল দর্শনে। মনুষ্যাত্মা স্বাধীন

জীব। সে নিজের দর্শন দ্বারা নিজের ধর্ম্ম নির্ণয় করে। এবং স্বনির্ণিত ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক আপনার পরিণাম প্রাপ্ত হয়। মানুষের ভাগ্য-বিধাতা মানুষ নিজে।

আমাদের ধর্ম্মের এই দুইটিই হইতেছে মূলতত্ত্ব। এত বড় স্বাধীনতার বাণী, উৎসাহের বাণী আর কে শুনাইতে পারিয়াছে? এ বাণী যে অফুরন্ত শক্তির উৎস। যখনি আমরা এ বাণী বিস্মৃত হইয়াছি, তখনি আমাদের শক্তি লোপ হইয়াছে। তখনি আমরা অদৃষ্টবাদী হইয়া জড়ত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং বাহ্য কর্ম্মের শাস্ত্রানুগ অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম মনে করিয়াছি। তখনই শাস্ত্র আমাদের জ্ঞানলাভের সহায়ক না হইয়া আমাদের প্রভু হইয়া উঠিয়াছে। আবার কোন মহাপুরুষ এই পরম-উৎসাহ-পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী স্মরণ করাইয়া দিতে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন; তখনি আমাদের মধ্যে শক্তির ফোয়ারা ছুটিয়াছে; আমরা অসাধ্য-সাধন করিয়াছি।

আমাদের "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর" জাতীয় ইতিহাসের ইহাই মূল সূত্র।

কথাটিকে আর একটু বিশেষ ভাবে বা নির্দ্দিষ্টাকারে আলোচনা করা যাউক।

আমাদের সকল ধর্ম্মের, সকল দর্শনের মূলে রহিয়াছে 'বেদান্ত'। বেদান্তকে হিন্দুমাত্রেই শ্রদ্ধা করেন এবং ইহারই ব্যাখ্যাভেদে ধর্ম্মের সম্প্রদায়ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত হিন্দুই অন্তরে-অন্তরে বৈদান্তিক। সমস্ত হিন্দুই বিশ্বাস করেন যে তিনি অসীমত্বের উপাদানে গঠিত; ব্রহ্ম হইতেই অবরোহণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মে অধিরোহণ করাই তাঁহার পরম পুরুষার্থ।

> "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
> সচ্চিদানন্দরূপোঽহং, নিত্যমুক্তস্বভাববান্"।

"আমি দেব, অন্য নহি। আমি ব্রহ্ম, আমি শোক-ভাগী নহি। আমি সচ্চিদানন্দময়; আমার স্বভাব নিত্যমুক্ত।"

সমস্ত হিন্দুই একথা বলিবার অধিকারী এবং নানা আকারে বলেন এবং বিশ্বাস করেন। এ যে বড় উৎসাহময় বাণী। অনন্ত শক্তির উৎস যে এ বাণীর মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। আমি তো ক্ষুদ্র নহি; আমি

যে অমৃতের অধিকারী। সমস্ত হীনতা আমার মধ্য হইতে দূর হইয়া গেল; রহিল শুধু অনন্ত উৎসাহ, অবাধ শক্তি, অপরিসীম আনন্দ।

কিন্তু এই মহাবাণীই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কখন কখন মহা অনর্থ ঘটাইয়াছে। তখন আমরা গর্ব্বান্ধ হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। এত বড় কথা শুনিয়া আমাদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আমরা মনে করিয়াছি আমরাই এক একটি ব্রহ্ম। আমাদের কর্ম্ম বা উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তির লোপ হইয়াছে। আমরা উপাসনা ভুলিয়া গিয়াছি। কর্ম্ম ভুলিয়া ব্যর্থ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছি। সত্য উপাসনা ভুলিয়া কতকগুলি অনুষ্ঠানকেই 'ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছি। আমাদের সমস্ত স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে; আমরা অসার জড় পদার্থে পরিণত হইয়াছি এবং শাস্ত্রের ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছি।

এইরূপেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উত্থান ও পতন হইয়াছে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও বেদান্তের ইতিহাস ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। বেদান্তে বা ধর্ম্মেই আমাদের উন্নতি ও অবনতি। যখন বেদান্ত সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত জনমত আমাদের কর্ম্ম ও ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে তখনই আমাদের অবনতি; যখন কোন মহাপুরুষ এই ভ্রান্ত জনমতকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া আমাদের কর্ম্ম ও ভক্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন তখনই আমাদের উন্নতি; তখনই আমাদের দেশে অসংখ্য কর্ম্মবীর ও ভক্তবীরের আবির্ভাব হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য একবার সমস্ত ভারতবর্ষকে নাড়িয়া দিয়াছিলেন নবম শতাব্দীতে। মীমাংসকগণ তখন ধর্ম্মকে অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যজ্ঞবেদীর সুষ্ঠু নির্ম্মাণ এবং চরুরন্ধনের হাতা-বেড়ীর মাপ নির্ণয় করাই ছিল সে যুগে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব। মানুষ শাস্ত্রের ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবান শঙ্কর তখন তাঁহার ভাস্বর দর্শন লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে নাই; ধর্ম্ম ব্রহ্ম-পদ-প্রাপ্তি-সাধনায়। আর ব্রহ্মপদ লাভ হইবে নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা 'অনাত্মার' জয়ে, আত্মার স্বরূপোপলব্ধিদ্বারা, তিনি ঘোষণা করিলেন যে মানুষ শাস্ত্রের দাস নহে। মানুষ স্বাধীন,

স্বধর্ম্মনির্ণয়ে অধিকারী ; মানুষ অমৃতের পুত্র। সে যুগে আমরা যে দর্শন রচনা করিয়াছিলাম তাহা আজও জগৎ-সভায় সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

আবার আমরা সে স্বাধীনতার বাণী, সে উপাসনার বাণী বিস্মৃত হইলাম। বেদান্তের কুব্যাখ্যাদ্বারা আমরা মায়াবাদী হইলাম। সংসারকে অস্বীকার করিলাম। কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে চাহিলাম। উপাসনা ভুলিয়া গেলাম। ফল হইল জাতীয় জড়ত্ব, অসারতা, অধঃপতন। সে যুগের দর্শনের প্রতীক চৈতন্য-চরিতামৃতের সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

আবার এই বাংলার মাটিতে নবদ্বীপচন্দ্রের উদয় হইল। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বিধ্বস্ত করিলেন। সার্ব্বভৌমের শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় ভগবানে তিনি অনন্ত শক্তি ও অনন্ত প্রেমের সঞ্চার করিলেন।

"অপানি শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পানি করণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥

*   *   *   *

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয়'॥

ভগবান অপানি করণ্; অতএব তিনি নিষ্ক্রিয় নিঃশক্তি নন। তিনি অনন্ত শক্তির উৎস ; তিনি অনন্ত লীলাময়। আবার ভক্তির বন্যা ছুটিল। সমস্ত বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিল। "সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবান"-এর সঙ্গে ভক্তগণের মধুর লীলা চলিতে লাগিল। সে লীলা আজও এই বাংলার মাটিতে চলিতেছে। আজও অসংখ্য ভক্তের চরণ-ধূলিতে বাংলা দেশ পবিত্র হইতেছে।

সে যুগে আমরা বাংলা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছি। এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছি যার সমকক্ষ পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে দুর্লভ। সে বাঙ্গালীর একটি পরম গৌরবময় যুগ। তখন অসংখ্য ভক্তবীরের আবির্ভাবে বাংলা দেশ পবিত্র হইয়াছে।

আবার আমরা সে মন্ত্র বিস্মৃত হইলাম। আবার অলস, অসার, জড়বুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। বিদ্যাচর্চ্চা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম। কর্ম্মের

শক্তিতে আস্থাহীন হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলাম; অধঃপাতের চরমসীমায় উপনীত হইলাম। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সে এক তমোময় যুগ।

তখন ইংরাজ তাহার পাশ্চাত্য কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এতই জড় হইয়াছি আমরা যে 'আঁখি' মেলিয়া সে আলো দেখিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। বরং "জাতি যাইবে" প্রভৃতি নানা আজুহাতে সে আলোককে দূরে ঠেলিতে প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছি। তখন বিধাতার বিধানে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইল। তিনি এই পাশ্চাত্য কর্ম্মশক্তি বাঙ্গালীর চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন এবং কর্ম্মশক্তিকে আমাদের রক্তমজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম-কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। শুধু অনুকরণ যে কর্ম্মশক্তির আশ্রয় সে শক্তি অধিকদিবস-স্থায়ী হইতে পারে না। শুধু বুদ্ধি-পরিচালিত শক্তিও আত্মঘাতী হইয়া উঠিতে পারে। কেননা, বুদ্ধি তীক্ষ্ণধার; যে কোন গ্রন্থি কাটিয়া ফেলা তার পক্ষে সুসাধ্য। ধারণ-স্বভাব ধর্ম্মই কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম উৎস। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধিত হইল।

বেদান্তেই এই সুন্দর সামঞ্জস্যের সমাধান হইল। মনুষ্যাত্মার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। এই স্বাধীনতাকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া স্বীকার করা হইল। সমস্ত শাস্ত্রকে স্বাধীন মনুষ্যাত্মার উন্নতির উপকরণীভূত বলিয়া স্বীকার করা হইল। শাস্ত্রের নব নব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। শাস্ত্র আর আমাদের আদেশ প্রদান করিল না; তৎপরিবর্ত্তে প্রচুর 'আলোক' উদ্গীরণ করিল। সমস্ত সংসার ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বলিয়া মান্য হইল। কাজেই সংসার ত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা রহিল না। বরং সংসারসেবাই ব্রহ্মসেবায় পরিণত হইল। সংসার লঙ্ঘন আর ব্রহ্মকে লঙ্ঘন একই জিনিষে পরিণত হইল। কর্ম্মের গুণগত পার্থক্য রহিল না। গৃহসর্ম্মার্জ্জন করা, সমুদ্রযাত্রা করা, আর বেদীতে বসিয়া প্রার্থনা করা যাহা কিছু কর্ম্ম সমস্তই ব্রহ্মোপাসনায় পরিণত হইল। ধর্ম্ম বেদী ত্যাগ করিয়া সমস্ত বিশ্বে শিকড় গাড়িল। কর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ম্ম অন্যরূপে এখন আমাদের কাছে উপনীত হইল। কর্ম্ম আর শুধু কর্ম্ম রহিল না; কর্ম্ম

ভগবদুপাসনায় পরিণত হইল। শাস্ত্র নিত্য নূতন আলোক বিতরণ করিতে লাগিল। তখন হইতেই বাংলাদেশে এক বিরাট শক্তির লীলা চলিয়াছে। বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই বিরাট শক্তিরই পূর্ণ প্রকাশ। বিবেকানন্দ এই নূতন বাণীর শ্রেষ্ঠ প্রচারক। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী কর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। জগৎ অবাক হইয়া শুনিয়াছে। বাঙ্গালীর ধমনীতে নূতন শক্তির লীলা বহিয়াছে।

ইহাই বাঙ্গালীর বর্ত্তমান গৌরবের মূল সূত্র। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি এই বাণীকেই তাঁহার "মুক্তি-সাধন" কবিতায় সুন্দর ভাষা দিয়াছেন,

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।"

ইহাই নব্য বাংলার শক্তিমন্ত্র। শঙ্করের জ্ঞান, চৈতন্যের ভক্তি ও বর্ত্তমান যুগের কর্ম্ম—এই ত্রিধারার অপূর্ব্ব সমাবেশে নব্য বাংলার সংগঠন হইয়াছে। বিবেকানন্দ এই ত্রিধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম।

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

লিঙ্‌হামের পথে

[লর্ড ডান্‌সানী]

জরকেন্‌স্‌ বল্লে, "কোনও রকম পানীয় পেটে না পড়লে আমি গল্পই বলতে পারি না, এই রকম একটা ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে। এমন কথা কেন রটে আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। আজ বিকেলেই হঠাৎ একটা গল্প মনে এল—বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যদি গল্প বলতে চাও। একটু অসাধারণ অভিজ্ঞতা, যদি শুন্‌তে চাও বলতে পারি। কিন্তু বলে রাখছি এক বিন্দু পানীয়েরও প্রয়োজন নেই।"

আমি বল্লুম, "তা আর বল্‌তে?"

জরকেন্‌স্‌ বল্লে, "আমার একটি মাত্র নিবেদন আছে—এই গল্প যদি আর কোথায়ও চালাও, এমন ভাবে বোলো যাতে লোকে বিশ্বাস করতে পারে। এমন লোকও আছে—হয়ত বেশী নয়. তারা—যারা তোমার-বলা আমার গল্পগুলোকে নেহাৎ আষাঢ়ে খেয়াল ভেবে থাকে। একজন তো আমায় মুন্‌চাউসেনের জুড়ি বলেছে তুলনাটা আমার পক্ষে গৌরবের, তবু কিনা মুনচাউসেন বলে বসলো! তুলনাটা আমায় বেশ ব্যথা দিয়েছিল—তোমার প্রকাশককেও আঘাত করে থাকবে। এ তোমার ঐ গল্প বলার ভঙ্গীর দোষে। ঘটনাগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু এমন ভাবে বলেছ যাতে এই সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে। এখন থেকে একটু হুঁশিয়ার হবে ত, কি বলো?"

আমি বল্লুম, "হুঁ, মনে থাকবে।"

এইবার জরকেন্‌স্‌ গল্প সুরু করলে।

"হাঁ একটু অসাধারণ বই কি—বেশ একটু। তাই বলে তুমি উড়িয়ে দেবে না নিশ্চয়ই। নইলে শুধু বিশ্বাস করানোর জন্য মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে নেহাৎ নীরস ঘরোয়া গুলোই বেছে নিতে হত—ধর না পেঞ্জ থেকে ভিক্‌টোরিয়া ষ্টেশন অবধি রেল-যাত্রার কাহিনী। আমাদের সে অবস্থায় এসে নিশ্চয়ই পৌঁছুতে হয় নি।"

আমি বল্লুম, "খেপেছ ?"

"যাক।" এই সময় আর দু জন বন্ধু আমাদের কাছে এসে ঘেঁসে বসলেন। জরকেন্‌স্‌ বল্লে ঃ—

"মনে হচ্ছে কালকের কথা। পূর্ব্ব ইংলণ্ডের একটি লম্বা রাস্তা। দু ধারে পপ্‌লারের শ্রেণী—রাস্তাটার পাড়ের মত। মাইল তিনেক লম্বা হবে রাস্তাটা। নীচু জলে ডোবা দেশ—তারই বুক চিরে পথটা চলেছে। ডোবাগুলো থেকে জল ছেঁচে নিয়েছে, তবুও দু চারটে ছোট ডোবা থেকে গেছে—তারই পাশে আর গর্ত্তগুলোর পাশ দিয়ে নলখাগড়ার ডগাগুলো কাঁপছে—যেন একটি সৈন্যদল মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যায় নি। ডোবাগুলোকে শুকিয়ে ফেলেও যেন স্বস্তি নেই, পপ্‌লারগুলোও কাটতে সুরু করেছে। এ পথ যখন প্রথম চোখে পড়ল—প্রান্তরের উভয় প্রান্তে দুটি ঋজু পপ্‌লারের শ্রেণী, যেন সবুজ ও সাদা পালক—তখন লোকগুলো এই কাজেই রত ছিল। আর যাই বল, কি খাসা হাত। ঠিক পথের উপরে এড়োভাবে তারা গাছগুলো ফেলছিল—সেই ভাবেই গাড়ী বোঝাই করার সুবিধা, আর এতে করে লোক-চলাচলের যা অসুবিধা হচ্ছিল তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়—সোজা তিন মাইল ফাঁকা, কোনও যান বাহন পথিক এলে দেখতে পাওয়ার অসুবিধাও নেই। আর আমার চোখেও কিছু পড়ে নি, এক যার কথা বলব সে ছাড়া। সে যাই হোক, কাঠুরেরা একটা গাছ কাটছিল—সেটাকে ফেলতে হবে ঠিক দুটো গাছের মধ্যে, ফাঁকটার ভিতর, এই দুটো গাছের ডাল পালা বাঁচাতে গেলে হাতখানেক জায়গার মধ্যেই গাছটাকে ফেল্‌তে হয়। এমন ওস্তাদের মত তারা গাছটা ফেল্লে যে একটা পাতাতেও ছোঁয়াছুঁয়ি হল না—ঐ দুটি গাছের মধ্যে দিয়ে বিরাট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে গাছটি ভূমিসাৎ হল, আর ঐ দুটি গাছের যে পল্লবগুলি এই গাছটির দিকে মুখ ফিরে ছিল, তারা আতঙ্কে ত্রস্ত হয়ে কেঁপে উঠল। এই পাকা ওস্তাদি দেখে আমি টুপি খুলে হর্ষধ্বনি করে উঠলাম। সবাই এমন করত। যারা ধ্বংসের কবলে পড়েছে, তাদের পতনে আনন্দবোধ করা উচিত নয়, প্রকাশ্যে ত নয়ই। কিন্তু এ রকম চিন্তা করে সব সময় ত আর কাজ করা হয় না। হর্ষনিনাদের

অস্ফুট প্রতিধ্বনিটুকু এই অভিশপ্ত তরুশ্রেণীর পথে মিলিয়ে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পরে সে কথা স্মরণ করে আমার ভারী লজ্জা হ'ল।

সেদিনকার মত এই তাদের শেষ গাছ-কাটা। একটু পরেই আমি লিঙ্‌হাম গ্রামের দিকে একা হেঁটে এগিয়ে চল্লুম। তিন মাইল জলা পেরিয়ে ওইখানেই প্রথম লোকালয়। সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ায় বৃক্ষশ্রেণীর রুক্ষতা মোলায়েম হয়ে আসছিল। কাঠুরেরা তাদের গাড়ী আর কাঠ নিয়ে গেল অন্য দিকে, তাদের উঁচু গলার কথাগুলো, ঘোড়ার উপর হাঁক ডাক, সব ক্রমশঃ শ্রুতির অগোচর হয়ে উঠল। চারিদিকে অক্ষুণ্ণ নিস্তব্ধতা, শুধু আমার নিজের পদধ্বনি আর থেকে-থেকে পেছনে অতি অস্ফুট গুঞ্জনের মত কি এক শব্দ শোনা যাচ্ছে—মনে হল বৃক্ষ-চূড়ায় মৃদু বায়ুর বীজন, বায়ু যদিও তখন একটুও ছিল না।

মাইল খানেকও যাই নি, এমন সময় কেমন যেন মনে হল কেউ চুপি-চুপি আমার অনুসরণ করছে। কেন মনে হল বলতে পারব না, কিন্তু বেশ গভীর ভাবে যেন অনুভব করলুম, ক্ষীণ সন্দেহ থেকে মিনিট দশেকের মধ্যে ধারণাটা ধ্রুব নৈশ্চিত্যে পরিণত হল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছুই চোখে পড়ল না কিম্বা হয়ত রাস্তার বাঁকের পেছনে কিসের একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখতেও পেয়ে থাকব—খানিক পরেই যাকে অতি স্পষ্টরূপে দেখেছিলাম—কিন্তু তখন বিশ্বাস করি নি। কে যেন পেছু নিয়েছে এই ধারণাটা যতই ধ্রুব হয়ে উঠ-ছিল, পেছুন ফিরে তাকানোর সাহস ততই হচ্ছিল ক্ষীণ। আমার কল্পনায় যত রকমের লোক আমার অনুসরণ করতে পারে তাদের কারুকে আমার সন্দেহের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলুম না। আর সিকি মাইল পথও হয় নি—শ' চারেক গজ বড় জোর হবে—কিন্তু দেখ আমার গলা শুকিয়ে গেছে। এ রকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি—আজও মনে করলে আমার গলা কাঠ হয়ে আসে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তোমাদের কারুকে নিশ্চয়ই এ অবস্থায় পড়তে হয় নি।"

"নিশ্চয়ই না" বলে আমি ওয়েটারকে ইসারা করলাম। জরকেন্‌সের স্মৃতিতে এমন একটা ভয়ের ছাপ নিশ্চয়ই লেগে ছিল যাতে করে এখনও সে বেশ প্রকৃতিস্থ হতে পারে নি বলে মনে হল। সামলে নিয়ে সে আমায়

ধন্যবাদ জানালে—এতে তার ভুল হয় না—তারপর গল্পটা ফের ধর্‌লে।

“আর চার শ’ গজও যাই নি এমন সময় আমি নিঃসংশয় হলুম যে আমার অনুসরণকারী নিশ্চয়ই মানবজগতের কেউ নয়। কেউ অনুসরণ করছে এতে যা বিচলিত হয়েছিলুম, এই নিঃসংশয়তায় তার চাইতে ঢের বেশী হলুম; অনুসরণটা যে ধ্রুব সত্য তা সন্দেহ করার উপায় নেই, মাপ করা পা ফেলাও শুন্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু মানুষের পা নয়। নীচু, জলাভূমি-বহুল সম্পূর্ণ বিজন প্রান্তরে আমার মনে হল—একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় এ ধারণাটা কিছু বিচিত্র নয়—যে কোনও কারণে মানুষ-যদি কোনও শক্তিকে চটিয়ে থাকে, তা হ’লে তার ভোগ পোহাতে হবে আমাকে। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে সমস্ত বস্তু যত অস্পষ্ট ও রহস্যগুণ্ঠনাবৃত মনে হতে থাকল, এই ধারণাটা আমার মনকে ততই পেয়ে বসল। সাহস নেহাৎ মন্দ দেখাই নি—আমার পিছনের পদধ্বনি স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, তখনও আমি দৃঢ় পদবিক্ষেপে পথ চলেছি। শুধু পিছনে তাকাতে পারছি না। অস্বীকার করি না যে অনুসৃত হয়েছি জেনে ভয় পেয়েছিলাম, অনুসরণকারী মানুষ নয় জেনে আরও ভয় পেয়েছিলাম—তবুও ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করব না এ বিষয়ে কতকটা দৃঢ়তাও যে ছিল না, তা নয়—শুধু পেছনে তাকানোর ভীতির থেকে অব্যাহতি পাই নি। তোমাদের যা বলেছি তারই কথা ভেবে গলা শুকিয়ে উঠেছে ভেবো না যেন।” এই বলে একটু চুপ করে থেকে জরকেন্‌স এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করে ফেল্লে।

“আরও সাংঘাতিক ভয় আমার বরাতে তোলা ছিল—এমন মর্ম্মান্তিক ভয় যে আমি মুহ্যমান হয়ে রাস্তার উপর পড়ি আর কি—আজও সে কথা মনে হলে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে, কত রাত্রি দুঃস্বপনে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। প্রাণী-জগতে আমরা এত গর্ব্ব অনুভব করি, আর এই জগতে আমরা এমন ভাবে মিশে আছি যে বাইরের থেকে কোনও আঘাত পেলেই আমরা বিচলিত, বিহ্বল হ’য়ে পড়ি। আমারও ঠিক এই অবস্থাই হ’ল যখন বুঝতে পারলুম আমার অনুগামী প্রাণী-জগতের অধিবাসী নয়। পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—খট্‌খট্—একটা কেমন একটানা খস্ খস্ শব্দও, কিন্তু

একটি নিঃশ্বাসের স্পন্দনও শুন্‌তে পাচ্ছি না। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখার সময় ঢের হয়েছে, অথচ সাহস নেই। পরুষ পদশব্দে কোমলতার স্পর্শও নেই। থাবা নয়, খুরও নয়। এ শব্দ এত কাছে এসে পড়েছে যে প্রাণী হলে তার নিঃশ্বাসের শব্দ নিশ্চয়ই শুনতে পেতুম। এই রকম অবস্থায় এক ধরণের অধ্যাত্ম-চেতনা আমাদের চালিত করে—তাকে অন্তর্দ্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম অনুভূতি যাই বল না কেন। সেই আমাকে অতি সুস্পষ্টভাবে বল্লে এই অনুসরণ-কারী আমাদের কেউ নয়। এর না আছে মাংসল কোমলতা, না আছে প্রাণ। এ যে আমাদের কেউ নয়, কেউই নয়, আমায় তা জানতে হয়েছিল।

এই যে ক মুহূর্ত্ত আমি পথ বেয়ে চলেচি আর ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্কল্প করছি—এতে যা ভয় পেয়েছিলাম তা জীবনে আর কখনও পাই নি। ঘাড় কিছুতেই ফেরাতে পারছি না। তার পর হঠাৎ থেমেই ঘুরে দাঁড়ালাম। ঠিক এ রকম কেন করেছিলাম বলতে পারি না—হয়ত আমার দেহ চালনার মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা স্ফুট হয়ে উঠেছিল, যাতে আমি আত্মসংযম করতে পেরেছিলুম—না পারলে অব্যাহতিও ছিল না। দৌড়লেই গিয়ে-ছিলাম। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে যা দেখার দেখে নিলাম, তার পর আবার ঘুরে দাঁড়ালুম।

বল্লুম না পপ্‌লারটা পড়ার সময় আমি হর্ষনাদ করেছিলুম—ঠিক তার পাশের গাছটার নীচেই তখন আমি দাঁড়িয়ে—অনেক হপ্তা ধরেই পপ্‌লার কাটা চলেছিল। যে গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে উল্লাস-প্রকাশ করেছিলাম তার চেহারাটা আমার মনে ছিল; তার ডাল পালা ছড়ানোর ভঙ্গীটি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। দেখেই তাকে চিনলাম। সেই বটে ঠিক রাস্তার মধ্যখানটায় দাঁড়িয়ে। একটা শিকড় উঁচুতে তোলা, তার গায়ে মাটির ডেলা লেগে রয়েছে। সেই খট্‌ খট্‌ করে লিঙ্গহামের পথে আমার অনুসরণ করছে। এখন বেশ শান্ত ছেলের মত তোমাদের সঙ্গে কথা কইছি, তা থেকে ভেবোনা তখনও মাথা এমনি ঠাণ্ডাই ছিল। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায় নি বল্লে নেহাৎ মিছে কথা বলা হবে। একটা কথাকে শুধু আমার ভয়ে-কাঁপা মন জোর করে ধরে ছিল—দৌড়লে চলবে না। কতই পুরোনো গল্প

মনে হল, কাদের সব সিংহে তাড়া করেছিল; সেগুলোকে আশ্রয় করে তাদের মর্ম্ম অনুযায়ী আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করলুম। দৌড়লেই গিয়েছি, আমার রিক্ত বুদ্ধির এই ছিল একমাত্র সম্বল।

অতর্কিতে আমার পদক্ষেপ দ্রুততর করতে অবশ্যই চেষ্টা করেছিলাম। পেরেছিলাম কি না জানি না—গাছটা ঠিক যেন পেছনে। ঘুরে আর দাঁড়াই নি, কিন্তু এর পদধ্বনি থেকে চেহারাটা এঁচে নিতে পারলুম—কাঁকড়ার মত গুড়ি মেরে হাতীর মত বিরাটকায় গাছ খট্ খট্ করে চলেছে, পাতা-গুলোর মর্ম্মর থেকে বোঝা যাচ্ছে ডালগুলো নুয়ে আসছে, তাতেও আমি দৌড়ই নি।

আর যে গাছগুলো ছিল, সবারই যেন আমার দিকে লক্ষ্য। উদ্ভিদ যদি সত্যিই প্রাণহীন হয় তাদের যে রকম নির্লিপ্ত হওয়া উচিত সে ভাবটা এদের নেই—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব ত' দূরের কথা। এই এতগুলো পপ্‌লারের ক্রোধের মাঝে নিঃসহায় আমি একা—অথচ জানো ত, আমি তাদের একটিকেও আঘাত করি নি।

হাঁটুতে যে জোর ছিল না তা নয়—দৌড়তে আমি পারতাম, শুদ্ধ আমার শুভবুদ্ধিই আমাকে নিবৃত্ত করলে। জানতাম দৌড়িয়ে এই বিরাটকায় অনুসরণকারীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। এখানে বসে যুক্তির চোখ দিয়ে দেখে বেশ বোঝা যায় যে অনুসরণকারী যেই হোক না কেন সহজে ছেড়ে দেবে না—আর পালানোর চেষ্টা যতই করবে, ততই তাকে উত্তেজিত করে তোলা হবে। তার পর আর যারা আছে তারাই বা কি করবে, তাও জানি না। এতক্ষণ অবশ্য তারা শুধু লক্ষ্যই করছে, কিন্তু আমি এত নিঃসঙ্গ—জনমানবের চিহ্ন মাত্রও সামনে নেই—ভাবলুম কিছুই হয় নি এমনি ভাব দেখিয়ে স্থিরভাবে পথ চলাই সমীচীন, আর অচেতন পদার্থকে আমরা যে দম্ভ দেখিয়ে থাকি সেই দম্ভের ভাবটাই বেশ জোরে বজায় রাখি না কেন। ঘনায়মান সন্ধ্যায় আমার চারদিকের জলাভূমিতে কাদাখোঁচার ডাক শুনতে পেলুম। এই শোচনীয় দশায় প্রাণী জগতের এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরেও আমি সাহচর্য্য অনুভব করতে পারতুম কিন্তু কেন জানি না এরা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। এদের কণ্ঠস্বরে যেন

একটা অস্বস্তির ভাব আছে, অন্তত যখন ঠিক বুঝতে পারা যায় না এরা শত্রু কি মিত্র, তখন মনে হয় সমস্ত আকাশ যেন গোঙাচ্ছে। তা ছাড়া, এটাও ঠিক যে এদের জন্য গাছের অনুসরণে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নি। প্রাণী-জগতের কেউ যদি আমার দলে আসত তা হলে গাছের অনুসরণ তো থেমে যাবার কথা। এক ঝাঁক দাঁড়কাক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, পরম উদাসীন—গাছটা কিন্তু ঠিক আমার পেছনে। ভয়ের তাড়সে ভুলে গেলাম আমি মানুষ, শুধু মনে রইল আমি প্রাণবান জীব। নেহাৎ নির্ব্বোধের মত আশা হল, যেই দাঁড়কাকগুলো উড়ে যাবে, কাদাখোঁচাগুলোর পাখা বাতাসের স্তর ভেদ করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এই নিরীক্ষমাণ ভীষণ পপ্‌লারশ্রেণী এবং আমার পশ্চাতের ভীতির কারণটিও যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়বে। কাদাখোঁচাদের কলতান নিঃসঙ্গতাকে আরও নিবিড় করে তুল্ল; দাঁড়কাকগুলোর পক্ষবিস্তারে ঘনায়মান অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠল—অথচ পপ্‌লার গাছটির এই অন্যায় জুলুম কেউই প্রতিনিবৃত্ত করলে না। বাধ্য হয়ে নেহাৎ বোকার মত আমাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হল। খুঁড়িয়ে চলেছি বড়ই যেন শ্রান্ত, অথচ একটা পা দিয়ে আর একটা পায়ের চাইতে কখনও বড় বড় কখনও জোরে জোরে ধাপ ফেলছি—যেটায় বেশী ঠকান যায়। কিন্তু কি-ই বা এই ছেলেমানুষীর মূল্য ? যেই অনুসরণ করুক পলাতকের গতির বিচার সে করবে মধ্যের ব্যবধানটুকু দিয়ে, আর গতিও সে ঠিকই লক্ষ্য করছে—তারই অনুযায়ী চলতে হবে তাকে। তাই যদিও মাঝে মাঝে আমি ব্যবধানটুকু বাড়িয়ে ফেলছিলাম, খানিক পরেই শাখাগুলোর মর্ম্মর স্পষ্টতর, আর সেই খট্ খট্ আওয়াজ আরও জোর হয়ে উঠছিল। আজও রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখলেই সে শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাই ; অন্য শব্দের সঙ্গে তার পার্থক্য মুহূর্ত্তেই ধরা পড়ে।

তিন মাইল শুনতে আর কতটুকু ? বড় জোর এখান থেকে কেনসিংটন ; কিন্তু আমি একজন লোকের কথা জানি—তাকে সিংহ তাড়া করেছিল এর চেয়ে ঢের কম পথ। সে শপথ করে বলেছিল এর চাইতে দীর্ঘতর পথ তাকে একবারের কেন, দশবারের হাঁটা জড় করলেও কখনও অতিক্রম করতে হয় নি। তাও সিংহ—যার হৃদ্‌যন্ত্র আছে, রক্ত আছে

মানুষের মতনই। মৃত্যু বটে, তবুও এ মরণ হাজারো লোকের ভাগ্যে ঘটেছে। কিন্তু আমার এ ভীতি মানব অভিজ্ঞতার বাইরে, কোনও মানুষকে এর সম্মুখীন হতে হয়নি, আমিও জানতুম না কোনও দিন এই ভীতির সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে। তবুও আমি দৌড়োই নি।

আমার চারিদিকের নির্জ্জনতায় যেন একটা পরিবর্ত্তনের ছায়া পড়ল। লিঙ্গহামের আলোকগুলিই নয়—চিমনির ধোঁয়াও নয়, বাড়ীগুলো থেকে এতদূরে এসেও যেটুকু মৃদু উত্তাপ আমায় স্পর্শ করছিল—মানবের অস্তিত্বের বৈজয়ন্তি-স্বরূপ সেই উত্তাপের স্পর্শও নয়, একটা অনুভূতি যা উত্তাপের চেয়ে ব্যাপকতর, কেমন একটা জ্যোতি যা মানবের সান্নিধ্য থেকে উচ্ছ্রিত হয়ে পড়ে। এই অনুভূতি শুধু আমাকেই যে স্পর্শ করেছিল তা নয়। একটু আগেই পপ্‌লার শ্রেণী উত্তেজিত আগ্রহে আমার বিনাশের প্রতীক্ষা করছিল—সে আগ্রহ এখন যেন অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে।"

টারবাট্‌ জরকেন্‌সকে পেলে ছাড়ে না। সে বল্লে "পপ্‌লারগুলো কেমন করে তাদের ভাব প্রকাশ করলে হে ?"

জরকেন্‌স বল্লে, "অনেক বছর ধরে যদি তুমি পপ্‌লারদের নিয়ে অনুশীলন করতে, কিম্বা অন্তত সেদিন পথে আমাকে যেমন করে নজর রাখতে হয়েছিল, তেমন করে নজর করতে, এমন অবস্থায় যদি পড়তে যখন বহু বিস্তৃত সময়ের পরিসর একটি মাত্র আতঙ্কময় অভিজ্ঞতায় সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—তা হলে তুমিও বুঝতে পারতে কখন পপ্‌লার সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে। এই ঘটনার পর কদাচিৎ আমি এ দৃশ্য দেখেছি, তাও নিঃসংশয় হওয়ার মত করে কখনও দেখি নি। কিন্তু তখন যে ভাবটি দেখেছি, তাতে ভুল হতে পারে না—প্রতিটি পল্লবে একটা টন্‌টনে আগ্রহ, শাখাগুলো যেন অশরীরীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে গ্রামকে বলছে—চুপ্‌! ভুল হবে কি করে? এখন কিন্তু মৃদু সান্ধ্যবায়ুতে পল্লবগুলি স্পন্দিত হচ্ছিল, শাখাগ্রে সেই সর্ব্বনাশের ভ্রূকুটি নেই—কোনও নির্দ্দেশ, বা ইঙ্গিত বা প্রতীক্ষার ভাব আর গাছগুলোয় নেই—প্রতীক্ষা বল্লে অবশ্য তাদের এই ত্রাস-সঞ্চারী স্থির আগ্রহের কথাটা কিছুই বলা হয় না। আরও ভাল কথা—আমার আশা হল—আশার চেয়ে বেশী এখনও আমি মনে করতে পারি নি, যে আমার অনুসরণকারী ক্রমশ যেন

পিছিয়ে পড়ছে। জানালাগুলোর দিকে অগ্রসর হতে হতে আমার আশা বেড়ে চলল। গবাক্ষপথে স্নিগ্ধ আলোক—কতকগুলিতে সন্ধ্যার ম্লানিমা, কতকগুলিতে প্রজ্জ্বলিত দীপালোক—জলাভূমির বহু দূর পর্য্যন্ত যেন মানুষের প্রভাব বিস্তার করে দিল। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। একটু পরেই একটা মালটানা গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ শোনা গেল—ওঃ কি তাতে স্বস্তি! গাড়ীখানা খামারে চলেছে। সমগ্র প্রকৃতির উপর এই সব শব্দের প্রভাব অতিরঞ্জিত করা সম্ভব নয়। মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলুম কোনও বিপ্লব ঘটে যায় নি—প্রাণী-জগতের প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পিছনের ভীতিপ্রদ পদধ্বনিতে একটা দ্বিধার ভাব বেশ শুনতে পেলুম। নাড়ী আমার যাই বলুক, স্থির পদে আমি পথ চলেছি। কতকগুলো হাঁস কলরব করে উঠল। আরও কতকগুলো মালটানা গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। মাঝেমাঝে একটা ছেলে গাড়ী দেখে চেঁচিয়ে উঠছে, কতকগুলো কুকুর তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। বুঝলাম প্রাণীজগতের সীমানার মধ্যে এসে পড়েছি। পিছনে সেই রক্ত-জল-করা খট্ খট্ শব্দ যদি না শোনা যেত, তা হলে গাছটাতেই হয়ত অবিশ্বাস করে বসতুম। এই যেমন তুমি এখানে তোফা বসে বসে অবিশ্বাস করেছিলে, বুঝলে না হে টারবাট্?" শেষ অবধি টারবাট্ চুপ করেই থাকল।

"যখন গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম পদশব্দ অতি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, শুধু আমার ভয় দিয়েই বুঝতে পারলুম কেন মানবজাতির প্রভুত্ব ও অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গ্রামের ভিতরেও এত দূর পর্য্যন্ত গাছটা আমার অনুসরণ করছে। একটু লম্বা পা ফেলে চল্‌তে চল্‌তে একটা সরাইয়ের সামনে এসে আমি দাঁড়ালুম—দরজাটা বেশ মজবুত। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে দরজা, ছাদ, আর সামনের দেয়াল দেখে নিয়ে আশ্বস্ত হলুম। সহজে ঘা মেরে ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকার জো নেই। এই রকম আশ্রয়ই খুঁজছি বুঝে খরগোসের মত সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লুম।

পপলারের সামনে যে বীরপনা দেখিয়েছিলুম্ ঢিলে জামার মতন ফস্ করে তা গেল খসে। টেবিলের পাশে একখানা কাঠের চেয়ারে ধপ্ করে বসে, শুয়ে বল্লেই হয়, পড়লাম, দেহের খানিকটা রইল চেয়ারে, বাকীটুকু

রইল টেবিলের উপর। কতকগুলো লোক আমার কাছে এসে কথা জুড়ে দিলে, আমার মুখে টুঁ শব্দটি নেই। জন তিন চারেক মজুর বিয়ার খেতে এসেছে সন্ধ্যায়, আর 'মাগ অভ এলের' সত্বাধিকারী স্বয়ং, এঁরা সবাই এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। আমি চুপ।

এরা আমায় খুব আপ্যায়িত করলে। যখন দেখলুম মুখে রা ফুটছে বল্লুম, শরীর ভাল নেই। কি হয়েছে তা আর বল্লুম না, হয়ত বেফাঁস এমন অসুখের কথা বলে বস্‌ব, যার পক্ষে হুইস্‌কী অনিষ্টকর, অথচ তখনই আমার এক চুমুক না টানলেই নয়। দিলেও তারা। না বল্লে বেইমানী করা হবে। জল না মেশানো একটি পুরো গেলাস হুইস্‌কী খেলুম। আর এক গেলাস দিলে। বিশ্বাস কর কিছুই হল না দু গেলাসে, এতটুকুও না। আরও এক গেলাস চাইলুম, কিন্তু সেটুকু গ্রহণ করার আগে একটা জিনিষ-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া চাই ত। বাইরে আমার জন্য কেউ প্রতীক্ষা করছে না ত? সোজা জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহসে কুলোল না। মাথা তুলে বল্লুম "খাসা গাঁ-টি। বাইরে কেমন সুন্দর গাছ!"

"একজন বল্লে, গাছ আবার কোথায়?"

"গাছ নেই? পাঁচ শিলিং বাজি রাখছি, নিশ্চয়ই আছে।"

সে বল্লে, "না"—বেশ জোরের সঙ্গে—বাজি অবধি ধরার তার আগ্রহ নেই।

"আমার মনে হচ্ছে যেন একটা"—পপ্‌লার বলতে ভরসা হল না, তাই বল্লুম, "যেন একটা গাছ দেখেছিলুম ঠিক দরজার বাইয়ে।"

সে বল্লে "নাঃ। গাছটাছ কিচ্ছু নেই।"

"বেশ, দশ শিলিং বাজি!"

সে বাজি ধরলে। "আচ্ছা, যান না কর্ত্তা বাইরে গিয়ে দেখেই আসুন না!"

ফের আমি দরজার বাইরে যাই আর কি? বল্লুম, "নাঃ। তুমি গেলেই হবে। তোমার স্মৃতিশক্তিতে আমার সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু তুমি বাইরে গিয়ে চোখে যদি দেখে এস আছে কি নেই, তাতে আমি অবিশ্বাস করব না।"

সে একটু হাসল, ভাবলে যে আমি একটু রঙে আছি। হায় ভগবান! যদি সত্য কথা বলতুম না জানি কি ভাবত।

যাক্—সে ফিরে এল এমন একটা খবর নিয়ে যাতে আমার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল—বাজির দশ শিলিং আমি হেরেছি। তখনই বাজির টাকাটা দিয়ে আমি তৃতীয় পাত্রটি গলাধঃকরণ করে ফেল্লুম—এতক্ষণ অবধি যে পানীয়টুকু গ্রহণ করতে ভরসা পাইনি। সেই পাত্রেই বাজি মাৎ। কোথায় গেল আমার দুর্দ্দশা, কোথায় গেল শ্রান্তি, কোথায় গেল ভয়। প্রাণী-জগতের অবিসংবাদিত আধিপত্যের হয়ত বা অবসান ঘটেছে এই যে মর্ম্মন্তুদ সংশয় আমার বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল—এ সব যেন অন্তর্দ্ধান করল। সব গেল দূরে, আমি টেবিলের উপরেই গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লাম।

পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। লোকগুলো ভালো—তারা আমাকে দোতালায় তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। লাল টালিগুলোর উপর দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা উঠোনে কতকগুলো মুরগী, চারিদিকে লাল ইঁটের দেওয়াল। একটা ছাগল বাঁধা—একটি মেয়ে তাকে খাবার দিতে যাচ্ছে। দূর থেকে গৃহস্থ বাড়ীর সেই সব সনাতন শব্দ শোনা যাচ্ছে, যারা কালের প্রবাহ উপেক্ষা করে আজও দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণীজগতের প্রভুত্বের প্রতীকস্বরূপ এই সব শব্দে আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। সেই উজ্জ্বল প্রভাতের আলোকে এমন একটা নিরাপদ আশ্রয় অনুভব করলাম যে মনে হল আমার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার অবসান ঘটেছে।

বলতে পার সব স্বপ্ন; কিন্তু এত বছর ধরে কেউ স্বপ্ন মনে করে রাখতে পারে না। সেই পপ্‌লারটির মানুষের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোন ভীষণ অভিযোগ ছিল, তার কারণও যথেষ্ট ছিল স্বীকার করি।

যদি দৌড়োতাম, তা হলে আমার কি যে করত, ভাবতে পারি না।”

জরকেন্‌স তা ভাবতে চাইলেও না—মহা স্ফূর্ত্তিতে হাত নেড়ে সে ওয়েটারকে সঙ্কেত করলে এমন একটা জিনিষের জন্য যার প্রবাহে স্মৃতি পর্য্যন্ত তলিয়ে যায়।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

কবিতা-গুচ্ছ

মর্ম্মবাণী

শিল্পীর ছবিতে যাহা মূর্ত্তিমতী,
গানে যাহা ঝরে ঝরণায়,
সে-বাণী হারায় কেন জ্যোতি,
কেন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়
মুখের কথায়
সংসারের মাঝে
নিরন্তর প্রয়োজনে জনতার কাজে ?
কেন আজ পরিপূর্ণ ভাষা দিয়ে
পৃথিবীর কানে কানে বলিতে পারিনে "প্রিয়ে
ভালোবাসি" ?
কেন আজ সুরহারা হাসি
যেন সে কুয়াশা মেলা
হেমন্তের বেলা ?

অনন্ত অম্বর
অপ্রয়োজনের সেথা অখণ্ড প্রকাণ্ড অবসর,
তারি মাঝে এক তারা অন্য তারকারে
জানাইতে পারে
আপনার কানে কানে কথা।
তপস্বিনী নীরবতা
আসন বিস্তীর্ণ যার অসংখ্য যোজন দূর ব্যেপে
অন্তরে অন্তরে উঠে কেঁপে
আলোকের নিগূঢ় সঙ্গীতে।

খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিতে
নাই সেই অসীমের অবসর,
তাই অবরুদ্ধ তার স্বর,
ক্ষীণসত্য ভাষা তার।
প্রত্যহের অভ্যস্ত কথার
মূল্য যায় ঘুচে,
অর্থ যায় মুছে।

তাই কানে কানে
বলিতে সে নাহি জানে
সহজে প্রকাশি'
"ভালোবাসি"।
আপন হারানো বাণী খুঁজিবারে,
বনস্পতি, আসি তব দ্বারে।
তোমার পল্লবপুঞ্জ শাখাব্যূহভার
অনায়াসে হয়ে পার
আপনার চতুর্দ্দিকে মেলেছে নিস্তব্ধ অবকাশ।
সেথা তব নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস
সূর্য্যোদয় মহিমার পানে
আপনারে মিলাইতে জানে।

অজানা সাগর পার হতে
দক্ষিণের বায়ুস্রোতে
অনাদি প্রাণের যে বারতা
তব নব কিশলয়ে রেখে যায় কানে কানে কথা,—
তোমার অন্তরতম—
সে-কথা জাগুক প্রাণে মম,—
আমার ভাবনা ভরি উঠুক বিকাশি'
"ভালোবাসি"।

তোমার ছায়ায় বসে বিপুল বিরহ মোরে ঘেরে ;
বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেরে
অবলুপ্ত করি' দেয় কালহীনতায়।
জন্মান্তর হতে যেন লোকান্তরগত আঁখি চায়
মোর মুখে।
নিষ্কারণ দুখে
পাঠাইয়া দেয় মোর চেতনারে
সকল সীমার পারে।
দীর্ঘ অভিসারপথে সঙ্গীতের সুর
তাহারে বহিয়া চলে দূর হতে দূর।
কোথায় পাথেয় পাবে তার
ক্ষুধা পিপাসার,
এ-সত্যবাণীর তরে তাই সে উদাসী
"ভালোবাসি"।
ভোর হয়েছিল যবে যুগান্তের রাতি
আলোকের রশ্মিগুলি খুঁজি সাথী
এ-আদিম বাণী
করেছিল কানাকানি
গগনে গগনে।
নবসৃষ্টি যুগের লগনে
মহাপ্রাণ সমুদ্রের কূল হতে কূলে
তরঙ্গ দিয়েছে তুলে
এ-মন্ত্রবচন।
এই বাণী করেছে রচন
সুবর্ণ কিরণ বর্ণে স্বপন-প্রতিমা
আমার বিরহাকাশে যেথা অস্তশিখরের সীমা।
অবসাদ গোধূলির ধূলিজাল তারে
ঢাকিতে কি পারে ?

নিবিড় সংহত করি এ-জন্মের সকল ভাবনা
সকল বেদনা
দিনান্তের অন্ধকারে মম
সন্ধ্যাতারা সম
শেষবাণী উঠুক উদ্ভাসি—
"ভালোবাসি"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা ও কবি

[D. H. Lawrence-এর একটি কবিতার ছায়ায়]

আমি যারে আঁকিয়াছি মোর কবিতায়—
প্রত্যহের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার
বিচিত্র বরণ রাগে,
করিয়াছি রূপায়িত যে মূরতিখানি—
মোর কাব্য-দেউলের সুদুর্গম মণিপীঠতলে
চিরদীপ্তা কলালক্ষ্মী-রূপে আলোকিয়া
যে রয়েছে বিরাজিতা
তোমরা দেখেছ' তারে—তোমাদের চোখে
না জানি কি রূপ তার! কল্পনায় দেখি,
তোমরা পেয়েছ' তার অচঞ্চল আঁখির আভাস,
আকাশের প্রান্তে আঁকা শুকতারকায়;
সমুদ্র-কল্লোলে,
উচ্ছ্বসিত ফেনায়িত তরঙ্গ-ফুৎকারে,
মলিন দিগন্ত হ'তে ঝ'রে-পড়া পাংশু চন্দ্রকরে
স্বর্ণাভ অলক তার পেয়েছ' দেখিতে… ;

মর্ম্মরিত পবন-সঞ্চারে
লঘুচ্ছন্দ পদক্ষেপ বাজিয়াছে তার
তোমাদের অন্তঃকর্ণে··· ; ভোরের শিশিরে,
দগ্ধ স্বর্ণ-কণিকায় দিবা অবসানে,
অবনত-পক্কশস্য হেমন্তের পীত দ্বিপ্রহরে,
তার হাসি, তার কান্তি, তার অভিমান
ছড়ায়ে জড়ায়ে আছে···। মোর কাব্য হ'তে
নাহি জানি চুপে-চুপে কবে অতর্কিতে
বাহিরিয়া গিয়াছে সে জগতের মাঝে ;
মোর মর্ম্ম হ'তে,
আহরিয়া নিশিদিন তিল তিল রস,
যে হ'য়েছে রসময়ী, আজ তার সাথে
অনন্ত বিচ্ছেদ মোর—আজ সে সবার !
তোমরা দেখেছ' তারে, হয়ত বা কেহ,
নিভৃত ঘুমের ঘোরে, একান্ত নির্জ্জনে,
তাহারে বেসেছ' ভালো—দিনরজনীর
কর্ম্মক্লান্ত অবসরে তার ছবিখানি,
বার বার ঝলকিয়া উঠিয়াছে তোমাদের চোখে—
তোমরা ভেবেছ' কভু, কখনো কি জাগিয়াছে মনে,
এই যে তরুণী তন্বী লীলা-বধূ মোর ,
এ নয়ক আফ্রোদিতি—
আদিম প্রভাতে,
ওঠেনি এ সমুদ্রের আত্যন্ত মন্থনে ;
আলুলিত কেশদাম আকাশে ছড়ায়ে,
অপাঙ্গে মদির দৃষ্টি, স্রস্তবাস, ত্রস্ত পদক্ষেপে ;
উত্তাল উদ্দাম সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া এর কটিতটে
মূর্চ্ছিয়া পড়েনি আত্মহারা !
এ নয়ক বিয়াত্রিস্—নেপ্‌লস্ সমুদ্র-উপকূলে

অদৃশ্য বায়ুর মতো সচকিত লঘুশ্বাস ফেলি
 ছুটে ছুটে করে নাই চেরী-বনে কুসুম-চয়ন !
পাণ্ডুর দিগন্ততলে ছল ছল কালো আঁখি মেলি,
এ ছিল না কোনদিন অলিন্দে এলায়ে—
রোমিওর প্রতীক্ষায় মুগ্ধা জুলিয়েট্ !
কবির কল্পনা নয়—
 আকাশের নীল,
  পাখীর কাকলীগান,
অরণ্যের চকিত মর্ম্মর,
কুসুমের কোমলতা, তিল তিল আহরিয়া আনি,
আমি এরে গড়ি নাই তিলোত্তমা করি !
একান্ত বাস্তবী এ যে—
লাজে-ভয়ে, কুণ্ঠিতা ব্যাকুলা,
পদে পদে বেপমতী এ বালিকা বধূ
 মোর প্রতিবেশী কোন দীন গৃহস্থের !
ইহারে দেখেছি আমি, বহুদিন বহু অবস্থায় ;
কভু রত গৃহ কাজে, কভু শিশু ক্রোড়ে ;
প্রতিটি ভঙ্গিমা এর—
  হাসি-কথা, চরণ-সঞ্চার,
ভূষণ-সিঞ্জন সহ তীক্ষ্ণ দিঠি, স্তন শিহরণ,
সমস্ত দেখেছি আমি ।
প্রত্যহের ছোট বড় ঘাত-প্রতিঘাতে,
উৎপীড়িত প্রাণ-পিণ্ড, বিহ্বল ব্যাকুল—
কখন বাসনা এসে লুকায়ে বাঁধিল বাসা তার মর্ম্মমূলে ;
দুর্নিবার অন্তর্দাহে জ্ব'লে জ্ব'লে প্রতি নিশিদিন,
তাহারে দেখেছি আমি—
  অসংবৃত লালসা-বিলাসে,
উচ্ছৃঙ্খল কামনা-পীড়নে,

কবিতা লিখেছি আমি।
এই রুক্ষ ধূলিম্লান, যন্ত্রের চক্রান্তভরা মূঢ় মৃত্তিকায়
প্রত্যহের প্রয়োজনে পলে পলে আত্ম-অপমান ;
রক্তপায়ী বর্ব্বরতা সুবর্ণের সভ্য আচ্ছাদনে—
হেথা হ'তে দূরে,
বিজন চেতনা তলে,
আত্মার দুরবগাহ গহন অতলে,
তাহারে ক'রেছি পূজা—তারি ক'টি ফুল
আমার কবিতা বন্ধু··· ;
কত বেদনায়,
কত দীর্ণ দুরাশায়, একে একে ফুটেছিল তারা,
তোমরা জান' কি তাহা ?
তোমরা দেখেছ' মোরে নির্ব্বিশেষ রূপে—
আমার আপন সৃষ্ট কল্প-লোক হ'তে
আমারে দিয়েছ' নির্ব্বাসন—
আমি আজ কেহ ন'ই, নাই কোন খানে ;
আমার সৃষ্টির তলে কোথা আমি গিয়েছি তলায়ে
আমি আজ অভিনেতা······ ;
মোর ভূমিকার
সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উল্লাসে,
সমুৎসুক সর্ব্বজন ;
শুধু মোর সাথে,
নাহি কারো পরিচয় !
আমার সমস্ত সত্তা নিঙাড়ি দেছি যে কবিতায়,
তার দীপ্তি, তার ভাতি,
বিশ্ব মর্ম্ম-লোকে,
মেলিয়াছে লক্ষ শিখা···শুধু আমি নাই !
নিঃশেষে হারায়ে গেছি কোথা আমি অকূল আঁধারে !

তবে কেন লিখেছি কবিতা,
কার্ তরে,
কোন্ প্রয়োজনে ?

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জরদ্গব

বৃদ্ধ অশথের শাখা বসন্তে নবীন,
মুঞ্জরণ-বেদনায় হয়েছে অধীর ;
এই দীপ্ত দ্বিপ্রহরে দখিণ সমীর
বুলায় পরশ-সুধা। ছিল অন্তরীণ
যত কচি কিশলয় হ'ল বন্ধহীন,
শুষ্কত্বক্-রন্ধ্রে রন্ধ্রে করি' চৌচির
উদার মুক্তির মাঝে হয়েছে বাহির,
আলোকে পুলকে তারা ফোটে অনুদিন।

দূর হ'তে দেখি আমি তরুণের মেলা,
জরাজীর্ণ অশথের শুষ্ক ডালে ডালে,
মুখর কিরণে তারা করে কলরব,
তালে তালে কি মধুর ঝিকিমিকি খেলা !
বাতাস ছুটিয়া আসি' মোর বক্ষে ভালে
সুধা-স্পর্শ হানি' কয়,—'জাগো জরদ্গব !'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

"নিবিড় কেশের জালে তোমার রবির আলো জড়াও"

[La figlia che Piange—T. S. Eliot]

সিঁড়ির পরে সবার চেয়ে উঁচু ধাপে দাঁড়াও,
বাগানের এই টবের কাছে ঘেঁসে,
নিবিড় কেশের জালে তোমার রবির আলো জড়াও,
ব্যথিত বিস্ময়ে লহ ফুলের রাশি বুকের কাছে টানি',
ধূলায় তাদের দাও ছড়িয়ে নিমেষ শেষে
দাঁড়াও ফিরে ক্রুদ্ধ চকিৎ চক্ষে তবে বহ্নিশিখা হানি',—
জড়াও তবু রবির আলো, তোমার নিবিড় কেশের জালে জড়াও।

চাহি, কিশোর এম্‌নি করেই ফিরে যাবে,
চাহি, তন্বী এম্‌নি ক'রে দাঁড়িয়ে রবে, ব্যথা পাবে।
কিশোর তবে যেতো চলে,—
যেমন করে আঘাতদীর্ণ জীর্ণ দেহে আত্মা নাহি থাকে,
পূর্ণপাত্র পানের শেষে চিত্ত যেমন দেহভাণ্ড উজাড় করি' মাটির
পরে রাখে।

পেতাম তবে খুঁজে
তারো উপায় এম্‌নি লঘু, এম্‌নি কৌশলে,
মোদের কাছে রহস্যময় অর্থ কোন রইত না তার বাকী,—
হাসির মতন সহজ তবু কপট হ'ত, সম্ভাষণের মতই স্পষ্ট ফাঁকী।

ফিরল বালা আপন পানে, তবু হেমন্তের স্বর্ণালোকে
চিত্ত আমার পূর্ণ করি' রইল অনেকদিন,—
অনেক দিবস, অনেক নিমেষ ভরি' ঃ
কবরী তার লুটায় বাহুর পরে, বাহুতে তার কুসুম-মঞ্জরী।
ভাবি মনে, এমন ছবি কেমন ক'রে লাগ্‌ল চোখে!
ভাবি যদি অদেখা মোর হারিয়ে যেতো দেহের ছন্দ, দেহের যতি!
ভাবা-না-যায় সেই ভাবনায় আজো অধীর নিদ্রাবিহীন
মধ্য রাতের অশান্তি মোর, মধ্য দিনের স্নিগ্ধ পরিণতি!

হুমায়ুন কবির

অননুতপ্ত

জাগরূক বীর্য্যের বিস্ময়ে
ভুবনবিবাগী রথে বাহিরিনু শূন্য দিগ্বিজয়ে
যবে আমি যুগান্তরে অলৌকিক প্রাতে,
সেদিন আমার হাতে
মন্ত্র-অভিষিক্ত অসি করো নাই তুমি সমর্পণ।
আমার জীবন
তাই কি নিষ্ফল হলো তীব্র পরাজয়ে
ঊষর ধূসর অপচয়ে ?

সে-সুদিনে জানিতাম যদি
জ্বালায়ে মঙ্গলদীপ তুমি নিরবধি
সন্ধ্যার তোরণতলে বসে রবে মোর প্রত্যাশায়,
তাহলে কি উদ্ধত অন্যায়
লুটাতো আমার পায়ে নাটনষ্ট কালিয়ের মতো ?
কালের তস্করসেনা—পিশাচ প্রমথ—
আমার অলক্ষ্যভেদে করিতো কি সভয়ে বর্জ্জন
স্বল্পপ্রাণ সুন্দরের সরণী নির্জ্জন,
তরুণের তীর্থযাত্রা নিরাপদ হতো কি তাহাতে ?

তোমার সতর্ক রাখী যদি মোরে সেদিন পরাতে,
হয়তো তাহলে
মোর দিব্য ঐরাবৎ সংগ্রথিত তৃণের শৃঙ্খলে
করিতো না আজি কালপাত ;
মোর বজ্রাঘাত
আঁধির চক্রান্তে প'ড়ে তবে বারম্বার
হারাতো না লক্ষ্য আপনার।
অমৃতের ত্যাজ্যপুত্র পরবশ উত্তরাধিকার

আবার কি ফিরে পেতো আপনার গুণে,
আমাদের দেখা হতো যদি কোনো আদিম ফাল্গুনে ?

কি জানি, হয়তো হতো তাই।
অন্তত অমন স্বপ্নে মাঝে মাঝে নিজেরে লুকাই
বিরাট ব্যর্থতা যবে নৈশ ভূকম্পনে
অসংহত ধিক্কার বর্ষণে
উলঙ্গ আত্মারে মোর চায় নিষ্পেষিতে।
স্বয়ম্বরসভামাঝে তুমি যদি মোরে মাল্য দিতে,
তবে—তবে—। কিন্তু থাক সে-নিরর্থ কথা।
কল্পনার কোষাগারে আজিকে যে এসেছে শূন্যতা
শতমুখ দুর্দ্দিনের উৎকোচ জোগাতে।
আর মিথ্যা অনুশোচনাতে
অক্ষম অস্থৈর্য্য মোর চাহিবো না করিতে গোপন ॥

যদি সেই অনবগুণ্ঠন
তোমার অসহ্য লাগে, করিবো না তবু অস্বীকার,
যে-পথে চলেছি আমি, সেই ছিলো অভীষ্ট আমার ;
কহিবো না, যত ভুল সে-সবি দৈবাৎ।
আমার অনাদি অমা যদি হয় আবার প্রভাত,
আপনার ভাগ্যনির্ব্বাচনে
শুধু মোর ইচ্ছা যদি মান্য হয় নবীন জীবনে,
তবে আরবার
বরণ করিবো, জানি, এ দৈন্য দুর্ব্বার,
এ-উন্মার্গ নিঃসঙ্গতা, উন্মুখর এই বিসংবাদ,
বিধ্বস্ত রূপের সেবা, অপক্ক প্রমাদ ॥

আজ আমি জানি,
বুদ্ধির বন্ধুর পথে অগ্রগামী হানি, অন্ধ হানি ;
তাহার সীমান্তে এসে যারা শান্তি পায়
খালি তাহাদের ঝুলি, পাংশু ধূলি তাহাদের গায়,
পিপাসায় কণ্ঠহারা আমার সমান।
ভগবান
তাহাদের ক্ষমিয়াছে কি না,
আমি তা জানি না।
কিন্তু তারা নিজেদের করেছে মার্জ্জনা,
যত আবর্জ্জনা
পদে পদে তাহাদের দিয়েছিলো বাধা,
ভুলেছে সে-সব তারা, অভিযোগ করেছে সমাধা।
তাহাদের মনে
বহিরাশ্রয়িতা নাই, তাই তারা অনন্ত শয়নে
দাবি করে সুষুপ্তি যে-জোরে,
সে নহে যোগ্যতা যার দুশ্ছেদ্য নিগড়ে
মানবতা মরে অপঘাতে॥

যদি তোমা সাথে
দেখা হতো সময় থাকিতে,
উন্মুদ্র ঊষার লগ্নে যদি তুমি আদরে রাখিতে
তোমার বিশ্বস্ত হাত মোর করপুটে
সিদ্ধির অঙ্কুটে
সোনার স্বর্গের দ্বার খুলিতো না তবু,
মোর দুঃস্থ ভবিতব্য অন্য রূপ ধরিতো না কভু।
তাহলেও আজ
ধূমকেতু সম আমি করিতাম নাস্তিতে বিরাজ

অসার্থক অপব্যয়ে স্বরচিত অন্ধকার চিরে ॥
তবু আজ সবিনয়ে ধীরে
তোমার উদাস কানে এইটুকু ব'লে যেতে চাই
আমি নিঃস্ব নিরাশ্রয়, তাই
দানের প্রকৃত মর্ম্ম, নির্ভরের যথার্থ স্বরূপ
কেবল আমারি কাছে পেতে পারে অর্ঘ্য অনুরূপ।
কিছু মোর প্রাপ্য নয়, জানি, তাই শুদ্ধ কৃতজ্ঞতা
গ্রহীতারে পুণ্য করে, দান করে দাতারে ধন্যতা।
ভবিষ্য রহস্যে ঢাকা, তুমি আমি জানি না কেহই
কি ঘটিবে বৎসরান্তে। কিন্তু আমি অনুতপ্ত নই
আর অতীতের লাগি, আবশ্যিক উদ্‌ভ্রান্তির তরে।
উচ্চাবচ বক্র পথে সারা বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে
যে-জীবন তব পদে পেয়েছে বিরতি,
তার অসঙ্গতি
নিশ্চয়ই নিতান্ত বাহ্য, অশ্রুপাত তার ধর্ম্ম নয়।
তাই পুন প্রাক্তন বিস্ময়
জাগিয়াছে মোর মনে,
বিদগ্ধ নয়নে
লাগিয়াছে প্রসাদের সুস্নিগ্ধ কজ্জল;
দ্বেষ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন অপ্রত্যাশী মোর অন্তস্তল
ক্ষমিয়াছে জগতেরে, লভিয়াছে জগতের ক্ষমা,
করিয়াছে আবিষ্কার নবজন্মে সৃষ্টির সুষমা ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

ন্যায়-পরিচয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ-প্রণীত, ২৪শ পরগণা যাদবপুরস্থ বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

এই "ন্যায় পরিচয়ের" প্রণেতা তর্কবাগীশ মহাশয়ের পরিচয় প্রকাশ অনাবশ্যক। তিনি ইতিপূর্ব্বে মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্র ও তাহার বাৎস্যায়ন মুনি কৃত সুকঠিন ভাষ্যের বঙ্গ ভাষায় বিস্তৃত অনুবাদ ও বহুবিচারপূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বত্র বিদ্বৎসমাজে যশস্বী হইয়াছেন। বঙ্গের বড় গৌরব নব্যন্যায়ের প্রবল প্রভাবে ক্রমশঃ সর্ব্বত্রই মূল ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়নভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের পঠন পাঠনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন ন্যায়ের সম্প্রদায়-লোপে ঐ সমস্ত গ্রন্থের বিশুদ্ধ পুস্তকও ছিল না। কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয় দীর্ঘ কাল যাবৎ অতি কঠোর পরিশ্রমে বহু প্রাচীন গ্রন্থের বিশেষ চর্চ্চা করিয়া যে ভাবে বাৎস্যায়নভাষ্যের উদ্ধার পূর্ব্বক বিশদ বঙ্গভাষায় যে ভাবে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এখন আর ঐ সুকঠিন ভাষ্যার্থ বুঝিবার কোন অন্তরায় নাই। পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় আর কোন দার্শনিক গ্রন্থের এই ভাবে বহু বিচার পূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যা হয় নাই। আমি জানি, বঙ্গের বাহিরেও বহু স্থানে অন্য দেশীয় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিয়াও তর্কবাগীশ মহাশয়ের ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। এবং সর্ব্বত্রই বহু ছাত্র ও অধ্যাপক তর্কবাগীশ মহাশয়ের ঐ গ্রন্থের সাহায্যেই এখন বাৎস্যায়নভাষ্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন। ইহা বঙ্গ ভাষা ও বাঙ্গালীর বড় গৌরবের কথা। কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদিত পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ সেই বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ন্যায়দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভকরা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। দীর্ঘকাল যাবৎ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ঐ রূপ বৃহৎ গ্রন্থ পাঠের সুযোগও সকলের ঘটে না। সুতরাং যাহাতে অল্প সময়ে সহজে ন্যায়দর্শনের মত ও বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়, এমন একখানা গ্রন্থও সরল বঙ্গ ভাষায় রচনা করা অত্যাবশ্যক। বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ সেই উদ্দেশ্যেই সেই কার্য্যে যোগ্যতম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়কেই "প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক বৃত্তি" দিয়া তাঁহার দ্বারাই উক্ত "ন্যায় পরিচয়" গ্রন্থ রচনা করাইয়া সম্প্রতি প্রকাশ করাইয়াছেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় এই পুস্তকে যথাসম্ভব সরল ভাষায় ন্যায়দর্শনের মত এবং প্রমাণাদি পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের বিশেষ মত এবং কাশ্মীরের শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞের বিশেষ মত প্রকাশ করিয়া সেই সমস্ত মতেরও সমালোচনা করিয়াছেন। আর তিনি দেখাইয়াছেন যে ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও শৈব সম্প্রদায়বিশেষ ন্যায়সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কোন কোন মতবিশেষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই গৌতমের মতে মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখানুভূতিও সমর্থন করিতেন। কাশ্মীরের ভাসর্ব্বজ্ঞ "ন্যায়সার" গ্রন্থে সেই প্রাচীন মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় আরও দেখাইয়াছেন যে, পরবর্ত্তী কালে কোন কোন অদ্বৈত-বাদী গ্রন্থকারও কণাদ ও গৌতম প্রভৃতি দ্বৈতবাদী ঋষিদিগকেও অদ্বৈতবাদী বলিবার জন্য অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রৌত অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যায় ভগবান শঙ্করাচার্য্য এবং "ভামতী" টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ঐরূপ কথা বলেন নাই। কণাদ ও গৌতমকে কোনরূপেই অদ্বৈতবাদী বলাও যায় না। তর্কবাগীশ মহাশয় এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষ বিচার করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত কথা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে ঐ বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকিবে না।

সুপ্রাচীনকাল হইতেই এদেশে নানা দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমে সেই সমস্ত মতের নানারূপে সমর্থন ও উহার বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন দ্বারা সম্প্রদায়-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং সেই সমস্ত মতের প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমে নানা দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বিচার ব্যতীত দার্শনিক গ্রন্থ হয় না। সুতরাং উক্ত গ্রন্থে তর্কবাগীশ মহাশয়ও দার্শনিক পূর্ব্বাচার্য্যগণের চিরন্তন রীতি অনুসারে কণাদ ও গৌতমের মতের ব্যাখ্যা করিতে অনেক বিচার করিয়াছেন। তিনি দ্বৈত মত সমর্থন করিতেই অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধে অনেক কথাও লিখিয়াছেন এবং সেজন্য তিনি অনেকস্থলে বৈষ্ণব দার্শনিকগণের অনেক কথাও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সকল কথাও তিনি জানেন। অদ্বৈত মতেও তাঁহার শ্রদ্ধা আছে। তিনি সকল মতেরই সম্মান রক্ষা করিয়া এই গ্রন্থে যে ভাবে ন্যায়-বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু বিষয়ের কাঠিন্য বশতঃ অনেক স্থলে কোন কোন কথা আরও ব্যক্ত করিয়া লিখিলে ভাল হইত। অবশ্য সংক্ষেপের অনুরোধে অনেক কথা লিখিত হয় নাই।

জীবাত্মার দেহাদিভিন্নত্ব নিত্যত্ব ও জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে নানা পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ পূর্ব্বক নানা যুক্তির দ্বারা উহার খণ্ডন ও আস্তিক মতের সমর্থন ন্যায়দর্শনের অধ্যাত্ম অংশে সর্ব্বসম্মত বৈশিষ্ট্য। তর্কবাগীশ মহাশয় এই গ্রন্থে সুন্দর ভাষায় সেই সমস্ত বিচারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবের প্রাক্তন সংস্কারের সমর্থনে তিনি সুন্দর ভাবে আরও বহু কথা লিখিয়াছেন, যাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। এইরূপ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে যে জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাপেক্ষ কর্ত্তা এবং নিত্য মহেশ্বরই বেদের আদি বক্তা বা কর্ত্তা, তাঁহার প্রামাণ্যপ্রযুক্তই বেদের প্রমাণ্য, কণাদ ও গৌতম পরতঃ প্রামাণ্যবাদী, ইত্যাদি বহু সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা দার্শনিক চর্চ্চাকারী সকলেরই বিশেষ জ্ঞাতব্য।

এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ন্যায়দর্শনোক্ত সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনোক্ত পঞ্চাবয়ব, তর্ক, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা ও হেত্বাভাসের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে। তাহাতে অনেক নূতন কথাও আমরা পাইয়াছি। আর এই গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকায় তর্কবাগীশ মহাশয় এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন যাহা ঐতিহাসিক-গণেরও অবশ্যপাঠ্য। আমরা তাহাতেও অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। এখনও ভারতের ন্যায়শাস্ত্রে নবদ্বীপের নব্যন্যায়েরই বহুল চর্চ্চা হইতেছে। নব্যন্যায় বাঙ্গালীর এক মহা গৌরব সন্দেহ নাই। কিন্তু মূল ন্যায়সূত্র ও তাহার প্রাচীন ভাষ্যাদি গ্রন্থের চর্চ্চা ব্যতীত ন্যায়শাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব-পরিজ্ঞান সম্ভব নহে। প্রথমে

ন্যায়দর্শনোক্ত নানা পদার্থে বুৎপত্তি ব্যতীত কোন দর্শনেরই সূক্ষ্ম বিচার বুঝা যায় না। বিশেষতঃ তর্কশাস্ত্রে অধিকার ব্যতীত তর্কের স্বরূপ এবং দোষগুণ ও সদুত্তর অসদুত্তর এবং বিচার-প্রণালী জানা যায় না। ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবহারাজীবগণ যে, বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তাহাদিগেরও ন্যায়দর্শনোক্ত বহু পদার্থে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। ফল কথা যাঁহারা তর্কশাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, অথবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই "ন্যায় পরিচয়" পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহাতে অন্য দর্শনের বহু কথাও আছে। তর্কবাগীশ মহাশয় সংক্ষেপে এই গ্রন্থ লিখিলেও ইহাতে নানা প্রসঙ্গে তিনি বহু কথা লিখিয়াছেন। সুতরাং ইহাতেও বিস্তৃত সূচীপত্র দেওয়া উচিত ছিল। আর ছাপা নির্দ্দোষ হওয়া নিতান্তই উচিত ছিল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে কর্ত্তৃপক্ষ সেবিষয়ে সুব্যবস্থা করিবেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

A Modern Yoga—The Riddle of this World—By Sri Aurabindo, published by the Arya Publishing House, College Street Market, Calcutta.

শ্রীঅরবিন্দের কলম থেকে কোন নূতন বই বেরুনো হচ্ছে সাধকজগতে একটা সবচেয়ে বড় ঘটনা; অধ্যাত্ম অনুসন্ধানে যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁদের কাছেও তা' তাই। বহুদিনের কথা, যখন অরবিন্দ 'Essays on the Gita' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নিষ্ফল ব্যবহারিক জ্ঞানলিপ্সা ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র নিন্দাবাদ প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থে যোগের যে সব ইঙ্গিত ছিল সে সম্বন্ধে অরবিন্দের স্পষ্টতর নির্দ্দেশের জন্য অনেকেই এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল। আলোচ্য গ্রন্থখানি হচ্ছে অরবিন্দের নানা লেখার সংগ্রহ, আর এসব লেখায় অরবিন্দ কতকগুলি প্রশ্ন ও বাধাবিপত্তির বিচার করেছেন। এই প্রশ্ন ও বাধাবিপত্তিগুলি উপস্থিত হয়েছিল বেশীর ভাগ তাদের সাম্‌নে যারা অরবিন্দের আওতায় অধ্যাত্মজীবনযাপনের চেষ্টা করছে। তাই বাইরের পাঠকের উদ্দেশে লেখা অন্য বইয়ের চেয়ে এ বইয়ে সাধনপথের যাত্রীদের বেশী প্রয়োজন আছে।

পাছে কেউ ভুল বোঝে, সেজন্য এখানে বলে রাখা ভাল যে এই বইয়ে যে যোগের কথা রয়েছে তার সঙ্গে আজকালকার ইউরোপীয় 'যোগের' কোন সম্বন্ধ নেই। কারণ আমি শুনেছি বর্ত্তমান ইউরোপে কোন কোন মূর্খদের দলে এক রকম যোগ খুব চলছে—আর সে যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ, যৌগিক 'তুক্‌তাক' ও স্বাস্থ্য, অর্থ কিংবা ইহলৌকিক সুখের ওপর বিশেষ মনোযোগ ও আসক্তি। এ বইয়ে যে যোগের কথা আছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অধ্যাত্ম-অনুসন্ধান, যা এমন কি যাজ্ঞবল্ক্যের যুগেও 'অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো' হিসাবে পরিচিত ছিল।

ভারতবর্ষে যাঁরা লেখেন তাঁদের ভেতর সম্ভবতঃ শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত এমন আর কেউ নেই যোগসম্বন্ধে যাঁর কোন মতামত লোকে বেশী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে, তা'র প্রথম কারণ হচ্ছে—তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে তাঁর সাধনা দীর্ঘ ও কঠোর—সে সাধনা তিনি এখনো চালাচ্ছেন। এ'তে তিনি অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত 'জীবন্মুক্তদের' পন্থা অবলম্বন করেন নি—কারণ তা'রা সাধনা কিছু সফল হ'তেই তা' ছেড়ে দেয় আর নিজেদের ঈশ্বরপদবাচ্য মনে করে সাধনায় অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না।

বইখানি লেখকের নিজের উপলব্ধি দিয়ে রচিত। যোগের আলোচনা নিয়ে এদেশে বেশ বাড়াবাড়ি হয়েছে। লোকপ্রিয় সন্ন্যাসী ও অন্যান্য সকলেও নানা যোগপন্থার কথা এত জোর গলায় বলেছেন যে সাধারণতঃ মনে হয়েছে যে তা'তে তাঁরা ওস্তাদ। কিন্তু যোগের সব প্রাচীন গ্রন্থে যে পরিভাষা আছে আধুনিকভাবে তার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া তাঁরা আর কিছু করেননি, যোগের যে সব অবস্থার কথা তাঁরা জোরগলায় প্রচার করেন তার অতি সামান্য মামুলী ধরণের অনুভূতি ছাড়া তাঁদের আর কিছু হয়নি।

এইবার বইয়ের কথায় ফিরে আসা যাক্। যারা লেখকের পূর্ব্বেকার বইগুলির সঙ্গে পরিচিত নয় তাদের বুঝবার জন্য এইটুকু বললেই চলবে যে এই যোগের প্রধান উপায় হচ্ছে পারমার্থিক সত্যে মানব প্রকৃতির আমূল ও সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ। যোগের প্রাচীন উপায়গুলি এ'তে পরিত্যাগ করা হয়নি, বরং এই মূল সমর্পণের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এই মূল সমর্পণই হচ্ছে যেন তা'দের আত্মা, তাই তা'র ভেতর দিয়ে হচ্ছে আমাদের সমস্ত সত্তা, দেহ, চিন্তা ও আত্মার, সমর্পণ। তাই তাপসিক দ্বৈত-মনোভাবের কোন আবশ্যক নেই, আবশ্যক আছে ঊর্দ্ধে আরোহণের, আর সে আরোহণের শক্তির উৎস হচ্ছে সমগ্র প্রকৃতি। নিজের জীবন সবচেয়ে বড় মনে করবার স্বার্থপর প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে যোগী যৌগিক ক্রিয়ায় নিজের সমস্ত শক্তিকে পবিত্র করেন ও পারমার্থিক সত্যের দ্বারে আরোহণ ও নির্ভরে অবস্থানের জন্য সে সব শক্তিকে নিয়োজিত করেন।

এই অবস্থায় পৌঁছে যখন অনেক সাধক থেমে যান তখনই যোগের দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হয়। সাধকের যখন আত্মজ্ঞান তিরোহিত হয়, ও ঊর্দ্ধে আরোহণের পরিমাণমত তিনি পারমার্থিক জ্যোতিঃ ও শক্তিলাভ করেন তখন তিনি পুনরাবর্ত্তন করে সেই জ্যোতি ও শক্তি নিয়ে আধিভৌতিক জগতে ফিরে আসেন। তখন তাঁর ভৌতিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সে প্রকৃতি এই আধিভৌতিক জগতে পারমার্থিক সত্যের প্রকাশের কেন্দ্রীভূত উপায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সাধনার গতি হচ্ছে দ্বিমুখী—ভগবানের দিকে আরোহণ আর ভগবানকে নিয়ে অবরোহণ, স্বর্গরাজ্যে আরোহণ ও আধিভৌতিক জগতে স্বর্গলোক নির্ম্মাণ। পৃথিবীর ধুলা ঝেড়ে ফেলে একক ভগবানের নিকট যাওয়া নয়, পরাবর্ত্তনের চেষ্টা, বা অধ্যাত্ম সত্যের প্রকাশের জন্য পথ ও কেন্দ্র তৈরী করে এই পার্থিব জীবনকে স্বর্গীয় করা। এই অধ্যাত্ম সত্যই হচ্ছে সমস্ত জগতের মূল, কিন্তু স্থূলজগতের তামসিক অকর্ম্মণ্যতা ও মনোজগতের স্বার্থপরায়ণতাই তা'র প্রকাশকে অবরুদ্ধ করে রাখে।

এই হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের যোগের উদ্দেশ্য। আত্মা, মন ও দেহের পরাবর্ত্তন

চাই। আত্মাকে হোমারের "strengthless heads of the dead"-এর মত ক্ষীণ ও পাণ্ডুর ছায়া করে রাখলে চল্‌বে না। তা'কে সজীব ও দীপ্তিময় হ'তে হ'বে, তা'কে হ'তে হ'বে এমন একটা কেন্দ্র যা' স্বর্গীয় জ্যোতি ও শক্তির সংস্পর্শে গতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে, ও দেহমনের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে। তখন মনকে শুধু বিচার করবার যন্ত্র হিসাবে, ইহজীবনের উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ও নিজের স্বাধীন অবস্থানে মশ্‌গুল হ'য়ে থাকলে চল্‌বে না। তখন তা'কে বুঝতে হ'বে যে সে আত্মার দাস, তাই বুঝে তা'কে কার্য্যে অগ্রসর হ'তে হ'বে। আর সে কার্য্য হ'বে সৃজনকারী-শক্তির, যে শক্তি জগৎ ও অরূপ সত্যকে রূপ দেয়।

এমন কি দেহও, যা অনেক সাধকের চোখে ঘৃণ্য ও বর্জ্জনীয়, তাও তখন আর সেন্ট ফ্রান্সিসের "Brother Ass" থাকে না; যেমনি করে একখণ্ড মর্ম্মর জড় পদার্থ না হয়ে রূপদক্ষের হাতে তার ভাবের দীপ্তিময় প্রকাশে পরিণত হয়, তেমনি করেই সে দেহ তখন হয়ে ওঠে স্বর্গীয় জীবনের নির্দ্বন্দ্ব বাহন।

যতটা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তা'তে মনে হয় এই হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের যোগের সার কথা। আরও বিশদভাবে এ যোগের কথা না বল্‌তে পারলেও এটুকু স্পষ্টই বোঝা যাবে যে এর উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র নয়। এ শুধু মুক্তি-লিপ্সা নয়, এর ভেতর রয়েছে একটা মহা চেষ্টা "to remould things nearer to—not the heart's but the divine desire"। তাই যাদের চোখ বস্তুজগতের ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ অন্ধ হয়নি তাদের কাছে এ আদর্শের বিশেষ মূল্য থাকা উচিত।

এতে তথাকথিত জ্ঞানমার্গীদের কোন বিরক্তির কারণ নেই। এ যোগের বিজ্ঞান মিথ্যা নয়, মনস্তত্ত্ব অপ্রচল কিম্বা ভূতত্ত্বও কল্পনার বস্তু নয়। প্রাচীন দর্শনপন্থাগুলি যে মানবজাতির প্রথম অবস্থায় অর্দ্ধস্ফুট উক্তি একথা আমি স্বীকার করতে রাজী নয়। তবে এ কথা বল্‌তে হ'বে যে অনেকেই এখন সেগুলির প্রকৃত অর্থ ভুলে গেছেন, আর প্রাচীনপন্থী টীকাকারেরা বেশীর ভাগই আঁধারের ওপর আলোকপাত না করে আলোকের ওপর আঁধারপাত করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থায় এক নূতন পরিভাষার সৃষ্টি করা হয়েছে—তাতে প্রাচীন সাধকদের চিন্তার ধারার কোন অবহেলা করা হয় নি, অথচ সেগুলি আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত পাঠকের সহজবোধ্য। এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে যদি দ্বিতীয় সংস্করণে একটা পরিশিষ্টে 'vital,' 'psychic,' 'supermind,' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাহ'লে বইয়ের মূল্য আরও বেড়ে যাবে। ঐ সব শব্দ ও ঐ জাতীয় অন্যান্য কথা এই বইয়ে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর সে অর্থ বুঝবার জন্য বইয়ের ভেতর যে সব ইঙ্গিত রয়েছে তা' অসম্পূর্ণ।

বইয়ের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যে এতে যোগের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আদর্শবাদী দর্শনের intellectual concepts বা কাব্যের emotional intuitions-এর মধ্যে যে প্রভেদ তা স্পষ্ট করে ধরে দেওয়া হয়েছে। পারমার্থিক সত্য (Absolute Reality) সম্বন্ধে পণ্ডিতদের দার্শনিক মতবাদ যতটাই idealistic হোক না কেন তাঁদের নিকট তা' শুদ্ধ অনুমানের বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নয়। "It cannot give the decisive experience or the spiritual certitude for which the soul is seeking"।

কবি কখনো কখনো ঐশ্বরিক জ্যোতির আভাস পেয়ে থাকেন কিন্তু তাঁর অনুভূতিগুলিও অত্যন্ত ভাসাভাসা রকমের আর সেগুলি এত শীঘ্র বিলীন হয়ে যায় যে সেগুলিকে কোন প্রয়োজনে লাগান সম্ভবপর হয় না। সেগুলি হ্রদের জলের ভেতরকার গাছের মতন,—সে গাছগুলি অত্যন্ত কোমল, আর সেগুলি যতক্ষণ জলের নীচে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে থাকে ততক্ষণ সেগুলির সৌন্দর্য্য হৃদয়গ্রাহী কিন্তু যেই সেগুলিকে দেখবার জন্য জলের থেকে তুলে নেওয়া যায় তখনি সেগুলি ভেঙ্গে গিয়ে জড়পিণ্ডে পরিণত হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনে কখনো কখনো সাধক এর চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারেন। তখন তাঁর যে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় কবির বা দার্শনিকের তা' হয় না। আর এ স্পষ্ট উপলব্ধি লাভ করতে হ'লে চাই যোগাভ্যাস—সে যোগাভ্যাস করতে হয় পারদর্শী গুরুর সহায়তায়।

বর্ত্তমান শিক্ষার যুগে অনেকে মনে করেন সব কথাই বই পড়লে বোঝা যায়। কিন্তু সত্যই এমন অনেক বিষয় আছে যা' বই পড়লেও বোঝা যায় না—আর যোগ হচ্ছে তা'র ভিতর একটি। যোগ হচ্ছে আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করবার উপায়—তা'র শিক্ষা কোন গুরুর সান্নিধ্য ব্যতীত হয় না। প্রকৃত গুরুর সহায়তা ব্যতীত যখনই কেউ যোগাভ্যাস করতে চেষ্টা করেছেন, তখনই তা' হয় বিফল হয়েছে না হয় আধ্যাত্মিক তুকতাকে পরিণত হয়েছে। তা'তে কোন কোন সাধকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছে—আবার কেউ বা উন্মত্ত হয়ে গেছেন। যৌগিক ব্যাপারে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সাধকদের এ সব অবস্থা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এ পথে যে সব বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয় তা'র আলোচনা এ পুস্তকের "Intermediate Zone" নামক অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে পাঠক বুঝ্‌তে পারবেন যে বর্ত্তমানকালে নানাস্থানে যে সব "অবতার," "জীবন্মুক্ত" ও "দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন গুরুরা" জনসাধারণকে মুক্তিদান করবার জন্য নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান তাঁদের নিজেদেরই মুক্তির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই সব স্বার্থান্বেষী "যোগিদের" প্রাদুর্ভাব হয়েছে বলেই যাঁ'রা কোন বিষয় তলিয়ে দেখ্‌তে চান না তাঁরা এ পথকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেন। কিন্তু বিচার করে দেখ্‌লে বল্‌তেই হ'বে যে যে পথে উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া অগ্রসর হওয়া চলে না সে পথে সবসময়ই শিক্ষার অভাবে এরূপ একদল লোক এসে জুটবেই।

এ বিষয়েও শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তা' সাধারণের উপদেশ নয়, তার ভেতর occultismএর মত রোমাঞ্চকর অথবা romantic ব্যাপার নেই আর তা' অস্পষ্টও নয় অসম্পূর্ণও নয়। তাঁর উপদেশ হচ্ছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ। তা'র চেয়ে স্পষ্ট করে এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া চলে না—বিশেষতঃ এ হচ্ছে এমন একটা বিষয় যার প্রকৃত বর্ণনা করতে গেলে বল্‌তে হ'বে—"half lights and tempting but often mixed and misleading experiences."

বস্তুতঃ এ পুস্তকে যে চিন্তার ধারা ব্যক্ত হয়েছে তা'তে স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা রয়েছে—কারণ তার মূলে রয়েছে সাধকের নিজের সত্যকার উপলব্ধি। অনেকে মনে করেন যে যা' কিছু mystical তা অস্পষ্ট হ'তে বাধ্য। এবং অধ্যাত্ম

বিষয়ে যা' কিছু লেখা তা'র ভেতর থাকবে একটা স্বপ্নের আবছায়া ও একটা আলো-আঁধারি ব্যাপার। আর সে আলোআঁধারি ব্যাপারের মধ্যে যা' কিছু প্রকাশ তা'র চেয়ে লুকানোই থাকবে বেশী। সুতরাং তার ভেতর অসংখ্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকলেও বিষয়বস্তুর উল্লেখে স্পষ্টতার অভাবের জন্যই উপলব্ধি হয়ে পড়ে বিফল। এ জাতীয় পাঠকেরা এ বই পড়লে বুঝতে পারবেন যে অধ্যাত্মজীবনের কথাকেও কত স্পষ্ট ভাষায় রূপ দেওয়া যায়। তাঁরা বুঝতে পারবেন যে যেসব বিষয় পরবর্ত্তীকালের লেখকের হাতে শুধু কদাকার dogmaয় পরিণত হয় তা'র ভাব ও ভাষা বড় বড় সাধকদের লেখায় কত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হ'তে পারে।

বইয়ের শেষ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ নির্ভীকভাবে সৃষ্টির অর্থ নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে এ চিরন্তন প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে দেওয়া সম্ভব নয়, সেইজন্য বুদ্ধও তাঁর শিষ্যদের এ নিয়ে আলোচনা করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু যাঁ'রা বুদ্ধের বচন মেনে নীরব থাকতে চান্ না তাঁদের সুবিধার জন্য শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের একটি জবাব দিয়েছেন। এ জবাব সম্পূর্ণ সত্য না হ'লেও, এই জ্বালাময় জগতের সীমানার বাইরে যে আনন্দময় জ্যোতি রয়েছে তা'র থেকে কেন এই দুঃখময় জগতের সৃষ্টি চলছে—যাঁরা সে প্রশ্নের সমাধান খোঁজেন তাঁদের মন এ জবাবে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'বে।

যাহ'ক এই শেষ সমাধানের চিন্তা থেকে এখন শ্রীঅরবিন্দের দ্বিমুখী যোগে ফিরে যাওয়া যাক্। এ যোগ আমাদের চিত্তকে যেন নাড়া দিয়ে যায়—মনে এ প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায় যে আমরা স্বার্থপূর্ণ ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর থেকে চিরকাল আমাদের বাসনার পেছন পেছন ছুটব, অথবা আমাদের অহঙ্কারকে এমনভাবে বিসর্জ্জন দেব যা'তে যে পারমার্থিক সত্যের বন্ধনে সমস্ত মর্ম্মবাদী ও বস্তুবাদী জগৎ আবদ্ধ সেই সত্যের সঙ্গে তা'কে ফিরিয়ে পাই। এইখানেই হয়ত কেউ ভুল বুঝতে পারেন। একজন খ্যাতনামা ও সহানুভূতিসম্পন্ন পাশ্চাত্য লেখক লিখেছেন যে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করেন যে—humanity is going to enlarge its domain by the acquisition of a new knowledge, new powers, now capacities which will lead to as great a revolution in human life as did the physical science in the nineteenth century."

কিন্তু এ হচ্ছে সত্যকার যোগকে ভুল বোঝা, এ ভুল ক্ষুদ্র হ'লেও মারাত্মক। যোগ এমন কিছু যন্ত্র বা বেতার নয় যা'তে করে মানবজাতির সম্পদ বা সভ্যতার উন্নতি সাধিত হ'বে। শ্রীঅরবিন্দের সম্প্রদায়ের প্রকাশিত আর এক বইয়ে একথা জোর করেই বলা হয়েছে যে এ যোগ মানবজাতিকে ইহলৌকিক ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য নয়, এ যোগ হচ্ছে পরমার্থ চর্চ্চার জন্য, সুতরাং যিনিই এ যোগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শুধু মানবজাতির কথা বলবেন তিনিই ভুল করবেন—কারণ এ যোগের মূল কথা হচ্ছে পরমার্থ আর মানুষের ভেতর তা'র প্রকাশ। তাই এ ভুলটা বর্ত্তমানকালের humanistএর নিকট সামান্য বা শুধু কথার বাঁধুনী মনে হ'লেও তা' গুরুতর—কারণ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের ক্ষণভঙ্গুর humanist

উন্নতি ও প্রাচীন প্রাচ্যজগতের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মধ্যে এইটুকুই হচ্ছে প্রভেদ। এ'র অর্থ এমন নয় যে সে পাশ্চাত্য উন্নতিকে হেয়জ্ঞান করতে হ'বে। সে সভ্যতার আদর্শ প্রাচ্যদেশের এ যোগ বা অন্য যোগের চেয়ে নিম্ন স্তরের।

শ্রীঅরবিন্দের বইয়ের একটা সামান্য ত্রুটির উল্লেখ না করে পারলাম না। সে ত্রুটি হচ্ছে যে তিনি বৌদ্ধযোগের ন্যায্য বিচার করেন নি। তাঁর বইয়ে এ যোগের দু' একটা উল্লেখ আছে এবং তা'তেও বলা হয়েছে যে বৌদ্ধধর্ম্ম জগতকে শিখিয়েছে বর্জ্জন ও ইহসংসারের বাইরে যে পারমার্থিক জগৎ আছে তা'র ভেতর নিজের সম্পূর্ণ লয় সাধন করতে। কতকগুলি সম্প্রদায়ের মত এইরূপ হলেও সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্বন্ধেই তা' বলা চলে না। অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন মহাযান সম্প্রদায়গুলি—বা সেগুলির মধ্যে দু'একটি—উচ্চতর আদর্শের বোধিসত্ত্ববাদ প্রচার করেছিল—আর সে বোধিসত্ত্ববাদে অর্হতের নির্ব্বাণের কোন স্থান ছিল না। তাদের মত ছিল যে নির্ব্বাণ ও সংসার একই পরমার্থসত্য আর সেই সত্যের প্রণিধানেই হচ্ছে বোধিজ্ঞান। এই সত্যকেই অশ্বঘোষ বলেছেন 'ভূততথতা'—আর অশ্বঘোষ হচ্ছে বৌদ্ধদার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। অশ্বঘোষ এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে বোধিজ্ঞানের দু'টো দিক্ আছে—যা'কে বলা হয় 'প্রজ্ঞা' ও 'অচিন্ত্য কর্ম্ম'। প্রথমটাকে বলা যেতে পারে একটা centripetal force যা'তে পাওয়া যায় অদ্বৈতজ্ঞান আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের অচিন্ত্য ও অপ্রমেয় কর্ম্ম যা'কে বলা যায় centrifugal force আর যা'তে সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধিত হয়।

লঙ্কাবতারসূত্রে বুদ্ধ বল্‌ছেন যে অধ্যাত্ম প্রণিধান ও পবিত্রতাই হচ্ছে বুদ্ধত্ব। এই বুদ্ধত্বের জ্যোতি অগ্নিপিণ্ডের মত বিস্ফুরিত হয়। যাঁরা অত্যন্ত দীপ্তিসম্পন্ন মনোজ্ঞ ও সৌভাগ্যবান তাঁরা ত্রিভুবনের পরিবর্ত্তন সাধিত করতে পারেন। কতকগুলি জগৎ এভাবে এখনো পরিবর্ত্তিত হচ্ছে আর কতকগুলির পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। এ কথা মহাযানের কোন অপ্রসিদ্ধ কথা নয়। এ কথা কিভাবে শ্রীঅরবিন্দের যোগের দ্বিধাগতির অনুরূপ তা'র আলোচনা আমি এখানে করব না—কিন্তু এ কথা সত্য যে সংসার থেকে মুক্তি পাওয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের একমাত্র বাণী নয়।

যাঁরা যোগের পথে চল্‌তে চান তা'দের জন্য দু'একটি কথা এখানে অবান্তর হবে না। অরবিন্দের বইয়ে একথা স্পষ্ট করে বলা না থাকলেও বইখানা পড়লেই বোঝা যায় যে, তাঁর প্রদর্শিত পথ প্রাচীন সাধকদের প্রদর্শিত পথ থেকে পৃথক নয়। তাঁর যোগের মূল কথা হচ্ছে "A central sincerity," "a fundamental humility", the ability to do all work in "a spirit of acceptance, discipline and surrender, not with personal demands and conditions but with a vigilant conscious submission to control and guidance, a calm equinanimity and a faith that inspite of our errors and weaknesses and inspite of any immediate appearance of failure the Divine will is leading us, through every circumstance

towards the final Realisation.'' । পরমার্থের সাহায্যে সমস্ত জগতের পরাবর্ত্তন—সেই পরমার্থ লাভ করবার একান্ত চেষ্টা ও নিজের যা কিছু তা' সেই পরমার্থে উৎসর্গ করবার একান্ত ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সে চেষ্টা ও ইচ্ছা এতটা ঐকান্তিক যে ভগবানের লীলায় তা'কে কোন স্থান অধিকার করতে হবে সে চিন্তার তখন আর তার অবকাশ থাকে না।

সত্য কথা বল্‌তে—যোগ ছেলেখেলা নয়, যাঁরা নূতন কিছু খোঁজেন তাঁদের ঔৎসুক্য শান্ত করবার উপায়ও নয়। এ হচ্ছে চিরন্তন অধ্যাত্ম-সাধনার পথ, alchemistদের "Great Work", সমস্ত মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধন। একাজ সহজসাধ্য নয়। কারণ প্রকৃতির পরাবর্ত্তন ভগবানের দয়া ব্যতীত সম্ভব না হ'লেও, প্রথম অবস্থায় যা' আয়োজন, পাত্রকে ভগবানের সেই দয়া নেবার জন্য তৈরী করা—সবই নিজের চেষ্টায় করতে হয়।

কেউ কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন যে এ যোগ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ না কর্ম্মযোগ। যাঁরা যোগের এসব মার্কা খোঁজেন তাঁদের আমি অনুরোধ করি বইখানা পড়তে। বইখানা পড়লেই তাঁরা তাঁদের প্রশ্নের জবাব পাবেন। বইয়ে একথা স্পষ্টই বলা হয়েছে যে—এপথে যে জ্ঞান লাভ হয় সে জ্ঞান হচ্ছে সেই অদ্বৈত পরমার্থসত্যের। সে হচ্ছে উপনিষদের—সর্বখল্বিদম্ ব্রহ্ম। ভক্তিও সেইখানে কারণ তার জন্য দরকার হয় ভগবানে শাশ্বতপ্রেম ও আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদনই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের নবধা ভক্তির চরম কথা। কর্ম্মযোগও সেইখানে কারণ সে জ্ঞানের জন্য দরকার হয় গীতার "কর্ম্মসু কৌশলম্।"

এই সমস্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাইরে সেই অদ্বৈত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিরঞ্জন শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনশীল ভগবান তাঁর চিরন্তন পরিবর্ত্তনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর আঁধার ছায়ার মাঝে নিজে জ্যোতিষ্মান্। সব পথই পথ—আর এ বই হচ্ছে তার আর একটি সাক্ষ্য যে এই আধুনিক বস্তুবাদের জগতেও যাঁদের চলবার সাহস আছে তাঁদের জন্য সেই প্রাচীন বিপদসঙ্কুল পথ খোলা রয়েছে—তেন ধীরা অপিয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিব ঊর্দ্ধং বিমুক্তা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম (রোনাল্ড্ নিক্সন্)

Recent Poetry 1923---1933, Edited by Alida Monro ; The Poetry Bookshop.

Strange Battalion ;—By Mary Lang ; Dent.

কোনো কবিকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে তাঁহার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ আদ্যন্ত পড়া দরকার। কাব্যযুগ সম্বন্ধেও সেই একই কথা—খ্যাত-অখ্যাত সমস্ত কবির সহিত পরিচয় না থাকিলে কোনো যুগের স্বরূপ আমাদের নিকট ধরা পড়ে না। এই ধরণের মতামত এমনই সত্য যে মনে হয় ইহাদের প্রতিবাদ চিন্তাতীত। তবুও প্রতিবাদ

প্রয়োজন; বলা দরকার, ভাবজগতে আদর্শহিসাবে ইহাদের মূল্য যতই হোক, সাধ্যন্তরে ইহাদের প্রসার অনেকাংশে পরিমিত। এক ইংরাজী ভাষাতেই কবি ও কাব্যের সংখ্যা এমন উল্কাবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে যে বেকনের মতো I have taken all Knowledge to be my province বলা দূরে থাক, ইংরাজীর সমস্ত প্রকাশিত কবিতা পড়িয়াছি বলার দুঃসাহসও বোধ হয় কোন পাঠকের নাই। তাই ইংরাজীতে উল্লেখ-যোগ্য কাব্য-চয়নিকার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য সকলেরই পলগ্রেভের কথা মনে পড়িবে। এমন পাঠকের কথা ভাবা যায়না যিনি ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছেন অথচ এই বইটির সহায়তায় সমৃদ্ধচিত্ত হন নাই। কে যেন একজন বলিয়াছেন, যদি তাঁহার কোনো নির্জ্জনদ্বীপে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হয়, ও সঙ্গে লইতে দেওয়া হয় মাত্র একখানি বই, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাছিয়া লন পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি। মানিতেই হইবে, ইঁহার মতো কাব্যরসিক যে কোনো দেশে অতি বিরল।

জ্যামিতিতে বলে, অংশ কখনও সমগ্রের সমান হইতে পারে না। এই সূত্রের সাহিত্যিক অনুমান টানিলে দাঁড়ায় এইরূপ, চয়নিকা দিয়া সংগৃহীতার অভাবপূরণ অসম্ভব। কিন্তু কাব্যের উৎকর্ষ ত পরিমাণগত নয়, গুণগত; তাই জ্যামিতিক সত্যের বিপরীতই কি কাব্য জগতে অধিকতর সত্য নয়? সেখানে কি একথা বলা চলে না যে অনেক ক্ষেত্রে অংশের মূল্য সমগ্রের চাইতে বেশী? সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক কবি কি জায়গা জুড়িয়া বসিয়া নাই যাঁহারা প্রতিষ্ঠার দাবী করিতে পারেন মাত্র দুয়েকটি রচনার জোরে? এই সব কবিরা বাঁচিয়া আছেন চয়নিকার কল্যাণে; কারণ তাহা না হইলে তাঁহাদের সংগৃহীত কাব্যাবলীর বিশালতায় এই ভালো কবিতাগুলি খড়ের গাদায় ছুঁচের মতো হারাইয়া গিয়া অধিকাংশ পাঠকের অপঠিত থাকিয়া যাইত। অনেক বিখ্যাত কবির বিখ্যাত কবিতাও বিখ্যাত হইতে পাইত কি না সন্দেহ, যদি না তাহারা বহু চয়নিকায় বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইত।

কবি বা স্রষ্টার গৌরবে চয়নকর্ত্তার অধিকার নাই বটে—তিনি মাত্র মিড্‌ল্‌ম্যান—তবুও তাঁহার স্বার্থের সফল সম্পাদনার জন্য সুষ্ঠু রূপজ্ঞানের প্রয়োজন। রূপজ্ঞানের গোড়ার কথা সীমাবোধ, অর্থাৎ গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন। তাই নিজের রুচি বা খুসীমতো কতকগুলি কবিতা একত্র করিলেই সুন্দর চয়নিকা গড়িয়া ওঠে না। প্রত্যেক চয়নগ্রন্থের থাকা উচিত একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হয় তাহার রূপ। এই রূপের খাতিরে চয়নকর্ত্তাকে অনেক সময় বাদ দিতে হয় এমন কোনো কোনো কবি বা কবিতাকে যাহা হয়ত তাঁহার ব্যক্তিগত রুচির অনুকূল অথচ চয়ন-উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। পলগ্রেভ এবিষয়ে আজিও পথ-প্রদর্শক রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল "সংস্‌ এণ্ড লিরিক্‌স্‌" সংগ্রহ করা। তাই এমন কবিতা তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই যাহা প্রধানতঃ গীতিমূলক নহে। সেজন্য অনেক ভালো কবিতা—আখ্যান বা নাটক জাতীয়—তাঁহার স্বর্ণভাণ্ডার হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অনেক চয়নকর্ত্তা তাঁহাদের উদ্দেশ্যকে অনির্দ্দিষ্ট রকমে বিস্তৃত করিয়া সবধরণের ভালো কবিতাকে একত্র জমাইয়াছেন; তবুও মনে হয় পলগ্রেভের মহিমাকে খর্ব্ব করিতে পারেন নাই। আর একটি গুণে পলগ্রেভ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহার নির্ব্বাচিত কবিতাগুলিকে তিনি সাজাইয়াছেন এমন একটি ভাবক্রম অবলম্বনে, এমন

একটি poetically effective manner-এ, যাহাতে পরস্পর কিরণ সম্পাতে কবিতা গুলির স্বকীয় মর্য্যাদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুরূহ পথে সম্প্রতি লরেন্স বীনিয়ন ব্যতীত, অপর কেহ তাঁহাকে অনুসরণের চেষ্টাও করিয়াছেন কিনা, আমার জানা নাই।

অন্ততঃ ইংরাজী কবিতার নবতম চয়নগ্রন্থের সম্পাদিকা শ্রীমতী মানরো সে চেষ্টা করেন নাই। তাই বলিয়া এ কথা বলা চলে না এ সম্পাদনার সমস্ত উপযোগিতায় তিনি বঞ্চিত। কারণ তাঁহার ভূমিকার প্রথম বাক্য এইটি—An anthology must have a purpose। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই চয়নিকা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্য তাঁহার নামকরণেই প্রকাশ, ১৯২৩ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত-দশকটির কাব্যরূপের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া। না, ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্যক্ বিবৃত হইল না। তিনি চান এই যুগের সাম্প্রতিক মূর্ত্তিটি স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে। ফলে, তাঁহাকে বাদ দিতে হইয়াছে অনেক কবিকে যাহারা কালে আধুনিক হইলেও মনে সাম্প্রতিক নহেন ; আর গ্রহণ করিতে হইয়াছে অনেক কবিতাকে যাহা এই দশকে রচিত না হইলেও বর্ত্তমান ভাবধারার উৎসস্বরূপ।

সম্প্রতি লরা রাইডিং ও রবার্ট গ্রেভস্ A Pamphlet against Anthologies নামক পুস্তিকায় কাব্যচয়নকে প্রাণ ভরিয়া ঠুকিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যতম প্রধান আপত্তি এই—চয়নকর্ত্তারা কেবল অতীতের দিকে চাহিয়া থাকেন, যে সব কবি পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠিত, শুধু তাহাদের কবিতাই চয়নিকায় স্থান পায়, আর যাহারা ভাব ভাষা ছন্দ লইয়া নূতন পরীক্ষণ চালাইতেছে, যাহারা সনাতন প্রথা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নবতর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, অভিজ্ঞতা-অনুভূতিকে অনুরূপ নবীনতায় বাণীকায়া দিতে চাহিতেছে, তাহারা একান্তই প্রত্যাখ্যাত হয়। এ অভিযোগ যে একেবারে অমূলক নয় তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ—Georgian Poetry নামক চারিখণ্ড চয়নিকা গ্রন্থ যাহা ১৯১১ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। কারণ, লরেন্স, পাউণ্ড, এলিয়ট প্রভৃতি আজ যাঁহারা মর্য্যাদাবান কবি বলিয়া প্রতিপন্ন, তাঁহাদের উল্লেখ পর্য্যন্ত এই বইগুলিতে মেলে না। শ্রীমতী মানরো-র "রিসেণ্ট পোয়েট্রী" এডওয়ার্ড মার্শ-এর "জর্জ্জিয়ান পোয়েট্রী"র সংবর্দ্ধনী। শুধু সংবর্দ্ধনী নহে, সংশোধনীও বটে। কারণ মার্শ সাহেব যে ভুল করিয়াছিলেন তাহা এড়াইয়া চলিয়াছেন শ্রীমতী মানরো। তাঁহার চয়ন-উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই বলিয়া তিনি সাম্প্রতিকতার ছাপকে ম্লান না করিয়াও প্রাচীন ও নবীন কবিবৃন্দকে একত্রিত করিতে পারিয়াছেন। একদিকে যেমন আছেন অডেন্, রীড্, বট্রাল্, স্পেণ্ডার, অলডিংটন, ডে লুইস্ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত তরুণ কবিবৃন্দ, অন্যদিকে ত্বালামার, ইয়েট্স্ সিটওয়েল-ভাইভগিনী ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনেরাও আছেন—কিন্তু আছেন তাঁহাদের আধুনিকতম রূপে, কাজেই তাঁহাদের উপস্থিতি বেসুরা বাজে নাই। মেসফিল্ড, গিবসন প্রভৃতি পরিত্যাক্ত হইয়াছেন, বর্ত্তমানযুগের সহিত তাল রাখিতে পারেন নাই বলিয়া। পাউণ্ড ও লরেন্স কেন বাদ পড়িলেন স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু এলিয়টের The Hollow Men ও The Love Song of Alfred Prufrock ১৯২৩ এর পূর্ব্বে রচিত হইলেও নির্ব্বাচিত হইয়াছে। The Waste Landকে বাদ দিতে হইয়াছে বোধ হয় স্থানাভাবে। কামিংস্ নাই বটে, তবে প্যামেলা ট্রাভারস্ ও রুথ পিটার আছেন। এইরূপে

সাঁইত্রিশটি কবির কাব্যভাণ্ডার অন্বেষণের ফলে শ্রীমতী মানরোর চয়নিকা ইংরাজী কাব্যের আধুনিকতম বিকাশের প্রতিভূকল্প হইয়া উঠিয়াছে। কোনো চয়নিকাই সর্ব্বরুচিসম্মত হইতে পারে না, তাঁহার এটিও হইবে না। এটুকু নিশ্চিত, অনেক কাব্যসন্ধানী পাঠকের কৃতজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করিবেন।

বইখানি আগাগোড়া পড়িবার পর আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে মনে যে অনুভূতি জাগিয়া ওঠে তাহাতে আনন্দ অপেক্ষা চমকই বেশী। ভাবব্যঞ্জনা, বচনভঙ্গী, ছন্দচালনা, ছেদবিভাগ ও পংক্তি-বিন্যাসের উদ্ভট দুঃসাহসিকতায় যত রকমে পাঠককে তাক লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহাতে কোনটি বোধ হয় এই কবিদের চোখ এড়ায় নাই। কবিতার একটি সঙ্গত অর্থ থাকা চাই। এই প্রাচীন ধারণাটিকে ইঁহারা অবজ্ঞা-ভরে অবহেলা করেন। তাই অনেকস্থলে অর্থের অভাবে অনর্থ আপনাকে জাহির করিয়াছে কাংস্যকণ্ঠ উচ্চরবে। ইঁহাদের চরম গৌরব দুর্ব্বোধ্যতায়—যেন পাঠকে বুঝিতে পারিলে ইঁহাদের জাতি যাইবে। মাঝে মাঝে এক একটি লাইনে বা স্তবকে, এক একটি উপমানে বা লক্ষণায় ইঁহাদের ক্ষমতার বিশেষত্ব ও কল্পনার স্বকীয়ত্ব বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো দীপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘন তমিস্রা, দুষ্ট সরস্বতীর বিকৃত মায়া। দুর্ব্বোধ্যতার এ অভিযোগ কেবল আমার মতো বিদেশী পাঠকের মনে উদিত হইলে তাহার কোন মূল্য থাকিত না। কিন্তু এ প্রশ্ন যে ওদেশের সুধী পাঠকমণ্ডলীকেও বিচলিত করিতেছে। অবশ্য কবিদের স্বপক্ষের ব্যাখ্যাকর্ত্তারও অভাব নাই। কী যে সাহিত্যিক কুরুক্ষেত্রের আয়োজন হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়, ইষ্টম্যান, এলিয়ট, রিচার্ডস্, লীভিস্, স্প্যারো, রবার্ট্স্, ষ্টোনিয়ের, ইত্যাদির অস্ত্র সঞ্চালনের সংবাদ রাখিলে; পরস্পরের প্রতি ঘাত-প্রতিঘাতে ইঁহাদের কাহারো লেখনী হইয়া উঠিয়াছে বিস্তার ভারে নদীর মতো, কাহারো বা বিষতিক্ত ব্যাঙ্গের প্রয়োগে ছুরিকার মতো তীক্ষ্ণমুখ। এই মসীযুদ্ধ সহজে নিবৃত্ত হইবে, এ আশা করা বৃথা। কারণ, কবিতার উৎকর্ষের সংজ্ঞা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই, কোনোদিন হইবে কি না সন্দেহ। তবে যে ধারা আজ ইংরাজী সাহিত্যে চলিতেছে তাহা যদি আরও কিছুকাল বজায় থাকে তাহা হইলে শুধু সাধারণ বিদ্যা ও সহজ রসবোধ সম্বল করিয়া আর কবিতা পড়া চলিবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতো আধুনিক কবিতা হইয়া উঠিবে অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পাঠকের সম্পত্তি, ও আজকাল আমরা যেমন বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা পড়িয়াই তুষ্ট হই, তখন কবিতার পরিবর্ত্তে সমালোচকের আলোচনা পড়িয়াই তুষ্ট থাকিতে হইবে। এ সম্ভাবনায় আমার মন ত্রস্ত হইয়া উঠে; কিন্তু ভরসা পায় এই ভাবিয়া "রিসেণ্ট পোয়েট্রি"র মত সাম্প্রতিক চয়নিকাতেও এমন কয়েকটি কবিতা আছে—যদিচ তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প—যাহা পড়িয়া সে সম্পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারে, সমগ্রতার উপলব্ধির আবেগে। উদাহরণতঃ দুটি কবিতা তুলিয়া দেওয়া গেল।

১। Tempt me no more; for I
Have known the lightning's hour,
The poet's inward pride,
The certainty of power.

Bayonets are closing round,
I shrink ; yet I must wring
A living from despair
And out of steel a song.

Though song, though breath be short,
I'll share not the disgrace
Of those that run away
Or never left the base.

Comrades, my tongue can speak
No comfortable words,
Calls to a forlorn hope,
Gives works and not rewards.

Oh keep the sickle sharp
And follow still the plough ;
Others may reach, though some
See not the winter through.

Father, who endest all,
Pity our broken sleep ;
For we lie down with tears
And waken but to weep.

And if our blood alone
Will melt this iron earth,
Take it. It is well spent
Easing a saviour's birth.

—Cecil Day Lewis.

২। Fin De Fete

Sweetheart, for such a day
One mustn't grudge the score ;
Here, then, it's all to pay,
It's Good-night at the door.

Good-night and good dreams to you,
Do you remember the picture-book
thieves

Who left two children sleeping in a
  wood the long night through,
And how the birds came down and
  covered them with leaves ?

So you and I should have slept, but
now,
  Oh, what a lonely head !
With just the shadow of a waving
bough
  In the moonlight over your bed.
      —Charlotte Mew

শ্রীমতী মানরো তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—this particular collection, not strictly an anthology। অতি প্রচলনের ফলে কথাটার অর্থের এমনই অধোগতি হইয়াছে যে যে-কোন collectionকে anthology না বলিতে পারার কারণ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। বোধহয় শ্রীমতীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছিল উহার মৌল গ্রীক অর্থ (anthost legeia=পুষ্পচয়ন) যে অর্থে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে মাডারাদেশীয় মিলিয়েগার সুবিখ্যাত গ্রীক অ্যান্থোলজি প্রণয়নের মুখবন্ধে প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। মিলিয়েগার বলিতেছেন :—

Beloved Muse, to whom do you bear this many-blossoming song ? And who wove this flower-crown of poets ? Meleager wrought it and made it perfect as a gift for remembrance to lovely Diocles, weaving into it many lilies of Anyte and many white lilies of Moero, and Sappho's few, but all roses, the narcissus of Melanippides heavy with song and the young vine shoot of Simonides, * * * * Now I bring this gift to my friends, for this sweet speaking garland of the Muses is for all who love the beauty of poetry.

(Aldington কৃত অনুবাদ)

নিজের গ্রন্থকে অ্যান্থোলজি বলিতে শ্রীমতী মানরোর এ সঙ্কোচ কেন? তবে কি তাঁহার ধারণা যে তাঁহার মাল্যগ্রন্থে আছে এমন অনেক কবিতা যাহারা প্রকৃত পুষ্প নহে? তাহারা কি তবে বর্ণে গন্ধে উগ্র কাগজের ফুল, প্রাকৃত সৃষ্টির স্নিগ্ধ অথচ শাশ্বত প্রকাশ হইতে বঞ্চিত ?

শ্রীমতী মেরী ল্যাং বোধ হয় ইংলণ্ডের তরুণতম কবি। তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের মলাটে লেখা আছে তিনি আজও কুড়ির কোঠায় পৌছান নাই। অধিকাংশ কবিতা সতেরো বছরের আগের লেখা। এ সংবাদে স্তব্ধ হইতে হয়, কারণ

কবিতা পড়িয়া ইহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কোথাও ছেলেমানুষির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অনুভূতির গাম্ভীর্য্যে, প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতায় বয়স্ক পরিণত মনেরই পরিচয় মেলে। ইঁহার কবিতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার সময় আজিও আসে নাই। আমাদের দেশের সপ্তদশী কবিযশঃপ্রার্থিনীরা কম নহেন বলিয়া প্রধানতঃ তাঁহাদের অবগতির জন্য তিনটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

(১) To Rain

O much abused inland of sodden skies,
I cannot hate the weary sullen sound
Of dripping, and the sight of spongy ground,
Because I see your face with other eyes ;
The eyes of retrospection. I am wise
In memories, and memories abound
Of a brown land, with parched and gasping
ground,
And burning, merciless and stark sunrise.
And I was waiting, looking on the land,
The barren paddocks, worn and brown and sere,
Waiting for you, the while the scalding hand
Of drought gripped all the land and me ; and fear
Supplanted hope, till suddenly in grand
Abundance you came, Rain, life-bringer clear.

(২) To—,At Evening

Across the scattered remnants of a day
I see your face in chiselled beauty clear ;
I see your level eyes, O thou most dear.
O thou most wonderful ; not turned away,
Nor cold as chiselled eyes, but steadfast grey,
And living blue, and changing green ; I hear
Your voice, as soft as when it soothed my ear
At dawn, and you outshone the sun's first ray.
Still is the tumult of each laden hour
Subordinate unto your face and voice ;
Yours is the vital image that doth tower
Triumphant in my heart ; I have no choice.
Would I forget you if I had the power ?
That power's denied me, I can but rejoice.

(৩) Realization.

So swift the flash, I thought that I had dreamed
One spaceless second on the crest of time,
Yet through the ragged veils, chill cities gleamed
And cold and sparkling pinnacled ; sublime,
As yet unseen, with places desolate
And towers fire-new, and wide-flung entrance gate.
All this beyond, yet swifter far than light,
And sharp as stars ; as stars so crystal pure..
And then a wind blew bleak, vanguard of night,
Dark leaned across the purple sweep of moor.
So swift the flash, I thought that I had dreamed.
Yet through the ragged veils, chill cities gleamed.

উৎসর্গপত্রে তরুণী কবি শেকসপিয়ারের 'টুয়েলফ্থ নাইট' হইতে বিনয় করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন—"what's to come is still unsure," বিনয় সর্ব্বদাই শোভন; তারুণ্যে বিনয় শোভনতর; শক্তিমান তারুণ্যের সহিত বিনয়ের সংযোগ শোভনতম। আশা করা যাক, এই বিনয়ই শ্রীমতী মেরী ল্যাংকে বর্ত্তমানের হাততালি ও যশোলিপ্সা অতিক্রম করাইয়া সমৃদ্ধতর কাব্যপ্রকাশের সহায় হইবে। যদি তাহা না হয়, যদি প্রতিভার উন্মেষ ভবিষ্যতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে রসপিপাসু পাঠকের দুঃখের কারণ ঘটিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

New Introductory Lecture on Psycho Analysis— by Sigmund Freud.

Modern Man in search of a Soul by C. I. Jung.

ফ্রয়েড সম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা হয়েছে যে আলোচনার বাড়াবাড়িতে ফ্রয়েডের নিজের কথা অনেক জায়গায়ই চাপা পড়ে যায়। কান্ট্ এবং হেগেলের তুলনামূলক সমালোচনায় একজন দার্শনিক বলেছেন যে কান্টের মতামত কঠিন বলে যে জনপ্রিয় হয়নি, তা নয়, কারণ তাহলে তো হেগেলের মতামতেরও বাজারে কোন চলতি থাকত না। অথচ কথায় কথায় আমরা হেগেলের মতের কথা শুনতে পাই—সমস্ত প্রশ্নেরই যে দুইটি দিক আছে, অথবা বাড়াবাড়ি করলে তার ফলে পস্তাতে হবে এ সমস্ত কথাও তাই হেগেলীয় মতবাদ বলে পরিচিত। সহজ বলে হেগেল জনপ্রিয় হননি—তাঁর মতামতকে অতি সহজে বিকৃত করা চলে বলেই হেগেলের এত আদর।

ফ্রয়েডের বেলায়ও ঠিক তাই হয়েছে। ফ্রয়েডের নামে যারা কথায় কথায় কসম্‌ খায়, তারা সবাই যে ফ্রয়েডের মতামত জানে, একথা মনে করবার বিশেষ কোন কারণ নেই। তাই যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আঘাতে আমরা অনেক সময় শিউরে উঠি, একটু সাবধান হয়ে খোঁজ করলেই দেখা যাবে যে ফ্রয়েড হয়তো স্বপ্নেও কোনদিন তেমন কথা বলেন নাই।

ফ্রয়েডের বিশেষত্ব এই যে মানুষের মনের যে দিকগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ তিনি আসবার আগে অত্যন্ত কম ছিল। তার মানে এ নয় যে আমরা সে সব বিষয়ে কিছুই জানতাম না। ফ্রয়েডের বহুযুগ পূর্ব্বে লাইবনিট্‌জ্‌ দেখিয়ে গিয়েছেন যে আমাদের সজাগ মন আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। সে সজাগ মনের পিছনে রয়েছে অচেতন মনোবৃত্তি, কিন্তু জীবনে তাদেরও প্রভাব কম নয়। এই অচেতন ও অর্দ্ধচেতন মনোরাজ্যকে কান্টও স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সে গোধূলিআলোর দেশের অস্তিত্ব স্বীকার করেও তাঁরা তার বিষয় আর বেশী কোন কথা বলতে পারেন নি। এই অচেতন ও অর্দ্ধচেতন রাজ্য আবিষ্কারেই ফ্রয়েডের প্রধান কৃতিত্ব।

আমরা প্রত্যেকেই প্রতি রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখি—বেশীর ভাগ স্বপ্নই মনে থাকে না, কিন্তু মাঝে মাঝে দুয়েকটি স্বপ্ন মনকে এমন নাড়া দিয়ে যায় যে তাদের কথা ভোলা যায় না। ফ্রয়েড ছিলেন চিকিৎসক—তাঁর রোগীদের এই সমস্ত স্বপ্নের অর্থ খুঁজতে গিয়ে তাঁর মনে হ'ল যে এ সমস্ত স্বপ্ন আমাদের অচেতনা ও অর্দ্ধচেতনার রাজ্যের। তাই নিয়ে আলোচনা করে তিনি দেখলেন যে সত্যই তাই। অর্দ্ধচেতন ও অচেতন মনকে আমরা বহুদিন স্বীকার করে এসেছি, সজাগ চেতনার উপর তার প্রভাবও স্বীকার করেছি, কিন্তু চেতনার বাইরে ছিল বলে এতদিন তাদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় নি। স্বপ্নের সঙ্গে তাদের নিগূঢ় যোগ আছে একথা স্বীকার করলে চেতনার পিছনকার এ মনোরাজ্যে আমাদের প্রবেশাধিকার মেলে—স্বপ্নের অর্থ খুঁজে খুঁজে আমরা তাতে মনের এই সমস্ত গোপন কক্ষের পরিচয় পাই।

ফ্রয়েড চিকিৎসক—রোগীমন নিয়েই প্রধানতঃ তাঁর কারবার, তাই রোগীর স্বপ্ন-আলোচনার ফলে তাঁর ধারণা হল যে মানুষের অচেতনা ও অর্দ্ধচেতনা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে পরিপূর্ণ। চেতন জীবনে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান না করতে পারলে এক মুহূর্ত্তও বাঁচা চলে না; প্রয়োজনের খাতিরে যেমন করেই হোক, গোঁজামিল দিয়েও তার কোন একটা সমাধান খাড়া করতে হয়, তাই সজাগ জীবনে আমরা এ সমস্ত দ্বন্দ্বের পরিচয় পাইনে—কিন্তু জীবনধারণের প্রয়োজনের সঙ্গে অচেতনা ও অর্দ্ধচেতনার সম্বন্ধ গৌণ বলে সেখানে এ দ্বন্দ্ব লুকোবার কোন দরকার নেই—সেখানেই আমরা মানুষের প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পাই।

ফ্রয়েডের অভিজ্ঞতায় এ সমস্ত দ্বন্দ্বের বেশীর ভাগই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে—তাদের সেক্সজীবনকে কেন্দ্র ক'রে। তাই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে মানবজীবনের এই দিকেই ঝোঁক পড়ে, কিন্তু তাই বলে ফ্রয়েড নিজে কোনদিন এমন কথা বলেননি যে সমস্ত স্বপ্নেই সেক্স রয়েছে, অথবা সেক্স ছাড়া মানুষের জীবনে আর কোন দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই।

ফ্রয়েডের মতে সমস্ত স্বপ্নেরই কারণ কোন একটি মানসিক দ্বন্দ্ব। স্বপ্নের মধ্য

দিয়ে আমরা সে দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চাই, কিন্তু যেখানেই দ্বন্দ্ব, সেখানেই তার সঙ্গে অতৃপ্তি এবং ক্ষোভ অথবা কোন কোন সময় তীব্র দুঃখ জড়িত রয়েছে। যা কষ্টকর তাকে আমরা এড়িয়ে চলি, কাজেই স্বপ্নে দ্বন্দ্ব নিজের মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় না, তাকে প্রকাশের জন্য সিম্বল বা প্রতীকের আমরা ব্যবহার করি। কাজেই স্বপ্নে আমরা যা দেখি, তা কেবল স্বপ্নের বাহিরকার ছায়া, এর ভেতরকার অর্থ রয়েছে লুকোনো, তাকে জানতে হলে এ সমস্ত প্রতীকের অর্থ জানা চাই, প্রতীক দিয়ে স্বপ্নকে বুঝে তখন আমরা তার প্রকৃত মর্ম্ম জানব।

ফ্রয়েডের বিবরণে দুটি বিষয় দ্রষ্টব্য। প্রতীক স্বীকার করায় আমাদের সমস্ত স্বপ্ন রূপক হয়ে দাঁড়ায়, তার ফলে স্বপ্নের বিশ্লেষণ ও অর্থবোধ হয় মনস্তাত্ত্বিকের প্রধান কাজ। অন্যপক্ষে ফ্রয়েড সুখবাদকে আমাদের জীবনের ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করেছেন, কারণ বাস্তবের দুঃখকে এড়াবার জন্যই স্বপ্নে প্রতীকের ব্যবহার।

ফ্রয়েডের এককালীন শিষ্য ইয়ুঙ্গের মতে এ দুটি কথাই ভুল। কোন কোন স্বপ্ন রূপক হ'তে পারে; কিন্তু তাই বলে সমস্ত স্বপ্নই যে রূপক হবে এমন কোন কথা নেই। প্রতীকের ব্যবহারও অনেক সময় হয়তো হয়, কিন্তু তাই বলে প্রতীকের অর্থ সম্বন্ধে ফ্রয়েড যেমন নিঃসন্দেহ, তার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। কতকগুলি প্রতীক হয়তো মানুষের অতি প্রাচীন জীবন থেকে চলে এসেছে, কিন্তু দেশকালপাত্রভেদে তাদেরও যে বদল হয় নি, সেকথা জোর ক'রে বলা চলে না। অন্যপক্ষে অনেক স্বপ্নকে রূপক বলে অর্থ করা যায় না। আমাদের অতীত বা ভবিষ্যৎ অনেক সময় স্বপ্নে ধরা পড়ে, তার কারণ এই যে সচেতন মনের পেছনে যে মন অচেতন ও অর্দ্ধচেতন, তাদের স্বরূপ সেখানে প্রকাশ পায়। তার জন্য কোন রূপক অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নেই। স্বপ্নে অনেক সময়ে আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় পাই, সজাগ অবস্থায় এ পরিচয় আমরা অস্বীকার করি—স্বীকার করলেও সে স্বীকৃতি সহজ নয়। স্বপ্নের অর্থ খুঁজতে গিয়ে ফ্রয়েড জিজ্ঞাসা করেন, "এ স্বপ্নের কারণ কি? যে স্বপ্ন দেখল, তার অতীতে এমন কি ঘটনা আছে যার ফলে সে এ স্বপ্ন দেখল?" ইয়ুঙ্গ এ ধরণের প্রশ্নের সার্থকতা স্বীকার করেও বলেন যে সমস্ত ক্ষেত্রে কারণ জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। তার বদলে জিজ্ঞেস করতে হবে "স্বপ্নের সার্থকতা কি? এ স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের এখনকার কোন্ কথা প্রকাশ পাচ্ছে, কি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হচ্ছে?" প্রশ্ন দুটি পরস্পর সাপেক্ষ, কিন্তু তবু তাদের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য রয়েছে।

ফ্রয়েডের সুখবাদও তাই ইয়ুঙ্গ স্বীকার করেন না। মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশই মানবজীবনের লক্ষ্য, তাতে যে সব সময়েই সুখ মেলে তা নয়। সুখ না মিললেও তাতে তৃপ্তি আছে, এবং এই গভীর তৃপ্তির জন্যই মানুষ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। ফ্রয়েডও আজকাল একথা স্বীকার করেন, কিন্তু এ স্বীকৃতির সঙ্গে যে তাঁর পূর্ব্বের মতামতের অনেকখানি সংশোধন দরকার, সেকথা এখনো তাঁর চোখে পড়েনি।

ফ্রয়েডের আধুনিক মত আর একদিক থেকেও খানিকটা বদলিয়েছে। মানুষের ধর্ম্মজীবনকে তিনি মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও তার সমাধানের দিক থেকে আগে দেখতেন—তাঁর চোখে তাই ধর্ম্মজীবনের কোন বিশেষ সার্থকতা ছিল না, এবং ধর্ম্মজীবনের অবসান তিনি আনন্দে প্রত্যাশা করেছেন। ইয়ুঙ্গও মানুষের স্বপ্নজীবনের সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের

সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে স্বপ্ন কেবলমাত্র রূপক নয়, মানব মনের বিশিষ্ট দিকের সত্য পরিচয়। ধর্ম্মকেও তাই তিনি মানবচিত্তের সত্য প্রকাশ বলে মনে করেন, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মের যে সমস্ত অনুষ্ঠান আচার এবং কাহিনীকে ফ্রয়েড কেবলমাত্র রূপক-মোহ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ইয়ুঙ্গ মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে তাদের স্থান মেনে নিয়েছেন। ফ্রয়েডের চোখে ধর্ম্ম কেবলমাত্র প্রতীক, তার পেছনে যে সত্য, তা আমাদের স্বভাবজাত বিভিন্ন বৃত্তির দ্বন্দ্ব ও মিলনের মধ্যে মেলে। ইয়ুঙ্গের কাছে ধর্ম্মের নিজের সত্তা আছে, এবং অন্যান্য মনোবৃত্তির মতন ধর্ম্মান্বেষণও সত্য।

ফ্রয়েডের বিবরণে মানুষের সমাজজীবন অপরিস্ফুট। প্রত্যেকে নিজের নিজের সুখের অন্বেষণে বিভিন্ন বৃত্তির ঘাত প্রতিঘাতে জীবন কাটায়, কাজেই প্রত্যেকের জীবনের মধ্যেই অস্থির চক্রাবর্ত্ত রয়েছে। এমনই অস্থির ব্যক্তি বিশেষদের নিয়ে সমাজ, কাজেই তার স্থিতি আরো সহজে ভেঙ্গে পড়ে। অথচ সমাজজীবনের স্থিতিশীলতাই প্রথম আমাদের চোখে পড়ে। কেবলমাত্র চেতনা অচেতনা ও অর্দ্ধচেতনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজধর্ম্মের বিবরণ দেওয়া যায় না, তাই ফ্রয়েড এখন চেতনা অচেতনা এবং অর্দ্ধ চেতনা ছাড়াও ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক স্বীকার করেন—তার নাম তিনি দিয়েছেন super consciousness বা ঊর্দ্ধ চেতনা। ফ্রয়েডের পূর্ব্বেকার বিবরণে মানুষের জীবনে বিভিন্ন বৃত্তির সামঞ্জস্য পরিষ্কার হয়নি, censor বা বিচারক যাকে তিনি বলেছেন, তার প্রকৃতি ও সম্বন্ধ দুইই হেঁয়ালীতে ভরা ছিল। বিভিন্নবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাতের রঙ্গভূমি, এই যদি মানুষের সত্য পরিচয় হয়, তবে মানুষের চরিত্রে বিভিন্ন বৃত্তির সামঞ্জস্যের কোন কথাই ওঠে না। মানুষের চরিত্রে বিচারক বলে কোন বৃত্তির সন্ধান মেলে না, তাই এই বিচারককে টেনে আনায় আমাদের বোঝবার কোন সুবিধা তো হয়ই না, বরং দুর্ব্বোধ্যতা বেড়েই চলে। মানব চরিত্রের মধ্যেই ঊর্দ্ধ চেতনাকে স্বীকার করায় বিচারক আমাদেরই স্বভাবজাত বলে আমরা জানি। তার ফলে সমাজধর্ম্ম—ব্যক্তিধর্ম্মের বিবাদও সহজ হয়ে আসে এবং মানুষের জীবনে সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক জীবনের ঐক্য ও পরিণতি বোঝবার দিক থেকেও এ নূতন বিবরণ আগেকার বিবরণের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

এ বিবরণ মেনে নিতে ইয়ুঙ্গের কোন আপত্তি নেই। ব্যক্তিগত বৈচিত্রের হিসেব করে, বয়স অনুসারে তার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে, তিনি তাকে সুস্পষ্ট ও ফলবান করতে চেয়েছেন। সে সম্বন্ধে আজ আর আলোচনা সম্ভব নয়; কিন্তু একথা বোধ হয় বলা চলে যে ফ্রয়েডের মতামত মেনে নিয়ে ইয়ুঙ্গ তার উপর যে কারিগরী করেছেন তাতে আমাদের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অনেক বেড়েছে। অসুস্থ পীড়িত মনের আলোচনার বাইরেও তিনি মনবিশ্লেষণ বিদ্যাকে নিয়ে এসেছেন—এইখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।

ফ্রয়েড এবং ইয়ুঙ্গ দুজনেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি, দুজনেই সুলেখক; এবং তথ্য ও রচনার ঐশ্বর্য্যে দুখানি বইই সমৃদ্ধ। সমালোচনায় কোন বড় লেখকেরই লেখার পরিচয় দেওয়া যায় না, এখানেও তাই হয়েছে। যাঁরা ফ্রয়েড এবং ইয়ুঙ্গের মতামত সঠিকভাবে জানতে চান, ফ্রয়েড এবং ইয়ুঙ্গের বই পড়া ছাড়া তাঁদের আর কোন উপায় নেই।

হুমায়ুন কবির

So a Poor Ghost—By Edward Thompson (Macmillan)

আজকাল ভারতের দিকে ইংরেজ সাহিত্যিকদের বেশ একটু নজর পড়েছে। এর জন্য আমাদের ধন্যবাদ দিতে হবে—অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং গোল টেবিল বৈঠককে। ভারত স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত কিনা, ভারতবাসীদের কতটা শাসনাধিকার দেওয়া যেতে পারে—এসব বিষয়ে বিলেতে মতভেদ উপস্থিত হয়েছে, আর যেখানে মতভেদ, সেখানেই যে বিষয়টি নিয়ে মতভেদ সেটাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখবার স্পৃহা স্বাভাবিক। ভারতবাসীকে নিয়েই যত গোল, কাজেই ইংরেজী সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে, ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-প্রবাসী ইংরেজ পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভারত ও ভারতীয় সমস্যা যে ইংরেজ সাহিত্যিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে আলোচ্য বইখানি তার একটি নিদর্শন। এখানি একখানি উপন্যাস। নায়ক হচ্ছেন Rattray নামে একজন ইংরেজ সাংবাদিক। আগে তিনি ভারতে শিক্ষা-বিভাগে কাজ করতেন—একজন I. E. S.এর লোক ছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে যোগদান করেন এবং যুদ্ধের শেষে আবার ভারতে ফিরে আসেন। হৃদয়টা তাঁর ছিল অতি মহৎ ও উদার। এক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জায়গায় সাহায্যের ব্যবস্থা নিয়ে ঝগড়ার ফলে তিনি ছাড়েন চাকুরী। তার পর থেকে বিলেতেই কাগজে লিখে তিনি তাঁর জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। একজন দেশীয় রাজার আমন্ত্রণেই তিনি তাঁর শিক্ষা-মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়ে ভারতে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এলেন—দেশীয় রাজ্যের প্রজা ও রাজার যাতে উন্নতি হয় এমন অনেক মতলব নিয়ে। কিন্তু তাঁর কল্পনাগুলি বাস্তবে পরিণত হ'বার কোন অবসর পেলেনা। শিক্ষা-বিভাগের যখন তিনি চাকুরী কর্‌তেন, তখন থেকেই তাঁর উপরে এখানকার শাসন-কর্ত্তাদের নজর পড়েছিল। রায়ালগড় কলেজের তিনি ছিলেন একজন অধ্যাপক, কিন্তু তিনি রায়ালগড়ের নাবালক রাজারও প্রাইভেট্-টিউটর-গিরি কর্‌তে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ তিনি তাঁর ছাত্রের উপর এমন প্রভাব বিস্তার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, যা বড় কর্ত্তাদের কাছে মোটেই ভাল মনে হ'ল না। তাঁকে বলা হ'ল—যে তাঁর কাজ হচ্ছে Shakespeare, Macaulay ব্যাখ্যা করা, অন্য বড় বড় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাঁর পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। এতে তিনি দমে গেলেন না, বরং মুখের মত জবাব দিলেন। তার পর তিনি যে ঘটনা সম্পর্কে এবং যেমন ভাবে চাকুরী ছেড়ে চ'লে যান তাতেও দিল্লীর কর্ত্তারা তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হতে পারেন নি। তা ছাড়া তিনি বিলেতে এমন সব কাগজে লিখ্‌তেন, যা এখানকার কর্ত্তাদের মতে ছিল "Bolshy papers"। এমন একজন লোক কোন দেশীয় রাজার শিক্ষা-মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হ'বে, তা কি কখনও সার্ব্বভৌম শক্তি বরদাস্ত কর্‌তে পারেন? এমন কলকাঠি টেপা হ'ল, যে যে রাজা তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী পদে নিয়োগ করবেন ব'লে বিলেত থেকে আনিয়ে-ছিলেন, তিনি বাধ্য হলেন তাঁর সঙ্গে যে চুক্তি হ'য়েছিল তা' রদ্ করতে। যে সব কল্পনা নিয়ে Rattray সাহেব এসেছিলেন, সেগুলি র'য়ে গেল তাঁর মনের মধ্যেই। তাঁকে আবার ফিরে যেতে হয় নিজের দেশে।

মোটামুটি গল্পটি হচ্ছে এই। কিন্তু এর সঙ্গে একটি প্রণয়ের কাহিনীও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মহাযুদ্ধে যোগ দেবার আগে Rattray সাহেবের সঙ্গে Lauretta

বলে একটি মেয়ের আলাপ হয়। এই আলাপই হয়ত গভীর প্রণয়ে পরিণত হ'তে পারত যদি না Rattray যুদ্ধে যোগদান করতেন। Lauretta অনেক কাল Rattray সাহেবের জন্য অপেক্ষা করেছিল. হয়ত আরও অপেক্ষা করত। কিন্তু Rattrayর ব্যবহারে এবং অন্যান্য ঘটনা থেকে তার মনে হল, Rattray বুঝি তাকে বিশেষ ভালবাসে না। কাজেই সে বিবাহ করলে এমন একজন লোককে যার সঙ্গে শুধু যে তার বয়সেরই বিশেষ পার্থক্য ছিল তা নয়, মনেরও মিল ছিল না। ইনি হচ্ছেন, কেনেডি সাহেব, রায়ালগড়ের রেসিডেন্ট। Rattray ও লরেটা—এ দুজনেরই ভুল ভাঙ্গল যখন তাদের আবার দেখা হল। কিন্তু ভুল যখন ভাঙ্গল, তখন ভুল শোধরাবার ইচ্ছে ও উপায় থাকলেও, কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করে Lauretta তাতে রাজী হ'ল না।

উপন্যাসে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই ঘটে মধ্যভারতের একটি দেশীয় রাজ্যের রাজধানীতে—রায়ালগড়ে। রাজধানীটি শিপ্রা নদীর কাছে। শিপ্রানদীর সঙ্গে অনেক সুমধুর স্মৃতি বিজড়িত। মধ্য ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, দেশীয় রাজাদের দরবারের আড়ম্বর—এ সমস্তই উপন্যাসে আছে। চরিত্রগুলিও বেশ নিপুণ ভাবে আঁকা হয়েছে। ঘটনার ঘাত-অভিঘাতে Rattrayর মনোভাবের ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন বেশ বুঝতে পারা যায়। কিন্তু যে Questioning face এর জন্য Lauretta Rattrayর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, উপন্যাসের শেষ পর্য্যন্ত যেন আমরা Rattrayর সেই Questioning faceই দেখতে পাই। এই বইএর পাত্র ও পাত্রীদের মধ্যে সকলকার চেয়ে আমাদের বেশী নজর পড়ে Lauretta ও Drake সাহেবের ওপর। Kennedy সাহেব নামে Resident হলেও কাজে Resident ছিলেন তাঁর পত্নী Lauretta। দুর্গেশ্বরের মহারাণা ও অন্যান্য সকলের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ। প্রজাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি তাঁর Rattray সাহেবের থেকে কম ছিল না। Kennedy সাহেবের সঙ্গে মনের মিল না থাকলেও তিনি কেন বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করতে রাজী হননি, তার তিনি যে কারণ দেখান তা থেকে তাঁর চরিত্র বেশ ফুটে ওঠে। তিনি বলেন,

"Civilization is not built on great eternal truths as we try to fool ourselves into believing. It's built on conventions. You are a writer, so naturally you like to think that literature issues out of something deeper than man's arrangements. But it doesn't. It issues out of convention and arrangement; it depends on convention and arrangement'" (p 337.)

ভারতবাসীদের কাছে উপন্যাসটি আর এক দিক থেকে খুব বেশী চিত্তাকর্ষক। ভারতবাসী, ভারতীয় সমস্যা, ভারতপ্রবাসী ইংরেজ ও দেশীয় রাজাদের বিষয়ে একজন প্রসিদ্ধ লেখকের মতামত বই থেকে অনেকটা জানা যায়। সাধারণ ভারতবাসীদের বিষয় এ বইএ বিশেষ কিছু নেই। যতটুকু আছে তা থেকে মনে হয় Forster-এর Passage to India বা Ackerleyর Hindoo Holiday-এর মধ্যে সাধারণ ভারতবাসীর যে ছবি আমরা দেখতে পাই, তা এর থেকে অনেক বেশী সত্যি। Shindeকে যদি ভারতীয় ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হ'লে এটা অবশ্য স্বীকার করতে হ'বে যে ভারতীয় ধনিক সম্প্রদায়কে গ্রন্থকার বিশেষ ভাল চক্ষে দেখেন না। সরকারী মহলের যে চিত্র আমাদের সামনে ধরা হয়েছে তা মোটেই প্রশংসাজনক নয়। মনে হয় যেন সেখানে যথেষ্ট নীচতা, সহানুভূতির অভাব ও অযোগ্যতা বর্ত্তমান। তা ছাড়া

তাঁরা যেন ভারতীয় সমস্যা ঠিকভাবে বোঝবার জন্য যে আয়াস ও কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করা দরকার, তা করতে মোটেই রাজী নন। দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সম্বন্ধে এই বই পড়ে যে ধারণা জন্মে তা তাঁদের খুব অনুকূল বলে বোধ হয় না। প্রজাদের সুখ ও সুবিধার জন্য তাঁরা বিশেষ লালায়িত নন। ব্রিটিশরাজের প্রতি প্রকৃত মনোভাব গোপন ক'রে তাঁরা কিরূপে থাকেন, দুর্গেশ্বরের মহারাণার চরিত্রে তা বেশ ফুটে উঠেছে। প্রজাদের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করবার মতলব তাঁর ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝতে পারলেন প্রজারা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নয়। Rattray সাহেবকে তিরস্কার ক'রে তিনি এক জায়গায় বল্‌ছেন—

"It was you who, when I was a youngman and worshipped you, because you seemed so strong, wise and kind, encouraged me in the foolish ideas I then had, of giving these people Self Government! They are my slaves and donkeys, fit only to carry burdens and to do what they are told! And now all these years we have had attack after attack by these wretched papers of your nationalists in British India, all because after I had started a Legislative Council and elections and a whole lot of mad things I saw how foolish it was and stopped doing such craziness."

ভারতীয় সমস্যা-সম্পর্কে গ্রন্থকারেরও মত অনুরূপ নয় কি ?

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

এবার কবি রবীন্দ্রনাথ —শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল। বাসন্তী প্রেস, ৭১নং শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

এবার কবি বইটির মলাটের ঠিক পরেই এক টুকরা কাগজে মুদ্রিত ও পৃথকভাবে সংলগ্ন এই অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়ে ঃ—

'Premloke'
is a
Love planet
in sight

Through the telescopic view of the spiritual world. A shade of fresh inspiration. A glow of new thoughts. A wave of original ideas. A melody of language and Decoration of phrase, characterize the romantic discovery of this "Love Planet."

ব্যাপারটি বিশেষ কিছু নয়—"প্রেমলোক" নামক একটি কবিতা পুস্তকের বিজ্ঞাপন। দুই পৃষ্ঠা পরে এই বিস্ময়কর গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা কবিবর শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মল্লিক মহাশয়ের ফটোগ্রাফও সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞাপনটির সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো হেতু নাই।

"এষার কবি" অবশ্য অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় সম্বন্ধে লিখিত। এই পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশক কর্তৃক সন্নিবেশিত একটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এই বিজ্ঞাপনটির উল্লেখ করিলাম। কারণটি শুধু এই কথা জানানো যে পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার সম্বন্ধে গ্রন্থকার ও প্রকাশক দুইজনেরই দায়িত্ব আছে এবং এই দায়িত্ব যথেষ্ট গুরু, কেননা জাতীয় জীবনের উন্নতি বা অবনতিসাধনে মুদ্রিত পুস্তকের প্রভাব নিতান্ত কম নহে। ভালো বই বা মন্দ বইর বিচার সহজ নহে এবং এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু ভালো বা মন্দ যে-কোনো প্রকারের মুদ্রিত পুস্তক—যাহা প্রকাশক বা গ্রন্থকার গুরুতর বিবেচনার যোগ্য বলিয়া মনে করেন—যে এইরূপ অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বহন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সামাজিক নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ব্যাপারের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও শালীনতার প্রয়োজন আছে এবং এই প্রয়োজনের উপলব্ধি শুধু পুস্তক রচয়িতার নহে, পুস্তক-প্রকাশকদেরও থাকা উচিত। যেখানে তাহার অভাব ঘটে, সেখানে সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং প্রচুর হাসির উদ্রেকেও এই ক্ষতির প্রতিকার হয় না। "এষার কবি" যে অমর্য্যাদার কলঙ্ক লইয়া পাঠকের হাতে পৌঁছায় তাহা এতই তীব্র যে তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

এষার কবি পরলোকগত অক্ষয়কুমার বড়াল। বড় কবি না হইলেও বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান আছে। এমন বহু কবিতা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যাহা সহজে মনকে স্পর্শ করে। অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক; রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান সম্পূর্ণ তাঁহার স্বকীয়—অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব এইখানেই। অক্ষয়কুমার এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুই কবিরই কবিতা যাঁহার ভালো লাগে তাঁহার পক্ষে দুইজনের মধ্যে তুলনা করা স্বাভাবিক, প্রিয়লাল দাস মহাশয় বারবার তাহা করিয়াছেন। কিন্তু এই তুলনাপ্রসঙ্গে এই দুইজনের আপেক্ষিক মূল্যের কোনো আভাস পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অক্ষয়কুমারের স্থান বহু নিম্নে। অথচ প্রিয়লাল বাবুর দুইখানি পুস্তক পড়িয়া এই সহজ সত্যটি সম্বন্ধে কোনোই ধারণা হয় না। ইহার জন্য শুধু গ্রন্থকারকে দোষ দিলে চলিবে না। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এখন পর্য্যন্ত সাহিত্য-বিচারের স্পষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ডএর অভাব আছে; তাই ছোট বা বড় লেখক, ব্যক্তিগত ভাবে যাহাদেরই লেখা আমাদের ভালো লাগে তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রশংসা অসংযত আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এবং এই অসংযমের মাত্রা সকল ক্ষেত্রেই প্রায় সমান। আলোচ্য পুস্তক দুইটিতে ইহার প্রমাণ বারবার পাওয়া যায়। সাহিত্য-সমালোচনা হিসাবে তাই এই পুস্তক দুইটির মূল্য নাই বলিলেও চলে; কিন্তু কি করিয়া সাহিত্য-সমালোচনা করা উচিত নয়, তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে এই দুইটি পুস্তকই বিশেষ মূল্যবান। যদি বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই বড় ও ছোটর তারতম্য এবং কে ছোট কে বড় তাহার বিচারের জন্য কোনো-না-কোনো ষ্ট্যাণ্ডার্ড আমাদের মানিয়া লইতে হইবে। কোনো ষ্ট্যাণ্ডার্ডই হয়তো চিরস্থায়ী নহে। তাহা ছাড়া ব্যক্তিভেদে রুচিভেদ

অবশ্যই থাকিবে। সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি সর্ব্বোচ্চ বলিয়া স্বীকৃত তাঁহার সম্বন্ধ এক বা একাধিক সত্যকারের রসগ্রাহী ব্যক্তিও ভিন্নমত হইতে পারেন। অন্যান্য সব দেশেই তাহা হইয়া থাকে। বার্ণাড শ শেক্সপীয়রের ট্রয়লাস ও ক্রেসিডাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করিতে পারেন; এলিয়ট শেলি অপেক্ষা ড্রাইডেনকে বড় কবি মনে করেন। কিন্তু এই সকল মতামত যাঁহারা জোরগলায় প্রচার করেন তাঁহারা শেক্সপীয়রের রচনাবলীর মধ্যে ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার স্থান কত নিম্নে বা ইংরাজ কবিদের মধ্যে শেলির স্থান কত উচ্চে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে তাহা ভালো করিয়া জানিয়াই করেন। তাই তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতামত প্রতিবাদের সুরে তীব্র হইয়া প্রকাশিত হয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে বাংলা ভাষার সমালোচকগণের এখনও ছোট বড় সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা হয় নাই; ইহার ফলে শুধু বড়দের নয় ছোটদের সম্বন্ধেও অবিচার হয়। অক্ষয়কুমারের স্থান যে ছোট কবিদের—অর্থাৎ ইংরাজীতে যাঁহাদের 'মাইনর পোয়েট্‌স্' বলে,—তাঁহাদের মধ্যে এই কথা মানিয়া লইয়া যদি "এষার কবি"র প্রণেতা তাঁহার স্তবগান করিতেন তাহা হইলে কাহারও কোনো আপত্তি হইত না এবং অক্ষয়কুমার সম্বন্ধেও সুবিচার হইত। দুঃখের বিষয়, প্রিয়লালবাবুর রচনা পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ই ধারণা হয় যে তিনি মনে করেন অক্ষয়কুমার জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া বিচারের যোগ্য। হায় রবীন্দ্রনাথ! হায় অক্ষয়কুমার!

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

Komos—by Willem De-Sitt er.
Harvard University Press (Boston Lectures Nov. 1931)
Exploring the Upper Atmosphere—by Dorothey Fisk.
Faber, Faber & Co.

কৌতূহলী পাঠকের অবিদিত নেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত কি পরিমাণে মানুষের চিন্তাক্ষেত্র, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মবাদ ও শিল্পকে রঞ্জিত করেছে। এ সকলের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এক শ্রেণীর সাহিত্য বেশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই সব ব্যাখ্যার উপদ্রব-বিরহিত আবিষ্কারগুলির সরল ও শুদ্ধ বর্ণনার অভাব লক্ষ্য হয়। আলোচ্য বই দুটি এই অভাব পূরণ করার দিকে অগ্রসর হওয়ায় বড়ই আদরণীয় হয়েছে।

ডি-সিটারের বইটির বিষয় নিখিল-বিশ্বের চৌহদ্দি; বিষয়টি নূতন নয়। Pythagorus, Ptolemy প্রভৃতির সময় থেকেই এর আলোচনা সুরু হয়েছে, তারপর Copernicus, Tycho Brahe, Kepler, Galileo ও Newtonএর দ্বারা একটা পরিণতি লাভ করেছে। আধুনিক যুগে Sir William Herschel, Kapteyn, Shapely, Einstein ও গ্রন্থকার স্বয়ং এ বিষয়ে অনেক নূতন ও বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরদের মধ্যে যাঁরা এই নিখিল-তত্ত্বের বিবরণ ও ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের মধ্যে Eddington ও Jeansই প্রধান।

কিন্তু এঁদের আলোচনা নিখিলতত্ত্ব ছাড়িয়ে এক একটি দর্শনবাদের রূপান্তর গ্রহণ করেছে। Eddingtonএর pointer readings ও "closed system" বহুতর্কের আমদানী করেছে। তেমনি Jeansএর realityর পশ্চাতে mathematical mind ও মানব মনের লোকোত্তর দৃষ্টি,—mind in direct contact with ultimate reality, ইত্যাদিও কূট তর্কের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। পক্ষান্তরে ডি-সিটারের রীতি ঐতিহাসিক ধারার অনুগমন করে নিখিল-তত্ত্ব কেমন করে ধাপে ধাপে মানুষের ধারণায় পরিণতি লাভ করেছে তার পথ দেখিয়ে সিদ্ধকাম হয়েছে। অন্য কোন পদ্ধতিতে উপস্থিত করলে বিষয়টি বোধ হয় এমন হৃদয়গ্রাহী হত না। এখানে পাঠককে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে আইনষ্টাইন যখন তাঁর মাধ্যাকর্ষণের নূতন তত্ত্ব প্রচার করে নিখিল বিশ্বের সীমা নির্দ্দেশ করেন তখন ডি-সিটার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আইনষ্টাইনের মতে নিখিল ছিল সসীম, ডি-সিটারের মতে নিখিল অসীম। এখনকার সর্ব্বগ্রাহ্য মতে নিখিল একেবারেই সসীম নয়, অসীমের দিকে সম্প্রসারণশীল—Expanding। স্বয়ং আইনষ্টাইনও এইমতে সায় দিয়েছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত জ্যোতিষিদের পরিচয় ছিল কেবলমাত্র নাক্ষত্রিক জগতের সঙ্গে, সম্প্রতি বৃহদায়তন টেলিস্কোপ ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির গঠন ও উন্নতির প্রসাদে তাঁদের জ্ঞান নাক্ষত্রিক জগতের সীমা অতিক্রম করে গেছে। নক্ষত্রময় যে জগৎ প্রতি রাত্রে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় তা সমুদয় বিশ্ব-নিখিলের একটা পরিবার মাত্র। শরৎ বা হেমন্তের নির্ম্মল অন্ধকার রাত্রে যে ছায়া-পথ দেখা যায় তাই এই নাক্ষত্রিক জগতের প্রান্তরেখা সূচিত করে। এক্ষেত্রেও কবির সেই প্রাচীন বর্ণনা প্রয়োগ করা যেতে পারে—"দূরাদয়শ্চক্রনিভশ্চ তন্বী—"; বহুদূরে আছে বলেই প্রান্তদেশ অমন ধূম্র দেখায়। সমস্তটা মিলে নাক্ষত্রিক জগৎ কতকটা গরুর গাড়ীর চাকা বা কুমারের চাকার মত ও আবর্ত্তনশীল। এর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় বিশহাজার আলোকবর্ষ অর্থাৎ বিশহাজার বছরে আলোক যতটা দূর যেতে পারে,—এর আবর্ত্তনের গতি প্রান্তের কাছাকাছি স্থানে প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ৬০ মাইল (পৃথিবীর আবর্ত্তন সেকেণ্ডে সিকি মাইলের কিছু বেশী)।

আমার এ নাক্ষত্রিক মেলার চিত্র খুব সঠিক বা সম্পূর্ণ হল না,— কারণ এপাশে ওপাশে globular clusters আছে; পরিশোধিত মাপজোপও ঢের বেশী, তা ছাড়া নক্ষত্রের জমায়েতের অসাম্য, সূর্য্যের অবস্থান, আন্তর্নাক্ষত্রিক বিমানের (space) অস্বচ্ছতা—ইত্যাদি অনেক কথা আছে। যা হোক globular clusters সমেত এই নক্ষত্রমেলা একটা সম্পূর্ণ পরিবার বা ব্যষ্টি মনে করা যেতে পারে। তা হলে উত্তর-নাক্ষত্রিক জগৎ কি? উত্তর-নাক্ষত্রিক জগৎ নীহারিকাময়। এক একটি নীহারিকা এক একটি পরিবার। প্রত্যেকেই আবর্ত্তনশীল বলে এগুলিকে ঘূর্ণী-নীহারিকা বলা হয়। এদের মাপও আমাদের নাক্ষত্রিক জগতেরই তুল্য বলে অনুমান করবার কারণ আছে। তাছাড়া অন্য কোন নীহারিকায় গিয়ে দেখলে আমাদের নাক্ষত্রিক জগৎও নীহারিকার মতই দেখাবে। তাহলে নিখিলবিশ্ব হল সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মত বিমানে (space) ভাসমান ঘূর্ণী-নীহারিকার সমষ্টি, প্রত্যেক ঘূর্ণী-নীহারিকা আবার নক্ষত্রের সমষ্টি। নীহারিকা ও নক্ষত্রের আদি সৃষ্টি যেমন

করেই সিদ্ধ হক আপাততঃ মাধ্যাকর্ষণের দরুণই নীহারিকার অন্তর্বর্ত্তী নক্ষত্রেরা ঘূর্ণাবর্ত্তে আলোড়িত হচ্ছে। কিন্তু নীহারিকারা পরস্পর এতই দূর যে এদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বল অতি ক্ষীণ। এই নীহারিকা থেকে নীহারিকার ব্যবধানই প্রচণ্ড বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে;—পরিমাণ,—দেড়শ কোটি বছরে ব্যবধান হয় দ্বিগুণিত। এই ব্যাপরটিরই নাম Expanding Universe। প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হতে পারে। মনে হতে পারে কেমন করে নীহারিকারা যা হোক কিছু মাধ্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী হয়েও পরস্পর থেকে বিক্ষিপ্ত হয়? নিউটন পরিকল্পিত মাধ্যাকর্ষণে হতে পারে না, কিন্তু আইনষ্টাইনের পরিশোধিত মাধ্যাকর্ষণ ও সার্ব্বভৌমিক আপেক্ষিকতার (Generalised Theory of Relativity) মতে তাই হয়। শেষোক্ত মতে পদার্থ হল বিমান বা space-এর মোচোড়, এই মোচড় যেখানে যেখানে পদার্থরূপে দানা বেঁধেছে সেখানেই নিউটনীয় আকর্ষণ পরিস্ফুট হয়, যেখানে মোচড় নেই সেখানে বিমানের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রানুযায়ী এ সম্প্রসারণ সিদ্ধ, সম্প্রতি Shapelyর অনুসন্ধান ফলে এ সম্প্রসারণ যন্ত্রসাহায্যে প্রত্যক্ষ ও মাপা হয়েছে। অকাট্য প্রমাণ,—এখানে আর দ্বন্দ্ব সন্দেহের অবকাশ নেই।

বলা বাহুল্য নিখিলের এ সম্প্রসারণ মাত্র সেদিন প্রত্যক্ষ হয়েছে; জ্যোতিষিরা এ বিষয়ে মোটেই শেষ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন নি, অনেক রকম দ্বন্দ্ব সন্দেহ স্বতঃই এ সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনও রয়ে গেছে। সে সবের উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের সিংহাসন পাতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও যুক্তিসিদ্ধ পরিকল্পনার মিলন-ক্ষেত্রে। গ্রন্থে ডি-সিটার এ বিষয়টির ওপর তাঁর কলমের জোর দিয়েছেন। প্রাচীন প্রসঙ্গ আলোচনায় তিনি বলেছেন Ptolemy, Copernicus প্রভৃতির খেলা ছিল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে জ্যামিতির কতরকম ছকে ফেলে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে তাই দেখা। এ কারণে তিনি Ptolemyর পৃথিবী-কেন্দ্রীয় জগৎ ও Copernicus-এর সূর্য্যকেন্দ্রীয় জগতের মধ্যে তফাৎ দেখেন না। গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন ত প্রত্যক্ষ অভিযানের শীর্ষে পৌছেছিলেন। এঁদের কাছে পরিকল্পনার কোন অবকাশ ছিল না। অপরদিকে শুদ্ধ দার্শনিকরা যে সব পরিকল্পনার ছড়াছড়ি করে গেছেন তার সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন যোগাযোগ ছিল না। নিউটনের অব্যবহিত পর থেকে পরিকল্পনার প্রকোপ অল্পে অল্পে মাথা তুলে উঠল। আইনষ্টাইনের তত্ত্ব তার পরিণতির জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। তাঁর আপেক্ষিক-তত্ত্ব প্রথম প্রচারের সময় সমস্তটাই ছিল পরিকল্পনার দৌড় কতদূর হতে পারে তারই নিদর্শন মাত্র। কিন্তু তার ব্যবহারিক সিদ্ধান্তগুলি যা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ব্যক্ত হয়েছিল একটি একটি করে তার প্রত্যেকটি অদ্যাবধি হুবহু মিলে গেল। বিজ্ঞানের আজ যে উৎকর্ষ-সিদ্ধি হয়েছে তার অধিকাংশই এই আগাম পরিকল্পনার প্রসাদে। Planck, Bohr, Rutherford, De-Broglie এঁদের পরিকল্পনায় ও তার সফলতায় বিজ্ঞান আজ সমৃদ্ধ। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি বিনা বিজ্ঞানের এ সম্মানলাভের উপায় ছিল না। জ্যোতিষিরা এখন এক ২০০ ইঞ্চি বেধ টেলিস্কোপ তৈরীর অপেক্ষা করে আছেন যা সম্পূর্ণ হলে জগতের অধিবাসী নিখিলবিশ্ব সম্পর্কে অনেক নূতন বার্ত্তা শুনতে পাবে।

বইটি সম্বন্ধে একটা কথা বাকি রয়ে গেল। নাক্ষত্রিক জগতের আবর্ত্তন, দূরত্ব, মাপজোপ তথা নীহারিকাদের গতিবিধি ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণে যে পদ্ধতির অনুগমন করা হয়েছে তা হল law of chance। এ একটা lawই নয় বলে অনেকে একে আক্রমণ করেন। এ বিষয়ে ডি-সিটারের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—"—Methods are based on the laws of the theory of probability, the law of great numbers, or, as we might paradoxically say, the law of accidents. Paradoxically—since an accident is by definition a thing that obeys no law. But even because they obey no law, accidents are in the long run liable to cancel one another, and the law of great numbers is, in fact, one of the most reliable laws of nature—"

মিস্ ফিস্কের বইটি যদিও উপরোক্ত বইটির মত জগতের চূড়ান্ত ব্যাপার নিয়ে ব্যাপৃত নয় তবু এমন চিত্তাকর্ষক বই যে সচরাচর চোখে পড়ে না একথা নির্ভয়ে বলা চলে। ঊর্দ্ধস্তরের আবহ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যতকিছু জানা গেছে গ্রন্থকর্ত্রী তাই সংগ্রহ করে সুরম্য ভাষায় গ্রন্থন করেছেন। আমাদের সাধারণ ধারণা ২০ মাইল ঊর্দ্ধে পর্য্যন্ত বায়ুস্তর আছে, খানিকটা ওপরে উঠলেই অক্সিজেন অভাবে প্রাণধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, চারিদিকের পরিমণ্ডল যেমন ঠাণ্ডার রসাতলে ডুবে থাকে সূর্য্যের রশ্মি তেমনি সন্থ অগ্নুত্তাপের তেজে যাতে পড়ে তাকেই দহন করে। এই পর্য্যন্ত;—কিন্তু হাইড্রোজেন পূর্ণ বেলুনে আরোহণ করে—ও আরোহীশূন্য বেলুন উড়িয়ে পণ্ডিতরা ঊর্দ্ধদেশের অনেক অভিনব বার্ত্তা সংগ্রহ করেছেন। প্রফেসার পিকার্ড ও মস্কো বেলুনের কথা সর্ব্বজনবিদিত যা যথাক্রমে ১০ ও ১১১/২ মাইল ঊর্দ্ধে আরোহণ করেছিল। এইসব আকাশপাড়ির বিবরণ গ্রন্থকর্ত্রী যা সংগ্রহ করেছেন তা রোমাঞ্চকর। বার্ত্তাবহ আরোহীশূন্য বেলুন ২৩১/২ মাইল পর্য্যন্ত উঠেছে। আমরা সচরাচর যে বায়ুস্তরের সঙ্গে পরিচিত তা আছে প্রায় ১০ মাইল পর্য্যন্ত—এতদূর অবধি ঊর্দ্ধত্বের সঙ্গে সঙ্গে শৈত্য বাড়তে থাকে। এর উপরে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত আর একটা বিভিন্ন স্তর, প্রায় বায়ুহীন। কিন্তু বড় অদ্ভুত কথা এখানকার শৈত্যের ঊর্দ্ধানুপাতে কমিবেশী নাই। এ স্তর ছাড়িয়ে ওপরে ওঠা বেলুনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বেলুনে চড়ে ওপরে উঠলে একটা সুন্দর দৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়, সে হল আকাশের এক অপরূপ গাঢ় বেগুনি-নীল রং যা পৃথিবী থেকে দেখা নীলের প্রায় দশগুণ গাঢ়। পৃথিবীর পৃষ্ঠসংলগ্ন ধূলিকণা ও জলকণারাশি এই গাঢ় বেগুনি-নীল রং কতকাংশে অপহরণ করে বলে ভূপৃষ্ঠ থেকে আমরা সে সৌন্দর্য্য দেখতে পাই না।

আরও ঊর্দ্ধদেশের বার্ত্তা আনা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হত যদি না প্রকৃতি আপনা হতেই আপন দূতকে বার্ত্তাবহ কাজে বাহাল করত। এ রকম একটি দূত হচ্ছে শব্দ; উপরের সম-শৈত্যদেশের সীমাপ্রান্ত থেকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়ে শব্দ ভূপৃষ্ঠে আবার ফিরে আসে। এই সীমাপ্রান্তে একটি অতি পাতলা Ozone-এর পর্দ্দা আছে যা সূর্য্যের Ultra-Violet-এর আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে। আর একটি দূত হল রেডিও। রেডিও ঊর্ম্মি ঊর্দ্ধে উঠে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়ে মাটিতে ফিরে এসে

একটি ৬০ মাইল উর্দ্ধে ও আর একটি ১২০ মাইল উর্দ্ধে বিলম্বিত দুটি বিদ্যুৎবাহী পর্দ্দার অস্তিত্বের বার্তা এনে দিয়েছে। প্রকৃতিকে এজন্য ধন্যবাদ না দিয়ে থাকা যায় না কেননা এদুটি স্তরের অভাবে রেডিওর long ও short wave broadcasting অসম্ভব হোত,—রেডিও উর্ম্মি ওপরে উঠে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধতর বিমানে বিলীন হয়ে যেত।

গ্রন্থকর্ত্রী একটি বড় চমৎকার কথা বলেছেন যে ল্যাবরেটারিতে আমরা যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি তারই পুনরভিনয় হয় প্রকৃতির প্রাঙ্গণে, বিরাটব্যাপী রূপে। তেশিরা কাঁচে আমরা সূর্য্যালোকর বর্ণচ্ছটা দেখি, প্রকৃতি তাকেই প্রকাশ করে মহান ইন্দ্রধনুরূপে,—আকাশে বিলম্বিত জলকণারাশির সাহায্যে। এরকম দুটি বহু ব্যাপী চমকপ্রদ প্রাকৃতিক লীলা গ্রন্থকর্ত্রী বিবৃত করেছেন। তার একটি হল মেরুচ্ছটা আর একটি হল নবাবিষ্কৃত cosmic রশ্মি। যে না মেরুচ্ছটা স্বচক্ষে দেখেছে তার কাছে এর মহীয়ান বিস্তৃতি ও খেয়ালী রূপভঙ্গির বর্ণনা করা বিফল। অথচ এ দীপ্তি ঠিক সেই উপায়েই সম্পাদিত হয় যে উপায়ে গ্যাসের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে আজকাল Neon lamp জ্বালানো হচ্ছে। সূর্য্য থেকে শুধু আলোক কিরণ নয়; সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎকণাও (Electrons, Positive ions ইত্যাদি) ধরা পৃষ্ঠে বর্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীর উর্দ্ধে ৬০ মাইল থেকে ১০০ মাইল উর্দ্ধে বিলম্বিত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি গ্যাসের অণু পরমাণু শেষোক্ত বিদ্যুৎকণা দ্বারা প্রহৃত হয়ে মেরুচ্ছটার সৃষ্টি করে।

Cosmic রশ্মির ব্যাপার সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যজনক; পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। এ রশ্মি মাপের হিসাবে X-ray রশ্মির চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম কিন্তু এর স্বচ্ছ অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করবার ক্ষমতা X-rayর তুলনায় বহুগুণ অধিক। পৃথিবী-পৃষ্ঠের উর্দ্ধাকাশ এই cosmic রশ্মিতে ভরপুর। প্রথমে অনুমিত হয় যে ভূগর্ভ নিহিত রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতু থেকে এ রশ্মির উদ্ভব কিন্তু তাহলে এ রশ্মি উর্দ্ধাকাশে এত প্রচুর হত না। এখন তিনটি মত দাঁড়িয়েছে—প্রথম, নিখিল বিশ্বের সুদূর গর্ভে কোথাও না কোথাও ধ্বংসের ব্যাপার চলছে তাই থেকে এর উদ্ভব। দ্বিতীয়, ধ্বংস নয় অথবা ধ্বংস ছাড়াও সৃষ্টি ক্রিয়া চলছে তাই থেকে এর উদ্ভব। তৃতীয়, সূর্য্য থেকে যে বিদ্যুৎকণা বর্ষিত হচ্ছে কার্য্যক্ষেত্রে তাই অতি প্রচণ্ড বেগবান হতে পারে—সেই বেগবান বিদ্যুৎকণারাই ভ্রম ক্রমে রশ্মিবলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে।

জ্ঞাতব্য হিসেবে এসব হয়ত খুব বেশী কিছু নয় কিন্তু এমন রমণীয় করে বইটি লেখা যে একবার পড়তে বসলে পাঠক আগাগোড়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ আবিষ্ট হবে।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Peter Abelard—by Helen Waddell (Constable).

মধ্যযুগে ফরাসীদেশে যে সব মনীষী জন্মগ্রহণ করেন, তার মধ্যে Abelard ছিলেন একজন অগ্রগণ্য। প্রতিভা ছিল তাঁর অসাধারণ, বুদ্ধিও অতি সূক্ষ্ম।

পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক বহু ক্যাথলিক পুরোহিতের ধর্ম্মবিষয়ক মতবাদ খণ্ডন ক'রে তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও বুদ্ধির পরিচয় দেন। এই রকম ক'রে মতবাদ খণ্ডন করবার ও নিজের অভিনব প্রগতিশীল মত প্রচার করার ফল দাঁড়ায় দুরকম। একদল যেমন তাঁর প্রবল শত্রু হ'য়ে উঠে, তেমনি তাঁর ভক্ত ও উপাসকের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যুবকসম্প্রদায় তাঁকে ঠিক একটি উপাস্য দেবতার মত ভক্তির চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করে। শেষাশেষি কিন্তু প্রগতিশীল মতবাদ প্রচার করার অপরাধে তাঁকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়।

শুধু অসাধারণ প্রতিভার জন্য নয়, অন্য এক কারণেও তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেটি হচ্ছে একটি প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার। তিনি ছিলেন একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত। রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের বিবাহ নিষিদ্ধ। তিনি কিন্তু মদনের পঞ্চশরে এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে গোপনে একটি মেয়ের পাণিগ্রহণ না করে পারেন নি। গোলাপে কাঁটা আছে, কুসুমে কীট আছে, প্রেমের রাজ্যেও আছে অনেক দুঃখ কষ্ট। প্রণয় ছিল তাঁর অতি গভীর, কিন্তু এই প্রণয়ের জন্যই তাঁর জীবনের শেষ ভাগ দুঃখময় হয়ে উঠেছিল।

এই প্রণয়-কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রেই আলোচ্য উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে।

উপন্যাসটির মধ্যে দু'টি প্রধান চরিত্র আছে—সে দুটি হচ্ছে Abelard ও Heloise। এ দুটি চরিত্রেরই ক্রমবিকাশ গ্রন্থকর্ত্রী বেশ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। যে লোক ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত কামপ্রবৃত্তি রোধ ক'রে এসেছিলেন—Abelard সম্বন্ধে তাঁর এক বাইশ বৎসর বয়স্ক ছাত্রের কাছে Gilles বলেন "For the seven years of manhood that you have behind you, and the fifteen that are before you till you reach his age, this man never looked on a woman to lust after her"—তিনি কি করে ধীরে ধীরে Heloise-এর প্রেমে আবদ্ধ হ'লেন, তাঁর প্রেমের গভীরতা ও পরিণতি—এ সকলের যে ছবি লেখিকা এঁকেছেন তার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করে পারা যায় না। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে—Heloiseও ছিল Abelard-এর উপযুক্ত প্রণয়িনী। Abelard ও Heloise-এর প্রণয় প্রসঙ্গে Gilles এক জায়গায় বল্‌ছেন, "He is not the only man who would think her worth flinging the world away for and heaven after it!" Abelard-এর কাছে আত্মদান করায় আগে Heloise নিজের মনের সঙ্গে বড় কম যুদ্ধ করে নি। আত্মদান করার পর থেকে সে একান্ত পতিগত-প্রাণ হয়ে উঠ্‌ল। Abelard-এর মঙ্গলের জন্য নিজের সুনাম, নিজের পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েও Abelard-এর হিতার্থে সে নিজেকে তাঁর রক্ষিতা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে নি। Abelard-এর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, কিন্তু পাণ্ডিত্য যেখানে অগাধ, সেখানে প্রায়ই সাংসারিক জ্ঞানের আধিক্য দেখা যায় না। এই সাংসারিক জ্ঞান কিন্তু Heloise-এর ছিল পুরামাত্রায়। এইজন্যই বিবাহের প্রস্তাবে সে প্রথমে রাজী হয় নি। সে বলে যে Abelard-এর রক্ষিতা বলে নিজের পরিচয় দিতে পারিলেও তার গর্ব্বের সীমা থাকবে না। এই সাংসারিক জ্ঞান ছিল বলেই সে প্রথম থেকে Abelard-কে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু Abelard লোককে বিশ্বাস করতেন

বেশী, তাই যতটা সাবধান হওয়া উচিত ছিল তিনি ততটা সাবধান হন কি, আর তার ফলই তাঁদের প্রণয়-কাহিনীর শেষ হয় বিষাদে।

চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখিকার নিপুণতা যে শুধু Abelard ও Heloiseএর চরিত্র অঙ্কনে ফুটে উঠেছে তা নয়। বইখানির মধ্যে ছোট খাট যে সব চরিত্র আছে, সে গুলিও এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যে ছোট দরের কোন লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব হ'ত না। তুলির দু' একটি আঁচড় দিয়ে আমাদের সামনে একটি পূর্ণ চিত্র দাঁড় করাতে পারাই শিল্পীর বাহাদুরী। এ দিক দিয়ে বিচার করলেও লেখিকাকে একজন খুব উঁচুদরের শিল্পী বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা Gilles-এর চরিত্রের উল্লেখ করতে পারি। এত অল্প চেষ্টাতে যে এত সুন্দর একটি চরিত্র আঁকা যেতে পারে, তা ধারণা করা বাস্তবিকই কঠিন। জ্ঞান, কঠোরতা, স্নেহ, মমতা ও ঔদার্য্যের এমন সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। চরিত্রটি কিন্তু কোন জায়গাতেই অস্বাভাবিক ব'লে মনে হয় না।

Abelard ও Heloiseকে কেন্দ্র ক'রে আরও উপন্যাস লেখা হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসখানি পড়ার পর আমাদের George Moore লিখিত উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। Waddellএর বইয়ের সঙ্গে Mooreএর বইয়ের প্রধান প্রভেদ atmosphere নিয়ে। Moore মধ্যযুগীয় ফরাসী দেশের যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে Troubadourদের প্রাধান্য বেশী, কিন্তু Waddell প্রাধান্য দিয়েছেন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের। কাজেই Mooreএর বইখানির ভিতর একটা কবিত্বপূর্ণ আবহাওয়া আছে, কিন্তু Waddellএর উপন্যাসে আমরা পাই সমাজের এমন একটি চিত্র যাতে বাধা নিষেধ ও নিষ্ঠার প্রাধান্যই বেশী।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

The Unexpected—By Frank Penn-Smith ;
Foreword by Richard Hughes, Cape.

প্রকৃতির অপর্য্যাপ্ত রস-সমুদ্র হতে প্রতিনিয়তই তরঙ্গ এসে শিল্পি-মনকে আলোড়িত ক'রে তোলে কিন্তু শিল্প-সৃষ্টি প্রাণবন্ত হয় কদাচিৎ। কারণ যে সাধনা ও একাগ্রতা শিল্প-প্রতিমার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারে সহায়তা করে, অন্নজগতের সুখ শান্তির উপর তা কতকটা আপেক্ষিক ভাবে নির্ভরশীল। ফ্রাঙ্ক পেন-স্মিথ যথার্থ শিল্পী এবং তাঁর সৃষ্টিশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়েছে বহু বিচিত্র ভাবে, নিত্য নিয়ত—অথচ বৃদ্ধ বয়সে রচিত আলোচ্য আত্মকাহিনীটি তাঁর একমাত্র সৃষ্টি যা সুধী সমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হবার যোগ্য। ধনী-সন্তান—দুষ্টগ্রহের তাড়নায় আজীবন অশন-ব্যসনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকে যখন কোন বৃহৎ সাহিত্য-সৃজনের অবসর পেলেন, তখন তাঁর জীবনের সায়াহ্নকাল অতীতপ্রায়—রোগ-ক্লান্ত বাত্যাপীড়িত দেহ মৃত্যু-সন্নিকট বেলা-ভূমিতে বিক্ষিপ্ত। পরপারের উদাত্ত সমুদ্র-গর্জ্জন যখন শ্রুতিগোচর হয়, শুনেছি ঐহিক ইন্দ্রিয়-রাজি ক্রমশঃ বধির হয়ে আসে—স্মৃতি মসীলিপ্ত হয় দার্শনিকতার নৈরাশ্যময় আচ্ছাদনে। কিন্তু আলোচ্য রচনার অপূর্ব্ব অবদান হচ্ছে বর্ণনার সৌকুমার্য্য।

সুদূর যৌবনের প্রশস্ত অঙ্গনে যে সৌন্দর্য্য এক কালে উন্মেষিত হয়ে নীরবে ঝরেছে, অন্তর-গুহনের অনির্ব্বাণ দীপ-শিখাটির আলোকে বৃদ্ধ তাই চয়ন করে আজ সাহিত্য-আসর মধুর সুরভিশ্বাসে পূর্ণ করেছেন। জীবনের তুচ্ছতম তুচ্ছ স্মৃতিগুলি অঙ্কিত হয়েছে বাতায়ন হতে দ্রষ্ট চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত উদ্যান-কুসুমের মত—যেন এক একটি লতা পাতা ফুল ও ফল আপন আপন রূপে পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ভাসিত অথচ সমগ্রের কল্যাণে সমাহিত। ক্লেদ, মালিন্য, নৈরাশ্য, অবসাদ ইত্যাদি গ্লানি সেরূপ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে—অন্তরায় হয়নি। উপমা-বহুল সুন্দর নির্ভার ইংরাজি ভাষার সঞ্চলমান গতির মধ্য হতে এক একটি শব্দ যেন আভ্যন্তরিক ওজস্বিতার আতিশয্যে বিপুল পুলকে পঙ্‌ক্তিমুক্ত হতে চায়। ভাবধারার অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত গতি গদ্যের মধ্যে ছন্দের পরিস্পন্দ এনেছে।

জীবন-চিত্রের রেখাপাত প্রথম হতেই বিচিত্র। লাঙ্কাশায়ারের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র নগরীতে সম্ভ্রান্ত 'পেন-স্মিথ' পরিবার বাণিজ্য-লক্ষীর ঐশ্বর্য্যময় অঙ্কে সমাসীন। বিদুষী মাতার উৎসাহে সমুদ্রপারের ফরাসী অভিজাত মণ্ডলীর সহিত নিবিড় আত্মীয়তা জমে উঠেছে—কত উজ্জ্বল দৃশ্য খণ্ড খণ্ড ভাবে চিত্রিত হয়েছে স্মৃতিপটে, তার ইয়ত্তা নেই। কি বৈদগ্ধ্যে, কি ললিত কলায়, স্থৈর্য্যে, ধৈর্য্যে তারা স্বজাতীয় নিকৃষ্ট-রুচি প্রতিবেশী হতে স্বকীয়তা বজায় রেখেছে, এমন কি নগরবাসীদের সহিতও ভদ্রতা-সূচক ইঙ্গিত বিনিময়ের অতিরিক্ত সৌহার্দ্দ্যপ্রকাশ বাহুল্য বিবেচিত হতো। অবকাশের আনন্দ উদ্‌যাপন হ'তো দেশ-ভ্রমণে—অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল নিমিত্ত মাত্র, মাতার ভগ্ন স্বাস্থ্য ছিল কারণ।

শিশু-সুলভ আহ্লাদে বিকশিত বাল্য-স্মৃতি অকস্মাৎ অদম্য কৌতূহলে পরিপূর্ণ হলো ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে। বাণিজ্যে পুনঃ পুনঃ ক্ষতির ফলে অর্থ-ভাণ্ডার তলে তলে নিঃশেষ হয়ে এসেছিল—এক দিন প্রত্যূষে বৃদ্ধ পিতা পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠিত বাস্তুভিটা সমূলে উৎপাটিত করে সপরিবারে সমুদ্র-যাত্রা করলেন।

১৮৭৯ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বহু দুঃস্থ ইংরাজ-পরিবার সর্ব্বস্ব পণ ক'রে অষ্ট্রেলিয়ার পাথেয় সংগ্রহ করে হঠাৎ ধনী হবার লোভে। খনিজদ্রবের আবিষ্কারের ফলে নাকি কতিপয় ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রভূত অর্থ লাভ করে এবং তখন হতে অর্থ-লোভ সংক্রামক হয়ে পড়ে। অনেকে পশুপালন উদ্দেশ্যে লব্ধ জমি স্বল্প মূল্যে বিক্রয় ক'রে দুর্গম পর্ব্বত ও অনধিগম্য অরণ্যানী অভিমুখে যাত্রা করে। বৃদ্ধ পিতা সেই সুযোগে হোবার্টের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-শিখরে অল্প মূল্যে এক খণ্ড বিশাল জমি ক্রয় করে বসেন। রাশিয়াতে প্রবাদ আছে যে চাষীর দুরবস্থা চরমে পৌছায় সে যখন শূকর ক্রয় করে। তেমনি পেন স্মিথ পরিবারের কাল হলো এই সম্পত্তি। ফল, ফুল, লতা, পাতার অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য, নিশাচর পক্ষীর কাকলি—প্রকৃতির বিবিধ ও অপরিমিত ঐশ্বর্য্য স্মিথ-পত্নীর ভাব প্রবণ হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করলো। বনশ্রীর স্নিগ্ধ অঙ্গনে বাণিজ্যের স্থূল পাদবিক্ষেপে তিনি ঘোরতর আপত্তি তুললেন। এদিকে চুনের আথায় ইন্ধনের অভাব—অধিকন্তু অর্থাভাব ও ঋণ-ভার। ক্রমে জীবিকা-আহরণের দায়িত্ব ফ্রাঙ্ক ও তাঁর ভ্রাতার স্কন্ধে ভর করিলে। ফ্রাঙ্ক পরিবারবর্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভাবিত বঙ্কিম প্রবাহে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

অনির্দ্দিষ্ট যাত্রার বিরাম হলো সপ্ততিবর্ষ আয়ুষ্কালে। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল

মরীচিকা-লুব্ধ উদ্‌ভ্রান্তের মত স্বর্ণ ও টিনের অন্বেষণে অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বন-বনান্তরে, উন্মুক্ত আকাশতলে, উত্তাল পারাবারে, অবারিত প্রান্তরে, দুর্গম পর্ব্বত-শিখরে ভ্রমণ করেও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সংগ্রহে কৃতকার্য্য হন নি—অথচ নিয়তির এমনই ছলনা যে ধৈর্য্য-সীমার প্রতি বাঁকে পুরস্কার বিকীর্ণ থেকেছে। মানসিক অবসাদ অপনোদনের জন্য প্রকৃতি অবিশ্রান্ত রূপ পরিবর্ত্তন করেছে। কখনও বা শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামলিমায়, কখন বা ঘোর কুহেলিকায় ভাবপ্রবণ চিত্ত আনন্দে অনুপ্রাণিত হয়েছে নদী-জল-কল্লোলে, বন-বিহগের কাকলিতে—বিষাদে, ত্রাসে অভিভূত হয়েছে দূরাগত পশুর আর্ত্তনাদে, ঝটিকার দাপটে।

সাহিত্যের সমালোচনায় রাজনৈতিক শ্লেষ বোধ করি অসঙ্গত হবে, কিন্তু না বলে পারছি না যে একটু অস্বস্তি মনে স্বতঃই জাগে যখন দেখি যে নৃতত্ত্ববিদ ব্যতিরেকে প্রায় সকল ইংরাজই আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদের বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা প্রণিধান-যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। পেনস্মিথ আপন বিবৃতি রোমাঞ্চকর করবার উদ্দেশে আফ্রিকার কাফ্রিদের বিচিত্র লম্ফ ঝম্ফ ও নরমাংস ভক্ষণের ভূয়সী বিবরণ দিয়েছেন অথচ ঘুণাক্ষরেও অনুকম্পা বা দরদ প্রকাশ করেন নি। তাঁর লেখায় বরং এই গর্ব্বের আভাস পাই যে কোন কোন জমি হতে আদিমনিবাসীদের উন্মূলন করে নাকি দেশকে সুগম সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

আলোচ্য বইখানিতে হৃদয়াবেগের প্রতিবিম্বগুলি প্রতিফলিত হয়েছে অনুপম ভাষার স্বচ্ছ পটে। ভাষার ঐকান্তিক বিশিষ্টতা হচ্ছে শব্দের অনপচয়তা। আজ সাহিত্য-জগৎ যেন অত্যধিক মনোবিকলনের আতিশয্যে অসুস্থ—আকাশ বাতাস যেন অকারণ নৈরাশ্যময় অবসাদে আচ্ছন্ন, যৌনচর্চ্চার উগ্রতায় অতিষ্ঠ। আলোচ্য আত্মকাহিনীটি এহেন সময় প্রভাত সূর্য্যরশ্মির মত স্মিত, স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে প্রবেশ করেছে। পেন-স্মিথের সাফল্য দেখে আশা হয় অচিরে 'আনন্দ' কথাশিল্পক্ষেত্রে আপন স্থান পুনরধিকার করে নেবে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

অনামী—শ্রীদিলীপকুমার রায়, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)
মোপাসাঁর গল্প—অনুবাদক শ্রীননীমাধব চৌধুরী এম, এ; শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম, এ; বার-এট-ল লিখিত ভূমিকা সহ। (মডার্ণ বুক এজেন্সি)।
ছিন্ন পাপড়ী—শ্রীনবগোপাল দাস, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)।
সুরা ও শোণিত—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।
মাধুকরী—পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।
অষ্টাদশী—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য।

আমার মত যারা দিলীপবাবুর ভক্ত তাদের কাছে এঁর প্রকাশিত যে কোন বই আশা ও আদরের বস্তু। অনামী দিলীপবাবুর কবিতার বই। ভারতীয় সঙ্গীতে দিলীপবাবুর সাধনা ও সিদ্ধি অসাধারণ তাই কাব্যের ঝঙ্কার যে তাঁর প্রাণের তন্ত্রীতে বাজার কথা এ সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি তিনি লোকোত্তর সাধনায় পণ্ডীচারি আশ্রমে

দিনযাপন করছেন। তাঁর কাব্যরচনায় এই দুই সাধনার মিলনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে বলে আমার মনে হয়।

যে কেউ অনামী পাঠ করবেন সহজেই বুঝিতে পারবেন যে আমার দ্বারা এর সমালোচনা অনভিপ্রেত উওয়া উচিত ছিল। তবু কয়েকটি কথা আমার বিশেষ কবে বলবার আছে বলে আমি অনামীকে এখানকার সমালাচনা-পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করেছি। অনামীকে সাধকের সাধনার বাণী হিসাবে না সাহিত্য হিসাবে পাঠ ও বিচার করা হবে এ সম্বন্ধে সাধারণ গ্রাহ্য মত কি সেটা আমার জিজ্ঞাস্য রইল। অনামী মোটামুটি ২ ভাগে বিভক্ত—এক, কবিতাবলী—তাতে কতক অনুবাদ আছে ও দ্বিতীয় পত্রাবলী যা দিলীপবাবুর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ও বহুতর দেশী বিদেশী মহাজন ও বন্ধুজনের আদান প্রদান হয়েছে। সাধনার সূত্র ধরে গ্রন্থকার কবিতাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন; সাহিত্যের দৃষ্টিতে আমি এ ভাগের বিশেষ সার্থকতা দেখি না। তেমনি রস-সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করতে গিয়ে আমার চোখে পড়েছে যে কবিতার রূপ ছন্দ বা কবিতা বলতে যা কিছু বোঝায় সে সম্পর্কীয় ধারণায় বা সিদ্ধিতে গ্রন্থকার বড় ঢিলে ঢালা ও অপরিণত। আমি একথা বলছি না যে তাঁর ছন্দ ও কবিতা কোথাও সুঠাম হয় নি, কিন্তু কবি সিদ্ধকাম হলে যেমন কাব্যলোকের একটা কোথাও স্থিতি লাভ হয় গ্রন্থকারের তা হয় নি। অনেকবার, অনেক কবিতায় তিনি কাব্যের সেই অরূপ অবর্ণনীয় লোকে উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু পরেই বা পরের কবিতাতেই তা থেকে তিনি ভ্রষ্ট হয়েছেন।

"গর্জ্জিল প্রেমের সিন্ধু চূর্ণিল ধূলিকা অদ্রি ছিন্ন ভিন্ন মোহ আবরণ" (গ্রন্থি)

বা "যে-প্রেম নির্ভরে ফুটে আপনার বেগে ছুটে উদ্বেলিত নির্ঝরিণী সম" (অহৈতুকী) কার না কাণে ঝঙ্কার তুলবে? এ দুটি আমি নিতান্ত হাতের কাছে পাওয়া স্থান থেকে তুলে দিলাম, নিশ্চয়ই আরও উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু যথা তথা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয় এমন কাব্যনাশের ও ছন্দনাশের গহ্বরে,—যেমন

কোথা যেন কাড়াকাড়ির—
　　তরে হৃদির
তলে চুপে ছদ্মরূপে
　　জাগ্‌তে না পিপাসা, (জাতিস্মর)

যে সেখান থেকে অক্ষত হয়ে ফেরা অত্যন্ত শক্ত হয়ে পড়ে।

আর একটা মুস্কিল হয়েছে এই যে ছন্দ সম্বন্ধে দিলীপবাবুর কতকগুলি মত তাঁর কবিতায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে নানা পত্রিকা মারফৎ দিলীপবাবুর এই সব মত প্রবোধচন্দ্রের সপক্ষে ও অমূল্যধনের বিপক্ষে তীব্রভাষায় বর্ষিত হয়েছিল। হয়ত প্রবোধ বাবুর মতই ঠিক অথবা হয়ত অমূল্য বাবুরই ঠিক্, হয়ত বা দিলীপবাবু-বর্ণিত স্বর-মাত্রিক গতিই বাংলা ছন্দের প্রাণ কিন্তু এই সব তর্কের দোসর হয়ে কবিতা স্বয়ং যদি কোমর বেঁধে অগ্রসর হয় তবে রসিকজনে তাকে বরণ করবে না। দিলীপবাবু "লঘু গুরু" ছন্দ নামে ছন্দ রচনা করেছেন, কিন্তু কে পড়তে পারবে ঠিক মত—

"কত প্রয়াস বিফলে　উচ্ছ্মলরোলে
মঙ্গল ডঙ্কে—নিন্দা বোলে,

হিংসা দোলে শান্তি নিচোলে
মত্ত মদির জয়গানে—" (বহুরূপী)

"হু হুচ্ছাসে ডমরুস্বননে
বজ্র ডঙ্কে সমূর্দ্ধে"— (তারা)

যদি এ সব ছন্দ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হয় আপন মতের সমর্থন করা বা প্রচার করা তবে দিলীপবাবুকে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হবে।

ছন্দসম্বন্ধে দিলীপবাবু যে রকম autocrat বাক্য সম্বন্ধেও সে রকম, কাল বা জনমতের সায় পাবে কিনা তা তিনি ভেবে দেখেন না। বলতে পারি দিলিপবাবুর অনেকগুলি কবিতায় মানকুমারী, সত্যেন দত্ত, করুণানিধান, কাজী নজরুল বা রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রতিধ্বনি পরিলক্ষিত হবে কিন্তু এ কথা বলায় তাঁর স্বকীয় কাব্য-প্রতিভার গৌরব প্রতিষ্ঠা হবে না। সব জড়িয়ে আমার মনে হয় এত তাড়াতাড়ি কবিতাগুলি প্রকাশ না করে আর কিছু পরিণত রচনার জন্য অপেক্ষা করলে ভাল হত। অন্ততঃ কবিতাগুলি বাছাই করলেও বইটি সার্থকতর হত।

"—পাইনি তোমারে বলে তিতি সদা আঁখি জলে
সেই মোর ভালো
তোমা ছাড়া প্রাণ মম হোক্ মরুভূমি সম
নিভে যাক আলো।
প্রতি রক্তবিন্দু মোর তবে প্রেমে হোক ভোর
আপনা বিস্মৃত—
জানি প্রভাতিবে নিশা তুমিই মিলাবে দিশা
মরণে অমৃত,"

(অভিমান ?)

এটি অনিলবরণের রচনা, কিন্তু এই হোল দিলীপবাবুরও সাধণবাণীর রূপ। প্রকৃত সাধক বিনা এ শ্রেণীর কবিতার সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভব নয়, আমি তাই এ বিষয়ে বিরত হলাম।

অনামী সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ এর পত্রাবলীকে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায়। আমি এ বিষয়ে দুর্নিবার আপত্তি জানাচ্ছি। এ সব পত্রগুলি দিলীপবাবুর সম্মান রক্ষা করে ও তাঁর প্রীতি কামনা করে নিতান্ত তাঁরই হৃদয়-মন-গোচরের জন্য লেখা। অনেক স্থলে পত্রগুলি দিলীপবাবুর ও তাঁর দুর্ব্বল বিকল কাব্য ও ছন্দের প্রশংসায় মুখর, এমন কি ভারাক্রান্ত; এ সব পত্র কত গোপনীয়, কত অসতর্কতাপূর্ণ! এগুলিকে দিলীপবাবুর পক্ষে ব্যক্ত করা যেমন অন্যায় তেমনি এগুলির অন্তর্নিহিত প্রশংসা পাঠকের পক্ষে তাঁর কাব্যাস্বাদনের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। কাব্যসরস্বতীর মন্দিরে পূজারীর নীরব আরাধনার সন্নিকটে এরকম প্রশংসার ঢক্কানিনাদের আবরণ সৃষ্টি যে কতদূর অমার্জ্জনীয় তা বলা যায় না। নতুবা পত্রগুলি আপন আপন সম্পদে গরীয়ান্; দেশ বিদেশের চিত্তলোকের নানা সমুদ্র নানা খনি থেকে সংগৃহীত মণি মুক্তা খচিত পত্রাবলী। শ্রীঅরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলির কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; অপরগুলির মধ্যে মিঃ সাহেদ সুরহর্দ্দির পত্র তার মাধুর্য্যমণ্ডিত আন্তরিকতার জন্য যে কোন পাঠককে মুগ্ধ করবে। কিন্তু এই পত্রই যে প্রকাশের নীরব প্রতিবাদে ঝঙ্কৃত।

এমন আরও কত পত্র আছে। অনামীর মধ্যে এই সব পত্র সংগ্রহ একেবারে অশোভন অসঙ্গত। এ কথা দিলীপবাবু কেন হৃদয়ঙ্গম করলেন না ?

যে ভাষাতেই মোপাসাঁর গল্প অনূদিত হয়েছে সে ভাষাই অসামান্য সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। আশা করি বাংলায় মোপাসাঁর অনুবাদের জবাবদিহি নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম বাংলায় মোপাসাঁর গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেন, সে বহু দিনের কথা। সম্প্রতিও মাসিক পত্রিকার কোন কোন সংখ্যায় আধুনিক লেখকদের অনূদিত মোপাসাঁর গল্প মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কোন অনুবাদই বাঙ্গালী পাঠকের চিত্ত অধিকার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

আলোচ্য গ্রন্থে আটটি গল্প অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম গল্পটি—বুলন্থ স্থইফ মোপাসাঁর অতি প্রসিদ্ধ গল্প ও তাঁর প্রথম গল্প রচনা, যা লিখে তিনি এক দিনেই দেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েন। এ গল্পটি ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময়কার মনোভাব চিত্রণে অদ্বিতীয়। এ শ্রেণীর গল্প রচনায় মোপাসাঁর হাত অত্যন্ত পাকা ছিল। প্রুশিয়ান সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত শহর বা প্রদেশের যে কোন অধিবাসীর ঘৃণা ও প্রতিশোধ-পরায়ণ মনোভাব ও বিজয়ী সৈনদলের বিকৃত মনুষ্যত্ব মোপাসাঁ গল্পে গুটিকতক ইঙ্গিতে যেন তুলির দু' একটি মাত্র আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতেন। আলোচ্য বইটির প্রায় সব কয়টি গল্পই এ শ্রেণীর গল্প থেকে বাছাই করা।

মোপাসাঁর গল্পের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা অল্প কথায় অসম্ভব কিন্তু সামান্য ভাবে এটুকু বলা যেতে পারে যে যে সব মনোভাব ও মনুষ্য-চরিত্র তাঁর গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা প্রকৃতই বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ; ভাষা লঘু, নিশানা অব্যর্থসন্ধানী। এ দুটি বিষয়ে আলোচ্য গল্পটির ত্রুটি রয়েছে, অনুবাদক এক শ্রেণীর গল্পই অনুবাদ না করে কিছু বৈচিত্র্য আনলেই ভাল করতেন। নতুবা তাঁর উচিত ছিল আর কিছু বেশী গল্প অনুবাদ করা। বাংলার মোপাসাঁর রস পেতে গেলেও এই কয়টি গল্পে পরিতৃপ্তি হবার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় ত্রুটি ভাষায়,—ভাষা সজীব হয়নি। গ্রন্থটির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন "কোন গল্পের মোটামুটি রূপ রক্ষা করিতে পারলেই তার অনুবাদ পাঠক সমাজকে আনন্দ দান করতে সক্ষম হয়।" এ কথা ঠিক হলেও মোপাসাঁর গল্প অনুবাদে ভাষার নির্জ্জীবতা ত্রুটি বলেই গণ্য হবে। অনুবাদগুলি বহু দিন পূর্ব্বে সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, নলী মাধব চৌধুরী মহাশয় তখন সবে কলম ধরতে শিখেছেন। এখন তাঁর লেখা ঢের পরিণতি লাভ করেছে, তাঁর আজকালকার লেখা গল্প আমার মত অনেক পাঠক অতি সমাদরে ও আগ্রহে পাঠ করে থাকেন। অনুবাদক বাঙ্গালী পাঠককে যা দিয়েছেন তার জন্য পাঠক শ্রেণী তাঁর কাছে ঋণী থাকবে কিন্তু তিনি যদি তাঁর সুপরিণত হাতে নূতন করে আরও কিছু মোপাসাঁর গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেন তবেই তাঁর অনুবাদ ধন্য হবে, নতুবা তাঁর এই অল্পোদ্যম অপূর্ণতা ও শৈথিল্য বিজ্ঞাপিত করবে।

আর যে-কখানি বয়ের নাম উপরে করা হয়েছে, তার মধ্যে "ছিন্ন পাপড়ী" গল্প-সংগ্রহ, অন্যগুলি কবিতা-পুস্তক। এই গ্রন্থগুলির রচয়িতারা সকলেই নূতন লেখক এবং নূতন লেখক হিসেবে পাঠ্য ও উল্লেখযোগ্য। তবে বই কয়টির এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা চলতে পারে। তাহলেও "অষ্টাদশী"র ছন্দ-দক্ষতা ও কাব্যগুঞ্জন আমায় মুগ্ধ করেছে।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

ওপারের ঢেউ—শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

বইখানি হাতে পড়তে ভেবেছিলুম ওর মধ্যে পারলৌকিক রহস্যের সন্ধান মিলবে; কিন্তু পাতা উল্টোতেই বোঝা গেলো সে-আশাও কুহকিনী। পুস্তকের নামকরণে গ্রন্থকার কোনো রূপকের প্রশ্রয় দেননি, ওপার-শব্দকে তার মূলার্থেই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এটি একটি অনুবাদ-চয়নিকা, এবং অনূদিত কবিতাগুচ্ছের প্রত্যেকটিই সাগরপারের ইংরেজিভাষী দেশগুলি থেকে আহৃত। কমলকৃষ্ণ ইস্‌লামিয়া কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক; সুতরাং ভাষা-ব্যবহারে এই রকম অর্থশুদ্ধি তাঁর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিশুকাল থেকে "কাব্যভারতীর কিঞ্চিৎ কৃপা পাওয়ায় যৌবনের স্পর্শমণির স্পর্শে তাঁর কাব্যপ্রতিভা" ফুটে উঠেছে। তাই আসল দরকারের সময়ে এই প্রশংসনীয় মূলানুরক্তি তাঁকে ছেড়ে যায়, এবং তাঁর অনুবাদ যাতে শুধু "ভাষানুবাদ" না-হয়ে "রসানুবাদ" হয়, তারি চেষ্টায় গ্রন্থকার প্রাণপাত করেন। এই রসায়নের ফল কি দাঁড়ায় তার একটা উদাহরণ দিই। এরিএল্‌এর শেষ গানটি—

Where the bee sucks there suck I,
In a cowslip's bell I lie,
There I couch when owls do cry,
On the bat's back I do fly
After summer merrily.
Merrily, merrily, shall I live now
Under the blossom that hangs on the bough.

আলোচ্য পুস্তকে এই আকার ধরেছে—

যেথা মধু পান করে মৌমাছিরা,
আমি মধু পান করি সেই ফুলে ফুলে!
বিছাই আমার শয্যা পরম আনন্দে
পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল-কোলে!
কোকিলের পিঠে চড়ি আমি ছুটে যাই
বসন্তের পিছু, তারে পাছে রে হারাই।
হর্ষভরে, হর্ষভরে থাকিব আমি রে
আজি হতে কুসুমিত তরুতলে ওরে।

এমন মনে করলে ভুল হবে যে প্রদত্ত দৃষ্টান্তই কমলবাবুর অনুবাদপদ্ধতির অনন্য প্রকার। যেখানে মূল কবিতাকে অপরিবর্তিত রেখেও, অনুবাদ "প্রাঞ্জল, সাবলীল ও মূলের সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হয়", এবং ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠক অনুবাদের মধ্যে দিয়ে মূলের রসাস্বাদনে সমর্থ হন, সেখানে ঘোষ মহাশয় অকবিদের কষ্টকল্পনাকে মার্জ্জনা করতে প্রস্তুত। তাই Legende of Goode Womenএর এই স্তবকটি—

Hyde, Absalon, thy gilte tresses clere;
Ester, ley thou thy mekenesse al adown;
Hyde, Jonathas, al thy frendly menere;
Penelopee, and Marcia Catoun,
Make of your wifhode no comparysoun;
Hyde ye your beautes, Ysoude and Eleyne,
My lady comith, that al this may disteyne,

অধ্যাপক মহাশয়ের কবিপ্রতিভার সংস্পর্শে এই রূপ পরিগ্রহণ করে—

স্বর্ণ কুন্তল তব লুকাও, লুকাও,
স্বর্ণকুন্তলশীর্ষ "এ্যাবসোলন্" গো ;
ত্যজ হে নম্রতা তব "এস্থার" সুন্দরী ;
"ইয়োনাথান্" ত্যজ হে মিতালি গরব ;
"পেনেলোপি" আর তুমি কেটোর নন্দিনী
"মার্সিয়া" ক'রো না গর্ব্ব পাতিব্রত্য লয়ে ;
"ইসোল্ট্", "হেলেন্" দোঁহে নিজ নিজ রূপ
ঢাকো, ঢাকো ত্বরা ক'রে ; ওই আসে ওই—
আমার রাণী যে আসে পরাজিতে সবে।

চসার ইংরেজ হলেও, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক, তাই তাঁর ভাষা, বিশেষ ক'রে বানানের গুণে, আমার মতো অশিক্ষিত লোকের কাছে অপরিচিত লাগতে পারে। সেইজন্যে কমলবাবুর মূলানুগত অনুবাদের নমুনা হিসেবে একটি আধুনিক কবিতার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ল্যাণ্ডর-প্রণীত রোজ্ এল্মার কবিতাটি—

Ah, what avails the sceptred race !
　　Ah, what the form divine !
What every virtue, every grace !
　　Rose Aylmer, all were thine.

Rose Aylmer, whom these wakeful eyes
　　May weep, but never see,
A night of memories and sighs
　　I consecrate to thee.

বাংলায় "নিশ্চিত মরণ" নাম নিয়ে তার নির্ব্বিকার সত্তা প্রকাশ করেছে এই রকমে—

হা হা, রাজদণ্ডে কিবা আসে যায়,
　　হা হা, ত্রিদিবের রূপে কিবা আসে,
রূপগুণ সব মিলে কিবা আসে যায়,
　　তোমার তো সবি ছিল, সবি গেল ভেসে।

চিরজাগরিত এই আঁখি দুটি ঝরে
　　অঝরে তোমার তরে, কিন্তু কোথা তুমি ?
স্মৃতির বৃশ্চিক আর দীর্ঘশ্বাসভরা
　　প্রতিনিশি তোমারে গো সমর্পিনু আমি।

কমলকৃষ্ণের কাব্যানুভূতির যে নিদর্শন উপরে দিয়েছি, তার সম্বন্ধে টীকাটিপ্পনী একান্ত অনাবশ্যক ; এমন-কি এ-বইয়ের সমালোচনাও বোধহয় পণ্ডশ্রম। তবু এই অপ্রিয়কর কার্য্যে কালক্ষেপ করতে হলো শুধু এই জন্যে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-শিরোমণি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রুগ্নদেহে যে ভূমিকা বা ধন্যবাদপত্র লিখে কমলকৃষ্ণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন—"বর্ত্তমান কালের অনেক কবিই শুধু 'দখিণা হাওয়া,' 'পাপিয়ার ডাক,' 'দাদুরীর বোল' ও 'সাঁঝের তারা'

লইয়া অতি সুলভ মূল্যের পদ রচনা করেন ; এক মুহূর্ত্তকাল জানেলা হইতে নীল আকাশের পানে তাকাইয়াই তাঁহারা কবি হইয়া বসেন।......কিন্তু ভারতীর কৃপা লাভ কি এত সহজ?......কমলবাবুর কবিতা বহু পরিশ্রমের ফল। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের আদ্যন্ত ঘাঁটিয়া ভারতীয় অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন।......এই উপকরণগুলি ছাড়া বর্ত্তমান কালের গীতি-কবিতায় শব্দ ও ছন্দচাতুর্য্য প্রভৃতি বিচিত্র কাব্যকথা লইয়া অধ্যাপক ঘোষ মহাশয়, অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু সেই শ্রমজনিত এক বিন্দু ঘর্ম্মও তাঁহার লেখায় আমরা দেখিতে পাই না। ১৬ বৎসরব্যাপী সাধনার ফলে নিবিড়ভাবে তিনি এই বিচিত্র উপকরণ আত্মসাৎ করিয়াছেন।......কমলবাবু সুলভ মূল্যে তাঁহার দুর্লভ পাণ্ডিত্য ও স্বভাবজ কাব্যশক্তির মহাদান আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন।"

এই মন্তব্যের মধ্যে শুধু যদি দীনেশবাবুর ইংরেজী সাহিত্য-সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই প্রকাশ পেতো, তিনি যদি কলেরিজ (?), বাইরন্, শেলি, স্কট্ ও ওয়ার্ড্সোয়ার্থ্ প্রভৃতির অভ্যুদয়ের জন্যে এসিয়ার অধ্যাত্ম-সম্পদে সমৃদ্ধ হৃদ-কবিদের দায়ী ক'রেই ক্ষান্ত হতেন, তবে হয়তো আমাদের আপত্তি করার কিছু থাকতো না ; কারণ দীনেশচন্দ্র বাংলারই অধ্যাপক ছিলেন ; সুতরাং তাঁর কাছ থেকে ইংরেজি সাহিত্যপ্রসঙ্গে নির্ভুল কথা শুনতে চাওয়া অন্যায়। কিন্তু ভূমিকাটির প্রতি ছত্রে তিনি বংলা সাহিত্যের সঙ্গে যে অপরিচয়ের আভাস দিয়েছেন, তা বস্তুতই শোচনীয়। বাংলায় কাকে ছন্দ বলা হয়, অধ্যাপক মহাশয় কি তাও এখনো শেখেন নি? পরিশ্রমের অর্থ, তাও কি দীনেশচন্দ্রের অবিদিত? পাণ্ডিত্য, কাব্যশক্তি, মহাদান ইত্যাদি শব্দগুলোর শুদ্ধ ব্যবহারেও কি তিনি অপারগ? না, তা সত্য নয়। কিন্তু যেটা নিঃসংশয় ভাবে সত্য, সে হচ্ছে এই যে দায়িত্ব-কথার মানে তিনি আজ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেননি।

কি উপায়ে কবি হওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে অধিকাংশ আধুনিক বাঙালীই হয়তো অনভিজ্ঞ, কিন্তু বিবেককে দাবিয়ে রেখে কি ক'রে উচ্ছ্বসিত অভিজ্ঞানপত্র লিখতে হয়, সে-বিদ্যায় আমরা সকলেই পারদর্শী। এই অবিমৃষ্যকারিতা, কর্ত্তব্যজ্ঞানের এই ভয়াবহ অভাব আমাদের জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত লক্ষণ কিনা, জানি না, তবে এটা নিশ্চয় যে এরি খাতিরে বাংলার জন্মপঙ্গু সমালোচনা-সাহিত্য সর্ব্বদেশের উপহাস্য হয়ে আছে। কমলবাবুর মতো আত্মশ্লাঘী ব্যক্তি সর্ব্বত্রই সুলভ, এবং আপনার দৌর্ব্বল্য-সম্পর্কে অন্ধতা আপামর সাধারণের মজ্জাগত। অতএব আলোচ্য পুস্তকের রচনা তো সহজ-বোধ্য বটেই, এমন-কি এর প্রকাশ ও প্রচারেও বোধহয় আপত্তি করা অন্যায়। বিদেশীদের মধ্যেও কাব্যলক্ষ্মীর অহংসর্ব্বস্ব প্রিয়পাত্রদের সংখ্যা অল্প নয়, এবং তাঁরাও স্বরচিত প্রহসনকে ট্র্যাজেডির পরাকাষ্ঠা বলে ভেবে থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভারতের বাইরে মুদ্রাকার্য্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য হওয়ায় তাঁদের প্রচেষ্টা সচরাচর অসূর্য্যম্পশ্যাই থেকে যায়। কাজেই "ওপারের ঢেউ"-এর মতো অপাঠ্য পুস্তকের বহুলতা আমাদের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নয়, বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এই ধরণের বইয়ের মুখবন্ধে দীনেশচন্দ্রের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীও সত্যভাষণের প্রবর্ত্তনা অনুভব করেন না। অবশ্য অপ্রিয় সত্য বলার অধিকার মানুষের আছে কিনা তা তর্কাধীন। কিন্তু তাই বলে অপলাপ মার্জ্জনীয় হতে পারে না। যদি সত্যের খাতিরে অন্যকে আঘাত করা আমাদের তথাকথিত সহৃদয়তায় বাধে, তবে

একেবারে চুপ থাকতে ক্ষতি কি? আমি জানি যে ইংরেজরাই মৌনিতাকে হিরণ্ময় ব'লে বর্ণনা করেছে, কিন্তু শতং বদ, মা লিখ, এই প্রবচনটার জন্ম অন্ততপক্ষে আমাদেরি দয়াশীল দেশে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বন্ধুর স্মৃতি—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ—প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী।
নারীর পূজা—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরিশ্চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।
ব্যোমকেশের ডায়ারি—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (পি, সি, সরকার)

বাংলা দেশের যৌথ পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম জ্যেষ্ঠ ও খুল্লতাতদের কতক নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে এবং কতক তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীদের প্ররোচনায়, শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের প্রতি নির্ম্মম আচরণের চিত্র বাংলা সাহিত্যে নূতন নয়। চরণদার মতন বিশ্বাসী ভৃত্যের চিত্রও অনেক জায়গায় দেখা গিয়াছে। নূতন নয় বটে কিন্তু তাহাদের চিত্রাঙ্কন যে এ পুস্তকে সম্পূর্ণ উপভোগ্য হইয়াছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। দেশের কল্যাণ-কামনায় দেশবাসীর চেষ্টা ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে এবং স্বদেশী-আন্দোলনের নেতাদিগের কার্য্যপদ্ধতি বিষয়ে যে অভিমত লেখক প্রথম বিশুর পিতার উক্তিতে, দ্বিতীয় অনন্ত বাবুর মারফৎ এবং তৃতীয় স্বয়ং বিশুর মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেকেরই গাত্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যদি এ বিষয়ে ভোট লওয়া যায় তাহা হইলে গ্রন্থকারই বেশী ভোট পাইবেন। বিশু ও সাধু দুই বন্ধুর চিত্রও অতি মনোরম ও স্বাভাবিক, কমলার জন্য চক্ষুতে জল আসে। ভিন্ন মতাবলম্বী পল্লীগ্রামের বালক সাধু সহর হইতে কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়া যখন পূর্ব্বমত বদল করিয়া বিশুর মতে মত দিল, সেই সময়ে গ্রামের সমিতির সভ্যদিগের সহিত তাহার যে সব কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক হইয়াছিল তাহার মধ্যে ভাবুকের খোরাক বহুল পরিমাণে আছে। পুস্তকখানির নাম "বন্ধুর স্মৃতি" কেন হইল তাহা পুস্তকখানির দুই স্থান হইতে বোঝা যায়। ১৫৭ পৃষ্ঠায়, কমলা (হারাণীর সহিত গ্রাম ত্যাগের সময়) তাহার আঁচলের শেষ প্রান্ত দিয়া তাহা (বিশুপ্রদত্ত "চয়নিকা") মুছিয়া লইয়া বলিল "বন্ধুর শেষস্মৃতিটুকু নিয়ে যাই দিদি"। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রচ্ছদ-পটের ছবিখানিও সুচিত্রিত হইয়াছে। আর এক জায়গা ১৬৫ পৃষ্ঠায় "মৃত্যুশয্যায় বিশু গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সাধু, সাধু বন্ধু আমার—আমার শেষ স্মৃতিটি রেখ"। কিন্তু কি সম্পর্কে বিশু এ কথা বলিল তাহা বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। যাহা হউক গ্রন্থকারের রচনার ভঙ্গী সুন্দর, ভাষাও উত্তম, ছাপা সুন্দর ও নির্ভুল এবং বাঁধাই সুদৃশ্য। মোটের উপর পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সময়ের অপব্যবহার করা হইয়াছে মনে হয় না।

নারীর পূজা—এই ক্ষুদ্র নাটিকার ভাষা সুন্দর, প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাও হৃদয়গ্রাহী। আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে পুরুষের কোন চরিত্রই নাই। রাজপুতানীর "নারীর পূজার" নৈবেদ্য মোটের উপরে বেশ সুখপাঠ্য।

ব্যোমকেশের ডায়েরী—চারিটি ডিটেক্‌টিভ গল্প। এগুলি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা একথা গ্রন্থকার ভূমিকাতে না বলিয়া দিলে বাস্তবিকই মনে হইত যে

Conan Doyleএর গল্পের অনুবাদ পড়িতেছি। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন "ডিটেক্‌টিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে—যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য।" সচরাচর যে সব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস (বাংলা ভাষায়) বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পাঠ করিয়া ঐরূপ ধারণা করা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যেখানে এত সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে গল্পগুলি পরিকল্পিত ও লিখিত হয় সেখানে এ কথা বলা চলে না। "সত্যান্বেষী" সত্য সত্যই ডিটেক্‌টিব গল্পের উপর আমাদের শ্রদ্ধা আনিয়া দিয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

পাঠক-গোষ্ঠী

শিরণী ও পাবনা জেলার গ্রাম্য ভাষা

পরিচয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আমি কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার পত্রিকায় মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীন সাহেবের 'শিরণী' নামক পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ করেছিলাম। সেই সমালোচনায় আমি যে সব কথা বলেছিলাম মনস্থর উদ্দীন সাহব তা'র একটি প্রতিবাদ আমার নিকট পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতিবাদ ও সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পাঠাচ্ছি, আপনার পত্রিকার পাঠকগোষ্ঠীতে সেগুলির স্থান হ'লে বাধিত হ'ব।

মনস্থরউদ্দীন সাহেবের বক্তব্য

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় আমার "শিরণীর" সমালোচনা সময়ে কতগুলি কথা বলেছেন যা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমার উক্তি থেকে তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছে যে আমি গল্পটি যে রকম শুনেছি সেইরূপেই লিপিবদ্ধ করি নি। এবং এই সন্দেহের স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা যথাযথ হয় নি।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল আমি নিজে ভাষাতত্ত্ববিদ বা নৃতত্ত্ববিদ নই। এবং এই কাজে আমার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাও নেই।

'লেখা গেল' এই শব্দ দু'টির অর্থ করেছেন তিনি রচিত হ'ল। কিন্তু এসম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে আমি গল্পটি যেমনি শুনেছি তেমনি record করেছি, নিজে কিছু রচনা করে—কী ভাষা কী ভাব, কী গল্প-বস্তু—এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিই নি। সুতরাং এ সম্বন্ধে যে সন্দেহ তিনি পাঠকের মনে জাগিয়ে দিয়েছেন তা আমার উক্তি দ্বারা নিরসন হ'লেই আমি সুখী হ'ব।

আমার 'নাম করণের' লেখাটি আমার নিজের নয়। ওটা "বঙ্গবাণী" সম্পাদকের। তিনি "বঙ্গবাণীতে" প্রকাশের জন্য আমার নোটটি সংক্ষিপ্ত করে ঐভাবে লিখে নিয়েছিলেন। আমি যখন গ্রন্থ প্রকাশ করি তখন ওটা পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন অনুভব করিনি, কেননা ওতেই কাজ চলবে, আমার ধারণা ছিল। আমি যা লিখেছিলুম তা এখানে পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে তুলে দিচ্ছি। [এবং এই লেখাটি ও বঙ্গবাণী সম্পাদকের নোটটি আমার কাছে এখনও আছে।]

"এই পল্লী-গল্পটি পাবনা জিলার পোঃ খলিলপুর গ্রাম মুরারীপুর-নিবাসী মুহম্মদ আমির উদ্দীন সরদার সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে। নানাবিধ পারিবারিক অশান্তি ও সাংসারিক কর্ম্ম আধিক্যের মধ্যেও তিনি যে এই সুদীর্ঘ গল্প বলিবার জন্য অবসর করিয়া লইয়াছিলেন এবং কোন প্রকার বিরক্ত না হইয়া বরং সানন্দ চিত্তে বলিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা ও অনুসন্ধান (research) করিতে হইলে এই সুন্দর মৌখিক গ্রাম্য গল্প অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এবং ওই মূল্য ব্যতিরেকেও রস-পিপাসুগণ ইহাতে অমৃতসম অনুপম গ্রাম্য মধুর সন্ধান পাইবেন, ইহাতে তিলমাত্র ভেজাল নাই; ইহা অনাঘ্রাত ও অনাস্বাদিত।

ছোটবেলায় রাতে মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া এই সমস্ত গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। তখন যেমন ইহা আমাকে অনাবিল আনন্দদান করিত এখনও সেই রকম—এক কথায় আমি যখন ইহা শুনি তখন "My heart leaps with joy."

সুতরাং অন্য প্রদেশের (?—কলিকাতা 'প্রদেশ'? না রাজশাহী 'প্রদেশ'? যেখানে আমি উচ্চ শিক্ষা পেয়েছি।) ভাষার আওতায় উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার ফলে সেই অঞ্চলের ভাষার ছাপ পড়ার বাধ্যতা হ'তে দূরে রইলুম। ডক্টর বাগচি আমাদের অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা না জেনেও [জানা কি একেবারেই অসম্ভব? কোন উপায়ই ছিল না? এ সম্বন্ধে Sir George Griersonএ বোধ হয় কিছু উপকরণ পাওয়া যেত—জেলার নানা অঞ্চলের ভাষা প্রায়ই এক ধরণের, তবে স্থান-ভেদে কিছু কিছু অদল-বদল হয়।] আমাদের অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে তিনি অযৌক্তিক মত প্রকাশ করেছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন ডক্টর বাগচী তাঁকে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন "শিরণীর" মধ্যে নাকি যশোহর জেলার ভাষার ঢঙ পাওয়া যায়।

এই সম্পর্কে আর একটা কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। গ্রাম্য গানের এবং গল্পের ভাষা গ্রাম্য-প্রচলিত কথ্যভাষা হ'তে পৃথক, কেবল ভাষার গ্রামার এবং ফনেটীক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লোক সঙ্গীতগুলি, হারামণির গানগুলি এবং "ময়মনসিংহ গীতিকা" প্রভৃতির গানগুলি দেখলেই বোঝা যাবে। [Sir George Griersonএর Linguistic Survey of Indiaতেও কিছু কিছু নিদর্শনী আছে।]

এই "শিরণীর" গল্প অংশে যে অপ্রয়োজনীয় আরবী ও ফার্সী শব্দসমূহ পাওয়া যাবে তার জন্য আমাকে দায়ী করা চলে না, কেননা গল্প রচয়িতা আমি নই। এই গল্পের ভূমিকা আমি লিখেছি এবং তাতে উক্ত ধরণের শব্দসংখ্যা বিরল। আর যদি প্রচুর পরিমাণে [অপ্রয়োজনীয় রূপে নয়] আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করা যায়, তবে তা কি বাংলা-সাহিত্যের সৌকর্য্যের হানি করবে? ইংরাজী, ফরাসী শব্দের [যা 'পরিচয়ে' অপর্য্যাপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়] দ্বারা কি বাংলা-সাহিত্যের সৌকর্য্য সাধিত হ'চ্ছে? বাংলা-সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহারে সাহিত্যের সৌকর্য্য সাধিত হ'বে কিনা তৎসম্বন্ধে আমার আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। এই উপলক্ষ্যে ডক্টর বাগচীকে Dictionary of Mussalman Bengali Words by the Revd William Goldsack [Christian Literature and Tract Society, 41, Lower Circular Road, Calcutta, Re. 1-8-0] পড়তে অনুরোধ করি। কেননা তা হ'লে তিনি বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আরবী ফার্সী তুর্কী শব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হ'তে পারবেন। তিনি আরবী ফার্সী শব্দের "আমদানী" [এই ফার্সী শব্দটার ব্যবহারের মধ্যে যে ঠাট্টা রয়েছে তা প্রয়োগ করা বাগচী

মহাশয়ের মত পণ্ডিতের পক্ষে অশোভন হ'য়েছে এবং এ থেকে আমার মনে হয় তাঁর অসহিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যভাব খুব উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।] দেখে বেজার হ'য়েছেন।

আমার শিরণী পেছন দিক থেকে আরম্ভ করার জন্য শিরণীর ।৶০ পৃষ্ঠা দেখ্‌তে অনুরোধ করি ["তিনিই (অবনীন্দ্রনাথ) এই গ্রন্থ দক্ষিণ দিক হইতে ছাপিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়াছেন পৃঃ ।৶০-]। আর দক্ষিণ দিক হ'তেই যদি ছাপা যায় তবে সেটা কি এতো দোষাবহ? রবীন্দ্রনাথকে আমি এ বই দিয়েছি। তিনি এতে কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা।

আমার বক্তব্য

মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁর প্রতিবাদটি আমার নিকট পাঠিয়ে আমাকে যে তাঁর প্রতিবাদের জবাব দেবার অবকাশ দিয়েছেন সে জন্য আমি তাঁর নিকট বাধিত। আমার জবাব আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপেই দেব, কারণ মনসুরউদ্দীন সাহেব 'শিরণী' উপহার দিয়ে বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, অনর্থক বাদপ্রতিবাদে সে উপহারের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'বে বই বাড়বে না। এ ভয় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর প্রতিবাদের জবাব দিতে বসেছি কেননা তিনিই তা' চেয়েছেন।

(১) মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁর পুস্তকের নাম-করণে বলেছেন—"ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রার্থিত সুবিধার জন্য খাঁটি-প্রাদেশিক ভাষায় এ উপকথাটি লেখা গেল"। তাঁর এই উক্তি থেকে আমি মনে করেছিলাম যে তিনি গল্পটি যেমন শুনেছিলেন আনুবর্ণিক-ভাবে তা' লিপিবদ্ধ করেন নি, নিজের প্রাদেশিক ভাষায় পুনরায় তা'র রচনা করেছেন। তাঁর প্রতিবাদ থেকে এখন বুঝলাম যে সে সন্দেহের কোন কারণ নেই—তিনি গল্পটি যেমনি শুনেছেন "তেমনি record" করেছেন। অর্থাৎ তাঁর উক্তির "লেখা গেল" কথাটি "লিপিবদ্ধ করা গেল" অর্থে গ্রহণ করতে হ'বে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে ওরূপ 'ভাসাভাসা' উক্তি তাঁর নিজের নয়, সেটা হচ্ছে "বঙ্গবাণী" সম্পাদকের। একথা শুনে বাঙ্গালী পাঠক নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হবেন, কারণ এ সব সংগ্রহ আনুবর্ণিকরূপে লিপিবদ্ধ না হ'লে ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট তার মূল্য অনেক কমে যায়। তবে একথা আমি এখনো বল্‌তে বাধ্য যে মনসুরউদ্দীন সাহেবের লিপিবদ্ধ করবার পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি রয়েছে—আর সে সব ত্রুটি ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে মারাত্মক। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে কাজে লাগবে মনে করে তিনি এ গল্প প্রকাশ করেছেন—অথচ শব্দের উচ্চারণ সঠিক লিপিবদ্ধ করবার জন্য তিনি কোন উপায় অবলম্বন করেন নি—তাই তাঁর প্রকাশিত গল্প থেকে 'বল্লাম', 'পারেন', 'জানিনা', 'রাগারাগি', 'জিলাপি', 'একটী', 'বাঁচাও', 'স্বীকার', 'আপনার', আ'সো' প্রভৃতি শব্দের প্রাদেশিক উচ্চারণ আমরা সহজে ধরতে পারি না। মনসুরউদ্দীন সাহেব নিশ্চয়ই বল্‌বেন না যে, এ শব্দগুলির উচ্চারণে কোন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য নেই। পাবনার গ্রাম্যভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকলেও এ কথা আমি নিঃসন্দেহেই বল্‌তে পারি যে সে ভাষায় "প্যারিনা" কথা চলে না, সে ভাষার বাক্যরচনায় 'তাঁই'লি' ও 'তা' নলি' এক অর্থে

ব্যবহৃত হয় না ("যদি তুমি তিন মাসে ফির‍্যা আসপ্যার পারো তা'নলি খোদাত্‌ালা আপনার একটী সন্তান দিবে"), এবং "কি জানি ভাই আমি জানি না", "আমরা তা পারবো না", "বাবা তোমাদের বাড়ী কোথায়" প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ সাধারণতঃ চলে না।

(২) 'শিরণীর' গল্পে যে সব আরবী ফারসী শব্দ পাওয়া যায় তা'র জন্য আমি মনসুরউদ্দীন সাহেবকে দায়ী করেছি একথা তাঁর মনে করবার কোন কারণ নেই। আমি তাঁকে দায়ী করেছি তাঁর নিজের রচিত উৎসর্গ পত্রের ভাষার জন্য। তিনি তা' যে ভাষায় রচনা করেছেন, বাংলা-সাহিত্যে তা'র কোন স্থান নেই। "মায়ের অমৃতময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে দুনিয়ার তামাম কচি ছেলে-মেয়ের হাতে দিলাম"—এই বাক্যে সত্যকার বাংলা শব্দের পরিবর্ত্তে 'দুনিয়া' ও 'তামাম' কথা প্রয়োগের কোন স্বার্থকতা নেই। বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ চলা উচিত নয় এমন কথা আমার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু প্রয়োগ করলেই যে সব আরবী ও ফারসী শব্দ বাংলা সাহিত্যে চলবে একথা আমি মানি না, কারণ লেখকের নিজের ইচ্ছামত শব্দের 'চলন' নির্দ্ধারিত হয় না।

(৩) আমার সমালোচনায় আমি বলেছিলাম যে ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির একটা বিশিষ্ট গতি আছে, মনসুরউদ্দীন সাহেব "শিরণী" পেছন দিক থেকে ছেপে সে গতির নিরর্থক অবহেলা করেছেন। এতে মনসুরউদ্দীন সাহেব মনে করেছেন যে "আমার অসহিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যভাব খুব উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে", ও আমি "বেজার হয়েছি"। তিনি এই উক্তির সমর্থনে বলেছেন যে স্বয়ং "অবনীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ দক্ষিণ দিক হইতে ছাপিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়াছেন" এবং রবীন্দ্রনাথও নাকি তা'তে কোন "অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি।" ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে "ব্রাহ্মণ্যভাবের" কোন সম্বন্ধ নেই। আর বাংলা বই যে "দক্ষিণ দিক হইতে ছাপিলে" "ছাপার" সৌকর্য্য সাধিত হয় একথা আমি মানি না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, ১৩৯-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা.
রামকুমার মেশিন প্রেস, ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত